কলিকাতা, ঢাকা, রাজশাহী, করাচী, পাটনা, বিহার, উৎকল ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের ইন্‌টারমিডিয়েট্, বি. এ. ও বি. টি. পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবিধ পরীক্ষার জন্য নব পরিকল্পনায় লিখিত।

# একের ভিতরে চার


## বিনয় সরকার, এম. এ., নাট্যবিশারদ

অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিভাগ, সিটি কলেজ (সাধারণ ও বাণিজ্য বিভাগ), কলিকাতা। ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ), কলিকাতা.; গভর্নমেণ্ট কমার্শিয়াল কলেজ (বর্তমানে গোয়েঙ্কা কলেজ অব্ কমার্স), কলিকাতা; বালিগঞ্জ গার্লস্ কলেজ (বর্তমানে মুরলীধর গার্লস্ কলেজ), কলিকাতা। প্রাক্তন পরীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।


প্রণেতা: 'ব্যাকরণিকা', 'প্রবেশিকা বাংলা ব্যাকরণ-সার', 'এ স্টাডী অব্ কমার্শিয়াল বেঙ্গলী' 'দেবত্র' নাটক প্রভৃতি।

সাধারণ সম্পাদক : 'চন্দ্রশেখর' [ 'বোধিনী'-সংবলিত ] 'কাহিনী-বোধিনী', 'প্রাচীন সাহিত্য-বোধিনী', 'সোনার তরী-বোধিনী,' 'আধুনিক সাহিত্য-বোধিনী', 'মেঘনাধবধ-কাব্য' [ 'বোধিনী'-সংবলিত ], 'মাধ্যমিক বাংলা-বোধিনী', 'হায়ার সেকেণ্ডারা মাধ্যমিক বাংলা-বোধিনী ও পাঠ-সংকলন-বোধিনী', 'স্কুল ফাইন্যাল পাঠ-সংকলন-বোধিনী', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা -বোধিনী', 'গল্পগুচ্ছ-বোধিনী', 'ছোটদের পথের-পাচালী বোধিনী', 'গৃহদাহ-পরিচিতি', 'নৈবেদ্য-পরিচিতি' ইত্যাদি।

B6783

দি ঢাকা ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

৫নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২


মূল্য ছয় টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা

প্রকাশক :

শ্রীসুনীলকুমার দত্ত, এম. এস্-সি.

ঢাকা ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী

৫নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ; কলিকাতা-১২।

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

তৃতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

চতুর্থ সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

ষষ্ঠ সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

সপ্তম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

অষ্টম সংস্করণ (সবিশেষ পরিমার্জিত ও সংযোজিত)—আশ্বিন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

নবম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

RARY
GAL
CALCUTTA

| মুদ্রাকর— | ফর্মা নম্বর :— |
| --- | --- |
| শ্রীসুনীলকুমার দত্ত<br>ভোলাগিরি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্<br>১১১, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯ | ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৪৯ ও সূচীপত্র |
| শ্রীজ্যোতির্ময় দেব<br>প্রিন্টার্স সিণ্ডিকেট্<br>১৯/১/১বি, পাটোয়ার বাগান লেন, কলি-৯ | ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৬ |
| শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়<br>প্রতিভা আর্ট প্রেস<br>১৯৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯ | ১০, ২৬, ২৮, ৩৪, ৩৫, ৪৫ |
| শ্রীহিতেন্দ্রনাথ বসু<br>হিন্দ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্<br>৬এ, গঙ্গনারায়ণ দত্ত লেন, কলিকাতা-৬ | ১, ৭, ৮, ৩০, ৩২ |

# সূচীপত্র

## দ্বিতীয় খণ্ড—অনুবাদ



## তৃতীয় খণ্ড—ভাব-সম্প্রসারণ : ভাবার্থ ঃ সারাংশ : বস্তুসংক্ষেপ ঃ ব্যাখ্যা : গূঢ় মর্ম ঃ কেন্দ্রীয় ভাব ঃ ভাব-বিবৃতি

## চতুর্থ খণ্ড—প্রবন্ধ

| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৫৮। | নজরুল-প্রতিভা | ৫৭৩ |
| ৫৯। | শিক্ষাবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ | ৫৭৮ |
| ৬০। | শিশুশিক্ষা | ৫৮৮ |
| ৬১। | নারী ও পুরুষের শিক্ষাদর্শের পার্থক্য | ৫৯১ |
| ৬২। | ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সংস্কার এবং পাক্-শিক্ষানীতি | ৫৯৪ |
| ৬৩। | আমাদের পরীক্ষা-পদ্ধতি | ৬০৩ |
| ৬৪। | আবশ্যিক সামরিক শিক্ষা | ৬০৮ |
| ৬৫। | স্বাধীন পাক্-ভারতে ইংরাজি ভাষার স্থান | ৬১১ |
| ৬৬। | সাংবাদিকতা ও আধুনিক জীবন | ৬১৪ |
| ৬৭। | বেতার ও বর্তমান জগৎ | ৬১৬ |
| ৬৮। | চিত্রবাণীর ধারা ও ভবিষ্যৎ | ৬২০ |
| ৬৯। | প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা | ৬২৬ |
| ৭০। | সাহিত্য-শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা | ৬২৮ |
| ৭১। | ভারতে বিজ্ঞানের অভিযান | ৬৩২ |
| ৭২। | বিজ্ঞানের গতি কোন্ পথে ! | ৬৩৪ |
| ৭৩। | যুগ-পরিবর্তনের ধারায় বাংলার উৎসব | ৬৩৭ |
| ৭৪। | আধুনিক কালে ভারতে পরিবার-জীবনের আদর্শ | ৬৪২ |
| ৭৫। | ভারতীয় গণতন্ত্রে ভারতীয় গণজীবন | ৬[illegible] |
| ৭৬। | জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা | [illegible] |
| ৭৭। | ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র | ৬[illegible] |
| ৭৮। | রাষ্ট্রীয়করণ নীতি ও ভারত | ৬[illegible] |
| ৭৯। | সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে ভারতীর রাষ্ট্র ও সমাজগঠন | ৬[illegible] |
| ৮০। | ভারতের ভূদান-যজ্ঞ ও সর্বোদয় | ৬৬৫ |
| ৮১। | ভারতের বন-মহোৎসব | ৬৭০ |
| ৮২। | ভারতে দশমিক মুদ্রা ও মেট্রিক পদ্ধতি | ৬৭৪ |
| ৮৩। | আমাদের বেকার-সমস্যা | ৬৮০ |
| ৮৪। | ভারতের রাষ্ট্রভাষা-প্রসঙ্গ | ৬৮৭ |

## সংকেত-ব্যাখ্যা

ক. বি. =কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়=C. U.
ঢা. বি. =ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়=D. U.
রা. বি.=রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়=R. U.
গৌ. বি.=গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়=G. U.
উ. বি.=উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়=U. U.
বি. বি.=বিহার বিশ্ববিদ্যালয়=B. U.

মাধ্যমিক=Intermediate Exam.
বি. এ.=B. A. Examination.
দ্বিতীয় ভাষা=Second Language.
অতি=Compartmental Exam.
বিশেষ=Special Examination.
বিকল্প=Alternative Bengali Exam.

# প্রবন্ধ-পাঠের নির্দেশিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় ইন্‌টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীগণের পক্ষে ১ হইতে ৩৭, ৪৩, ৫০, ৫৯, ৬১ হইতে ৭৩, ৮০ হইতে ৮৪, ৮৮, ১০০ ও ১০১-সংখ্যক প্রবন্ধাদি অবশ্যই পঠিতব্য। ইন্‌টার্‌মিডিয়েট্ বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীগণকে ৬৯ হইতে ৭২ ও ১০১-সংখ্যক প্রবন্ধ-পঞ্চকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় বি. এ. পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীদের পক্ষে ১ হইতে ১৭, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৬ হইতে ৬৩, ৭৩ হইতে ৮৮, ৯৭ হইতে ১০১-সংখ্যক প্রবন্ধাদি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পরীক্ষায় ৯৩ হইতে ৯৬-সংখ্যক প্রবন্ধচতুষ্টয় অতীব মূল্যবান।

পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের বাংলা পরীক্ষায় ১৯, ৩৪, ৭১, ৭৪, ৭৫, ৭৮ হইতে ৮৮, ৯৩ হইতে ৯৬-সংখ্যক প্রবন্ধাদি পাঠ করিবার প্রয়োজন নাই।

—গ্রন্থকার।

# একের ভিতরে চার

# প্রথম খণ্ড

# ব্যাকরণ ঃ অলংকার ঃ ছন্দ

## প্রথম পর্ব—ধ্বনি-প্রকরণ

### প্রথম অধ্যায়

### বর্ণপরিচয় ঃ উচ্চারণ-তত্ত্ব

**বর্ণপরিচয়**

ভাষায় উচ্চারিত শব্দকে ( word ) বিশ্লেষ করিলে **ধ্বনি** ( **Sound** ) পাওয়া যায়। ধ্বনি দুই জাতের—এক জাতীয় ধ্বনি অপর জাতীয় ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই স্বয়ংপূর্ণ ও পরিস্ফুট ভাবে উচ্চারিত হয় এবং ইহাকেই আশ্রয় করিয়া অপর জাতীয় ধ্বনি, যাহা একলা স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইবার যোগ্য নয়, তাহাই ব্যক্ত হয়—এইরূপ স্বয়ংপূর্ণ ধ্বনিই **স্বরধ্বনি** ( **Vowel Sound** ) এবং পরনির্ভরশীল ধ্বনিই **ব্যঞ্জন-ধ্বনি** ( **Consonant Sound** ) : যেমন—'ক্' একটি ব্যঞ্জনধ্বনি ; ইহাকে শ্রুতিযোগ্য করিয়া উৎকৃষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে হইলে স্বরধ্বনির আশ্রয় লইতে হয় অর্থাৎ ক=ক্+অ : কা=ক্+আ ; কি=ক্+ই। সাধু ও চলিত বাংলা ভাষায় মাত্র সাতটি স্বরধ্বনিই প্রচলিত। ইহারাই **মৌলিক স্বরধ্বনি** ( **Cardinal Vowels** ), যথা,—'অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও'। ঈ-কার বা ঊ-কার উচ্চারণ ই, উ দিয়া সমাপ্ত হয় ; ঋ হইয়াছে রি, ৯ হইয়াছে লি। আবার এই স্বরধ্বনিগুলিরই সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছে **সন্ধিস্বর**, **সন্ধ্যক্ষর** তথা **সংযুক্ত**, **মিশ্র** বা **যৌগিক স্বরধ্বনি** ( **Dipthongs** )। এই জাতীয় স্বরধ্বনির মধ্যে কেবলমাত্র দুইটির জন্য বর্ণ বাংলা বর্ণমালায় নির্দিষ্ট আছে ; যেমন,—ঐ [ =ওই ], ঔ [ =ওউ ]। ধ্বনিনির্দেশক চিহ্নকে **বর্ণ** বলা হয়। কিন্তু বর্ণ এবং অক্ষর এক জিনিস নয়, আলাদা। কোনো শব্দ যখন একসঙ্গে যতটুকু উচ্চারিত হয়, তখন তাহাকে বলা হয় **অক্ষর** ( **Syllable** ) : যেমন,—'কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান'—এই চরণটিতে চৌদ্দটি অক্ষর আছে, কিন্তু চব্বিশটি বর্ণ ( **Letter** ) আছে।

স্বরধ্বনিবোধক চিহ্নকে **স্বরবর্ণ** ( **Vowel Letter** ) এবং ব্যঞ্জনধ্বনিবোধক চিহ্নকে **ব্যঞ্জনবর্ণ** ( **Consonant Letter** ) বলা হয়। ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিদ্যোতক চিহ্নাদির সমষ্টিকে বলা হয় **বর্ণমালা** ( **Alphabet** )। বাংলা বর্ণমালায় অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ( ৠ, ঌ ), এ, ঐ, ও, ঔ— **ইহারা স্বরবর্ণ** এবং ক, খ, গ, ঘ, ঙ ; চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ; ত, থ, দ, ধ, ন ; প, ফ, ব, ভ, ম : য, র, ল, ব ; শ, ষ, স, হ ; ড়, ঢ় ; য় ; ং, ঃ, ঁ— **ইহারা ব্যঞ্জনবর্ণ**। অ-ভিন্ন অন্যান্য স্বরবর্ণ তাহাদের সংক্ষিপ্ত রূপ লইয়া ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হয়। ইহাদের সংক্ষিপ্ত রূপ এইরূপ :—[ া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ৄ, ে, ৈ, ো, ৌ ]। পক্ষান্তরে, অ-কারের নিমিত্ত কোন সংক্ষিপ্ত রূপ নাই—অ-কার ব্যঞ্জনবর্ণের গায়েরই মধ্যে মিশিয়া থাকে। তাই ( ্ ) এই চিহ্নটি ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে বসাইলে অ-কারের লোপ জানানো হয় : এই বিশিষ্ট চিহ্নের নাম **হসন্তচিহ্ন**। বাংলার হসন্তচিহ্নের ব্যবহারে বড়ই শিথিলতা দেখা যায়। ইহা ঠিক নয়। বাংলায় ব্যবহৃত হসন্ত তৎসম শব্দগুলিতে হসন্তচিহ্ন থাকা উচিত। ইহা ছাড়া বাংলায় যুক্তাক্ষর ভাঙিয়া লিখিবার কালে হসন্তচিহ্ন অবশ্যই দিতে হইবে : যেমন,—মহান্ ; উদ্ঘাটন।

### স্বরবর্ণের উচ্চারণ-আলোচনা

অ—( ক ) সাধারণ বা স্বকীয় উচ্চারণ : যথা,—কথা ; চলা ; অধীর। ইহার উচ্চারণ অনেকটা ইংরাজি law-এর স্বরধ্বনির ন্যায়। ( খ ) ও-কারবৎ উচ্চারণ —সাধারণতঃ পরবর্তী অক্ষরে ই বা উ-ধ্বনি যদি থাকে অথবা য-ফলা বা ক্ষ [ যাহার বাংলা উচ্চারণ 'খ্য' ] যদি থাকে, তাহা হইলে অ-কার ও-কারবৎ উচ্চারিত হয় : যথা,— অতি [ =ওতি ] ; বস্তু [ =বোস্তু ] ; তাৎপর্য [ =তাৎপোর্‌জো ]। আবার একাক্ষর শব্দে অ-কার দীর্ঘ রূপেও উচ্চারিত হয় : যথা,—জল [ =জ—ল্ ]।

**লুপ্ত অ-কার**—সন্ধি অর্থাৎ শব্দের ধ্বনিমিলন ঘটিলে অ-কারের লোপ হয়। এই ঘটনাটি বুঝাইবার জন্য এক অনুচ্চার্য অক্ষর আছে—ঽ। ইহার অবস্থানই আছে, উচ্চারণ নাই : যথা,—ততোঽধিক [ =ততঃ+অধিক ]-এর উচ্চারণ [=ততোধিক ]।

আ—( ক ) একাক্ষর শব্দে আ-কার দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত হয় : যথা,—নাম [ =না—ম্ ]। ( খ ) আ-কার অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব ভাবেও উচ্চারিত হয় : যথা,—নামা। ( গ ) হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী থাকিলে আ-কারের উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘের মাঝামাঝি হয় : যথা,—কাট্ ; মার্।

ই, ঈ—( ক ) একাক্ষর পদে ই ঈ দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত হয় : যথা,—দিন ; দীন। ( খ ) একাধিক অক্ষরের পদে কিংবা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বাক্যে ই

ঈ হ্রস্ব ভাবে উচ্চারিত হয় : যথা,—দিন-কাল ; কলমটি আমায় দিন্ দেখি ; দীন-দুনিয়ার মালিক ; দীন-দুঃখী।

উ, ঊ—(ক) একাক্ষর পদে উ ঊ দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত হয়,—পুব ; পূব ; পুর ; পূর। (খ) একাধিক অক্ষরের পদে কিংবা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বাক্যে উ ঊ হ্রস্ব ভাবে উচ্চারিত হয় : যথা,—পুব-দিক ; পূব-মুখো চলেছ বুঝি ; আলিপুর যাবে নাকি ; কচুরির পূরটি খেয়ে দেখ তো।

ঋ, ৠ, ঌ—সংস্কৃতে এইগুলি স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হইত, কিন্তু বাংলায় এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণ এইরূপ :—রি, রী, লী। **বাংলায় এইগুলিকে প্রকৃতপক্ষে স্বরধ্বনি বলা যায় না।** কারণ,—র, ল-এর সহিত সংযুক্ত ই অথবা ঈ-ধ্বনি লইয়াই ঋ, ৠ, ঌ-এর উচ্চারণ পদ্ধতি। সংস্কৃত বর্ণমালাকে অনুসরণ করিয়া এইগুলিকে বাংলা বর্ণমালাতেও রাখা হইয়াছে। বাংলায় ঌ-এর ব্যবহার নাই।

এ—(ক) সাধারণ বা স্বকীয় উচ্চারণ : যথা,—কেশ, মেষ, শেষ। এ কারের উচ্চারণটি Fame-এর 'a' স্বরধ্বনির ন্যায়। (খ) বিকৃত উচ্চারণ : যথা,—একা [ =অ্যাকা ] ; খেলা [ =খ্যালা ]। এ-কারের এইরূপ বিকৃত উচ্চারণ শব্দের আদিতেই কেবল মিলে। এই বিকৃত উচ্চারণটি Bat-এর 'a' স্বরধ্বনি অর্থাৎ 'অ্যা'-এর ন্যায়।

ও—ও-কারের উচ্চারণটি ইংরাজি শব্দ 'robe, roap'-এর 'o, oa'-র স্বরধ্বনির ন্যায় হয় : যথা,—লোক ; রোগা ; বিয়োগ : পুরোহিত।

ঐ, ঔ—ঐ-কার এবং ঔ-কারকে বাংলায় **দ্বিস্বর ধ্বনি, যৌগিক স্বরধ্বনি** বা **সন্ধ্যক্ষর (Dipthong)** বলা হয়। 'ও' এবং 'ই'—এই দুইটি স্বরধ্বনির দ্রুত উচ্চারণের ফলে 'ঐ' আবার 'ও' এবং 'উ'—এই দুইটি স্বরধ্বনির দ্রুত উচ্চারণের ফলে 'ঔ' সন্ধ্যক্ষরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে : যথা,—ধৈর্য [ =ধোইর্জো ] ; চৈতন্য [ =চোইতোন্নো ] ; কৌরব [ =কোউরব্ ]।

**মন্তব্য :** একটিমাত্র স্বরধ্বনি উচ্চারণ করিবার সময়ে যদি দুইটি স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে **সন্ধ্যক্ষর** বা **সংযুক্ত স্বর** বলা হয়। সন্ধ্যক্ষরে দুইটি মিলিত স্বরধ্বনি একটি অখণ্ড একক স্বরধ্বনি সৃষ্টি করে। চলিত বাংলায় পঁচিশটি সন্ধ্যক্ষর বা সংযুক্ত স্বর আছে।

### মৌলিক স্বরধ্বনির উচ্চারণসংগত শ্রেণীবিভাগ

'ই (ঈ), এ, অ্যা'—এই কয়টি স্বরধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বা আগাইয়া সম্মুখ-ভাগে চলিয়া আসে বলিয়া ইহারা **সম্মুখস্থ স্বরধ্বনি (Front Vowels)** নামে পরিচিত। ইহাদের উচ্চারণকালে জিহ্বা তালুর দিকে প্রসৃত হয় বলিয়া ইহারা **তালব্য (Palatal) স্বরধ্বনি** নামে, আবার অধরোষ্ঠও প্রসৃত হওয়ায় **'প্রসারি-যুক্ত বা প্রসৃত'**

স্বরধ্বনি ( Spread Vowels ) নামে অভিহিত হয়। ই ( ঈ )-কারের উচ্চারণে জিহ্বা উচ্চে 'অগ্র-তালুর কঠিন অংশের নিকট পৌঁছে বলিয়া ইহাকে **'উচ্চাবস্থিত সম্মুখস্থ স্বরধ্বনি'** (High Front Vowel ; এ-কারের উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থিতি ই-কারের মত সম্মুখে, তবে একটু নিম্নে হওয়ায় ইহাকে **'মধ্যাবস্থিত সম্মুখস্থ স্বরধ্বনি'** ( Mid Front Vowel ) ; এবং অ্যা-কারের উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান ই-কার ও এ-কারের মত সম্মুখে হইলেও আরও নিম্নে হওয়ায় ইহাকে **'নিম্নাবস্থিত সম্মুখস্থ স্বরধ্বনি'** ( Low Front Vowel ) বলা হয়। এ-কার ও অ্যা-কারের উচ্চারণে জিহ্বার পশ্চাৎ অংশ খানিকটা কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয় বলিয়া এই দুইটি **'কণ্ঠতালব্য স্বর'** ( Palato-guttural Vowels ) নামে সুপরিচিত।

'উ (ঊ) ও, অ'—এই কয়টি স্বরধ্বনির উচ্চারণকালে অভ্যন্তরভাগে জিহ্বা পিছাইয়া আসে বলিয়া ইহারা **'পশ্চাৎ স্বরধ্বনি'** ( Back Vowels ) নামে পরিচিত। এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ-ব্যাপারে ওষ্ঠাধর প্রলম্বিত হইয়া গোলাকার হয় বলিয়া এইগুলিকে **'ওষ্ঠ্য'** ( Labial ) এবং **'বর্তুল'** ( Rounded ) ধ্বনি বলা হয়। উ (ঊ)-কারের উচ্চারণে জিহ্বা পিছাইয়া আসিয়া পশ্চাৎ-তালুর কোমল অংশের কাছে উঠে বলিয়া ইহাকে **'উচ্চাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি'** ( High Back Vowel ) ; ও-কারের উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান ঔ-কারের মত পিছনেই—তবে একটু নিম্নে হওয়ায় ইহাকে **'মধ্যাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি'** ( Mid Back Vowel ) ; এবং অ-কারের উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থিতি উ-কারের ও ও-কারের ন্যায় পশ্চাতে হইলেও আরও নিম্নে হওয়ায় **'নিম্নাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি'** ( Low Back Vowel ) বলা হয়। ও-কার ও অ-কারের উচ্চারণে জিহ্বা কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয় বলিয়া এই দুইটি **'কণ্ঠৌষ্ঠ্য স্বর'** ( Labio-guttural Vowels ) নামে সুবিদিত।

**'আ'**—এই স্বরধ্বনিটির উচ্চারণকালে জিহ্বা মুখের সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের মাঝামাঝি তথা কেন্দ্রস্থানীয় অংশে সাধারণভাবে শায়িত থাকায় ইহা **'কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনি'** (Low Central Vowel ) নামে পরিচিত। আ-কারের উচ্চারণে জিহ্বা কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয় বলিয়া ইহা **'কণ্ঠ্যধ্বনি'** (Guttural Sound) হিসাবে সুপরিচিত। মুখবিবর উন্মুক্ত বা বিবৃত থাকায় ইহা **'বিবৃত ধ্বনি'**ও ( Open Sound ) বটে। এই কেন্দ্রীয় আ-কার ব্যতীত, আর এক ধরণের আ-ধ্বনিও আছে, যাহা সম্মুখে বা মুখাগ্রভাগে উচ্চারিত হয় আর ইহাই 'তালব্য আ' ( Palatal ā ) নামে পরিচিত। 'কল্য' অর্থে আধুনিক প্রাদেশিক বাংলায় 'কাল, কাল' শব্দের আ-কারটি তালব্য আ-কারই বটে। এই জাতীয় আ-কার বুঝাইতে আ' ( া' ) অথবা আ ( ৗ ) চিহ্নদ্বয়ের একটি ব্যবহৃত হয়।

## স্বরধ্বনির উচ্চারণসংগত শ্রেণীবিভাগের ছক

| | সম্মুখাবস্থিত Front [ প্রসৃত Spread অধরোষ্ঠ ] | কেন্দ্রীয় Central [ বিবৃত Open অধরোষ্ঠ ] | পশ্চাদবস্থিত Back [ বর্তুল Rounded অধরোষ্ঠ ] |
|---|---|---|---|
| উচ্চ High | ই ( ঈ ) | | উ ( ঊ |
| উচ্চ-মধ্য High-Mid | এ | | |
| নিম্ন-মধ্য Low-Mid | অ্যা | | অ |
| নিম্ন Low | আ', আ় (প্রাদেশিক ভাষায়) | আ | |

**ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-আলোচনা**

ক্ হইতে ম্ অবধি পঁচিশটি বর্ণ **স্পর্শবর্ণ** ( **Stops, Occlusives** ) কারণ, এই বর্ণগুলির উচ্চারণে জিহ্বার কোন-না-কোন অংশের সহিত কণ্ঠ, তালু বা দন্তের কিংবা ওষ্ঠে ও অধরে স্পর্শ হয়ই ; ক-বর্গ, ট-বর্গ এবং প-বর্গের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ বর্ণগুলির উচ্চারণ-সময়ে মুখবিবরের বিশেষ স্থান স্পৃষ্ট হয় বলিয়া ইহারা **স্পৃষ্টবর্ণ**। চ্ ছ জ্ ঝ্—ইহাদিগের উচ্চারণকালে জিহ্বা এবং তালুর স্পর্শের পরেই উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্ষণজাত ধ্বনি বাহির হয় বলিয়া ইহারা **ঘৃষ্টবর্ণ**। ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্—ইহাদিগের উচ্চারণকালে মুখের ভিতরে কিংবা ঠোঁটে-ঠোঁটে স্পর্শ ঘটিয়া থাকে এবং মুখের ভিতরকার বাতাস মুখপথ দিয়া বাহির না হইয়া নাক দিয়া বাহির হয় বলিয়া ইহারা **নাসিক্য** বা **অনুনাসিক ধ্বনি** ( **Nasalised Sounds** )।

**ক বর্গ**—ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্। জিহ্বার মূল বা পশ্চাদ্ভাগ দ্বারা কণ্ঠের দিকে তালুর কোমল অংশে স্পর্শ করিয়া এই বর্ণমালার ধ্বনি উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে **কণ্ঠ্য বর্ণ** ( **Gutturals, Velars** ) বলা হয়। ঙ্—প্রাচীন সময়ে এই বর্ণটির উচ্চারণ ছিল—'উঁঅ্'। এখন ঙ্-বর্ণের উচ্চারণ ইংরাজি Sing-শব্দের ng র ন্যায়।

**চ-বর্গ**—চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্। জিহ্বার মধ্যভাগ-দ্বারা তালুর সম্মুখ বা কঠিন অংশে স্পর্শ বা ঘর্ষণ করিয়া এই বর্ণমালার ধ্বনি উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে **তালব্য বর্ণ** ( **Palatals** ) বলা হয়। বাংলা চ্ ছ্ জ্ ঝ্-এর উচ্চারণ যথাক্রমে ইংরাজি ch বা

tch, ch-h, বা tch-h, j বা dg এবং j-h বা dg-h-এর ন্যায়। কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে এই বর্ণমালার উচ্চারণ অন্যবিধ। ঞ্—এই বর্ণটির উচ্চারণ সানুনাসিক য়্ বা ইঁয়্-র ন্যায়। তাই বর্ণটির নাম 'ইঁয়'। সাধারণতঃ চ-বর্গের বর্ণগুলির পূর্বে অবস্থিত এই বর্ণটির উচ্চারণ দন্ত্য ন-কারবৎ হয়ঃ যথা,—পঞ্চ [ পন্‌চ] ; অঞ্জলি [ =অন্‌জোলি ] ; আবার অন্যত্র য়ঁ-এর মত উচ্চারণও হয় ; যথা,—মিঞা [ =মিয়া ]। সংস্কৃত যাচ্ঞা শব্দের পুরানো বাংলা উচ্চারণ [ =জাচিঙ্গা ], আধুনিক বাংলা উচ্চারণ [ =জাচ্‌ন্যা ]। কিন্তু জ্+ঞ্ অর্থাৎ জ্ঞ্-এর উচ্চারণ বাংলায় [ =গ্যঁ ]ঃ যথা,—আজ্ঞা [ আগ্‌গ্যা ] —পশ্চিমবঙ্গে [ =আঁগ্‌গ্যাঁ, আঁগ্‌গে ], কিন্তু পূর্ববঙ্গে [ =আইগ্‌গ্যা ]।

**ট-বর্গ**—ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্। জিহ্বার অগ্রভাগকে প্রতিবেষ্টিত করিয়া অর্থাৎ উল্‌টাইয়া মূর্ধন বা মূর্ধা-প্রদেশে অর্থাৎ তালুর শীর্ষদেশের নিকট ( অবশ্য সাধারণ বাংলা উচ্চারণে আরও একটু নিম্নে ), স্পর্শ করিতে হয় বলিয়া এই বর্ণমালাকে **মূর্ধন্য বর্ণ** ( **Cerebrals, Cacuminals** বা **Retroflex Sounds** ) বলা হয়। জিহ্বাগ্রকে উল্‌টাইয়া লইয়া উচ্চারণ করা—ইহাই হইতেছে মূর্ধন্য বর্ণমালার বিশিষ্ট লক্ষণ ; তাই ইহাদিগকে **প্রতিবেষ্টিত (Retroflex) ধ্বনি** বলা হয়। **ট্ ড্**—ইংরাজির t, d-ধ্বনি আমাদের কানে ট্, ড্-এর মত শুনাইলেও, ঐ ইংরাজি শব্দ দুইটি দন্তমূলীয় ; অর্থাৎ,—ইংরাজি t, d-ধ্বনি আমাদের দন্ত্য ত্, দ্-এর সগোত্র—আমাদের মূর্ধন্য ট্, ড্-এর সগোত্র নয়। **ড়্ ঢ়্**—শব্দের মধ্যে ও অন্তে ড্ ঢ্ বাংলায় ড়্ ঢ়্ হয়। বিন্দুযুক্ত ড্ ঢ্ অর্থাৎ ড়্ ঢ়্ বর্ণদ্বয় বাংলায় নূতন—প্রাচীন বাংলায় বা তাহারও অগ্রবর্তী বাংলা বর্ণমালায় ড়্ ঢ়্ বর্ণদ্বয় নাইঃ যথা,—বিড়াল ক্রীড়া। ড়্ ধ্বনি একটি ক্ষণিক ধ্বনি। জিহ্বার অধোভাগ বা তলা দিয়া দন্তমূলে তাড়ন বা আঘাত হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই ধ্বনিকে **তাড়নজাত ( Flapped ) ধ্বনি** বলা হয়। ড়্-এর মহাপ্রাণ রূপ হইতেছে ঢ়্। পূর্ববঙ্গে সাধারণতঃ এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থান-বিশেষে 'ড়্' 'র্'-এর মত উচ্চারিত হয়ঃ যথা,—'ঘর ভাড়া' স্থলে লেখায় এবং সময়ে কথাতেও 'ঘড় ভারা' প্রচলিত আছে। **ণ**—মূর্ধন্য ণ-এর ধ্বনি বাংলায় লুপ্ত—ইহার উচ্চারণ বাংলায় দন্ত্য ন-এর মতই ; যথা,—কাণ [ =কান ] ; পুরাণ [ =পুরান ]। তবে, ট্ ঠ্ ড্ ঢ্—এর আগে ণ কারের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। 'ঘণ্টা', 'কণ্ঠ' প্রভৃতির উচ্চারণকালে জিহ্বা উল্‌টাইয়া মূর্ধন্য-স্থানে মূর্ধন্য ণ-কার ধ্বনিত হয়, কিন্তু বাঙালীর কানে তাহা দন্ত্য ন-কারের ন্যায় শোনায়। বিশুদ্ধ মূর্ধন্য ণ-এর ধ্বনি কানে খানিকটা [ ড়ঁ ]-এর মত শোনা যায়।

**ত-বর্গ**—ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্। জিহ্বার অগ্রবর্তী অংশকে পাখার ন্যায় মেলিয়া তাহার দ্বারা উপরিস্থ দন্তসারির পিছনের দিকে নিম্নভাগে স্পর্শ করিয়া এই বর্ণমালার উচ্চারণ

করিতে হয় বলিয়া ইহাদিগকে **দন্ত্য বর্ণ ( Dentals )** বলা হয়। **ন্**—দন্ত্য ন-এর শুদ্ধ উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তশ্রেণীর একটু ঊর্ধ্বে কোনও স্থানে ঠেকে। কিন্তু ত্, থ্ দ্, ধ্-এর পূর্ববর্তী ন-কারের উচ্চারণে জিহ্বা একেবারে দাঁতের উপরে ঠেকিয়া থাকে। 'প্রাপ্ত, কন্থা, মন্দ, অন্ধ' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে ইহা লক্ষণীয়।

**প-বর্গ**—প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্। এই বর্ণমালার উচ্চারণে ওষ্ঠ এবং অধর পরস্পর কর্তৃক স্পৃষ্ট হয় বলিয়া ইহাদিগকে **ওষ্ঠ্য বর্ণ (Labials)** বলা হয়। **ফ্ ভ্**—মহাপ্রাণ বর্ণ ফ্ ও ভ্-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ হইতেছে প্+হ্ এবং ব্+হ্ অর্থাৎ ইংরাজির loop-hole, club-house-এর 'p-h' এবং 'b-h'-এর ন্যায় ফ্ ও ভ্-এর উচ্চারণ হওয়া উচিত ; যথা,—প্রফুল্ল [ =প্রপ্ হুল্ল ] ; প্রভা [ =প্রব্ হা ]। কিন্তু বাংলায় ফ্ ও ভ্ বিশুদ্ধ মহাপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনি নয়—Spirant বা উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ বাংলায় 'ফ্' ও 'ভ'-এর উচ্চারণ কতকটা f ও v-এর ন্যায় হয় : যথা,—প্রফুল্ল [ =Profullo ] ; প্রভাত [ =Provat ]। ইংরাজিতে বাংলা নামের এইরূপ বানানই লেখা হয়। কিন্তু ফ্, ভ্-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে ইংরাজিতে লেখা উচিত—Praphulla ; Prabhat।

**অন্তঃস্থ বর্ণ**—য্ র্ ল্ ব্। এক দিকে ক্ হইতে ম্ অবধি পাঁচশটি স্পর্শবর্ণ এবং অন্য দিকে শ্ ষ্ স্ হ্ এই চারিটি উষ্মবর্ণ—এই উভয় তরফের অন্তঃ বা অন্তরস্থিত অর্থাৎ মধ্যবর্তী য্ র্ ল্ ব্ এই চারিটি বর্ণকে **অন্তঃস্থ বর্ণ** বলা হয়। এই চারিটি বর্ণের মধ্যে য্ ( =y ), ব্ ( =w ) হইতেছে **অর্ধস্বর (Semi-vowel)** এবং র্, ল্ হইতেছে **তরল স্বর (Liquid)**। এই চারিটি অক্ষরের অন্তর্নিহিত অ-কারকে বাদ দিলে যথাক্রমে স্বরধ্বনি ই, ঋ, ৯, উ মিলে। **য্**—এই বর্ণের প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ [ =ইঅ ], কিন্তু প্রাকৃতে ও তদনুসারে বাংলায় ইহার বর্তমান উচ্চারণ [ =জ ]। আর য-কারের প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ [ =ইঅ ]-কে জানাইবার নিমিত্ত আধুনিক কালে বাংলায় 'বিন্দুযুক্ত য' অর্থাৎ 'য়' অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্-এর উচ্চারণ ইংরাজি [ j ] এবং 'য়্'-এর উচ্চারণ ইংরাজি [ y ]-এর ন্যায় হওয়া সমীচীন। ( ক ) পদের আদিস্থিত 'য্' সর্বত্রই নিজ উচ্চারণ রাখে : যথা,—যত্ন ; যম। ( খ ) পদের মধ্যস্থিত 'য্' কখনও-বা নিজ উচ্চারণ রাখে, আবার কখনও-বা 'য়্' উচ্চারণ গ্রহণ করে : যথা,—বিয়োগ, প্রয়োগ, সংযোগ, উপযোগী। ( গ ) পদের অন্ত্যস্থিত 'য্' অ-কারের ন্যায় উচ্চারিত হয় : যথা,—তনয় ; সময়। **র্**—জিহ্বার অগ্রবর্তী অংশকে কাঁপাইয়া সেই কম্পমান অংশের দ্বারা দন্তমূলে একাধিক বার দ্রুত আঘাত করিয়া র-ধ্বনির উৎপত্তি হয় বলিয়া এই ধ্বনিকে **কম্পনজাত (Trilled) ধ্বনি** বলা হয়। ইংরাজি 'r'-এর উচ্চারণ

বাংলা 'র'-এর উচ্চারণ হইতে বিশেষ পৃথক। **ল্**—ল-কারের উচ্চারণ-কালে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকাইয়া রাখিয়া জিহ্বার দুই পাশ দিয়া মুখবিবর হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করা হয় বলিয়া ল্-এর ধ্বনিকে **পার্শ্বিক (Lateral) ধ্বনি** বলা হয়। পরবর্তী দন্ত্য বা মূর্ধন্য বর্ণের প্রভাবে পড়িয়া পূর্ববর্তী ল-এর উচ্চারণস্থান একটু বদলাইয়া যায়: যথা,— আলতা [=আল্‌তা]; এখানে ল-কার দন্তে উচ্চারিত হয়। আবার 'উল্‌টা : পাল্‌টা' প্রভৃতি শব্দে ল-কার মূর্ধন্য ল-রূপে উচ্চারিত হয়। **ব্—এই অন্তঃস্থ ব** এবং **প-বর্গীয় ব**, উভয়েরই আকৃতি ও উচ্চারণ বর্তমানে বাংলায় অভিন্ন। বর্গীয় ব-এর উচ্চারণ ইংরাজি 'b'-এর অনুরূপ এবং অন্তঃস্থ ব এর উচ্চারণ ইংরাজি 'w' [অর্থাৎ উঅ]-এর উচ্চারণের অনুরূপ। সংযুক্ত বর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যে ব-ফলা আসে, তাহা সাধারণতঃ অন্তঃস্থ ব; কিন্তু ইহা বাংলায় নিজস্ব কোন উচ্চারণ না ঘটাইয়া পূর্বস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব-ভাব ঘটায়। আবার আদ্য অক্ষরে ব ফলা থাকিলে তাহার নিজস্ব উচ্চারণ তো দূরের কথা, ব্যঞ্জনবর্ণেরও দ্বিত্ব-ভাব ঘটায় না: যথা,—পক্ব [=পক্‌ক]; বিদ্বান্ [=বিদ্‌দান্]; কিন্তু দ্বিত্ব [=দিৎত]; স্বত্ব [=শৎত]। আবার 'জিহ্বা, আহ্বান, বিহ্বল'-এর বেলায় উচ্চারণ হয় যথাক্রমে [=জিউহা, আওহান্, বিউহল]। এখানে অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ কিছুটা ইংরাজি w-এর মত হয়। অবশ্য ইহাদের উচ্চারণ যথাক্রমে [=জিব্‌ভা, আব্‌ভান, বিব্‌ভল]-ও আছে; এখানে উচ্চারণ প্রাচীন বাংলা বা প্রাকৃতের অনুরূপ। **মন্তব্য:** স্মরণ রাখা উচিত যে, বর্গীয় 'ব' বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ব, পক্ষান্তরে অন্তঃস্থ 'বর্ণ' দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ। এই উভয় 'ব'-এর চিনিবার লক্ষণটি এইরূপ:—'উদূটৌ যত্র বিদ্যতে যো বঃ প্রত্যয়সন্ধিজঃ অন্তঃস্থং তং বিজানীয়াৎ তদন্যো বর্গ্য উচ্যতে।'—অর্থাৎ যেখানে 'ব' 'উ'-তে পরিণত হয়, যেখানে 'ব' প্রত্যয় বা সন্ধি-জাত, সেখানে উহা অন্তঃস্থ; অবশিষ্ট স্থানগুলিতে 'ব' বর্গীয়।

**উষ্মবর্ণ**—শ্ ষ্ স্ হ্। 'উষ্ম' শব্দের অর্থ 'নিঃশ্বাস'। যতক্ষণ শ্বাস থাকে, ততক্ষণ এই বর্ণগুলির উচ্চারণ টানিয়া প্রলম্বিত করা যায় বলিয়া ইহাদিগকে **উষ্মবর্ণ (Spirant)** বলা হয়। শ-এর উচ্চারণ-স্থান তালুতে, ষ্-এর উচ্চারণ-স্থান মূর্ধায়, স্-এর উচ্চারণ-স্থান দন্তে এবং হ্-এর উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠে। উষ্মবর্ণকে **নিঃশ্বসিত বা নিঃশ্বাসাশ্রয়ী** বর্ণও বলা যায়। শ্ ষ্ স্—শিশ্ দিবার ধ্বনির সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাদিগকে **শিশ্‌ধ্বনি (Sibilant)** বলা যায়। প্রাচীনকালে ইহাদের পৃথক পৃথক উচ্চারণ ছিল, কিন্তু বর্তমানে বাংলায় ইহাদের উচ্চারণ একই রূপ অর্থাৎ ইংরাজি s-এর মত না হইয়া sh-এর মত। **ক্ষ**—মূলে ক্ ও ষ্-এর সংযোগে গঠিত সংযুক্ত-বর্ণের উচ্চারণ প্রাচীন সংস্কৃতযুগে ছিল [=ক্ ষ্], কিন্তু এক্ষণে বাংলায় হয় [=খ্য]: যথা,—'লক্ষ'-এর প্রাচীন উচ্চারণ [=লক্‌ষ্], কিন্তু বর্তমান উচ্চারণ

[=লথ্য], পশ্চিমবঙ্গে [=লোক্‌-খো], কিন্তু পূর্ববঙ্গে [=লইক্‌খ]। **হ্‌**—কণ্ঠনালী হইতে উদ্ভূত হ্‌-কার উষ্ম ঘোষবর্ণ। যতক্ষণ শ্বাস থাকে, ততক্ষণ ইহাকে প্রলম্বিত করা যায়: যথা,—হ্‌ হ্‌ হ্‌ হ্‌......। পূর্ববঙ্গে উষ্ম উচ্চারণের জায়গায় হ্‌-কার কণ্ঠনালীর স্পৃষ্টধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়: যথা,—হাত [=হাৎ]।

**অনুস্বার**—ং। সংস্কৃতে অনুস্বারের প্রয়োগ আংশিক ভাবে সানুনাসিক পরিবেশ গড়িলেও, বাংলায় ইহার উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে [=ঙ]। অন্য স্বর ও ব্যঞ্জনের সঙ্গে অনুস্বারের যোগ কল্পিত হয় নাই—যেন ইহা স্বর- এবং ব্যঞ্জন-মালার বাহিরে অবস্থিত—তাই ইহা **অযোগবাহ ধ্বনি**। বলিতে কি, ইহার ঠিক পূর্ববর্তী কোন স্বরধ্বনির সঙ্গে ইহাকে উচ্চারণ করিতে হয়। তাই অনুস্বার 'আশ্রয়স্থানভাগী'ও বটে। বাংলায় 'ং' এবং 'ঙ' উচ্চারণে অভিন্ন হইয়া যাওয়ায়, একের ব্যবহার অপরের পরিবর্তে খুবই সাধারণ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে: যথা,—'বাংলা' এবং 'বাঙলা'; 'রং' এবং 'রঙ'।

**বিসর্গ**—ঃ। ইহা এক রকম হ্‌-এর ধ্বনি। সাধারণ 'হ' ঘোষধ্বনি আর বিসর্গ অর্থাৎ 'ঃ' তাহারই অনুরূপ অঘোষ ধ্বনি। একই কারণে অনুস্বারের ন্যায় বিসর্গও **অযোগবাহ ধ্বনি** আবার 'আশ্রয়স্থানভাগী'ও বটে। (ক) বাংলা ভাষায় কেবলমাত্র বিস্ময়াদি প্রকাশক অব্যয়ের ক্ষেত্রেই বিসর্গের ধ্বনি আছে: যথা,—'আঃ, উঃ, ওঃ'। (খ) পদের অন্ত্যস্থিত বিসর্গ প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে: যথা,—বস্তুতঃ [বস্তুত]। (গ) পদমধ্যবর্তী বিসর্গ ঠিক ইহারই পরবর্তী ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করিয়া থাকে: যথা,—দুঃখ [=দুক্‌খ]; মফঃস্বল বা মফঃসল [=মফস্‌সল]।

**চন্দ্রবিন্দু**—ঁ। চন্দ্রবিন্দুর এই চিহ্নটি স্বরধ্বনির মাঝে অনুনাসিকতা সংক্রামিত করে: যথা,—পাক>পাঁক; ইদুর>ইঁদুর।

## স্পর্শ বর্ণমালার উচ্চারণরীতিগত বিভাগ

স্পর্শ বর্ণমালার অন্তর্গত প্রতিটি বর্গের প্রথম চারিটি বর্ণের মধ্যে দ্বিতীয় বর্ণটি প্রথমটির সঙ্গে প্রাণ বা নিঃশ্বাস-যোগে এবং চতুর্থ বর্ণটি তৃতীয়টির সঙ্গে প্রাণ বা নিঃশ্বাস-যোগে গঠিত হয়। 'প্রাণ বা নিঃশ্বাস-যোগ' মানে 'হ্‌-কার জাতীয় ধ্বনির সংযোগ'। এইভাবে গঠিত ধ্বনিগুলিকে **মহাপ্রাণ (Aspirate) ধ্বনি** বলা যায়: যথা,—খ্‌ [=ক্‌হ্‌]; ঘ্‌ [=গ্‌হ্‌]; ছ্‌ [চ্‌হ্‌] ইত্যাদি। বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণে এই প্রাণ নাই—তাই ইহাদের ধ্বনিকে **অল্পপ্রাণ (Unaspirated) ধ্বনি** বলা যায়: যথা,—ক্‌, গ্‌, চ্‌, ইত্যাদি। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণে গাম্ভীর্য নাই, আছে মৃদুতা; পক্ষান্তরে, তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণ গম্ভীর। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ **অঘোষ-বর্ণ** (Voiceless বা Unvoiced Sounds) বা **শ্বাসবর্ণ**

## ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-স্থানের ছক

| উচ্চারণের রীতি | | | কণ্ঠনালী | কণ্ঠ ( কোমল তালু ) ও জিহ্বামূল | কঠিন তালুর ঊর্ধ্বভাগ ও জিহ্বা-মধ্য | মূর্ধা বা তালুর শিরোভাগ ও উল্‌টানো জিহ্বাগ্র | দন্তমূল ও জিহ্বাগ্র-ভাগ | দন্ত ও জিহ্বাগ্র-ভাগ | দন্ত ও ওষ্ঠ ( অধর ) | ওষ্ঠদ্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্পর্শবর্ণ | অল্পপ্রাণ | অঘোষ | ... | ক | চ | ট | ... | ত | ... | প |
| | | ঘোষ | ... | গ | জ | ড | ... | দ | ... | ব |
| | মহাপ্রাণ | অঘোষ | ... | খ | ছ | ঠ | ... | থ | ... | ফ |
| | | ঘোষ | ... | ঘ | ঝ | ঢ | ... | ধ | ... | ভ |
| | নাসিক্য ঘোষ | | ... | ঙ | ঞ | ণ | ন | ... | ... | ম |
| কম্পনজাত ( ঘোষ ) | | | ... | ... | ... | ... | র | ... | ... | ... |
| পার্শ্বিক ( ঘোষ ) | | | ... | ... | ... | ... | ল | ... | ... | ... |
| তাড়নজাত | অল্পপ্রাণ | | ... | ... | ... | ড় | ... | ... | ... | ... |
| | মহাপ্রাণ | | ... | ... | ... | ঢ় | ... | ... | ... | ... |
| উষ্মধ্বনি | অঘোষ | | ঃ (বিসর্গ) | ... | ... | ... | ... | ... | f (ফ) | ... |
| | ঘোষ | | হ | ... | ... | ... | ... | ... | v (ভ) | ... |
| | শিশ্‌ধ্বনি ( অঘোষ ) | | ... | ... | শ | [ষ] | স<br>জ = z (ঘোষ | ... | ... | ... |
| অর্ধস্বর ( ঘোষ ) | | | ... | ... | ( য় = y ) | ... | ... | ... | ... | অন্তঃস্থ ব<br>ব (ওয়) = w |

( **Breath Sounds, Hard Sounds** বা **'Tenues** ) ; তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ **ঘোষ-বর্ণ** ( **Voiced Sounds** ) বা **নাদ-বর্ণ** (**Soft Sounds** বা **Mediae**)

| অল্পপ্রাণ | মহাপ্রাণ | অল্পপ্রাণ | মহাপ্রাণ | নাসিক্য |
|---|---|---|---|---|
| [ ক্, চ্, ট্, ত্, প্, ] | [ খ্, ছ্, ঠ্, থ্, ফ্ ] | [ গ্, জ্, ড্, (ড়্), দ্, ব্ ] | [ ঘ্, ঝ্, ঢ্ (ঢ়্), ধ্, ভ্ ] | [ ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্ ] |

**স্বরত্রয়**
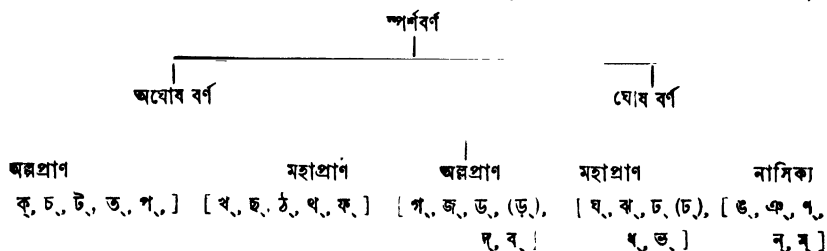
প্রাচীন সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষায় কণ্ঠস্বরের উচ্চ অথবা নিম্ন গতিকে অবলম্বন করিয়া এক প্রকার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য দেখা যাইত। উহা তিন প্রকার : যথা,—[১] **উদাত্ত স্বর** ( **High Pitch** বা **Rising Pitch** )—উহাই উচ্চ স্বর বা আরোহী সুর ; [২] **অনুদাত্ত স্বর** ( **Low Pitch** )—উহাই নিম্ন স্বর ; [৩] **স্বরিত স্বর** ( **Combined Rise and Fall**)—উহাই উচ্চ হইতে নিম্নগামী সুর বা অবরোহী স্বর। বাংলা ভাষায় কণ্ঠস্বরের এহেন উন্নয়ন বা অবনমন সাধারণতঃ একক শব্দ বা অক্ষরকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হয় না—কেবলমাত্র সমগ্র বাক্যেই উহার সার্থক ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।

## অনুশীলনী

[ এক ] নিম্নোদ্ধৃত বর্ণগুলির যে কোন চারিটির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কর :—এ, ং, ঃ, ঞ, ণ, শ, য-ফলা, ব-ফলা, ৺। **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৪৮**

[ দুই ] উচ্চারণ-স্থান নির্ণয় কর :—অ, আ, ঈ, ঋ, ঐ, ও, ঔ, ঙ, চ, জ্ঞ, ড, ড়, ন, ফ, ব, ভ, য, র, ল, হ, স, ক্ষ।

[ তিন ] উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা কর :—হসন্ত, লুপ্ত অ-কার : যৌগিক স্বরধ্বনি ; বিবৃত ধ্বনি : শ্বাস বর্ণ বা অঘোষবর্ণ ; শিশ্ ধ্বনি ; প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি ; অযোগবাহ ধ্বনি ; স্পর্শ বর্ণ ; কণ্ঠ-তালব্য বর্ণ ; দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ ; অন্তঃস্থ বর্ণ : উষ্ম বর্ণ। নাদ-বর্ণ বা ঘোষবর্ণ [ **বা. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫** ]। মহাপ্রাণ বর্ণ, অনুনাসিক বর্ণ ( **গৌ. বি. বি. এ. '৫১** )। অঘোষ, মহাপ্রাণ, দ্বি-স্বর, অর্ধস্বর, নাসিক্য, ঘৃষ্ট, সংবৃত [ **ক. বি. বি. এ. ( বিকল্প ) '৫০** ]। স্পৃষ্টধ্বনি [ **ক. বি বি. এ. ( বিকল্প ) '৫১** ]। পশ্চাৎ স্বরধ্বনি, মহাপ্রাণ, মৌলিক স্বরধ্বনি, উষ্মধ্বনি [ **ক. বি. বি. এ. ( বিকল্প ) '৫৮** ]। অঘোষ ব্যঞ্জন ; সংবৃত ( closed ) স্বর ; দ্বিস্বর ধ্বনি ( dipthong ) , উদাত্ত স্বর ; স্বরিত [ **ক. বি. বি. এ. ( বিকল্প ) '৫৯** ]।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## ধ্বনিপরিবর্তন : কতিপয় বিশিষ্ট রীতি

**স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Anaptyxis বা Vowel Insertion)**

সহজে উচ্চারণ করিবার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে ভাঙিয়া উহাদের ভিতরে স্বরধ্বনি সংক্রামিত করিলে **স্বরভক্তি** বা **বিপ্রকর্ষ** হয় : যেমন,—(ক) অ-কারের আগম—চক্র > চক্কর (চলিত ভাষায়); সূর্য > সূরজ; ফারসী শর্ম > সরম = শরম; ইংরাজি মট্‌ন্ (mutton) > মটন্। (খ) ই-কারের আগম—শ্রী > ছিরি; ইন্দ্র > ইন্দির (চলিত ভাষায়); ফারসী নির্খ্ > নিরিখ; ইংরাজি ফিল্ম্ (film) > ফিলিম। (গ) উ-কারের আগম—মুক্তা > মুকুতা; শুক্রবার—শুক্কুরবার (চলিত ভাষায়): ফারসী মুল্ক্ > মুলুক্, মুল্লুক্; তুর্কী কুফ্ল্ > কুলুপ্; ইংরাজি ফ্লুট্ (flute) > ফুলুট্। (ঘ) এ-কারের আগম—শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ; ফারসী সির্ফ > সেরেফ্, ইংরাজি গ্লাস্ (glass) > গেলাস্। (ঙ) ও-কারের আগম—শ্লোক > শোলোক; ফারসী মুর্গ্ > মোরোগ্, মোরগ্। (চ) ঋ-কার ব্যঞ্জনবর্ণের পরে আসিলে, সংযুক্ত বর্ণের মত উচ্চারিত হয় অর্থাৎ র-ফলা ও হ্রস্ব-ই যুক্ত হয়—তৃপ্ত > তিরপিত; সৃজিল > সিরজিল।

**সম্প্রকর্ষ**

তাড়াতাড়ি উচ্চারণের সময়ে পদের মধ্যস্থিত স্বরধ্বনির যে লোপের ব্যাপার ঘটে, তাহারই নাম **সম্প্রকর্ষ**। আসলে ইহা বিপ্রকর্ষেরই বিপরীত ঘটনা : যেমন,—(ক) অ-কারের অবলুপ্তি—বসতি > বস্তি। (খ) আ-কারের অবলুপ্তি—জানালা > জান্‌লা। (গ) ই-কারের অবলুপ্তি—ভগিনী > ভগ্নী।

**শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পরে স্বরধ্বনি যোজনা**

বাংলায় শব্দের শেষে দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে না। হয় দুইটিকে ভাঙিয়া স্বরভক্তি সংক্রামিত করিতে হয়, নয় উহাদের অন্তে একটি স্বরধ্বনি যুক্ত করিতে হয় : যেমন,—'সূর্য' এই শব্দটির মূল উচ্চারণ, যাহা হিন্দীতে সুপ্রচলিত, বাংলায় তাহা প্রচলিত নয় পক্ষান্তরে, বাংলায় স্বরভক্তির প্রভাবে ইহার উচ্চারণ হয় 'সুরজ'; অথবা ইহার উচ্চারণ হয় 'শুরজো'। বলা বাহুল্য, এই উচ্চারণটিতে শেষে একটি 'ও-কারের আগম' ঘটিয়াছে। এইরূপ ইংরাজি লিস্ট্ (list) > লিষ্টি; বেঞ্চ (bench) > বেঞ্চি

**স্বরসংগতি বা স্বরসৌষম্য (Vowel Harmony)**

সময়ে সময়ে সাধু ভাষায়—এবং চলিত ভাষায় তো বিশেষ করিয়া—পরবর্তী অথবা পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে, পদস্থিত অপর অক্ষরের স্বরধ্বনির উচ্চারণ-স্থান

বদলাইয়া গেলে যে উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য ঘটিয়া থাকে, তাহারই নাম **স্বরসংগতি** বা **স্বরসৌযম্য**।

**পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে স্বরসংগতি**—(ক) পরবর্তী অক্ষরে ই, উ, য-ফলা, জ্ঞ, ক্ষ থাকিলে পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ ও-কারবৎ হয়; তবে, এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বানান বদলায় না : যেমন,—অতি (=ওতি), অমুক (=ওমুক), পথ্য (=পোৎথ), দৈবজ্ঞ (=দোইবোগ্‌গঁ), লক্ষ (=লোক্‌খ্)। (খ) পরবর্তী অক্ষরে অ, আ, এ, ও থাকিলে পূর্ববর্তী অক্ষরের ই-কারের উচ্চারণ এ-কার হয়; এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বানানও বদলাইয়া যায় : যেমন,—মিশা>মেশা; মিশে>মেশে। (গ) পরবর্তী অক্ষরে অ, আ, এ, ও থাকিলে পূর্ববর্তী অক্ষরের উ-কার উচ্চারণ ও-কার হয়; এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বানানও বদলাইয়া যায় : যেমন,—শুনা>শোনা; শুনে>শোনে; শুনো>শোনো। (ঘ) পরবর্তী অক্ষরে অ, আ এ, ও থাকিলে পূর্ববর্তী অক্ষরের এ-কারের উচ্চারণ 'বাঁকা এ' অর্থাৎ 'অ্যা' হয়; এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাধারণ বানান লিখিত হয় না, তবে কোন কোন আধুনিক লেখক উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বানান লিখিয়া থাকেন : যেমন,—দেখা>দেখা (=দ্যাখা), দেখে>দেখে (=দ্যাখে), দেখো>দেখো (=দ্যাখো), দেখ>দেখ (=দ্যাখ)। (ঙ) পরবর্তী অক্ষরে ই, উ থাকিলে পূর্ববর্তী অক্ষরের ও-কারের উচ্চারণ উ-কার হয়; এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বানানও বদলাইয়া যায় : যেমন,—শোই>শুই; শোউক>শুউক>শু'ক; নোড়া>নুড়ী; আমোদিয়া>আমুদে; নিয়োগী>নেউগী; নেওগী। পরবর্তী য-ফলার অন্তর্নিহিত ই-কারের প্রভাবে, পূর্ববর্তী অক্ষরের ও-কারের উচ্চারণও উ-কার হয় : যেমন,—যোগ্য>যোগ্‌ইঅ>যুগ্যি (=জুগ্‌গি)। (চ) তিন বা ততোঽধিক অক্ষরের শব্দের শেষে যদি ই, ঈ থাকে তবে পদমধ্যবর্তী অ-কারের উচ্চারণটি উ-কারে পরিবর্তিত হয় : যেমন,—এখনি>এখুনি; উড়নী>উড়ুনি; নাটকিয়া>নাটুকে।

**পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে স্বরসংগতি**—(ক) শব্দের ভিতরে প্রথমেই যদি ই-কার থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী অক্ষরের আ-কার উচ্চারণটি এ-কারে পরিবর্তিত হয় : যেমন,—মিছা>মিছে; করিতাম>করিতেম, ক'রতেম; বিলাত>বিলেত। (খ) শব্দের ভিতরে, প্রথমেই যদি উ-কার বা ঊ-কার থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী অক্ষরের আ-কার উচ্চারণটি ও-কারে পরিবর্তিত হয় : যেমন,—পূজা>পূজো; শূয়ার>শূওর, শোর। (গ) তিন অক্ষরের শব্দে যদি দ্বিতীয় অক্ষরে অ-কার থাকে, তাহা হইলে চলিত ভাষায় এই অ-কার উচ্চারণটি সাধারণতঃ পূর্ণ ও-কার রূপে অথবা ঈষৎ ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়; এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য

অনুযায়ী বানান বদলায় না : যেমন,—গোবর [=গোবোর]; বোতল [=বোতোল]।

**অপিনিহিতি** ( **Epenthesis** )

শব্দের ভিতরে যদি ই বা উ থাকে, তাহা হইলে সেই ই বা উ-কে পূর্বেই উচ্চারণ করিয়া ফেলিলে, সেই উচ্চারণ-রীতির নাম **অপিনিহিতি**। য-ফলায় যে ই-ধ্বনি থাকে, তাহাও অপিনিহিতির ফলে প্রকট ই-কার রূপে দেখা দেয়। একদা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে অপিনিহিতি বিদ্যমান ছিল, এখন পূর্ববঙ্গেই ইহা চালু আছে, আর পশ্চিমবঙ্গে অপিনিহিতি অভিশ্রুতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ, মনে রাখিতে হইবে যে, অপিনিহিতি সাধু ভাষায় খাটে না: (ক) ই-কারের অপিনিহিতি—রাখিয়া>রাখ্+ইয়া>রাইখ্-ইয়া, রাইখ্যা (পুরাতন বাংলায় ও আধুনিক পূর্ববঙ্গে)>রেখ্যা, রেখো, রেখে (অভিশ্রুতিতে রূপান্তরিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত)। কালিয়া>কাল্+ইয়া>কাইলিয়া, কাইল্যা>কেলে। (খ) উ-কারের অপিনিহিতি—জলুয়া>জউলুয়া, জইলুয়া>জ'লো, জোলো। গাছুয়া> গাউছুয়া>গেছো। (গ) য-ফলার অন্তর্নিহিত ই-কারের অপিনিহিতি—সত্য [=শইত্ত], কাব্য [=কাইব্ব], কন্যা [=কইন্না]। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ-রীতিতে এই ধরণের অপিনিহিতি লক্ষ্য করা যায়। (ঘ) 'ক্ষ, জ্ঞ'—এই দুইটির উচ্চারণেও ই-কারের অপিনিহিতি পাওয়া যায় : যেমন,—লক্ষ>লখ্য [=লইক্‌খ]; যজ্ঞ>জগ্য [=জইগ্‌গ]

**অভিশ্রুতি** ( **Umlaut** বা **Vowel Mutation** )

ই এবং উ (বা উ হইতে জাত ই) অপিনিহিত হইলে, এই ই-ধ্বনি সাধারণ একাক্ষর শব্দে লোপ পাইয়া থাকে, কিন্তু একাধিক অক্ষরময় শব্দে পূর্ববর্তী স্বর-ধ্বনিকে প্রভাবান্বিত করিয়া এক রকমের আভ্যন্তর সন্ধির বলে পূর্বস্থিত স্বরবর্ণের নবরূপ ধারণ করাইয়া থাকে। এই স্বরধ্বনির পরিবর্তন তথা নবরূপ ধারণ করাইবারই নাম **অভিশ্রুতি** : যেমন,—(ক) অ+ই+অ=অ'(=ও)+ও :—বলিব>বইলব>ব'লব, ব'লবো [=বোলবো]; সত্য>সৎতিয় [শোত্তো] উচ্চারণে। (খ) অ+ই+আ বা এ=অ' (=ও)+এ :—করিয়া>কইর‍্যা>ক'রে [=কোরে]; ধরিলে>ধইরলে >ধ'রলে [=ধোরলে]; অভ্যাস>অবভিয়াস>ওবভেশ্ (উচ্চারণে)। (গ) আ+ই+অ বা ও=এ+ও :—রাখিহ>রাখিঅ>রাখিও>রাইখো>রেখো। (ঘ) আ+ই+আ=এ+এ :—রাখিয়া>রাইখ্যা>রেখে; আসিয়া>আইস্যা>এসে। (ঙ) অ, আ, ই, উ, এ অথবা ও+আই+আ=যথাক্রমে অ' (=ও), আ, ই, উ, ই, উ+ই+এ :—বলাইয়া>ব'লিয়ে [=বোলিয়ে]; নাচাইয়া>নাচিয়ে; ডিঙ্গাইয়া> ডিঙিয়ে; দেওয়াইয়া [=দেআইয়া]>দিইয়ে; শোয়াইয়া>শুইয়ে। (চ) অ+

আ+ই=অ'( =ও )+এ+ই :—করিয়াছি>ক'রেছি [ =কোরেছি ]; বসিয়াছিল >ব'সেছিল। ( ছ ) অ, আ, আই, ই, উ, এ, ও+অ+ইয়া=যথাক্রমে অ' ( =ও ), আ, এ, ই, উ, ই, উ+উ+এ : নগরিয়া>ন'গুরে, নগুরে' [ =নোগুরে ]; কান্দনিয়া >কাঁদুনে'; দেঅনিয়া>দিউনে'; কোন্দলিয়া>কুঁদুলে'। (জ) অ+উ+আ=অ'(=ও) +ও :—জলুয়া>জ'লো [ =জোলো ]; পটুয়া>প'টো [ =পোটো ]। ( ঝ ) আ+ উ+আ=এ+ও :—সাথুয়া>সাউথুআ>সাইথুআ>সেথো; মাছুয়া>মেছো।

**শ্রুতিধ্বনি (Euphonic Glides)**

শব্দ-মধ্যে পাশাপাশি দুইটি স্বরধ্বনি যদি থাকে এবং সেই দুইটি স্বর যদি একটি যৌগিক স্বরে বা সন্ধ্যক্ষরে রূপান্তরিত না হয় তাহা হইলে সেই স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনের অভাবজনিত ফাঁকটুকুতে (hiatus) উচ্চারণের সুবিধার জন্য অন্তঃস্থ য় (y), অন্তঃস্থ ব (=w, ওয়, ও) বা 'দ' ধ্বনির আবির্ভাব ঘটে। শ্রুতিমাধুর্যের জন্য এই যে অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনির আবির্ভাব, ইহাকেই বলা হয় **শ্রুতিধ্বনি** : ( ক ) **য়-শ্রুতির** উদাহরণ :—মা+আমার>মা+য়+আমার>মায়ামার ; মা+এর>মা+য়+এর> মায়ের ; কে+এলো>কে+য়+এলো>কেয়েলো। ( খ ) **ব-শ্রুতির** উদাহরণ :— খা+আ>খাওয়া, মো+আ>মোয়া; না+ওয়া>নাওয়া। **মন্তব্য** : এই উদাহরণগুলিতে ইহাই লক্ষ্য করা যায় যে, য়-শ্রুতি 'য়' বর্ণ দ্বারা বুঝানো হয়; কিন্তু ব-শ্রুতির বেলায় 'ওয়, ও, য়'—এই তিনটিরই ব্যবহার আছে। আবার য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতির অদল-বদলও দেখা যায় : যেমন,—দেয়াল>দেয়াল ( য়-শ্রুতিতে ), দেওয়াল (ব-শ্রুতিতে ); ছায়া>ছায়া (য়-শ্রুতিতে ), ছাওয়া ( ব শ্রুতিতে ) ( গ ) **দ-শ্রুতির** উদাহরণ : বৈদিক সংস্কৃত সু+নর>সুন্দর ; বা+নর>বান্দর>বাঁদর।

**মধ্যবর্তী র-কার ও হ-কারের লোপ-প্রবণতা ( Tendency to drop internal r and h )**

শব্দ-মধ্যে অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের আগে যে র-কার ( রেফ্ ) থাকে, চলিত বাংলার উচ্চারণ-ক্ষেত্রে অনেক সময়েই লোপ পায়। ঠিক এমনি ভাবে দুই স্বরের মধ্যবর্তী হ-কার সহজেই লুপ্ত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, অন্ত্য হ-কার তো সহজেই লোপ-প্রবণ বর্ণ। অনেক সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বিদেশী শব্দ এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের ফলে বাংলায় নব রূপ লাভ করিয়াছে : ( ১ ) **র-এর লোপ**—করিতে>ক'রতে>ক'ত্তে (কোত্তে ); মারিল>মা'রল>মাল্ল ; গৃহিণী>গিরহিণী>গিন্নী ; ফারসী শীরীনী> শিরণী>শিন্নী। ( ২ ) **হ এর লোপ**—ফলাহার>*ফলাআর>ফলার ; পুরোহিত >*পুরুইত>পুরুত ; মহোৎসব>মোচ্ছব ; নাহিব>নাইব ; বাহির>বার।

**অপশ্রুতি** ( Ablaut)

সংস্কৃত ধাতু হইতে শব্দগঠন করিবার সময়ে ধাতুর স্বরধ্বনিতে যে পরিবর্তনগুলি ঘটে, তাহারা গুণ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ নামে সংস্কৃত ব্যাকরণে পরিচিত। এই তিন প্রকারের পরিবর্তনকে সমবেতভাবে বাংলা ব্যাকরণে বলা হয় **অপশ্রুতি**ঃ যেমন,— 'বচ্' ধাতু হইতে 'বচন' ( গুণের দৃষ্টান্ত ), 'বাচ্' ( বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত ) 'উক্ত' ( সম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত ); 'বস্' ধাতু হইতে 'বসতি' ( গুণের দৃষ্টান্ত ), 'বাসী' ( বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত ) 'উষিত' ( সম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত )। সংস্কৃত এবং পরে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া খাঁটি বাংলা ভাষাও উত্তরাধিকার-সূত্রে অপশ্রুতি পাইয়াছে : যেমন,—মিল > মেলা ( গুণের দৃষ্টান্ত ) পড়ে > পাড়ে ( বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত ) ; দ্বার > দুয়ার ( সম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত )।

**সমীকরণ, সমীভবন** বা **সমবর্ণতা** ( Assimilation )

শব্দের ভিতরে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি আলাদা ধ্বনির একটি অপরটির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কমবেশী স্বারূপ্য বা স্বগোত্রতা পাইলে **সমীকরণ, সমীভবন** বা **সমবর্ণতা** হয় : যেমন,—জন্ম > জম্ম ; গল্প > গপ্প ; চন্দন > চন্নন ; পাঁচ্‌সের > পাঁস্‌সের।

সমীভবন তিন রকমের : যেমন—( ১ ) **প্রগত** বা **পুরোবর্ত সমীভবন** ( Progressive Assimilation ) : ইহাতে পূর্বের ধ্বনি পরের ধ্বনিকে বদলাইয়া দেয় : অন্ত > অন্ন। ( ২ ) **পরাগত** বা **প্রত্যাবর্ত সমীভবন** ( Regressive Assimilation ) : ইহাতে পরের ধ্বনি পূর্বের ধ্বনিকে বদলাইয়া দেয় : তৎ + জন্য > তজ্জন্য। ( ৩ ) **অন্যোন্য সমীভবন** ( Mutual Assimilation ) : ইহাতে পরস্পরের প্রভাবে উভয় ধ্বনিই বদলাইয়া যায় : উৎ + শ্বাস > উচ্ছ্বাস।

**অসমীকরণ, বিষমীভবন** বা **বিষমবর্ণতা** ( Dissimilation )

শব্দের ভিতরে দুইটি সমধ্বনির একটির পরিবর্তন ঘটিলে **অসমীকরণ, বিষমীভবন** বা **বিষমবর্ণতা** হয় : যেমন,—শরীর > শরীল ; লাল > নাল ( গ্রাম্য উচ্চারণে ) ; তরবার > তলোয়ার ; চলচল > চঞ্চল ; পোর্তুগীস আর্মারিও > বাং আল্‌মারি।

**স্বরাগম বা স্বরের পূর্বাগম** ( Prothesis )

শব্দের আদিতে অবস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের আগে স্বরধ্বনির আবির্ভাব ঘটিলে **স্বরাগম** বলা হয় : যেমন,—স্ত্রী > ইত্থি ( পালিতে ) ; ইস্তিরি ( বাংলায় ) ; স্পিরিট > ইস্পিরিট ; স্টেব্‌ল্ > আস্তাবল, স্টেশন > ইস্টিশন ; স্কুল > ইস্কুল ; ঘোর > অঘোর।

**বর্ণাগম**

শব্দের গোড়ায়, মধ্যে বা শেষে, নূতন স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের আবির্ভাব ঘটিলে **বর্ণাগম** বলা হয় : যেমন স্পর্ধা > আস্পর্ধা ; অম্ল > অম্বল ; নস্য > নস্যি। প্রথম উদাহরণে স্বরাগম, দ্বিতীয় উদাহরণে বিপ্রকর্ষ, তৃতীয় উদাহরণটিও বিপ্রকর্ষজাত।

**স্বরলোপ** ( **Aphesis : Syncope : Apocope** )

উচ্চারণকালে শব্দের অন্তর্গত কোন বর্ণের উপরে পক্ষপাতহেতু বিশেষ জোর দেওয়া হইলে অপর কোন ব্যঞ্জনধ্বনি অনাদৃত হয়—ফলে ঐ ব্যঞ্জনবর্ণের স্বরধ্বনি অবলুপ্ত হয়। ইহাকেই বলা হয় **স্বরধ্বনি লোপ** অর্থাৎ **স্বরলোপ**। ইহা তিন রকমে হইয়া থাকে। (১) প্রথম স্বরবর্ণ লুপ্ত হইলে **আদি স্বরলোপ (Aphesis)** হয় : যেমন,—অলাবু্>লাউ ; অপিধান>পিধান ; উধার>ধার ; উড়ুম্বর>ডুমুর। (২) মধ্যবর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হইলে **মধ্য স্বরলোপ** ( **Syncope** ) হয়। মূলতঃ, ইহাকেই ইতিপূর্বে **সম্প্রকর্ষ** বলা হইয়াছে। সম্প্রকর্ষের উদাহরণ দ্রষ্টব্য। (৩) শেষের স্বরবর্ণ লুপ্ত হইলে **অন্ত্য স্বরলোপ** ( **Apocope** ) হয় ; যেমন,—কাল>কাল্ ; ভাত>ভাৎ ( ভাত্ )।

**অন্তর্হতি**

শব্দের মধ্যবর্তী কোন বর্ণ যদি লুপ্ত হয় অর্থাৎ মাঝখান হইতে যদি কেবলমাত্র ব্যঞ্জনধ্বনি অথবা স্বরবর্ণযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হয়, তাহা হইলে যে ঘটনাটি ঘটে, তাহাকে বলা হয় **অন্তর্হতি** : যেমন,—আলাহিদা>আলাদা ; ফাল্গুন>ফাগুন ; ফলাহার>ফলার ; ছোট দিদি>ছোট্দি, ছোড়্দি।

**বর্ণবিপর্যয়** বা **বর্ণব্যত্যয়** ( **Metathesis** )

শব্দের মধ্যবর্তী স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের স্থান-পরিবর্তন ঘটিলে **বর্ণবিপর্যয়** বা **বর্ণব্যত্যয়** বলা হয় : যেমন,—মুকুট>মুটুক ; ঢেঁকশাল>ঢেঁশকাল ; বাক্স>বাস্ক ; পিশাচ>পিচাশ ; বারাণসী>বানারসী ; রিক্সা>রিস্কা ; আলনা>আনলা।

**বর্ণবিকৃতি** ( **Voicing** )

শব্দের অন্তর্গত স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ নূতন রূপ ধরিলে **বর্ণবিকৃতি** বলা হয় : যেমন,—বাষ্প>ভাপ ; ধাই>দাই ; কবাট>কপাট ; শাক>শাগ ; ধোবা>ধোপা।

**বর্ণদ্বিত্ব ( Doubling or Lengthening of Consonant Sounds )**

জোরের সহিত বলিবার জন্য কখনও কখনও শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করা হইলে **বর্ণদ্বিত্ব** হয় : যেমন,—ছোট>ছোট্ট ; পাকা>পাক্কা ; একরতি>একরত্তি।

**অদ্বিকোক্তি, সমাক্ষর লোপ** বা **বর্ণচ্যুতি ( Haplology )**

শব্দের অন্তর্গত পাশাপাশি অবস্থিত সমধর্মাবলম্বী দুইটি বর্ণের একটির লোপ হইলে **অদ্বিকোক্তি** বলা হয় : যেমন,—দাদা>দা ; সব্যব্যস্ত>সাব্যস্ত ; ভাইশ্বশুর>ভাশুর ; দিদি>বৌদি ; মুখকোষ>মুখোষ ; লৌকিকতা>লৌকতা।

**( Aspiration )**

অল্পপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ বর্ণরূপে উচ্চারিত হইলে **পীনায়ন** হয় : যেমন, কাঁটাল> ; পুকুর>পুখুর।

**ক্ষীণায়ন ( De-aspiration )**

মহাপ্রাণ বর্ণ অল্পপ্রাণ বর্ণরূপে উচ্চারিত হইলে **ক্ষীণায়ন** হয় ঃ যেমন,—হাথ> হাত ; পালখ>পালক ; ধাত্রী>ধাই>দাই ।

**নাসিক্যীভবন ( Nasalisation )**

ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্—এই নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি যদি লুপ্ত হইয়া পূর্ববর্তী বর্ণের স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক করিয়া তোলে, তাহা হইলে এই ক্রিয়াটিকে বলা হয় **নাসিক্যীভবন** ঃ যেমন,—সন্ধ্যা>সাঁঝ; চন্দ্র>চাঁদ ; গঙ্গা>গাঙ্। অবশ্য সময়ে সময়ে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির সংযোগ ব্যতিরেকেই স্বরধ্বনি আপনা হইতেই অনুনাসিক হইয়া পড়ে ; যেমন,—পুথি>পুঁথি ; ছুচ> ছুঁচ ; হাসি>হাঁসি ; কানা>কাঁনা ।

**মূর্ধন্যীভবন ( Cerebralisation )**

যদি কোন ব্যঞ্জনধ্বনির সাহায্যে অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্য বর্ণে পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে এই ক্রিয়াটিকে বলা হয় **মূর্ধন্যীভবন** ঃ যেমন,—মৃত> মড়া ; বৃদ্ধ>বাড় ; পততি>পড়ে ; মৃত্তিকা>মাটি ।

**সকারীভবন ( Assibilization )**

যদি স্পর্শবর্ণ স শ বা জ-এর মত উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে এই ক্রিয়াটিকে বলা হয় **সকারীভবন** ঃ যেমন,—গাছতলা>গাস্‌তলা ।

**উষ্মীভবন ( Spirantization )**

যদি স্পর্শবর্ণ উষ্মধ্বনির মত উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে এই ক্রিয়াটিকে বলা হয় **উষ্মীভবন** ঃ যেমন,—কাগজ>কাগজ্ (=z) ; মেজদা>মেজ্ (=z) দা। জ-এর ধ্বনিটি হয় ঠিক ইংরাজি "z"-এর ন্যায় ।

**সাদৃশ্য ( Analogy )**

যদি একটি শব্দের সদৃশ হইয়া এবং মানে হয় এমন ভাবেই অপর কোন শব্দ ধ্বনি-পরিবর্তনের সাহায্যে গঠিত হয়, তাহা হইলে এই ক্রিয়াটিকে বলা হয় **শব্দ-সাদৃশ্য** বা **সাদৃশ্য**। মনে রাখিতে হইবে, সাদৃশ্যের মধ্যে অনুসরণ-ক্রিয়াই প্রবল ঃ যেমন,—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত 'পাখি—পাখালি' শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্যে গঠিত হইয়াছে 'গাছ—গাছালি' শব্দ । 'ধোপানী' শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্যে 'মাস্টারনী', নাটিকা' শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্যে 'কবিতিকা', ফরাসী 'নাবালিগ্' শব্দ হইতে উদ্ভূত 'নাবালক' শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্যে 'সাবালক', আরবী শব্দ 'ওকালৎ'-এর প্রসারে বাংলা 'ওকালতি' শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্যে ইংরাজি শব্দ 'জজ্' হইতে 'জজিয়ৎ'-এর প্রসারে বাংলা 'জজিয়তি', 'বক্তব্য' শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্যে 'কহতব্য' শব্দ প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে।

**মিশ্রণ ( Contamination )**

শব্দের সাদৃশ্যে সৃষ্টি হইবার কথা থাকিলেও যদি কোন নবজাত শব্দ অপর কোন শব্দের ধ্বনিধারাকে অনুকরণ করিয়া উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে এই ক্রিয়াটিকে বলা হয় **মিশ্রণ** : যেমন,—পোর্তুগীজ ভাষার 'Ananas' শব্দটি বাংলা 'রস' শব্দের ধ্বনিধারা অনুসরণ করিয়া 'আনারস' হইয়াছে। সংস্কৃত 'সর্ব' শব্দটি ধ্বনিপরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বাংলায় 'সাব' না হইয়া 'সভা' শব্দের সাদৃশ্যপ্রভাবে 'সব' হইয়াছে। পোর্তুগীজ 'পাউ' ও হিন্দুস্থানী 'রুটি'—সমার্থক শব্দ ; কিন্তু উভয়ের মিশ্রণে বাংলা ভাষায় 'পাউরুটি' শব্দটি হইয়াছে। ঠিক এইরূপ Hospital > হাঁসপাতাল ; Arm-chair > আরাম-চেয়ার > আরাম-কেদারা।

**জোড়কলম ( Portmanteau )**

ইহাও একরূপ মিশ্রণই। দুইটি বিভিন্ন শব্দের মিলনে একটি নূতন শব্দ গঠিত হয় এবং এই মিলনে দুইটি শব্দেরই ছিন্নাংশ থাকিয়া যায় বলিয়া এই জাতীয় নবসৃষ্ট শব্দকে বলা হয় **জোড়কলম শব্দ** : যেমন,—আরবী মিন্নৎ+সংস্কৃত বিজ্ঞপ্তি (>প্রাঃ বিণ্ণত্তি >বাং বিনতি ) হইতে 'মিনতি' এই জোড়কলম শব্দটি গঠিত হইয়াছে।

**লোক-ব্যুৎপত্তি ( Folk-etymology )**

নূতন শব্দগঠনের সময়ে ধ্বনিসাম্য রক্ষা করিতে গিয়াও সময়ে সময়ে লোকেরা এক অভিনব অশ্রুতপূর্ব শব্দ গঠন করিয়া বসে। সাধারণ লোকের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির আওতায় পড়িয়া একটা ব্যাপক লোক-ব্যবহারে যে শব্দগুলির সৃষ্টি হয়, তাহাদিগকে বলা হয় **লোক-ব্যুৎপত্তি** : যেমন,—English > ইংরাজ ; 'রাজা' শব্দটি সাধারণ লোকের বড়ই প্রিয় আবার ইংলিশ জাতি বাংলা তথা ভারতের 'রাজা' ছিল বলিয়া ধ্বনিসামঞ্জস্য পরিহার করিয়া 'ইংলিশ' হইয়াছে 'ইংরাজ'। Tobacco > তাম্রকূট > তামাক। সেই কোন্ অতীতকালে Tobacco যখন এদেশে আসে, তখন তাহার রং ছিল ঈষৎ তামাটে আর ঐ পদার্থটি সাধারণ লোকের কাছে ছিল 'কূট' অর্থাৎ বিষতুল্য। তাই সাধারণ লোকে Tobaccoকে 'তাম্রকূট' বলিত। লোকব্যবহারে 'তাম্রকূট' এখন 'তামাকে' পরিণত হইয়াছে। Martaban দেশের কদলী লোকব্যবহারে নাম পাইয়াছে 'মর্তমান'। Batavia দেশ হইতে আনীত লেবু লোকব্যবহারে নাম পায় 'বাতাবিয়া'—উহাই এক্ষণে 'বাতাবী'রূপে আমাদের রসনাকে পরিতৃপ্ত করে।

**শীৎকার বা কাকুধ্বনি ( Click )**

হর্ষ, বিস্ময়, শোক প্রভৃতি আকস্মিক ভাবপ্রকাশের কালে, কিংবা মেঘের গর্জন, তবলার বোল্, পাখির ডাক, বৃষ্টিপতনের শব্দ প্রভৃতি বুঝাইতে হইলে বর্ণমালার সাহায্যে

নয়—ধ্বনির সাহায্যে রূপদান করিতে হয়। মুখবিবরে বাতাস টানিয়া জিহ্বাকে নানা কায়দায় আলোড়িত করিয়া এই সমস্ত ধ্বনি উচ্চারিত হইলে এই ক্রিয়াকে বলা হয় **কাকুধ্বনি** বা **শীৎকার:** যেমন,—ইস্, উস্,; ধা ধিন্ ধিন ধা; পিউ পিউ; ঝম্ ঝম্। পোষা বিড়ালকে আদর করিবার বা গোরু তাড়াইবার সময়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাহারও নাম 'কাকুধ্বনি'।

## অনুশীলনী

[ এক ] ধ্বনিপরিবর্তনের সাধারণ নিয়মগুলির পরিচয় উদাহরণ-সহ লিখ।
**রা. বি. বি. এ. ( বিকল্প ) '৫৭**

[ দুই ] দৃষ্টান্ত-সহযোগে ব্যাখ্যা কর :—অভিশ্রুতি [ **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৭** ]। সমীভবন, বিপ্রকর্ষ, স্বরাঘাত, স্বরলোপ [ **ক. বি. বি. এ. ( বিকল্প ) '৫১** ] অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, য়-শ্রুতি [ **ক. বি. বি. এ. ( বিকল্প ) '৫০** ]। স্বরসংগতি, অপিনিহিতি [ **রা. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬** ]। অভিশ্রুতি, বর্ণবিপর্যয়, য়-শ্রুতি, অপশ্রুতি [ **রা. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫** ]। অপশ্রুতি, অভিশ্রুতি ( **গৌ. বি. বি. এ. '৫১** )। বিপ্রকর্ষ ( **ক. বি. বি. এ. '৫১** )। অপিনিহিতি, স্বরসংগতি ( **উ. বি. বি. এ. '৫৫** )। সমীভবন, সাদৃশ্য, লোক-ব্যুৎপত্তি, অপশ্রুতি, মিশ্রণ [**ক. বি. বি.এ. (বিকল্প) '৫৮**]। শ্রুতিধ্বনি, স্বরাগম, সাদৃশ্য [**ক. বি. বি. এ. বিকল্প) '৫৯** ]।

[ তিন ] ব্যাকরণে 'আগম' কাহাকে বালে? পূর্বাগম, মধ্যাগম ও অন্ত্যাগমের উদাহরণ দাও। অপিনিহিতি (Epenthesis) কি প্রকারের আগম? উদাহরণ-সহ বুঝাইয়া দাও। **ক. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫৬**

[ চার ] ব্যাকরণে 'আগম' কাহাকে বলে? পূর্বাগম, মধ্যাগম ও অন্ত্যাগমের উদাহরণ দাও। অপিনিহিতি (Epenthesis) কাহাকে বলে? তিনটি উদাহরণ দাও। স্বরসংগতি (Vowel harmony) কাহাকে বলে? ঊর্ধ্বস্বর নিম্নাকৃষ্ট এবং নিম্নস্বর ঊর্ধ্বাকৃষ্ট হইয়াছে এমন উদাহরণ দাও। **ক. বি. বি. এ. ( বিকল্প) '৫৭**

[ পাচ ] নিম্নলিখিত বিধিগুলি উদাহরণ-সহযোগে ব্যাখ্যা কর :—শব্দমধ্যবর্তী র-কার ও হ-কারের লোপপ্রবণতা; শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পর স্বরধ্বনি যোজনা; অসমীকরণ; বর্ণাগম; শ্রুতিধ্বনি, বর্ণবিকৃতি; স্বরলোপ; বর্ণদ্বিত্ব; অদ্বিরুক্তি; স্বরাগম; পুরোবর্ত সমীকরণ; প্রত্যাবর্ত সমীকরণ; অন্যোন্য সমীকরণ; পীনায়ন; ক্ষীণায়ন; নাসিক্যীভবন; মূর্ধন্যীভবন; সকারীভবন; উষ্মীভবন; জোড়কলম; শীৎকার।

# তৃতীয় অধ্যায়

## ধ্বনিপরিবর্তন : মূর্ধন্যীকরণ

### ণত্ববিধি

**কোথায় কোথায় মূর্ধন্য ণ হয়?**

(ক) ট্ ঠ্ ড্ ঢ্-এর আগে মূর্ধন্য ণ হয়: যেমন,—কণ্টক, কুণ্ঠা, দণ্ড, ঢুণ্ঢি। (খ) ঋ র্ ষ্-এর পর মূর্ধন্য ণ হয়: যেমন,—ঋণ, কর্ণ, বিষ্ণু। (গ) একই পদের মধ্যে প্রথমে ঋ র ষ্ ও পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, য্ ব্ হ অথবা অনুস্বারের ব্যবধান আর ইহার পরে দন্ত্য ন থাকিলে সেই দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়: যেমন,—স্রক্কণী, দর্পণ, পাষাণ, শ্রবণ,, রেণু, বৃংহণ। (ঘ) প্র, পরা, পরি, নির্—এই চারিটি উপসর্গের পর প্রায়ই মূর্ধন্য ণ হয়: যেমন,—প্রণাম, প্রণাশ, প্রণোদিত, পরায়ণ, পরিণীত, নির্ণয়। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও আছে: যেমন,—প্রনষ্ট, পরান্ন, পরিনির্বাণ। (ঙ) সমাস হইলেও কয়েকটি পদের দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়: যেমন,—অগ্রণী, উত্তরায়ণ, গ্রামণী, পূর্বাহ্ণ, রামায়ণ, শূর্পণখা। (চ) কয়েকটি শব্দে স্বভাবতঃই মূর্ধন্য ণ হয়: যেমন,—অণু, আপণ, কঙ্কণ, কণা, কণিকা, কল্যাণ, কোণ, গণ্য, গুণ, গৌণ, ঘুণ, চিক্কণ, তূণ, নিপুণ, পণ, পণ্য, পাণি, পুণ্য, বণিক, বাণ, বাণিজ্য, বাণী, বিপণি, বীণা, বেণী, বেণু, ফণা, ফণী, লবণ, লাবণ্য, শণ, শোণ, শোণিত, স্থাণু।

**কোথায় কোথায় দন্ত্য ন হয়?**

(ক) ত বর্গযুক্ত দন্ত্য ন অপরিবর্তিত থাকে: যেমন,—বৃন্ত, গ্রন্থ, মন্দির, রন্ধন, নিরন্ন। (খ) পদেব অন্তস্থিত দন্ত্য ন অপরিবর্তিত থাকে: যেমন,—শ্রীমান, ধর্মচারিন্। (গ) সমাস হইলে দ্বিতীয় পদের দন্ত্য ন অপরিবর্তিত থাকে: যেমন— দুর্নাম, বরানুগমন, দুর্নিমিত্ত, দুর্নীতি। (ঘ) বাংলা ক্রিয়ার দন্ত্য ন অপরিবর্তিত থাকে: যেমন,—ধরেন, করেন, ধারেন। (ঙ) অসংস্কৃত শব্দে দন্ত্য ন থাকিবে: যেমন,—বামুন, সোনা, কোরান, করোনার, কর্নওয়ালিশ, গভর্নমেণ্ট। 'রাণী' শব্দ বিকল্পে 'রানী'ও হয়। কিন্তু অসংস্কৃত শব্দে যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ চলিবে: যেমন,— ঘুণ্টি, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা।

## ষত্ববিধি

(ক) ঋ বা ঋ-কারের পর মূর্ধন্য ষ হয়: যেমন,—ঋষি, বৃষ, কৃষ্ণ। (খ) অ আ-ভিন্ন স্বরবর্ণ ক র-এর পর প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়: যেমন,—জিগীষা, শ্রীচরণেষু, কল্যাণীয়েষু। কিন্তু-সাৎ প্রত্যয়ের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়: যেমন,—অগ্নিসাৎ, ভূমিসাৎ। (গ) অতি, অধি, অনু, অপি, অভি, নি, পরি, প্রতি, বি, সু—এই উপসর্গগুলির পরে কতিপয় ধাতুর দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়: যেমন,—অধিষ্ঠান, অনুষঙ্গ, অভিষেক, পরিষদ, প্রতিষেধ, বিষণ্ণ, সুষুপ্ত। (ঘ) দুইটি পদ সমাসবদ্ধ হইয়া একটি শব্দে পরিণত হইলে, পূর্বপদের শেষে ই, উ, ঋ, ও থাকিলে পরপদের আদ্য দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়: যেমন,—যুধিষ্ঠির, সুষম, পিতৃষ্বসা, গোষ্ঠ, বিষময়। (ঙ) কয়েকটি শব্দ স্বভাবতঃই মূর্ধন্য ষ হয়; যেমন,—অমর্ষ, আষাঢ়, ঈষৎ, ঊষা, ওষধি, ঔষধি, কর্ষণ, কৃষি, কোষ, ঘর্ষণ, তুষার, দূষণ, দোষ, পরুষ, পাষাণ, পুরুষ, পুষ্টি, পুষ্প, পৌষ, প্রদোষ, বর্ষণ, বর্ষা, বিষাণ, বিশেষ, বিশেষণ, বিশেষ্য, ভাষা, ভীষ্ম, ভূষা, মহিষ, মূষিক, মেষ, শোষ, শ্লেষ, শ্লেষ্মা, ষট্, ষোড়শ, সর্ষপ, হর্ষ।

### শ ষ স সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

(ক) মূল সংস্কৃত শব্দানুসারে তদ্ভব শব্দে শ ষ বা স হইবে: যেমন,—অংশু > আঁশ; আমিষ > আঁষ, সর্ষপ > সরিষা। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও আছে: যেমন, —শ্রদ্ধা > সাধ; মনুষ্য > মিন্‌সে। (খ) দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে: যেমন,—ফরসা, ফরশা; উসখুস, উশখুস; করিস। (গ) বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে s-এর স্থানে স, sh-এর স্থানে শ হইবে: যেমন,— আসমান, কনেস্টবল, ক্লাস, চশমা, ডিশ, বদমাশ, লশকর, শখ, শরবৎ, শহর, শহীদ, শাগরেদ, শার্ট, শুরু, শেমিজ, সাদা, সালিস, সুপারিশ, সুটকেশ, স্টিমার স্টেশন, হামেশা, হিস্টিরিয়া, হুঁশ, হুসিয়ার, হুঁসিয়ার। তবে কতকগুলি শব্দে প্রচলিত বানান বজায় থাকিবে: যেমন,—গোমস্তা, ইস্তাহার, ভিস্তি, খ্রীষ্ট।

## অনুশীলনী

[এক] ণত্ব ও ষত্ব-বিধির প্রধান প্রধান সূত্র উদাহরণ-সহ নির্দেশ কর।

**ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫০**

[দুই] কারণ নির্দেশ করিয়া নিম্নলিখিত শব্দগুলির শুদ্ধি সাধন কর:—ঋসি, দর্পন, উত্তরায়ন, কর্ন, কর্ণওয়ালিস, রেনু, প্রনোদিত, পুন্য, শূর্পনখা, ধর্মচারিণ, দুর্ণাম, ধরেণ, সোণা, শ্রীচরণেসু, কল্যাণীয়াষু, অণুসঙ্গ, সুসম, বিসেশ, সোশ, সরিসা, ফরষা, আশমান, ক্লাশ, ডিস, শুটকেশ, ষ্টিমার, পরিণির্বান, গ্রামনী, অগ্নিষাৎ, মিন্‌ষে, খ্রীস্ট

# দ্বিতীয় পর্ব—শব্দ-প্রকরণ

## প্রথম অধ্যায়

### শব্দপরিচয়

**ধ্বনি ভাষা শব্দ ও পদের সংজ্ঞা**

মানুষের মন গতিশীল। তাই তাহার মনে যে কোন ভাবের উৎপত্তি হইবামাত্র, তাহা তাহার কণ্ঠ, নাসিকা ও মুখের ভিতর অবস্থিত জিহ্বা ইত্যাদি বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত সাংকেতিক **ধ্বনির** মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। কণ্ঠ হইতে উদ্‌গীর্ণ অর্থবান এই ধ্বনিসমষ্টিই **ভাষা**। একটি ধ্বনি অথবা একাধিক ধ্বনিসমষ্টি যখন কোন বস্তু বিষয় বা ভাবকে ব্যক্ত করে, তখন সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির লিখিত রূপকে বলা হয় **শব্দ**। বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলা হয় **পদ**। দৃষ্টান্ত—'ছাত্ররা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে'। বিশ্লেষণ করিয়া আমরা পাই—

'ছাত্র' শব্দ+'-রা' বিভক্তি='ছাত্ররা' পদ।
'শিক্ষক' শব্দ +'-কে' বিভক্তি='শিক্ষককে' পদ।
'শ্রদ্ধা' শব্দ+'শূন্য' বিভক্তি (অর্থাৎ বিভক্তি হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে কিছু নজরে পড়ে না)='শ্রদ্ধা' পদ।
'কর্' ধাতু+'-এ' বিভক্তি='করে' পদ।

বলা বাহুল্য, 'ছাত্র' **শব্দে** আমরা পাই ছ্+আ+ত্+র্+অ **ধ্বনিসমষ্টি**। এই ধ্বনিসমষ্টিতে ছ্, ত্, র্—এই তিনটি **ব্যঞ্জনধ্বনি** এবং আ, অ—এই দুইটি **স্বরধ্বনি** আছে। সর্বসমেত এই পাঁচটি ধ্বনির সমষ্টি লইয়াই তো 'ছাত্র' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

**বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার**

আমাদের এই বাংলা দেশে বাঙালী জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত শব্দাদি লইয়া **বঙ্গভাষা** তথা **বাংলা ভাষা** গঠিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দসমূহের শ্রেণীবিভাগ হয় উৎপত্তির দিক দিয়া, নয় গঠনের দিক দিয়া, নয় অর্থের দিক দিয়া, নয় প্রত্যয়-বিভক্তিযোগের দিক দিয়া নানা রকমে করা যাইতে পারে। বিভিন্ন ছকের সাহায্যে শব্দের শ্রেণীবিভাগের নানাবিধ পদ্ধতি পরবর্তী পৃষ্ঠাদিতে ব্যাখ্যাত হইল—

# শব্দের শ্রেণীবিভাগের নানাবিধ পদ্ধতি

## (১) ভাষাতত্ত্বমূলক পদ্ধতিতে বিভাগ
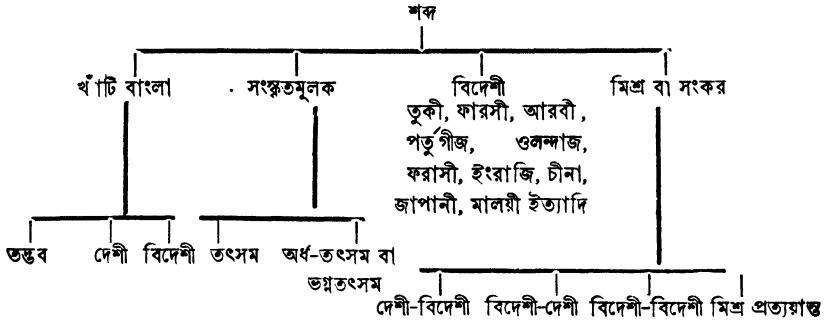
ভাষাতত্ত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বাংলা শব্দের শ্রেণীবিভাগ করিবার কালে আমরা চার জাতের বাংলা শব্দ পাই ঃ যেমন,—( ক ) খাঁটি বাংলা শব্দ ; ( খ ) সংস্কৃতমূলক শব্দ ; ( গ ) বিদেশী তথা বিদেশ হইতে আমদানীকৃত শব্দ ; ( ঘ ) মিশ্র বা সংকর শব্দ।

খাঁটি বাংলা শব্দের তিনটি বিভাগ—তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী। **তদ্ভব**—অর্থাৎ 'তৎ' বা 'তাহা হইতে' মানে 'মূল আর্যভাষা হইতে ভব অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার'। প্রাচীন আর্য ভাষা হইতে উৎপন্ন শব্দই **তদ্ভব শব্দ**। সংস্কৃতই এই মূল আর্যভাষার প্রকৃষ্ট রূপ। প্রাচীন আর্যভাষা ভাষা-প্রাকৃতের মধ্য দিয়া পরিবর্তিত বা বিকৃত হইয়া বাংলায় আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। এই ভাবেই তদ্ভব শব্দের উদ্ভব বা আগমন ঘটিয়াছে। প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত বলিয়া শব্দের অপর এক নাম **প্রাকৃতজ শব্দ**। পরিবর্তন বা বিকৃতির মধ্য দিয়া তদ্ভব শব্দের উৎপত্তির নমুনা এইরূপ ঃ—সং অদ্য > প্রাঃ অজ্জ > বাং আজ ; সং কর্ণ > প্রাঃ কণ্ণ > বাং কান ; সং কাষ্ঠ > প্রাঃ কট্ঠ > বাং কাঠ। প্রাকৃত ভাষায় অনেক অনার্য শব্দ ও অজ্ঞাতমূল শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল—উহারাই **দেশী শব্দ** ঃ যেমন,—'চঙ্গ' হইতে প্রাদেশিক বাংলায় 'চাঙ্গা' বা 'চাঙা' ; 'ঢুণ্ট' হইতে বাংলায় 'ঢুঁড়' ইত্যাদি। 'চাউল, তেঁতুল, লাঠি, ঢেঁকি, ডাগর, বাদুড়, কুকুর, গাড়ী, ঘোড়া' প্রভৃতি দেশী শব্দ। অবশ্য ইহাদের কয়েকটি প্রতিরূপ শব্দ সংস্কৃতেও পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে পুরাতন পারসিক, গ্রীক প্রভৃতির সহিত যোগাযোগ থাকায় কয়েকটি ঐ ঐ ভাষাসম্ভূত **বিদেশী শব্দ**ও প্রাকৃতে প্রবেশ করিয়াছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে ভাষা-রূপান্তরের মধ্য দিয়া বাংলা ভাষাতেও তাহারা স্থায়ী আসন লইয়াছে ঃ যেমন,—প্রাচীন-গ্রীক দ্রাখ্‌মে ( =মুদ্রাবিশেষ ) > দ্রম্ম > দম্ম > দাম। প্রাচীন পারসীক 'মোচক্ ( =পাদত্রাণ ) প্রস্তুতকারী' অর্থে মোচিক > মোচিঅ > মুচি।

সংস্কৃতমূলক শব্দের দুইটি বিভাগ—তৎসম ও অর্ধতৎসম। অবিকৃত বানানসংবলিত সংস্কৃত শব্দই **তৎসম শব্দ**। **তৎসম**—অর্থাৎ 'তৎ বা তাহার' মানে 'সংস্কৃতের সম বা সমান'। যেমন,—'গৃহিণী, কৃষ্ণ, চন্দ্র, যজ্ঞ, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, মিত্র' ইত্যাদি। বিকৃত তৎসম বা বিকৃত সংস্কৃত শব্দকে বলা হয় **অর্ধতৎসম** বা **ভগ্নতৎসম শব্দ** ঃ যেমন—'গিন্নি, কেষ্ট, চন্দর, যজ্ঞি, পুরুত, বেরাহ্মীণ, মিত্তির' ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার উৎপত্তির পরে এই ভারতে তথা বাংলা দেশেও বহু জাতির পদার্পণ ঘটিয়াছে। ফলে বাংলা ভাষায় বহু **বিদেশী শব্দ** প্রবেশ করিয়াছে। এই বিদেশী উপাদানের নমুনা দেওয়া গেল ঃ যেমন,—'চকমকি, চাকু, দারোগা, লাশ' প্রভৃতি **তুর্কীশব্দ**; কাগজ, কলম, বুজরুক, বরফ' প্রভৃতি **ফারসী শব্দ**; 'কবর, নামাজ' প্রভৃতি **আরবী শব্দ**; 'কামরা, পেয়ারা, বোতল, চাবি, পাউরুটি, পেঁপে, বালতি, সাবান, বোতাম' প্রভৃতি **পোর্তুগীজ শব্দ**; কার্তুজ, কুপন, ওলন্দাজ, দিনেমার, বুর্জোয়া' প্রভৃতি **ফরাসী শব্দ**; ইস্ক্রুপ, তুরুপ, ইস্কাপন, হরতন, রুইতন' প্রভৃতি **ওলন্দাজ শব্দ**; 'গেলাস, বেঞ্চি, টিকিট, ট্রেন, নম্বর, কাপ, ডিস, স্কুল, কলেজ, সিনেমা, থিয়েটার, হাইকোর্ট, ডাক্তার, জজ, ট্রাম, চেয়ার, টেবিল, লেমনেড, পাশ, ফেল' প্রভৃতি **ইংরাজী শব্দ**; রিক্সা, হারিকিরি' প্রভৃতি **জাপানী শব্দ**; 'চা, চিনি, লুচি' প্রভৃতি **চীনা শব্দ**; 'সাগু, গুদাম' প্রভৃতি **মালয়ী শব্দ**। আবার **বান্টু ভাষার** 'জুলু', **দক্ষিণ আফ্রিকার** ভাষার 'জেব্রা', **পেরু দেশীয়** ভাষার 'কুইনিন', **অষ্ট্রেলীয়** ভাষার 'কাঙ্গারু', **ইটালীয়** ভাষার 'ম্যাজেণ্টা', **তিব্বতী** ভাষার 'লামা', **বর্মী** ভাষার 'ফুঙ্গী', **রুশ** ভাষার 'বলশেভিক'—এমনি কত কত বিদেশী শব্দকে বাংলা ভাষা সাদরে বরণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া, বাংলা ভাষার ভগ্নীস্থানীয় আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা হইতেও হয় সরাসরিভাবে নয় খবরকাগজ বা পুস্তকাদির মারফতে অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে ঃ যেমন,—'বানি' **হিন্দুস্থানী শব্দ**; 'শিখ, চাহিদা' প্রভৃতি **পাঞ্জাবী শব্দ**; 'হরতাল' **গুজরাটী শব্দ**; 'বর্গী' **মারাঠী শব্দ**; 'চেট্টি' **তামিল শব্দ**; 'কপি, কলা, মর্কট' প্রভৃতি **দক্ষিণ ভারতীয় আদি অনার্য শব্দ**; 'কম্বল, ময়ূর' প্রভৃতি **সাঁওতালী শব্দ**। এই ভারতীয় এবং ইতিপূর্বে উল্লিখিত অ-ভারতীয় শব্দাদিই বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে **বিদেশী শব্দ** নামে অভিহিত হইয়াছে।

খাঁটি বাংলা শব্দ, সংস্কৃতমূলক শব্দ ও বিদেশী শব্দের সংযোগে অথবা এক শ্রেণীর শব্দের সঙ্গে অপর শ্রেণীর প্রত্যয়াদির মিশ্রণে জাত যে সকল শব্দ বাংলা ভাষায় আসিয়াছে, তাহারাই **মিশ্র** বা **সংকর শব্দ (Hybrid word)**। ইহাদের উৎপত্তি-ব্যাপারে সাধারণতঃ চার রকমের পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় ঃ যেমন,—**(১)** দেশী ও বিদেশী শব্দের মিশ্রণ—'হাট-বাজার, রাজা-উজীর, শাক-সব্‌জী; **(২)** বিদেশী ও

দেশী শব্দের মিশ্রণ—'মাস্টার-মশাই, জামাই-বাবু, হেড্-পণ্ডিত'; (৩) বিদেশী ও দেশী শব্দের মিশ্রণ—'উকিল-ব্যারিষ্টার, হেড-মৌলবী'; (৪) মিশ্র প্রত্যয়ান্ত শব্দ—'পণ্ডিতগিরি, বেটাইম, নস্যদান, মাস্টারী, বাজারিয়া <বাজারে।

## (২) গঠনমূলক অর্থাৎ ব্যাকরণগত পদ্ধতিতে বিভাগ
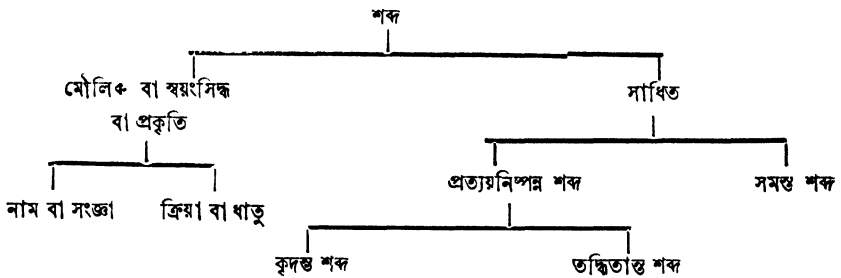
(ক) যে শব্দকে ভাঙা যায় না এবং যাহার প্রকাশিত অর্থই চরম, তাহাকে বলা হয় **মৌলিক** বা **স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ** ঃ মৌলিক শব্দেরই অপর নাম **প্রকৃতি**। যখন কোনও দ্রব্য, জাতি, গুণ বা অপর পদার্থ এই প্রকৃতির দ্বারা দ্যোতিত হয়, তখন ইহাকে **নামপ্রকৃতি** বা **সংজ্ঞাপ্রকৃতি** বলা যায় ঃ যেমন—'কলম, ভাই, পা, নদী, রাত্রি, পাহাড়'। অর্থসম্পন্ন অথচ বিভক্তিহীন এমন **নামপ্রকৃতিকে প্রাতিপদিক বলা** হয় ঃ যেমন,—'লতা, পাতা, ফুল, নদী, পাখী'। পক্ষান্তরে, প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ ভাঙিলে মৌলিক ভাবব্যঞ্জক যে অংশটুকু কোনও দ্রব্য জাতি বা গুণ বুঝাইয়া কোনও রকমের ক্রিয়া বুঝায়, তাহারই নাম **ক্রিয়াপ্রকৃতি** বা **ধাতুপ্রকৃতি** তথা **ধাতু** ঃ যেমন,—'রাখ্' গাহ্, খা, চল্, জান্'। (খ) যে শব্দকে ভাঙা যায় এবং ভাঙিয়া শব্দের পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে বলা হয় **সাধিত শব্দ**। শব্দ দুই জাতের—**প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ** বা **সমস্ত শব্দ**। একটি শব্দ ভাঙিয়া যদি একটি অংশে মৌলিক ভাব এবং অপর অংশে ঐ মৌলিক ভাবেরই প্রসারণ সংকোচন এবং অপরাপর পরিবর্তন-নির্দেশক আর একটি অংশ—যাহার নাম **প্রত্যয়**—থাকে, তাহা হইলে সেই শব্দকে বলা হয় **প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ** ঃ যেমন,—কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের নমুনা—'দৃশ্+অনট্=দর্শন ঃ রাখ্+আল=রাখল'। তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের নমুনা—'বাক্য+বন্দ>প্রসারে বন্দী বাক্যবন্দী; সর্প+ইলচ্ (ইল)=সর্পিল'। যে শব্দ ভাঙিলে একাধিক মৌলিক বা প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ পাওয়া যায়, তাহাকে বলা হয় **সমস্ত শব্দ** অর্থাৎ **সমাসযুক্ত** বা **মিলিত শব্দ**। যেমন,—'পা-গাড়ী, হাত-পাখা, বর্ষব্যাপী, উনুনমুখো' ইত্যাদি।

## (৩) অ পদ্ধতিতে বিভাগ

শব্দ

যৌগিক | রূঢ় | যোগরূঢ়

(ক) ভাষায় যাহার বিশ্লেষ সম্ভব নয় এমন মৌলিক শব্দ অর্থাৎ প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের যোগে, অথবা একাধিক শব্দের সংযোগে যে অর্থ হওয়া সমীচীন, তাহাই **যৌগিক** বা **যোগ শব্দের** দ্বারা প্রকাশিত হয় ঃ যেমন,—'যিনি দান করেন' এই অর্থে দাতা > দা+তৃন্ ; 'মিতা বা বন্ধুর ভাব' এই অর্থে মিতালি > মিতা+আলি। (খ) প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অনুসারী অর্থ না হইয়া, যেখানে শব্দের দ্বারা অপর কোন বিশেষ পদার্থ বুঝায় সেইরূপ শব্দকে বলা হয় **রূঢ়** বা **রূঢ়ি শব্দ** ঃ যেমন,—'কুশল'-এর প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ হইতেছে 'যে কুশ তুলিতে পারে', কিন্তু এই শব্দের প্রচলিত রূঢ়ি অর্থ হইতেছে 'দক্ষ'। জেঠাম-এর প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ 'জেঠার মত কাজ' কিন্তু এই শব্দের প্রচলিত রূঢ়ি অর্থ 'চাপল্য'। (গ) একাধিক শব্দ বা ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন বা সমাসযুক্ত শব্দ যেখানে আপেক্ষিত অর্থ অর্থাৎ স্বাভাবিক অর্থ প্রকাশ করিয়াও কোনও বিশেষ **অর্থ** বুঝায়, সেইরূপ শব্দকে বলা হয় **যোগরূঢ় শব্দ** ঃ যেমন,—'রাজপুত' শব্দের অপেক্ষিত বা স্বাভাবিক অর্থ 'রাজার পুত বা পুত্র'; কিন্তু 'ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধ-জাতিবিশেষ'ও বুঝায়—তাই 'রাজপুত' যোগরূঢ় শব্দ। 'সুহৃৎ' শব্দের অপেক্ষিত বা স্বাভাবিক অর্থ 'সুন্দর হৃদয় যাহার', কিন্তু ইহা 'বন্ধু' এই বিশেষ অর্থও বুঝায়—তাই 'সুহৃৎ' যোগরূঢ় শব্দ। 'পঙ্কজ' শব্দের অপেক্ষিত বা স্বাভাবিক অর্থ 'পঙ্কে যাহা জাত'; কিন্তু ইহা 'পদ্ম' এই বিশেষ অর্থও বুঝায়—তাই 'পঙ্কজ' যোগরূঢ় শব্দ।

## (৪) প্রত্যয়-বিভক্তিযোগমূলক পদ্ধতিতে বিভাগ
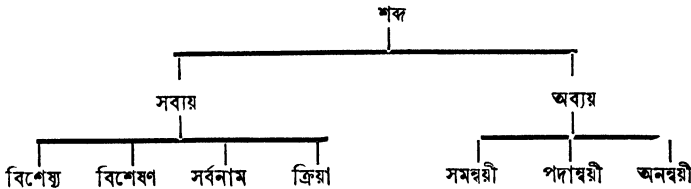
প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগ করিলে যে শব্দের রূপান্তর ঘটে, তাহা **সব্যয় শব্দ**; যেমন,—ছাত্র+রা বিভক্তি=ছাত্ররা। কর্+ইতেছে প্রত্যয়=করিতেছে। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া—এই চার প্রকারের সব্যয় শব্দ হয়। লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচনের দিক দিয়া যে শব্দের কোন রকমেরই পরিবর্তন ঘটে না, তাহাই **অব্যয় শব্দ**।

অব্যয় শব্দকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ যেমন,—'আর' 'ও' 'কিন্তু' প্রভৃতি **সমন্বয়ী অব্যয়**; 'দ্বারা' 'চেয়ে' 'নিমিত্ত' প্রভৃতি **পদান্বয়ী অব্যয়**ঃ 'মরি-মরি' 'ছি ছি' **অনন্বয়ী অব্যয়**। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক রকমের অব্যয় শব্দ বাংলায় আছে ঃ, যেমন,—'তা' 'তো' প্রভৃতি **বাক্যালংকার অব্যয়**। 'যদিও...তথাপি', 'হয় ···নয়', 'যখন···তখন' প্রভৃতি **সাপেক্ষ অব্যয়**; 'শন্ শন্' 'ঘেউ ঘেউ' 'কড়মড়' প্রভৃতি **অনুকৃতিবাচক অব্যয়**।

## অনুশীলনী

[ এক ] 'শব্দ' ও 'পদে'র পার্থক্য কী? শব্দের শ্রেণীবিভাগের বিভিন্ন পদ্ধতি ছকের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

[ দুই ] বাঙ্গালা ভাষায় প্রযুক্ত বিভিন্ন ভাষার শব্দ ও প্রত্যয় যোগে গঠিত পাঁচটি মিশ্র বা সংকর শব্দের ( Hybrid word এর ) উদাহরণ দাও ও সেই শব্দ লইয়া পাঁচটি বাক্য রচনা কর। **ক.বি. মাধ্যমিক ( বিজ্ঞান )** '৫৭

[ তিন ] নিম্নলিখিত প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া দৃষ্টান্তসহ বিশদ পরিচয় লিখ ঃ— দেশী শব্দ, সংকর শব্দ, যৌগিক শব্দ, যোগরূঢ় শব্দ ( **গৌ. বি. বি. এ. '৫০, '৫১** )। যোগরূঢ় শব্দ ও তদ্ভব শব্দ [ **রা. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫** ]। ভগ্নতৎসম শব্দ [**ক. বি. বি. এ. '৫১ ; (বিকল্প) '৫১ ; উ. বি. বি. এ. '৫৫**]। বিদেশী শব্দ ; স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ ; সাধিত শব্দ ; সমস্ত শব্দ ; নামপ্রকৃতি ; ধাতুপ্রকৃতি ; প্রাতিপদিক ; রূঢ়ি শব্দ।

[ চার ] তদ্ভব, তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দ কাহাকে বলে উদাহরণ-সহ বুঝাইয়া দাও। **ক. বি. বি. এ. ( বিকল্প ) '৫৫**

[ পাঁচ ] বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের বিবিধ ও বিচিত্র উপকরণগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ কর। **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৪৯ ; বি. এ. ( বিকল্প ) '৫৬**

**অথবা,** বাংলা ভাষায় মৌলিক ও আগন্তুক শব্দসমূহের শ্রেণীবিভাগ করিয়া বাংলা শব্দভাণ্ডারের ভাষাবিজ্ঞানসম্মত পরিচয় দাও এবং উপযুক্ত উদাহরণ দিয়া তাহা বুঝাইয়া দাও। **ক. বি. বি. এ. ( বিকল্প ) '৫৮**

[ ছয় ] প্রাকৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও। **ক. বি. বি. এ. ( বিকল্প ) '৫৭**

[ সাত ] যে কোন পাঁচটি শব্দের উপর ভাষাবিজ্ঞানসম্মত টীকা লিখ ঃ—বুজরুক ; উত্তরাঢ়ী ( দক্ষিণ রাঢ়ীর বিপরীত ) ; সধবা ; জুয়া ( খেলা ) ; নাছ ( দুয়ার ) ; পাষণ্ড ; কালে ভদ্রে ; দাম ( =মূল্য ) ; জানালা ; পাঁউরুটি। **ক. বি. বি. এ. ( বিকল্প ) '৫৯**

[ আট ] বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত ছয়টি বিদেশী শব্দের মূল ভাষার উল্লেখপূর্বক উহাদের সাহায্যে এক একটি বাক্য রচনা কর। **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৬**

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## শব্দবিবর্তন

| সংস্কৃত | প্রাকৃত | আধুনিক বাংলা |
|---|---|---|
| অদ্য (*অদ্যম্) | অজ্জিং | আজ্ |
| অধস্তাৎ (*অধিস্তাৎ) | হেট্‌ঠা, হেণ্টা | হেঁট |
| অপর | অবর | আর্ |
| অপস্মরতি | পস্‌সরদি, পস্‌সরই | পাসরে |
| অর্ধ-তৃতীয় | অড্‌ঢ-তইঅ | আড়াই |
| অলক্ত- | অলত্ত- | আল্‌তা |
| অবিধবা | অবিহবা | এয়ো |
| অবিধবত্ব | অবিহবত্ত | এয়োৎ |
| অশীতি | অসীদি, অসীই | আশী |
| অষ্টাদশ | অট্‌ঠারহ | আঠারো |
| অস্মে | অম্‌হে | আমি |
| আদর্শিকা | আঅরসিয়া | আরশি |
| আদিত্য | আইচ্চ | আইচ্(পদবী) |
| আম্রাতক | অম্বাডঅ | আম্‌ড়া |
| আবিশাত | আবিসই | আইসে, আসে |
| ইন্দাগার- | ইন্দাআর- | ইঁদারা, ইঁদেরা |
| ইষ্টক | ইঠঅ, ইট্‌ঠঅ | ইট, ইঁট |
| উদ্ধার- | উদ্ধার | উধার > ধার |
| উষ্ণাপন- | উন্‌হারণ | উনান |
| উপবীত | পঅইত | পৈতা |
| উপাধ্যায় | উবজ্‌ঝাঅ | ওঝা > রোজা |
| কথয়তি | কহেই | কহে, কয় |
| কফোণিকা | কহোণিঅ | কনুই |
| কক্ষ- | কচ্ছ, কক্খ > কক্‌খ | কাঁখ, কাছ |
| কর্ণ | কন্ন | কান |
| কর্ষপট্টিকা | কস্‌সবট্টিআ | কষটী, কষ্টী |
| কীদৃশ, কীদৃশন- *কাদৃশন- | কাইসণ, কইসণ- | কেন (=ক্যানো) |
| *কৃষ্ণ = *ক্র্‌ষণ | কণ্‌হ | কান, কানু, কানাই |
| কৃত্যগৃহীকা | কচ্ছহারিঅ | কাছারি |
| কণ্টকফল | কণ্টঅ-অল | কাঁটাল, কাঁঠাল (পদবী) |

| সংস্কৃত | প্রাকৃত | আধুনিক বাংলা |
|---|---|---|
| কেতক- | কেদগ-, কেঅঅ- | কেয়া |
| *কেতক-ট— | কেদগড—, কেঅঅড— | কেওড়া |
| ক্ষুদ্র | ক্ষুদ্দ | খুদ |
| ক্ষার- | ছার, খার | ছার, খার |
| ক্ষণিত্র | খণিত্থ | খন্তা |
| খাদতি | খাঅই | খায়্ |
| খাদ্য- | খজ্জ | খাজা |
| গত + ইল- | গঅ + ইল্ল- | গেল (=গ্যালো) |
| গর্দভ- | গদ্দহ- | গাধা |
| গৃহিণী | ঘরিণী | ঘরণী |
| গো-বিষ্ঠা | গোইট্‌ঠা | ঘুঁটে |
| গোমিক | গোমিগ, গোমিঅ | গুঁই (পদবী) |
| গোরূপ | গোরূব | গোরু |
| গ্রথতি | গঢই | গড়ে > গড়ে |
| গ্রন্থি | গণ্ঠি | গাঁঠ |
| গ্রাম | গাম | গাঁও, গাঁ |
| ঘাত | ঘাদ, ঘাঅ | ঘাও, ঘা |
| চন্দ্র | চন্দ | চাঁদ |
| ছাদনিকা— | ছাঅণিকা | ছাঅনি > ছানি |
| জতুগৃহ | জৌহর | জহর |
| জ্যেষ্ঠতাত | জেট্‌ঠআঅ | জেঠা (জ্যাঠা) |
| তন্ত্র | তন্ত | তাঁত |
| তাম্র-, *তাম্ব | তম্ব- | তাঁবা, তামা |
| তুণ্ড | টুণ্ড | ঠোঁট |
| ত্রীণি | তিণ্ণি | তিন্ |
| দলপতি | দলবই | দলই, দলুই (পদবী) |
| দ্রম্য | দম্ম | দাম, দাঁ (উপাধি) |
| দীপবর্তিকা | দীববট্টিআ | দেউটী |
| দীপবৃক্ষ | দীবরুক্‌খ— | *দিঅউরুখা, দেউরুখা, দেরুখো |
| দুহিতা | ধীতা > ঝিআ | ঝি |

| সংস্কৃত | প্রাকৃত | আধুনিক বাংলা |
|---|---|---|
| দেবকুলিক— | দেউলিঅ | দেউলিয়া |
| দ্বি-অর্ধ | দিঅড্‌ঢ | দেড় |
| দেবগৃহ | দেবহর- | দেহরা |
| নবনীত | | ননী |
| নপ্তৃক— | নত্তিঅ | নাতি |
| পাটলি, পাটলিকা | পাডলি, পাডলিআ | পারুল |
| প্রতিষ্ঠা | পইট্‌ঠা | পইঠা>পৈঁঠা |
| প্রতিবেশিক— | পডিএসিঅ | পড়িশী>পড়শী |
| প্রস্থাপয়তি | পট্‌ঠাবেই | পাঠায় |
| প্রবিশতি | পবিসই | পৈশে, পশে |
| | ফগ্‌গু | ফাগ |
| বৎসরূপ | বচ্ছরুঅ | বাছরু, বাছুর |
| বাষ্প | *বপ্‌ফ>ভপ্প | ভাপ |
| ব্রাহ্মণ | বম্‌হণ | বামন্, বামুন |
| ভদ্রক | ভল্লঅ— | ভালো |
| ময়া | মএ | মই |
| মাতৃষ্বসা | মাউস্‌সিআ | মাসী |
| মৃত- | মড- | মড়া |
| যাতি (=য়াতি) | জাই | জায়্ (=যায়) |
| রথ্যা | রচ্ছা, লচ্ছা | নাচ |
| রক্ত | রত্ত | রাতা (প্রাচীন বাং) |
| রক্ষাপাল | রকখপাল | রাখাল |

| সংস্কৃত | প্রাকৃত | আধুনিক বাংলা |
|---|---|---|
| রাজ্ঞিকা | রণ্ণিআ | রাণী |
| রাধিকা | রাহিআ | রাই |
| রোহিত- | রোহিঅ | রুহী, রুই |
| বল্গা | বগ্‌গা | বাগ্ |
| বন্যা | বণ্ণা | বান |
| শুষ্ক- | সুক্‌খ- | শুখা, শুকো |
| শৃণোতি | সুণই | শুনে, শোনে |
| শেফালিকা | সেহালিআ | শিউলী |
| *শ্বশ্রূটিকা | সস্‌সুডিআ | শাশুড়ী |
| ষোড়শ | ষোলহ | ষোল |
| সন্ধ্যা | সঞ্‌ঝা | সাঁঝ্ |
| সপত্নী | সবত্তী | সৎ ( বৎ-মা ) |
| সমর্পয়তি | সমপ্পেই | সঁপে |
| সহস্রমল্ল | সঅস্‌সমল্ল | শাসমল (পদবী) |
| সংক্রম | সংকম | সাঁকো |
| সংদংশিক | ---ণ্ডংসিআ | সাঁড়াশি |
| স্থামিক | ঠামিঅ>ঠাবিঁঅ | ঠাঁই |
| সামন্তরাজ | সামন্তরাঅ | সাঁতরা (পদবী) |
| সিংহ | সিঅ | সী, শী (পদবী) |
| হস্ত | হত্থ | হাত |

## অনুশীলনী

[ এক ] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটির সংস্কৃত মূল লিখ এবং তাহা হইতে বর্তমান আকারে পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা প্রদর্শন কর ;—গুঁই (পদবী) ; দেরখো ; সাঁকো ; সাঁঝ ; আইচ ( পদবী ) ; কেন ? আমি ; এঁয়ো ; ঘুঁটে ; ভালো ; উবু ; নাছ ; ভাব ; ঝি ; বাগ ( rein ) ; থাজা ; সাঁওতাল ; ভাত ; দাঁ ( পদবী ) ; সা ( পদবী ) ; ফাগ ; ওঝা ; পৈতা ; উনুন ; মেসো ; শাশুড়ী ; ( পদবী ) ; ইঁদারা ; বাছুর ; সাঁতরা । **ক. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫৫, '৫৬, '৫৭ '৫৮**

[ দুই ] নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে কোন পাঁচটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :—কানু, ঠাকুর, তাম্বুল, শিউলি, উর্ণনাভ, পুঁথি, মুচি, দাম, হেঁট, কার্তুজ। **ক. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫২**

# তৃতীয় অধ্যায়

## শব্দগঠন

### প্রত্যয়—সন্ধি—সমাস—উপসর্গ

শব্দগঠনের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, সাধারণতঃ শব্দগঠন দুই রকমে হয় ঃ প্রথমতঃ, প্রত্যয়যোগে ; দ্বিতীয়তঃ, ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনিযোগে, শব্দের সঙ্গে শব্দ-যোগে। ধাতুর সহিত কৃৎ প্রত্যয়-যোগে এক জাতীয় শব্দ গঠিত হয়—ইহারা **কৃদন্ত শব্দ**। ক্রিয়াপ্রকৃতি অথবা ধাতুর উত্তর যে সকল প্রত্যয় জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহারাই **কৃৎ প্রত্যয়**। আবার শব্দের সহিত তদ্ধিত প্রত্যয়-যোগে আর এক জাতীয় শব্দ গঠিত হয় ইহারা **তদ্ধিতান্ত শব্দ** বা **সাধিত শব্দ**। শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয় জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহারাই **তদ্ধিত প্রত্যয়**। সর্বশেষে ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি-যোগে, শব্দের সঙ্গে শব্দযোগে যে শব্দাদি গঠিত হয়, তাহারা **সন্ধিনিষ্পন্ন, সমাসনিষ্পন্ন ও উপসর্গযোগে উৎপন্ন শব্দ**। এই জাতীয় শব্দই **যৌগিক শব্দ**।

### (১) কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দ তথা কৃদন্ত শব্দ

**বাংলা কৃৎ প্রত্যয়**

অন>( বিকারে-স্বরবর্ণের পরে ) ওন—( ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠন করে ও অর্থ টি অনেক ক্ষেত্রেই ক্রিয়াবাচক হইতে বস্তুবাচক হইয়া পড়ে )—নাচ্+অন= নাচক ; খা+ওন=খাওন ; এইরূপ ঢাকন, ফলন, ঝাড়ন, ঝুলন।

অনা, ওনা ( 'অন' প্রত্যয়েরই প্রসার ; তাই ইহার অর্থটিও 'অন' প্রত্যয়েরই অনুরূপ )—কাঁদ্+না=কাঁদনা>কান্না ; এইরূপ কুটনা, বাজনা, ঢাকনা।

অন্ত—( 'এইরূপ করিতেছে, এইরূপ অবস্থায় বিদ্যমান' অর্থে এই প্রত্যয়ঘটিত শব্দ বিশেষণ ও বিশেষ্য গঠন করে )—জী+অন্ত=জীয়ন্ত>জ্যান্ত ; এইরূপ বাড়ন্ত, ফলন্ত।

অৎ>প্রসারে অতা, অতী ( অতি ), তা, তি—ফির্+অৎ=ফিরৎ=ফেরৎ>প্রসারে ফেরতা, ফিরতী ; এইরূপ চলতী, উঠতি, বহতা, সব-জানতা, পারত-পক্ষে। এই প্রত্যয়ের প্রসার-জাত অতী, অতি, তি প্রত্যয় ক্রিয়া এবং বস্তুবোধকও বটে : যেমন,—গুনতি, ভরতি, বাড়তি, ঘাটতি, ঝড়তি, পড়তি।

আই—( সাধারণতঃ ভাববাচক ক্রিয়াদ্যোতক, তবে কদাচিৎ বস্তুদ্যোতকও হয় )—
লড়্+আই=লড়াই ; এইরূপ বাছাই, খোদাই, ঝালাই, বাঁধাই।

আনি, আনী—( ভাববাচক ক্রিয়াবোধক, তবে কখনও কখনও বস্তুবাচক নামরূপেও হয় ব্যবহৃত )—উড়্+আনি ( নী )=উড়ানি, উড়ানী ; এইরূপ নিকানি, নিকানী।

আনো, আনী—( 'ণিজন্ত অথবা নামধাতুর নিষ্ঠা' অর্থে )—নামধাতুতে 'আনো'—যেমন,—ঘোলানো, এইরূপ ভিড়ানো। ণিজন্ত ধাতুতে 'আনো'—যেমন,—ছাদচোঁয়ানো, ঘুমভাঙানো, বুকজুড়ানো, বাঁধ-আটকানো। ধ্বন্যাত্মক ধাতুতে 'আনি,—যেমন,—কলকলানি, ফোঁস ফোঁসানি, কনকনানি, দবদবানি টনটনানি, ধড়ফড়ানি। আবার লোকহাসানী, ঘরভাঙানী, পাড়াবেড়ানী।

আরী, উরী—( 'জীবিকা' অর্থে )—ডুব+আরী ( উরী )=ডুবারী ডুবুরী ; এইরূপ ধুনারী ধুনুরী।

ইয়া>চলিত ভাষায় ইয়ে—( 'সেই বিষয়ে প্রবীণ বা দক্ষ' বুঝায় )—খা+ইয়ে—খাইয়ে ; এইরূপ বলিয়ে, গাইয়ে, নাচিয়ে, বাজিয়ে।

উনি—( 'স্বল্পতাবোধক ক্রিয়া অথবা ক্ষুদ্র বস্তু' অর্থে ; 'সে এই কাজ করে' অর্থে বক্+উনি=বকুনি ; এইরূপ গাঁথুনি, রাঁধুনি, নাচুনি, বাঁধুনি।

উয়া>চলিত ভাষায় ও ( 'সে করে' এই অর্থে )—পড়্+উয়া>ও=পড়ুয়া> প'ড়ো। এইরূপ খাউয়া, খেয়ো।

উক>প্রসারে উক+আ=উকা—( স্বভাব বুঝাইতে ]—খা+উকা=খাউকা> খেকো। এইরূপ মিশুক।

## সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

অক্—( 'শিল্পী' অর্থে )—গৈ+অক=গায়ক ; এইরূপ রঞ্জক, নর্তক, খনক।

তৃচ্, তৃন্—( 'সে করে' অর্থে )—দা+তৃন্=দাতা ; এইরূপ জেতা, গ্রহীতা, নিয়ন্তা, সবিতা।

অ—খচ্—( 'যে করে' অর্থে )—শুভ+কৃ+খচ্=শুভংকর ; এইরূপ ভয়ংকর ক্ষেমংকর, প্রিয়ংবদ, তুরঙ্গম, যুগন্ধর, বিশ্বম্ভর, শত্রুঞ্জয়।

ঘঞ্—( কর্তার, অথবা ভাবের প্রকাশক )—বি—রঞ্জ্+ঘঞ্=বিরাগ ; এইরূপ পাক, শোক, রোগ, সঙ্গ, ভাগ, ভাব, বোধ, দায়।

অচ্—( ভাববাচক নামপ্রকাশক )—জি+অচ্=জয় ; এইরূপ লয়, রব, বর্ষ, মোহ।

অনট্—( করণ বুঝাইতে অর্থাৎ 'যদ্দ্বারা কার্য নিষ্পন্ন হয়' এই অর্থে )—সৃজ্+অনট্=সর্জন, কিন্তু বাংলায় 'সর্জন' স্থানে 'সৃজন' সুপ্রচলিত ; চি+অনট্=

চয়ন ; এইরূপ আরোহণ, বিধান, ভোজন, রঞ্জন, শয়ন, শ্রবণ, পতন, গান, অধ্যয়ন, অনুষ্ঠান, দান।

ক্ত=ত ( নিষ্ঠার্থে অর্থাৎ 'হইয়াছে' অর্থে )—নি—মসজ্+ক্ত=নিমগ্ন ; নির্—আ—কৃ ( 'খণ্ডন করা' অর্থে )+ক্ত=নিরাকৃত ; বি—নশ্+ক্ত=বিনষ্ট; এইরূপ গত, দগ্ধ, স্থিত, মৃত, দত্ত, দৃষ্ট, মুগ্ধ। লালা+ক্যঞ্=‘লালায়’ নামধাতু। অতঃপর লালায়+ক্ত=লালায়িত।

তব্য, অনীয়—( 'ইহা করা হইবে, অথবা করা উচিত' এই অর্থে )—দৃশ্+তব্য, অনীয়=দ্রষ্টব্য, দর্শনীয় ; এইরূপ বক্তব্য, বচনীয় ; পূজিতব্য, পূজনীয় ; কর্তব্য, করণীয় ; স্মর্তব্য, স্মরণীয় ; মন্তব্য, মননীয়।

যৎ>য—পা+য=পেয় ; এইরূপ সহ্য, দেয়, লভ্য, জেয়, ধ্যেয়, ভব্য।

ক্তি=তি—( 'ভাববাচ্যে' অর্থাৎ 'তাহার ভাব' এই-অর্থে )—বচ্+ক্তি=উক্তি ; এইরূপ দৃষ্টি, খ্যাতি, গীতি, শ্রান্তি, হানি।

ণিন্=ইন্—( কর্তৃবাচ্যে 'ব্রত, শীল ও পৌনঃপুন্য' অর্থে )—অপ—রাধ্+ণিন্=অপরাধী ; এইরূপ উপকারী, অধিকারী, সত্যবাদী, জয়ী, দমী, ·যোগী, মিত্রদ্রোহী, বিবেকী।

শানচ্—বৃধ্+শানচ্=বর্ধমান ; এইরূপ বর্তমান, দীপ্যমান, ম্রিয়মাণ, শয়ান, আসীন। বন্দমান ( কর্তৃবাচ্যে ), বন্দ্যমান (কর্মবাচ্যে) ; ঘূর্ণমান (কর্তৃবাচ্যে), ঘূর্ণ্যমান ( কর্মবাচ্যে )। দণ্ড+ক্যঙ=‘দণ্ডায়’ নামধাতু। অতঃপর দণ্ডায়+শানচ্=দণ্ডায়মান।

যঙ্+শানচ্—( 'পৌনঃপুন্য' অর্থে 'যঙ্' প্রত্যয় বসে )—জ্বল্+যঙ্=শানচ্=জাজ্বল্যমান; এইরূপ দেদীপ্যমান, রোরুদ্যমান, দোদুল্যমান।

সন্+অঙ্—( ইচ্ছার্থে )—শ্রু+সন্+অঙ, স্ত্রীলিঙ্গে আ=শুশ্রূষা ; এইরূপ জিজ্ঞাসা, জিগীষা, বুভুক্ষা, পিপাসা, লিপ্সা, ভিক্ষু, পিপাসু।

## প্রয়োগ

বাতাসে **দোদুল্যমান** বস্ত্রাঞ্চল শারদ আকাশের মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। গীতকণ্ঠ পথিক সুরের মাধুর্য চতুর্দিকে **বিকীর্ণ** করিতে করিতে যাইতেছেন। তিনি পুত্রশোকে **মুহ্যমান** হইলেন। **বাতাহত** কদলীপত্রের শোভা দর্শনে তিনি বিমোহিত হন। কবিতাটি **নাচুনি** ছন্দে লিখিত। নেতাজীর স্মৃতি আমাদের অন্তরে স্বর্ণাক্ষরে **খোদাই** থাকিবে। **পড়্তি** বেলায় মেয়েরা কলসী-কাঁখে জল আনতে যায়। লোকটি বেশ **বলিয়ে কইয়ে**।

## ( ২ ) তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ তথা তদ্ধিতান্ত শব্দ

### বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

আল, আলা, ওয়াল, ওয়ালা—( 'সম্বন্ধ=দেশ, ব্যবসায়' বুঝাইতে )—ঘোষাল, কাশীয়াল, গয়াল, আগরওয়াল, বাড়িয়ালা, ফুলওয়ালা, ফেরিওয়ালা, পানয়ালা।

টে, আ, ঈ, ওয়ার, আলো, মন্ত, বন্ত, ইয়াল, দার—স্বার্থে বা সাদৃশ্যে, ভাবার্থে, 'গুণ সম্বন্ধ শীল বা সংযোগ' বুঝাইতে )—হিংসুটে, বকাটে, ভাড়াটে, পাগ্‌লাটে, রোগাটে, তামাটে, ঘোলাটে, সাদাটে, ধোঁয়াটে ; জংলা, তেলা, লাংলা ; করাতী, দোকানী, পসারী, ঢাকী, দরদী, মরমী, বাঙ্গালী ; দাঁড়ী ; জানোয়ার, হুঁসিয়ার, পাটোয়ার ; শাঁসালো, ধারালো, তেজালো ; লক্ষ্মীমন্ত, শ্রীমন্ত ; ভাগ্যবন্ত, বলবন্ত ; খাটিয়াল, লাঠিয়াল ; চড়নদার, বাজনদার।

পারা, পানা—( সাদৃশ্যার্থে )—চাঁদপারা, পাগলপারা ; কুলোপানা, হাঁড়িপানা।

আলি, পনা, আনি, আমি, মি, তমি—( 'ভাব, বৃত্তি বা কার্য' বুঝাইতে )—মিতালি, ঠাকুরালি, ঘটকালি ; টীটপনা, গিন্নিপনা ; কাতরানি ; জ্যাঠামি ; গোঁয়ারতমি।

উক, উকে—( 'আতিশয্য, আসক্তি' অর্থে )—লাজুক, মিথ্যুক, পেটুক ; নাটুকে।

ত', তো, তা, তুতা, তুতো—( অপত্যার্থে )—জেঠাত', জেঠুতা, জেঠ্‌তুতা ; মামাতুতো>মামাতো

আর, রী, আরী—( 'জীবিকা' অর্থে )—চামার, কুমার, ছুতার ; শাঁখারী, কাঁসারী, পূজারী ; চূণারী, ভিখারী।

আই—( ভাবে ও আদরে )—বামনাই, বড়াই, খাড়াই, পোষ্টাই, চওড়াই, সাফাই, মিঠাই ; কানাই, ধনাই, লখাই, ছিরাই, গণাই, জনাই।

আ, ই, উ—( স্বার্থে )—চোঙা, তলা, থালা, চোরা, পাতা, ল্যাজা ; কাঁঠি, ছাতি, থলি ; আগু, গাড়ু, চুমু।

তা, তী, উতি, ত—( পত্রজাতীয় বস্তু বুঝাইতে 'যুক্ত' অর্থে )—নাম্‌তা, নোন্‌তা, পান্তা, চাক্‌তি, করাত।

ঈ—( 'সম্বন্ধ, সংযোগ, শীল, ধর্ম, ব্যবসায় বা আজীবিকা' বুঝাইতে )—নাকী, দাগী ; আলাপী, মজলিসী, হিসাবী, খেয়ালী, ধ্রুপদী, সেতারী।

ভর, ভরা—( পরিমাণার্থে )—তোলা-ভর, রাতভর ; বাটাভরা, গালভরা

আ, আল, লি, আলি, রি, লা, ই—( বিবিধার্থে )—ভাতা, ‘হাতা, বাঘা, চাষা, বাতাসা ; সাজাল, দাঁতাল, দয়াল ; সোনালি, মাঝিয়ালি, দূতীয়ালি ; মাঝারি, মশারি, বাঁকারি ; শ্যামলা, আধলা, ছাদলা, কামলা, মেঘলা ; ডালি, কাঁসি, দাঁতি।

## সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণি, ষ্ণিক, ষ্ণেয় ষ্ণায়ন, ষ্ণীয়—(অপত্যার্থে)—পার্থ, দৌহিত্র, মানব ; দৈত্য, চাণক্য ; দ্রৌণি, কার্ষ্ণি, দাশরথি, সৌরি, রাবণি, আর্জুনি, সৌমিত্রি ; রৈবতিক, আশ্বপালিক ; কৌন্তেয়, বৈমাত্রেয়, গাঙ্গেয় ; বৈশম্পায়ন, দ্বৈপায়ন, বাৎস্যায়ন, মৌদ্গলায়ন, নারায়ণ, কাত্যায়ন ; স্বস্রীয়।

ষ্ণ, ষ্ণ্য—(‘উপাসক বা ভক্ত’ অর্থে )—সৌর, ব্রাহ্ম, জৈন, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য।

ষ্ণিক, নীন ( =ঈন ) নীয় ( =ঈয় )—( ‘সম্বন্ধীয়’ অর্থে )—মানসিক, নৈতিক, সার্বজনিক, ঐহলৌকিক, পারলৌকিক, সার্বজনীন, সর্বজনীন ; গ্রামীণ ; জলীয়, রাজকীয়, বঙ্গীয়, স্বীয়, স্বকীয়, রাষ্ট্রীয়, শারদীয়, স্বর্গীয়, জাতীয়, ভবদীয়, মদীয়, তদীয়।

ত্ব, তা, ইমন, থা, ত্য—( ‘গুণ, ভাব’ অর্থে )—দাসত্ব, সতীত্ব, সত্ত্ব, মহত্ত্ব ; সত্তা, মধুরতা ; মাধুরিমা, নীলিমা, মহিমা, রক্তিমা, গরিমা, লঘিমা, লালিমা ; সর্বথা, যথা ; পাশ্চাত্ত্য, দাক্ষিণাত্য।

তা, ত্ব, ষ্ণ্য, ষ্ণিক—( ‘কার্য, জীবিকা’ অর্থে )—শিক্ষকতা ; পৌরোহিত্য ; নেতৃত্ব, সতীত্ব, নারীত্ব , সারথ্য, সৌজন্য ; তৈলিক, তাম্বুলিক, নাবিক।

ইন্, ময়ট্, ল, আলু, শ, ইল, র, মতুপ্, বতুপ্—( অস্ত্যর্থে )—দেহী , মহিমময় ; মাংসল, রসাল ; দয়ালু ; রোমশ ; ফেনিল, পঙ্কিল ; নখর ; শ্রীমান্ ; গুণবান্।

চ্বি—( ‘অভূত-তদ্ভাব’ অর্থে )—ভস্মীভূত, একত্রীভূত, বশীভূত, একীভূত।

কল্প—( ‘ন্যূন’ অর্থে )—ঋষিকল্প, দেবকল্প, মৃতকল্প, পিতৃকল্প।

ময়ট্ ( =ময় )—( ‘বিকার, সংসর্গ, ব্যাপ্তি, প্রাচুর্য’ অর্থে )—হিরণ্ময় ; পাপময় ; জলময় ; তন্ময় ; আনন্দময়।

ইত, ইক—( ‘উৎপন্ন, দেয়, জাত, যুক্ত, জ্ঞাত’ অর্থে )—ফলিত, পুষ্পিত, নিদ্রিত, পুলকিত, কলঙ্কিত ; চৈনিক, মাসিক, বার্ষিক, দৈনিক, বাসন্তিক, সামুদ্রিক, ঐহিক, ঐতিহাসিক, নৈয়ায়িক, সাহিত্যিক।

বৎ, স্থানীয়—( সাদৃশ্যার্থে )—মাতৃবৎ, মাতৃস্থানীয় ; পিতৃব্য, পিতৃস্থানীয়।

## বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়

আন, ওয়ান, দার—( 'অধিকার' বুঝাইতে )—গাড়োয়ান, দারওয়ান, কোচওয়ান ; দোকানদার, বুটিদার, দানাদার, চৌকিদার, বুঝদার।

আনা ( -য়ানা ) > প্রসারে আনী, আনি,—( 'অভ্যাস বা শীল' অর্থে )—বিবিয়ানা, বিবিয়ানি ; মস্তানী ; সালানা, সালিয়ানা ; হিন্দুয়ানা, হিন্দুয়ানী।

খানা—('দোকান, স্থান' অর্থে )—মুদিখানা, ছাপাখানা, ডাক্তারখানা, পিলখানা।

খোর—( 'সেবনকারী' অর্থে )—গাঁজাখোর, মদখোর, গুলিখোর, আফিঙখোর।

গর—( 'যে করে বা গড়ে' অর্থে )—কারিগর, বাজিগব, সওদাগর।

গিরি—( 'ব্যবসায় বা শীল' অর্থে )—মুটিয়াগিরি, পাণ্ডাগিরি, রাজাগিরি, মুচিগিরি, বাবুগিরি, কেরাণীগিরি।

চা, চি, চী—( 'আধার, ক্ষুদ্র' অর্থে )—বাগিচা, নলিচা, নইচা, পাতমচি বা পাতঞ্চি ; ধুনাচী। চী—( 'ব্যবসায়ী বা কর্মী' অর্থে )—বাবুর্চী, খাজাঞ্চী, কলমচী ( ব্যঙ্গার্থে লেখক )।

দান, দানী—( 'আধার' অর্থে )—আতরদান, কলমদান, নস্যদান ; ফুলদানী, পিকদানী।

তর, তরো—( 'প্রকার' অর্থে )—এমনতর, গুরুতর, বহুতর ; যেমনতরো।

নবিশ—( 'লেখা, পেশা বা ব্যবসায়' অর্থে )—নকলনবিশ, শিক্ষানবিশ।

বন্দ > প্রসারে বন্দী—( 'বদ্ধ বা গৃহীত' অর্থে )—পেটরা-বন্দী, বাক্সবন্দী, চিঠা-বন্দী, বাঘ বন্দী।

বাজ—( 'অভ্যস্ত' অর্থে )—চালবাজ, ফন্দীবাজ, ধড়িবাজ, ধাপ্পাবাজ, ধোঁকাবাজ, মামলাবাজ। বাজী—( প্রসারে 'শীল' অর্থে )—চালবাজী, গলাবাজী।

সহি, সই—( 'যোগ্য' অর্থে )—মানান্-সহি, প্রমাণসহি, মাপসই, টেঁকসই, চলনসই, লাগসই।

স্তান—( 'দেশ' অর্থে )—হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ( সং পাবক—স্থান=পবিত্র দেশ )

### প্রয়োগ

আমাদের **বাড়িয়ালার** সঙ্গে রাস্তার **পানয়ালার** ঝগড়া বাধিতেই এক **ফুলয়ালা** আসিয়া গোলমাল মিটাইয়া দিল। **পাওনাদারদের** ভয়ে **দেনাদার** খিড়কীর দুয়ার দিয়া যাতায়াত করে। **বাজিগরের** অপূর্ব ক্রীড়া দেখিয়া কারখানার **কারিগরেরা** বিস্মিত হইল। হরেনবাবু যেমন **আলাপী** তেমনি **মজলিসী**। মুখখানি **হাঁড়িপানা** করে ব'সে আছ কেন? আঙুর খুব **পোষ্টাই**। এই গ্রামে একটিও **করাতী** নাই।

## (৩) যৌগিক শব্দ

### কয়েকটি সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ

**স্বরসন্ধি**—অনু+উদিত=অনূদিত। গঙ্গা+ঊর্মি=গঙ্গোর্মি। মহা+ওষধি=মহৌষধি। হিম+ঋতু=হিমর্তু। উত্তম+ঋণ=উত্তমর্ণ। বি+অর্থ=ব্যর্থ। প্রতি+উষ=প্রত্যূষ। নি+ঊন=ন্যূন। ত্রি+অম্বক=ত্র্যম্বক। বি+ঊঢ়=ব্যূঢ়। বহু+আশী=বহ্বাশী। সাধু+ঈ=সাধ্বী। যোদ্ধৃ+ঈ=যোদ্ধ্রী। কর্তৃ+ঈ=কর্ত্রী।

**ব্যঞ্জনসন্ধি**—ষট্+অঙ্গ=ষড়ঙ্গ। বাক্+দত্তা=বাগ্দত্তা। বাক্+নিষ্পত্তি=বাঙ্‌নিষ্পত্তি। উৎ+ছিন্ন=উচ্ছিন্ন। উৎ+জ্বল=উজ্জ্বল। বিদ্যুৎ+লীলা=বিদ্যুল্লীলা। উৎ+শ্বাস=উচ্ছ্বাস। উৎ+হৃত=উদ্ধৃত পরি+ছন্ন=পরিচ্ছন্ন।

**বিসর্গসন্ধি**—সদ্যঃ+ছিন্ন=সদ্যশ্ছিন্ন। তপঃ+ধন=তপোধন। বয়ঃ+বৃদ্ধ=বয়োবৃদ্ধ। ততঃ+অধিক=ততোঽধিক। স্ব+গত=স্বর্গত। প্রাতঃ+আশ=প্রাতরাশ। মাতঃ+গঙ্গে=মাতর্গঙ্গে। দুঃ+অদৃষ্ট=দুরদৃষ্ট। জ্যোতি+ময়=জ্যোতির্ময়। নিঃ+রন্ধ্র=নীরন্ধ্র। চক্ষু+রোগ=চক্ষুরোগ। জ্যোতিঃ+ক=জ্যোতিষ্ক। ধনুঃ+পাণি=ধনুষ্পাণি। অতঃ+এব=অতএব।

**নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি**—কুল+অটা=কুলটা। বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ। শুদ্ধ+ওদন=শুদ্ধোদন স্ব+ঈর=স্বৈর। মার্ত+অণ্ড=মার্তণ্ড। অন্য+অন্য=অন্যান্য, অন্যোন্য। সার+অঙ্গ=সারঙ্গ। প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ়। গো+অক্ষ=গবাক্ষ। অক্ষ+ঊহিণী=অক্ষৌহিণী। শীত+ঋত=শীতার্ত আঃ+পদ=আস্পদ। পতৎ+অঞ্জলি=পতঞ্জলি বনঃ+পতি=বনস্পতি। বৃহৎ+পতি=বৃহস্পতি। এক+দশ=একাদশ। ষট্+দশ=ষোড়শ। দিব+লোক=দ্যুলোক। আ+চর্য=আশ্চর্য। সীমন্+অন্ত=সীমান্ত। মনস্+ঈষা=মনীষা। হরি+চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র। গো+পদ=গোষ্পদ। তৎ+কর=তস্কর। [সন্ধির নিয়মানুযায়ী যে পদ সিদ্ধ হয় না, তাহাকে বলা হয় **নিপাতনে সিদ্ধ** পদ।]

**খাঁটি বাংলা সন্ধি**—তেমন+ই=তেমনি। যেমন+ই=যেমনি। এত+দিন=এদ্দিন। পাঁচ+জন=পাঁজ্‌জন। পাঁচ+সের=পাঁশ্‌সের। নাত্+জামাই=নাদ্-জামাই। সাত+গুণ=সাদ্‌গুণ। জাহাজ+উপরি=জাহাজোপরি। কোথা+যাবে=কোজ্জাবে। বড়+ঠাকুর=বড়্‌ঠাকুর > বট্‌ঠাকুর। ঘোড়া+গাড়ী=ঘোড়্-গাড়ী। পাট+কাঠি=পাকাঠি। আমি+তা=আম্‌তা। দূর+তোর=দুত্তোর। হাত+ধরা=হাদ্‌ধরা। প্রকৃতপক্ষে এই উদাহরণগুলি বাংলা মৌখিক সন্ধির উদাহরণ।

## সমাসনিষ্পন্ন শব্দ

শব্দগঠনের ব্যাপারে সমাস একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এই সমাস সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে। তবে একটি বিষয় এখানে আলোচনা করিব। এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহা সমাসের কখনও-বা পূর্বপদ, কখনও-বা পরপদরূপে প্রচলিত। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, একই পূর্বপদের সহিত বিভিন্নার্থক পরপদ যুক্ত হইলে বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দ গঠিত হয়। আবার একই পরপদের সহিত বিভিন্নার্থক পূর্বপদ যুক্ত হইলেও বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দের সৃষ্টি হয়।

## একই পূর্বপদের সহিত বিভিন্ন অর্থবোধক পরপদের যোগ

**লোক**—লোকপাল, লোকসাহিত্য, লোকশিক্ষা, লোকসংখ্যা, লোকনিন্দা। **লীলা**—লীলাক্ষেত্র, লীলাবসান, লীলাস্থলী, লীলাচঞ্চল, লীলাখেলা। **পতি**—পতিসেবা, পতিভক্তি, পতিপদ, পতিধর্ম, পতিপ্রেম। **পথ**—পথকর, পথখরচ, পথনির্দেশ, পথচারী, পথরোধ। **ফল**—ফলকর, ফলশ্রুতি, ফলাহার, ফলভোগ, ফলহানি। **অগ্নি**—অগ্নিপরীক্ষা, অগ্নিবৃষ্টি, অগ্নিবাণ, অগ্নিমূল্য, অগ্নিযুগ। **ধন**—ধনস্থান, ধনপিশাচ, ধনকুবের, ধনধান্য, ধনদৌলত। **যোগ**—যোগাসন, যোগাযোগ, যোগবল, যোগমায়া, যোগস্নান। **রাম**—রামছাগল, রামপাখী, রামরাজ্য, রামলীলা, রামদা। **দান**—দানপত্র, দানাধিকার, দানসাগর, দানবীর, দানসজ্জা। **ক্ষয়**—ক্ষয়ক্ষতি, ক্ষয়ব্যাধি, ক্ষয়শীল, ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষয়কাশ। **আশ্রম**—আশ্রমবাসী, আশ্রমবালক, আশ্রমবিধি, আশ্রমবৃক্ষ, আশ্রমধর্ম। **আচার**—আচারনিষ্ঠ, আচারপরায়ণ, আচারব্যবহার, আচারভক্ষণ, আচারপালন। **অন্তর**—অন্তরাত্মা, অন্তরাপত্যা, অন্তদর্শন, অন্তর্বেদনা, অন্তর্যামী। **ভ্রষ্ট**—ভ্রষ্টাচার, ভ্রষ্টচরিত্র, ভ্রষ্টাচরণ, ভ্রষ্টগুণ, ভ্রষ্টস্বভাব। **শক্তি**—শক্তিশেল, শক্তিশালী, শক্তিহীন, শক্তিলাভ, শক্তিমত্তা।

## একই পরপদের সহিত বিভিন্ন অর্থবোধক পূর্বপদের যোগ

**লোক**—দেবলোক, দ্যুলোক, ভূলোক, বিষ্ণুলোক, গন্ধর্বলোক। **লীলা**—নরলীলা, জীবলীলা, ভবলীলা, দেবলীলা, কৃষ্ণলীলা। **পতি**—নরপতি, দলপতি, কমলাপতি, ভূপতি, কুলপতি। **পথ**—রাজপথ, সৎপথ, নয়নপথ, শ্রবণপথ, হাঁটাপথ। **ফল**—কর্মফল, ভাগফল, গুণফল, পরীক্ষাফল, কোষ্ঠীফল। **অগ্নি**—জঠরাগ্নি, মুখাগ্নি, মন্দাগ্নি, যজ্ঞাগ্নি, হোমাগ্নি। **ধন**—স্ত্রীধন, পুত্রধন, গোধন, পিতৃধন, পরধন। **যোগ**——নৌকাযোগ, রাত্রিযোগ, অমৃতযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ। **রাম**—বলরাম, পরশুরাম, বোকারাম, সীতারাম, রাজারাম। **দান**—গোদান, অন্নদান, বস্ত্রদান, কন্যাদান, ভিক্ষাদান। **ক্ষয়**—লোকক্ষয়, অর্থক্ষয়, আয়ুক্ষয়, রক্তক্ষয়, পুণ্যক্ষয়।—**আশ্রম**—আতুরাশ্রম, অনাথাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, উন্মাদাশ্রম। **আচার**—বীরাচার, স্ত্রী-

আচার, লোকাচার, ম্লেচ্ছাচার, দেশাচার; **অন্তর**—দেশান্তর, দ্বীপান্তর, বারান্তর, উপায়ান্তর, গ্রামান্তর। **আলয়**—বিদ্যালয়, রঙ্গালয়, যমালয়, লোকালয়, পিত্রালয়; **ভ্রষ্ট**—যূথভ্রষ্ট, চরিত্রভ্রষ্ট, পথভ্রষ্ট, কক্ষভ্রষ্ট, ধর্মভ্রষ্ট। **পরায়ণ**—ধর্মপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ, দুর্নীতিপরারণ, কর্তব্যপরায়ণ, যজ্ঞপরায়ণ। **শক্তি**—গণশক্তি, আত্মাশক্তি, নৌশক্তি, সংঘশক্তি, বাক্‌শক্তি।

**প্রয়োগ।**

পুত্রহারা জননীর শোক দেখিয়া আমার **অন্তরাত্মা** কাঁদিয়া উঠিল। **অন্তরা-পত্যা** রমণীকে অতি সাবধানে থাকিতে হয়। যোগী পুরুষের **অন্তর্দর্শনের** ক্ষমতা থাকে। এই দুঃসংবাদ শুনিয়া আমি গভীর **অন্তর্বেদনায়** মুষড়াইয়া পড়িলাম। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া কর্মপথে অগ্রসর হইতে হয়! **দেশান্তরে** গমন করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলেন। বিচারে হত্যাকারীর **দ্বীপান্তর** দণ্ড হইল। **বারান্তরে** তোমার সহিত সকল বিষয়ই আলোচনা করিব। **উপায়ান্তর** না দেখিয়া তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। **গ্রামান্তরেও** এই জনরব বিদ্যুৎগতিতে ছড়াইয়া পড়িল।

**উপসর্গ-যোগে গঠিত শব্দ।**

সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী উপসর্গাদি ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসিয়া তাহার অর্থের বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে।

**বাংলা উপসর্গ**—(১) আ-, অনা-, অ- —('না' অর্থে অথবা 'কুৎসিত' অর্থে)—আকথা, আলুনি; অনামুখো, অনাবাটা, অনাছিষ্টি; অখুশী, অহিসাবী, অকাজ, অঝর, অকুমারী, অমন্দ, অথৈ। (২) আ-, অ- —('প্রকৃষ্ট' অর্থে, স্বার্থে, সাদৃশ্যার্থে)—আরঙ্গা বা অরঙ্গা, আঁকাড়া, আকাট, আচোঠ, আগাছা, আথাম্বা; (৩) অগা-, অঘা-— ('অজ্ঞ' অর্থে)—অগারাম; অঘাচণ্ডী। (৪) অন্তর- —('গোপন' অর্থে)—অন্তর-টিপুনী। (৫) অজ- —('খুব' অর্থে)—অজ-পাড়াগায়ে। (৬) অব- —('খারাপ' অর্থে)—অবগুণ! (৭) আন্‌- —('অন্য' অর্থে)—আন্‌কোরা, আনমনা, আন্‌কো। (৮) আগ- —('অগ্র' অর্থে)—আগডাল, আগবাড়া (ভাত)। (৯) আড়- —('বক্র, অর্ধ' অর্থে)—আড়মোড়া, আড়নয়ন, আড়ময়লা, আড়বুঝো, আড়খেমটা, আড়ক্ষেপা। (১০) ঊন- —('কম' অর্থে)—ঊনপাজুরে, ঊনবুকে, ঊনবর্ষা। (১১) উভ- —('উচ্চ, চতুর্দিকে' অর্থে)—উভরায়। (১২) কু- —('নিন্দনীয়' অর্থে)—কুচাল, কুকেচ্ছা, কুচুটে ('কুচক্রী' অর্থে)। (১৩) নি-, নির-, নিশ- —('না' অর্থে)—নিখোঁজ, নির্ভরসা, নিরাম, নিশ্ছিপি। (১৪) পাতি- —('ক্ষুদ্র' অর্থে)—পাতি-কুয়া < পাত্‌কো, পাতিহাঁস, পাতিভাঁড়, পাতিলেবু। (১৫) বি-, বে- —('না' অর্থে

বা নিন্দার্থে)—বিভুঁই, বিজোড়, বিকল. বেঢপ, বেজন্মা, বে-আরাম, বে-টাইম, বে-হেড্। (১৬) ভর-, ভরা- —('পূর্ণ' অর্থে)—ভরপেট, ভরযুবতী, ভরাবাদর, ভরাতুপুর, ভরা-যৌবন। (১৭) স- —('সহিত' অর্থে)—সজোরে, সঠিক, সঘনে, স-বুট (পদাঘাত)। (১৮) সা- —('ভাল' অর্থে)—সা-জিরে. সা-মরিচ, সা-জোয়ান। (১৯) সু- —('প্রশস্ত' বা 'প্রশংসার যোগ্য' এই অর্থে)—সুছাঁদ, সুডৌল, সুগোছ. সুগড়, সুনজর। (২০) রাম- —('বড়' অর্থে)—রাম-দা, রাম-শিঙে, রাম-শালিক। (২১) হা- —(হতার্থে বা বিগতার্থে)—হাপুত, হাঘ'রে হাবাতে, হা-পিত্যেশ, হাপুতি।

**সংস্কৃত উপসর্গ**—(১) অতি- (অতিক্রমণ, অতিরিক্ত); (২) অধি- (উপরে, মধ্যে); (৩) অনু- (পরে, কোনও কিছুর দিকে); (৪) অন্তর-, অন্তঃ- (মধ্যে, ভিতরে); (৫) অপ- (দূরে, মধ্য হইতে); (৬) অপি- (ভিতরে, উপরে, সন্নিকটে); (৭) অভি- (প্রতি, উপর, দিকে, চতুর্দিকে); (৮) অব- (নিম্নে, নিম্নদিকে); (৯) আ- (প্রতি, উপরে, ঈষৎ, সম্যক্); (১০) উদ্ (উপরে, উপরের দিকে, বাহিরে); (১১) উপ- (দিকে, প্রতি, সন্নিকট); (১২) দুঃ- (মন্দ, কু); (১৩) নি- (নিম্নে, ভিতরে, মধ্যে, পূর্ণরূপে); (১৪) নিঃ- (বহির্গতি, নাই); (১৫) পরা- (দূরে, বাহিরে); (১৬) পরি- (চতুর্দিকে, ব্যাপকভাবে); (১৭) প্র- (সম্মুখে, পুরতঃ, শ্রেষ্ঠ); (১৮) প্রতি- (বিপরীতভাবে, বিরুদ্ধে, প্রত্যুত্তরে); (১৯) বি- (বিদূরে, বিশ্লিষ্ট, বাহিরে); (২০) সং- (সহিত, একত্র); (২১) সু- (মঙ্গল, ভদ্র, উৎকর্ষ উৎকৃষ্ট)। এই মোট একুশটি সংস্কৃত উপসর্গের অর্থও বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

নী (পথ দেখানো)—প্রণয়, পরিণয়, বিনয়, অভিনয়, অনুনয়।

হৃ (হরণ করা)—আহার, প্রহার, সংহার, পরিহার, উপহার, উদ্ধার, ব্যবহার।

গম্ (যাওয়া)—আগমন, অনুগমন, নির্গমন, প্রত্যাগমন, সংগম।

কৃ (করা)—অধিকার, অপকার, আকার, উপকার, প্রকার, বিকার।

ক্রম্ (পদক্ষেপ করা)—অতিক্রম, উপক্রম, নিষ্ক্রম, পরাক্রম, পরিক্রম, বিক্রম, ব্যতিক্রম।

বদ্ (বলা)—অনুবাদ, অপবাদ, প্রবাদ, বিবাদ, সংবাদ, সুবাদ।

যুজ্ (যোগ করা)—প্রয়োগ, নিয়োগ, বিয়োগ, অনুযোগ, অভিযোগ, সংযোগ।

দৃশ্ (দেখা)—অন্তর্দর্শন, নিদর্শন, পরিদর্শন, প্রদর্শন, সুদর্শন, সন্দর্শন।

**বিদেশী উপসর্গ**—(১) আম- —('সাধারণ' অর্থে)—আমদরবার, আমরাস্তা। (২) কার- —('কৌশল' অর্থে)—কারদানি, কারচুপি, কারসাজি, কারবার। (৩) খাস- —('নিজস্ব' অর্থে)—খাসমহল, খাসকামরা। (৪) গর- —('না' অর্থে)—গরমিল, গরহিসাবী

গররাজী, গরহাজির। (৫) গুম- —( 'গোপন' অর্থে )—গুমখুন, গুমসানি ( =রুদ্ধ গরম ), গুমান ( =গোপনে অহংকার ) । (৬) দর- —( 'নিম্নস্থ, অল্প, ঈষৎ' অর্থে )—দরদালান, দরপত্তনি, দরকচা ( কাঁচা ), দরপাকা, দরপোক্ত। (৭) না- —( নঞর্থে )—না-হক, না-টক, না-মিষ্টি, নাচার, নাবালক, নাখেরাজ ( =নিষ্কর ), নাখোস ( =অসন্তুষ্ট )। (৮) নিম্- —('অর্ধ' অর্থে)—নিমরাজী, নিম্‌খুন, নিম্-হাকিম, নিম্-আস্তীন, নিম্-মোল্লা। (৯) পিল- —( 'হাতী' অর্থে )—পিলখানা, পিলসুজ, পিলপা। (১০) ফি- —(প্রত্যেক)—ফি-লোক, ফি-দিন। (১১) বদ্- —(নিন্দায়)—বদরাগী, বদ্‌হাল, বদ্‌মাইস, বদ্‌লোক, বদ্‌রীত্, বদ্‌গন্ধ। (১২) বর- —বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরবাদ। (১৩) ব- —( 'সহিত' অর্থে )—বমাল, বনাম, বহাল, বকলম। (১৪) হর- —(প্রত্যেক, সর্ব) হর-বোল, হর-সাল, হর-রোজ, হর-ঘড়ি। (১৫) হেড্- —(=Head)—হেড্-পণ্ডিত, হেড্-মুহুরী, হেড্-মৌলবী। (১৬) হাফ্- —(=Half)—হাফ্-আখড়াই, হাফ্-গেরস্ত ইত্যাদি। (১৭) ফুল-—( =Full )—ফুল-বাবু, ফুল-সার্ট। (১৮) সব্- ( =Sub) —সব্-ডেপুটি, সব্-জজ।

**প্রয়োগ**

**আলুনি** তরকারি সে হাত দিয়েও স্পর্শ করল না। **নিশ্ছিপি** বোতলের ওষুধটা নষ্ট হয়ে গেছে। একদা এই বাংলা দেশে নীলকর সাহেবেরা **স-বুট** পদাঘাতে গর্ভবতী রমণীর প্রাণনাশ করেছিল। গোপার দু'খানি হাত কেমন **সুডৌল**! **হাবাতের** বেটার মুখে আবার পোলাও-কালিয়ার গল্প! প্রকৃত **বন্ধুপ্রণয়** এই পৃথিবীতে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তরুণ-তরুণীর **প্রণয়** সময়ে **পরিণয়ে** রূপান্তরিত হয়। বিদ্যাই মানুষকে বিনয়-গুণে **সম্পৃক্ত করিয়া** থাকে। আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চের **অভিনয়ে** শিশিরকুমারই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন। মাথার দিব্যি দিয়া, **অনুনয়** করিয়া, কখনও ভালবাসা পাওয়া যায় না। মনের সঙ্গে **গরমিল** হলেই **বদ্‌লোকে** **না-হক** ( অর্থাৎ শুধু শুধু ) গালমন্দ পেড়ে থাকে। পরীক্ষা দিবার সময়ে কোন কোন ছাত্র **হর ঘড়ি** মলমূত্রত্যাগের জন্য বাইরে গিয়ে থাকে। **ফি-দিন হেড্-পণ্ডিত-মশায়** আমাদের বাড়তে সন্ধ্যেবেলায় বেড়াতে আসেন।

## অনুশীলনী

[ এক ] উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও :—তদ্ধিত প্রত্যয়, কৃৎ প্রত্যয়। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭, '৫৮**

[ দুই ] চৈনিক, সার্বজনীন, শ্রীমন্ত, বিবিয়ানা, এমনতর, চালবাজী, নকলনবিশ, রোমশ—ইহাদের মধ্য হইতে যে কোনও পাঁচটি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিজ্ঞান ) '৫৬**

[ তিন ] নিম্নের যে কোনও পাঁচটি শব্দ কি করিয়া গঠিত হইল তাহা বল :—ফেনিল, মহত্ত্ব, বাড়ন্ত, রোরুদ্যমান, বর্তমান, সর্বথা, পাশ্চাত্ত্য ও বৈমাত্রেয়।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( কলা ) '৫৬**

[ চার ] কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের পার্থক্য কি? তিনটি কৃৎ প্রত্যয়ের নাম কর ও কৃদন্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর। **ক. বি. মাধ্যমিক ( কলা ) '৫৬**

[ পাঁচ ] প্রত্যয় ও উপসর্গের প্রভেদ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও ;

**রা. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫**

[ ছয় ] খাঁটি বাংলা শব্দে বিদেশী প্রত্যয়যোগের পাঁচটি উদাহরণ দিয়া তাহারা কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা বল। **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৩**

[ সাত ] নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে কোনও পাঁচটির প্রকৃতি, প্রত্যয় এবং প্রত্যয়ের অর্থ লিখ :—দাশরথি, বিশ্বজনীন, অকর্মণ্য, সৈন্ধব, শ্রমিক, মহিমা, নৌকা, পাতলা, কুঠরী, সোনালী, হলদে, বড়াই, রেশমী, চিমটি, গরু, ঘুমন্ত, উঠতি, রাঁধুনী, ডুবুরা, পোড়ো ; একলা, হাবিলদার, মেঠো, লাঠিয়াল, ঠোংকা, রান্না, ডাকু, হবু, জ্যান্ত, বৈঠক। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৫, '৫৭, '৫৮**

[ আট ] 'বিত্ত' শব্দের যোগে গঠিত, বাংলা ভাষায় সচরাচর প্রচলিত একটি শব্দের উল্লেখ ও অর্থ নির্দেশ কর। ( উত্তর, 'মধ্যবিত্ত' শব্দ এবং ইহার অর্থ 'ধনী ও দরিদ্রের মধ্যবর্তী অবস্থাপন্ন গৃহস্থ'। ) **ক. বি. মাধ্যমিক '৫৩**

[ নয় ] নিম্নোদ্ধৃত শব্দগুলির যে-কোন একটিকে পরপদ তথা দ্বিতীয় উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিয়া পাঁচটি যৌগিক শব্দ গঠন কর এবং উহাদের প্রত্যেকটিকে লইয়া বাক্য রচনা কর :—অন্তর, আলয়, পরায়ণ, ভ্রষ্ট, লোক। **ক. বি. মাধ্যমিক '৪৮**

[ দশ ] -দার, -ওয়ালা, -কর এবং -ঈ প্রত্যয়ান্ত ব্যক্তিবাচক বা শ্রেণীবাচক শব্দাদির দৃষ্টান্তবাহী বাক্য রচনা কর। **ক. বি. মাধ্যমিক '৩৭**

[ এগারো ] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে পাঁচটির সঙ্গে সমার্থক শব্দ যোজনা করিয়া উহাদের সম্পূর্ণ দ্বৈতরূপটি উদ্ধার কর ও এই যুগ্ম শব্দসমূহের প্রয়োগ বুঝাইবার জন্য পাঁচটি বাক্য রচনা কর :— দর— ; বন— ; কুটুম্ব— ; লোক— ; সৈন্য— ; আদর— ; লোহা— ; বিবাদ— ; রাত— ; ছল—। ( **উত্তর-সংকেত**। দরদস্তুর ; **বনজঙ্গল** ; কুটুম্বস্বজন ; লোকজন ; সৈন্যসামন্ত ; আদরযত্ন ; লোহা-লক্কড় ; বিবাদ-বিসংবাদ ; রাতারাতি ; ছলচাতুরী—এই শব্দাদি অবলম্বনে বাক্যাবলী রচনা করিতে হইবে )। **ক. বি. বি. এ. '৫৪**

দ্বারা তিনটি সমস্ত পদ রচনা কর ঃ—পদ্ম, মাতা, পুষ্প, সমাজ, পতি, জায়া, গন্ধ, নদী, ধনুঃ, বিদ্বান্। ( **উত্তর**। পদ্মগন্ধা ; নদীমাতৃক ; পুষ্পধন্বা ; দম্পতি ; বিদ্বৎসমাজ। )
**ক. বি. বি. এ. '৫১**

[ তেরো ] নিম্নলিখিত ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় সংজ্ঞা ও বিধিগুলির যে কোন তিনটির দৃষ্টান্তসহিত বিশদ পরিচয় দাও ঃ—নিপাতনে সন্ধি, সর্বনাম হইতে গঠিত তদ্ধিত পদ, নামীকরণ।
**ক. বি. বি. এ. '৫০**

[ চৌদ্দ ] উপসর্গ প্রয়োগে অর্থান্তর সংঘটনের উদাহরণ দাও। **ক. বি. বি. এ. '৪৮**

[ পনেরো ] প্র-, পরি-, বি- এবং অভি- এই চারিটি উপসর্গের যোগে নী ধাতুর অর্থপরিবর্তন দর্শাও।
**ক. বি. বি. এ.' ৪৪**

[ ষোলো ] প্র, পরা, অপ, সম্, নি—এই পাঁচটি উপসর্গ প্রয়োগ করিয়া পাঁচটি শব্দ গঠন কর এবং ঐ প্রত্যেকটি শব্দের দ্বারা এক একটি বাক্য রচনা কর।
**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিজ্ঞান ) '৫৯**

[ সতেরো ] তদ্ধিত ও কৃদন্তের অথবা সন্ধি ও সমাসের উদাহরণসহ পার্থক্য দেখাও।
**ক. বি. বি. এ. '৫৬**

[ আঠারো ] কলেজের প্রতিষ্ঠাদিবস অথবা সরস্বতীপূজা উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে একটি পত্র রচনা কর। পত্রমধ্যে সমাসনিষ্পন্ন পাঁচটি শব্দ ব্যবহার করিবে এবং ঐ পাঁচটি শব্দকে চিহ্নিত করিবার জন্য উহাদের নিম্নে রেখা টানিয়া দিবে।
**ক. বি. মাধ্যমিক ( কলা ) '৫৮**

[ উনিশ ] বাংলা ভাষায় সন্ধি কতদূর সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুগামী তাহা দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা কর।
**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৯**

[ কুড়ি ] বাংলা ভাষায় কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের যে সংস্কৃত-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র রীতি দেখা যায় তাহার উদাহরণ দাও।
**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৯**

[ একুশ ] নিম্নোদ্ধৃত শব্দগুলির যে কোন একটিকে একবার পূর্বপদ এবং আরেকবার পরপদ হিসাবে গ্রহণ করিয়া পাঁচ পাঁচটি যৌগিক শব্দ গঠন কর। অতঃপর গঠিত দশটি শব্দ লইয়া পৃথক্ পৃথক্ বাক্য রচনা কর ঃ—অগ্নি, ধন, রাম, পথ, ফল, দান।

[ বাইশ ] খাঁটি বাংলা শব্দগঠনে ও বাক্যরচনায় নিম্নোদ্ধৃত উপসর্গগুলির প্রয়োগবৈশিষ্ট্য দর্শাও ঃ—অনা-, দর-, নিশ-, পাতি-, ভরা, হা-, গর-, না-, ফি-, হেড্-, হাফ্-, ফুল্-, সব-, আম-, সা-, নিম্-, রাম্-, অগা-, অজ-, উন-, আড়-, কার-।

[ তেইশ ] নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ—দেওন ; মাগ্না ; জান্তা ; ঝালাই ; ঘরভাঙ্গানী ; ধুনুরী ; বকুনি ; বাজিয়ে ; গুনতি ; রঞ্জক ; সবিতা ; ক্ষেমংকর।

# চতুর্থ অধ্যায়

## শব্দ গঠন ঃ পদপরিবর্তন

### প্রথম পর্যায়

বিশেষ্য বিশেষণ

উপলব্ধি—উপলব্ধ, উপলভ্য,
আঘাত—আহত, আঘাতী
বিদ্যা—বিদ্বান্
পরিচয়—পরিচিত, পরিচায়ক
বায়ু—বায়বীয়, বায়ব্য
আরোহণ—আরূঢ়, আরোহী
সাহিত্য—সাহিত্যিক
বিদ্যুৎ—বৈদ্যুতিক, বৈদ্যুত, বিদ্যুত্বান্
গান—গীত, গেয়, গায়ক, গায়েন
পিতৃ-পিতামহ—পৈতৃক
কৌতূহল—কৌতূহলী
অধ্যয়ন—অধীত, অধ্যেয়, অধ্যেতব্য
প্রার্থনা—প্রার্থিত, প্রার্থী, প্রার্থনীয়
স্পর্শ—স্পৃষ্ট
পান—পানীয়, পীত, পেয়
কামনা—কাম্য, কামনীয়
স্ত্রী—স্ত্রৈণ
পুর—পৌর
পর—পরকীয়
হেম—হৈম
গিরি—গৈরিক
অধিবাস—অধিবাসী
অণু—আণব, আণবিক
ধর্ম—ধর্ম্য

বিশেষ্য বিশেষণ

অভিধা—অভিহিত
অভিধান—আভিধানিক
জন্তু—জান্তব
প্রমাণ—প্রামাণ্য, প্রামাণিক
খেদ—খিন্ন
বিপ্লব—বিপ্লুত, বৈপ্লবিক
ইয়ত্তা—ইয়ৎ
অবসান—অবসিত
ভঙ্গ—ভগ্ন
শরৎ—শারদ, শারদীয়
শ্রম—শ্রান্ত, শ্রমিক
যশ—যশস্বী
বাক্—বাগ্মী, বাচাল
পুরুষ—পৌরুষেয়
মৃৎ—মৃন্ময়
সংখ্যা—সাংখ্য
বস্তু—বাস্তব, বাস্তবিক
সূর্য—সৌর
ধ্যান—ধ্যানী, ধ্যেয়
আসন—আসীন
ফেন—ফেনিল
মুখ—মৌখিক, মুখ্য, মুখর
বিধান—বিহিত, বিধেয়
বপন—উপ্ত
পংক্তি—পাংক্তেয়
পাঠ—পাঠ্য, পঠিত

বিশেষ্য বিশেষণ

অরণ্য—আরণ্য
গো—গব্য
স্বাস্থ্য—স্বস্থ
আদি—আদ্য, আদিম
মোহ—মুগ্ধ, মূঢ়
অগ্নি—আগ্নেয়
উপনিবেশ—ঔপনিবেশিক
প্রতীচী—প্রতীচ্য
প্রাচী—প্রাচ্য
স্মৃতি—স্মার্ত
ফল—ফলিত
বর্ষ—বার্ষিক
উপদ্রব—উপদ্রুত
মদ—মত্ত
লয়—লীন
লোম—লোমশ
প্রত্যয়—প্রতীত
ভূমি—ভৌম
পুষ্প—পুষ্পিত
পঙ্ক—পঙ্কিল
মনঃ—মানসিক
নিশা—নৈশ
চক্ষু—চাক্ষুষ
ন্যায়—নৈয়ায়িক
মাংস—মাংসল
পাণ্ডু—পাণ্ডুর

| বিশেষ্য বিশেষণ | বিশেষ্য বিশেষণ | বিশেষ্য বিশেষণ |
|---|---|---|
| ভেদ—ভিন্ন | জাতি—জাতীয় | শিক্ষা—শিক্ষিত |
| সর্বাঙ্গ—সর্বাঙ্গীণ | ঋষি—আর্ষ | শোক—শোচ্য, শোচনীয় |
| অন্ত—অন্তিম, অন্ত্য | গ্রাম—গ্রাম্য, গ্রামীণ | দর্শন—দৃষ্ট, দার্শনিক |
| অগ্র—অগ্র্য, অগ্রিম | বন্ধু—বান্ধব | চন্দ্র—চান্দ্র |
| কণ্ঠ—কণ্ঠ্য | প্রশ্ন—পৃষ্ট, প্রষ্টব্য | আয়ু—আয়ুষ্য |
| কর্ম—কর্মঠ | হৃদয়—হৃদ্য | সিন্ধু—সৈন্ধব |
| বীর্য—বীর | মধু—মধুর | ব্যাস—বৈয়াসিক |
| গ্রহণ—গ্রাহ্য | অনুবাদ—অনূদিত | গ্রন্থ—গ্রথিত, গ্রন্থিত |

## চলিত ভাষায় কয়েকটি উদাহরণ

| | | |
|---|---|---|
| শান্তিপুর—শান্তিপুরী | সোনা—সোনালি ( লী ) | ধার—ধারাল |
| ঘর—ঘরোয়া | রং—রংদার | মাটি—মেটে |
| পাটনা—পাটনাই | পুষ্টি—পোষ্টাই | গাঁ—গেঁয়ো |
| মোগল—মোগলাই | ঢাকা—ঢাকাই | বন—বুনো |
| মেয়ে—মেয়েলি | গাছ—গেছো | কাঠ—কেঠো |
| ঝড়—ঝড়ো | দাঁত—দাঁতাল, দেঁতো | খেয়াল—খেয়ালী |
| ভূত—ভূতুড়ে | ধান—ধেনো | জল—জ'লো |
| হিংসা—হিংসুটে | মেঘ—মেঘলা | বেগুন—বেগুনী ( নি ) |

## প্রয়োগ

**যশস্বী** ব্যক্তিই লোকসমাজে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। **বাগ্মী** সুরেন্দ্রনাথের খ্যাতি আজও এই ভারতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। **বাচালের** কথায় কেহ বিশ্বাস করে না। কাহারও কাহারও মতে, বৈদিক সূক্তাদি **পৌরষেয়** রচনা নহে। কপিল মুনি **সাংখ্যদর্শনের** প্রণেতা। **সৌর** জগতের অনেক তত্ত্বই বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এখনও সমস্ত **বায়বীয়** পদার্থের প্রকৃতি নির্ধারিত হয় নাই। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাবেলার **বায়ব্য** স্নান স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণকর। পদ্মাসনে **আসীন** যোগীর ধ্যানরত সৌম্য মূর্তি দেখিলে সারা অন্তর আপনা হইতেই শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসে। হিমালয়ের গোমুখী-গহ্বর হইতে বাহির হইয়া গঙ্গা যখন সমতলভূমির উপর দিয়া বহিয়া চলে, তখন তাহার তরঙ্গমালা স্বভাবতঃই **ফেনিল** হইয়া থাকে। **মৌখিক** শিষ্টাচারে সাময়িক ফল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু **মুখ্য** ফল পাওয়া যাইতে পারে না। বিহগ-কাকলীতে তখন কাননভূমি **মুখর** হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির **বেদ-বিহিত** রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মনুষ্যসমাজে বাস করিতে হইলে পরোপকার সর্বতোভাবে **বিধেয়**।

# চতুর্থ অধ্যায়

## শব্দ গঠন ঃ পদপরিবর্তন

### প্রথম পর্যায়

বিশেষ্য বিশেষণ

উপলব্ধি—উপলব্ধ, উপলভ্য,
আঘাত—আহত, আঘাতী
বিদ্যা—বিদ্বান্
পরিচয়—পরিচিত, পরিচায়ক
বায়ু—বায়বীয়, বায়ব্য
আরোহণ—আরূঢ়, আরোহী
সাহিত্য—সাহিত্যিক
বিদ্যুৎ—বৈদ্যুতিক, বৈদ্যুত, বিদ্যুত্বান্
গান—গীত, গেয, গায়ক, গায়েন
পিতৃ-পিতামহ—পৈতৃক
কৌতূহল—কৌতূহলী
অধ্যয়ন—অধীত, অধ্যেয়, অধ্যেতব্য
প্রার্থনা—প্রার্থিত, প্রার্থী, প্রার্থনীয়
স্পর্শ—স্পৃষ্ট
পান—পানীয়, পীত, পেয়
কামনা—কাম্য, কামনীয়
স্ত্রী—স্ত্রৈণ
পুর—পৌর
পর—পরকীয়
হেম—হৈম
গিরি—গৈরিক
অধিবাস—অধিবাসী
অণু—আণব, আণবিক
ধর্ম—ধর্ম্য

বিশেষ্য বিশেষণ

অভিধা—অভিহিত
অভিধান—আভিধানিক
জন্তু—জান্তব
প্রমাণ—প্রামাণ্য, প্রামাণিক
খেদ—খিন্ন
বিপ্লব—বিপ্লুত, বৈপ্লবিক
ইয়ত্তা—ইয়ৎ
অবসান—অবসিত
ভঙ্গ—ভগ্ন
শরৎ—শারদ, শারদীয়
শ্রম—শ্রান্ত, শ্রমিক
যশ—যশস্বী
বাক্—বাগ্মী, বাচাল
পুরুষ—পৌরুষেয়
মৃৎ—মৃন্ময়
সংখ্যা—সাংখ্য
বস্তু—বাস্তব, বাস্তবিক
সূর্য—সৌর
ধ্যান—ধ্যানী, ধ্যেয়
আসন—আসীন
ফেন—ফেনিল
মুখ—মৌখিক, মুখ্য, মুখর
বিধান—বিহিত, বিধেয়
বপন—উপ্ত
পংক্তি—পাংক্তেয়
পাঠ—পাঠ্য, পঠিত

বিশেষ্য বিশেষণ

অরণ্য—আরণ্য
গো—গব্য
স্বাস্থ্য—স্বস্থ
আদি—আদ্য, আদিম
মোহ—মুগ্ধ, মূঢ়
অগ্নি—আগ্নেয়
উপনিবেশ—ঔপনিবেশিক
প্রতীচী—প্রতীচ্য
প্রাচী—প্রাচ্য
স্মৃতি—স্মার্ত
ফল—ফলিত
বর্ষ—বার্ষিক
উপদ্রব—উপদ্রুত
মদ—মত্ত
লয়—লীন
লোম—লোমশ
প্রত্যয়—প্রতীত
ভূমি—ভৌম
পুষ্প—পুষ্পিত
পঙ্ক—পঙ্কিল
মনঃ—মানসিক
নিশা—নৈশ
চক্ষু—চাক্ষুষ
ন্যায়—নৈয়ায়িক
মাংস—মাংসল
পাণ্ডু—পাণ্ডুর

| বিশেষ্য বিশেষণ | বিশেষ্য বিশেষণ | বিশেষ্য বিশেষণ |
| --- | --- | --- |
| ভেদ—ভিন্ন | জাতি—জাতীয় | শিক্ষা—শিক্ষিত |
| সর্বাঙ্গ—সর্বাঙ্গীণ | ঋষি—আর্ষ | শোক—শোচ্য, শোচনীয় |
| অন্ত—অন্তিম, অন্ত্য | গ্রাম—গ্রাম্য, গ্রামীণ | দর্শন—দৃষ্ট, দার্শনিক |
| অগ্র—অগ্র্য, অগ্রিম | বন্ধু—বান্ধব | চন্দ্র—চান্দ্র |
| কণ্ঠ—কণ্ঠ্য | প্রশ্ন—পৃষ্ট, প্রষ্টব্য | আয়ু—আয়ুষ্য |
| কর্ম—কর্মঠ | হৃদয়—হৃদ্য | সিন্ধু—সৈন্ধব |
| বীর্য—বীর | মধু—মধুর | ব্যাস—বৈয়াসিক |
| গ্রহণ—গ্রাহ্য | অনুবাদ—অনূদিত | গ্রন্থ—গ্রথিত, গ্রন্থিত |

## চলিত ভাষায় কয়েকটি উদাহরণ

| | | |
| --- | --- | --- |
| শান্তিপুর—শান্তিপুরী | সোনা—সোনালি ( লী ) | ধার—ধারাল |
| ঘর—ঘরোয়া | রং—রংদার | মাটি—মেটে |
| পাটনা—পাটনাই | পুষ্টি—পোষ্টাই | গাঁ—গেঁয়ো |
| মোগল—মোগলাই | ঢাকা—ঢাকাই | বন—বুনো |
| মেয়ে—মেয়েলি | গাছ—গেছো | কাঠ—কেঠো |
| ঝড়—ঝড়ো | দাঁত—দাঁতাল, দেঁতো | খেয়াল—খেয়ালী |
| ভূত—ভুতুড়ে | ধান—ধেনো | জল—জ'লো |
| হিংসা—হিংসুটে | মেঘ—মেঘলা | বেগুন—বেগুনী ( নি ) |

## প্রয়োগ

**যশস্বী** ব্যক্তিই লোকসমাজে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। **বাগ্মী** সুরেন্দ্রনাথের খ্যাতি আজও এই ভারতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। **বাচালের** কথায় কেহ বিশ্বাস করে না। কাহারও কাহারও মতে, বৈদিক সূক্তাদি **পৌরুষেয়** রচনা নহে। কপিল মুনি **সাংখ্যদর্শনের** প্রণেতা। **সৌর** জগতের অনেক তত্ত্বই বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এখনও সমস্ত **বায়বীয়** পদার্থের প্রকৃতি নির্ধারিত হয় নাই। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাবেলায় **বায়ব্য** স্নান স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণকর। পদ্মাসনে **আসীন** যোগীর ধ্যানরত সৌম্য মূর্তি দেখিলে সারা অন্তর আপনা হইতেই শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসে। হিমালয়ের গোমুখী-গহ্বর হইতে বাহির হইয়া গঙ্গা যখন সমতলভূমির উপর দিয়া বহিয়া চলে, তখন তাহার তরঙ্গমালা স্বভাবতঃই **ফেনিল** হইয়া থাকে। **মৌখিক** শিষ্টাচারে সাময়িক ফল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু **মুখ্য** ফল পাওয়া যাইতে পারে না। বিহগ-কাকলীতে তখন কাননভূমি **মুখর** হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির **বেদ-বিহিত** রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মনুষ্যসমাজে বাস করিতে হইলে পরোপকার সর্বতোভাবে **বিধেয়**।

# চতুর্থ অধ্যায়

## শব্দ গঠন : পদপরিবর্তন

### প্রথম পর্যায়

বিশেষ্য বিশেষণ

উপলব্ধি—উপলব্ধ, উপলভ্য,
আঘাত—আহত, আঘাতী
বিদ্যা—বিদ্বান্
পরিচয়—পরিচিত, পরিচায়ক
বায়ু—বায়বীয়, বায়ব্য
আরোহণ—আরূঢ়, আরোহী
সাহিত্য—সাহিত্যিক
বিদ্যুৎ—বৈদ্যুতিক, বৈদ্যুত, বিদ্যুত্বান্
গান—গীত, গেয়, গায়ক, গায়েন
পিতৃ-পিতামহ—পৈতৃক
কৌতূহল—কৌতূহলী
অধ্যয়ন—অধীত, অধ্যেয়, অধ্যেতব্য
প্রার্থনা—প্রার্থিত, প্রার্থী, প্রার্থনীয়
স্পর্শ—স্পৃষ্ট
পান—পানীয়, পীত, পেয়
কামনা—কাম্য, কামনীয়
স্ত্রী—স্ত্রৈণ
পুর—পৌর
পর—পরকীয়
হেম—হৈম
গিরি—গৈরিক
অধিবাস—অধিবাসী
অণু—আণব, আণবিক
ধর্ম—ধর্ম্য

বিশেষ্য বিশেষণ

অভিধা—অভিহিত
অভিধান—আভিধানিক
জন্তু—জান্তব
প্রমাণ—প্রামাণ্য, প্রামাণিক
খেদ—খিন্ন
বিপ্লব—বিপ্লুত, বৈপ্লবিক
ইয়ত্তা—ইয়ৎ
অবসান—অবসিত
ভঙ্গ—ভগ্ন
শরৎ—শারদ, শারদীয়
শ্রম—শ্রান্ত, শ্রমিক
যশ—যশস্বী
বাক্—বাগ্মী, বাচাল
পুরুষ—পৌরুষেয়
মৃৎ—মৃন্ময়
সংখ্যা—সাংখ্য
বস্তু—বাস্তব, বাস্তবিক
সূর্য—সৌর
ধ্যান—ধ্যানী, ধ্যেয়
আসন—আসীন
ফেন—ফেনিল
মুখ—মৌখিক, মুখ্য, মুখর
বিধান—বিহিত, বিধেয়
বপন—উপ্ত
পংক্তি—পাংক্তেয়
পাঠ—পাঠ্য, পঠিত

বিশেষ্য বিশেষণ

অরণ্য—আরণ্য
গো—গব্য
স্বাস্থ্য—স্বস্থ
আদি—আদ্য, আদিম
মোহ—মুগ্ধ, মূঢ়
অগ্নি—আগ্নেয়
উপনিবেশ—ঔপনিবেশিক
প্রতীচী—প্রতীচ্য
প্রাচী—প্রাচ্য
স্মৃতি—স্মার্ত
ফল—ফলিত
বর্ষ—বার্ষিক
উপদ্রব—উপদ্রুত
মদ—মত্ত
লয়—লীন
লোম—লোমশ
প্রত্যয়—প্রতীত
ভূমি—ভৌম
পুষ্প—পুষ্পিত
পঙ্ক—পঙ্কিল
মনঃ—মানসিক
নিশা—নৈশ
চক্ষু—চাক্ষুষ
ন্যায়—নৈয়ায়িক
মাংস—মাংসল
পাণ্ডু—পাণ্ডুর

| বিশেষ্য বিশেষণ | বিশেষ্য বিশেষণ | বিশেষ্য বিশেষণ |
|---|---|---|
| ভেদ—ভিন্ন | জাতি—জাতীয় | শিক্ষা—শিক্ষিত |
| সর্বাঙ্গ—সর্বাঙ্গীণ | ঋষি—আর্ষ | শোক—শোচ্য, শোচনীয় |
| অন্ত—অন্তিম, অন্ত্য | গ্রাম—গ্রাম্য, গ্রামীণ | দর্শন—দৃষ্ট, দার্শনিক |
| অগ্র—অগ্র্য, অগ্রিম | বন্ধু—বান্ধব | চন্দ্র—চান্দ্র |
| কণ্ঠ—কণ্ঠ্য | প্রশ্ন—পৃষ্ট, প্রষ্টব্য | আয়ু—আয়ুষ্য |
| কর্ম—কর্মঠ | হৃদয়—হৃদ্য | সিন্ধু—সৈন্ধব |
| বীর্য—বীর | মধু—মধুর | ব্যাস—বৈয়াসিক |
| গ্রহণ—গ্রাহ্য | অনুবাদ—অনূদিত | গ্রন্থ—গ্রথিত, গ্রন্থিত |

## চলিত ভাষায় কয়েকটি উদাহরণ

| | | |
|---|---|---|
| শান্তিপুব—শান্তিপুরী | সোনা—সোনালি ( লী ) | ধার—ধারাল |
| ঘর—ঘরোয়া | রং—রংদার | মাটি—মেটে |
| পাটনা—পাটনাই | পুষ্টি—পোষ্টাই | গাঁ—গেঁয়ো |
| মোগল—মোগলাই | ঢাকা—ঢাকাই | বন—বুনো |
| মেয়ে—মেয়েলি | গাছ—গেছো | কাঠ—কেঠো |
| ঝড়—ঝড়ো | দাঁত—দাঁতাল, দেঁতো | খেয়াল—খেয়ালী |
| ভূত—ভূতুড়ে | ধান—ধেনো | জল—জ'লো |
| হিংসা—হিংসুটে | মেঘ—মেঘলা | বেগুন—বেগুনী ( নি ) |

## প্রয়োগ

**যশস্বী** ব্যক্তিই লোকসমাজে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। **বাগ্মী** সুরেন্দ্রনাথের খ্যাতি আজও এই ভারতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। **বাচালের** কথায় কেহ বিশ্বাস করে না। কাহারও কাহারও মতে, বৈদিক সূক্তাদি **পৌরষেয়** রচনা নহে। কপিল মুনি **সাংখ্যদর্শনের** প্রণেতা। **সৌর** জগতের অনেক তত্ত্বই বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এখনও সমস্ত **বায়বীয়** পদার্থের প্রকৃতি নির্ধারিত হয় নাই। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাবেলায় **বায়ব্য** স্নান স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণকর। পদ্মাসনে **আসীন** যোগীর ধ্যানরত সৌম্য মূর্তি দেখিলে সারা অন্তর আপনা হইতেই শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসে। হিমালয়ের গোমুখী-গহ্বর হইতে বাহির হইয়া গঙ্গা যখন সমতলভূমির উপর দিয়া বহিয়া চলে, তখন তাহার তরঙ্গমালা স্বভাবতঃই **ফেনিল** হইয়া থাকে। **মৌখিক** শিষ্টাচারে সাময়িক ফল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু **মুখ্য** ফল পাওয়া যাইতে পারে না। বিহগ-কাকলীতে তখন কাননভূমি **মুখর** হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির **বেদ-বিহিত** রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মনুষ্যসমাজে বাস করিতে হইলে পরোপকার সর্বতোভাবে **বিধেয়**।

## দ্বিতীয় পর্যায়

| বিশেষণ বিশেষ্য | বিশেষণ বিশেষ্য | বিশেষণ বিশেষ্য |
|---|---|---|
| প্রপীড়িত—প্রপীড়ন | প্রবীণ—প্রবীণতা, প্রাবীণ্য | অবহিত—অবধান |
| আহৃত—আহরণ | প্রতিকূল—প্রতিকূলতা, প্রাতিকূল্য | সুরভি—সৌরভ |
| অনাদৃত—অনাদর | | সৎ—সত্তা, সত্ত্ব |
| সুগন্ধ—সৌগন্ধ্য | গুরু—গুরুত্ব, গৌরব, গরিমা | দীর্ঘ—দৈর্ঘ্য, দ্রাঘিমা |
| দক্ষ—দক্ষতা, দাক্ষ্য | চতুর—চাতুরী | মন্দ—মান্দ্য |
| পরাক্রান্ত—পরাক্রম | বুদ্ধিমান্—বুদ্ধিমত্তা | অরুণ—অরুণিমা |
| বিপ্রলব্ধ—বিপ্রলম্ভ | নিকট—নৈকট্য | মধুর—মাধুর্য, মাধুরী, মধুরতা, মধুরিমা, মধুরত্ব |
| অনভ্যস্ত—অনভ্যাস | অবসন্ন—অবসাদ | |
| প্রণীত—প্রণয়ন, প্রণেতা | ব্যাহত—ব্যাঘাত | রক্ত—রাগ, রক্তিমা |
| নিষ্কর্ম—নিষ্কর্মা, নৈষ্কর্মতা, নিষ্কর্মত্ব | ইষ্ট, ঐচ্ছিক—ইচ্ছা | চেতন—চৈতন্য |
| সহায়—সাহায্য, সহায়তা | বৈধ—বিধি | মহৎ—মহিমা, মহত্ত্ব |
| উচিত—ঔচিত্য | তামসিক—তমঃ | দুরাত্মা—দৌরাত্ম্য |
| প্রসন্ন—প্রসাদ | শুষ্ক—শোষ | বিদগ্ধ—বৈদগ্ধ্য |
| সংক্ষুব্ধ—সংক্ষোভ | সৌম্য—সোম | জড়—জাড্য, জড়িমা |
| শিথিল—শৈথিল্য, শিথিলতা | ঋজু—ঋজুতা, আর্জব | বিষম—বৈষম্য |
| প্রিয়—প্রীতি, প্রেম | শূর—শৌর্য | কৃশ—কার্শ্য |
| অতীত—অত্যয় | বহু—ভূমা | হ্রস্ব—হ্রাস |
| উজ্জ্বল—ঔজ্জ্বল্য | সম্পন্ন—সম্পদ | দৃঢ়—দৃঢ়তা, দার্ঢ্য |
| অভিজাত—আভিজাত্য | কুশল—কৌশল | সুকুমার—সৌকুমার্য |
| নীল—নীলিমা | শীত—শৈত্য | লঘু—লঘিমা |
| নিপুণ—নিপুণতা, নৈপুণ্য | সুন্দর—সৌন্দর্য | আভ্যন্তরীণ—অভ্যন্তর |
| মলিন—মালিন্য, মলিনতা | মৃদু—মৃদুতা | মূর্খ—মূর্খতা |

### চলিত বাংলায় কয়েকটি উদাহরণ

| | | |
|---|---|---|
| ইতর—ইতরামি | গিন্নী—গিন্নীপনা | মেজাজী—মেজাজ |
| ধূর্ত—ধূর্তামি, ধূর্তপনা | পাকা—পাকামি | বাবু—বাবুয়ানা, বাবুগিরি |
| কুঁড়ে—কুঁড়েমি | নকল—নকলনবিশ | চতুর—চতুরালি |
| বড়—বড়াই | দীঘ—দীঘল | বুড়ো—বুড়োমি |

### প্রয়োগ

**ঔচিত্য** বিচার না করিয়া কার্য করিলে পরিণামে কষ্ট পাইতে হয়। বিধির **বিধানে** পাপীকে পরিণামে দুঃখক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ভগবদ্-**প্রসাদে** তিনি কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন। বিরহী জনের হৃদয়ের **সংক্ষোভ** কয়জনেই-বা

বুঝিতে পারে! কর্মময় জীবনে **অবসাদকে** এড়াইয়া যাইতে হইবে। নব নব **ব্যাঘাতকে** জয় করিবার সাহস ও ধৈর্য আজ সঞ্চয় করিতে হইবে। **ইচ্ছাই** মানুষের কর্ম-শক্তিকে জাগাইয়া রাখে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্য বঙ্গ-সম্প্রদায় সামাজিক **বিধি** লঙ্ঘন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। ছাত্রজীবনে **বাবুগিরি** আদৌ শোভনীয় নহে। বাংলা রামায়ণ **প্রণেতাদের** মধ্যে কৃত্তিবাসই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়াছেন। অক্লান্তলেখক রবীন্দ্রনাথ প্রচুর বাংলা গ্রন্থ **প্রণয়ন** করিয়াছেন। কর্মত্যাগে **নৈষ্কর্ম্য** অর্জিত হয় না, অর্জিত হয় **নিষ্কর্মত্ব**। গীতা বলেন, **নিষ্কর্মতা** পরিত্যাজ্য আর **নৈষ্কর্ম্য** একান্তভাবে কাম্য। বৈষ্ণব-কবি বিদ্যাপতি শব্দের **মধুরতার** সহিত মনের **মাধুরী** মিশাইয়া যে **মাধুর্যরস** পরিবেশন করিয়াছেন, তাহার **মধুরিমা** আস্বাদ করিবার ক্ষমতা কয়জনেরই-বা আছে?

## তৃতীয় পর্যায়

| অব্যয় বিশেষ্য | সর্বনাম বিশেষ্য | বিশেষ্য গুণবাচক বিশেষ্য |
|---|---|---|
| তথা—তথ্য | মৎ—মদীয় | পুরোহিত—পৌরোহিত্য |
| সহসা—সাহস | তৎ—তদীয় | ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ্য |
| পৃথক্—পার্থক্য | ভবৎ—ভবদীয় | ভাস্কর—ভাস্কর্য |
| কেবল—কৈবল্য | যৎ—যাদৃশ | স্থপতি—স্থাপত্য |
| যুগপৎ—যৌগপদ্য | অদস্—অমুক | পিতা—পিতৃব্য |
| সুষ্ঠু—সৌষ্ঠব | স্ব—স্বীয়, স্বকীয় | সহচর—সাহচর্য |
| | | মিত্র—মৈত্রী |
| **অব্যয় বিশেষণ** | **সর্বনাম অব্যয়** | সুজন—সৌজন্য |
| অকস্মাৎ—আকস্মিক | স্ব—স্বতঃ | অতিথি—আতিথ্য |
| পুনঃপুনঃ—পৌনঃপুনিক | সর্ব—সর্বথা. | সুভ্রাতা—সৌভ্রাত্র্য |
| অধুনা—আধুনিক | অন্য—অন্যত্র | চোর—চৌর্য |
| বহিঃ—বাহ্য | তদ্—তথা, তত্র | |
| সায়ং—সায়ন্তন | কিম্—কদা, কুত্র | |
| ইদানীম্—ইদানীন্তন | ইদম্—ইদানীম্ | |
| পশ্চাৎ—পাশ্চাত্ত্য | | |

### প্রয়োগ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে ও সাহিত্যে একটি সমন্বয়মূলক **সৌষ্ঠব** রক্ষা করিয়া চলিতেন। **মদীয়** বাসভবনে উপস্থিত হইয়া আনন্দ বর্ধন করিবেন। গান্ধীজীর **আকস্মিক** নিধনে সমগ্র দেশবাসী শোকে মুহ্যমান হইয়াছিল। যিনি **স্বতঃ**প্রবৃত্ত হইয়া সভাপতিত্ব করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হন, তিনি লোকসমক্ষে উপহাসাস্পদ হইয়া

থাকেন। তাঁহার **সৌজন্যে** ও **আতিথ্যে** আমি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে প্রাচীন ভারতের **স্থাপত্য**-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন রহিয়াছে।

## অনুশীলনী

[ এক ] নিম্নলিখিত পদগুলিকে প্রয়োজনানুসারে বিশেষ্য অথবা বিশেষণে পদান্তরিত করিয়া উহাদের প্রত্যেককে অবলম্বন করিয়া এক একটি বাক্য গঠন কর :—অধ্যয়ন, প্রার্থনা, পান, কামনা, উপলব্ধি, আঘাত, সাহিত্য, পরিচয়, বায়ু, শ্রম; আরোহণ, বিদ্যুৎ, গান, কৌতূহল, প্রপীড়িত, আহৃত, সুগন্ধ, অনাদৃত, দক্ষ, বিপ্রলব্ধ, পরাক্রান্ত, অনভ্যস্ত, আসন, ফেন, মুখ, অবসন্ন, ব্যাহত, বিধান, ইষ্ট, বৈধ, উচিত, আরূঢ়, সংখ্যা, বস্তু, সূর্য, বিহিত, প্রসন্ন, সংক্ষুব্ধ, ধ্যান, বায়ু।

**ক. বি. মাধ্যমিক '৩১, '৩৩, '৪২, '৪৪**

[ দুই ] নিম্নোদ্ধৃত পদগুলিকে বিশেষ্যপদে রূপান্তরিত করিয়া উহাদের প্রত্যেকটির সাহায্যে এক একটি বাক্য রচনা কর :—বাবু, প্রণীত, নিষ্কর্মা, মধুর।

**ক. বি. মাধ্যমিক '৩৭**

[ তিন ] নিম্নোদ্ধৃত পদগুলিকে বিশেষণপদে রূপান্তরিত করিয়া উহাদের প্রত্যেকটির সাহায্যে এক একটি বাক্য রচনা কর :—যশঃ, বাক্, পুরুষ, মৃৎ ; দাঁত, মাটি, মোগল, গাঁ, বন, ঢাকা। **ক. বি. মাধ্যমিক '৩৬, ( কলা ) '৫৭**

[ চার ] অব্যয়কে বিশেষ্যে, সর্বনামকে বিশেষণে, অব্যয়কে বিশেষণে, সর্বনামকে অব্যয়ে, বিশেষ্যকে গুণবাচক বিশেষ্যে পদ-পরিবর্তনমূলক এক একটি পদ অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বাক্য রচনা কর।

[ পাঁচ ] নিম্নলিখিত যে কোনও পাঁচটি শব্দের বিশেষণ হইতে বিশেষ্যের এবং বিশেষ্য হইতে বিশেষণের রূপ লিখ :—মূঢ়, আয়ু, স্নিগ্ধ, সূর্য, তামসিক, বীর্য, অগ্নি, ঝড়, নিকট, লঘিমা, চাতুরী, মধু, যশ, লোম, ব্যাস, অধিবাস, বপন, বায়ু, সোনা, চন্দ্র, ন্যায়, পিতৃ-পিতামহ, বিদ্যা, গাছ, কাঠ। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫০**

[ ছয় ] নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিশেষ্য থাকিলে বিশেষণে, কিংবা বিশেষণ থাকিলে বিশেষ্যে পরিবর্তিত করিয়া পরিবর্তিত শব্দগুলির দ্বারা বাক্য রচনা কর। ( যে কোনো পাঁচটি ) :—বস্তু, সুন্দর, গ্রাহ্য, পান, অনুবাদ, গ্রন্থ, আভ্যন্তরীণ, নিপুণ, শিক্ষা, জাতি, গো, মলিন, সহায়, স্পর্শ, ইষ্ট, অধুনা, মৃদু, মূর্খ, ভেদ, চক্ষু। **রা. বি. মাধ্যমিক '৫৬, '৫৭**

# পঞ্চম অধ্যায়

## শব্দগঠন—সমাস ( Compounds )

পরস্পরের সহিত অর্থসম্বন্ধযুক্ত দুই বা ততোঽধিক পদ মিলিত হইয়া একটিমাত্র পদে পরিণত হইল, এই মিলনকে বলা হয় **সমাস**। এহেন সমাস হইতে উদ্ভূত শব্দ বা পদকে বলা হয় **সমস্ত-পদ**। যে পদগুলি মিলিত হইয়া সমাস তৈয়ার করে, তাহাদের প্রত্যেকটিকে বলা হয় **সমস্যমান** পদ। যে বাক্যের সাহায্যে সমস্যমান পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষ করিয়া—অর্থাৎ সোজা কথায় সমাস ভাঙিয়া—দেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই বাক্যকে বলা হয় **সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য** বা **বিগ্রহবাক্য**। সমস্ত-পদের প্রথম পদটির নাম **পূর্বপদ** ও শেষ পদটির নাম **উত্তরপদ**। যেমন,—'শূলপাণি'—এই সমস্ত-পদে 'শূল' ও 'পাণি'—পদ দুইটির প্রত্যেকেই সমস্যমান পদ; 'শূল পাণিতে বা হস্তে যাহার' এই বাক্যটির পারিভাষিক নাম সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য : 'শূল' পূর্বপদ ও 'পাণি' উত্তরপদ।

প্রসঙ্গতঃ **সন্ধি** ও **সমাসের পার্থক্যটি** স্মরণ রাখা উচিত। দুইটি ধ্বনির দ্রুত উচ্চারণকালে তাহাদের আংশিক বা পূর্ণভাবে মিলন ঘটিলে অথবা একটির লোপ হইলে কিংবা একে অপরের প্রভাবে বদলাইয়া গেলে এই মিলন লোপ বা পরিবর্তনই **সন্ধি** নামে অভিহিত। পক্ষান্তরে, দুই বা ততোঽধিক সুবন্ত পদের একপদীভাব হইলে **সমাস** হয়। সন্ধিতে কোন পদেরই বিভক্তি লোপ পায় না, কিন্তু সমাসে প্রতিটি পদের বিভক্তি লোপ পায়। সন্ধিতে অনেক পদ অনেক পদই থাকে, কিন্তু সমাসে অনেক পদ মিলিয়া একটিমাত্র পদই হয়। যেমন,—সন্ধির উদাহরণ : গণ+ঈশ=গণেশ। সমাসের উদাহরণ : গাছে পাকা=গাছপাকা ( ৭মী তৎপুরুষ সমাস )।

**সংস্কৃত ব্যাকরণ-মতে সমাস প্রধানতঃ চার প্রকার :** যথা,—অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব ও বহুব্রীহি। এক রকমের তৎপুরুষকে কর্মধারয় এবং এক রকমের কর্মধারয়কে দ্বিগু বলা হয়। তাই কর্মধারয় ও দ্বিগু তৎপুরুষেরই অন্তর্গত। তবে অনেকে এই সমস্ত সমাসের বিষয়-বহির্ভূত আর একটি পৃথক্ সমাস 'সহসুপা'কে গণ্য করিয়া **পঞ্চবিধ সমাসও** বলিয়া থাকেন। অব্যয়ীভাবে পূর্বপদের অর্থ-প্রাধান্য, তৎপুরুষে উত্তরপদের অর্থ-প্রাধান্য, বহুব্রীহিতে পূর্বপদ বা উত্তরপদের অর্থ না বুঝাইয়া অন্য অর্থের প্রাধান্য এবং দ্বন্দ্বে উভয় পদেরই অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়। দ্বন্দ্ব ও

সমাসের গোষ্ঠী-তালিকা
সমাস
সংযোগমূলক
দ্বন্দ্ব সমাস
সাধারণ
অলুক্
ইত্যাদি অর্থসূচক
সমার্থক
ব্যাখ্যানমূলক বা আশ্রয়মূলক
বর্ণনামূলক
বহুব্রীহি সমাস
ব্যধিকরণ
সমানাধিকরণ
ব্যতিহার
মধ্যপদলোপী
অলুক্
নঞ্
কর্মধারয়
দ্বিগু
তৎপুরুষ
সাধারণ
মধ্যপদলোপী
উপমামূলক
উপমান
রূপক
উপমিত
প্রথমা
দ্বিতীয়া
তৃতীয়া
চতুর্থী
পঞ্চমী
ষষ্ঠী
সপ্তমী
উপপদ
নঞ্
অলুক্
প্রাদি
গতি
নিত্য
অব্যয়ীভাব
সহসুপা
একদেশী
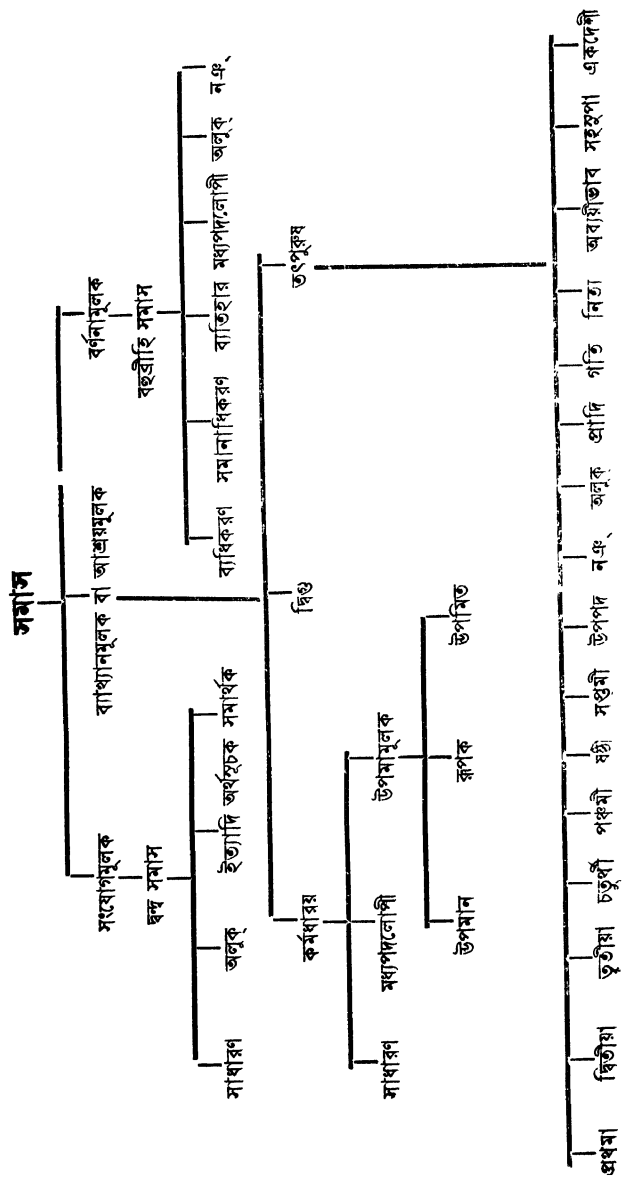
বহুব্রীহি বহু পদের মিলনেও হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য সমাস কেবলমাত্র দুইটি পদেরই মিলনে হয়। আবার কোন কোন বৈয়াকরণ **অন্যথায় সমাসের ছয়টি প্রকারও** বলিয়াছেন : যথা,—অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, দ্বন্দ্ব ও বহুব্রীহি। সে যাই হোক,—মোটের উপর সমাসের গোষ্ঠী বড়ই বৃহৎ। তাই ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা-সহযোগে সমাসকে মোটামুটি ভাবে তিনটি প্রধান বিভাগে এবং এক একটি প্রধান বিভাগকে নানা উপবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ছকের সাহায্যে এই বিভাগ ও উপবিভাগগুলিকে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হইয়াছে।

ঐ ছক লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, **অলুক্ সমাস** সংযোগমূলক, ব্যাখ্যানমূলক ও বর্ণনামূলক—এই তিন জাতেরই সমাসে যথাক্রমে অলুক্ দ্বন্দ্ব, অলুক্ তৎপুরুষ ও অলুক্ বহুব্রীহি নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সমাসবদ্ধ হইলেও অন্বয়জ্ঞাপক বিভক্তি লোপ পায় না। তাই সমাসের নাম অলুক্ সমাস : যেমন,—হাটে-মাঠে ; চিনির-বলদ ; গায়ে-পড়া।

### সংযোগমূলক সমাস

**দ্বন্দ্ব সমাস**—একাধিক পদে মিলিত এই সমাসে প্রতিটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে। এই সমাস নানা জাতের ,—( ১ ) **সাধারণ দ্বন্দ্ব**—যেমন,—অহঃ ও রাত্রি=অহোরাত্র ; কুশ ও লব=কুশীলব ; এইরূপ আনা-গোনা, হয়-নয়, লোক-লস্কর, জায়াপতি দম্পতি দম্পতী, তেল-নুন-লাকড়ী, দুই-দই-ক্ষীর-সর, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ। ( ২ ) **অলুক্ দ্বন্দ্ব**—বনে ও বাদাড়ে=বনে-বাদাড়ে ; এইরূপ দুধে-ভাতে, হাতে-পায়ে, ঠারে-ঠোরে। ( ৩ ) **'ইত্যাদি' অর্থসূচক দ্বন্দ্ব**—(ক) সহচর শব্দযোগে—যেমন,—লাঠি-ঠেঙা ; বাড়ি-ঘর ; জীব-জন্তু। ( খ ) অনুচর শব্দযোগে—যেমন,—চুরি-চামারি ; হাতী-ঘোড়া। ( গ ) প্রতিচর শব্দযোগে—যেমন,—মেয়ে-পুরুষ ; হিন্দু-মুসলমান। (ঘ) বিকার শব্দযোগে—যেমন,—অদল-বদল ; তুক্-তাক্। (ঙ) অনুকার শব্দযোগে—যেমন,—কাজ-ফাজ ; উলট-পালট। ( ৪ ) **সমার্থক দ্বন্দ্ব**—যেমন,—কাগজ-পত্র ; রাজা-বাদশা ; ঠাট্টা-মস্করা ; শাক-সব্জী। ( ৫ ) **একশেষ দ্বন্দ্ব**—যেমন,—তুমি সে ও আমি, আমরা ; তুমি ও সে, তোমরা।

### ব্যাখ্যানমূলক বা আশ্রয়মূলক সমাস

**কর্মধারয় সমাস**—এই সমাসে প্রথম পদটি দ্বিতীয় পদের বিশেষণ-রূপে থাকিয়া দ্বিতীয় পদের অর্থের প্রাধান্য বজায় রাখে। দুইটি বিশেষণ পদ মিলিয়াও কর্মধারয় সমাস হয়। এই সমাস নানা জাতের :—( ১ ) **সাধারণ কর্মধারয়**—(ক) বিশেষণ+বিশেষ্য—যেমন,—কু যে পুরুষ, কুপুরুষ বা কাপুরুষ ; এইরূপ নীলোৎপল,

মহানদী, মহারাজা, অপরাহ্ণ। (খ) বিশেষ্য+বিশেষণ—যেমন,—ঘননীল; হলুদ-বাটা। (গ) বিশেষণ+বিশেষণ—যেমন,—তাজাও যাহা মরাও তাহা, তাজা-মরা; এইরূপ নীল-লোহিত, মধুর-ভীষণ, রুদ্র-সুন্দর। (ঘ) বিশেষ্য+বিশেষ্য—যেমন,—সর্দারও যে পড়ুয়াও সে, সর্দার-পড়ুয়া; এইরূপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, ভূলোক, আকাশমণ্ডল। (ঙ) অবধারণা-পূর্বপদ কর্মধারয়—এই জাতীয় কর্মধারয় সমাসে প্রথম পদের অর্থের উপরে বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হয়ঃ—যেমন,—উদরই সর্বস্ব, উদরসর্বস্ব; এইরূপ দোজবর, কালসর্প। (চ) পূর্বনিপাত কর্মধারয়—এই জাতীয় কর্মধারয় সমাসে পরে যে পদের বসা কর্তব্য তাহা আগেই বসেঃ যেমন,—ছন্নমতি, মতিচ্ছন্ন; উত্তম পুরুষ, পুরুষোত্তম; এইরূপ রাজাধম, তেল-পড়া, হলুদ-বাটা। (ছ) বিবিধ—যেমন,—সেজন; বিঁভুই; সুনজর; বে-সুর; তে-তলা; অনিন্দ্য; অদৃষ্ট; স্বয়ংকৃত। (২) **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়**—এই জাতীয় কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধবর্তী ব্যাখ্যানমূলক পদের লোপ হয়ঃ যেমন,—সিংহ-চিহ্নিত আসন, সিংহাসন; ছায়া-প্রধান তরু, ছায়াতরু; অষ্ট-অধিক দশ, অষ্টাদশ; কীর্তি-প্রকাশক মন্দির, কীর্তিমন্দির; নাতি-পর্যায়ের জামাই, নাত-জামাই; 'মনি' রাখিবার 'ব্যাগ', মনি-ব্যাগ। (৩) **উপমামূলক কর্মধারয়**—এই জাতীয় সমাসে দুইটি বস্তুর পরস্পরের মধ্যে তুলনা বা উপমা থাকে। তুলনা বা উপমার ক্ষেত্রে যাহা উপমিত হয় অর্থাৎ যাহাকে তুলনা করা হয় তাহাকে বলা হয় **উপমেয়**; আবার যাহার সঙ্গে উপমা বা তুলনা করা হয়, তাহাকে বলা হয় **উপমান**। উপমামূলক কর্মধারয় তিন রকমের হয়ঃ (ক) **উপমান কর্মধারয়**—যে ক্ষেত্রে উপমানের ধর্ম উপমেয়ের দ্বারা দ্যোতিত হয়, সেখানে হয় উপমান কর্মধারয় সমাসঃ যেমন,—মিশির মত কালো, মিশ্-কালো; এইরূপ দূর্বাদল-শ্যাম, অরুণ-রাঙা, কুসুম-কোমল। (খ) **রূপক কর্মধারয়**—ভিন্ন জাতীয় বা ভিন্ন শ্রেণীর উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কোনও বিষয়ে স্পষ্ট হইলে এবং উভয়কে অভিন্ন রূপে কল্পনা করিলে রূপক কর্মধারয় সমাস গঠিত হয়ঃ যেমন—বাদ্‌লা-রূপ দূতী, বাদল-দূতী; এইরূপ শোকসিন্ধু, মুখচন্দ্র, চাঁদবদন, জ্ঞানালোক। (গ) **উপমিত কর্মধারয়**—যেখানে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য স্পষ্ট নয়, তবে উভয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনও সমান ধর্ম বা গুণ বর্তমান থাকে, সেখানে হয় উপমিত কর্মধারয় সমাসঃ যেমন,—মন-রূপ রথ, মনোরথ; কর পল্লবের ন্যায়, করপল্লব; হংসতুল্য রাজা (=রাজশ্রেষ্ঠ), রাজহংস; এইরূপ নরপুঙ্গব, নরশার্দুল, পুরুষসিংহ।

**দ্বিগু সমাস**—প্রথম পদটি সংখ্যাবাচক হইলে এবং সমস্ত-পদটির দ্বারা সংযোগ বা সমষ্টি বুঝাইলে, দ্বিগু সমাস হয়ঃ যেমন,—পাঁচ সেরের সমাহার, পঙুরী

( পন্‌সেরী, পাঁচসেরা )। এইরূপ ষড়্‌ঋতু, চৌমুহানী, তিন-ঠেঙ্‌। তবে, যেখা সমষ্টি বুঝাইতে গিয়া শেষের পদে প্রত্যয়ের লোপ বা যোগ হয় বা অপর কোন পরিবর্তন ঘটে, সেখানে হয় **সমাহার দ্বিগু :** যেমন,—পঞ্চ নদীর সমাহার, পঞ্চনদ ( -ঈ প্রত্যয়ের লোপ ); পঞ্চ বটের সমাহার, পঞ্চবটী ( -ঈ প্রত্যয়ের যোগ ); চৌ ( =চারি ) মাথার সমাহার, চৌমাথা; এইরূপ শতাব্দী, পঞ্চাঙ্গুল।

**তৎপুরুষ সমাস**—পূর্বপদের কারকবোধক বিভক্তির লোপ হইয়া ইহার সহিত পরপদের সমাসে প্রায়ই পরপদের অর্থের প্রাধান্য দেখা দিলে তৎপুরুষ সমাস গঠিত হয়। তৎপুরুষ সমাস বহু প্রকারের : ( ১ ) কর্তৃবাচক—**প্রথমা তৎপুরুষ :** যেমন,—হাতী-কাঁদা; দাগ-লাগা; বাজ-পড়া; ঘর-চাপা। ( ২ ) কর্মবাচক —**দ্বিতীয়া তৎপুরুষ :** যেমন,—নখ-নাড়া; ভুঁই-ফোঁড়; চোখ-মটকানো; সাহায্যপ্রাপ্ত; গৃহপ্রবিষ্ট; চিরকাল ব্যাপিয়া শত্রু, চিরশত্রু; অর্ধ-রূপে মৃত, অর্ধমৃত; দ্রুত যথা তথা গামী, দ্রুতগামী; মৃদু যথা তথা ভাষিণী, মৃদুভাষিণী; নিম্‌ ( =অর্ধ ) রূপে রাজী, নিমরাজী; এইরূপ নিমখুন, ধীরগামী, মাসাশৌচ। ( ৩ ) করণবাচক—**তৃতীয়া তৎপুরুষ :** যেমন,—( বিধিপূর্বক ) বাক্য দ্বারা দত্তা ( কন্যা ), বাগ্‌দত্তা; মন দ্বারা গড়া, মন গড়া; এইরূপ ঢেঁকি-ছাটা, ঝাঁটা-পেটা, মধু-মাখা, শ্রীযুত, বিস্ময়বিহ্বল, মৎকৃত, মাতৃহীন, পোয়া-কম্‌। ( ৪ ) উদ্দেশ্যবাচক—**চতুর্থী তৎপুরুষ :** যেমন—ডাকের জন্য মাশুল, ডাকমাশুল; জীবনের জন্য কাঠি, জীয়ন-কাঠি; বিয়ের জন্য পাগল, বিয়েপাগলা। এইরূপ শোষ-কাগজ; ধান-জমি; শিশু-বিভাগ; যূপ-কাষ্ঠ; বালিকা-বিদ্যালয়। সম্প্রদানার্থেও চতুর্থী তৎপুরুষ হয় : যেমন, —দেবকে দত্ত, দেবদত্ত। ( ৫ ) অপাদানবাচক—**পঞ্চমী তৎপুরুষ :** যেমন,—আগা হইতে গোড়া, আগাগোড়া; যুদ্ধ হইতে উত্তর, যুদ্ধোত্তর; মিত্র হইতে জাত, মিত্রা-জা। এইরূপ ঘোষ-জা, থ'লে-ঝাড়া, কলেজ-পালানো, স্বর্গভ্রষ্ট, ভুক্তাবশেষ, স্নাতকোত্তর, জেল-খালাস, বিলাত-ফেরত। ( ৬ ) সম্বন্ধবাচক—**ষষ্ঠী তৎপুরুষ :** যেমন,—মনের রথ, মনোরথ; হংসের রাজা, রাজহংস; হাত-ঘড়ি, ঠাকুরপো; জাহাজ-ঘাটা; চা-বাগান; গিনি-সোনা; গোরা-বারিক; গুরূপদেশ; শিশুগণ; ধনিগণ; ভ্রাতৃ-সম; ভ্রাতা-সম; দাতৃগণ; দাতাগণ; নদীর মাঝ, মাঝনদী; মৃগীর শাবক, মৃগশাবক; হংসীর অণ্ড, হংসাণ্ড; ছাগীর দুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ; তাহার প্রতি, তৎপ্রতি; বন্ধুর ত্রয়, বন্ধুত্রয়। ( ৭ ) স্থানবাচক—**সপ্তমী তৎপুরুষ :** যেমন,—গাছে পাকা, গাছপাকা; ঘরে পোড়া, ঘরপোড়া; লিপ্টি-ভুক্ত; পুঁথিগত; সাঁঝ ঘুমানী; পাড়া-বেড়ানী; আকাশ-বাণী; জল-জাত; কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কবিশ্রেষ্ঠ; নরের মধ্যে অধম, নরাধম; দক্ষিণে পথ, দক্ষিণাপথ; পূর্বে শ্রুত, শ্রুতপূর্ব;

পূর্বে ভূত, ভূতপূর্ব ; পূর্বে দৃষ্ট, দৃষ্টপূর্ব ; ঝুড়ী-ভরতী ; মাথা-ব্যথা ; কোল কুঁজা ; পকেট-জাত ; বাক্সনন্দী ; রথারূঢ় ; লোকবিশ্রুত ; কাশীবাসী।

(৮) **উপপদ তৎপুরুষ সমাস** : উপপদের সহিত পরবর্তী পদের বিভিন্ন কারকের অন্বয় করিয়া সমাস হইলে উপপদ তৎপুরুস সমাস হয়। সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ান্ত পদের পূর্বে উপসর্গ ছাড়া অন্যান্য শব্দও বসে। উপসর্গ ছাড়া অন্য শব্দকে **উপপদ** বলে : যেমন,—গৃহে থাকে যে, গৃহস্থ ; হাড় ভাঙে যাহাতে, হাড়ভাঙা ; বর্ণ চুরি করে যে, বর্ণচোরা ; ফেল মারে যে, ফেল-মারা ; হিত ইচ্ছা করে যে, হিতৈষী ; হালুয়া করে যে, হালুইকর ; পাশ করিয়াছে যে, পাশ-করা ; গিরিতে যিনি শয়ন করেন, গিরিশ। (৯) **নঞ্ তৎপুরুষ সমাস** : 'ন', 'নাই' বা 'নয়' অর্থে 'নঞ্'-নামে এক সংস্কৃত প্রত্যয় আছে। পরপদের প্রাধান্য রাখিয়া এই 'নঞ্'-এর সহিত যে সমাস গঠিত হয়, তাহাই নঞ্ তৎপুরুষ সমাস। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে, 'ন'-এর পরিবর্তে 'অ' হয় আর স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'ন'-এর পরিবর্তে প্রায়ই 'অন', 'অনা' হয়। 'বে' 'গর' 'না' 'অ' প্রভৃতি নাস্তিবাচক শব্দযোগেও নঞ্ তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন,—নয় লক্ষুণে (=শুভ), অলক্ষুণে ; ন কাতর, অকাতর ; ন আচার, অনাচার ; ন অন্য, অনন্য ; আইনের অভাব, বে-আইনী ; ন হাজির, গরহাজির ; নাই মামা, নেইমামা ; নয় ঘাট, আঘাট ; নয় সৃষ্টি, অনাসৃষ্টি। (১০) **অলুক্ তৎপুরুষ সমাস** : এই সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় না। প্রতি প্রকার তৎপুরুষ সমাসেরই অলুক্ সমাস হয় : যেমন,—**অলুক ৩য়া তৎপুরুষ**—তেলে-ভাজা, বালির বাঁধ, ঢেঁকি'ছাঁটা, ঘিয়ে-ভাজা। **অলুক্ ৪র্থী তৎপুরুষ**—ঘানির-বলদ, চায়ের-বাটি, আত্মনেপদ। **অলুক্ ৫মী তৎপুরুষ**—ঘানির-তেল, নদীর-মাছ, কলের-জল। **অলুক্ ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ**—হাতের-পাচ, ভাগের-মা, চোখের-বালি, পাথরের-বাটী, ভ্রাতুষ্পুত্র, বাচস্পতি, সোনার-বাংলা। **অলুক্ ৭মী তৎপুরুষ**—তেলে-বেগুনে, গায়ে-পড়', হাতে-গরম, অন্তেবাসী, লালে-লাল, চোখে-দেখা, হাতে-খড়ি, মুখে-মধু।

(১১) **প্রাদি সমাস** : প্রথমে প্র-আদি উপসর্গ ও পরে কৃদন্ত পদযোগে এবং অব্যয়ের সহিত নামযোগে এই সমাস গঠিত হয়। ইহা তৎপুরুষের রূপান্তর। এক দিক দিয়া এই সমাসকে নিত্য সমাসেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায় : যেমন,—প্র (=প্রকৃষ্টরূপে) ভাত (=জ্যোতিঃযুক্ত), প্রভাত ; সু (=সুদৃশ্য) পুরুষ, সুপুরুষ ; প্রাকৃতকে অতিক্রম করিয়া, অতিপ্রাকৃত ; উৎ (=উৎক্রান্ত) শৃঙ্খলা, উচ্ছৃঙ্খল।

(১২) **গতি সমাস** : 'আবিঃ, পুরঃ, তিরঃ, প্রাদুঃ, বহিঃ, অলম্, সাক্ষাৎ'—এই কয়টি অব্যয়কে 'গতি' বলা হয়। এই গতির সহিত কৃদন্ত পদের সমাস হইলে গতি সমাস হয় : যেমন,—আবিঃ (=দৃষ্টিগোচর হইবার) ভাব, আবির্ভাব ; পুরঃ

( সম্মুখে আনিবার ) কার (=কাজ ), পুরস্কার ; তিরঃ ( দৃষ্টির বাহিরে যাইবার ) ভাব, তিরোভাব ; ভাবের প্রাদুঃ, প্রাদুর্ভাব ; অঙ্গের বহিঃ, বহিরঙ্গ ; অলং ( =সম্যক্‌রূপে ) করণ ( সাজানো ), অলংকরণ ; সাক্ষাতের কার ( =ভাব বা কাজ ), সাক্ষাৎকার। (১৩) **নিত্য সমাস**ঃ সমস্যমান পদগুলি পাশাপাশি থাকিলেই নিত্য সমাস হয় ঃ যেমন,—অন্য গৃহ, গৃহান্তর ; কেবল দর্শন, দর্শনমাত্র ; তাহা মাত্র ( =কেবল তাহা ), তন্মাত্র ; একটি লোক, লোকটি ; অনেক মাছ, মাছগুলি ; একখানি বই, বইখানি ; এইরূপ অনলসংকাশ, বজ্রসন্নিভ।

( ১৪ ) **অব্যয়ীভাব সমাস**ঃ যে সমাসে পূর্বপদস্থিত অব্যয় পদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই অব্যয়ীভাব সমাস। অবশ্য এই সমাস প্রাদি পর্যায়েই পড়ে। সামীপ্য, বীপ্সা ( পুনঃ পুনঃ অর্থে ) অনতিক্রম, পর্যন্ত, যোগ্যতা, অভাব, পশ্চাৎ, সাদৃশ্য, হীনতা, ক্ষুদ্রতা, অধিকরণ অর্থ বুঝাইতে অব্যয়ীভাব সমাস হয় ঃ যেমন,—কূলের সমীপে, উপকূল ; দিন দিন, প্রতিদিন ; ক্ষণ ক্ষণ, অনুক্ষণ ; রোজ রোজ, হররোজ ; বছর বছর, ফিবছর ; টকের অভাব, না-টক ; ঘরের অভাব, হা-ঘর ; ভিক্ষার অভাব, দুর্ভিক্ষ ; মিলের অভাব, গরমিল ; মানানের অভাব, বেমানান ; জানু পর্যন্ত, আজানু ; বিধিকে অতিক্রম না করিয়া, যথাবিধি ; রূপের যোগ্য, অনুরূপ ; গমনের পশ্চাৎ, অনুগমন ; বনের সদৃশ, উপবন ; হীন দেবতা, অপদেবতা ; উপ ( =ক্ষুদ্র ) বিভাগ, উপবিভাগ ; আত্মাকে অধিকার করিয়া, অধ্যাত্ম ; দৈবকে অধিকার করিয়া অধিদৈব।

( ১৫ ) **সহসুপা** বা **সুপ্‌সুপা সমাস**ঃ 'সুপ্‌' অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত একটি নামপদের সহিত আর একটি 'সুপ্‌' অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত পদের সমাসকে সুপ্‌সুপা বা সহসুপা সমাস বলা হয়। ব্যাপক অর্থে সকল প্রকারের সমাসই সুপ্‌সুপা সমাস। কিন্তু এই অর্থকে সংকুচিত করিয়া বলা যায় যে, যখন কোন সমাসবদ্ধ পদকে অপর কোন সমাসেরই অন্তর্গত করা যায় না, তখনই তাহাকে সুপ্‌সুপা সমাসরূপে ধরা হয়ঃ যেমন,—পর রাত্র, পররাত্র ; পরম পূজ্য, পরমপূজ্য ; প্রত্যক্ষ ভূত, প্রত্যক্ষভূত ; ন অতি শীতোষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ ; পূর্বে ভূত, পূর্বভূত ; যাচ্ছে তাই, যাচ্ছেতাই।

( ১৬ ) **একদেশী** বা **একদেশ সমাস**ঃ 'একদেশ' মানে 'অবয়ব' বা 'অংশ' নয়—'অবয়বী' বা 'সমগ্র'। এই সমাসে সমগ্রবোধক পদের সঙ্গে অংশবোধক পদের সমাস হয়। তবে কাহারও কাহারও মতে, একদেশবাচক পদের সহিত কালবাচক পদের সমাসই **একদেশী** বা **একদেশ সমাস** নামে পরিচিত ঃ যেমন,—কায়ের উত্তরভাগ, উত্তরকায় ; গ্রামের অর্ধ, গ্রামার্ধ ; রাত্রির পূর্বভাগ, পূর্বরাত্র ; রাত্রির মধ্যভাগ, মধ্যরাত্র ; অহ্নের সায়ম্‌, সায়াহ্ন, অহ্নের অপর ভাগ, অপরাহ্ণ।

## বর্ণনামূলক সমাস

সমাসস্থ পদগুলির কোনটিরই অর্থ না বুঝাইয়া সমাসনিষ্পন্ন পদ অপর কোন পদার্থকে প্রধান রূপে বুঝাইলে, বহুব্রীহি সমাস হয়। সমাসনিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ হয়। এই সমাস নানা জাতের :—( ১ ) **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি**—পূর্বপদ বিশেষণ না হইলে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হয় : যেমন—বাক্ দত্ত হইয়াছে যাহার সম্পর্কে এমন যে সে ( স্ত্রীলিঙ্গে ), বাগ্‌দত্তা ; বজ্রের ন্যায় নখ যাহার, বজ্রনখ ; পদ্ম নাভিতে যাহার, পদ্মনাভ ( =বিষ্ণু ) ; বীণা পাণিতে যাহার, বীণাপাণি (=সরস্বতী)। (২) **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি**—পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হইলে, সমানাধিকরণ বহুব্রীহি হয় : যেমন,—বহু ব্রীহি (অর্থাৎ ধান্য) যাহার, বহুব্রীহি ; পীত অম্বর যাহার, পীতাম্বর ( =কৃষ্ণ ) ; কালো বরণ ( =বর্ণ ) যাহার, কালোবরণ। (৩) **ব্যতিহার বহুব্রীহি**—পরস্পরের মধ্যে একই ধরণের ক্রিয়া করা বুঝাইলে, একই শব্দের পুনরুক্তি দ্বারা ব্যতিহার বহুব্রীহি গঠিত হয়। সমাসবদ্ধ পদের পূর্বপদ হয় আ-কারান্ত আর পরপদ হয় ই-কারান্ত : যেমন,—কানে কানে কথা যেখানে, কানাকানি ; দণ্ডে দণ্ডে যুদ্ধ যাহার তাহা, দণ্ডাদণ্ডি ; হাসিয়া হাসিয়া আলাপ যেখানে, হাসাহাসি। (৪) **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি**—যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যে মধ্যপদের লোপ হয়, তাহাই মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস। এই শ্রেণীর বহুব্রীহি সমাসে একটি উপমান পদ থাকিয়া তুলনা বুঝায় বলিয়া ইহার আর একটি নাম **উপমাত্মক বহুব্রীহি** : যেমন,—মীনের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার সে ( স্ত্রীলিঙ্গে ), মীনাক্ষী ; মৃগের ন্যায় সুন্দর নয়ন যাহার সে ( স্ত্রীলিঙ্গে ), মৃগনয়নী। এইরূপ চাঁদমুখ, চন্দ্রবদন, চন্দ্রমুখী। ( ৫ ) **সংখ্যা বহুব্রীহি**—যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকে, তাহাই সংখ্যা বহুব্রীহি সমাস : যেমন,—সে (—ফার্সি তিন ) তার যাহার, সেতার ; পঞ্চ মুখ যাহার, পঞ্চমুখ ; দুই নল যাহার, দোনলা। এইরূপ দশানন, ত্রিবর্ণ, ত্রিপদী, চৌচির ইত্যাদি। ( ৬ ) **অলুক্ বহুব্রীহি**—এই জাতীয় বহুব্রীহি সমাসে বিভক্তির লোপ হয় না : যেমন,—যাচ্ছে-তাই, যাচ্ছেতাই। এইরূপ পাঞ্জাবী-গায়ে, মাথায়-ছাতি, কোঁচা-হাতে, ছড়ি হাতে, আপ্-কে-ওয়াস্তে। ( ৭ ) **নঞ্ বা নিষেধ বহুব্রীহি**—যেমন,—নাড়ী ( নাড়ী-জ্ঞান ) নাই যাহার সে, আনাড়ী। এইরূপ নির্জলা, বেইমান। (৮) **অন্ত্য-পদলোপী বহুব্রীহি**—যে বহুব্রীহি সামাসে ব্যাসবাক্যের শেষ পদের লোপ হয় তাহাই অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস : যেমন,—পাঁচহাত পরিমাণ যাহার, পাঁচহাতি ; বিশ হইতে পঁচিশ সীমা যাহার, বিশ-পঁচিশ ; গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে, গায়েহলুদ এইরূপ দশ-বছুরিয়া > দশ-বছরে, দশগজী, বউভাত।

## আরও কতিপয় সমাস

**অসংলগ্ন সমাস**—সমাসে সমস্ত-পদটি এক পদে পরিণত হইবেই। কিন্তু বাংলা ভাষায় মিশ্র সমাসবদ্ধ বড় বড় পদকে ভাঙিয়া পৃথক্ পৃথক্ পদ বা শব্দরূপে লেখা হয়। এহেন পদসমষ্টিতে সমাসত্ব থাকিলেও সমাসের প্রধান সর্ত একপদীভাবত্বটি নাই; আবার লেখায় দৃষ্টিকটুতা পরিহারার্থে সমস্যমান পদগুলির ভিতরে হাইফেন-চিহ্নও বসানো হয় না। এইজন্যই এহেন পদসমষ্টিকে বলা হয় অসংলগ্ন সমাস : যেমন,—প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন; নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা; সব পেয়েছির দেশ।

**পদগর্ভ সমাস**—আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত কতিপয় দীর্ঘ সমাসকে সংস্কৃত রীতি-অনুসারে কোনও সমাসের অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারায়, কোন কোন বৈয়াকরণের মতে ঐ জাতীয় দীর্ঘ সমাস পদগর্ভ বা বাক্যগর্ভ সমাস নামে অভিহিত হইয়াছে : যেমন,—'এক যে ছিল রাজার আমল'; 'কানে কানে ডাকা'।

**মিশ্র সমাস**—ভাষায় যে সমস্ত সমাস ব্যবহৃত হয়, তাহারা সাধারণতঃ কোন একটি সমাসের অবিমিশ্র রূপ নয়। প্রায়ই নানা সমাস মিশ্রভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাই ইহাদের নাম মিশ্র সমাস : যেমন,—শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনী; জনগণমন-অধিনায়ক; নদী-জপমালা-ধৃত-প্রান্তর। বাণ-বিদ্ধ-মীন-মত।

## সমাসের দরুণ অর্থ-পার্থক্য

**বসন্তসখা**—বসন্ত সখা যাহার, বহুব্রীহি। **বসন্তসখ**—বসন্তের সখা, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। **মহাধন**—মহৎ ধন, কর্মধারয়। **মহদ্ধন**—মহতের ধন, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। **মাতাপিতা**—মাতা ও পিতা, দ্বন্দ্ব। **মাতৃপিতা**—মাতার পিতা, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। **সূত্রধর**—সূত্রের ধর বা ধারণকারী, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। **সূত্রধার**—সূত্র ধরে যে, উপপদ তৎপুরুষ। **স্বপত্নী**—নিজের পত্নী, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। **সপত্নী**—সমান পতি যাহাদের, বহুব্রীহি। **মতিচ্ছন্ন**—ছন্ন বা আচ্ছন্ন মতি, কর্মধারয়। **ছন্নমতি**—ছন্ন বা আচ্ছন্ন মতি যাহার, বহুব্রীহি। **অনর্থ**—নাই অর্থ, নঞ্ তৎপুরুষ। **অনর্থক**—অর্থ নাই যাহাতে, বহুব্রীহি সমাস।

## অর্থের দরুণ সমাস পার্থক্য

**কীর্তিমন্দির**—(১) কীর্তি-প্রকাশ মন্দির, মধ্যপদলোপী; (২) কীর্তি প্রকাশ করে যে মন্দির, উপপদ তৎপুরুষ। **কাশীবাসী**—(১) কাশীতে বাসী, সপ্তমী তৎপুরুষ; (২) কাশীতে বাস করে যে, কর্মধারয়। **সুপুরুষ**—(১) সু যে পুরুষ, কর্মধারয়, (২) সু-পুরুষ, প্রাদি সমাস। **বাগ্‌দত্তা**—(১) বাক্য দ্বারা দত্তা (কন্যা), তৃতীয়া তৎপুরুষ; (২) বাক্ দত্ত হইয়াছে যাহার সম্পর্কে এমন সে, ব্যধিকরণ বহুব্রীহি।

## অনুশীলনী

[ এক ] সন্ধি ও সমাসের উদাহরণসহ পার্থক্য দেখাও। **ক. বি. বি. এ. '৫৬**

[ দুই ] সমাস কাহাকে বলে এবং বাংলা ভাষায় সমাসের আবশ্যকতা কি ?
**ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৮ ; রা. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫**

[ তিন ] সমাস কয় প্রকার এবং কি কি? প্রত্যেক প্রকার সমাসের একটি করিয়া উদাহরণ দাও। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭**

[ চার ] প্রধান সমাসগুলির উদাহরণ খাঁটি বাংলা ভাষা হইতে দাও। বহুব্রীহি ও তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞা বর্ণনা করিয়া তাহাদের পার্থক্য প্রদর্শন কর।
**রা. বি. বি. এ. ( বিকল্প ) '৫৬**

[ পাঁচ ] নিম্নলিখিত পদগুলির সমাস নির্ণয় করিয়া ব্যাসবাক্য লিখ ঃ—ঘরপালানো (**ক. বি. বি. এ. '৫৯**)। লেজঝোলা, হাতাহাতি ( **ক. বি. বি. এ. '৫৮**)। পটলভাজা, হরিণনয়না, চুলোচুলি (**ক. বি. বি. এ. '৫৬**)। তিনকড়ি (মানুষের নাম), বিড়ালচোখী, ঘনশ্যাম, চুলোচুলি, তেমোহানা, অম্লমধুর, গাছপাকা, ঢেঁকিছাঁটা, বিয়েপাগলা, পুষ্পধন্বা ( **ক. বি. বি. এ. '৫৫** )। না-মঞ্জুর, শশব্যস্ত, হাতে-খড়ি, জীবন্মৃত, সেতার, গ্রামান্তর, সস্ত্রীক, রাতকানা, এতিমখানা [ **রা. বি. বি. এ. ( বিকল্প ) '৫৪** ]। মাথাপিছু, লক্ষ্মীছাড়া, ছেলেভুলানো, বালিকাবিদ্যালয়, ঘরপাতা, পীরোত্তর, হরবোলা, সেতার, কানাকড়ি, তেপান্তর [ **রা. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫** ]। স্বাধীনতা-দিবস, অর্থনীতি, তেলেবেগুনে, হেড্-পণ্ডিত, রূপবাণী, উড়োজাহাজ, গাছপাকা, চুলোচুলি, জলযোগ, শতবার্ষিকী [ **রা. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৬** ]। তেপায়া, ডাকাবুকো, বিয়েপাগলা, মাথাব্যথা, চালাকচতুর, লাঠালাঠি, একঘরে, তেলেভাজা, দাকুমড়া, বকধার্মিক ( **ঢা. বি. বি. এ. '৪৯** )। রাজহংস, বাগ্দত্তা, আজানুলম্বিত, গাছপাকা, আগাগোড়া, মনোরথ, অভূতপূর্ব, অলক্ষুণে, মতিচ্ছন্ন, আনাড়ী ( **ক. বি. মাধ্যমিক '৩৪, '৩৫** )। জলজ্যান্ত, গাছপাকা, কাজল-কালো, ফি-বছর, আকাল, ছোলাভিজে, প্রীতিভোজ [ **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৩** ]। আশালতা, এণাক্ষী, ব্রাহ্মণেতর, সুধী, সতীর্থ, মসীকৃষ্ণ, ধর্মসংক্রান্ত, অহোরাত্র [ **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫** ]। শ্রীশ, অন্তরীপ, অনুক্ষণ, ভূতপূর্ব, রাজপথ, কুশীলব, তন্তুবায়, কদন্ন, গাছপাকা [ **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৬** ]। বেতার, বালিকা-বিদ্যালয়, ফুলবাবু, গরমিল, হাড়ভাঙা, মিঠাকড়া, মনমাঝি, সেতার, দিনভর, রূপবাণী [ **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭** ]। তেতলা, আগাছা, ধামাধরা, বেহায়া, অবুঝ, বেগুনপোড়া, মনিব্যাগ, আদায়-কাঁচকলায়, মাথা-পিছু, হাঘরে। ( **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৮** )।

[ ছয় ] রূপক, উপমিত ও উপমান—এই সমাসত্রয়ের উদাহরণ-সহকারে পার্থক্য নির্দেশ কর। **ঢা. বি. বি. এ. '৫০**

[ সাত ] নিম্নের যে কোনও পাঁচটি শব্দে কি সমাস হইয়াছে তাহা লিখ এবং শব্দগুলি দিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—জারি-জুরি, ভাগ-বাটোয়ারা, যুদ্ধোত্তর, কোপবহ্নি, কানাকানি, জনগণমন-অধিনায়ক, শোকাকুল, স্বর্ণাক্ষর।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিজ্ঞান ) '৫৬**

[ আট ] থানা-পুলিস, দুধে-ভাতে, ঘর-পালানো, বাটা-ভরা, ঘর-পিছু, অতি-মানব, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভুক্তাবশেষ—ইহাদের মধ্য হইতে যে কোন পাঁচটি সমস্ত-পদের ব্যাসবাক্য বল এবং উহাদের লইয়া বাক্য রচনা কর।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিজ্ঞান ) '৫৫**

[ নয় ] উদাহরণ-সহযোগে নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির ব্যাখ্যা লিখ :—সমাহার দ্বিগু ( **ঢা. বি. বি. এ. '৫০** ) ; সমাহার দ্বিগু ও উপমিত সমাস ( **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৩** ) ; দ্বিগু সমাস, বহুব্রীহি সমাস, নঞ্ তৎপুরুষ, রূপক কর্মধারয়, উপমিত কর্মধারয় ( **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৬** ) ; অলুক্ সমাস ( **গৌ. বি. বি. এ. '৫০** ) ; বহুব্রীহি সমাস ( **গৌ. বি. বি. এ. '৫১** ) ; উপমাত্মক বহুব্রীহি (**ক. বি. বি এ. '৫০**) ; একদেশ সমাস ও ব্যতিহার বহুব্রীহি ( **ক. বি. বি. এ. '৫১** ) ; অলুক তৎপুরুষ ও রূপক কর্মধারয় [ **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৩** ] ; অলুক্ দ্বন্দ্ব [ **রা. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫** ] ; অলুক সমাস, উপমিত সমাস, উপপদ সমাস ও নিত্য সমাস ( **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭** ) ; দ্বন্দ্ব সমাস [ **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প '৫৭** ] ; রূপক সমাস, বহুব্রীহি সমাস, অব্যয়ীভাব সমাস ( **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৮** ) ; অলুক্ সমাস [ **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প) '৫৮** ]।

[ দশ ] সমাস নির্ণয় করিয়া অর্থপার্থক্য লিপিবদ্ধ কর :—বসন্তসখা, বসন্তসখ ; মহাধন, মহদ্ধন ; মাতাপিতা, মাতৃপিতা ; সূত্রধর, সূত্রধার ; স্বপত্নী, সপত্নী।

[ এগারো ] অর্থের দরুণ সমাস পার্থক্য নির্ণয় কর :—কীর্তিমন্দির ; কাশীবাসী ; সুপুরুষ , বাগ্দত্তা।

[ বারো ] নিম্নলিখিত সমাসগুলির পার্থক্য দেখাও :—কর্মধারয় ও বহুব্রীহি ; সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ; গতি ও নিত্য ; মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি ; প্রাদি ও অব্যয়ীভাব ; নঞ্ তৎপুরুষ ও নঞ্ বহুব্রীহি।

[ তেরো ] নিম্নলিখিত সমাসগুলির ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ কর :—উপপদ তৎপুরুষ সমাস ; সহসুপা বা সুপ্সুপা সমাস ; অসংলগ্ন সমাস ; পদগর্ভ সমাস ; মিশ্র সমাস।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## শব্দগঠন

## লিঙ্গ বচন ও পদাশ্রিত-নির্দেশক

### লিঙ্গ

পার্থিব বস্তুমাত্রই পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব, এই তিন শ্রেণীর। প্রাণীদিগের মধ্যে পুরুষ **পুংলিঙ্গ** আর স্ত্রী **স্ত্রীলিঙ্গ**ঃ যেমন,—'বালক, পুরুষ' প্রভৃতি পুংলিঙ্গ; কিন্তু 'বালিকা, স্ত্রী' প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ। পক্ষান্তরে, প্রাণহীন বা অচেতন অথবা স্বভাবতঃ চলচ্ছক্তিহীন বস্তু অথবা ক্রিয়া বা ভাবের নাম **ক্লীবলিঙ্গ**ঃ যেমন,—পাথর, গাছ, আকাশ, জল, পর্বত, রোদ, ছুরি, সমুদ্র, ঘুম, বই, সরম, রাগ, গাঙ্'. পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রী-রূপ দ্বিবিধঃ একটি রূপ বুঝায় সেই শ্রেণীর বা জাতির স্ত্রীলোককে এবং অপর রূপ বুঝায় সেই শ্রেণীরই বা জাতিরই পুরুষের পত্নীকেঃ যেমন,—'ভাই' এই শ্রেণী বা পর্যায়ের স্ত্রী-রূপ হইতেছে 'বোন, ভগ্নী, ভগিনী'; কিন্তু অপর রূপে 'ভাইয়ের পত্নী' অর্থে 'ভাজ' হয়।

বাংলায় পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করিবার উপায় তিনটিঃ

**(১) স্বতন্ত্র শব্দ দ্বারা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ-প্রদর্শন**

| পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ | পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ | পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ |
|---|---|---|
| দাদা—দিদি; বৌদিদি | বর—বধু, কন্যা, ক'নে | ছাহেব—ছাহেবা, বিবি, খাতুন |
| ভাশুর; দেওর—ননদ; জা | কর্তা—গৃহিণী, গিন্নি, কর্ত্রী | |
| বেটা, ছেলে, পো—মেয়ে, ঝি; বউ | পুত্র—কন্যা; স্নুষা, পুত্রবধূ<br>রাজা—রাজ্ঞী, রাণী | লর্ড, লাট—লেডী |
| জামাই—বউ; ঝি, মেয়ে | পুরুষ—নারী, প্রকৃতি, মহিলা | গোলাম, নফর, বান্দা—বাঁদী |
| তালুই, তাউই, তাঐ—মাউই, মাঐ, আবুই, আবুই-মা | শুক—সারি, সারিকা<br>ভূত, প্রেত—প্রেতিনী, পেত্নী<br>স্বামী—স্ত্রী, জায়া, ভার্যা, সহধর্মিণী | চাকর—দাসী, ঝি, চাকরানী<br>খানসামা, খিদ্‌মৎগার—আয়া<br>বাদশাহ, নবাব—বেগম |
| নাতী—নাতনী; নাতবৌ | সাহেব, গোরা—বিবি, মেম | খাঁ—খানম |

**(২) সাধারণ শব্দে পুরুষ বা স্ত্রী-বোধক শব্দযোগে লিঙ্গ-নির্দেশ**

| পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ | পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ | পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ |
|---|---|---|
| বসু—বসুজায়া | যাত্রী—মেয়ে-যাত্রী, স্ত্রী-যাত্রী | বেটা-ছেলে—মেয়ে-ছেলে |
| কবি—মহিলা-কবি, স্ত্রী-কবি, মেয়ে-কবি | গোসাই—মা-গোসাই<br>পুরুষ-মানুষ—মেয়ে-মানুষ | এঁড়ে-বাছুর—নই-বাছুর, বকন-বাছুর |

| পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ | পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ | পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ |
|---|---|---|
| গয়লা—গয়লা-বৌ | মদ্দা-হাঁস—মাদী-হাঁস | উড়ে—উড়েনী, উড়েবৌ |
| ডাক্তার—লেডী-ডাক্তার | প্রভু—প্রভু-পত্নী | দত্ত—দত্তগিন্নী, দত্তবৌ |
| কর্মী—কর্মিণী, মহিলা-কর্মী | শিল্পী—নারী-শিল্পী | উট—মাদী-উট, উটনী |
| চিল—মাদী-চিল, স্ত্রী-চিল | পুলিশ—মেয়ে-পুলিশ | বৃষ, ষাঁড়, বলদ, ষাঁড়-গোরু —গাই-গোরু |
| প্রতিনিধি—মহিলা-প্রতিনিধি | কাপুরুষ—মেয়ে-কাপুরুষ | |

## (৩) পুং-বাচক নামের অন্তে স্ত্রী-প্রত্যয়যোগে লিঙ্গ-নির্দেশ

| পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ | পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ | পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ |
|---|---|---|
| বিদ্বান্—বিদুষী | তনু—তন্বী | পণ্ডিত—পণ্ডিতা ; পণ্ডিতানী |
| আয়ুষ্মান্—আয়ুষ্মতী | গুরু—গুর্বী, গুরুপত্নী | মালা—মালিনী |
| অশ্ব—অশ্বা | ব্রাহ্ম—ব্রাহ্মী, ব্রাহ্মিকা | মেধাবী—মেধাবিনী |
| সুকণ্ঠ—সুকণ্ঠা, সুকণ্ঠী | ঠাকুর—ঠাকুরাণী, ঠাক্‌রুণ | সুদন্ত—সুদতী, সুদন্তী, সুদন্তা |
| ছাত্র—ছাত্রা ; ছাত্রী | সয়া—সই | লঘু—লঘ্বী |
| গায়ক —গায়িকা ; গায়কী | খোকন—খুকনী | প্রেয়ান্—প্রেয়সী |
| শূদ্র—শূদ্রা , শূদ্রী, শূদ্রানী | চোর—চোরনী | ভূয়ান্—ভূয়সী |
| মনুষ্য—মনুষী | আহ্লাদে—আহ্লাদী, আহ্লাদিনী | ভাবুক—ভাবুকা, ভাবুকী |
| আচার্য—আচার্যা ; আচার্যানী | মিতে—মিতেন | সেবক—সেবকা, সেবিকা |
| মনু—মনাবী, মনায়ী | নন্দাই—ননদ, ননদী, ননদিনী | সম্রাট্—সম্রাজ্ঞী |
| মহাত্মা—মহীয়সী | শুক্ল—শুক্লা | অধীন—অধীনা |
| পাচক—পাচিকা | মহৎ—মহতী | সাধু—সাধ্বী |
| প্রদর্শক—প্রদর্শিকা | গরীয়ান্—গরীয়সী | মাতুল—মাতুলানী |
| সুনেতা—সুনেত্রী | দূত—দূতী | ওজস্বী—ওজস্বিনী |
| সুনেত্র—সুনেত্রা | বন্ধু—বান্ধবী ; বন্ধুনী | ঘোড়া—ঘুড়ী |

### বিশেষ দ্রষ্টব্য

**(ক)** স্ত্রীবোধক শব্দ হইতে পুং-বাচক শব্দের উৎপত্তি : যেমন,—ননদ—নন্দাই ; বোন—বোনাই ; পিসী—পিসা ; মাসী—মেসো ; ফুফী, ফুফু—ফুফা।

**(খ)** নিত্য পুংলিঙ্গ শব্দ : যেমন,—বিপত্নীক, সভাপতি, সেনাপতি, ভাই (সম্বোধনে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে ব্যবহৃত)

**(গ)** নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ : যেমন,—বিধবা, অঙ্গনা, সজনী, রূপসী, ধনী, গর্ভিণী, ডাকিনী, অরক্ষণীয়া, বড়কী, ছোটকী, এয়ো, অবীরা' কপিলা, ধাই, শাকচুন্নী।

**(ঘ)** নিপাতনে সিদ্ধ লিঙ্গ-পরিবর্তন ; যেমন,—অরণ্য—অরণ্যানী (মহারণ্য) ; হিম—হিমানী (হিমসংহতি বরফ) ; বন—বনানী (বৃহৎ বন) ; স্থল—স্থলী (অকৃত্রিম ভূমি) ; যবন—যবনানী (যবনদের লিপি) ; যব—যবানী (খারাপ যব)।

(ঙ) ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রী-বাচক '-ইকা' ও '-ঈ' প্রত্যয়ঃ যেমন,—পুস্তক—পুস্তিকা ; নাটক—নাটিকা ; মালা—মালিকা ; চয়ন—চয়নিকা ; ব্যাকরণ—ব্যাকরণিকা ; ঘট—ঘটী ; ছোরা—ছুরী ; বেড়া—বেড়ী ; ঝোড়া—ঝুড়ী ; বাটা—বাটী।

(চ) অলিঙ্গক শব্দঃ এই জাতীয় শব্দের পুংলিঙ্গ নাইঃ যেমন,—পাল্কী, জুল্‌ফি, খুঁটি, বঁটি, চুড়ি, ঝুঁটি, রুটি, চটি।

(ছ) নারীর নাম ও উপাধিতে পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গরূপে প্রচলনঃ 'সবিতা, নমিতা, নীলিমা, পূর্ণিমা, চন্দ্রমা, শশী' প্রভৃতি শব্দাদি সংস্কৃতে পুংলিঙ্গ, কিন্তু এক্ষণে নারীদের নামকরণে ইহাদের ব্যবহার সুপ্রচলিত। আবার পূর্বকালে নারীদের কুলোপাধি-অনুযায়ী 'দাশগুপ্তা, ঘোষজায়া, চৌধুরাণী, দত্তজা, বসুজায়া, দাসী' প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এক্ষণে সরাসরিভাবে আধুনিকাদের নামের পরে কুলো-পাধির লিঙ্গ পরিবর্তন না করিয়াই ব্যবহার করা হইয়া থাকেঃ যেমন,—মাধুরী দাশগুপ্ত ; প্রীতি ঘোষ ; কল্যাণী দত্ত ইত্যাদি।

(জ) সমূহার্থে স্ত্রীপ্রত্যয়ঃ যেমন,—জোড়া+ঈ=জুড়ী ; কাঁধ+ঈ=কাঁধী > কাঁদী ; ত্রিলোক+ঈ=ত্রিলোকী ; পাঁচসের+ঈ=পাঁচসেরী।

(ঝ) তারিখ অর্থে স্ত্রী-প্রত্যয়ঃ যেমন,—ষোড়শ+ঈ=ষোড়শী ; পাঁচ+ই= পাঁচই ; এইরূপ একাদশী, পঞ্চমী, তেরোই, আটই।

## বচন

যাহার দ্বারা শব্দার্থের সংখ্যা-বিষয়ে বোধ জন্মে তাহারই নাম **বচন**। বাংলায় দুইটি বচন—**একবচন** ও **বহুবচন**। দ্বিবচন নাই। একবচনে কোন প্রত্যয় নাই—মূল শব্দটির অবিকৃতভাবে বহুবচন করিতে হইলে হয় কোন প্রত্যয়, নয় কোন সমষ্টিবোধক শব্দ বসাইতে হয়ঃ যেমন,—

(১) '-রা, -এরা, -দিগ, -দিগের, -দের, -গুলি, -গুলা' প্রত্যায়াদি (ক) '-রা, -এরা' প্রত্যয় দুইটি কেবলমাত্র কর্তৃকারকেই প্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়। তবে অপ্রাণিবাচক বস্তুতেও প্রাণ বা চেতনাশক্তি আরোপ করিয়া এই প্রত্যয় দুইটি প্রয়োগ করা চলিতে পারেঃ যেমন,—'শিশুরা' ; ব্রাহ্মণেরা' ; নভোমণ্ডলের 'নক্ষত্রেরা' যেন তাহাদের নয়ন মেলিয়া এই পৃথিবীর ঘুমন্ত প্রকৃতির শিয়রে সারা রাত জাগিয়া পাহারা দেয়। আবার '-রা, -এরা' প্রত্যয়ের সঙ্গে 'সব-শব্দটিরও ব্যবহার আছে। যেমন,— 'মূর্খেরা সব'। (খ) '-দিগ, -দিগের, -দের. -দিকে, -এদের, -দের' প্রত্যয়গুলি কর্তা ভিন্ন অন্য কারকে প্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়ঃ যেমন,—'বালকদিগের ; ছাত্রদের ; ভদ্রলোকদের'। (গ) সমস্ত কারকেই প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক, উভয় প্রকার

শব্দেরই সঙ্গে অনাদরে '-গুলা' প্রত্যয় সংযোজিত হয়ঃ যেমন,—'বদমাশগুলা, শূয়ারগুলা ; ফুলগুলি, গোরুগুলি'। প্রসঙ্গতঃ ইহাও লক্ষণীয় যে, উচ্চশ্রেণীর অথবা মানী ব্যক্তিগণের নামবাচক শব্দে এই প্রত্যয় দুইটি চলে নাঃ যেমন,—'শিক্ষকগুলি', 'শিক্ষকগুলা' হবে না, হবে 'শিক্ষকগণ' ; এইরূপ 'ঋষিগণ, দেবতাগণ'।

(২) 'গণ' মণ্ডলী, বর্গ, কুল, জন, লোক, সভা'—এই সমষ্টিবোধক শব্দগুলি প্রাণিবাচক একবচনাত্মক শব্দের পরে বসেঃ যেমন,—'মানবগণ, দেবগণ, বিবুধমণ্ডলী, রাজন্যবর্গ, ধেনুকুল, সাধুজন, মূর্খলোক, পণ্ডিতসভা'।

(৩) 'মহল, দিগর' এই সমষ্টিবোধক বিদেশী শব্দগুলি প্রাণিবাচক একবচনাত্মক শব্দের পরে বসেঃ যেমন,—'লবীমহল, যোগীন্দ্রনাথ সরকার-দিগর' ( অর্থাৎ যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও তাঁহার সহযোগীরা )।

(৪) 'গ্রাম, চয়, দাম, নিকর, মণ্ডল, মালা, রাশি, রাজি, বৃন্দ'—এই সমষ্টিবোধক শব্দগুলি অপ্রাণিবাচক একবচনাত্মক শব্দের পরে বসেঃ যেমন,—ইন্দ্রিয়গ্রাম, পুষ্পচয়, বিদ্যুদ্দাম, কমলনিকর, মেঘমণ্ডল, নক্ষত্রমালা, কুসুমরাশি, বৃক্ষরাজি, সভ্যবৃন্দ'।

(৫) 'আবলী, নিচয়, সকল, সব, সমুচয়, সমূহ' —এই সমষ্টিবোধক শব্দগুলি প্রাণী ও অপ্রাণী উভয়বোধক শব্দের পরে বসেঃ যেমন,—'চিত্রাবলী, পঞ্চাবলী ; পুষ্পনিচয়, পশুনিচয় ; ছাত্রসকল, দোষসকল ; ভাইসব, দোষসব; মনুষ্যসমুচয়, বৃক্ষসমুচয় ; ছাত্রসমূহ, দোষসমূহ'।

(৬) 'অনেক, বহু, অজস্র, প্রচুর, দেদার'—এই সমষ্টিবোধক শব্দগুলি একবচনাত্মক শব্দের পূর্বে বসাইয়া বহুবচন করা যায়ঃ যেমন,—'অনেক লোক, বহু দোষ, অজস্র অর্থ, প্রচুর টাকা, দেদার স্ফূর্তি'।

(৭) 'পত্র'—এই শব্দটি অপ্রাণিবাচক একবচনাত্মক শব্দের পরে বসেঃ যেমন,—'জিনিসপত্র, কাগজপত্র'।

(৮) দ্বিরুক্তি অর্থাৎ শব্দদ্বৈতের দ্বারা বহুবচনের ভাব প্রকাশ করা যায়ঃ যেমন,—( ক ) দ্বিরুক্তি বিশেষ্য—এই কথা আমি 'জনে জনে' (=নানা জনকে) বলিব। এইরূপ 'বনে বনে ; ভাই ভাই'। ( খ ) দ্বিরুক্তি বিশেষণ—বাজারে 'বড় বড়' মাছ ( =বড় আকৃতির মৎস্যসমূহ ) আসে। এইরূপ 'লাল লাল' ফুল ; 'উঁচু উঁচু' পাহাড়।

## পদাশ্রিত-নির্দেশক বা বস্তুনির্দেশক

'টা, টি, টুকু, টুকুন্, টুক্, খানা, খানি, গাছা, গাছ, গাছি, জন'—এই শব্দ বা শব্দাংশগুলিকে বলা হয় **পদাশ্রিত-নির্দেশক** প্রত্যয়। কারণ,—ইহারা বিশেষ্য বা বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক বিশেষণের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া বিশেষ্য বা

সংখ্যাবাচক শব্দকে বিশেষ ভাবে নির্দেশ করে। যেমন,—'বইখানা, বইখানি লাঠিগাছা, লাঠিগাছ' ইত্যাদি।

একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পদাশ্রিত-নির্দেশকসমেত সংখ্যাবাচক বিশেষণ যখন বিশেষ্যের পূর্বে বসে, তখন একটা **অনির্দিষ্টভাব** সংক্রামিত করে, কিন্তু যখন ইহা বিশেষ্যের পরে বসে, তখন ইহা **সুনির্দিষ্টভাব** সঞ্চারিত করে: যেমন,—'তিনখানা বই' অনির্দিষ্ট তিনখানা বইকে বুঝায়, কিন্তু 'বই তিনখানা' সুনির্দিষ্ট বা সুপরিজ্ঞাত তিনখানা বইকে বুঝায়। ঠিক এইরূপ 'পাঁচটি ছেলে', 'দশজন প্রজা', একটা বালক বা বালক একটা', 'চারগাছা ডাঁটা' অনির্দিষ্ট ভাবদ্যোতক এবং 'ছেলে পাঁচটি', 'প্রজা দশজন', 'বালকটা', 'ডাটা চারগাছা' সুনির্দিষ্ট ভাবদ্যোতক।

অবশ্য সংখ্যাবাচক বিশেষণের আগে পদাশ্রিত নির্দেশক জুড়িয়াও অনির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করা যায়: যেমন,—'জন-চার-ছাত্র', 'খান-ছয় গামছা', 'গাছ-কতক ডাঁটা'। আবার অনিশ্চয়তা-বোধক প্রত্যয় 'এক' সংখ্যাবাচক শব্দে যোগ করিয়া অনির্দিষ্ট ভাবকে আরও জোরালো করিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে: যেমন,—'জন চারেক ছাত্র', 'খান-ছয়েক গামছা', 'গাছ পাঁচেক লাঠি', খান-সাতেক রুটি'।

**'টা' ও 'টি'**

এই দুইটি পদাশ্রিত-নির্দেশক প্রত্যয়ের মধ্যে প্রথমটি বিরক্তি বা অবজ্ঞা-বোধক এবং শেষোক্তটি সাধারণতঃ স্নেহ বা সহানুভূতিব্যঞ্জক: যেমন,—'ছাত্রটা' বড়ই অমনোযোগী। 'ছাত্রটি বেশ মেধাবী।

**'টুকুন্', 'টুকু' ও 'টুক্'**

এই তিনটি পদাশ্রিত-নির্দেশক প্রত্যয় পরিমাণবাচক শব্দের সঙ্গে বসে। 'টুকুন্' স্বল্পতম পরিমাণব্যঞ্জক এবং স্নেহাদরবোধকও বটে: যেমন,—শ্বশুরবাড়িতে জামাইকে ঐ 'দুধটুকুন্' খাওয়ানোর জন্য শাশুড়ির কতই-না প্রয়াস দেখা গেল। 'টুকু' সাধারণভাবে পরিমাণজ্ঞাপক: যেমন,—'দুধটুকু' খেয়ে ফেল। আবার এই 'টুকু' ক্রিয়া-বিশেষণেও ব্যবহৃত হয়: যেমন,—আমি তোমার অনুরোধ 'এতটুকু' শুনিব না। 'টুক্' স্বল্পতম পরিমাণজ্ঞাপক, কিন্তু অবজ্ঞাবোধক: যেমন,—বিড়ালের উচ্ছিষ্ট ঐ 'দুধটুক্' ফেলে দাও।

**'খানা' ও 'খানি'**

এই দুইটি পদাশ্রিত-নির্দেশক প্রত্যয় দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-সমন্বিত আয়তনবোধক। তবে 'খানা' বড় আয়তনের জিনিসকে আর 'খানি' ছোট আয়তনের জিনিসকে বুঝায়: যেমন,—'কাপড়খানা', 'গামছাখানি'। তবে 'খানি' পদাশ্রিত-নির্দেশক আদরার্থে সরু জিনিসের সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হয়: যেমন,—"শুধু 'বাঁশীখানি' হাতে দাও তুলি।"

**'গাছা', 'গাছি' ও 'গাছ'**

এই পদাশ্রিত-নির্দেশক প্রত্যয় তিনটি সরু ও লম্বা জিনিসের বেলায় বসে। 'গাছা' ও 'গাছ' লম্বা জিনিসের সম্পর্কে ও 'গাছি' সরু জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ঃ যেমন,—'লাঠিগাছা, লাঠিগাছ'; 'ছড়িগাছি'।

ইহা ছাড়া, 'এক, টা, টো, জন, খান, গোটা'—এই কয়টির অনির্দেশক প্রত্যয়রূপে ব্যবহার লক্ষণীয়ঃ যেমন,—'এক' রাজা ছিলেন। 'একটা' কথা বলি। 'দুটো' ভাত চাই। 'জনতিনেক' ছেলে। 'খানপাঁচেক' খাতা। 'গোটাকতক' আম।

## অনুশীলনী

[এক] নিম্নলিখিত যে কোন পাঁচটির স্ত্রীলিঙ্গের রূপ লিখঃ—অশ্ব, বিদ্বান্, সম্রাট্, আচার্য, বাদশাহ, ঠাকুর, কবি, ডাক্তার, মহাত্মা, শুক্র। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫০**

[দুই] নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে কোনও পাঁচটির লিঙ্গ পরিবর্তন কর এবং বাক্য রচনা করিয়া উদাহরণ দাওঃ পাচক, মহৎ, বিদ্বান, সাধু, গরীয়ান্, সম্রাট্, মাতুল, কর্তা, কবি, কাপুরুষ। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৩**

[তিন] নিম্নলিখিত নির্দেশানুসারে পৃথক্ পৃথক্ বাক্য রচনা করঃ—(ক) বিশেষ্যের দ্বিত্বের দ্বারা বহুবচন; (খ) অনির্দিষ্ট বা সুনির্দিষ্ট ভাব বুঝাইতে পদাশ্রিত-নির্দেশক-সংযুক্ত সংখ্যাবাচক বিশেষণের ব্যবহার; (গ) বিশেষণের দ্বিত্বের দ্বারা বিশেষ্যের বহুবচন। (**ক. বি. বি. এ. '৪৮**)। দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুবচন-প্রকাশ। [**ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প)** '৫৩]

[চার] টি, টা, খানি, খানা, টুকু, টুকুন্, গাছি, গাছা প্রভৃতি নির্দেশাত্মক বা খণ্ডসূচক প্রত্যয়ের প্রয়োগের বিভিন্ন অর্থ ও উপলক্ষ্য উদাহরণ-সাহায্যে পরিস্ফুট কর। **ক. বি. মাধ্যমিক '৫৩**

[পাঁচ] 'টা', 'টি', 'খানা', 'খানি' প্রভৃতি নির্দেশ-বা পরিমাণ-সূচক প্রত্যয়-গুলির বিভিন্নরূপ প্রয়োগ উদাহরণ-সহযোগে বুঝাইয়া দাও। **ক. বি. বি. এ. '৫৪**

[ছয়] নিম্নলিখিত যে কোনও পাঁচটির ব্যাখ্যা লিখ ও উদাহরণ দাওঃ—উভয় লিঙ্গ (**রা. বি. মাধ্যমিক '৫৪**); নিত্য পুংলিঙ্গ; নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ, অলিঙ্গক শব্দ; সমূহার্থে স্ত্রী-প্রত্যয়; ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রী-প্রত্যয়; তারিখার্থে স্ত্রী-প্রত্যয়।

[সাত] বহুবচন করিবার বেলায় নিম্নলিখিত প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দাবলীর প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ করঃ— -রা, -দের, -গুলি, -গুলা, গণ, মণ্ডলী, সভা, লোক, মহল, দিগর, গ্রাম, দাম, বৃন্দ, রাজি, আবলী, নিয়চ, সকল, অনেক, বহু, দেদার, প্রচুর, পাত্র।

# সপ্তম অধ্যায়

## শব্দগঠন

### বিশেষণের তারতম্য বা অতিশায়ন

সংস্কৃতের ন্যায় বাংলা ভাষায়, বিশেষতঃ সাধু ভাষায়, দুয়ের মধ্যে তারতম্য দেখাইতে বিশেষণ শব্দের পরে '-তর' অথবা 'ঈয়স' ( -ঈয়সুন ) এবং বহুর মধ্যে তারতম্য দেখাইতে বিশেষণ শব্দের পর '-তাম' অথবা '-ইষ্ঠ' ( -ইষ্ঠন্ ) প্রত্যয় যোগ করা হয় ঃ যেমন,—লঘু—লঘুতর, লঘীয়ান্—লঘুতম, লঘিষ্ঠ। বহু—বহুতর, ভূয়ান্—বহুতম, ভূয়িষ্ঠ। শ্রী ( প্রশস্য )—শ্রেয়ান্ ( শ্রেয়ঃ )—শ্রেষ্ঠ। প্রিয়—প্রেয়ান্ ( প্রেয়ঃ ), প্রিয়তর—প্রেষ্ঠ, প্রিয়তম। বৃদ্ধ—বর্ষীয়ান্, জ্যায়ান্—বর্ষিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ। যুবা—যবীয়ান্—যবিষ্ঠ। অল্প—কনীয়ান্—কনিষ্ঠ। স্বাদু—স্বাদীয়ঃ, স্বাদুতর—স্বাদিষ্ঠ, স্বাদুতম। গুরু—গরীয়ান্, গুরুতর—গরিষ্ঠ, গুরুতম। উরু—বরীয়ান্—বরিষ্ঠ। মহৎ—মহীয়ান্, মহত্তর—মহিষ্ঠ মহত্তম। তবে একটি কথা। তারতম্যবোধক '-ঈয়স', '-ইষ্ঠ' প্রত্যয় দুইটি বাংলায় প্রায়ই সাধারণ বিশেষণের ন্যায় প্রচলিত ঃ যেমন,—'সুন্দর স্বাদযুক্ত' অর্থ 'স্বাদিষ্ঠ', 'প্রভূত' অর্থে 'ভূয়সী', 'বলশালী' অর্থে 'বলিষ্ঠ', 'অগ্রজ' অর্থে 'জ্যেষ্ঠ', 'প্রিয়া স্ত্রী' অর্থে 'প্রেয়সী', 'মহৎ গুণবিশিষ্টা' অর্থে মহীয়সী, 'উৎকৃষ্ট' অর্থে 'শ্রেষ্ঠ' শব্দাদি ব্যবহৃত হয়। আবার কদাচিৎ ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে, তারতম্যবোধক '-তর', '-তম' প্রত্যয় দুইটিও তুলনা না বুঝাইয়া গুণাধিক্য বুঝায় ঃ যেমন—'ঘোরতর' ( =অতীব ঘোর বা কঠিন ) বিপদ ; 'গুরুতর' (=অতীব গুরু) সমস্যা ; 'উত্তম' ( =খুব ভাল ) ছেলে। ব্যাকরণমতে 'শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম, কনিষ্ঠতম' যদিও ভুল তবু বাংলায় ইহাদের প্রচলন আছে।

খাঁটি বাংলায় দুইটি ব্যক্তি বা পদার্থের মধ্যে তুলনাকালে 'হইতে', 'থেকে', 'চেয়ে', 'অপেক্ষা' প্রভৃতি শব্দকে বিশেষ্যের পরে বসাইয়া তারতম্য প্রদর্শিত হয় ঃ যেমন,—সোনার 'চেয়ে' হীরার দাম বেশি। পক্ষান্তরে, বহুর মধ্যে তারতম্য দেখাইবার ব্যাপারে 'সকল', 'সর্বাপেক্ষা', 'সব চেয়ে' প্রভৃতি শব্দ বা শব্দসমষ্টি ব্যবহৃত হয় ঃ যেমন,—ভারতীয় নৃত্যকলায় উদয়শংকর 'সব চেয়ে' বড় নৃত্যশিল্পী।

### অনুশীলনী

[ এক ] নিম্নলিখিত বিষয়টি ব্যাখ্যা কর ও উদাহরণ দাও ঃ—বিশেষণের তারতম্য।

[ দুই ] নিম্নোদ্ধৃত প্রতিটি শব্দের দুই এবং বহুর তারতম্যবোধক শব্দাদি গঠন করিয়া বাক্য রচনা কর ঃ—গুরু, বহু, শ্রী, প্রিয়, বৃদ্ধ, যুবা, অল্প।

[ তিন ] খাঁটি বাংলায় দুই বা ততোহধিকের মধ্যে কি ভাবে তারতম্য দেখানো হয় ? উদাহরণ দাও।

# অষ্টম অধ্যায়

## শব্দদ্বৈত

বাংলা ভাষায় একই শব্দ বা পদের দ্বিত্ব বা দ্বৈতরূপক প্রয়োগে বিভিন্ন অর্থের প্রকাশ হয়। এই শব্দদ্বৈত দ্বন্দ্বসমাসের পর্যায়ভুক্ত হয়। শব্দদ্বৈত তিন রকমে গঠিত হইয়া থাকে : **প্রথমতঃ**, একই শব্দের পুনরাবৃত্তিযোগে : যেমন,—'চোখে-চোখে ; শীত-শীত' ; **দ্বিতীয়তঃ**, একই শব্দের সহিত সমার্থক বা অনুরূপ অর্থ-সমন্বিত অপর এক শব্দযোগে : যেমন,—'জন-মানব ; গা-গতর'। **তৃতীয়তঃ**, অনুকার বা বিকারজাত শব্দযোগে : যেমন,—'হুপ্-হাপ্ ; টিপ্-টাপ্'।

**শব্দদ্বৈতাদির প্রয়োগ ও অর্থ**

**(ক)** পুনরাবৃত্তি, পৌনঃপুন্য বা বাহুল্য বুঝাইতে শব্দদ্বৈত হয় : যেমন,—'বছর-বছর ; ধামা-ধামা ; মুঠা-মুঠা ; হাঁড়ি-হাঁড়ি ; বাড়ি-বাড়ি' ; যজ্ঞি-বাড়িতে 'হাতে-হাতে' কাজ না করিলে কাজ এগোয় না।

**(খ)** সাদৃশ্য, ঈষৎ অল্পতা, মৃদুতা বুঝাইতে শব্দদ্বৈত হয় : যেমন,—'জ্বর-জ্বর' ( ভাব ) ; 'শীত-শীত' ( ভাব ) করিতেছে ; 'হাসি-হাসি' মুখ ; 'কাঁদ-কাঁদ' ( ভাব ) ; 'গরম-গরম' ( ঈষৎ অল্পতা ) খাওয়া উচিত।

**(গ)** দ্বিধা, আগ্রহ, আকুলতা, ইচ্ছা বুঝাইতে শব্দদ্বৈত হয় : যেমন,—'মানে-মানে' এখান থেকে যেতে পারলেই বাঁচি ( দ্বিধা-প্রকাশক )! পূজার বন্ধের পূর্বে প্রবাসী ছাত্রদের মন 'বাড়ি-বাড়ি' করে ( আগ্রহ ও ব্যাকুলতা-প্রকাশক )। প্রেক্ষাগৃহ হইতে 'উঠি-উঠি', করিয়াও উঠিতে পারিলাম না ( ইচ্ছাপ্রকাশক )। 'টাকা-টাকা' করিয়া রাম পাগল হইয়াছে ( আগ্রহ ও ব্যাকুলতা-প্রকাশক )।

**(ঘ)** সম্পূর্ণতা বুঝাইতে বিভিন্ন শব্দযোগে শব্দদ্বৈত হয় : যেমন,—'গা-গতর ; ভেবে-চিন্তে ; করে-কম্মে ; পূজা-আচ্চা ; মাথা-মুণ্ডু ; বিদেশ-বিভুঁই ; লজ্জা-সরম'।

**(ঙ)** ইত্যাদি অর্থে শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ হইয়া থাকে : যেমন,—'রান্না-বান্না ; খাওয়া-দাওয়া ; হাঁড়ি-কুঁড়ি ; রাজা-রাজড়া'। **মন্তব্য :** 'ইত্যাদি' অর্থবোধক শব্দদ্বৈতের অর্থের সংকোচ, প্রসারণ প্রভৃতি নানাবিধ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে : যেমন,—**(১) অর্থের সংকোচ**—'কাজ-ফাজ, ভাত-ফাত ; তাস-ফাস ; লুচি-ফুচি ; মাছ-ফাছ ; ভূত-ফুত'। এখানে **ফ-যোগে অবজ্ঞা** বুঝাইতেছে। **(২) অর্থের প্রসারণ**—'কাজ-টাজ ; ভাত-টাত ; তাস-টাস ; লুচি-টুচি ; মাছ-টাচ, ভূত-টুত'। এখানে **ট-যোগে সাধারণ ভাবে শব্দের প্রসার** তথা **'অনুরূপ বস্তু'** বুঝাইতেছে। **(৩) অর্থের আমূল পরিবর্তন**—'লুচি-মুচি ; 'তেল-মেল'। এখানে **ম-যোগে অপ্রীতি** বা **রুক্ষতার** ভাব বুঝাইতেছে।

(চ) ব্যতিহার অর্থাৎ পারস্পরিক ভাব বুঝাইতে শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ হয়ঃ যেমন,—'পিঠা-পিঠি' ভাই; কথা 'চালা-চালি'; 'খেও-খেই; মারা-মারি; ঝোলা-ঝুলি'।

(ছ) বিশেষ্য, বিশেষণ পদকে দ্বিত্ব করিয়া বিশেষ্যের বহুবচন বুঝানো যায়ঃ যেমন,—'হাঁড়ি-হাঁড়ি' সন্দেশ; 'লাল-লাল' ঘোড়া; 'ছোট-ছোট' মাছ। (জ) ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, এই অর্থে ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব লক্ষণীয়ঃ যেমন,—'খাইতে খাইতে' কথা বলিলে বা হাসিলে বিষম লাগে। 'দেখ্‌তে দেখ্‌তে' অধ্যাপনায় একটি যুগ কেটে গেল। 'শুয়ে শুয়ে' বাতে ধরবে। (ঝ) বিশেষ্য, বিশেষণ পদের দ্বিত্ব করিয়া উহাদের ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে ব্যবহারও লক্ষণীয়ঃ যেমন,—'দিনে দিনে' হচ্ছে বেশ। বাতাস 'মন্দ-মন্দ' বহিতেছিল। **মন্তব্যঃ** এই অনুচ্ছেদে যে দ্বিরুক্তিগুলি আছে, তাহাদিগকে সাধারণভাবে 'শব্দদ্বৈত' বলা হয়। কিন্তু এই দ্বিরুক্তিগুলির বিশেষ প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদিগকে **পদদ্বৈত** বলাও চলে।

(ঞ) অনুকার-ধ্বনিতে শব্দদ্বৈত খুবই ঘটেঃ যেমন,—'ঝনাঝন্, কচর্-মচর্; হুড়্-দাড়্ > হুদ্দাড়্; ফিট্-ফাট্; ভুজং-ভাজং, গুখ্‌না-শাখ্‌না, খোঁচ্-খাঁচ্, নজ্-গজ্; অবুড়া-খাবুড়া (এবড়ো-খেবড়ো); আঁকু-পাকু; কট্-কট্; টন্-টন্; বক্-বক্; খাঁ-খাঁ। ধ্বনির অনুকরণে উদ্ভূত বলিয়া ইহাদিগকে **ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত** বলা যায়।

## অনুশীলনী

[এক] শব্দদ্বৈত কিরূপে গঠিত হয়? পদদ্বৈত হইতে ইহার পার্থক্য কিরূপ? শব্দদ্বৈত যে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, তাহার উদাহরণ দাও? **রা. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫৬**

[দুই] পদদ্বৈত, শব্দদ্বৈত এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত—ইহাদের পার্থক্য উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৩**

[তিন] নিম্নলিখিত প্রয়োগসমূহের উদাহরণ-সহযোগে অর্থ নির্দেশ করঃ—(ক) বিশেষণের দ্বিত্বের দ্বারা বিশেষ্যের বহুবচন (**ক. বি. বি. এ '৪৮**); (খ) অসম্পূর্ণ ক্রিয়া বুঝাইতে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব (**ক. বি. বি. এ. '৪৯**); (গ) ঈষৎ অর্থে শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ ও দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুবচন প্রকাশ [**ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৩**]।

[চার] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটিতে সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক শব্দের পুনরাবৃত্তির বিশেষ অর্থ বুঝাইয়া দাওঃ তুলতুলে, কাঁদ-কাঁদ [**ক. বি. বি. এ. '৫৮**], রাজা-রাজড়া, খাঁ-খাঁ, পূজা-আচ্চা, টাকা-টাকা (করিয়া পাগল হইয়াছে), শীত-শীত (করিতেছে), গরম-গরম (খাওয়া উচিত), সকাল-সকাল (শুইবে), শুয়ে-শুয়ে (বাতে ধরবে)। **ক. বি. মাধ্যমিক '৫৩**

[পাঁচ] স্থূলাক্ষর অংশের অর্থব্যঞ্জনা পরিস্ফুট করঃ—**মাথায় মাথায়** ভাবনা; **টাপুরটুপুর** বৃষ্টি পড়ে। **ক. বি. বি. এ. '৫৭**

# তৃতীয় পর্ব—শব্দার্থ-প্রকরণ

## প্রথম অধ্যায়

### শব্দার্থপরিচয়

### শব্দার্থের শ্রেণীবিভাগ

অর্থসম্পন্ন বা **সার্থক শব্দ** তিন রকমের হয়ঃ যথা,—বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ। (**ক**) যে শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র সুবিদিত প্রচলিত অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাই শব্দের **বাচ্যার্থ, মুখ্যার্থ** বা **শক্যার্থ**ঃ যেমন,—'বৃক্ষ, মানুষ, জল' ইত্যাদি। (**খ**) যেখানে শব্দের **মুখ্য অর্থের বদলে তৎসংশ্লিষ্ট** অন্য অর্থ বক্তার অভিপ্রেত হয়, সেখানে শব্দের **লক্ষ্যার্থ** সূচিত হয়ঃ যেমন,—হরেনের মাথায় 'গোবর-ভরা'। বলা বাহুল্য, হরেন যখন মানুষ, তখন তাহার মাথায় গোরুর ক্লেদময় দুর্গন্ধ মলমূত্র তথা গোবরের উৎপত্তি ঘটিতেই পারে না। তাহা ছাড়া, গোরুরও মাথায় গোবর থাকে না। সুতরাং, এহেন কল্পনা সাধারণ দৃষ্টিতে অর্থহীন। কিন্তু বক্তা 'গোবর' শব্দ প্রয়োগ করিয়া হরেনের মাথায় 'ধারণাশক্তির অভাব'কে নির্দেশিত করিতেছে। এখানে 'গোবর' মুখ্যার্থ প্রকাশ না করিয়া লক্ষ্যার্থ প্রকাশ করিয়াছে। (**গ**) যেখানে শব্দের বাচ্যার্থ অথবা লক্ষ্যার্থ ধরিয়া বাক্যের অর্থবোধ হয় না, বরং সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন অর্থ সূচিত হয়, সেখানে শব্দের বিরূপ অর্থ ধরিতে হয়—ইহাই শব্দের **ব্যঙ্গার্থ**ঃ যেমন,—সে 'পটোল তুলিয়াছে'। এখানে 'পটোল তোলা'র ব্যঙ্গার্থ 'মৃত্যু হওয়া'।

### শব্দার্থের পরিবর্তন-লীলা

ভাষায় এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যাহাদের প্রচলিত অর্থের সহিত ব্যুৎপত্তিগত তথা মূল অর্থের কোন সম্বন্ধ নাই। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, শব্দাদির কোথাও-বা অর্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ, কোথাও-বা অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ, কোথাও-বা অর্থের প্রসার, কোথাও-বা অর্থের সংকোচ আবার কোথাও-বা অর্থের আমূল পরিবর্তনই ঘটিয়াছে।

**অর্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ**

মূল অর্থ পরিহার করিয়া কোন শব্দের অর্থগৌরব দেখা দিলে শব্দার্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ হয়ঃ যেমন,—বাধিত—পীড়িত ( মূল অর্থ ); কৃতজ্ঞ ( প্রচলিত অর্থ )। সম্ভ্রম—ভ্রান্তি ( মূল অর্থ ); মর্যাদা ( প্রচলিত অর্থ )। মন্দির—গৃহ ( মূল অর্থ ); দেবালয় ( প্রচলিত অর্থ )। ধ্যান—চিন্তা (মূল অর্থ); পরমার্থ-চিন্তা ( প্রচলিত অর্থ )। মান—পরিমাপ ( মূল অর্থ ); সম্মান ( প্রচলিত অর্থ )। সংকীর্তন—গুণাদি কথন ( মূল অর্থ ); শ্রীহরির মাহাত্ম্যগান ( প্রচলিত অর্থ )। সাহস—হঠকারিতা, বলপূর্বক কৃত দুষ্কর্ম ( মূল অর্থ ); বিপদসংকুল কর্মে নির্ভয় উদ্যম ( প্রচলিত অর্থ )। 'মন্দির', 'ধ্যান' ও 'সংকীর্তন'—এই শব্দত্রয়ের অর্থের উৎকর্ষের সঙ্গে সংকোচও ঘটিয়াছে।

**অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ**

মূল অর্থ পরিহার করিয়া কোন শব্দের অর্থের অগৌরব বা হীনতা দেখা দিলে শব্দার্থের অবনতি বা অপকর্ষ হয়ঃ—যেমন,—ইতর—অপর লোক ( মূল অর্থ ); ছোট লোক ( প্রচলিত অর্থ )। মহাজন—মহাপুরুষ ( মূল অর্থ ); উত্তমর্ণ, বণিক্ ( প্রচলিত অর্থ )। ঠাকুর—গুরু, দেবতা ( মূল অর্থ ); পাচক ব্রাহ্মণ ( প্রচলিত অর্থ )। অর্বাচীন—পরবর্তী, অপ্রাচীন ( মূল অর্থ ); আনাড়ী, অনভিজ্ঞ, অপরিণত-বুদ্ধি ( প্রচলিত অর্থ )। রাগ—রঙ্, প্রীতি, অনুরাগ ( মূল অর্থ ); ক্রোধ ( প্রচলিত অর্থ )। ঝি—কন্যা ( মূল অর্থ ); চাকরানী ( প্রচলিত অর্থ )। সাধু—ধার্মিক, সৎ ( মূল অর্থ ); বণিক্ ( প্রচলিত অর্থ )। বৈরাগী—সংসারে অনাসক্ত ( মূল অর্থ ); বৈষ্ণব ভিক্ষু ( প্রচলিত অর্থ )।

**অর্থের প্রসার**

কোন কোন সংস্কৃত শব্দ মূলগত সংকুচিত বিশেষ অর্থটি না বুঝাইয়া বাংলায় সামান্য অর্থাৎ ব্যাপক অর্থটি বুঝায় আর ইহাই প্রচলিত অর্থঃ যেমন,—ফলাহার—ফল ভক্ষণ ( মূল অর্থ ); মিষ্টান্নাদি আহার ( প্রচলিত অর্থ )। কালি—কালো রঙ ( মূল অর্থ ); লাল কালি, সবুজ কালি, নীল কালি ইত্যাদি যে কোন রঙ্ ( প্রচলিত অর্থ )। তৈল—তিল হইতে জাত স্নেহপদার্থ ( মূল অর্থ ); রেড়ির তৈল, নারিকেল তৈল, সরিষার তৈল ইত্যাদি যে কোন স্নেহপদার্থ ( প্রচলিত অর্থ )। বাঁশি—বংশনির্মিত ফুৎকার-বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ( মূল অর্থ ); যে কোন ফুৎকার-বাদ্যযন্ত্র ( প্রচলিত অর্থ )। গৌরচন্দ্রিকা—কীর্তনগানের পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনাজ্ঞাপক পদবিশেষ ( মূল অর্থ ); যে কোন বিষয়ের অবতরণিকা ( প্রচলিত অর্থ )। পরশু—এই বাংলা শব্দটি সংস্কৃত 'পরশ্বঃ' শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই সংস্কৃত শব্দটির মূল অর্থ 'আগামী কল্যের পর দিন', কিন্তু বাংলায় এই অর্থটি ছাড়াও 'গত কালের পূর্ব দিন' অর্থে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

গাঙ্—এই বাংলা শব্দটি সংস্কৃত 'গঙ্গা' শব্দ হইতে উদ্ভূত। এই সংস্কৃত শব্দটির মূল অর্থ 'গঙ্গা নামে নদী' ; কিন্তু বাংলায় ইহা 'নদীমাত্র'কেই বুঝায়।

## অর্থের সংকোচ

কোন কোন সংস্কৃত শব্দ মূলগত সামান্য অর্থাৎ ব্যাপক অর্থ না বুঝাইয়া বাংলায় সংকুচিত বিশেষ অর্থটি বুঝায় আর ইহাই প্রচলিত অর্থঃ যেমন,—সম্বন্ধী—যাহার সহিত সম্বন্ধ আছে ( মূল অর্থ ) ; শ্যালক ( প্রচলিত অর্থ )। পঙ্কজ—পঙ্কে যাহা জাত ( মূল অর্থ ) ; পদ্ম ( প্রচলিত অর্থ )। মিছরী—মিসর দেশের জিনিস ( মূল অর্থ ) ; শর্করাখণ্ড ( প্রচলিত অর্থ )। অন্ন—যাহা খাওয়া হয় (মূল অর্থ ) ; ভাত ( প্রচলিত অর্থ )। মহোৎসব—বড় উৎসব ( মূল অর্থ ) ; বৈষ্ণব উৎসববিশেষ অর্থাৎ মোচ্ছব ( প্রচলিত অর্থ )। ক্ষীর—দুগ্ধ ( মূল অর্থ ) ; ঘনায়িত দুগ্ধ ( প্রচলিত অর্থ )। পানি —যে কোন রকমের পেয় বস্তু ( মূল অর্থ ) ; জল ( প্রচলিত অর্থ )। বৈবাহিক—বিবাহ-সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তি ( মূল অর্থ ) ; জামাতার বা পুত্রবধূর পিতা ( প্রচলিত অর্থ )। করী—কর আছে যাহার ( মূল অর্থ ) ; হস্তী ( প্রচলিত অর্থ )।

## অর্থের আমূল পরিবর্তন

বাংলায় সংস্কৃত শব্দের অর্থের উন্নতি, অবনতি, প্রসার বা সংকোচ, ইহাদের মধ্যে কোনটিই ঘটে নাই অথচ অর্থের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এমন বহু উদাহরণ মিলেঃ যেমন,—সন্দেশ—সংবাদ ( মূল অর্থ ) ; মিষ্টান্নবিশেষ ( প্রচলিত অর্থ )। প্রসাদ—অনুগ্রহ ( মূল অর্থ ) ; ভুক্তদ্রব্যের অবশেষ, নিবেদিত ভোজ্য বস্তু ( প্রচলিত অর্থ )। তত্ত্ব—খবর ( মূল অর্থ ) ; কুটুম্ববাড়িতে প্রেরিত নানাবিধ উপঢৌকন দ্রব্য ( প্রচলিত অর্থ )। ঘর্ম—গরম ( মূল অর্থ ) ; ঘাম, স্বেদ ( প্রচলিত অর্থ )। কৃপণ—কৃপার পাত্র ( মূল অর্থ ) ; ব্যয়কুণ্ঠ ( প্রচলিত অর্থ )। তিরস্কার—অদৃশ্য হওয়া ( মূল অর্থ ) ; ভর্ৎসনা ( প্রচলিত অর্থ )। আবার ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ( ১ ) লক্ষণার দ্বারা অর্থের আমূল পরিবর্তন ঘটেঃ যেমন,—'পুলক' শব্দের অর্থ 'রোমাঞ্চ' ; কিন্তু লক্ষণার দ্বারা এই শব্দ 'আনন্দ'কেও বুঝায়। ( ২ ) ব্যঞ্জনার দ্বারাও অর্থের আমূল পরিবর্তন ঘটেঃ যেমন,—'গুরু-গোঁসাই', 'ধুরন্ধর'। ( ৩ ) বিশিষ্টার্থক পদেও শব্দের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া থাকেঃ যেমন,—'তীর্থের কাক', 'ধামা-ধরা', 'ঘরের ঢেঁকি' ইত্যাদি।

শব্দার্থের এই পরিবর্তনলীলা পরবর্তী উদাহরণাদিতেও পরিলক্ষিত হইবে। প্রতিটি শব্দের প্রথম অর্থটি মূলগত তথা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং দ্বিতীয় অর্থটি বাংলায় প্রচলিত অর্থঃ যেমন,—

**অনটন**—(১) ভ্রমণাভাব ; (২) অভাব।
**অনিবার**—(১) অনিবার্য ; (২) সতত।
**অনুপপত্তি**—(১) প্রমেয়ের অসিদ্ধি (২) অভাব।
**অনুবাদ**—(১) পশ্চাৎ ভাষণ ; (২) ভাষান্তরীকরণ।
**অপর্যাপ্ত**—(১) অল্প ; (২) প্রচুর।
**অপ্রতুল**—(১) অসম ; (২) অভাব।
**অবকাশ**—(১) অন্তর (ফাঁক) ; (২) অবসর, ছুটি।
**অবদান**—(১) পূজা বা অর্চনার্থ দান ; (২) দান।
**অসুখ**—(১) দুঃখ ; (২) রোগ
**আঙ্গিক**—(১) অঙ্গ-সম্বন্ধীয় অভিনয়ের প্রকার ; (২) গঠন-প্রণালী, প্রমুতি।
**আক্রোশ**—(১) শব্দ ; (২) ক্রোধ।
**আজি**—(১) যুদ্ধ ; (২) অদ্য।
**আতর**—(১) তরপণ্য ; (২) সুগন্ধি দ্রব্য।
**আদায়**—(১) লইয়া (গৃহীত্বা) ; (২) পাওয়া।
**আপ্যায়িত**—(১) বর্ধিত ; (২) তৃপ্ত।
**আম**—(১)অপক্ব ; (২) ফলবিশেষ।
**আমাশয়**—(১) অন্নের অংশ ; (২) রোগবিশেষ।
**আরতি**—(১) ক্রীড়া, তৃপ্তি ; (২) নীরাজনাবিধি।
**ইতি**—(১) এই ; (২) পত্রাদির সমাপ্তিসূচক বাক্য।
**উচ্ছিষ্ট**—(১) অবশিষ্ট (২) এঁটো।
**উদ্দেশ্য**—(১) উপায়, পথ ; (২) খোঁজ-খবর।
**উদ্বেল**—(১) বেলাভূমিকে অতিক্রম করিয়াছে যে ঢেউ ; (২) ব্যাকুল।
**উন্মাদ**—(১) রোগবিশেষ ; (২) উন্মত্ত ব্যক্তি।
**উপন্যাস**—(১) বাক্যোপস্থাপন ; (২) নভেল সাহিত্যগ্রন্থ।
**এবং**—(১) এইরূপ ; (২) ও, আরও।
**কপাল**—(১) মাথার খুলি, শরা ; (২) ললাট।
**কম**—(১) কমনীয় ; (২) অল্প।
**কবচ**—(১) বর্ম, ধারণীয় মন্ত্রাদি ; (২) দাখিলার কবচ, মাদুলি।
**কলম**—(১)—শর, থাগ ; (২) লেখনী।
**কলা**—(১) বিদ্যা ; (২) ফলবিশেষ।
**কল্য**—(১) প্রত্যূষকাল ; (২) আগামী দিবস।
**কুক্ষি**—(১) উদর, বাহুমূল ; (২) বাহুমূল।
**গবাক্ষ**—(১) গোরুর চোখ ; (২) জানালা।
**গো**—(১) যেখানে অনেক গরু থাকে ; (২) সমূহ।
**গব্য**—(১) গো-সম্বন্ধীয় ; (২) দড়ি।
**ঘটা**—(১) সমূহ ; (২) উৎসব।
**ঘাট**—(১) অঙ্গবিশেষ ; (২) জলাবতরণের জন্য সোপানাদি।
**চাপ**—(১) ধনু ; (২) ভার দেওয়া।
**ছবি**—(১) কান্তি ; (২) আলেখ্য।
**জন্তু**—(১) প্রাণী ; (২) পশু।
**টীকা**—(১) গ্রন্থের ব্যাখ্যা ; (২) দাহ্য বস্তুবিশেষ।
**দম**—(১) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ; (২) শ্বাস।
**দর**—(১) ভয় ; (২) মূল্য।
**দল**—(১) পত্র ; (২) বর্গ বা সমূহ।
**দায়**—(১) পৈতৃক সম্পত্তি, (২) ঠেকা, বাধা।
**দাম**—(১) রজ্জু বা মাল্য ; (২) মূল্য
**দারুণ**—(১) দারুনির্মিত ; (২) অত্যন্ত কঠিন।
**দুরন্ত**—(১) যাহার পরিণাম মন্দ ; (২) দুর্বৃত্ত।
**ধন্য**—(১) ধনশালী ; (২) সর্বসৌভাগ্যবান।
**ধুনী**—নদী ; (২) অগ্নিকুণ্ড।
**ধুম**—(১) অগ্নির ধুম ; (২) উৎসব।
**নাক**—(১) স্বর্গ ; (২) নাসিকা।
**নাগর**—(১) নগরের লোক ; (২) অবৈধ প্রণয়ী।
**নায়ক**—(১) পরিচালক ; (২) নাটকের প্রধান ব্যক্তি।
**নিরীহ**—(১) অচেষ্ট, নিশ্চেষ্ট, নিষ্কাম ; (২) নির্বিরোধী, শান্ত।
**পশ্চিম**—(১) দিগ্‌বিশেষ, শেষ ; (২) দিগ্‌বিশেষ।
**পাষণ্ড**—(১) ধর্মসম্প্রদায়, (২) ধর্মজ্ঞানহীন, অত্যাচারী।
**প্রমাদ**—(১) ভুল ; (২) বিপদ।
**প্রস্তুত**—(১) আরব্ধ, উপস্থিত ; (২) তৈয়ারী।
**পাতা**—(১) পালক ; (২) পত্র।
**বনস্পতি**—(১) বনের পতি ; (২) বৃহৎ।
**বর**—(১) কন্যানির্বাচনকারী ; (২) বিবাহার্থী, স্বামী।
**বলি**—(১) উপচার, চর্মসংকোচ ; (২) পশুবধ।
**বর্ষ**—(১) বর্ষাকাল ; (২) বৎসর।
**বালিশ**—(১) মূর্খ ; (২) উপাধান।
**বিরক্ত**—(১) অননুরক্ত, বৈরাগ্যযুক্ত ; (২) অসন্তুষ্ট।
**বিবাহ**—(১) একেবারে বহন করিয়া অর্থাৎ অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া ; (২) পরিণয়।

ভান—(১) জ্ঞান ; (২) ছল।
মদ—(১) গর্ব ; (২) মদ্য।
মধুর—(১) মধুযুক্ত ; (২) রমণীয়, চমৎকার।
মায়া—(১) ইন্দ্রজালবিদ্যা ; (২) স্নেহ, মমতা।
যথেষ্ট—(১) ইচ্ছানুরূপ ; (২) প্রচুর।
যবনিকা-পতন—(১) নাট্যাঙ্ক বা গর্ভাঙ্কের অভিনয়ান্তে পটক্ষেপ (২) নাট্যাভিনয়ের সমাপ্তিবোধক-পটক্ষেপ।
লক্ষ্মী—(১) দেবীবিশেষ ; (২) শান্তশিষ্ট।
লাবণ্য—(১) লবণত্ব ; (২) কান্তি।
লৌকিকতা—লৌকিক ব্যবহার ; (২) উপহার।
বাজী—(১) অশ্ব ; (২) অগ্নিক্রীড়া।
বাণ—(১) শর ; (২) বন্যা।
বালা—(১) বালিকা ; (২) অলংকারবিশেষ।
বিরাট্—(১) আদিতে ব্রহ্মার রূপবিশেষ; (২) বৃহৎ।
ব্যবসায়—(১) চেষ্টা ; (২) বাণিজ্য।
শরৎ—(১) শীতকাল ; (২) ঋতুবিশেষ।
শরাব—(১) শরা ; (২) মদ্য।
শক্ত—(১) সমর্থ ; (২) কঠিন।
শাস্তি—(১) শাসন করে ( শাস্ + তি) ; (২) দণ্ড।
শ্বশুর, শ্বশ্রূ—(১) পতির পিতা, মাতা ; (২) পতি বা পত্নীর পিতা বা মাতা।
সমারোহ—(১) সম্যক্ আরোহণ ; (২) উৎসব।
সন্ধান—যুক্ত করা ; (২) খোঁজ-খবর।
সম্ভ্রান্ত—(১) বিচলিত, ভীত ; (২) মাননীয়।
সুতরাং—(১) অতিশয় ; (২) অতএব।
স্তম্ভিত—(১) স্তম্ভত্বপ্রাপ্ত ; (২) বিস্মিত।
সহসা, হঠাৎ—(১) সবলে ; (২) আকস্মিকভাবে।

## অনুশীলনী

[ এক ] শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারার উল্লেখ কর এবং উপযুক্ত উদাহরণ দিয়া তাহা বুঝাইয়া দাও। **ক. বি বি. এ. ( বিকল্প ) '৫৮**

[ দুই ] শব্দের বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ কাহাকে বলে? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও। **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৮**

[ তিন ] নিম্নলিখিত শব্দগুলির ভিতর হইতে যে কোনও চারিটি শব্দ বাছিয়া লইয়া বাংলায় তাহাদের ব্যবহারে কি ভাবে অর্থ-সংকোচন, অর্থ-প্রসারণ বা অর্থ-পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা কর:—আঙ্গিক, অবদান, ইতর, রাগ, ছবি, ইতি, সুতরাং, যবনিকা-পতন। **ক. বি. বি. এ. '৫২**

[ চার ] 'তুমি এ বিষয়ে কোন উচ্চ-বাচ্য করিও না'—এই বাক্যটিতে 'উচ্চ-বাচ্য' কথাটির মূলগত অর্থের সহিত ব্যবহারগত অর্থের কি সম্বন্ধ বুঝাইয়া দাও। ( **উত্তর**।—'উচ্চ-বাচ্য' কথাটির মূলে আছে সংস্কৃত 'উচ্চাবচ' শব্দটি। উহার অর্থ—'উচ্চনীচ ; ভালমন্দ ; বিবিধ ; অসমান'। আবার 'উচ্চ' ও বাচ্য,' এই দুইটি ভিন্ন সংস্কৃত শব্দকে একযোগে জুড়িয়া অর্থ পাওয়া যায়—'যাহা উচ্চৈঃস্বরে বা জোরে বলিবার যোগ্য তাহাই উচ্চ-বাচ্য'। কিন্তু বাংলায় 'উচ্চ-বাচ্য' না করা' মানে 'কোন বিষয়ে প্রশ্ন প্রতিবাদ বা হাঁ-না ভালমন্দ কিছুই না বলা'। **ক. বি. মাধ্যমিক '৫১**

[ পাঁচ ] 'বিরক্ত' ও 'নিরীহ', এই দুইটি পদের বাংলা ভাষায় প্রয়োগে সংস্কৃত হইতে কিরূপ অর্থবিভেদ ঘটিয়াছে, তাহা দেখাও। **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিশেষ ) '৫৩**

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## ভিন্নার্থক শব্দ

**অঙ্ক**—(১) নাটকের অংশবিশেষ—কোন কোন সমালোচকের মতে, দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের চতুর্থ 'অঙ্কে'র পরই যবনিকা-পতন হওয়া উচিত। (২) গণিত—'অঙ্ক'-শাস্ত্রে রামানুজম্ সুপণ্ডিত ছিলেন। (৩) ক্রোড়—মাতৃ-'অঙ্কে' শিশুর সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে। (৪) চিহ্ন, রেখা—পালামৌতে যাইবার পথে সঞ্জীবচন্দ্র বরাকরনদীর পূর্বপার হইতে দেখিলেন যে, অপরপারে জনৈক চাপরাসী পারার্থীদের বাহুতে গৈরিক মৃত্তিকা-দ্বারা কি যেন 'অঙ্ক'পাত করিতেছিল।

**অর্থ**—(১) মানে—রসবোধ না থাকিলে রবীন্দ্রকাব্যের 'অর্থ'ভেদ অসম্ভব। (২) টাকাকড়ি—মানুষের জীবনে 'অর্থ'ই যখন বড় হয়, তখন সে হারায় মনুষ্যত্ব।

**উত্তর**— ১) ব্যক্তিবিশেষের নাম—বিরাট্‌রাজার পুত্র 'উত্তর' অতিশয় রণনিপুণ ছিলেন না। (২) অসামান্য—মহাত্মাজীর 'লোকোত্তর' চরিত্রের প্রভাবে অনেকেই প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। (৩) ভবিষ্যৎ—বালকটি 'উত্তর' জীবনে শস্ত্র-চালনায় নিপুণ হইবে। (৪) পরবর্তী—'রবীন্দ্রোত্তর' যুগে বাংলা সাহিত্যে কাব্যরচনা করিয়া কীর্তিলাভ করা বড়ই কঠিন। (৫) জবাব—এই দুরূহ প্রশ্নের 'উত্তর' কয়জনেই-বা দিতে পারে? (৬) দিগ্‌বিশেষ—ভারতের 'উত্তরে' গিরিরাজ হিমালয়।

**কড়া**—(১) নির্মম, কঠোর—'কড়া' অভিভাবকের 'কড়া' কথা সব সময়ে সুফল প্রসব করে না। (২) ঘর্ষণজাত দাগ—জুতা পরিতে পরিতে পায়ে 'কড়া' পড়িয়া যায়। (৩) কপর্দক—হরিহরবাবুর মৃত্যুর পরে দেখা গেল যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীপুত্রের জন্য এক 'কড়া' সম্বলও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। (৪) রন্ধনপাত্রবিশেষ—ছোট 'কড়া'য় দুধ জ্বাল দিতে পার। (৫) বালার মত হাতল—বাহিরে যাইবার পূর্বে দরজার 'কড়া'য় তালাটি দিও।

**কড়ি**—(১) কপর্দক—বিদেশভ্রমণকালে সঙ্গে টাকা-'কড়ি' রাখিলেও বিপদ, না রাখিলেও বিপত্তি। (২) ছাদ রাখিবার জন্য লম্বা কাঠ বা লোহা—অতি পুরাতন কাঠের 'কড়ি'তে ঘুণ ধরিতে থাকে।

**কথা**—(১) প্রতিশ্রুতি—আমি যখন 'কথা' দিয়াছি, তখন এই কাজ করিবই। (২) অনুরোধ—ভয় হয়, পাছে যদি তুমি আমার 'কথা' না রাখ। (৩) গল্প, উপাখ্যান—'কথা'সাহিত্যে শরৎচন্দ্র অমর হইয়া থাকিবেন। (৪) অভিপ্রায়, চিন্তা—মনের 'কথা' একবার খুলেই বল। (৫) প্রবাদ—'কথা'য় বলে তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনও তার মরণের ভয়! (৬) প্রসঙ্গ—বিবাহের 'কথা' উঠিতেই বীণা লজ্জায় অধোবদন হইল। (৭) আলোচনা—অপরের 'কথা'য় থাকিতে নাই।

**কর্ম**—(১) কার্য—'কর্মে'র দ্বারা কর্মীর খাঁটি বিচার করা যায় না। (২) পেশা—প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণেরা কূল'কর্ম' করিয়াই জীবিকানির্বাহ করিতেন। (৩) অনুষ্ঠান—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আশুতোষ হিন্দুর ক্রিয়া-'কর্মে' শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। (৪) প্রাক্তন—ইহজন্মে, এমন কি জন্মান্তরেও 'কর্মে'র ভোগ ভুগিতে হয়।

**কর**—(১) কিরণ—রবি'কর'স্পর্শে ঘুমন্ত প্রকৃতি যেন জাগিয়া উঠিল। (২) হস্ত—সেবাপরায়ণা জননীর 'কর'স্পর্শে রুগ্ন শয্যাশায়ী সন্তানের অন্তর ভরিয়া যায়। (৩) শুল্ক—প্রাক্-স্বাধীন ভারতের বিক্রয়'কর' এই স্বাধীন ভারতেও চলিয়াছে।

**কাণ্ড**—(১) স্থূল জ্ঞান—'কাণ্ড'জ্ঞান' থাকিলে কি আর ছাত্র শিক্ষকের সম্মুখে ধুমপান করে! (২) অধ্যায়, সর্গ—সপ্ত'কাণ্ড' রামায়ণ পড়িবার পরেও সীতাহরণ-কাহিনী যথাযথভাবে বিবৃত করিতে পারিতেছ না। (৩) গাছের গুঁড়ি—অদূরবর্তী অশ্বত্থ'কাণ্ডে' একটি বিষধর সর্প জড়াইয়া আছে। (৪) বিষম ব্যাপার—তর্কাতর্কি, হাতাহাতি, পরিশেষে খুনোখুনি 'কাণ্ড' শিক্ষিত লোকেই করিয়া বসিল!

**কাল**—(১) আগামী দিন বা পূর্বদিন—'কাল' পরীক্ষা শুরু হইবে। 'কাল' পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। (২) সময়—'কালে' লোকে পুত্রশোকও ভুলিয়া যায়। (৩) মৃত্যু—তাঁর পিতার 'কাল' হইয়াছে। (৪) সর্বনাশের হেতু—ঐ বিয়েই তাঁহার 'কাল' হইয়াছিল। (৫) অবস্থা—বাল্য'কালে' সাধন খুবই দুষ্টু ছিল।

**গজ**—(১) দাবাখেলার বলবিশেষ—'গজে'র কিস্তিতে সে তাহার প্রতিপক্ষকে মাৎ করিল। (২) হস্তী—নবজামাতা 'গজ'গমনে শ্বশুরালয়ে চলিলেন। (৩) মাপবিশেষ—আমার জামা তৈয়ার করিতে সাড়ে তিন 'গজ' কাপড় লাগে।

**গুণ**—(১) দড়ি, কাছি—নদীর আর একটি বাঁক অবধি মাঝিরা নৌকার 'গুণ' টানিয়া চলিল। (২) বার—তাহার সম্পত্তির আয় আমার সম্পত্তির আয় অপেক্ষা বিশ 'গুণ' বেশী। (৩) উপকার, ফায়দা—বিত্তশীল ব্যক্তির সন্তান সময়ে সময়ে শিক্ষার 'গুণ' বুঝিতে পারে না। (৪) যাদু, তুক্—ডাইনী বুড়ী 'গুণ' করিয়া কোলের শিশুটিকে কঙ্কালসার করিয়া ফেলিল। (৫) ফলোৎপাদিকা শক্তি—ঔষধটির এমনই 'গুণ' যে পান করিবামাত্রই তাহার জ্বর চলিয়া গেল। (৬) ধর্ম—প্রাচীনারা দ্রব্য'গুণ' সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। (৭) অলংকারশাস্ত্রে কথিত প্রসাদ, মাধুর্য, ওজঃ গুণবিশেষ—শরৎচন্দ্রের রচনারীতিতে প্রসাদ 'গুণ' আছে।

**ঘন**—(১) মেঘ—বর্ষার আকাশ 'ঘন'ঘটায় ছাইয়া থাকে। (২) অল্প সময়ের ব্যবধানবোধক—'ঘন ঘন' বাড়ি গেলে চাকরি রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। (৩) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের ভাব—এই প্রস্তরবেদীর 'ঘন'ফল কত হইতে পারে? (৪) নিবিড়—নবকুমার 'ঘন' অরণ্যের সমীপবর্তী হইলেন। (৫) গাঢ়—দুধ 'ঘন' করিয়া রাবড়ী প্রস্তুত করা হয়।

**চাল**—( ১ ) চাউল—কলে-ছাঁটা 'চাল' স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী। (২) ফন্দি—যাহারা 'চাল' চালে, একদিন তাহাদের স্বরূপ বাহির হইয়া পড়েই। ( ৩ ) প্রতিমার পিছনের পট—এবারে কুমারটুলির দুর্গাপ্রতিমার 'চাল'চিত্রটিই সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। জীবনযাত্রার রীতি—নবাবী 'চালে' চলিয়া সে পথের ভিখারী হইল।

**চিনি**—( ১ ) পরিচিত বলিয়া জানি—আমি রামপুরহাটের শ্রীভবেশ সান্যালকে 'চিনি'। ( ২ ) দোষগুণ বুঝি—জিনিস 'চিনি' বলেই বাজার করার ভার রয়েছে আমার উপরে। ( ৩ ) শর্করা—'চিনি'পাতা দই আমি বড় ভালবাসি।

**ছল**—( ১ ) প্রতারণা—'ছলে'বলে রমেন তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্পত্তি গ্রাস করিয়া বসিল। ( ২ ) ব্যপদেশ—'ক্রীড়াচ্ছলে' রসিদ রমেনের পা ভাঙিয়া দিল। ( ৩ ) কপট—'ছল' শ্রীকৃষ্ণের ছলনা পুরাণ-প্রসিদ্ধ ব্যাপার। ( ৪ ) ছুতা—রোগের 'ছল' করিয়া সে বাড়িতে বসিয়া থাকিল। ( ৫ ) উপলক্ষ্য—স্তুতির 'ছলে' নিন্দা করিতে নারদ অভ্যস্ত ছিলেন।

**ছাপা**—( ১ ) ছাপা, লুক্কায়িত—দুষ্কৃতি কখনও 'ছাপা' থাকে না। ( ২ ) মুদ্রণ—বইখানির 'ছাপা' ও বাঁধাই বেশ চমৎকার। ( ৩ ) অতিক্রম করা—বর্ষার জল পুকুর 'ছাপাইয়া' উঠিয়াছে।

**ছোট**—( ১ ) কনিষ্ঠ—লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের 'ছোট' ভাই। ( ২ ) ক্ষমতায় বা পদে নীচু—আপিসের 'ছোট' সাহেবের অত্যাচারে বাবুরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ( ৩ ) খাটো—আমার ভায়ের ধুতি আমার ধুতির চেয়ে দুই আঙুল 'ছোট'। ( ৪ ) সমাজে অবনত—গান্ধীজী 'ছোট' লোকদিগকেই 'হরিজন' বলিয়াছেন। (৫) সংক্ষিপ্ত—ভোজসভায় শ্রীযুক্ত বসু একটি 'ছোট' বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

**ডাক**—( ১ ) খ্যাতি—রেবা নাকি এই অঞ্চলের মধ্যে 'ডাকে'র সুন্দরী। ( ২ ) নিলামে ক্রেতা যে হাঁকে—নিলামে বেতারযন্ত্রটির 'ডাক' উঠিল দুই শত টাকা। ( ৩ ) সম্বোধন—হরেনের 'ডাক' নাম ছাগলা। ( ৪ ) চীৎকার—নিদ্রা হইতে উঠিয়াই শিশুটি 'ডাক' ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ( ৫ ) চিঠিবিলির জন্য সরকারী ব্যবস্থা—'ডাক'টিকিটের মূল্য বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু পত্রপ্রেরণ-ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে নাই।

**তত্ত্ব**—( ১ ) ব্রহ্ম—'তত্ত্ব'জ্ঞান লাভ করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। ( ২ ) উপঢৌকন—পশ্চিম-বঙ্গের অঞ্চলবিশেষে পূজাপার্বণাদি উপলক্ষ্যে বধূর বাপের বাড়ি হইতে 'তত্ত্বাদি' আসে। ( ৩ ) খোঁজ—মাঝে মাঝে আমি তাহার 'তত্ত্ব' লইয়া থাকি। ( ৪ ) বিজ্ঞান—পল্লীপ্রধান ভারতে কৃষি 'তত্ত্ব' সম্পর্কে গবেষণা হওয়া উচিত।

**তন্ত্র**—( ১ ) অধীন—ইন্দ্রিয়পর 'তন্ত্র' হইলে দিন দিন আয়ু হয় ক্ষীণ। ( ২ ) রাজ্যশাসন-পদ্ধতি—ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াও আমলা'তন্ত্রে'র প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারে নাই। ( ৩ ) শাস্ত্রবিশেষ—'তন্ত্র'মতের উপরেই তান্ত্রিকের

উপাসনা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। (৪) অনুবন্ধী বিষয়ের সমবায়—রক্তসংবহন'তন্ত্র' সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে চিকিৎসক হওয়া যায় না।

**তাল**—(১) গীত বাদ্য বা নৃত্যের সময়ের বিভাগ—কমল মল্লিক গান গায় ভাল, কিন্তু একেবারে 'তাল'কানা। (২) গোলাকার পিণ্ড—বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে মাটির 'তাল' পাকাইয়া রাখে। (৩) ফলবিশেষ—কচি 'তালে'র আঁঠির শাঁস খাইতে বড়ই সুস্বাদু। (৪) বাহু ইত্যাদিতে চপেটাঘাত—স্বনামপ্রসিদ্ধ কুস্তিগীর গামা ও গোবর কুস্তির আখড়ায় 'তাল' ঠুকিতে লাগিলেন! (৫) পিশাচবিশেষ—বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গলীলা দেখিয়া মনে হয়, বুঝিবা 'তাল'বেতাল সমুদ্রবক্ষের উপরে অদৃশ্য নৃত্য সুরু করিয়াছে।

**দণ্ড**—(১) খেসারৎ, গচ্চা—পচা মাছ কিনিয়া দুই টাকা 'দণ্ড' গেল। (২) শাস্তি—মহাত্মাজীর আততায়ী গড্‌সে প্রাণ'দণ্ডে' দণ্ডিত হইয়াছিল। (৩) ডাণ্ডা—লৌহ'দণ্ডে'র প্রহারে চোরের আক্কলগুড়ুম হইল। (৪) কালের বিভাগ-বিশেষ—আমার এখানে দুই 'দণ্ড' থাকিলে তোমার পিতা আদৌ বিরক্ত হইবেন না।

**দল**—(১) পত্র—বিল্ব'দল' শিবপূজার উপকরণ। (২) জলজ তৃণবিশেষ—গ্রামের অধিকাংশ জলাশয়ই যত্নের অভাববশতঃ 'দলে' পরিপূর্ণ থাকে। (৩) সম্প্রদায়—পুণ্যলাভের আশায় দল'বদ্ধ' যাত্রিগণ গঙ্গাসাগরাভিমুখে চলিয়াছে। (৪) সমূহ, পাপ্‌ড়ি—কুসুম'দল ছিন্ন করিয়া রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলেন।

**দ্বিজ**—(১) জন্মের পর যাহাদের উপবীতগ্রহণরূপ সংস্কার হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—'দ্বিজ' চণ্ডীদাসের পদাবলী আমি পাঠ করিয়াছি। (২) পক্ষী—সে অনেক 'দ্বিজ' বধ করিয়া পাপ সঞ্চয় করিয়াছে। (৩) দন্ত—"কুন্দ-কোরক জিনিয়া 'দ্বিজ'। কি ছার তাহাতে করক বীজ।" (৪) দুইটি, দুইখানি—"দ্রোণ 'দ্বিজ' ধনুর্বেদ পাঠাইলা ক্রমে।"

**ধর্ম**—(১) প্রতিটি জীব, বস্তু বা বিষয়ের নিজস্ব গুণ, যাহার অভাবে ঐ জীব, বস্তু বা বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে না—জলের 'ধর্ম' যেমন তারল্য ও শৈত্য, অগ্নির 'ধর্ম'ও তেমনি উত্তাপ ও ঔজ্জ্বল্য। (২) দণ্ড-পুরস্কারের কর্তা যম—এই অন্যায়ের বিচার 'ধর্ম'ই করিবেন। (৩) রীতি—কালের 'ধর্ম'কে কখনও অস্বীকার করা যায় না। (৪) স্বভাব—তোমার 'ধর্ম' তোমারই থাক্‌। (৫) শাস্ত্রবিহিত আচার—আজিকার দিনে হিন্দু'ধর্মে'র গোঁড়ামি মানিতে অনেকেই নারাজ।

**ধারা**—(১) প্রবাহ—অপরের দুঃখ দেখিয়া যাঁহার গণ্ডদেশ অশ্রু'ধারা'য় প্লাবিত হয়, তিনিই ধরাধামে ধন্য। (২) রীতি—একাহারী থাকা, ইহাই এই বংশের 'ধারা'। (৩) আইনের বিধি—ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে, এমন কি এই স্বাধীন ভারতের ইতিহাসেও, ১৪৪ 'ধারা' একটি স্বনামখ্যাত বিধান। (৪) শৃঙ্খলা—বিধাতার কাজের 'ধারা' বুঝিবার সাধ্য কাহার? (৫) ঋণী হইয়া থাকা—

'ধারা'ধারির ভিতরে আমি যাই না। (৬) স্রাব—গুলীবিদ্ধ ছাত্রশহীদদের বক্ষোদেশ শোণিত 'ধারা'য় স্নাত ছিল।

**নাম**—( ১ ) ইষ্টদেবের নাম—কায়মনোবাক্যে 'নাম' জপিতে পারিলে সাধকের সিদ্ধিলাভ ঘটে। ( ২ ) ঈষৎ—ক্ষুধা না থাকায় 'নাম'মাত্র খাইব। (৩) খ্যাতি —গাঁজা খাইয়া শেষে কি বংশের 'নাম' ডুবাইবে ? ( ৪ ) আখ্যা—পিতা সদ্যোজাত পুত্রের 'নাম' রাখিলেন বিরাজেন্দ্রপ্রসাদ।

**পক্ষ**—( ১ ) দল—বর'পক্ষ' আসিয়া পড়িলেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। ( ২ ) চন্দ্রের ক্ষয় বা বৃদ্ধিকাল—কৃষ্ণ'পক্ষ' অপেক্ষা শুক্ল'পক্ষ'ই যুবকযুবতীর প্রাণে হিল্লোল বহাইয়া দেয়। ( ৩ ) একাধিক পত্নীর একটি—কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় 'পক্ষ' শান্তি দেওয়া দূরে থাকুক, অশান্তির আগুনই জ্বালাইয়া থাকে। ( ৪ ) পাখির ডানা—রাবণের অস্ত্রাঘাতে জটায়ুর 'পক্ষ'দেশ ছিন্নবিছিন্ন হইয়াছিল। ( ৫ ) বাটীর পার্শ্ব—পাওনাদারদের ভয়ে তিনি 'পক্ষ'দ্বার দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকেন। ( ৬ ) তরফ—কলওয়ালা ও শ্রমিক, এই দুই বিরুদ্ধ 'পক্ষে'র মধ্যে শেষোক্ত পক্ষের দাবিই মানবতার দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য।

**পত্র**—( ১ ) পাতা—পুস্তকের 'পত্র'গুলি জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ( ২ ) চিঠি— আমি তাহাকে 'পত্র' দিয়াছি। ( ৩ ) প্রভৃতি-বোধক—বিছানা'পত্র' ভাল করিয়াই বাঁধিয়া লইয়াছি। ( ৪ ) পাত—স্বর্ণ'পত্রে'র উপরে সূক্ষ্ম কারিগরি সকল স্বর্ণকারই দেখাইতে পারে না।

**পদ**—( ১ ) অনুগ্রহ বা আশ্রয়—দরিদ্র ব্যক্তিটি প্রধান মন্ত্রীর নিকট যাইয়া কহিলেন, "আপনি যদি আমায় 'পদে' রাখেন, তাহা হইলে আমি সপরিবারে বাঁচিবার আশা রাখি।" ( ২ ) কর্মের ভার—তিনি রাজস্বমন্ত্রীর 'পদে' বাহাল হইলেন। ( ৩ ) ছন্দোবদ্ধ বাক্য—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব মহাজন কর্তৃক রচিত 'পদাবলী' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ( ৪ ) চরণ—শিষ্য গুরুদেবেয় 'পদ'রেণু মস্তকে ধারণ করিলেন। ( ৫ ) বিবিধ বস্তু বা অঙ্গ—ভোজের 'পদ'গুলি পূর্বেই জানা থাকিলে খাইয়ে লোকের সুবিধা হয়।

**পর**—( ১ ) অপর—'পরে'র অনিষ্ট চিন্তা করিলে নিজেরই সর্বনাশ হয়। ( ২ ) অনাত্মীয়—তুমি আমার আপনার জন, 'পর' নও। ( ৩ ) পরম—চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারিলে 'পর'ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটে। (৪) রত—স্বার্থ'পর' ব্যক্তি মানবজাতির কলঙ্ক। ( ৫ ) পশ্চাৎ—তাহার 'পর' পুত্রহারা জননীর নয়নে শ্রাবণের ধারা ঝরিয়া পড়িল। ( ৬ ) পরিধান কর—'জন্মদিনে নববস্ত্র 'পর'।

**পান**—( ১ ) তরল বা বায়ব দ্রব্য গলাধঃকরণ—সুরা'পান' মহাপাপ। ( ২ ) তাম্বূল—দোকানে-সাজা 'পানে'র খিলি চর্বণ করিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে। ( ৩ ) ঝাল—কোন কোন স্বর্ণকার গহনায় এত 'পান' দিয়া থাকে যে, তাহা ভাঙিয়া গড়াইবার কালে 'পান'-মরা হিসাবে বেশ কিছু পরিমাণ বাদ পড়িয়া যায়।

**পাশ**—( ১ ) বন্ধন—অর্জুন নাগ'পাশ' অস্ত্রের অধিকারী ছিলেন। ( ২ ) গুচ্ছ—কুসুমমাল্যে সুশোভিত কেশ'পাশে'র শোভা অতীব মনোমদ। ( ৩ ) পার্শ্ব—ক'লকাতার এমনই আজব সভ্যতা যে 'পাশে' বাস করেও একজন আর একজনের খোঁজখবর রাখে না।

**ফল**—( ১ ) বৃক্ষলতাদির শস্য—গাছে 'ফল' ধরিয়াছে। ( ২ ) পরিণাম—পাপের 'ফল'ভোগ করিতেই হইবে। ( ৩ ) নির্ধারণ—তাহার পক্ষে জ্যোতিষ-গণনার 'ফল' আদৌ অনুকূল নয়। ( ৪ ) উপকার—ব্রজ করিবাজের ঔষধে 'ফল' ফলিয়াছে। ( ৫ ) অঙ্ক কষিবার পর যে রাশি পাওয়া যায়—দেখ তো! অঙ্কের 'ফল' কত দাঁড়াইল ?

**বর**—( ১ ) আশীর্বাদ—রাবণ ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া 'বর' লাভ করিয়াছিলেন। ( ২ ) বিবাহের পাত্র—'বর'-কনের উপস্থিতিতে বিবাহ-বাসর অপূর্ব শোভায় শোভিত হইয়া থাকে। ( ৩ ) অনুগ্রহসূচক করভঙ্গী—সাধকের জীবনে ইষ্টদেবতার 'বরাভয়' অমূল্য সম্পদ। ( ৪ ) শ্রেষ্ঠ—'বরনারী' সীতা রঘুকুলপতি শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্মিণী।

**বর্ণ**—( ১ ) রং—অসীম সমুদ্র নীল'বর্ণ'। ( ২ ) অক্ষর—আমাদেব দেশের অধিকাংশ লোকেরই 'বর্ণ'জ্ঞান নাই। ( ৩ ) জাতি—হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিটি 'বর্ণে'র মধ্যে ব্রাহ্মণই 'বর্ণ'শ্রেষ্ঠ।

**বার**—( ১ ) রবি, সোম প্রভৃতি দিবস—সোম'বার' কলেজ খুলিবে। ( ২ ) দফা—এই'বার' তোমায় আমি বাগে পেয়েছি। ( ৩ ) পালা—এ বৎসর আমাদের উপরেই দুর্গাপূজার 'বার' পড়েছে। ( ৪ ) অতীত—ইচড়ে পাকা ছেলে শাসনের 'বার" হয়ে থাকে। ( ৫ ) প্রকাশিত—'একের ভিতরে চারে'র নূতন সংস্করণ প্রতি বৎসরেই শুভ মহালয়া দিবসে 'বার' হয়।

**বারণ**—( ১ ) হস্তী—যুবামন মদমত্ত 'বারণে'রই ন্যায় বেগবান। ( ২ ) নিষেধ—বার-বার 'বারণ' করিয়াও তাহাকে সৎপথে আনিতে পারিলাম না।

**বাস**—( ১ ) অবস্থান—পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তুহারাদের আগমনে কলিকাতায় 'বাস'-গৃহ-সমস্যা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। ( ২ ) বস্ত্র—পীত'বাস'-পরিহিত বনমালী হিন্দুদের আরাধ্য দেবতা। ( ৩ ) সুগন্ধ—ফুলের 'বাস' সমগ্র কাননটিকে আমোদিত করিতেছে।

**বিধি**—( ১ ) নিয়তি—'বিধি'-বিড়ম্বনায় তিনি অতি অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ( ২ ) ক্রম—সভাপতি সভার কার্য'বিধি' ঘোষণা করিলেন। (৩) বিধান—

হরেনের পিতৃশ্রাদ্ধ যথাসম্ভব শাস্ত্র'বিধি'মতেই হইয়াছে। (৪) আইন—ভারতীয় দণ্ড'বিধি'র ১০ ধারা এই মকদ্দমা-সম্পর্কে প্রযোজ্য।

**বেলা**—(১) সময়—'বেলা' দশটায় আপিস বসে। (২) বিলম্ব—প্রতিদিন এত 'বেলা' করিয়া আসিলে তোমার চাকরি থাকিবে না। (৩) সমুদ্রতীর—'বেলা'ভূমিতে যখন তরঙ্গনিচয় আছড়াইয়া পড়ে, তখন এক অপূর্ব শোভা বিকশিত হয়। (৪) বয়স —এইটুকু 'বেলা'য় বিয়ে না করাই ভাল। (৫) পক্ষ—আপন সন্তানের 'বেলা'য় কোন দোষ নাই, আর পরের ছেলের 'বেলা'য় যত দোষ! (৬) সুযোগ, অবসর—বাবা বাড়িতে নাই—এই 'বেলা' খেলার মাঠে চল্ ভাই। (৭) আটা ময়দা প্রভৃতির পিণ্ড পাত্‌লা করা—বেলন দিয়া ময়দা 'বেলা' শ্রমসাপেক্ষ নয় বটে, তবে অভ্যাস-সাপেক্ষ। (৮) পুষ্পবিশেষ—'বেলা' ফুলের গন্ধ বড়ই মনোরম।

**বোঝা**—(১) ভার—কুলিটি দেড়মণি 'বোঝা' অবলীলাক্রমে তাহার মাথার উপরে রাখিল। (২) ভর্‌তি—বাক্স-'বোঝাই' কাপড়চোপড় লইয়া চোর গভীর রজনীতে পলায়ন করিল। (৩) হৃদয়ংগম করা—এই জটিল্ তত্ত্বকথা 'বোঝা' আমার কর্ম নয়।

**ভাব**—(১) মনঃস্থিত বিষয় অর্থাৎ Idea—কবিতাটির 'ভাব' সম্প্রসারণ কর। (২) অনুরাগ, প্রণয়—অসৎ লোকের সঙ্গে 'ভাব' থাকা সমীচীন নয়। (৩) আচরণ—দাস্য'ভাব'ও ভগবদ্‌প্রেমের সাধনায় সিদ্ধি দান করে। (৪) চিত্তবিকার—নবদ্বীপধামে শ্রীচৈতন্যদেব 'ভাবা'বেশে হরিনাম সংকীর্তন করিতেন। (৫) মনের অবস্থা—তাঁহার 'ভাবান্তর' দর্শনে আমি ব্যথিত হইলাম। (৬) অভিপ্রায়—আমি আমার মনো'ভাব' সভায় জানাইয়া দিয়াছি।

**ভার**—(১) দুরূহ—এই দুর্মূল্যতার বাজারে সাধারণ লোকের বাচাই 'ভার'। (২) ভরণপোষণ—মৃত বন্ধুর পোষ্য আত্মীয়বর্গের 'ভার' লইয়া তিনি মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। (৩) সমূহ—ধীবর মৎস্য'ভার' লইয়া বাজারে চলিল। (৪) দায়িত্ব—অল্প বয়স হইতেই তিনি কঠিন কাজের 'ভার' লইতে অভ্যস্ত। (৫) চাপ—পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের স্কন্ধে দেনার 'ভার' পড়িল। (৬) উদ্বেগ—বেদনার 'ভার' আর তো বহিতে পারি না! (৭) ওজন—ধারে নাই-বা কাটিল, 'ভারে' তো কাটিবে।

**ভোর**—(১) ব্যাপিয়া—তিনি জীবন'ভোর' সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। (১) বিহ্বল—পুষ্পকানন গন্ধে 'ভোর' হইয়া আছে। (৩) পরিমিত—মটর'ভোর' আফিম খাইয়াও মৃত্যু ঘটিতে পারে। রাত্রিশেষ—'ভোরা' হইবামাত্র সে মরিল।

**যোগ**—(১) সম্বন্ধ—রক্তের 'যোগ অস্বীকার করা যায় কি? (২) সংযোগ—সুয়েজপ্রণালী ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের মধ্যে 'যোগ' সাধন করিতেছে (৩) সময়—সেই ভয়াবহ রাত্রি 'যোগে' নদী পার হইয়া ডাকাতের দল পাকিস্তান-এলাকায় প্রবেশ করিল। (৪) হঠযোগাদিসাধন—'যোগ'বলে (মহাত্মা বামা

ক্ষেপা সকলই জানিতে পারিতেন। (৬) নিষ্কাম সাধনা—মহাত্মা অশ্বিনীকুমার গীতার ভক্তি'যোগে'র অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (৭) পর্ব, উৎসব—গত বৎসরে চূড়ামণি-'যোগে' নবদ্বীপধামে বেশ জনসমাগম হইয়াছিল। (৮) ঔষধ—আমাশয় রোগের পক্ষে এই মুষ্টি'যোগ'টি অব্যর্থ।

**রস**—(১) অলংকারশাস্ত্রোক্ত আদি করুণ বীর ইত্যাদি নবরস—মেঘনাদ-বধকাব্য 'করুণরসা'শ্রিত মহাকাব্য। (২) রঙ্গ, কৌতুক—'রস'রচনায় নাট্যকার অমৃতলাল বসু সিদ্ধহস্ত ছিলেন। (৩) নিঃস্রাব—ফোড়ার 'রস' পড়িতেছে। (৪) নির্যাস—সরবতের সঙ্গে লেবুর 'রস' মিশাইয়া পান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ উপকারী। (৫) সম্বল বা সামর্থ্যজনিত গর্ব—হাভাতের বেটার ভারী 'রস' হয়েছে ! (৬) রসায়ন—'রস'শালায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অধিকাংশ সময়ই কাটাইতেন।

**রাগ**—(১) ক্রোধ—তাঁহার 'রাগ' না পড়া অবধি আমি কিছুতেই বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিব না। (২) সংগীতশাস্ত্রসম্মত স্বরবিন্যাসের পদ্ধতিবিভাগ—হিন্দুসংগীতশাস্ত্রানুসারে ছয় 'রাগ' ও ছত্রিশ রাগিণী আছে। (৩) রক্তিমা—অস্ত-'রাগে'র আভা যেন প্রকৃতিরাণীর ললাটে সিন্দুর 'রাগ' মাখাইয়া দিল। (৫) অনুরাগ—বৈষ্ণব মহাজনদিগের পূর্ব'রাগে'র পদাবলী বড়ই অপূর্ব।

**রূপ**—(১) আকৃতি—শ্রীনাথ বহুরূপী কুলবধূর 'রূপ' ধরিয়া বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। (২) প্রকার—এই 'রূপ' গালিগালাজ করা আদৌ শোভনীয় নয়। (৩) সৌন্দর্য—বৃদ্ধের 'রূপ' উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা এই পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেরই আছে। (৪) স্বরূপ—দারিদ্র্য'রূপ' দোষ মানুষকে বহু অকল্যাণের মুখে ট নিয়া লইয়া যায়। (৫) শিল্প—'রূপ'কার উদয়শংকর 'কল্পনা' বাণীচিত্রে প্রাচ্য নৃত্যকলার রস পরিবেশন করিয়াছেন।

**লোক**—(১) মনুষ্য—তিনি বড় ভাল 'লোক'। (২) জনসাধারণ—প্রাচীন কালে যাত্রা কথকতা পাঁচালী গান প্রভৃতি 'লোক'সাহিত্য 'লোক'শিক্ষার বাহন ছিল। (৩) ভুবন—নেতাজী সুভাষচন্দ্র কি ইহ'লোক' ত্যাগ করিয়াছেন ? (৪) ভৃত্য, কর্মচারী—আপিসে কাজের যখন এতই চাপ, তখন একজন 'লোক' তো অনায়াসেই লইতে পার।

**সুর**—(১) দেবতা—বৃহস্পতি 'সুর'গণের গুরুদেব। (২) কণ্ঠস্বর—অনেক গায়ক-গায়িকা আধুনিক বাংলা গান নাকী 'সুরে' গাহিয়া থাকেন। (৩) রাগিণী—সেই অজানা পথিকের গানের 'সুর' আজও আমার কর্ণে বাজে। (৪) আভাষ—'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের মূল 'সুর'—গতিরাগের 'সুর'। (৫) উদ্দেশ্য—হিন্দুমহাসভা ছাড়িয়া কংগ্রেসে যোগ দিবার পর হইতেই তাঁহার 'সুর' বদলাইয়া গিয়াছে।

**সূত্র**—( ১ ) গতিক—কার্য'সূত্রে' ছুটির মধ্যেও কলিকাতায় থাকিলাম। ( ২ ) ধারা—পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর বজ্রগম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া আমার চিন্তা'সূত্রের' খেই হারাইয়া গেল। ( ৩ ) সংক্ষিপ্ত বাক্য—বেদান্ত'সূত্রে'র ব্যাখ্যা না পড়িলে, উহার মর্মভেদ করা দুঃসাধ্য। ( ৪ ) নাটকের প্রস্তাব—সংস্কৃত নাটকে 'সূত্র'ধার প্রথমেই যে 'সূত্র' স্থাপন করেন, তাহা নাটকের ফলশ্রুতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রচিত। ( ৫ ) সূতা—কার্পাস-'সূত্র'-নির্মিত বস্ত্রের মূল্য উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে।

**হার**—( ১ ) মাল্য—কুসুম-'হার'-শোভিত রাজনর্তকী চারুকুন্তলা রাজপ্রাসাদে চলিল। ( ২ ) দর—জোড়াপিছু গামছার 'হার' কত? ( ৩ ) পরাভব—তর্কে রমেন রমেশের কাছে 'হার' মানিল।

**হাল**—( ১ ) লাঙল—গোরু ও 'হাল',—এই দুইটিই চাষীদের জীবনধারণের সম্বল। ( ২ ) অবস্থা—যৌবনে টাকা-পয়সা উড়িয়ে আজ তার হাড়ীর 'হাল' হয়েছে! ( ৩ ) বর্তমান—তোমার 'হাল' সনের খাজনা এখনও পাই নি। ( ৪ ) আধুনিক—'হাল' ফ্যাশানের শাড়ী পরতে মেয়েরা বড়ই ভালবাসে।

**হেলা**—( ১ ) অজ্ঞতা—'হেলা'য় আমার কোন সংবাদ লও নাই। ( ২ ) শালুক—পুষ্করিণীতে 'হেলা' ফুল ফুটিয়াছে। ( ৩ ) স্নেহ; প্রীতি—আমার প্রতি যেন তোমার 'হেলা' থাকে। ( ৪ ) স্ত্রীলোকের ভাববিশেষ—লীলা মেয়েটির প্রায়ই 'হেলা' হয়। ( ৫ ) ঝুঁকা—চেয়ারটি বাঁ দিকে 'হেলা' নয় তো কী?

## অনুশীলনী

[ এক ] নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি শব্দকে দুই অর্থে প্রয়োগ করিয়া দশটি বাক্য রচনা কর :—(/০) বার; (৵০) কাল; (৶০) চিনি; (।০) চাল; (।/০) ডাক।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( কলা ) '৫৭**

[ দুই ] নিম্নের শব্দ দুইটির বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ উদাহরণ-সাহায্যে দেখাও :—দ্বিজ, অঙ্ক।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৮**

[ তিন ] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটিকে নির্বাচনপূর্বক প্রত্যেকটি শব্দের ভিন্নার্থবোধক দুইটি করিয়া মোট দশটি বাক্য রচনা কর :—কড়া, কড়ি, কথা, কাক, অঙ্ক, দণ্ড, ছাপা, গজ, পাশ, পান, বারণ, বোঝা, হার, পত্র, কর।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( অতি ) '৫৬**

[ চার ] নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে একাধিক অর্থে প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর :—উত্তর, গুণ, তাল, ধর্ম, ধারা, নাম, পক্ষ, পদ, বেলা, ভাব, ভার, যোগ, রস, রাগ, রূপ, সুর, সূত্র, লোক, ভোর, বিধি, বর, বর্ণ, হাত, হেলা।

# তৃতীয় অধ্যায়

## প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থবোধক শব্দ

অজাগর—অনিদ্র।
অজগর—সর্পবিশেষ

অগণ্য—যাহা গণনার অতীত
নগণ্য—যাহা গণনার অযোগ্য

অধৃষ্ট—নম্র
অধৃষ্য—অজেয়

অংশ—ভাগ
অংস—স্কন্ধ

অনু—পশ্চাৎ
অণু—সূক্ষ্মতম অংশ

অনুধাবন—বিবেচনা
অনুধ্যান—কল্যাণময় চিন্তা

অনুনাসিক—নাকি, খোনা
উন্নাসিক—ঘৃণাব্যঞ্জক

অবতরণ—নামা
অবতারণা—প্রস্তাবনা

অনুবাদিত—ভাষান্তরিত
অনুবাদ্য—অনুবাদযোগ্য

অন্যান্য—অপরাপর
অন্যোন্য—পরস্পর

অন্তর্বর্তী—অন্তঃপাতী
অন্তর্বত্নী—গর্ভবতী

অপলাপ—গোপন
প্রলাপ—অর্থহীন উক্তি

অপ্রমিত—অপরিমিত
অপ্রমেয়—অপর্যাপ্ত

অবগত—জ্ঞাত
অপগত—বিদূরিত

অবদ্য—অকথ্য, নিন্দিত
অবধ্য—যে বধের অযোগ্য

অবলম্বিত—গৃহীত
অবিলম্বিত—ত্বরিত

অবলেপন—বিলেপন
অবলেহন—চাটা

অবিরাম—অবিরত
অভিরাম—সুন্দর

অর্ঘ—মূল্য
অর্ঘ্য—পূজার উপকরণ ; পূজ্য

অসি-লতা—তরবারি
অ-শীলতা—অশিষ্ট ব্যবহার

অন্নদা—অন্নপূর্ণা
অন্যদা—অন্য সময়ে

অন্নপুষ্ট—অন্নের দ্বারা পুষ্ট
অন্যপুষ্ট—কোকিল

অযুগ্ম—বিযোড়
অযোগ্য—অনুপযুক্ত

অরণ্য—বন
অরণ্যানী—বৃহৎ বন

অলিক—ললাট
অলীক—মিথ্যা

অশক্ত—অসমর্থ
অসক্ত—নির্লিপ্ত

অশন—ভোজন
অসন—ক্ষেপন

অর্ধাসন—আসনের অর্ধভাগ
অর্ধাশন—আধপেটা আহার

অবিচার—অবিবেচনা।
অভিচার—পরহিংসা।

অবচয়—চয়ন
অপচয়—ক্ষতি

অশিত—ভক্ষিত
অসিত—কৃষ্ণ

অন্ত—শেষ
অর্তি—পীড়া
অর্থী—যাচক

অনিল—বাতাস
অ-নীল—যাহা নীল নহে

অন্বয়—পদের পরস্পর সম্বন্ধ
সমন্বয়—মিলন

অতএব—এ কারণে
অর্থাৎ—ইহার মানে

অবদান—পূজা বা অর্চনার্থ দান
অবধান—মনোযোগ-সহ শ্রবণ

অভ্যাশ—সমীপ
অভ্যাস—বারংবার একই কর্ম করণ

অভিনিবেশ—মনোযোগ
উপনিবেশ—বিদেশস্থিত আবাসভূমি

অনিষ্ট—অপকার
অ-নিষ্ঠ—নিষ্ঠাহীন
অভীষ্ট—আকাঙ্ক্ষিত

অবহিত—অভিনিবিষ্ট
অবিহিত—নিন্দিত
অভিহিত—কথিত

অশ্ব—ঘোটক
অ-স্ব—নিজের নহে
অশ্ম—পাথর

অমানুষ—পশুবৎ, মনুষ্যত্বহীন
অমানুষিক—মানুষের অতীত (ভাল অর্থে), মনুষ্যস্বভাবের বিরুদ্ধ ( খারাপ অর্থে )

অস্ত্র—যাহা ছুঁড়িয়া মারিবার যোগ্য অর্থাৎ যন্ত্রচালিত প্রহারক : যথা,—আগ্নেয়াস্ত্র
শস্ত্র—যাহা ছুঁড়িয়া মারিবার নয়, হাতে করিয়া প্রহার করিতে হয় : যথা,—অসি

আকিঞ্চন—আকাঙ্ক্ষা
অকিঞ্চন—দীন

আগত—যাহা আসিয়াছে
আগামী—যাহা আসিবে

আত্ত—গৃহীত
আর্ত—পীড়িত

আপন—নিজ
আপণ—দোকান, হট্ট

আহুত—হোমপ্রদত্ত
আহূত—আহ্বানপ্রাপ্ত

আদি—প্রথম
আধি—মনঃপীড়া

আধ্মান—স্ফীতি
আধ্যান—চিন্তা

আবৃতি—আবরণ
আবৃত্তি—বারংবার পাঠ

আভাষ—ইঙ্গিত, ভূমিকা
আভাস—ঈষৎ দীপ্তি

আস্তিক—ঈশ্বরে বিশ্বাসী
আস্তীক—জরৎকারু-পুত্র

আরাম—আয়েশ
বিরাম—নিবৃত্তি

আসক্তি—রতি
আসত্তি—সন্নিধি

আসব—চোয়ানো মদ
আহব—যুদ্ধ

আকাট—নিরেট্
আকাটা—কাটা নয়
অকাট্য—প্রতিবাদের অতীত

আকাল—দুঃসময়
আকালিক—অসাময়িক
অকাল—অসময়োচিত

আপ্ত—ভগবান, দেবতা বা ঋষি হইতে প্রাপ্ত ; বিশ্বস্ত
আত্ম—নিজ সম্পর্কিত ; স্বয়ং

আসার—ধারাসম্পাত
আষাঢ়—মাসবিশেষ
অসার—মিথ্যা

আহরিৎ—ঈষৎ হরিদ্বর্ণ
আহরিত—সংগৃহীত

ইষ—আশ্বিন মাস
ঈশ—ঈশ্বর
ঈষ—লাঙলের ফলা

ইতি—সমাপ্তি, এই অবধি
ঈতি—ফসল ফলাইবার ষড়্‌বিধ বিঘ্ন : যথা,—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, পতঙ্গ, পক্ষী ও নিকটবর্তী শত্রু, রাজা

ইহা—এই বস্তু
ঈহা—উত্তোলিত

উদ্বৃত্ত—বাকি
উদ্ধৃত—উত্তোলিত

উপজীবী—আশ্রিত
উপজীব্য—আশ্রয়স্থল

উপধি—রথচক্র, কপট
উপাধি—পদবী

উপাদান—মালমশলা
উপাধান—বালিশ

উদ্দেশ—অভিমুখ
উদ্দেশ্য—অভিপ্রায়

উদ্ধত—ধৃষ্ট
উদ্যত—উদ্যুক্ত

উপাসিত—আরাধিত
উপোষিত—অভুক্ত

উত্থিত—যে বা যাহা উঠিয়াছে
উত্থাপিত—যাহা বা যাহাকে উঠানো গিয়াছে

উৎপত—পাখী
উৎপথ—কু-পথ
উৎপাত—উপদ্রব

উপকরণ—কার্যসমাধার সমবায়ী কারণ
উপাদান—দ্রব্যনির্মাণের সমবায়ী কারণ

ঋষ্টি—দ্বিধার খড়্গ
রিষ্টি—অশুভ

একদা—এককালে
একধা—এক প্রকারে

ওষধি—ফলপাকান্ত উদ্ভিদ
ঔষধি—রোগবিনাশক দ্রব্য

কল্য—প্রত্যূষ
কল্ল—বধির

করঙ্ক—কৌটা, কমণ্ডলু
কলঙ্ক—অখ্যাতি

কৃতদাস—ভৃত্যে পরিণত
ক্রীতদাস—গোলাম

কুট—পর্বত ; দুর্গ, গড়
কূট—জটিল ; পর্বতশৃঙ্গ

কৃত্তি—বাঘের ছাল
কীর্তি—যশ

কৃত্তিবাস—মহাদেব
কীর্তিবাস—যশস্বী

কৃতী—কার্য ; নির্মিতি
কৃতি—নিপুণ

কপাল—মাথার খুলি
কপোল—গণ্ডদেশ

কটি—কোমর
কোটি—সংখ্যাবিশেষ

কৃত্য—কার্য
কৃত্ত—ছিন্ন

কৃষ্ট—কর্ষিত
-বাসুদেব

কোণ—দুই রেখার মিলনস্থান
কোন—অনিশ্চিত কিছু একটা

কোমল—নরম
কমল—পদ্ম

কৌতুক—তামাসা
কৌতূহল—ঔৎসুক্য

কুল—বংশ ; সমূহ ; ফলবিশেষ
কূল—নদীতীর

কতক—কিছু
কথক—কথার মাধ্যমে ভাগবত-ব্যাখ্যাকার-বিশেষ

গড়ুর—কুব্জ
গরুড়—?

গুড়—খাদ্যবিশেষ
গূঢ়—গুপ্ত

গর্ভ—ভ্রূণ, কুক্ষি
গর্ব—অহংকার

গোলক—বর্তুলাকৃতি ; তারক
গোলোক—বৈকুণ্ঠ, স্বর্গ.

গিরীশ—পর্বতশ্রেষ্ঠ ; মহাদেব
গিরিশ—মহাদেব

চাষ—কর্ষণ
চাস—নীলকণ্ঠ পাখী

চির—দীর্ঘ
চীর—ছেঁড়া কাপড়

চিৎ—চৈতন্য
চিত—সঞ্চিত
চিত্ত—মনঃ

চ্যুত—ভ্রষ্ট
চূত—আম্র

চতুর্—চারি
চতুর—চালাক

ছাত—ছিন্ন
ছাদ—আচ্ছাদন

জাম—ফলবিশেষ
যাম—প্রহর

জাল—ফাঁদ
জ্বাল—আগুনের আঁচ

জাত—উৎপন্ন
যাত—গত

জিন—বুদ্ধ, বিষ্ণু
জীন—জীর্ণ ; বৃদ্ধ

টপ্ টপ্—জোর বৃষ্টির শব্দ
টিপ্ টিপ্—অল্প বৃষ্টির শব্দ

তত্ত্ব—গূঢ় অর্থ ; সংবাদ ; ব্রহ্ম
তথ্য—বিষয়, যাথার্থ্য

য়—তাহার
য়—তোমার

তরণী—নৌকা
তরুণী—নবযুবতী ; নবীনা

তুণ্ড—মুখ
তুন্দ—উদর

দারা—পত্নী
দ্বারা—দিয়া

দোষ—অপরাধ
দোস্—বাহু
দূত—চর
দ্যূত—পাশা

দশাস্য—দশানন রাবণ
দশাশ্ব—চন্দ্র

দেবত্ব—দেবভাব
দেবত্র—দেবসেবার্থ ভূমি

দূতী—সংবাদবাহিকা
দ্যুতি—দীপ্তি

দিষ্টান্ত—মৃত্যু
দৃষ্টান্ত—উদাহরণ

দিননাথ—সূর্য
দীননাথ—দরিদ্রবন্ধু

দেশ—রাজ্য
দ্বেষ—ঈর্ষা

দ্বন্দ্ব—কলহ ; বিরোধ
দণ্ড—লগুড়

দুকুল—দুই বংশ
দুকূল—সূক্ষ্ম রেশমবস্ত্র ; তীরদ্বয়

দীপ—প্রদীপ
দ্বীপ—জলবেষ্টিত ভূভাগ
দ্বিপ—হস্তী

ধরা—পৃথিবী
ধড়া—জীর্ণ বস্ত্র

ধন—ঐশ্বর্য
ধ্বন—শব্দ

ধাতৃ—বিধাতা
ধাত্রী—ধাই-মা, পৃথিবী

ধনী—ধনবান্
ধনি—সুন্দরী স্ত্রী
ধ্বনি—শব্দ

ধুম—সমারোহ
ধূম—ধোঁয়া

নাক—স্বর্গ
নাগ—হস্তী ; সর্প

নিরাশ—হতাশ
নিরাস—ক্ষালন ; নিরাকরণ

নিদেশ—আজ্ঞা
নির্দেশ—ইঙ্গিত দ্বারা প্রদর্শন

নির্জর—দেবতা
নির্ঝর—ঝরণা

নিশাত—শাণিত
নিষাদ—চণ্ডাল

নিশিত—শাণিত
নিশীথ—গভীর রাত্রি

নিরস্ত্র—অস্ত্রহীন
নিরস্ত—বিরত

নিবার—নিষেধ
নীবার—ধান্যবিশেষ

নিরশন—অনাহার
নিরসন—দূরীকরণ

নিবন্ধ—প্রবন্ধ
নির্বন্ধ—অতিশয় অনুরোধ

নিবৃত্তি—বিরতি, ক্ষান্তি
নির্বৃতি—মুক্তি ; শান্তি

নীর—জল
নীড়—পাখীর বাসা
নিরয়—নরকবিশেষ

নিপাত—বিনাশ
নিপাতন—সূত্রোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম

পক্ষ—পাখীর ডানা ; মাসার্ধ
পক্ষ্ম—চক্ষুর পাতার লোম

পরভৃৎ—কাক
পরভৃত—কোকিল

পদ্য—ছন্দোময় বাক্য
পদ্ম—কমল

পরুষ—কঠোর
পৌরুষ—পুরুষত্ব

পুরুষ—নর ; আত্মা
পুরীষ—বিষ্ঠা

পরন্তু—পক্ষান্তরে
উপরন্তু—অধিকন্তু

পর্যবসিত—পরিণত
পর্যসিত—বাসি

পল্লব—নূতন পাতা
পল্বল—ক্ষুদ্র—জলাশয়

পাণি—হস্ত
পানি—জল

পৃষ্ট—জিজ্ঞাসিত
পৃষ্ঠ—পশ্চাদ্‌ভাগ

প্রকার—ভেদ ; জাতি
প্রাকার—প্রাচীর

প্রসাদ—অনুগ্রহ
প্রাসাদ—অট্টালিকা

প্রতিশ্রুৎ—প্রতিধ্বনি
প্রতিশ্রুত—অঙ্গীকৃত

পূৎ—নরকবিশেষ
পূত—পবিত্র

পুষ্কর—পদ্ম
পুষ্কল—শ্রেষ্ঠ

পূর্বাহ—পূর্বদিন
পূর্বাহ্ণ—দিনের পূর্বভাগ

প্রতি—লক্ষ্য
প্রীতি—ভালবাসা

পরিচর্চা—আলোচনা
পরিচর্যা—সেবা

প্রোত—প্রথিত
প্রোথ—অশ্বনাসিকা

পরিচ্ছন্ন—পরিষ্কৃত
পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ

প্রকৃত—যথার্থ
প্রাকৃত—স্বাভাবিক

প্রতিষ্ঠা—খ্যাতি
প্রতিষ্ঠান—সংস্থাপন

পালন—পোষণ
প্রতিপালন—মাননা

প্রসূত—সন্তান
প্রসূতি—জননী

প্রয়োজন—দরকার
প্রযোজনা—পরিচালনা

প্রবাদ—জনশ্রুতি
পরিবাদ—অপবাদ

পরিণত—পরিপুষ্ট
পরিণীত—বিবাহিত

প্রশস্ত—যোগ্যতম
প্রশস্তি—প্রশংসা

পরিষদ—সভা
পারিষদ—সভ্য

পরিচ্ছদ—পোশাক
পরিচ্ছেদ—গ্রন্থাদির বিষয়-বিভাগ

পরস্ব—অন্যের সম্পত্তি
পরশ্ব—আগামী কালের পরদিন

প্রকৃত—যথার্থ
প্রাকৃত—স্বাভাবিক ; সংস্কৃতের পূর্ববর্তী ভাষা-বিশেষ

পবন—বায়ু
পাবন—পবিত্র, পবিত্রতাকারী

প্রেরণ—পাঠানো
প্রেরণা—প্রবৃত্তি, শক্তি, প্রতিভা ইত্যাদির সঞ্চার

পঞ্চবার্ষিক—পাঁচ বৎসর ব্যাপিয়া যাহা হইয়াছে বা হইতেছে
পাঞ্চবার্ষিক—যাহা আগামী পাঁচ বৎসরে সম্পন্ন হইবে

বন্ধ—বন্ধন
বন্ধ্য—নিষ্ফল

বিজন—নির্জন
বীজন—পাখা

বলি—উৎসর্গযোগ্য
বলী—বলবান

বর্জ্য—ত্যাজ্য
বর্য—শ্রেষ্ঠ

বক্ত্র—মুখ
বক্র—বাঁকা

বৃন্ত—বোঁটা
বৃন্দ—সমূহ

বসন—বস্ত্র
ব্যসন—বিপদ ; বিষয়াসক্তি

বান—বন্যা
বাণ—শর

বিত্ত—বিভব ; ধনসম্পত্তি
বৃত্ত—বর্তুল, গোলাকার ক্ষেত্র

বিবৃত—বর্ণিত
বিব্রত—ব্যতিব্যস্ত

বিবৃতি—বিস্তৃতি
বিবৃত্তি—বিবর্তন

বিমল—নির্মল
বিম্লিন—বিশেষ ম্লান

বল্লব—পাচক ; গোপ
বল্লভ—প্রিয়

বিবর—গর্ত
বীবর—জলজন্তুবিশেষ

বৃষ্টি—বর্ষণ
বৃষ্ণি—যদুবংশ

বিল্ল—আলবাল ; হিং
বিল্ব—শ্রীফল

বীভৎস—ঘৃণার্হ
বীভৎসু—অর্জুন

বিস্মিত—চমৎকৃত
বিস্মৃত—ভ্রান্ত

বেদ—হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থবিশেষ
বেধ—গভীরতা

বিনা—ব্যতীত
বীণা—বাঁশী

বানি—বানাইবার ব্যয় (যেমন—স্বর্ণকারের 'বানি')
বাণী—বাক্য ; সরস্বতী

বিশ—কুড়ি ; বৈশ্য
বিষ—গরল ; মৃণাল
বিস—মৃণাল

বিদুর—ধৃতরাষ্ট্রের বৈমাত্রের ভ্রাতা ; জ্ঞানী
বিদূর—বহুদূরস্থ

বিমর্শ—বিবেচনা, তথ্যানুসন্ধান
বিমর্ষ—অসহন ; নাট্যাঙ্গ

ব্যঙ্গ—বিকলাঙ্গ ; ভেক ; ঠাট্টা
ব্যঙ্গ্য—ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা বোধ্য (অর্থ)

ভাশুর—স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
ভাস্বর—দীপ্তিশালী

ভাষণ—উক্তি ; অভিভাষণ
ভাসন—দীপ্তি

ভাণ—নাট্যবিশেষ
ভান—দীপ্তি ; শোভাপ্রকাশ ; ছল

মেদ—মজ্জা
মেধ—যজ্ঞ

মহিত—পূজিত
মোহিত—মোহপ্রাপ্ত

মরীচি—কিরণ ; দীপ্তি
মরীচিকা—মৃগতৃষ্ণিকা

মূক—নির্বাক
মুখ—বদন

মুখপত্র—প্রথম বা প্রধান পত্র বা পত্রিকা
মুখপাত্র—প্রধান ব্যক্তি ; অগ্রণী

যব—শস্য বা পরিমাণ-বিশেষ
জব—বেগ ( যেমন,—রথজব )

যাপন—কাটানো
উদ্‌যাপন—সম্পাদন

যতি—যতিচিহ্ন ; মুনি ; ভিক্ষু
যতী—তপস্বী ; ভিক্ষু
জ্যোতি—দীপ্তি

যাচক—ঐ
উপযাচক—স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যে যাচ্ঞা করে

যবনী—যবন-স্ত্রী
যবনানী—যবনলিপিসমূহ
যবানী—যোয়ান; যবানীনামক ঔষধ

রিক্থ—ধন ; দায়

রুক্ষ—কর্কশ
রীতি—প্রথা ; প্রণালী
ঋতি—পথ ; গতি
হৃতি—হরণ

লক্ষ—সংখ্যাবিশেষ
লক্ষ্য—উদ্দিষ্ট ; দ্রষ্টব্য ; শরব্য

শকল—খণ্ড ; আঁইস
সকল—সমস্ত

শকৃৎ—বিষ্ঠা
সকৃৎ—একবার

শক্ত—সমর্থ
সক্ত—অনুরক্ত ; লগ্ন

শংকর—শিব
সংকর—মিশ্রণোৎপন্ন

শঙ্খ—শাঁখ
সংখ্য—সংখ্যাযোগ্য

শম্বর—হরিণ
সম্বর—সংবরণ

শঠ—প্রবঞ্চক
ষট্—ছয়

শত—সংখ্যাবিশেষ
স্বতঃ—আপনা হইতে

শপ্ত—অভিশাপগ্রস্ত
সপ্ত—সাত

শবল—নানাবর্ণযুক্ত
সবল—বলবান

শম—দম ; শান্তি ; চিত্তস্থৈর্য
সম—সমান

শরল—পীতদারু বৃক্ষ
সরল—ঋজু

শরণ—আশ্রয়
স্মরণ—স্মৃতি

শশা—ফলবিশেষ
স্বসা—ভগিনী

সলিল—জল
সলীল—লীলাযুক্ত ; কৌতূহলী

সর্পিঃ—ঘৃত
সর্পী—বিসর্পণশীল ; গমনকারী

শান্ত—ধীর
সান্ত—সসীম

শারদ—শরৎকালীন ; বৎসর
সারদ—শ্রেষ্ঠত্বদায়ক

শারদা—ভগবতী দুর্গা
সারদা—সরস্বতী

শ্রুত—যাহা শোনা গিয়াছে
স্রুত—ক্ষরিত

শিকড়—বৃক্ষমূল
শীকর—জলকণা

শুক—পক্ষিবিশেষ
শূক—শস্যের সূক্ষ্মাগ্র

শূকর—জন্তুবিশেষ
সুকর—সুসাধ্য

শুক্তি—ঝিনুক
সূক্তি—সজ্জনবাণী

শীত—ঠাণ্ডা ঋতুবিশেষ
সিত—সাদা

শিতি—কৃষ্ণবর্ণ
সিতি—শুক্লবর্ণ

শৃত—পক্ব
শ্রিত—সেবিত

শ্রবণ—শ্রুতি
স্রবণ—ক্ষরণ

শর—বাণ
সর—দুধের সর
স্বর—উদাত্তাদি কণ্ঠধ্বনি

শাপ—অভিশাপ
সাপ—সর্প
স্বাপ—নিদ্রা

শক্তি—ক্ষমতা
সক্তি—সংযোগ
সক্‌থি—উরু

শুচি—পবিত্র
সূচী—ছুঁচ ; নির্ঘণ্ট ; বিষয়-নির্দেশ-তালিকা

শূর—বীর
সুর—দেবতা ; গানের সুর
সূর—সূর্য

শব—মৃত
সব—প্রসব ; সমস্ত

শর্ব—শিব
সর্ব—সমস্ত

শিল—মসলা গুঁড়া করিবার পাথরের নুড়ি
শীল—চরিত্র
সীল—জলজন্তুবিশেষ

সত্র—যজ্ঞ
সত্বর—শীঘ্র

সবিতৃ—সূর্য
সবিত্রী—জননী

সম্প্রতি—অধুনা
সম্প্রীতি—সদ্ভাব

সর্গ—অধ্যায় ; সৃষ্টি
স্বর্গ—দেবলোক

সহিত—সঙ্গে
স্বহিত—নিজের কল্যাণ

সংস্কার—ধর্মবিহিত অনুষ্ঠান
সংস্করণ—মুদ্রিত পুস্তকাদির রূপ

সাক্ষর—অক্ষয়-জ্ঞানসম্পন্ন
স্বাক্ষর—দস্তখত

সামি—অর্ধাংশ
স্বামী—প্রভু ; ভর্তা

সার্থ—সমূহ ; বণিক্‌দল ; ধনবান্
স্বার্থ—নিজের প্রয়োজন

সীমন্ত—সিঁথি
সীমান্ত—সীমাশেষ

সুত—পুত্র
সূত—সারথি

সুতা—কন্যা
সূতা—সুতো

সমীর—বাতাস
শমীর—বৃক্ষবিশেষ

সিক্ত—আর্দ্রীভূত
সিক্‌থ—মোম

স্কন্দ—কার্তিকেয়
স্কন্ধ—কাঁধ

সুদ—কুসীদ
সূদ—পাচক

সাম—বেদবিশেষ
শ্যাম—বনবিশেষ

সুবন্ত—সুপ্‌ বিভক্ত্যন্ত
সুবন্ধ—তিল ; যন্ত্র

সদ্য—টাট্‌কা
সদ্ম—আবাস

সোদর—সহোদর
স্বোদর—নিজের উদর
সুগন্ধ—যাহা অপর সামগ্রীর সৌরভে সুবাসিত
সুগন্ধি—যে সামগ্রীর নিজেরই ভাল গন্ধ আছে

সত্য—যথার্থ ; প্রকৃতি
সত্ত্ব—গুণবিশেষ ; সার ; প্রাণী
স্বত্ব—স্বামিত্ব
সার্বজনীন—সর্বজনের সম্বন্ধীয়
সর্বজনীন—সর্বজনের মঙ্গলের নিমিত্ত বা সর্বজনের হিতকর

সুকৃতি—সৎকর্ম ; ভাগ্য
সুকৃতী—পুণ্যাত্মা ; সৌভাগ্যশালী
সুকীর্তি—সুখ্যাতি

**প্রয়োগ**

কোকিলশাবককে পালন করায় কাকের নাম হইয়াছে **পরভৃৎ**। কাকের দ্বারা পালিত হওয়ায় কোকিলের নাম হইয়াছে **পরভৃত**। **অসিত**বর্ণ লৌহে নির্মিত অসিতে হয় হীরকের দীপ্তি। শীতকালে **অশিত**কর রবিরশ্মির জন্য জীবকুল আগ্রহান্বিত থাকে। তূলা **উপাধানের** প্রধান **উপাদান**। **বিষই** বিষের ঔষধ। **বিস**-কিসলয় মরালের প্রিয় সামগ্রী। **বিশ** বছর আগে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। নিশীথে সহসা আর্ত**ধ্বনি** শ্রুত হইল। সাধারণতঃ **ধনীর** দুলাল মূর্খই হয়। 'শুনগো, রাজার **ধনি**' ( 'সুন্দরী স্ত্রী' অর্থে 'ধনি' শব্দ ব্যবহৃত হয় )।

## অনুশীলনী

[ এক ] নিম্নলিখিত শব্দযুগলসমূহের মধ্যে চারটির প্রয়োগ ও অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :—নিপাত, নিপাতন , অভিনিবেশ, উপনিবেশ ; প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান ; পালন, প্রতিপালন ; আরাম, বিরাম ; আসব, আহব ; কৌতুক, কৌতূহল ; যাচক, উপযাচক ; পরন্তু, উপরন্তু ; অতএব, অর্থাৎ ; উদ্বৃত্ত, উদ্ধৃত ; যাপন, উদ্‌যাপন ; টপ্‌ টপ, টিপ্‌ টিপ্‌ ; অন্বয়, সমন্বয় ; পরুষ, পৌরুষ ; সংস্কার, সংস্করণ ; ভাত-টাত, ভাত-ফাত ; অবতরণ, অবতারণা ; অর্ধাসন, অর্ধাশন ; অনুনাসিক, উন্নাসিক ; প্রেরণ, প্রেরণা ; প্রশস্ত, প্রশস্তি ; প্রয়োজন, প্রযোজনা ; প্রবাদ, পরিবাদ ; শংকর, সংকর ; শক্ত, সক্ত ; শারদা, সারদা ; সর্গ, স্বর্গ ; চ্যুত, চূত ; আহুত, আহূত ; সাক্ষর, স্বাক্ষর ; সার্থ, স্বার্থ ; সদ্য, সদ্ম ; সম্প্রতি, সম্প্রীতি ; বিষ, বিস ; অবদান, অবধান ; অবিরাম, অভিরাম ; পরুষ, পুরুষ ; পল্লব, পল্বল ; প্রকার, প্রাকার ; প্রকৃত, প্রাকৃত ; প্রসাদ, প্রাসাদ।

**ক. বি. মাধ্যমিক '৫০, '৫১, '৫৪ ( বিজ্ঞান ) '৫৫, ( বিকল্প ) '৫৫**

[ দুই ] নিম্নলিখিত যে কোন তিনটি শব্দযুগ্মকের অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া উপযুক্ত বাক্য রচনা কর :— অবদান অবধান ; নির্বন্ধ, নিবন্ধ ; কুট, কূট ; অবিচার, অভিচার , গিরিশ, গিরীশ ; অসার, আসার। **গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫১**

[ তিন ] যে কোনও পাঁচটিতে অর্থ বৈষম্য নির্ণয় কর :—অস্ত্র ও শস্ত্র ; কুল ও কূল ; ব্যসন ও বসন ; উপকরণ ও উপাদান ; শ্মশ্রু ও শ্বশ্রূ ; পরিচ্ছেদ ও পরিচ্ছদ ; সর্গ ও স্বর্গ ; স্বত্ব ও সত্ত্ব। **রা. বি. মাধ্যমিক '৫৪**

# চতুর্থ অধ্যায়

## প্রায়-সমার্থবাচক শব্দাদির সূক্ষ্ম অর্থপার্থক্য

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে লেখকের অভাব নাই। খুবই দুঃখের বিষয় যে, জনপ্রিয় লেখকেরাও সময়ে সময়ে অত্যন্ত আলগা ভাবে শব্দপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। আমাদের সাহিত্যে এমন অনেক শব্দগুচ্ছ আছে, যাহারা প্রায়-সমার্থবাচক হইলেও শব্দনির্বিশেষে সূক্ষ্ম অর্থসম্পন্ন। এই ধরণের বহুপ্রচলিত কয়েকটি প্রায়-সমার্থবাচক শব্দগুচ্ছের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল:

**অকস্মাৎ**—সাধারণ ভাবে অপ্রত্যাশিত বিপদকে বুঝায়। **দৈবাৎ**—মানব-জীবনের দুর্ঘটনায় নিয়তির অমোঘ বিধান যেখানে কল্পিত হয়। **সহসা**—প্রাকৃতিক বিপৎপাত যেখানে দেখা দেয়। **হঠাৎ**—অপ্রত্যাশিতপূর্ব ঘটনা যেখানে লক্ষিত হয়।

**অকাজ**—অপ্রয়োজনীয় কাজ। **কু-কাজ**—খারাপ কাজ।

**অকাল**—অপ্রশস্ত কাল: যেমন,—অকালের আম। **অবেলা**—অতিশয় বেলা: যেমন,—অবেলায় আহার। **অসময়**—বিপদের সময়: যেমন,—অসময়ের বন্ধু।

**অনায়াসে**—মানসিক ক্ষেত্রে বিনা চেষ্টায়: যেমন,—অনায়াসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। **অক্লেশে**—কায়িক ক্ষেত্রে কষ্টবোধ না করিয়া: যেমন,—অক্লেশে দশ মাইল হাঁটা। **সহজে**—আপনা হইতেই অপরের উপরে নির্ভর না করিয়া: যেমন,—পশু সহজেই পশু।

**অজ্ঞ**—যে জানে না অর্থাৎ অভিজ্ঞতাহীন। **অশিক্ষিত**—যে লেখাপড়ার মারফতে শিক্ষালাভ করে নাই। **অবোধ**—বয়সও কম এবং বুদ্ধিও পাকে নাই: যেমন, অবোধ বালক। **নির্বোধ**—বয়স বেশি, অথচ, বুদ্ধিহীন: যেমন,—নির্বোধ বৃদ্ধ। **মূর্খ**—সাধারণ ভাবে 'বোকা' অর্থে প্রযুক্ত।

**অনিদ্র**—রোগ শোক চিন্তা বেদনার জন্য অবিরাম নিদ্রাহীনতাবোধক: যেমন,—বয়স্থা কন্যাকে পাত্রস্থা করিবার চিন্তায় অনিদ্রভাবে বৃদ্ধ পিতার রজনীযাপন। **বিনিদ্র**—ঐরূপ কোন উপসর্গ নাই, অথচ ক্ষণকালের জন্য নিদ্রাহীনতা: যেমন,—রজনীতে বিনিদ্র হইয়া দেখি, প্রদীপ নির্বাপিত—গৃহদ্বার উন্মুক্ত।

**অহংকার**—নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান। **অভিমান**—প্রিয়জনের ত্রুটিহেতু ক্ষোভ, আত্মমর্যাদাবোধ। **গর্ব**—ধন বিদ্যা রূপ ইত্যাদির জন্য আত্মশ্লাঘা ও অপরকে

উপেক্ষা। **দর্প**—ধনবিদ্যাদির আতিশয্যবশতঃ আত্মগৌরব প্রকাশ। **দম্ভ**—যে বিষয়ে যোগ্যতা নাই, সেই বিষয়েই যোগ্যতা প্রকাশ।

**আগত**—যে বা যাহা আসিয়াছে। **আগামী**—যে বা যাহারা আসে নাই, কিন্তু আসিবে।

**আচার**—সাধারণ ভাবে চালচলন: যেমন,—দেশাচার, লোকাচার, সদাচার ইত্যাদি। **ব্যবহার**—ব্যক্তিবিশেষের চালচলন।

**আধি**—মনের পীড়া। **ব্যাধি**—দেহের পীড়া।

**উৎকণ্ঠা**—চিত্তচাঞ্চল্য। **উদ্বেগ**—সংশয়জনিত ব্যাকুলতা। **ঔৎসুক্য**—মনের মত কাজে আগ্রহ।

**উপকরণ**—যে সকল সমবায়ী কারণের গুণে কার্যসমাধা হয়। যেমন,—নৈবেদ্য পূজার উপকরণ। **উপাদান**—যে সকল সমবায়ী কারণের গুণে দ্রব্য নির্মিত হয়: যেমন,—কাঠ আয়নার উপাদান।

**কুল**—একজাতীয় নিম্নশ্রেণীর প্রাণিবাচক বহুবচনবোধক শব্দ: যেমন,—ধেনুকুল, অলিকুল, **গণ**—একজাতের উচ্চজাতীয় প্রাণিবাচক বহুবচনবোধক শব্দ: যেমন,—মনুষ্যগণ। শব্দটি দেবতাবাচকও বটে। **নিচয়**—প্রাণি এবং অপ্রাণিবাচক বহুবচনবোধক শব্দ: যেমন,—পশুনিচয় মেঘনিচয়, পুষ্পনিচয়। **বর্গ**—একজাতীয় অথবা একই রকমের ধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ: যেমন,—নেতৃবর্গ, রাজন্যবর্গ। **সভা**—প্রাণিবাচক বহুবচনবোধক শব্দ: যেমন,—পণ্ডিতসভা, যুবতীসভা। **মণ্ডলী**—উচ্চনীচনির্বিশেষে সকল জাতীয় প্রাণিবাচক বহুবচনবোধক শব্দ: যেমন,—কৃষক-মণ্ডলী, বিবুধমণ্ডলী। **গ্রাম, দাম, মণ্ডল, মালা, রাজি**—অপ্রাণিবাচক বহুবচন-বোধক শব্দ; যেমন,—ইন্দ্রিয়গ্রাম, বিদ্যুদ্দাম, মেঘমণ্ডল, নামমালা, বৃক্ষরাজি।

**দল**—একই আদর্শ বা লক্ষ্য-সমন্বিত সম্প্রদায়:—শ্রমিকদল, ধনিকদল, কৃষক-দল, দস্যুদল। **পাল**—গবাদি গৃহপালিত পশুর সমষ্টি: যেমন,—গোরুর পাল, ছাগলের পাল, ভেড়ার পাল। **সার্থ**—একমাত্র বণিক্‌দল সম্পর্কেই প্রযোজ্য: যেমন,—বণিক্‌সার্থ। **যূথ**—পশুসমষ্টি, বিশেষ করিয়া হস্তিসমষ্টি, বুঝাইবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: যেমন,—হস্তিযূথ।

**কুশল**—গুরুজন ও লঘুজন, ভক্তিভাজন ও স্নেহভাজন—উভয়ের জন্য মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা। **কল্যাণ**—কেবলমাত্র লঘুজন তথা স্নেহভাজনেরই জন্য মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা। **আশীর্বাদ**—গুরুজনের দ্বারা শুভ কামনাসূচক বাচন।

**জাগ্রৎ**—যে ঘুমন্ত নয়, পক্ষান্তরে জাগিয়াই আছে: যেমন,—জাগ্রৎ দেবতা; গৃহস্থকে 'জাগ্রৎ' দেখিয়া চোর পলায়ন করিল। **জাগরিত**—যাহার সবেমাত্র নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে: যেমন,—ভীতসন্ত্রস্ত প্রতিবেশীদের চীৎকারে আমি 'জাগরিত'

হইলাম। **জাগরূক**—সজাগ, সতর্ক ; যেমন,—তাঁহার উপদেশ সর্বদা আমার অন্তরে 'জাগরূক' রহিয়াছে।

**দর্শন**—সাধারণ দেখা। **সন্দর্শন**—মহাপুরুষদিগের দর্শন। **পর্যবেক্ষণ**—মনোযোগ দিয়া দেখা। **পরিদর্শন**—তন্ন তন্ন করিয়া দেখা।

**সেবা**—দেবদ্বিজ ও গুরুজনের সন্তুষ্টিবিধায়ক কার্য। **শুশ্রূষা**—রোগীর পরিচর্যা।

**হিংসা**—অপরের অনিষ্ট করিবার মনোভাব। **ঈর্ষা**—পরশ্রীকাতরতা। **দ্বেষ**—অপরের প্রতি ঘৃণা। **অসূয়া**—অপরের গুণের অনাদর ও দোষের আলোচনা।

**শক্তি**—কাজ করিবার ক্ষমতা। **সামর্থ্য**—শারীরিক বল। **প্রভাব**—প্রভুশক্তি। **প্রতাপ**—লোকবল ও অর্থবলজনিত তেজ।

**নমস্কার**—সমপদস্থ বা তুল্য ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখানো : যেমন,—শূদ্র শূদ্রকে নমস্কার করে। **প্রণাম**—গুরুজনকে নত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখানো : যেমন,—শূদ্র ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে। **অভিবাদন**—অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে সম্মান দেখানো : যেমন,—প্রজা রাজাকে অভিবাদন করে।

**ক্ষুদ্র**—আকারে ছোট : যেমন,—ক্ষুদ্র, অণু। **ছোট**—যাহা বড় নয় যেমন,——ছোট নদী। **তুচ্ছ**—নগণ্য : যেমন,—তুচ্ছ ব্যাপার। **হীন**—নীচ যেমন,—হীন আচরণ।

**রীতি**—পদ্ধতি, প্রথা। **নীতি**—ধর্মসংগত বা সমাজহিতকর বিধান।

**ভ্রম**—অমনোযোগিতার জন্য ভুল। **প্রমাদ**—অজ্ঞতার জন্য ভুল। **ভুলচুক**-সামান্য ভুল। **বিস্মরণ**—স্মৃতিশক্তিহীনতার জন্য একেবারে ভুল।

**ইচ্ছা**—সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত শব্দ। **স্পৃহা**—ইচ্ছা যখন খুব বলবতী হয় : যেমন,—ভোজনের স্পৃহা। **লিপ্সা**—লাভ করিবার ইচ্ছা : যেমন,—যশোলিপ্সা। **লালসা**—যে ইচ্ছার মধ্যে লোভ প্রবাহিত থাকে : যেমন,—অর্থলালসা। **বাসনা**—বিষয়ভোগের ইচ্ছা : যেমন,—বিষয়বাসনা। **আকাঙ্ক্ষা**—প্রাপ্তির নিমিত্ত আগ্রহ : যেমন,—ধনাকাঙ্ক্ষা। **অভিরুচি**—মনের প্রবৃত্তি : যেমন—ঘরজামাই হইয়া থাকিবে, কি থাকিবে না—তোমার 'অভিরুচি'। **বাঞ্ছা**—অন্তরের ইচ্ছা : যেমন,—সাধিকা শবরী 'বাঞ্ছা'-কল্পতরু শ্রীরামচন্দ্রের জন্য তাঁহার অন্তরে প্রেমের প্রদীপ জ্বালাইয়াছিলেন।

**বন্ধু**—যাহার ত্যাগ ( অর্থাৎ বিয়োগ অথবা বিচ্ছেদ ) সহ্য করা যায় না। **সুহৃৎ**—যে সকল সময়েই একমত থাকিয়া প্রিয় কাজ অথবা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। **মিত্র**—যে একই প্রকার ক্রিয়াকর্ম করে। **সখা**—প্রাণের তুল্য প্রিয়জন। [ তুলনীয় : 'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ। একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।'—হিতোপদেশ। ]

**অনুরাগ**—সাধারণ ভাবে চেতন অচেতনের প্রতি হৃদয়ের টান: যেমন,—খেলাধূলায় অনুরাগ। **প্রেম**—ভগবান ও সর্বজীবের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা: যেমন,—ভগবৎপ্রেম, জীবে প্রেম। **প্রণয়**—পতি, পত্নী, বন্ধু ইত্যাদির প্রতি ভালবাসা; যেমন,—বন্ধুর প্রণয়। **প্রীতি**—ভালবাসার জনের সুখ দেখিয়া যেখানে মানসিক তৃপ্তিলাভ করা যায়: যেমন,—কাহারও ব্যবহারে প্রীতিলাভ করা। **ভালবাসা**—বন্ধু প্রভৃতি সমকক্ষ ব্যক্তি সম্পর্কে হৃদয়ের টান: যেমন,—প্রবোধ আমার 'ভালবাসা'র পাত্র।

**আদর**—স্নেহের বাহ্য প্রকাশ: যেমন,—অতি 'আদর' দিলে ছেলের মাথা খাওয়া হয়। **স্নেহ**—ছোটদের প্রতি ভালবাসা: যেমন,—সন্তানস্নেহ।

**শ্রদ্ধা**—অনাত্মীয় বড়দের প্রতি সম্মাননিষিক্ত ভালবাসা: যেমন,—কবি-সমালোচক মোহিতলাল আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। **ভক্তি**—আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ গুরুজনের প্রতি হৃদয়ের সশ্রদ্ধ টান: যেমন,—পতিভক্তি, গুরুভক্তি।

**মায়া**—মিথ্যাবুদ্ধিজনিত অজ্ঞানতা: যেমন,—এই নশ্বর জীবনে সন্তানের প্রতি 'মায়া' ভগবদ্‌প্রেম-প্রাপ্তির পক্ষে অন্তরায়। **মমতা**—আপন বলিয়া জ্ঞান: যেমন,—পরের ছেলের প্রতি 'মমতা' আরোপ করিলে কষ্ট পাইতে হয়।

**কি**—এই জিজ্ঞাসাবাচক শব্দটি সাধারণতঃ প্রশ্নার্থে, কষ্টে-খেদে, বিস্ময়ে, সন্দেহে, বিরক্তিতে, নিষেধে, ভয়প্রদর্শনে, সংস্রব-রাহিত্যে, অভাবার্থে ব্যবহৃত হয়। ভয়প্রদর্শনে, ক্রোধে, বিস্ময়ে, বিরক্তিতে, ঘৃণায়, লজ্জায় ইহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ

## অনুশীলনী

নিম্নলিখিত শব্দগুচ্ছগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটি গুচ্ছকে বাছিয়া লও এবং প্রত্যেক গুচ্ছের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দের সূক্ষ্ম অর্থ বিবেচনা করিয়া এক একটি পৃথক্ বাক্য রচনা কর:—অকস্মাৎ দৈবাৎ সহসা ও হঠাৎ; অহংকার অভিমান গর্ব দর্প ও দম্ভ; কুল গণ নিচয় বর্গ সভা মণ্ডলী গ্রাম ও দাম; দল পাল সার্থ ও যূথ; দর্শন সন্দর্শন পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন: ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা অভিরুচি ও স্পৃহা; লিপ্সা লালসা বাসনা ও বাঞ্ছা; বন্ধু মিত্র সখা ও সুহৃৎ; অনুরাগ প্রেম প্রীতি প্রণয় ও ভালবাসা; আদর ও স্নেহ; শ্রদ্ধা ও ভক্তি; মায়া ও মমতা; কি ও কী ( ক. বি. বি. এ. '৫১ )।

# পঞ্চম অধ্যায়

## বিপরীতার্থক শব্দ

**শব্দ — বিপরীত শব্দ**

অগ্রজ—অনুজ
অণু—বৃহৎ
অনুরক্ত—বিরক্ত
অনুগ্রহ—নিগ্রহ
অনুলোম—প্রতিলোম ; বিলোম
অনৃত—সুনৃত
অধমর্ণ—উত্তমর্ণ
অন্তর—বহিঃ
অর্পণ—গ্রহণ ; প্রত্যর্পণ
অর্থী—প্রত্যর্থী
অধিত্যকা—উপত্যকা
অনুকূল—প্রতিকূল
অসীম—সসীম
অন্ত্য—আদ্য
অলস—শ্রমী
আনা—গোনা
অনন্ত—সান্ত
অমৃত—বিষ ; গরল
আকর্ষণ—বিকর্ষণ
আমান্ন—সিদ্ধান্ন
আরোহণ—অবরোহণ
আবাহন—বিসর্জন
আবির্ভাব—তিরোভাব ; তিরোধান
আস্তিক—নাস্তিক
আদিষ্ট—নিষিদ্ধ
আস্থা—অনাস্থা
আবিল—অনাবিল
আশা—নিরাশা ; হতাশা
আবৃত—অনাবৃত ; উন্মুক্ত
আসামী—ফরিয়াদী
ইষ্ট—অনিষ্ট

উচ্চ—অবচ ; নীচ
উগ্র—সৌম্য
উৎকর্ষ—অপকর্ষ
উত্থান—পতন
উন্মীলন—নিমীলন
উপচয়—অপচয়
উৎকৃষ্ট—নিকৃষ্ট ; অপকৃষ্ট
উত্তর—দক্ষিণ ; প্রত্যুত্তর
উত্তাপ, তাপ—শৈত্য
উত্তরণ—অবতরণ
ঊর্ধ্ব—অধঃ
ঋজু—বক্র
ঐক্য—অনৈক্য
ঐহিক—পারত্রিক
ওস্তাদ—সাগ্‌রেদ ; আনাড়ী
কোমল—কর্কশ ; কঠিন
কুৎসা—প্রশংসা
কাপুরুষ—বীরপুরুষ
কৃত্রিম—নৈসর্গিক
ক্ষিপ্ত—প্রকৃতিস্থ
কৃষ্ণ—শুক্ল ; শুভ্র
ক্রোধ—প্রীতি ; ক্ষমা ; শান্তি
ক্ষয়িষ্ণু—ব
ক্ষীণ—পীন ; পুষ্ট
খেদ—আহ্লাদ
গরিষ্ঠ—লঘিষ্ঠ
গরিমা—লঘিমা
গুণ—দোষ ; ভাগ
গুরু—লঘু ; শিষ্য
গুপ্ত—ব্যক্ত ; প্রকাশিত

গৌরব—লাঘব
গ্রহণ—দান ; বর্জন ; ত্যাগ ; অর্পণ
গ্রাম্য—পৌর ; শহুরে ; জানপদ
গোপন—প্রকাশ
গৃহী—সন্ন্যাসী
ঘন—তরল ; বিরল
ঘাত—প্রতিঘাত
চেতন—জড়
চড়াই—উতরাই
জ্যোৎস্না—আঁধার
জরা—যৌবন
জয়—পরাজয়
জাগরণ—নিদ্রা ; সুপ্তি
জ্বলন—নির্বাণ
জাগ্রৎ ; প্রবুদ্ধ—সুষুপ্ত
ঝটিতি—বিলম্ব
ডুবন্ত—ভাসন্ত
তন্বী—স্থূলা ; স্থূলাঙ্গী
তরুণ—বৃদ্ধ
তিতা—মিঠা
তিমির—আলোক
তামসিক—রাজসিক ; সাত্ত্বিক
তেজঃ—ক্ষমা
দাতা—গ্রহীতা ; ভিক্ষুক ; বখিল ; কৃপণ
দীর্ঘ—হ্রস্ব
দুরন্ত—শান্ত
দক্ষিণ—বাম
দ্যুলোক—ভূলোক
দাবি—উপরি
দুষ্কৃতি—সুকৃতি

| শব্দ বিপরীত শব্দ | শব্দ বিপরীত শব্দ | শব্দ বিপরীত শব্দ |
|---|---|---|
| দ্রুত—মন্থর | বিনীত—উদ্ধত ; গর্বিত | শিক্ষক—শিক্ষার্থী ; ছাত্র |
| দৃঢ়—শিথিল | বরখাস্ত—বাহাল | সংক্ষেপ—বাহুল্য ; বিস্তার |
| দুষ্কর—সুকর | বিপথ—সুপথ | সংকীর্ণ—প্রশস্ত |
| ধনিক—শ্রমিক | বিমল—সমল | সরল—কপট ; কুটিল |
| নীচ—উচ্চ ; মহৎ | বিরল—গাঢ় | সজীব—নির্জীব |
| নিন্দা—প্রশংসা ; স্তুতি | বিস্তৃত—সংক্ষিপ্ত | সাদৃশ্য—বৈসাদৃশ্য |
| নিরত—বিরত ; রত | বোকা—সেয়ানা | সঞ্চয়—ব্যয় ; অপচয় |
| নির্দয়—সদয় | ব্যর্থ—সার্থক ; অব্যর্থ | সংকোচ—বিস্তার ; অসংকোচ |
| নির্মল—মলিন | বিপ্রকর্ষ—সন্নিকর্ষ | সন্ধি—বিগ্রহ |
| নরম—শক্ত | বন্য—গৃহপালিত ; গ্রাম্য | সাম্য—বৈষম্য |
| নিশ্চেষ্ট—সচেষ্ট | বিজেতা—বিজিত | সমাপ্ত—আরব্ধ |
| নীরস—সরস | বাচাল—স্বল্পভাষী | স্বার্থ—পরার্থ |
| ন্যূন—অধিক | ভীরু—নির্ভীক | সাকার—নিরাকার |
| পরকীয়—স্বকীয় | ভাঁটা—জোয়ার | সুগন্ধি—দুর্গন্ধি |
| প্রফুল্ল—ম্লান | ভূত—ভবিষ্যৎ | সুগম—দুর্গম |
| প্রাচীন—অর্বাচীন ; আধুনিক ; নব্য | ভদ্র—ইতর ; অভদ্র | সুশীল—দুঃশীল |
| পুরুষ—পেলব | ভূষণ—দূষণ | সৃষ্টি—প্রলয় ; সংহার ; ধ্বংস |
| প্রবীণ—নবীন ; নব্য | মিলন—বিরহ | সাবধান—অনবধান |
| পুরোভাগ—পশ্চাদ্ভাগ | মুখ্য—গৌণ | স্থাবর—জঙ্গম |
| প্রকৃতি—বিকৃতি | মৃদু—প্রবল ; উগ্র ; তীব্র ; তীক্ষ্ণ | স্থূল—সূক্ষ্ম ; কৃশ |
| প্রত্যক্ষ—পরোক্ষ | মধুর—তিক্ত ; কটু | সমস্ত—ব্যস্ত |
| প্রতিযোগী—সহযোগী ; অনুযোগী | মরণ—জীবন ; বাঁচন ; জনম | স্মৃতি—বিস্মৃতি |
| প্রসন্ন—বিষণ্ণ | মান—অপমান | সত্য—মিথ্যা ; অলীক |
| প্রসারণ—সংকোচন ; আকুঞ্চন | যশ—অপযশ ; কলঙ্ক | স্বর্গ—নরক ; পাতাল |
| প্রাংশু—বামন | যোজক—প্রণালী | সুধা—হলাহল |
| পূর্ণ—শূন্য | | স্বতন্ত্র—পরতন্ত্র |
| পরাধীন—স্বাধীন | রোগী—নীরোগ | সমষ্টি—ব্যষ্টি |
| পুরস্কার—তিরস্কার ; দণ্ড | রাগ—শম ; শান্তি ; দ্বেষ | সম্পদ—বিপদ ; আপদ |
| ফলন্ত—অফলা | লাভ—ক্ষতি ; লোকসান | সুরভি—পূতি |
| বন্ধ ; বন্ধন—মুক্ত | শিব—অশিব | সাধু—দুষ্ট; চোর; অসাধু; ভণ্ড |
| বাদ—প্রতিবাদ | শীতল—তপ্ত ; উষ্ণ | স্নিগ্ধ—রুক্ষ |
| বিয়োগ—যোগ ; সংযোগ | শুষ্ক—আর্দ্র ; সিক্ত | স্পৃহা—ঘৃণা |
| বিধি—নিষেধ | শুকো—হাজা | হর্ষ—বিষাদ |
| বন্ধুর—মসৃণ | শ্রদ্ধা—ঘৃণা ; অশ্রদ্ধা | হ্রাস—বৃদ্ধি |
| বর্ধমান—ক্ষীয়মাণ | শোক—আনন্দ | হরণ—পূরণ |
| বাদী—বিবাদী ; প্রতিবাদী | শ্রম—বিশ্রাম ; আলস্য | |
| বিশ্লেষণ—সংশ্লেষণ | শ্বাস—প্রশ্বাস ; নিশ্বাস | |

**প্রয়োগ**

ভারতের **ক্ষীয়মান** কুটীরশিল্পের মাঝে বিপ্লব দেখা না দিলে, ভারতীয় জনসাধারণের **ক্ষয়িষ্ণু** অবস্থায় উন্নতি ঘটিবে না। পূতচরিত্র মানবমাত্রেই **ঐহিক**-বোধ পরিহারপূর্বক **পারত্রিক** চিন্তা করিয়া থাকেন। দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে যখন **সন্ধির** সর্ত অচল হইয়া পড়ে, তখন স্বভাবতঃই **বিগ্রহের** আগুন জ্বলিয়া উঠে। **ব্যষ্টিকে** অস্বীকার করিয়া **সমষ্টিকে** চালনা করা অশ্বের সম্মুখে শকট রাখিয়া চালাইবার প্রয়াসের ন্যায় নিরর্থক ও হাস্যকর। **অব্যর্থ** শরসন্ধানের ক্ষেত্রে অর্জুন ছিলেন **সার্থক** ধানুকী। কায়মনোবাক্যে যিনি **শান্তি** কামনা করেন, তিনি কখনও অপরের প্রতি **দ্বেষ** পোষণ করেন না। **অগ্রজ** শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ **অনুজ** লক্ষ্মণ পালন করিতেন। সকল পদার্থেরই **শৈত্যে সংকোচন** ও **উত্তাপে প্রসারণ** ঘটে। গান্ধীজীর **তিরোভাবে** ভারতীয় জাতি পিতৃহীন হইয়াছে। আজিকার দিনে **শিক্ষক-ছাত্রের** সম্পর্ক, অতীত কালের ন্যায় মধুর নয়। কল্যকার অধিবেশনে **ওস্তাদ-সাকরেদের** সংগীতচর্চা খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল। **মরণ-বাঁচনের** কথা কে বলিতে পারে? **রাজসিক** আহার **সাত্ত্বিক** ভাবগঠনের পরিপন্থী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই **স্থূলা** রমণী **তন্বী** নারীর চেয়ে কর্মিষ্ঠা হয় না। **আপদে-সম্পদে** যিনি সমভাবে ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনিই প্রকৃত ধর্মভীরু ব্যক্তি। চন্দ্রের **হ্রাসবৃদ্ধিতে** সাগরে **জোয়ারভাঁটা** দেখা দেয়। **দুষ্ট** জনের সংসর্গে পড়িয়া **সাধু** ব্যক্তিরও সর্বনাশ ঘটিয়া থাকে।

**অনুশীলনী**

[ এক ] নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে কোন পাঁচটির বিপরীতার্থক শব্দদ্বারা একটি করিয়া বাক্য রচনা কর :—প্রফুল্ল ; গর্বিত ; বিরক্ত ; উগ্র ; কৃত্রিম ; শ্রম ; সন্ধি ; সঞ্চয় ; ভূত ; বিরল। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭**

[ দুই ] নিম্নলিখিত শব্দগুলি হইতে পাঁচটি বাছিয়া লইয়া উহাদের সমার্থক প্রতিশব্দ দ্বারা একটি ও বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা একটি করিয়া বাক্য রচনা কর :—স্থূল, বিসর্জন, গর্বিত, স্তুতি, হ্রাস, স্নিগ্ধ, কৃত্রিম, উগ্র, মধুর, অর্বাচীন। **রা. বি. মাধ্যমিক '৫৬**

[ তিন ] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোনও পাঁচটির বিপরীতার্থক শব্দ লিখ ও সেই শব্দগুলি লইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—হর্ষ, বিরত, বর্ধমান, ঐহিক, সন্ধি, সমষ্টি, শ্রম, প্রফুল্ল ; রাগ, জয়, আরোহণ, অগ্রজ, প্রসারণ, আবির্ভাব, শিক্ষক, ওস্তাদ, মরণ, হ্রাস, আপদ, তামসিক, ক্ষয়িষ্ণু, তন্বী, সাধু ; প্রাচীন, অধঃ, চড়াই, জড়, জঙ্গম, প্রত্যক্ষ, দ্যুলোক, নরম, কৃতঘ্ন, দুরন্ত, ধনিক, তিক্ত ; আরোহণ, বন্য, জঙ্গম, তন্বী, সুধা, সহযোগী, গৌরব ; ব্যষ্টি, হ্রাস, সুকৃতি, জঙ্গম, সরল।

**ক. বি. মাধ্যমিক '৪৪, '৪৯, ( অতি ) '৪৯, ( কলা ) '৫৫ ; বি. এ. '৫৬**

# চতুর্থ পর্ব

## পদ-প্রকরণ

## প্রথম অধ্যায়

## পদপরিচয়
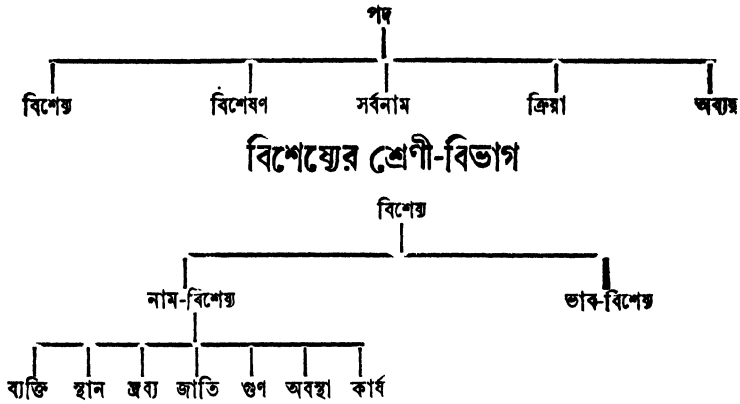
'কৃষ্ণ, রাধা, সামসুদ্দিন' ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য। 'ঢাকা, রাজশাহী, কলিকাতা' দিল্লী' স্থানবাচক বিশেষ্য। 'জল, ফল' দ্রব্যবাচক বিশেষ্য। 'মনুষ্য, সাপ' জাতিবাচক বিশেষ্য। 'অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা' গুণবাচক বিশেষ্য। 'সুখ, দুঃখ' অবস্থাবাচক বিশেষ্য। 'আহার' দর্শন' কার্যবাচক বিশেষ্য। ভাব-বিশেষ্য, ভাব–বচন বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, একাধারে বিশেষ্যবোধক ও ক্রিয়াবোধক। ভাব-বিশেষ্য ক্রিয়াবোধক হিসাবে কর্তা কর্ম প্রভৃতি কারকের সহিত যেমন অন্বিত হইয়া থাকে, আবার বিশেষ্যবোধক হিসাবে নিজে কারকত্বও পায়ঃ যেমন,—চক্রবর্তী কোম্পানীর বই 'বাঁধাই' ভাল। এখানে ক্রিয়ারূপে 'বাঁধাই'-এর কর্ম 'বই' এবং বিশেষ্যরূপে 'বাঁধাই' 'হয়' উহ্য ক্রিয়ার কর্তা।

বিশেষ্যের নিম্নলিখিত প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়ঃ—(১) বিশেষণরূপে বিশেষ্যের ব্যবহারঃ যেমন,—কর্মকারের কাছে আমি একখানি 'রাম'-দা গড়াইতে দিয়াছি। (২) ক্রিয়াবিশেষণরূপে বিশেষ্যের ব্যবহারঃ যেমন,—বিবাহের কথা উত্থাপন করিতেই রীণার মুখ লজ্জায় যেন 'জবাফুল' হইয়া গেল।

# বিশেষণের শ্রেণী-বিভাগ

## নাম-বিশেষণ

নাম-পদ তথা বিশেষ্যপদ, সর্বনামপদ ও বিশেষণপদের সঙ্গে যুক্ত হয়। অর্থবিচার করিয়া নাম-বিশেষণকে মোটামুটি ভাবে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়: যেমন,—(ক) গুণ বা অবস্থা-বাচক নাম-বিশেষণ: যথা,—'সহিষ্ণু' ব্যক্তি; 'পরাধীন' জীবন; (খ) উপাদান-বাচক নাম-বিশেষণ: যথা,—'মেটে' হাঁড়ি। (গ) সংখ্যা বা পরিমাণ-বাচক নাম-বিশেষণ: যথা,—'দশ-জন' মানুষ; 'চার' বাটি দুধ; 'বহু' লোক। (ঘ) পূরণ বা ক্রম-বাচক নাম-বিশেষণ: যেমন,—'দ্বিতীয়' পুত্র; 'সাতই' আশ্বিন। (ঙ) সর্বনামীয় বা সর্বনাম-জাত বিশেষণ: যেমন,—'মদীয়' ভবনে একবার আপনি আসিবেন। 'সে' কথা আমার মনে নাই।

## ভাব বিশেষণ

বিশেষ্য ও সর্বনাম ছাড়া অন্য পদ বা বাক্যকে যে পদ বিশেষিত করে, সেই পদের নাম ভাব-বিশেষণ। (ক) ক্রিয়া-বিশেষণ: যথা,—যথেষ্ট সময় থাকায় স্টেশনের অভিমুখে আমরা 'ধীরে' চলিলাম। (খ) নাম-বিশেষণীয় বিশেষণ: যথা,—সব্যসাচী 'অতি' চরিত্রবান্ ছাত্র। (গ) ক্রিয়া-বিশেষণীয় বিশেষণ: যথা,—দুর্বল শরীরে 'খুব' ধীরে ধীরে পথ চল। (ঘ) নাম-বিশেষণীয় বিশেষণের বিশেষণ: যথা,—'অল্প' কিছু কম টাকা লইয়া তিনি শ্যামকে দেনার দায় হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। (ঙ) ক্রিয়া-বিশেষণীয় বিশেষণের বিশেষণ: যথা,—'এত' তাড়াতাড়ি করিয়া চলিতেছ কেন? (চ)

বাক্যের বিশেষণ : যথা,—'সৌভাগ্যক্রমে' বাসগাড়ীখানি গতিবেগ কমাইয়া ছেলেটিকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। (ছ) পদান্বয়ী অব্যয়ের বিশেষণ : যথা,—আমাদের কলেজের অধ্যক্ষমহাশয় তো 'একেবারে' মহাদেবের ন্যায় নিস্পৃহ। (জ) সমুচ্চয়ী অব্যয়ের বিশেষণ : যথা,—আগন্তুকের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিলাম, সম্প্রতি সে কার্যোদ্ধারের জন্য একজন 'আস্ত' বিড়ালতপস্বী সাজিয়াছে।

## লক্ষণীয় কয়েকটি বিষয়

ইহা ছাড়া আরও কিছু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে : যেমন,—(১) সম্বন্ধপদীয় বিশেষণের দৃষ্টান্ত—'ভোরের ঘুম' যেন কিছুতেই ভাঙ্‌তে চায় না। (২) যৌগিক বিশেষণের দৃষ্টান্ত—'তালিমারা' পাঞ্জাবী গায়ে দিয়েই সে বেরিয়ে পড়ল। 'বিয়ে-পাগলা' অরুণকে লইয়া তরুণ সিনেমা দেখিতে গেল। (৩) বহুপদীয় বিশেষণের দৃষ্টান্ত—'আপন-ভাবে-আপনি-বিভোর' ব্যক্তি জীবনে কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। (৪) ধ্বন্যাত্মক বিশেষণের দৃষ্টান্ত— এমন 'প্যান্‌পেনে ঘ্যান্‌ঘেনে' ছেলে কদাচিৎ দেখা যায়। (৫) বিধেয় বিশেষণের দৃষ্টান্ত—গান্ধীজী আমাদের 'নমস্য'। (৬) অনুবর্তী বিশেষণের দৃষ্টান্ত—'আলুভাজা' মুখরোচক সামগ্রী। (৭) লক্ষ্যার্থক বিশেষণের দৃষ্টান্ত—রমেনবাবু একেবারে 'মাটির মানুষ'। (৮) বীপ্সাত্মক বিশেষণের দৃষ্টান্ত—বিয়েবাড়িতে 'হাঁড়ি-হাঁড়ি' রসগোল্লা যাইতেছে। (এখানে বিশেষ্যশব্দের বীপ্সা ঘটিয়াছে।) প্রতি বছরেই ভারত হইতে 'লাখ-লাখ' টাকা বাহিরে চলিয়া যায়। (এখানে বিশেষণ শব্দের বীপ্সা ঘটিয়াছে।) 'টানাটানা' চোখে সে সুরমা দিয়াছে। (এখানে কৃদন্ত পদের বীপ্সা ঘটিয়াছে।) (৯) বিশেষণরূপে বিশেষ্যপদের প্রয়োগ—কবিতাটির 'সার' মর্ম লিপিবদ্ধ কর। (১০) বিশেষ্যরূপে বিশেষণের একবচন অথবা বহুবচন গ্রহণ—'বড়'র সঙ্গে 'ছোট'র বন্ধুত্ব হয় না। 'বড়দের' কথা আর বলিবার নয়, 'ছোটদের' প্রতি তাহারা একেবারেই বেদরদী। (১১) বিশেষণের আলংকারিক প্রয়োগ—'সুবাসিত' রজনীতে তরুণ-তরুণী 'পুষ্পিত' বাক্য ও 'ক্ষুব্ধ' অভিমানের 'মোহন' মালা রচনা করিয়া থাকে।

(ক) বিশেষ্য-বিশেষণে বিভক্তিযোগে ক্রিয়া-বিশেষণ—সে এখানে 'বিলম্বে' আসিয়াছে। বাতাস 'ধীরে' বহিতেছিল। (খ) সমস্তপদীয় ক্রিয়াবিশেষণ—পাগলটি 'অনর্গল' বকিতেছে। (গ) বীপ্সায় ক্রিয়াবিশেষণ—ছায়াচিত্রের টিকিট কাটিবার জন্য আবালবৃদ্ধ 'সারিসারি' দাঁড়াইয়া আছে। (ঘ) ক্রিয়ামূলক ক্রিয়া-বিশেষণ—মেয়েটি 'ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে' কাঁদ্‌ছে।

## সর্বনামের শ্রেণী-বিভাগ
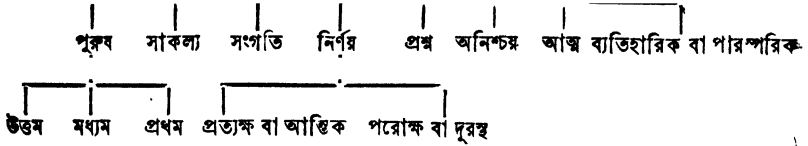
যে পদ 'সর্ব' মানে 'সর্ব-জাতীয়' নাম তথা বিশেষ্যপদের স্থানে ব্যবহৃত হয়, তাহাকেই বলা হয় সর্বনাম। (১) ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক সর্বনামের গোষ্ঠীতে পড়ে 'আমি, মুই, মোরা, আমরা' উত্তম পুরুষের সর্বনাম, 'তুই, তুমি, আপনি, তোরা, তোমরা, আপনারা' মধ্যম পুরুষের সর্বনাম এবং 'সে, তিনি, তাহা (তা), তাহারা, তা'রা, তাঁহারা, তাঁ'রা' প্রথম পুরুষের সর্বনাম। (২) 'উভয়, সকল, সর্ব'—এই কয়টি সাকল্যবাচক সর্বনাম। (৩) 'যে, যিনি, যাহা'—এইগুলি সংযোগ, সম্বন্ধ বা সংগতিবাচক সর্বনাম। (৪) 'এ, ইহা, ইনি'—এই কয়টি প্রত্যক্ষ নির্ণয়সূচক বা উল্লেখসূচক সর্বনাম এবং 'ও, উহা, উনি'—এই কয়টি পরোক্ষ নির্ণয়সূচক বা উল্লেখসূচক সর্বনাম। (৫) 'কে, কি, কোন্, কাহার'—এই কয়টি প্রশ্নসূচক সর্বনাম। (৬) 'কেহ, কেউ, কিছু'—এই কয়টি অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম। (৭) 'স্বয়ং, নিজ আপনি'—এইগুলি আত্মবাচক সর্বনাম; ইহার প্রয়োগ এইরূপ ঃ—তুমি 'আপনি' এই কথা বলিয়াছিলে। (৮) ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম বুঝাইতে 'পরস্পর' অর্থে বা 'স্বেচ্ছায়' অর্থে 'আপনা-আপনি' এই দ্বিত্ব রূপ ব্যবহৃত হয়। 'পরস্পর' অর্থে 'আপন' শব্দেরও ব্যবহার আছে ঃ যেমন,—'আপনের' মধ্যে বাদবিতণ্ডা করা অনুচিত।

ইহা ছাড়া, (ক) সাপেক্ষ সর্বনামের উদাহরণ—'যে' নরহত্যা করে, 'সে' মহাপাপী। এই উদাহরণে দেখা যায়, 'যে' সর্বনামটি ব্যবহৃত হওয়ায় 'সে' সর্বনামটি আবশ্যক রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহাই সাপেক্ষ সর্বনামের প্রয়োগবিধি। (খ) নিরপেক্ষ সর্বনামের উদাহরণ—'তুমি' এই কাজ করিয়াছ। (গ) যৌগিক সর্বনামের উদাহরণ—'আমরা সবাই' তাঁহার কর্মনীতি সমর্থন করি। (ঘ) পুরা বাক্যের পরিবর্তে সর্বনামের প্রয়োগ—ক্রোড়পতি রথীন্দ্রনাথ আজ পথের ভিখারী হইয়াছেন! 'ইহাই' কি আমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে? (ঙ) বাক্যাংশের পরিবর্তে সর্বনামের প্রয়োগ—পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে তোমার যে আচরণ, 'তাহা' আমি কোন ক্রমেই সমর্থন করিতে পারি না।

# ক্রিয়ার শ্রেণী-বিভাগ

ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষ করিলে দুইটি অংশ পাওয়া যায়ঃ একটি, অবিভাজ্য অপরিবর্তনীয় মৌলিক অংশ এবং অপরটি, প্রত্যয় ও বিভক্তি। প্রথমাংশটিই ক্রিয়া-পদের অন্তর্নিহিত নিছক ভাবটিকে ব্যঞ্জিত করে আর ইহারই নাম **ক্রিয়া প্রকৃতি** বা **ধাতু**। অতঃপর দ্বিতীয়াংশটি ঐ ধাতুর বিকার অথবা পূর্তি ঘটাইয়া ক্রিয়াপদ গঠন করে।
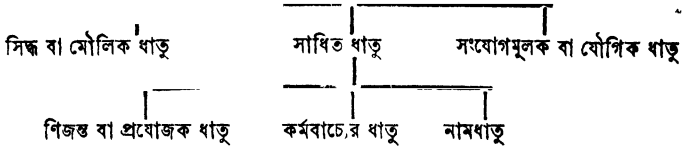
বাংলা ধাতুসমূহের উৎপত্তি ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিলে উল্লিখিত শ্রেণীসমূহে বিভক্ত করা যায়। (১) যে ধাতুসমূহ স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ যাহাদিগের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, তাহাদিগকে **সিদ্ধ** বা **মৌলিক ধাতু** বলা হয়ঃ যেমন,—'কর্; খা; গাহ্; চল্; দে'। (২) যে সমস্ত ধাতুকে বিশ্লেষ করিলে অপর একটি ধাতু অথবা নামশব্দ এবং এক বা একাধিক প্রত্যয় পাওয়া যায়, তাহাদিগকে **সাধিত ধাতু** বলা যায়ঃ যেমন,—'করা; বেঁধা; বেতা'। (২ক) যে সমস্ত মৌলিক ধাতুতে 'আ' বা '-ওয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহারাই **ণিজন্ত** বা **প্রযোজক ধাতু**ঃ যেমন,—'কর্+আ=করা; খা+আ=খাআ >খাওয়া (ব-শ্রুতিতে)'। (২খ) যে সমস্ত মৌলিক ধাতু কর্মবাচ্যে-'আ' প্রত্যয়-যুক্ত হয়, তাহাদিগকে **কর্মবাচ্যের ধাতু** বলে; যেমন,—বিঁধ্+আ=বিঁধা> বেঁধা। (উদাহরণ—নাকে নথ পরিবার জন্য সে নাক 'বেঁধায়'।) (২গ) সাধারণ বিশেষ্য বিশেষণ এবং (প্রসারে) অব্যয় শব্দে '-আ' প্রত্যয় যোগ করিয়া যে সকল ধাতু নিষ্পন্ন হয়, তাহাদিগকে **নামধাতু** বলেঃ যেমন,—'লাঠি বা লাঠা+আ=লাঠা; জুতা+আ =জুতা; বেত+আ=বেতা; থমক্+আ=থমকা; ধমক+আ=ধমকা; দাবড়+আ =দাবড়া; আঁচড়+আ=আঁচড়া; ঘষট+আ=ঘষটা; ছোবল+আ=ছোবলা; ডুকর+ আ=ডুকরা; ঝলস+আ=ঝলসা; লেঙচ+আ=লেঙচা। (৩) 'কর্, দে, পা, হ' প্রভৃতি কতিপয় ধাতুর সঙ্গে বিশেষ্য বিশেষণ শব্দাদি অথবা ধ্বন্যাত্মক শব্দ জুড়িয়া দিয়া যে ধাতুগুলি গঠিত হয়, তাহাদিগকেই **সংযোগমূলক** বা **যৌগিক ধাতু** বলা হয়ঃ যেমন,—'ভ্রমণ কর্; উত্তর দে; লজ্জা পা; রাজী হ' ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় প্রায় সকল বিশেষ্যপদেরই সহিত 'কর্' ধাতু জুড়িয়া দিয়া সংযোগমূলক ধাতু গঠন করা যায়।

**দ্রষ্টব্য : ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারধ্বনিজ** ধাতু নামেও একজাতীয় ধাতু মেলে। ধ্বনি বা শব্দের অনুকরণে '-আ' প্রত্যয়যোগে এই জাতীয় ধাতু গঠিত হয় : যেমন,—ফোঁস্-ফোঁস্ +আ=ফোঁস্-ফোঁসা ; হাঁচ্+আ=হাঁচা'। ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারবাচক অব্যয় শব্দ হইতে জাত এই ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারধ্বনিজ ধাতু মূলতঃ নামধাতুই। আবার এই ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বয় অবলম্বনে সংযোগমূলক বা যৌগিক ধাতুও গঠন করা যায় : যেমন,— 'ফোঁস্-ফোঁস্ কর্' ; 'হাঁচি দে'।
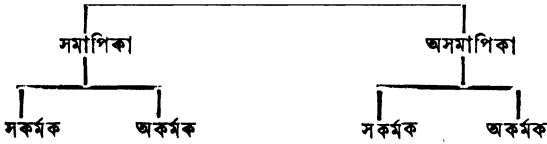
**সমাপিকা ক্রিয়ায়** বক্তব্য বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। অকর্মক ক্রিয়া কর্তাকে অবলম্বন করিয়া ঘটে—ইহার কর্ম নাই : যেমন,—লিচুগাছটি 'বাড়িতেছে'। সকর্মক ক্রিয়ায় ক্রিয়াপদের দ্বারা বর্ণিত ব্যাপার কোনও কর্মকে অবলম্বন করিয়াই সমাপ্ত হয় : যেমন,—সে 'বই' পড়ে। সকর্মক ক্রিয়ার একাধিক কর্মও থাকে : যেমন,—ছাত্র 'শিক্ষকমহাশয়কে' 'প্রশ্ন' করিল। 'প্রশ্ন' মুখ্য কর্ম, 'শিক্ষকমহাশয়কে' গৌণ কর্ম।

**প্রযোজক** বা **প্রেরণার্থক ক্রিয়ায়** ক্রিয়ার কাজ একজনের প্রেরণা বা চালনায় দ্বারা অপর জন কর্তৃক সংঘটিত হয়। ক্রিয়াকে প্রেরণার্থক করিতে হইলে 'ণিচ্' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। তাই প্রযোজক বা প্রেরণার্থক ক্রিয়াকে **'ণিজন্ত ক্রিয়া'**ও বলা হয়। প্রযোজক ক্রিয়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল কর্ম অকর্মক থাকিলে, প্রযোজক ক্রিয়া সকর্মক হয়। মূল ক্রিয়া ও প্রযোজক ক্রিয়ার প্রয়োগ-বৈচিত্র্য এইরূপ :

| **মূল ক্রিয়া** | **প্রযোজক ক্রিয়া** |
|---|---|
| (ক) শিশু 'হাসে'। ( মূল ক্রিয়া অকর্মক ) | (ক) পিতা শিশুকে 'হাসায়'। |
| (খ) শিশু 'দুধ' খায়। ( মূল ক্রিয়া সকর্মক ) | (খ) জননী শিশুকে দুধ 'খাওয়ায়'। |
| (গ) হরেন নরেনকে বই 'দিল'। ( মূল ক্রিয়া দ্বিকর্মক ) | (গ) শিক্ষক মহাশয় হরেনকে দিয়া নরেনকে বই 'দেওয়াইলেন'। |

অসমাপিকা ক্রিয়ায় বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। অসমাপিকা ক্রিয়াও সকর্মক অথবা অকর্মক হইতে পারে : যেমন,—সে 'ভাত' 'খাইয়া' আসিবে। (এখানে 'খাইয়া' অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম 'ভাত')। সে 'আসিলে' আমি যাইব। (এখানে 'আসিলে' অসমাপিকা ক্রিয়াটি অকর্মক)। উল্লিখিত দুইটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিলে ইহাই আমরা পাই যে, '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ও বাক্যের

সমাপিকা ক্রিয়া—উভয়েরই কর্তা এক ও অভিন্ন। ইহা ছাড়া, এই **কর্তৃনিষ্ঠ অসমাপিকা ক্রিয়া** পূর্ববর্তিতাবোধকও বটে। তবে, **ভাবে সপ্তমী** বুঝাইলে আলাদা কর্তাও হইতে পারে: যেমন,—ঝড় 'উঠিয়া' নৌকা ডুবিয়া গেল। কিন্তু '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা সাধারণতঃ সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা হইতে বিভিন্ন হয়। এই জাতীয় অসমাপিকা ক্রিয়াকে **সাপেক্ষিকা বা অবস্থাত্মিকা ক্রিয়াও** বলা হয় এইজন্য যে, এই অসমাপিকা ক্রিয়ারই উপরে সমাপিকা ক্রিয়া একান্তভাবে নির্ভরশীল। এই **অন্যাশ্রয়ী অসমাপিকা** ক্রিয়া ভাবে সপ্তমী বুঝাইবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী: যেমন,—বর্ষা 'পড়িলে' ছোটখাটো নদীতে নৌকা চলে।

## অসমাপিকা ক্রিয়ার কয়েকটি বিশিষ্ট প্রয়োগ

(১) কর্তা অথবা ক্রিয়ার বিশেষণরূপে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে: যেমন,—'কাঁদিয়া কাঁদিয়া' নববধূ পতিগৃহে যাত্রা করিল। এই পত্রটি 'ধরিয়া ধরিয়া' লিখিবে। (২) সমাপিকা ক্রিয়ার বিশেষণ রূপেও অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়: যেমন,—ধীরেন তাহার বন্ধুর জিনিসপত্তর 'কষিয়া' বাঁধিল। গ্রামবাসিগণ জমিদারকে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য 'চাপিয়া' ধরিল। (৩) 'পরে' এই ক্রিয়াবিশেষণটিকে '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিতও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়: যেমন,—রাম আসিলে 'পরে' শ্যাম যাইবে।

## ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

(ক) কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর '-ইতে' প্রত্যয় যোগ করিয়া ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ গঠন করা যায়। ক্রিয়াবাচক বিশেষণের প্রয়োগ, হয় একরূপে, নয় দ্বিরুক্তিরূপে, ঘটিয়া থাকে: যেমন,—রাম না 'হইতে' রামায়ণ। আমি তাহাকে 'আসিতে' দেখিলাম। নরেনকে কাঁঠাল 'পাড়িতে' দেখিয়াছিলাম। সমুদ্রের মনোহর দৃশ্য 'দেখিতে দেখিতে' আমরা অগ্রসর হইলাম। মহালে জমিদারবাবু 'থাকিতে থাকিতে' প্রজারা খাজনা চুকাইয়া দিয়া গেল। (খ) কর্মবাচ্যে ধাতুর উত্তর '-আ' এবং '-আনো' প্রত্যয় যোগ করিয়াও ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ গঠন করা হয়: যেমন,—সুনীতিবাবুর ব্যাকরণ তো আমার 'পড়া' বই। জামা কাচানো' হয় নাই। (গ) মৌলিক ধাতুর উত্তর '-অন্ত' প্রত্যয় যোগ করিয়া কর্তৃবাচ্যের বিশেষণ গঠিত হয়: যেমন,—'ডুবন্ত' সূর্যের শোভা অনির্বচনীয়। 'উঠন্ত' বয়সে বালকদিগকে সাবধান থাকিতে হয়। (ঘ) সংস্কৃত ধাতুর উত্তর 'ক্ত, তব্য, অনীয়, শানচ্' প্রত্যয়াদি যোগ করিয়া ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়: যেমন,—'হৃত' সামগ্রী ফিরিয়া পাইবার আশা আমি রাখি না। আমার 'কর্তব্য' কার্য সমাধা করিয়াছি। আপনার দোকানে 'পানীয়' জল আছে কি? 'আসীন' ভদ্রলোকটিকে যথারীতি সম্ভাষণ করিলাম।

**ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা ভাব-বচন**

**ধাতুর সহিত কতিপয় প্রত্যয়-যোগে ক্রিয়ার ভাব বা কাজ জানানো হয়ঃ** যেমন,—দেখন, বাট্‌না, গোড়ালী, বোল-চাল, বুলি, ফেরী বা ফিরি, নেওয়া, করা, জিয়ানো, ঝাঁকানি, জ্বলুনি, জ্বলনি, মেলানি, চোলাই, উতরাই, বনিবনাও, দিবামাত্র, ধরিবার, আসিবারে। [ পূর্বে 'বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগের' আলোচনায় এতৎসম্পর্কে বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে। ]

**নঞর্থক বা পঙ্গু ক্রিয়া**

অস্তি-বাচক 'হ' ধাতুর আগে নঞর্থক 'ন' শব্দযোগে 'নহ্‌' ধাতুর উৎপত্তি ঘটে। এই 'নহ্‌' ধাতুর প্রয়োগে 'হ' ধাতুর সর্ববিধ রূপ পঙ্গুত্ব তথা নিষ্ক্রিয়তা পায় বলিয়া ইহাকে বলা হয় **নঞর্থক** বা **পঙ্গু ক্রিয়া**। নিত্য বর্তমানেই এই ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে, অন্যকালে ইহার প্রয়োগ হয় না। সাধু ভাষায় এই ক্রিয়ার রূপ পাওয়া যায়—'নহি ; নহ ; নহিস্‌ ; নহেন ; নহে'; কিন্তু চলিত ভাষায় ইহার রূপ হয়—'নই ; নও ; ন'স্‌ ; নন্‌ ; নয়'। এই ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপ হইতেছে—'নহিলে, নইলে'। কবিতায় 'নার্‌' এই নঞর্থক ধাতুর ব্যবহার আছে। অব্যয় 'না বা ন' এবং 'পার্‌' ধাতুর যোগে 'নাপার্‌>নার্‌' ধাতুর উৎপত্তি ঘটিয়াছে। 'নারিলাম, নারিনু, নারিলা, নারিবি, নারিবা' ইত্যাদির প্রয়োগ কবিতায় যথেষ্ট মিলে। অসমাপিকা ক্রিয়ায় এই ধাতুর রূপ হয়—'নারিয়া, নারিলে, নারিতে'।

**সংযোগমূলক বা যৌগিক বা মিলিত ক্রিয়া**

'-ইতে' এবং '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সমাপিকা ক্রিয়ার যোগে যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। এই জাতীয় ক্রিয়ার প্রথম ক্রিয়াপদটির অর্থই প্রধান এবং দ্বিতীয় ক্রিয়াপদটি প্রথম ক্রিয়ার অর্থকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে সাহায্য করে। তাই দ্বিতীয় ক্রিয়াপদটিকে প্রথম বা **মৌলিক** ক্রিয়ার **সহকারী ক্রিয়া** বলা যাইতে পারেঃ যেমন,—'করিতে লাগ্‌ ; খাইতে থাক্‌ ; খাইতে দে ; কাড়িয়া লহ্‌ ; সরিয়া পড়্‌ ; বসিয়া যা ; লাফাইয়া পড়্‌ ; গিয়া থাক্‌ ; চাহিয়া দেখ্‌'। বলা বাহুল্য, যৌগিক ক্রিয়ার সমাপিকা অংশটিকেই সহকারী বলা হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষায় ভিন্নার্থক দুইটি ধাতু পাশাপাশি পৃথক্‌রূপে প্রযুক্ত হইয়াও উভয়ে মিলিত ভাবে একটি অর্থই প্রকাশ করেঃ যেমন,—ছাত্রটি মন দিয়া 'পড়াশুনা' করে ( =পাঠাদি করে )। পাচক ঠাকুর 'রান্নাবান্না করিয়াছে ( =অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে )। এই জাতীয় ক্রিয়াপদে ইহাই লক্ষ্য করা যায় যে, যৌগিক ক্রিয়ার ন্যায় একটি ধাতুর অর্থ মুখ্য এবং অপরটির অর্থ গৌণ নয়, পক্ষান্তরে উভয় ধাতুরই অর্থ বলবান।

## অব্যয়ের শ্রেণী-বিভাগ

সম্মতি অসম্মতি অনুমোদন ঘৃণা বা বিরক্তি মনঃকষ্ট বিস্ময় করুণা আহ্বান অনুকার

( ক ) 'এবং, ও আর' প্রভৃতি সংযোজক সমুচ্চয়ী অব্যয় : 'কিংবা, অথবা, চাই কি, না-না, না' প্রভৃতি বিয়োজক অব্যয় ; 'অর্থাৎ, অনন্তর' প্রভৃতি বৈকল্পিক অব্যয় ; ( খ ) 'কিন্তু, অধিকন্তু, তো, নয় তো, তথাপিও, পুনশ্চ, তথাচ' প্রভৃতি প্রতিষেধক বা প্রাতিপক্ষিক অব্যয়। ( গ ) 'যদি না, নতুবা' প্রভৃতি ব্যতিরেকাত্মক অব্যয়। ( ঘ ) 'যদি, যদি নাকি, যাই, হইলে' প্রভৃতি অবস্থাত্মক অব্যয়। ( ঙ ) 'তবে, তদনন্তর, কখনও কখনও, তবে নাকি, তাহা হইলে' প্রভৃতি ব্যবস্থাত্মক অব্যয়। ( চ ) 'কারণ, বলিয়া, যে হেতু, যে কারণে' প্রভৃতি কারণাত্মক অব্যয় : ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত— বকিয়াছি 'বলিয়া' সে আর আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে না। ( ছ ) এই জন্য, এই হেতু, তাইতে' প্রভৃতি অনুধাবনাত্মক অব্যয় : ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—'এই হেতু' আমি তাহার বাড়িতে যাই না। ( জ ) 'যাহাতে ( lest ). শেষটা. আখের' প্রভৃতি সমাপ্তিবাচক অব্যয় : ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত 'শেষটা' তুমি এই কাজ করেছ ? ( ঝ ) 'তো, না, মেনে, বটে' প্রভৃতি অবধারণে, পাদপূরণে, বাক্যালংকারে ব্যবহৃত অব্যয় : ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—তুমি 'না' গাইয়ে ? ( ঞ ) 'অ্যাঁ ? কি ? বটে ? হ্যাঁ ? না কি ? হ্যাঁ ?' প্রভৃতি প্রশ্নাত্মক অব্যয় : ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—'বটে' ? খুব বাহাদুর হয়েছ 'না কি' ? ( ট ) 'যেন, মনের মত, যথা-তথা, ন্যায়, যেমন' প্রভৃতি উপমাদ্যোতক অব্যয় : ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—সে আমার 'মনের মত' জন। এই এগারো প্রকার অব্যয় শব্দ সম্বন্ধ-বা সংযোগ-বাচক অব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

( ক ) 'আচ্ছা, আজ্ঞে, যথা-আজ্ঞা, যা বলেন, তাই' প্রভৃতি সম্মতিজ্ঞাপক অব্যয় : ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—'আচ্ছা', এ কাজ আমি করব। ( খ ) 'না, একদম না, আদৌ না, প্রায়ই না, কখনো না' প্রভৃতি অসম্মতিজ্ঞাপক অব্যয় : ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত— চাকরির কথা বলিতেই বড়বাবু 'একদম না' বলিয়া দিলেন। ( গ ) 'বাঃ বাঃ বাঃ, বাহবা, বেড়ে, কি খাসা, সাবাস, বলিহারি যাই মরি মরি, ধন্য ধন্য' প্রভৃতি অনুমোদন-

জ্ঞাপক অব্যয় : ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—তাঁহার ছেলেটি 'কি চমৎকার'! (ঘ) 'ছিঃ ছিঃ, রামঃ রামঃ, আ মলো, ছাই, ধ্যেৎ, দুত্তোর' প্রভৃতি ঘৃণা বা বিরক্তিব্যঞ্জক অব্যয় : ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—'ম্যাঃ গে'! ও বাড়ির নূতন বৌয়ের কি চেহারা! (ঙ) 'উঃ, ওঃ, বাপ, গেলাম রে, মারে' প্রভৃতি ভয় যন্ত্রণা বা মনঃকষ্টব্যঞ্জক অব্যয় : ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—'মা গো'! তোমার মনে এই ছিল। (চ) 'ওব্বাবা, বল কি, ওমা, কোথা যাবো, হরি হরি' প্রভৃতি বিস্ময়দ্যোতক অব্যয় : ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—'ওমাঃ'! কোথা যাবো'! আমার বরাতে এও ছিল! (ছ) 'বাছা আমার, ধন আমার, আহা হা, হায় হায়' প্রভৃতি করুণাদ্যোতক অব্যয় : ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—'আহা হা'! অহিংস গান্ধীজী হিংসার অনলে প্রাণ আহুতি দিলেন। (জ) 'আর, ওগো, ওলো, তুতু, চৈচৈ, আ আ, আয় আয়' প্রভৃতি আহ্বান বা সম্বোধন দ্যোতক অব্যয় : ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—বাড়ির পোষা কুকুরটিকে না দেখিতে পাইয়া তিনি 'তুতু' স্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। (ঝ) 'কুহু-কুহু, ঝাঁ-ঝাঁ, কড়্-কড়্, খাঁ-খাঁ, টিম্-টিম্' প্রভৃতি অনুকারবাচক অব্যয় : ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—গতকাল 'কড়্-কড়্' শব্দে বাজ পড়িয়াছিল।

(১) কয়েকটি অব্যয়ের সহায়তায় শব্দের পরে বিশেষ-বিশেষ বিভক্তি যুক্ত করা হয়। এহেন বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে এই অব্যয়গুলির অন্বয় থাকায়, অব্যয়গুলিকে **পদান্বয়ী অব্যয়** বলা হয় : যেমন,—ছাত্র হিসাবে রমেনের 'চেয়ে' সত্যভূষণ অনেক ভাল। (২) যে অব্যয়গুলি দুইটি বাক্য অথবা পদের সংযোজন বা বিয়োজন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে **সমন্বয়ী** বা **সমুচ্চয়ী অব্যয়** বলা হয় : যেমন,—স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ধর্মবীর 'ও' কর্মবীর। তুমি 'অথবা' তোমার ভাই আমার কাছে থাকিতে পার। (৩) যে অব্যয়গুলি বাক্যের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও অপর পদের সঙ্গে ব্যাকরণগত সম্বন্ধবিরহিত, তাহাদিগকে **অনন্বয়ী অব্যয়** বলা হয় : যেমন—নরেন 'নাকি' সিটি কলেজেই পড়িবে? মহাত্মা গান্ধী অহিংস 'বটে'। 'ছিঃ' তোমার ন্যায় কৃতী ছাত্রের এই চৌর্যবৃত্তি! এই পদান্বয়ী সমুচ্চয়ী ও অনন্বয়ী অব্যয়কে **নিরপেক্ষ অব্যয়ও** বলা যাইতে পারে। কারণ,—এই অব্যয় বাক্যের অপর অংশের উপরে নির্ভরশীল থাকে না। (৪) একাধিক শব্দযোগে **যৌগিক অব্যয়** হইয়া থাকে। যথা,—'তাও আবার, তদনন্তর, এমন কি, তবে কিনা, যদি বা, তাহা হইলে'। (৫) কতকগুলি অব্যয় এমন আছে, যাহাদের একটিকে ব্যবহার করিলে অপর একটি অব্যয়কেও ব্যবহার করিতে হয়, নচেৎ বাক্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—এহেন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অব্যয়কে **সাপেক্ষ** বা **নিত্যসম্বন্ধীয় অব্যয়** বলা হয় : যেমন,—গভীর রজনীতে 'যাই' চোর চোর রব উঠিল, 'অমনি' পাড়ার লোকে জাগিল। 'পাছে' লোকে কিছু বলে, 'তাই' সে নীরব থাকে।

## বিভিন্ন পদরূপে অব্যয়ের ব্যবহার

( ক ) বিশেষ্যরূপে অব্যয়ের প্রয়োগ : যেমন,—দেনদার পাওনাদারকে 'আজকাল' করিয়া ঘুরাইতে লাগিল। তাঁহার ন্যায় লোকের মুখের 'হাঁ-কে না' করিবার 'জো' নাই। ( খ ) বিশেষণরূপে অব্যয়ের প্রয়োগ : যেমন,—তোমার বিরুদ্ধে আমি 'নানা' কথা শুনিয়াছি। 'বৃথা' ব্যয় করিয়া লাভ আছে কি ? ( গ ) সর্বনামরূপে প্রয়োগ : যেমন,—আধুনিক বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের 'মত' অভিনেতা 'আর' নাই। 'যত' হাসি 'তত' কান্না। ( ঘ ) ক্রিয়ারূপে অব্যয়ের প্রয়োগ : যেমন,—এই গরীব ছেলেটির বই 'নাই'। ছেলেটি ভাল 'নয়'। ( ঙ ) ক্রিয়া-বিশেষণরূপে অব্যয়ের প্রয়োগ : যেমন,—সে আগামী কাল এখানে 'অবশ্য' আসিবে।

## আপেক্ষিক বা সাপেক্ষ পদের প্রয়োগ

বাক্যে একটি পদ প্রয়োগ করিলে তদনুযায়ী অপর একটি পদও ব্যবহার করিয়া বাক্যটিকে যখন সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে হয়, তখন এহেন উভয় পদকে **আপেক্ষিক** বা **সাপেক্ষ পদ** বলে। অব্যয় ছাড়াও, সর্বনাম, বিশেষণ এবং ক্রিয়াবিশেষণে পরস্পরসাপেক্ষ শব্দপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত মিলে : যেমন,—'কে' এমন সাহিত্যিক আছেন, 'যিনি' রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হইবেন ? 'যে' আমার বিরুদ্ধে এই কথা বলিয়াছে, 'সে' অতীব মিথ্যাবাদী। 'যত' অর্থ দান করিবে 'ততই' নাম হইবে। 'একে' মা মনসা, 'তায়' ধুনোর গন্ধ। 'আমি 'যেখানেই' যাই, 'সেখানেই' তোমার সুখ্যাতি শুনি। আমি 'যখন' স্টেশনে পৌঁছিলাম 'তখনই' ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

### অনুশীলনী

[ এক ] পদ কয় প্রকার এবং কি কি ? মোটা হরফের পদগুলির বিন্যাস-পদ্ধতি বুঝাইয়া দাও—"**তোমার না আছে ধন,** না আছে **মান**।" ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৮

[ দুই ] ধাতু প্রধানতঃ কয় প্রকার এবং কি কি ? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও। ঢা বি. মাধ্যমিক '৫৭

[ তিন ] বাক্যে প্রথম, মধ্যম ও উত্তম পুরুষের কর্তার প্রত্যেকের পৃথক্ ভাবে এবং সকলের একত্রে অবস্থিতির বিভিন্ন উদাহরণ দাও। ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭

[ চার ] উদাহরণরূপে বাক্যাদি রচনা কর :—ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া ; 'না' বাক্যালংকার অব্যয় ; 'চেয়ে' শব্দের অব্যয় প্রয়োগ। ক. বি. বি. এ. '৫৭

[ পাঁচ ] ধ্বন্যাত্মক ধাতু কাহাকে বলে ? এই ধাতুর উদাহরণ-স্বরূপ দুইটি বাক্য গঠন কর। ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প )'৫৭

[ ছয় ] 'নাম ধাতু' কাহাকে বলে ? 'নাম ধাতু'র দুইটি উদাহরণ দাও এবং প্রত্যেকটির দ্বারা এক-একটি বাক্য রচনা কর। ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প )'৫৯

**[ সাত ] দেখা, শোনা, পড়া, বহা, ফলা, চলা, দেওয়া—ইহাদের যে কোনও পাঁচটি হইতে প্রযোজক ধাতু নিষ্পন্ন কর এবং তাহা দিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর।**

**ক. বি. মাধ্যমিক ( কলা ) '৫৫**

[ আট ] নিম্নলিখিত ব্যাকরণের বিধিগুলির প্রত্যেকটিরই দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও ঃ—(ক) পরস্পরসাপেক্ষ ( correlative ) শব্দযোগে গঠিত ক্রিয়া-বিশেষণ। (খ) প্রতিষেধক অব্যয়। (গ) পুরা বাক্য বা বাক্যাংশের পরিবর্তে সর্বনামের প্রয়োগ। (ঘ) বিশেষ্যের বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে ব্যবহার। (ঙ) অব্যয়ের নিরপেক্ষ ( বাক্যের অন্য অংশের উপর অনির্ভরশীল ) প্রয়োগ। (চ) বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত বিশেষণের বহুবচন গ্রহণ। (ছ) অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্রিয়াবিশেষণরূপে প্রয়োগ। (জ) নামধাতু। (ঝ) সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক অথবা অকর্মকের সকর্মক প্রয়োগ। (ঞ) বিশেষণ পদ হইতে গঠিত নামধাতুর পদ। **ক বি. বি এ. '৩৬, '৩৫, '৪৯, ( অতি ) ৪৮, '৪৮**

[ নয় ] উদাহরণ-সহ ব্যাখ্যা কর ঃ—যৌগিক বা মিলিত বা মিশ্র ক্রিয়া, ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া, প্রযোজক ক্রিয়া, নামধাতু, মৌলিক ধাতু, দ্বিকর্মক ক্রিয়া ( **ঢা. বি মাধ্যমিক '৫৩, '৫৭, '৫৮ ; বি. এ. '৫১** ) সংযোজক অব্যয়, নিজন্ত ক্রিয়া, দ্বিরুক্ত সর্বনাম, বিধেয় বিশেষণ, অনুকার শব্দ, নামধাতু, অনন্বয়ী অব্যয় [ **রা বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫, '৪৬** ] অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম, ব্যতিরেকাত্মক অব্যয়, প্রথম পুরুষ, ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ, পূরণবাচক বিশেষণ, নঞর্থক বা পঙ্গু ক্রিয়া [ **ক. বি মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৩ ; বি. এ. '৫০, '৫১, ৫২** ]। সহায়ক ক্রিয়া ; ভাববিশেষ্য ; ভাববিশেষণ।

[ দশ ] অনুকার-অব্যয়গুলির যথাযথ প্রয়োগ দেখাও ( যে কোন চারিটির ) ঃ— কিল্‌বিল্ ; খিল্‌খিল্ ; গম্‌গম্ ; গল্‌গল্ ; ছম্‌ছম্ ; ঝম্‌ঝম্ ; ঝল্‌ঝল্।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫**

[ এগারো ] সর্বনাম কাহাকে বলে ও ইহা কয় প্রকার ?—উদাহরণ-সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৮**

[ বারো ] নিম্নের যে কোন চারিটি শব্দকে অব্যয় বলা কতটা সমীচীন তাহা বিচার কর ঃ—অধুনা, নতুবা, বাবদ, ইস্তক, বরাবর, ছি ছি, আদৌ, বটে।

**ক. বি মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৯**

[ তেরো ] মোটা মোটা হরফে লিখিত পদগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ কর ঃ—সবারে **বাসরে ভালো ; নেচে নেচে** আয় মা শ্যামা ( **ক. বি. বি. এ. '৫৮** )। নেহাৎ **ছেলেমানুষ ব'লে** রেহাই পেলে ( **ক. বি. বি এ '৫৯** )। এ চিত্রের ওষ্ঠাধরে **যদি ভাষা থাকিত** ! তীর্থস্থানের পাপ প্রায়শ্চিত্তে **খণ্ডায়** না। **গুরু বলিয়া** আজকাল কেহ **ভক্তি** করে না। চক্রবর্তী কোম্পানীর বই **বাঁধাই** ভাল।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## একই শব্দের বিভিন্ন পদে প্রয়োগ

**জোর**—[ বি ]—নৃপেনের গায়ে খুব 'জোর' আছে। [ বিণ ]—আজ তোর 'জোর' বরাত। [ ক্রি-বিণ ]—মোটর গাড়ীখানি তখন 'জোর' চলিতেছিল।

**কিছু**—[ বি ]—তাহার কাছে 'কিছু' টাকা পাই। [ সর্ব ]—তিনি আমায় 'কিছু' দিলেন। [ বিণ-বিণ ]—খবরটি পাইয়া তিনি 'কিছু' বিষণ্ণ হইলেন।

**নাই**—[ বিণ ]—'নাই' মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল। [ অ ]—নরেন বাজারে যায় 'নাই'। [ ক্রি ]—ভিক্ষা করা ছাড়া বিধবা রমণীটির কোন উপায় 'নাই'। [ বি ]—সংবৎসরই তো তোমার সংসারে 'নাই নাই' শুনিতেছি।

**ফলে**—[ ক্রি ]—এই গাছে লিচু 'ফলে' না। [ বি ]—'ফলে' লোভ করিলে কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে না। [ অ ]—সে যথাসময়ে স্টেশনে উপস্থিত হইতে পারিল না—'ফলে' গন্তব্য স্থানে পৌছাইতে একদিন বিলম্ব হইয়া গেল।

**যে**—[ অ ]—তিনি বলিলেন 'যে', তাঁহার ছুটি নাই। [ বিণ ]—'যে'-কথা, সেই কাজ। [ সর্ব ]—'যে' প্রিয় বাক্য বলে, সে জনপ্রিয় হয়।

**বিলক্ষণ**—[ বিণ ]—আশুতোষের 'বিলক্ষণ' চরিত্রগৌরব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। [ বিণ-বিণ ]—বীণার ন্যায় 'বিলক্ষণ' ভাল মেয়ে কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। [ ক্রি-বিণ ]—কৃতকার্য হই 'বিলক্ষণ' আর না হই তো এ ছার প্রাণ বিসর্জন দিবই। [ অনন্বয়ী অব্যয় ]—'বিলক্ষণ'! একাজ তুমি করবে?

**পশ্চাৎ**—[ বি ]—'পশ্চাতে' দৃষ্টিপাত কর। [ বিণ ]—আততায়ী 'পশ্চাৎ' দিক হইতে তাঁহাকে নিহত করিল। [ ক্রি-বিণ ]—আমি তাহার 'পশ্চাৎ পশ্চাৎ' চলিলাম। [ অ ]—এখন থাক, 'পশ্চাৎ' তোমার বাসায় যাইব।

**বড়**—[ বি ]—'বড়' আর ছোটর বন্ধুত্ব কখনও টেকে না। [ বিণ ]—টাকাই কি 'বড়' মানুষের পরিচয়? [ ক্রি-বিণ ]—হেমেনের মেয়েটি 'বড়' কাঁদে। [ বিণ-বিণ ]—সাধন 'বড়' ভাল ছেলে।

**ঠিক**—[ বি ]—রাগের সময় তাহার মাথার 'ঠিক' থাকে না। [ বিণ ]—চাকরি পাইবার 'ঠিক' খবর আজই পাইয়াছি। [ ক্রি-বিণ ]—কাল তোমার বাসায় 'ঠিক' যাইব। [ অনন্বয়ী অব্যয় ]—"সাধু ফুকারিয়া বলে, 'ঠিক' বটে ঠিক।"

**কত**—[ বি-বিণ ]—সভায় 'কত' লোক আসিয়াছিল। [ বিণ-বিণ ]—তুমি যে 'কত' বড় শয়তান, তাহা আমি আগে বুঝিতে পারি নাই। [ সর্ব-বিণ ]—সে যে

আমার 'কত' আপন তাহা তুমি ধারণাও করিতে পারিবে না। [ ক্রি-বিণ ]—ক্রোধে জ্ঞানশূন্যা হইয়া মাতা ছেলেটিকে 'কত' মারিলেন। [ ক্রি, বিণ-বিণ ]—সেতুর উপর দিয়া 'কত' সাবধানে ওপারে পৌছিলাম। [ অ-বিণ ]—পাগলে 'কত' কি বলে!

উপর—[ বি ]—তিনি আজকাল 'উপরে' থাকেন, নীচে নামেন না। [ বিণ ] —আমি 'উপর'তলায় যাই নাই। [ ক্রি-বিণ ]—পরীক্ষার খাতা 'উপর উপর' দেখা উচিত নয়। [ বিণ-বিণ ]—ছাত্রটি খুব 'উপর' চালাক।

পাপ—[ বি ]—'পাপে'র পরিণাম বড়ই ভয়ংকর। [ বিণ ]—'পাপ' কর্ম হইতে বিরত হওয়াই মনুষ্যত্বের লক্ষণ।

পুণ্য—[ বি ]—'পুণ্যে'র মত আনন্দদায়ক আর কিছুই নাই। [ বিণ ]—রাজা অশোক অনেক পুণ্য কার্য করিয়াছিলেন।

গুরু—[ বি ]—'গুরু'র আদেশ শিরোধার্য করিবে। [ বিণ ]—লঘু পাপে 'গুরু' দণ্ড আদৌ ন্যায়সংগত নয়। [ ক্রি-বিণ ]—আকাশে মেঘ ডাকে 'গুরু গুরু'।

ঘোর—[ বি ]—তন্দ্রার 'ঘোর' এখনও কাটে নাই। [ বিণ ]—অমাবস্যার 'ঘোর' অন্ধকারের মধ্যে চলিতে চলিতে পথিক পথ হারাইয়া ফেলিল। [ ক্রি ] —কৃপণের কাছে যতই 'ঘোর' না কেন, কিছুতেই টাকা পাইবে না।

## অনুশীলনী

[ এক ] 'ঘোর' শব্দের বিশেষ্য প্রয়োগের উদাহরণরূপে বাক্য রচনা কর।
ক. বি. বি. এ. '৫৭

[ দুই ] নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রত্যেকটিকে বিশেষ্য এবং বিশেষণ রূপে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :—পাপ, পুণ্য, গুরু। ক. বি. মাধ্যমিক '৩৩

[ তিন ] 'বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়ার বিশেষণ, এমন কি অব্যয়কেও একই বিশেষণ শব্দ বিশেষিত করিতে পারে।'—এই বিধি অনুসারে 'কত' (বিশেষণ) শব্দের সাহায্যে যে-কোন চারিটি প্রয়োগের উদাহরণ দিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর। ক. বি. মাধ্যমিক (অতি) '৪৮

[ চার ] 'বিলক্ষণ' শব্দটিকে বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও অব্যয়রূপে প্রয়োগ করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর। ক. বি. বিশেষ '৫০

[ পাঁচ ] নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন পদে প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর :—কিছু, নাই, ফলে, যে, পশ্চাৎ, বড়, ঠিক, উপর, ঘোর, বিলক্ষণ।

# তৃতীয় অধ্যায়

## ক্রিয়ার প্রকার ও কাল

### ক্রিয়ার প্রকার

যে উপায়ে ক্রিয়ার কাজ ঘটিবার প্রকার বা রীতির বোধ ঘটে, তাহাকে বলা হয় ক্রিয়ার ভাবপ্রদর্শক **প্রকার** ( Mood )। প্রকার তিন রকমের—( ক ) **অবধারক** বা **নির্দেশক প্রকার** : যেমন,—'শিশু হাসে'। এখানে হাস্যক্রিয়া ঘটিবার সাধারণ অবধারণা বা নির্দেশ হইয়াছে। ( খ ) **আজ্ঞাদ্যোতক** বা **নিয়োজক প্রকার**, বা **অনুজ্ঞা** : যেমন,—'সে মরুক'। এখানে মৃত্যু-ঘটনা ঘটুক—ইহাই বলিয়া বক্তা অনুমোদন, প্রার্থনা বা অভিশাপ জানাইতেছে। ( গ ) **ঘটনান্তরাপেক্ষিত প্রকার** বা **সংযোজক প্রকার** : যেমন,—'যদি সে পড়ে, তবে সে পাশ করিবে।' এখানে পঠনক্রিয়া ঘটিবার অনিশ্চয়তা জানানো হইয়াছে।

### ক্রিয়ার কাল

**রূপ-এবং অর্থ-অনুযায়ী ক্রিয়ার কালবিভাগ**
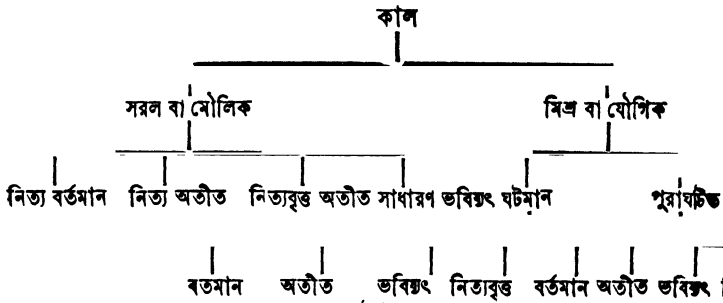
( ১ ) **সাধারণ, সামান্য, মৌলিক** বা **নিত্য বর্তমান**—সাধারণ ভাবে কোনও ক্রিয়ার ব্যাপার ঘটিতে থাকিলে, নিত্য বর্তমান হয় : যেমন,—ছাত্রটি 'পড়ে'। অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিত্য বর্তমানের ব্যবহার হইতে দেখা যায়। ( ক ) উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিবার ব্যাপারে নিত্য বর্তমান ব্যবহৃত হয় : যেমন,—তবে আমরা 'যাত্রা করি'। ( খ ) কোনও অতীত ঘটনা বা ঐতিহাসিক ঘটনা বুঝাইতে অতীত কালের ক্রিয়ার পরিবর্তে নিত্য বর্তমানের ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। যেমন,—নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ ফৌজ 'গঠন করেন'। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারত স্বাধীন 'হয়'। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ সালে কাঁঠালপাড়া গ্রামে 'জন্মগ্রহণ করেন'। ( গ ) নঞ্-অর্থক অব্যয়যোগে অতীত কাল বুঝাইতে নিত্য

বর্তমানের ব্যবহার হয়ঃ যেমন—শেষ অবধি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও ভারতে স্থায়ী 'হয় নাই'। তিনি এ গান 'গাহেন নাই'। (ঘ) 'যখন, যতক্ষণ, যেন' প্রভৃতি যোগে সময়ে সময়ে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে নিত্য বর্তমানের প্রয়োগ ঘটেঃ যেমন,—যখন সে 'আসে', তখন আমার কনিষ্ঠ ভাই বাড়িতে ছিল না। যতক্ষণ গুলি-গোলা 'চলে', ততক্ষণ ছাত্রেরা কলেজেই ছিল। আশীর্বাদ করুন, যেমন এবার ছাত্রটি 'পাশ করে'।

(২) **সাধারণ** বা **নিত্য অতীত**—কোনও ঘটনা বা কাজ অনির্দিষ্ট অতীত কালে ঘটিয়াছে, ইহাই বুঝাইবার জন্য সাধারণ বা নিত্য অতীত হয়। ঘটনার সাঙ্গ বা সম্পূর্ণ হইয়া যাইবার কথা এই অতীতে প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহাকে 'ঐতিহাসিক অতীত'ও বলা হয়ঃ যেমন,—ভীমসেন তখন গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ 'করিলেন'। রাম অস্পৃশ্যা শবরীকে 'দেখা দিলেন'। সময়ে সময়ে নিত্য অতীত ক্রিয়ায় 'এইমাত্র ঘটিল' ভাবটি প্রকাশিত হয়ঃ যেমন,—বেতারে পঙ্কজ মল্লিক 'গাইলেন'। আমি 'শুনিলাম'।

(৩) **নিত্যবৃত্ত** বা **পুরানিত্যবৃত্ত অতীত**—অতীতে কোনও কাজ নিয়মিত রূপে বা সর্বদা ঘটিত, ইহাই বুঝাইবার ক্ষেত্রে নিত্যবৃত্ত অতীতের ব্যবহার ঘটেঃ যেমন,—তিনি প্রতিদিনই প্রাতর্ভ্রমণ 'করিতেন'। মেয়েটি আগে খুব 'নাচিত', এখন আর পারে না। তাহার চিঠি সময়মত পাইলে আমি 'যাইতাম'।

(৪) **সাধারণ** বা **নিত্য ভবিষ্যৎ**—কোনও ক্রিয়ার ঘটনা এখনও ঘটে নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে ঘটিবে, ইহাই বুঝাইতে সাধারণ ভবিষ্যৎ ব্যবহৃত হয়ঃ যেমন,—পড়াশুনা না করিলে কিছুতেই 'পাশ করিবে' না। আমি কাল তোমাকে বইখানি 'দিব'।

(৫) **ঘটমান বর্তমান**—কোনও ক্রিয়ার ঘটনা এখনও চলিতেছে, তাহার সমাপ্তি ঘটে নাই, ইহাই বুঝাইতে ঘটমান বর্তমান ব্যবহৃত হয়ঃ যেমন,—শিশুটি 'হাসিতেছে'। মুষলধারে বৃষ্টি 'পড়িতেছে'। আমি বই 'পড়িতেছি'।

(৬) **ঘটমান অতীত**—কোনও ক্রিয়ার ঘটনা অতীত কালে চলিতেছিল, তখনও তাহার সমাপ্তি ঘটে নাই, ইহাই বুঝাইতে ঘটমান অতীত ব্যবহৃত হয়ঃ যেমন,—গত রবিবার সকালে যখন তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়, তখন তিনি চা 'পান করিতেছিলেন'।

(৭) **ঘটমান ভবিষ্যৎ**—কোনও ক্রিয়ার ঘটনা ভবিষ্যৎ কালে ঘটিতে থাকিবে, ইহাই বুঝাইতে ঘটমান ভবিষ্যৎ ব্যবহৃত হয়ঃ যেমন,—কাল এমনি সময়ে আমি নৌকায় চড়িয়া নদী 'পার হইতে থাকিব'।

(৮) **পুরাঘটিত বর্তমান**—ক্রিয়ার ঘটনা কিছুকাল আগেই ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার জের ফল বা প্রভাব এখনও বিদ্যমান, ইহাই বুঝাইতে পুরাঘটিত বর্তমান ব্যবহৃত হয়: যেমন,—বৃষ্টির সাপটে বইগুলি 'ভিজিয়া গিয়াছে'। সে কালই তাহাকে 'মারিয়াছে'।

(৯) **পুরাঘটিত অতীত**—যখন কোনও ক্রিয়ার ঘটনা অতীতেই ঘটিয়াছিল এবং তাহার জের ফল বা প্রভাব অতীতেই শেষ হইয়াছিল, তখন পুরাঘটিত অতীত কাল হয়: যেমন,—পাঁচ বছর আগে মুন্সীদের বাড়ীতে একবার ডাকাত 'পড়িয়াছিল'। তুমি অতি শিশুকালে একবার কৃষ্ণনগরে 'গিয়াছিলে'। (ক) ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত করিবার কালে পুরাঘটিত অতীতের বদলে অতীতার্থে বর্তমানের প্রয়োগ খুব প্রচলিত আছে: যেমন,—তুর্কীরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলা দেশে 'আসিয়াছিল'। এই বাক্যের পুরাঘটিত অতীতের বদলে বর্তমানের প্রয়োগ ঘটাইয়া লেখা যায়: যেমন,—তুর্কীরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলা দেশে 'আসে'।

(১০) **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ**—কোনও ক্রিয়ার ঘটনা হয়তো অতীত কালে ঘটিয়াছিল অথবা ঘটিয়া থাকিতে পারে, ইহাই বুঝাইতে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এই সংজ্ঞাটিতে স্ববিরোধ থাকায় **সন্দিগ্ধ অতীত কাল** বলাই সংগত: যেমন,—বোধ হয় আইভ্যান্‌হোর গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র ছেলেবেলায় সঞ্জীবচন্দ্রের নিকট হইতে 'শুনিয়া থাকিবেন'। আমি এই কথা 'বলিয়া থাকিব'।

(১১) **ঘটমান নিত্যবৃত্ত** বা **পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত**—কোন ক্রিয়ার কাজ বহুক্ষণ বা কিছুকাল ধরিয়া অতীতকালে চলিতেছিল এই ভাবটি বুঝাইতে ঘটমান নিত্যবৃত্ত বা পুরানিত্যবৃত্ত ব্যবহৃত হয়: যেমন,—পরিবেশক পরিবেশন করিতে থাকিলে আমরাও 'খাইতে থাকিতাম'।

(১২) **পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত** বা **পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত**—কোনও ক্রিয়ার কাজ অতীতেই সম্পন্ন করিয়া কর্তার তিষ্ঠানের বা তিষ্ঠিবার সম্ভাবনা বুঝাইতে পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত বা পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত ব্যবহৃত হয়: যেমন,—আসন্ন পরীক্ষার সময়ে সে সারারাত 'জাগিয়া পড়িত'। গালিগালাজ সে যদিই-বা 'করিয়া থাকিত', তাহা হইলেই বা কি দোষ হইত?

**মন্তব্য:** পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ এইরূপ:—(১) **'যে ক্রিয়াকাণ্ডটি সাধারণভাবে ঘটে, ঘটিয়াছিল অথবা ঘটিবে; এবং তাহার ফল কোথাও-বা প্রাপ্ত আবার কোথাও-বা অপ্রাপ্ত—ইহাই বুঝাইবার জন্য সাধারণ বা নিত্য কালের প্রয়োগ ঘটে।** সাধারণ বর্তমান—'রেণুকা আপিসে যায়'। সাধারণ অতীত—'রেণুকা আপিসে গেল'। সাধারণ ভবিষ্যৎ—

'রেণুকা আপিসে যাইবে'। (২) **'নিত্যবৃত্ত' কথাটির মানে 'নিত্য অভ্যস্ত'।** অতীতে কোন ক্রিয়াকাণ্ড করিবার ব্যাপারে কর্তা অভ্যস্ত ছিলেন—এই রকমটি বুঝাইবার ক্ষেত্রে 'নিত্যবৃত্ত অতীতে'র ব্যবহার হয়ঃ যেমন,—'তিনি রাত দশটায় খাইতেন'। অতীতে খাওয়া ক্রিয়াকাণ্ডটি রাত দশটায় সারিতে যে তিনি তথা কর্তা অভ্যস্ত ছিলেন, ইহাই 'খাইতেন' এই নিত্যবৃত্ত অতীতে বুঝা যাইতেছে। (৩) **'যে ক্রিয়াকাণ্ডটি কিছুকাল ধরিয়া সংঘটনশীল, অথচ তাহার ফল অপ্রাপ্ত' ইহাই বুঝাইবার জন্য ঘটমান কালের প্রয়োগ ঘটে।** ঘটমান বর্তমান—'তিনি খাইতেছেন'। ঘটমান অতীত—'তিনি খাইতেছিলেন'। ঘটমান ভবিষ্যৎ—'তিনি খাইতে থাকিবেন'। ঘটমান নিত্যবৃত্ত—'তিনি খাইতে থাকিতেন'। বলা বাহুল্য, এই চার রকমের ঘটমান কালে খাওয়া ক্রিয়াকাণ্ডটির সংঘটনশীলতাই প্রকট, কিন্তু সেই ক্রিয়াকাণ্ডের ফল অপ্রাপ্ত। (৪) **'যে ক্রিয়াকাণ্ডটি কিছুকাল ধরিয়া অথবা কোন এক ক্ষণে সংঘটনশীল এবং তাহার ফলও ইতিমধ্যে প্রাপ্ত' ইহাই বুঝাইবার জন্য পুরাঘটিত কালের প্রয়োগ ঘটে।** পুরাঘটিত বর্তমান—'তিনি খাইয়াছেন'। পুরাঘটিত অতীত—'তিনি খাইয়াছিলেন'। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ—'তিনি খাইয়া থাকিবেন'। পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত—'তিনি খাইয়া থাকিতেন'। এই চার রকমের পুরাঘটিত কালেই 'খাওয়া' ক্রিয়াকাণ্ডটির সংঘটনশীলতার বিরতি ও তাহার ফলপ্রাপ্ত লক্ষণীয়।

## অনুশীলনী

[এক] ব্যাকরণে 'কাল' বলিতে কি বুঝায়? বাংলা বিভিন্ন কালের নাম লিখ এবং উদাহরণ দাও। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭**

[দুই] নিম্নলিখিত ব্যাকরণের বিধিগুলির প্রত্যেকটিরই প্রয়োগের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাওঃ—পুরাঘটিত বর্তমান; ভবিষ্যৎ বুঝাইতে বর্তমানের ক্রিয়ারূপে প্রয়োগ; অনুজ্ঞা বুঝাইতে ভবিষ্যতের ক্রিয়ারূপে প্রয়োগ; অতীত বুঝাইতে বর্তমানের ক্রিয়া-প্রয়োগ। **ক. বি. বি. এ '৪৮, (অতি) '৪৮, '৪৯**

[তিন] নিম্নলিখিত প্রয়োগসমূহের উদাহরণ দাওঃ—(ক) নঞ্-অর্থক অব্যয়যোগে অতীত বুঝাইতে বর্তমানের ক্রিয়া-প্রয়োগ। (খ) 'যখন, যতক্ষণ, যেন' প্রভৃতি যোগে অতীত ও ভবিষ্যৎ বুঝাইতে বর্তমানের ক্রিয়া-প্রয়োগ। (গ) পুরাঘটিত অতীতের বদলে অতীতার্থে বর্তমানের ক্রিয়া-প্রয়োগ। (ঘ) ঐতিহাসিক বর্তমান কাল। **ঢা. বি. বি. এ. '৫০**

[চার] বাংলার অতীতকালের চারিটি বিভিন্ন রূপের প্রয়োগ দেখাইয়া চারিটি বাক্য রচনা কর। **[ক. বি মাধ্যমিক (কলা) '৫৭]**; বাংলা ক্রিয়াপদের অতীত কালের

বিবিধ রূপের অর্থপার্থক্য দেখাইয়া বাক্যাদি রচনা কর :—সাধারণ অতীত, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত অতীত ও পুরানিত্যবৃত্ত অতীত। **গৌ বি. বি এ. '৫০**

[ পাঁচ ] নিম্নলিখিত প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা ও দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও :— নির্দেশক প্রকার; ঘটমান কালরূপ ( **গৌ বি. বি. এ. '৫১** )। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ( **ঢা বি. বি এ '৫০, মাধ্যমিক '৫৩** )। সংযোজক প্রকার; পুরাঘটিত কালরূপ; পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ; ঘটমান বর্তমান [**ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৩, (বিকল্প) '৫৭**]। ঘটমান অতীত-কাল [ **রা. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৬** ]

[ ছয় ] 'আমি এই কথা **বলিয়া থাকিব**'; 'তাহার চিঠি সময় মত পাইলে আমি **যাইতাম**'—ক্রিয়ার কাল নির্ণয় কর। **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিশেষ ) '৫০**

[ সাত ] ঐতিহাসিক বর্তমান, ঘটমান বর্তমান ও পুরাঘটিত বর্তমানের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫০**

[ আট ] বাংলা ভাষায় ক্রিয়া-পদের বিভিন্ন কালরূপের শ্রেণী বিভাগ কর।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৭**

[ নয় ] বাক্য রচনা করিয়া বর্তমান বা অতীত কালের বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৮**

[ দশ ] নিম্নলিখিত ধাতুগুলির কালবিভাগগত পূর্ণ রূপ লিপিবদ্ধ কর :—কর্; বল্, খা; যা; চাহ্; মিল্; শুন্; আস্; লিখ্; পড়্; দে; চল্।

[ এগারো ] নিম্ন নির্দেশানুসারে ধাতুরূপ লিখ :—(ক) 'আস্' ধাতুর মৌলিক কালগত নিত্য বর্তমানে সাধু রূপ; (খ) 'আস্' ধাতুর মৌলিক কালগত নিত্য অতীতে ও যৌগিক কালগত পুরাঘটিত অতীতে চলিত রূপ; (গ) 'চাহ্' ধাতুর মৌলিক কালগত নিত্য অতীতে ও যৌগিক কালগত ঘটমান ভবিষ্যতে ও পুরাঘটিত অতীতের চলিত রূপ; (ঘ) 'যা' ধাতুর মৌলিক কালগত নিত্য অতীতে ও যৌগিক কালগত পুরাঘটিত বর্তমানে ও অতীতে চলিত রূপ; (ঙ) 'শু' ধাতুর মৌলিক কালগত সাধারণ ভবিষ্যতে চলিত রূপ; (চ) 'দে' ধাতুর মৌলিক কালগত পুরাঘটিত নিত্যবৃত্তে চলিত রূপ।

# চতুর্থ অধ্যায়

## বিভক্তি ও কারক

### বিভক্তি

বিভক্তি দুই জাতের :—একটি, **শব্দ-বিভক্তি** অর্থাৎ **সুপ্**; অপরটি **ক্রিয়া-বিভক্তি** অর্থাৎ **তিঙ্**। শব্দ-বিভক্তির যোগে শব্দ বিশেষ্য বা সর্বনামপদে পরিণত হয়। শব্দ-বিভক্তির সংস্কৃত নাম 'সুপ্' বলিয়া বিভক্তিযুক্ত নাম বা সর্বনামপদ **সুবন্তপদ** রূপে পরিচিত। বিভক্তির প্রয়োগেই বিশেষ্য ও সর্বনামপদের বচন ও কারক নির্দেশিত হয় : যেমন,—মানুষ শব্দ+এর বিভক্তি=মানুষের ; আমি শব্দ+তে বিভক্তি=আমাতে। ক্রিয়া-বিভক্তির যোগে ধাতু ক্রিয়াপদে পরিণত হয়। ক্রিয়া-বিভক্তির সংস্কৃত নাম 'তিঙ্' বলিয়া বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদ **তিঙন্তপদ** রূপে পরিচিত। ধাতু+কালবাচক প্রত্যয়+বিভক্তি=ক্রিয়াপদ : যেমন,—খা ধাতু+ইল্ প্রত্যয় (সাধারণ অতীতবোধক)+আম বিভক্তি='খাইলাম' ক্রিয়াপদ ; কর্ ধাতু+ইব প্রত্যয় (সাধারণ ভবিষ্যৎবোধক)+এন বিভক্তি='করিবেন' ক্রিয়াপদ। কিন্তু বর্তমানের ক্রিয়ার কালবাচক কোন প্রত্যয় না জুড়িয়া শুধু বিভক্তির যোগেই কাল ও পুরুষ নির্দেশ করা হয় : যেমন,—মার্+এ=মারে ; মার্+ই=মারি। অতএব, প্রকৃতি ও প্রত্যয়-সাহায্যে অসংলগ্ন শব্দ গঠিত হয় এইমাত্র আর বিভক্তিযোগেই ইহাদের পারস্পরিক সংযোগ বা সম্বন্ধ স্পষ্টীকৃত হয়। বাংলায় শব্দ বা ধাতুর পরে বিভক্তি না জুড়িলে অর্থই হয় না। **বিভক্তির কার্য** হইতেছে সম্বন্ধ ফুটাইয়া তোলা আর **প্রত্যয়ের কার্য** হইতেছে ধাতু বা প্রাতিপদিকের প্রকার ফুটাইয়া তোলা।

বাংলায় কোন কারকেরই একেবারে নিজস্ব কোন বিভক্তি নাই। একই বিভক্তি বিভিন্ন কারক বুঝায়। তবে, যে যে কারকে যে যে বিভক্তি সাধারণ ভাবে চলিত আছে, তাহা ধরিয়া মোটামুটি ভাবে কারকগত বিভক্তির একটা নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। সেই বিভক্তিগুলির মধ্যে 'শূন্য, কে, রে, এরে, র, এর, কার, তে, এ, য়' খাঁটি বাংলা **সুপ্** বা **যথার্থ বিভক্তি** আর 'দ্বারা, দিয়া, করিয়া, কর্তৃক, হইতে, থেকে, বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত পদ, যাহাদিগকে বাংলায় বলা হয় **কর্ম-প্রবচনীয়**, **সম্বন্ধীয়**, **পরসর্গ** বা **অনুসর্গ**। মার্জিত ভাষায় কর্তৃকারকের একবচনের বড় একটা বিভক্তি-চিহ্ন থাকে না। বিভক্তির এই না-থাকাই শূন্য বিভক্তির পরিচয় বহন করে। অতএব, 'শূন্য বিভক্তি' কর্তৃকারকের প্রথমা বিভক্তি। 'কে, রে, এরে,

বিভক্তি কর্মকারকের দ্বিতীয়া বিভক্তি। 'দ্বারা, দিয়া, করিয়া, কর্তৃক' অনুসর্গ তথা বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ করণকারকের তৃতীয়া বিভক্তি; কর্মকারকের 'রে, এরে' বিভক্তি সম্প্রদান কারকের চতুর্থী বিভক্তি। 'হইতে, থেকে' অনুসর্গ তথা বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ অপাদান কারকের পঞ্চমী বিভক্তি। 'র, এর, কার' বিভক্তি সম্বন্ধপদের ষষ্ঠী বিভক্তি। 'তে, এ, য়' বিভক্তি অধিকরণ কারকের সপ্তমী বিভক্তি।

## কারক

কর্তা কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ—এই ছয়টি কারক; কারণ—ক্রিয়ার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু **সম্বন্ধ পদ পদই কারক নয়**; যেহেতু ইহার সঙ্গে ক্রিয়ার সম্বন্ধ নাই—ইহার সম্বন্ধ থাকে অন্য পদের সঙ্গে।

## কারকের শ্রেণীবিভাগ
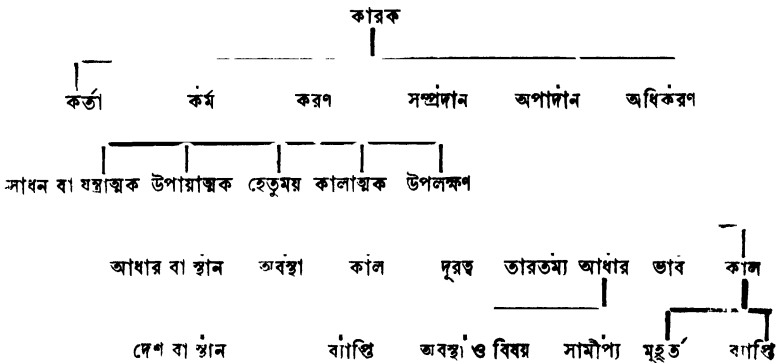
**কর্তৃকারক**—যখন কোন বিশেষ্য বা সর্বনামপদ বাক্যস্থিত ক্রিয়া সম্পাদন করে বা করায়, তখন তাহা হয় কর্তৃকারক : যেমন,—'অলকা' কলেজে পড়িতেছে। এখানে 'অলকা' কর্তৃকারক। (ক) প্রযোজক কর্তার দৃষ্টান্ত—'সাপুড়ে' সাপ খেলায়। (খ) সমধাতুজ কর্তা বা ক্রিয়াসম কর্তার দৃষ্টান্ত—মন্দিরে আরতির 'বাজনা' বাজিতেছে। (গ) নিরপেক্ষ কর্তার দৃষ্টান্ত—'গোলাগুলি' ছুটিলে শত্রুদল পলায়ন করিল। (ঘ) ব্যতিহার ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত—'মায়ে-পোয়ে' রওনা দিয়াছে। (ঙ) অনুক্ত কর্তার দৃষ্টান্ত—'ছবিখানি' এখনও দেখা হয় নাই।

**কর্মকারক**—যাহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়ার কর্ম সম্পাদিত হয় অথবা যাহার দ্বারা ক্রিয়া সম্পূর্ণতা পায়, তাহাই কর্মকারক : যেমন,—গোপা 'চিঠি' পাইয়াছে। রাম 'শ্যামকে' মারিয়াছে। (ক) গৌণ কর্ম ও মুখ্য কর্মের দৃষ্টান্ত—শিক্ষক 'ছাত্রকে' 'প্রশ্ন'

জিজ্ঞাসা করিলেন। এখানে 'ছাত্র' গৌণ কর্ম ও 'প্রশ্ন' মুখ্য কর্ম। (খ) প্রযোজক ক্রিয়ার কর্মের দৃষ্টান্ত—গৃহশিক্ষক প্রতিদিনই 'ছাত্রকে' অঙ্ক কষাইয়া থাকেন। (গ) উদ্দেশ্য কর্মের দৃষ্টান্ত—দুর্জনে কুবুদ্ধি দিয়া ভাল 'লোককে' মন্দ লোক করিতে পারে। (ঘ) বিধেয় কর্মের দৃষ্টান্ত—"যে ধনে হইয়া ধনী 'মণিরে' মান না মণি।" (ঙ) ক্রিয়াসম কর্ম বা সমধাতুজ কর্মের দৃষ্টান্ত—মরণের 'ভাবনা' আমি ভাবি না। (চ) দুইটি ক্রিয়ার একটি কর্মের দৃষ্টান্ত—'কাপড়টি' কিনিয়া আনিবে।

**করণ কারক**—যাহার সাহায্যে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাই করণ কারক: যেমন,—'বাতাসে' লঘু মেঘ উড়িয়া যায়। (ক) সাধন বা যন্ত্রাত্মক করণের দৃষ্টান্ত—চতুর ব্যক্তি 'কাঁটা দিয়া' কাঁটা তুলিতে পারে। 'বাষ্পে' রেলগাড়ী চালানো হয়। (খ) উপায়াত্মক করণের দৃষ্টান্ত—'সময়ে' মানুষ সবই ভুলিয়া যায়। (গ) হেতুময় করণের দৃষ্টান্ত—বড় 'দুঃখে' আজ আমি এখানে আসিয়াছি। (ঘ) কালাত্মক করণের দৃষ্টান্ত—'চার দিনে' আমি কাজটি সারিয়া ফেলিলাম। (ঙ) উপলক্ষণ বা লক্ষণাত্মক করণের দৃষ্টান্ত—তিনি 'ধর্মপরায়ণতা'য় যুধিষ্ঠির, 'শক্তিমত্তা'য় ভীম এবং 'বীর্যবত্তা'য় অর্জুন। (চ) একাধিক করণের দৃষ্টান্ত—তিনি 'একমনে' 'কলম দিয়া' চিঠি লিখিতেছেন।

**সম্প্রদান কারক**—দাবিদাওয়া একেবারে পরিহার করিয়া যাহাকে কিছু দান করা যায়, অথবা যাহার নিমিত্ত বা যাহার উদ্দেশ্যে কিছু করা যায়, তাহাই সম্প্রদান কারক; যেমন,—পিতা 'সৎপাত্রে' কন্যাদান করিলেন। সাঁঝের বেলায় পল্লীবধূরা 'জলকে' (=জলের নিমিত্ত) চলে। এখন 'ঘরকে' (=ঘরের উদ্দেশ্যে) যাও।

**অপাদান কারক**—যখন কোন আধারবাচক, স্থানবাচক, কালবাচক বিশেষ্য বা সর্বনাম হইতে বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের দ্বারা অপসরণ বা সরিয়া যাওয়া বুঝায় তখন তাহা অপাদান কারক: যেমন,—সে 'গেলাস হইতে' জল খাইল। 'ঢাকা হইতে' প্রতিদিনই উড়োজাহাজ কলিকাতায় আসিয়া থাকে। 'তিন দিন হইতে' আমার অসুখ হইয়াছে। (ক) আধার বা স্থানবাচক অপাদানের দৃষ্টান্ত—ঘুড়ি উড়াইবার কালে ছেলেটি 'ছাদ হইতে' পড়িয়া গেল। 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে' প্রেরিত প্রতিনিধি দিল্লীতে পৌঁছিলেন। (খ) অবস্থাত্মক অপাদানের দৃষ্টান্ত—চলন্ত ট্রেণের 'কামরা হইতে' তিনি কথা বলিতে লাগিলেন। (গ) কালবাচক অপাদানের দৃষ্টান্ত—আমাদের 'গৃহ হইতে' আজানের ধ্বনি শোনা যায়। (ঘ) দূরত্ববাচক অপাদানের দৃষ্টান্ত—'কলিকাতা হইতে' দ্বারভাঙ্গা তিন শত মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত। (ঙ) তারতম্যবাচক অপাদানের দৃষ্টান্ত—'মিনুর চেয়ে' গোপার বয়স বেশি।

**অধিকরণ কারণ**—যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ বাক্যস্থিত ক্রিয়ার আধার, কাল বা ভাব বুঝায়, তাহাই অধিকরণ কারক : যেমন,—'অরণ্যে' ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু বাস করে। আগামী 'বৎসরে' দুর্ভিক্ষ হইবে। একমাত্র পুত্র হারাইয়া বিধবা মাতা 'শোকসাগরে' নিমজ্জিত হইয়াছেন। (ক) আধারাধিকরণের দৃষ্টান্ত—'হিমালয়ে' কস্তুরী মৃগ পরিদৃষ্ট হয়। (—স্থানাধিকরণ)। 'ভারতবর্ষে' গঙ্গা নদী বহিয়া যাইতেছে। (—দেশাধিকরণ) [ 'সাগরে' লবণ আছে। (—ব্যাপ্ত্যধিকরণ)। আজ বাজারে এক 'টাকায়' দশটি ন্যাংড়া আম পাওয়া যাইতেছে। ( -অবস্থাধিকরণ। রামানুজম্ 'গণিতে' অত্যন্ত কুশলী ছিলেন। (—বিষয়াধিকরণ)। প্রতি বৎসরেই 'গঙ্গাসাগরে' মেলা বসে। (—সামীপ্যাধিকরণ)। (খ) কালাধিকরণের দৃষ্টান্ত—সন্ধ্যা ছয় 'ঘটিকায়' ট্রেন ছাড়িবে। (—মুহূর্তাধিকরণ)। 'বর্ষাকালে' অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের ফলে বাড়ির বাহিরে যাইবার উপায় থাকে না। (—ব্যাপ্ত্যধিকরণ)। (গ) ভাবাধিকরণের দৃষ্টান্ত—নববিবাহিত নরনারী কিছুকাল 'আনন্দসাগরে' সন্তরণ করিয়া থাকে।

## কারকাদিতে বিভক্তির প্রয়োগ

### কর্তৃকারক

(ক) কর্তৃবাচ্যের কর্তায় 'শূন্য, এ, য়, তে' বিভক্তির প্রয়োগ : যেমন,—'বৃষ্টি' পড়ে। 'ছাগলে' ঘাস খায় (কর্তায় সপ্তমী—কর্তৃকারকে বহুত্বের আভাস লক্ষণীয়)। 'লোকে' এই কথা বলে (কর্তায় সপ্তমী; এখানেও কর্তৃকারকে বহুত্বের আভাস লক্ষণীয়)। এইরূপ 'ঘোড়ায়' গাড়ী টানে; 'পাখীতে' ধান খায়। (খ) কর্মবাচ্যের কর্তায় 'কর্তৃক' অনুসর্গ ও 'কে, এর' বিভক্তির প্রয়োগ : যেমন,—'রাম কর্তৃক' শ্যাম বিতাড়িত হইয়াছে (কর্তায় তৃতীয়া)। 'আমাকে' এখনই কাপড় কিনিতে হইবে (কর্তায় দ্বিতীয়া)। 'রজনী' গ্রন্থখানি 'বঙ্কিমচন্দ্রের' প্রণীত (কর্তায় ষষ্ঠী)। (গ) ভাববাচ্যের কর্তায় 'কে, র' বিভক্তির প্রয়োগ : যেমন,—'তোমাকে' গান করিতে হইবে (কর্তায় দ্বিতীয়া)। 'তাঁহার' না থাকিলে নয় (কর্তায় ষষ্ঠী); (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তায় 'শূন্য' বিভক্তির প্রয়োগ : যেমন,—'সুন্দর' মানায়। 'শাঁখ' বাজে।

### কর্ম কারক

কর্মকারকে 'শূন্য, কে, রে, এ' বিভক্তির প্রয়োগ : যেমন,—গোরু 'দুধ' দেয় (কর্মে প্রথমা)। 'অরুণকে' সকলে ভালবাসে। 'তারে' মেরো না। 'বাঘেরে" বশীভূত করা যার তার কর্ম নয়। "ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী 'তরুবরে'?" (কর্মে সপ্তমী)।

**করণ কারক**

করণ কারকে 'এ, য়, তে, র, এর, শূন্য' বিভক্তি এবং 'দ্বারা, দিয়া, করিয়া, হইতে' ইত্যাদি অনুসর্গের প্রয়োগ : যেমন—'কলমে' লিখ (করণে সপ্তমী)। মূর্খ ছেলের চেয়ে শিক্ষিতা 'মেয়েতে' বংশের মুখ উজ্জ্বল হয় (করণে সপ্তমী)। 'টাকায়' কি না হয় (করণে সপ্তমী)। 'সেবা-দ্বারা' গুরুজনকে পরিতুষ্ট করিবে। আত্মীয় অপেক্ষা 'অনাত্মীয় দিয়া। উপকার হয়। 'চাকরকে দিয়া' মাছ কিনিয়া আন। 'পায়ে করিয়া' জুতাসমূহ সরাইয়া রাখ। 'আমা হইতে' তোমার কোন অপকার হইবে না (করণে পঞ্চমী)। 'কালির' দাগ দাও (করণে ষষ্ঠী)। 'নখের' আঁচড় দিও না (করণে ষষ্ঠী)। গৃহস্থ চোরকে 'লাঠি' মারিল (করণে প্রথমা)। **মন্তব্য :** সময়ে সময়ে করণ কারক ও অধিকরণ কারকের ভিতর পার্থক্য নির্দেশ করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। তাই অধিকরণ কারকের বিভক্তি করণ কারকেও সম্প্রসারিত হয় : যেমন,—তাঁহার আত্মোৎসর্গের কথা জ্বলন্ত 'অক্ষরে' লিখিত থাকিবে। 'পীড়ায়' তিনি অত্যন্ত দুর্বল।

**সম্প্রদান কারক**

সম্প্রদান কারকে 'কে, রে, এরে, তে, এ, য়' বিভক্তি এবং 'জন্য তরে, লাগিয়া' ইত্যাদি অনুসর্গের প্রয়োগ হয় : যেমন,—'বস্ত্রহীন'কে বস্ত্র দাও। "তোমার পতাকা যারে দাও 'তারে' বহিবারে দাও শকতি।" 'বাস্তুহারা সমিতিতে' তিনি অনেক টাকা দান করিয়াছেন (সম্প্রদানে সপ্তমী)। 'অন্ধজনে'ধন দান কর। (সম্প্রদানে সপ্তমী)। সে 'ঘরকে' গেল। 'আমায়' একটু জল দাও। 'যার জন্য' এত টাকা খরচ করিলাম, সে-ই আমাকে পথে বসাইল। 'দরিদ্রের তরে' ধনীর প্রাণ কাঁদে না। 'মানুষের লাগিয়া' মানুষ ব্যথা পায়।

**অপাদান কারক**

অপাদান কারকে 'হইতে, থাকিয়া, থেকে, হ'তে, চাহিয়া, চেয়ে, কাছে, অপেক্ষা, দিয়া ইত্যাদি অনুসর্গ এবং 'এ, তে, য়, এর, শূন্য' বিভক্তির প্রয়োগ : যেমন,—ছাত্রেরা 'কলেজ হইতে' বাহিরে আসিল। 'নদী থেকে' জল আন। 'কূপ হ'তে' জল তোল। 'ধনের চেয়ে' বিদ্যা গরীয়সী (ভিন্ন জাতীয় সমুদায়ের মধ্যে পৃথকীকরণে নির্ধারণে পঞ্চমী—ইহা নিকৃষ্টার্থে বা অপেক্ষার্থে পঞ্চমী নামেও অভিহিত।) 'রাম অপেক্ষা' শ্যাম অনেক ভাল। 'বীরেনের কাছে' কর্জ পাওয়া গেল না। এরূপ কথা আমার 'মুখ দিয়া' বাহির হইতে পারে না। 'তিলে' তেল হয় (অপাদানে সপ্তমী)। 'খনিতে' কয়লা পাওয়া যায় (অপাদানে সপ্তমী)। সে 'ভূতের' ভয়ে রাত্রিতে পথে চলে না (অপাদানে ষষ্ঠী)। 'পড়ায়' কখনও বিরত হইবে না (অপাদানে সপ্তমী)। 'বাড়ি' ঘুরে এলেই টের পাবে। (অপাদানে প্রথমা)।

**অধিকরণ কারক**

অধিকরণ কারকে 'তে, য়, এ, শূন্য' বিভক্তি এবং 'হইতে, মধ্যে, কাছে' অনুসর্গ প্রভৃতির প্রয়োগ। যেমন,—আমি তাঁহার 'বাড়িতে' যাইব। দত্তবাবুদের 'দরজায়' হাতী বাঁধা থাকে। 'জলে' কুমীর থাকে। এই 'বৎসর' দেশের অবস্থা বড়ই খারাপ (অধিকরণে প্রথমা)। বাঁদর গাছের 'ডাল হইতে' ঝুলিতেছে (অধিকরণে পঞ্চমী)। "হেন কালে 'গগনেতে' উঠিলেন চাঁদা।" আনন্দময়ীর 'আগমনে' আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে হাসি ফুটিতেছে। ভারতীয় 'কবিদের মধ্যে' কালিদাস শ্রেষ্ঠ (একজাতীয় সমুদায়ের মধ্যে পৃথকীকরণে নিধারণে সপ্তমী)। 'মানুষের কাছে' মানুষ যায়। **বীপ্সায় সপ্তমী**—বীপ্সা (=প্রত্যেক) অর্থে সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত পদের দ্বিরুক্তি হয়। ফলে প্রথম পদটি অপাদানের ও দ্বিতীয় পদটি অধিকরণের কার্য সম্পাদন করে: যেমন,—'হাতে হাতে; কোণে কোণে; ঘর ঘর; কুঞ্জে কুঞ্জে।' **মন্তব্য:** অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা বা গভীর অন্তরঙ্গতা বুঝাইতেও দ্বিরুক্তি ঘটে; যেমন,—'মনে মনে; চোখে চোখে; কানে কানে; হাতে হাতে (=সঙ্গে সঙ্গে)।'

## সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ

**সম্বন্ধ পদ**

যাহার অধিকারে কোনও পদার্থ থাকে অথবা যাহার সঙ্গে কোনও পদার্থের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ থাকে এবং উক্ত পদার্থকে যাহা বিশিষ্ট করে, তাহাই সম্বন্ধ পদ। সম্বন্ধ পদে 'র, এর, কার' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। সম্বন্ধ নানা রকমের: যেমন,—(১) কারক-সম্বন্ধ:—(ক) কর্তৃ-সম্বন্ধ—শিশুর খেলা। (খ) কর্ম-সম্বন্ধ—ঈশ্বরের উপাসনা। (গ) করণ-সম্বন্ধ—কলমের লেখা। (ঘ) অপাদান-সম্বন্ধ—ভূতের ভয়। (ঙ) অধিকরণ-সম্বন্ধ—মাথার ব্যথা। (২) রূপক সম্বন্ধ, অভেদ-সম্বন্ধ বা নিত্য-সম্বন্ধ—বিদ্যার সাগর। (৩) কার্য-কারণ সম্বন্ধ—পাপের শাস্তি। (৪) উপাদান-সম্বন্ধ—মাটির পুতুল। (৫) নিমিত্ত-সম্বন্ধ—সখের যাত্রা। (৬) যোগ্যতা-সম্বন্ধ—খাইবার ঔষধ। (৭) গতি-সম্বন্ধ—কলের জাহাজ। (৮) বিশেষণ-সম্বন্ধ—সুখের সংসার। (৯) ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ—দশদিনের পথ। (১০) তারতম্যমূলক সম্বন্ধ—সে 'রামের চেয়ে' বড়। সে 'রামের অপেক্ষা' বড়। 'দুইজনের মধ্যে' সেই বড়। (১১) অব্যয় যোগে সম্বন্ধ পদ—জোরের সঙ্গে। কলেজের নিকটে। মাতার তুল্য। রেবার নিমিত্ত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ভারতের পশ্চিমে। (১২) বাক্য-বিবক্ষায়—হরেন যে বিশেষ দুঃখিত 'তাহার' (=তাহাতে) আর কোন সন্দেহ নাই। 'কার' বিভক্তির প্রয়োগেও সম্বন্ধ পদ হয়: যেমন,—'পরশুকার; উপরকার; প্রথমকার; সেখানকার' ইত্যাদি। এই পদগুলি বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। আবার সম্বন্ধপদে শূন্য বিভক্তিও দেখা যায়: যেমন,—খাজনা বাবদ; ভাড়া বাবদ; তোমা অপেক্ষা।'

**সম্বোধন পদ**

বাক্যের গতিভঙ্গ করিয়া যাহাকে বিশেষরূপে আহ্বান করা হয়, তাহাকে বলা হয় সম্বোধন পদ। ক্রিয়াপদের সহিত সম্পর্ক থাকে না বলিয়াই, সম্বোধনও সম্বন্ধ পদের ন্যায় কারক নয়, পদই। খাঁটি বাংলা শব্দে সম্বোধনের মূল শব্দের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, তবে কয়েকটি বিশেষ অব্যয় পদকে মূল শব্দের পূর্বে অথবা পরে বসাইয়া সম্বোধন পদকে ফুটাইয়া তোলা হয়। বলা বাহুল্য, এগুলি অব্যয়যোগে প্রথমার উদাহরণ ঃ যেমন,—হ্যাঁগা মাসী! অরে মন্মথ! আলো খেঁদী! হ্যাঁরে ছোঁড়া! হ্যাঁলা ছুঁড়ী! বাপ আমার! মা গো! মানুষ রে!"

**বি. দ্র.** কোন কোন বৈয়াকরণ, এমন কি প্রশ্নকর্তাও, 'কে, রে, এ, য়, তে' প্রভৃতিকে 'বিভক্তি' না বলিয়া 'প্রত্যয়' বলিয়াছেন! কিন্তু 'বিভক্তি' এবং 'প্রত্যয়' একার্থক নয়—ভিন্নার্থক।

## অনুশীলনী

[ এক ] 'কারক' ও 'বিভক্তি' বলিতে কি বুঝ? সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ কারক কি? উদাহরণ-যোগে বুঝাইয়া দাও।

[ দুই ] বাংলা ভাষায় কারক কয় প্রকার? তাহাদের নাম বল এবং প্রত্যেকের একটি করিয়া উদাহরণ দাও। **ক. বি. মাধ্যমিক [ বিকল্প ] '৫৯**

[ তিন ] বিভিন্ন কারকে 'এ' বিভক্তির (অর্থাৎ সপ্তমী বিভক্তির) উদাহরণ দাও। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৩, '৫৭**

[ চার ] নিম্নলিখিত প্রয়োগসমূহের উদাহরণ দাও ঃ—(ক) বহুত্বের আভাস বুঝাইতে কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি। (খ) বিশেষণ-সম্বন্ধ বুঝাইতে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ। (গ) 'তে' প্রত্যয়যোগে কর্তৃকারক নির্দেশ। **ক. বি. বি. এ. '৪৮, '৪৯**

[ পাঁচ ] ব্যাখ্যা-সহ উদাহরণ দাও ঃ—প্রযোজক কর্তা, গৌণ কর্ম, সমধাতুজ কর্ম, নির্ধারণে পঞ্চমী, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক, কর্মকারক, করণ কারক, একদেশাধিকরণ ভাবে সপ্তমী (**ঢা. বি মাধ্যমিক '৫৩, '৫৬, '৫৭, '৫৮; বি. এ. '৫০**)। প্রযোজক কর্ম, অপাদান কারক [ **রা. বি মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬** ]। দ্বিকর্মক ক্রিয়া, সমধাতুজ কর্ম, মুখ্য কর্ম, উদ্দেশ্য কর্ম, সমধাতুজ বা ক্রিয়াসম কর্তা, অপাদানে সপ্তমী, অব্যয়যোগে প্রথমা, বিশেষণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী, অভেদে ষষ্ঠী, অব্যয়যোগে প্রথমা [ **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৭; বি. এ. '৫১, '৫৬, '৫৭** ]। দুইটি ক্রিয়ার একটি কর্ম, অনুসর্গ (**গৌ বি. বি. এ '৫৫**)

[ ছয় ] দুইটি উদাহরণ সাহায্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্মের মধ্যে পার্থক্য পরিস্ফুট কর। **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৯**

[ সাত ] 'পাইলটে কালি ধরে বেশী, শেফারে লেখা হয় ভালো'—'পাইলটে' ও 'শেফারে' কি কারক ? ( **উত্তর**। 'পাইলটে' অধিকরণ ও 'শেফারে' করণ কারক। )

**ক. বি. বি এ. '৫৬**

[ আট ] নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটিতে নিম্নরেখ পদসমূহের বিভক্তি নির্ণয় করিয়া সেই বিভক্তিগুলি কোন্ কোন্ কারকে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে লিখিয়া দাও :—

তাস খেলে পড়া নষ্ট—কত ছেলে করে,
পরীক্ষা আসিলে চোখে তাই জল ঝরে।
সর্ব শিষ্যে জ্ঞান দেন গুরু মহাশয়,
শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান অন্যে কভু নয়। **রা. বি বি. এ (বিশেষ পত্র) '৫৪**

[ নয় ] 'সে তাস খেলে' ; 'সে লাঠি খেলে'—এখানে 'তাস' ও 'লাঠি' কি একই কারক বা বিভিন্ন কারক হইবে এ বিষয়ে যুক্তিসহ তোমার মত ব্যক্ত কর ( **উত্তর**। 'সে তাস খেলে'—এই উদাহরণে 'তাস' ছাড়া খেলা ক্রিয়াটি সম্পাদিত হইতে পারে না বলিয়া 'তাস' করণ। অন্য কিছুর দ্বারা নয়—তাসের দ্বারাই খেলা—এখানে তাস সামগ্রীটি 'খেলা' ক্রিয়া-সম্পাদনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ; তাই 'তাস' করণ। পক্ষান্তরে, 'সে লাঠি খেলে'—এই উদাহরণে 'লাঠি খেলার' অর্থ প্রকৃত খেলা করা নয়—লাঠিকে ঘোরানো তথা নৈপুণ্য দেখানো ; তাই 'লাঠি' 'খেলে' ক্রিয়ার কর্ম। )

**ক. বি মাধ্যমিক ( বিশেষ ) '৫০**

[ দশ ] অধিকরণ কারক বুঝাও এবং আধার-অধিকরণ, ব্যাপ্ত্যধিকরণ, কালাধিকরণ এবং ভাবাধিকরণ-এর একটি করিয়া উদাহরণ দাও। **ক. বি মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৭**

[ এগারো ] বিভিন্ন অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ উদাহরণ-সমেত প্রদর্শন কর।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৭**

[ বারো ] স্থূলাক্ষর অংশের বন্ধনীস্থ নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :—এখানে **সুতানুটি** ব'লে একটা গাঁ ছিল ( বিভক্তিকারণ সহ )। **ক. বি বি. এ '৫৯**

[ তেরো ] মোটা মোটা হরফে লিখিত পদগুলির কারক নির্ণয় কর :—**কেউটে সাপে** কামড়ালে আর রক্ষা নেই ; এ পোশাকে **তোমাকে** মানায় না। ( **ক. বি. বি. এ '৫৮** )। **অন্ধজনে** দেহ আলো ; এ আমার **স্বকর্ণে** শোনা। ( **ক. বি. বি এ '৫৯** )। এ **কলমে** বেশ লেখা যায়। **পাগলে** কি না বলে। **আমার** ভাত খাওয়া হইল না। **বিপদে** মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা। ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ **বুক**। **মাথায়** ছোটো, বহরে বড়, বাঙ্গালী সন্তান। **গুরুজনে** কর নতি। শরতে ধরাতল **শিশিরে** ঝলমল। ( **ঢা বি. মাধ্যমিক '৫৮** )

[ চোদ্দ ] নিম্নলিখিত প্রয়োগসমূহের উদাহরণ দাও :—কর্তায় দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও সপ্তমী ; কর্মে সপ্তমী ; করণে প্রথমা, ষষ্ঠী ও সপ্তমী ; সম্প্রদানে সপ্তমী ; অপাদানে প্রথমা, ষষ্ঠী ও সপ্তমী ; অধিকরণে প্রথমা ও পঞ্চমী ; বীপ্সায় সপ্তমী।

# পঞ্চম পর্ব

## বাক্য-প্রকরণ

### প্রথম অধ্যায়

### বাক্যপরিচয়

যে পদ বা শব্দসমষ্টির সাহায্যে কোন বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্যকরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে বলা হয় **বাক্য**। প্রতিটি বাক্যেই দুইটি বস্তু থাকে—একটি, উদ্দেশ্য এবং অপরটি বিধেয়; যাহার উদ্দেশ্যে বা সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাহাই **উদ্দেশ্য,** আর যাহা কিছু বলা হয় তাহাই **বিধেয়**। সাধারণতঃ উদ্দেশ্য আগে ও বিধেয় পরে বসে ঃ যেমন,—রাম হাসিতেছে। 'রাম' উদ্দেশ্য এবং 'হাসিতেছে' বিধেয়। সম্বন্ধ-পদ, বিশেষণ, কৃদন্ত প্রভৃতির দ্বারা উদ্দেশ্যকে আর কর্ম, সম্প্রদান বা অপর কারকে প্রযুক্ত বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম বা অব্যয়-দ্বারা বিধেয়কে সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে ঃ যেমন,—বীরেনবাবুর নিষ্কর্মা পুত্র রাম এখন মনোযোগসহকারে পরীক্ষার পড়া পড়িতেছে।

**আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি**

আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং আসত্তি—এই তিনটি গুণ না থাকিলে সার্থক বাক্যরচনা হয় না। **প্রথমতঃ,** বাক্য এমন হওয়া উচিত যাহাতে বক্তার পূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রোতার আগ্রহ বা **আকাঙ্ক্ষা** মিটিয়া যায়। যতক্ষণ অবধি এই আকাঙ্ক্ষা না মিটে ততক্ষণ তক অপর নূতন পদ আসিবার আবশ্যকতা থাকে। শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা না মিটা অবধি বাক্য সম্পূর্ণ হয় না ঃ যেমন,—'আমি কলেজে যাইয়া' এই অবধি বলিয়া বক্তা যদি থামিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পূর্ণ উদ্দেশ্য জানিবার জন্য শ্রোতার আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে। পক্ষান্তরে, 'আমি কলেজে যাইয়া পড়িব' এই ভাবে বাক্যটিকে শেষ করিলে শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহের নিবৃত্তি হয়। **দ্বিতীয়তঃ,** বাক্যের মধ্যে পদসমষ্টিকে ব্যাকরণমতে পরস্পরের সঙ্গে সংগত করিয়া বসাইলেই চলিবে না; অভিজ্ঞতা ও সুযুক্তির অনুসারী না হইলে ব্যাকরণ-অনুযায়ী বাক্যের অবয়ব হইবে সত্য, কিন্তু অর্থগত ও ভাবগত বিপত্তিহেতু বাক্যটি উন্মাদের প্রলাপোক্তিতে পরিণত হইবে। অর্থগত ও ভাবগত মেলবন্ধনকেই বাক্যের **যোগ্যতা** বলা যাইতে পারে ঃ যেমন,—'ছাগল গোরুকে খাইতেছে'। ব্যাকরণমতে ইহা বাক্য, কিন্তু গোরুকে খাইবার যোগ্যতা ছাগলের নাই। এহেন বাক্য পাগলের

প্রলাপোক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, বাক্যরচনায় অর্থগত ও ভাবগত যোগ্যতা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। **তৃতীয়তঃ,** বাক্যের অর্থবোধের নিমিত্ত পদগুলিকে ভাষায় স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পর পর সাজাইয়া পরস্পরের সহিত অন্বিত বা সম্পর্কিত করিতে হয়। ইহাকেই বলা হয় বাক্যের **আসত্তি** বা **নৈকট্য** রক্ষণ ঃ যেমন,—'পরশু হইতে মাসীর আসিয়াছে বাড়ি হরেন।'—ইহাতে পদগুলির যথাযোগ্য নৈকট্য না থাকায় বাক্যটি অর্থহীন। পক্ষান্তরে, 'হরেন পরশু মাসীর বাড়ি হইতে আসিয়াছে।'—এইরূপ বলিলে আসত্তি বজায় থাকে, বাক্যটিও অর্থপূর্ণ হয়।

## বাক্যের গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ

বাক্য

সরল বা সাধারণ | মিশ্র বা জটিল | যৌগিক বা সংযুক্ত

(১) যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য ও একটিমাত্র বিধেয় (সমাপিকা ক্রিয়া) থাকে, তাহাই **সরল** বা **সাধারণ** বাক্য ঃ যেমন,—'সে ঘোড়ায় চড়ে'। (২) যে বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়সংবলিত প্রধান অংশ ছাড়াও এক বা ততোঽধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য বা বাক্যাংশ প্রধান বাক্যের অঙ্গ হিসাবে থাকিয়া সম্পূর্ণ বৃহত্তর বাক্য গঠন করে, তাহাকে বলা হয় **মিশ্র** বা **জটিল বাক্য**। এই বৃহত্তর বাক্যের অঙ্গীভূত অপ্রধান বাক্যাংশ বা খণ্ডবাক্যকে বলা হয় **উপাদান-বাক্য** বা **আশ্রিত বাক্যাংশ**। এই উপাদান-বাক্যও তিন শ্রেণীর ঃ (**ক**) যে খণ্ডবাক্য বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া প্রধান বাক্যের অন্তর্গত কোন পদের সহিত অন্বিত বা সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহাকে বলা হয় **বিশেষ্যস্থানীয় উপাদান-বাক্য** ঃ যেমন,—'তপন ঢাকুরিয়ায় থাকে', ইহা আমি জানি। এখানে 'তপন ঢাকুরিয়ায় থাকে' এই খণ্ডবাক্যটি বিশেষ্যধর্মী উপাদান-বাক্য; ইহা কর্ম কারক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। (**খ**) যে খণ্ডবাক্য বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া প্রধান বাক্যের অন্তর্গত কোন পদকে বিশেষিত করে, তাহাকে বলা হয় **বিশেষণ-স্থানীয় উপাদান-বাক্য** ঃ যেমন,—'যে লোক পরোপকার করে', সে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়। (**গ**) যে খণ্ডবাক্য ক্রিয়াবিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া প্রধান বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়ার অবস্থা প্রকৃতি প্রভৃতি নির্দেশিত করে, তাহাকে বলা হয় **ক্রিয়াবিশেষণ স্থানীয় উপাদান-বাক্য** ঃ যেমন,—'যখন আমরা স্টেশনে পৌঁছিলাম,' তখন ট্রেন ছাড়িল। এখানে 'যখন আমরা স্টেশনে পৌঁছিলাম'—এই খণ্ডবাক্যটি 'ছাড়িল' ক্রিয়ার বিশেষণ। (৩) যে বাক্যে দুই বা ততোঽধিক সরল, মিশ্র, অথবা সরল ও মিশ্র বাক্যকে সংযোজক অথবা

প্রতিষেধক অব্যয়-যোগে সংযুক্ত করিয়া, একটি দীর্ঘ প্রস্তাব বাক্যের ন্যায় গঠিত করা হয়, তাহাকে বলা হয় **যৌগিক** বা **সংযুক্ত বাক্য**ঃ যেমন,—'রীণা বেলুড়ে যাইবে ও অলকাকে সঙ্গে লইবে।' 'রীণা না থাকিলে অলকা যাইবে না, কিন্তু অলকা বলিয়া পাঠাইয়াছে যে, তাহার আসিতে বিলম্ব হইবে।'

## বাক্যের উদ্দেশ্যগত বা অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ
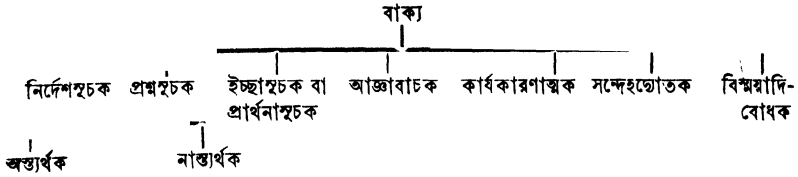
বাক্য

নির্দেশসূচক | প্রশ্নসূচক | ইচ্ছাসূচক বা প্রার্থনাসূচক | আজ্ঞাবাচক | কার্যকারণাত্মক | সন্দেহদ্যোতক | বিস্ময়াদি-বোধক

নির্দেশসূচক → অস্ত্যর্থক, নাস্ত্যর্থক

(ক) নির্দেশসূচক অস্ত্যর্থক বাক্য—'সে স্কুলে যায়।' (খ) নির্দেশসূচক নাস্ত্যর্থক বাক্য—'সে স্কুলে যায় না।' (গ) প্রশ্নসূচক বাক্য—'সে কখন স্কুলে যাইবে?' (ঘ) ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য—'কাল আমার কাছে পড়িতে আসিও।' 'মা চিত্তেশ্বরী তোমার কল্যাণ করুন।' (ঙ) আজ্ঞাবাচক বাক্যে—'অধ্যক্ষ-মহাশয়ের সঙ্গে এখনই দেখা কর।' (চ) কার্যকারণাত্মক বাক্য—কষ্ট না করিলে কেষ্ট মিলে না।' (ছ) সন্দেহদ্যোতক বাক্য—'বোধ হয় কাল তোমার বাড়িতে যাইব। (জ) বিস্ময়াদি-বোধক বাক্য—'পুরীর সমুদ্রদৃশ্য কি মনোরম!'

## অনুশীলনী

[এক] এমন একটি বাক্য রচনা কর যাহাতে 'বিধেয়' অংশ আগে ও 'উদ্দেশ্য' অংশ পরে থাকিবে। **ক. বি. বি. এ. '৫৬**

[দুই] দৃষ্টান্তসহকারে নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলি ব্যাখ্যা করঃ—উদ্দেশ্য; বিধেয়; আকাঙ্ক্ষা; যোগ্যতা; আসত্তি; সরল বাক্য; মিশ্র বাক্য; যৌগিক বাক্য [**ঢা. বি. বি এ. '৫০**]। বিশেষ্যস্থানীয় উপাদান-বাক্য; বিশেষণস্থানীয় উপাদান-বাক্য; ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় উপাদান-বাক্য।

[তিন] বাংলা বাক্য কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকার বাক্যের একটি করিয়া উদাহরণ দাও। **রা. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প), '৫৫**

[চার] মিশ্র, জটিল ও যৌগিক বাক্য কাহাকে বলে? প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও। **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প). '৫৮**

**মন্তব্যঃ** বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মিশ্র ও **জটিল** বাক্য যে **একই সামগ্রী, তাহাও প্রশ্নকর্তা বা প্রশ্নপত্র-তত্ত্বাবধায়ক (Moderator)—কেহই জানেন না।**

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## বাক্যপরিবর্তন

অর্থরক্ষা করিয়া বাক্যপরিবর্তন করা যাইতে পারে। এই বাক্যপরিবর্তন তথা বাক্যান্তরীকরণের পদ্ধতি নানাবিধঃ **প্রথমতঃ**, বাক্যের গঠন বদলাইয়া বাক্যান্তরীকরণ অর্থাৎ সরল বাক্য, মিশ্র বাক্য ও যৌগিক বাক্যের মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তরীকরণ; **দ্বিতীয়তঃ**, বাক্যের নিশ্চয়াত্মক ও নিষেধাত্মক, নির্দেশাত্মক ও প্রশ্নাত্মক আকারের মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তরীকরণ; **তৃতীয়তঃ**, উক্তি-পরিবর্তন করিয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, স্বকীয়, সরল বা অপরোক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ, পরকীয় বা বক্র উক্তিতে এবং পরোক্ষ উক্তিকে প্রত্যক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করিয়া বাক্য-পরিবর্তন; **চতুর্থতঃ**, বাচ্যপরিবর্তন করিয়া কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্যে, কর্মবাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে, কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে, ভাববাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে রূপায়িত করিয়া বাক্যপরিবর্তন; **পঞ্চমতঃ**, অর্থরক্ষা করিয়া ভাবসংগতি বজায় রাখিয়া যথেচ্ছভাবে বাক্যপরিবর্তন।

## প্রথম পর্যায়

### সরল বাক্য হইতে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

এই জাতীয় রূপান্তরকালে সরল বাক্যের অন্তর্ভুক্ত কোন পদ বা পদসমষ্টিকে ভাঙিয়া **নিরপেক্ষ** অপ্রধান বাক্যে পরিণত করা দরকার। প্রয়োজনমতে সংযোজক বিয়োজক বা নিমিত্তার্থক অব্যয়ের ব্যবহার অনিবার্য: যেমন,—

সরল বাক্য—নশ্বরদেহ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কীর্তি অবিনশ্বর।
যৌগিক বাক্য—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দেহ নশ্বর ছিল, কিন্তু তাঁহার কীর্তি অবিনশ্বর।

সরল বাক্য—পিতৃবিয়োগে শোকার্ত সমর এবার পরীক্ষা দিবে না।
যৌগিক বাক্য—সমর পিতৃবিয়োগে শোকার্ত আছে, সেই নিমিত্ত পরীক্ষা দিবে না।

### সরল বাক্য হইতে জটিল বাক্যে রূপান্তর

এই জাতীয় রূপান্তরকালে সরল বাক্যের অন্তর্ভুক্ত কোনও একটি পদ বা পদসমষ্টিকে সম্প্রসারিত করিয়া একটি অংশকে প্রধান বাক্য হিসাবে রাখিয়া অপর অংশকে অপ্রধান বাক্যে তথা **উপবাক্যে** পরিণত করা দরকার। এই উপবাক্য হয় বিশেষ্যধর্মী, নয় বিশেষণধর্মী, নয়তো-বা ক্রিয়াবিশেষণধর্মী হইবে: যেমন,—

সরল বাক্য—আমি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক।
জটিল বাক্য—আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করি।

সরল বাক্য—পরোপকারীকে সকলেই শ্রদ্ধা করে।
জটিল বাক্য—যিনি পরের উপকার করেন, তাঁহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করে।

সরল বাক্য—গৃহস্থের নিদ্রাকালে চোর আসিয়াছিল।
জটিল বাক্য—গৃহস্থ যখন নিদ্রা যাইতেছিল, তখন চোর আসিয়াছিল।

## যৌগিক বাক্য হইতে সরল বাক্যে রূপান্তর

এই জাতীয় রূপান্তরকালে যৌগিক বাক্যের অন্তর্ভুক্ত নিরপেক্ষ অপ্রধান বাক্যকে পরিহার করিয়া একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া রাখিতে হইবে আর পরিত্যক্ত অপ্রধান বাক্যকে পদে বা পদসমষ্টিতে রূপায়িত করিতে হইবে। সংযোজক বিযোজক বা নিমিত্তার্থক অব্যয়ের চিহ্নমাত্র থাকিবে না ; যেমন,—

যৌগিক বাক্য—'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নহিলে খরচ বাড়ে।'
সরল বাক্য—পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য না হইলে খরচ বাড়ে।

যৌগিক বাক্য—বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে নাই।
সরল বাক্য—তাহার বয়স বাড়িলেও বুদ্ধি বাড়ে নাই।

## যৌগিক বাক্য হইতে জটিল বাক্যে রূপান্তর

এই জাতীয় রূপান্তরকালে যৌগিক বাক্যের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের মধ্যে একটিকে ছাড়া অপর বাক্য বা বাক্যগুলিকে উপবাক্যে রূপায়িত করিতে হইবে। 'যখন—তখন', 'যদিও—তথাপি', যদি—তাহা হইলে' ইত্যাদি অপেক্ষাসূচক অব্যয় থাকিবে ; অর্থাৎ,—ইহা যেন নিরপেক্ষ না হয় : যেমন,—

যৌগিক বাক্য—তিনি ধনী, কিন্তু তাঁহার মন দরিদ্রের জন্য কাঁদে।
জটিল বাক্য—যদিও তিনি ধনী, তথাপি তাঁহার মন দরিদ্রের জন্য কাঁদে।

যৌগিক বাক্য—বর্ষায় বর্ষাতি লইয়া যাও, নইলে পথে দাঁড়াইতে হইবে।
জটিল বাক্য—যদি বর্ষায় বর্ষাতি না লইয়া বাহিরে যাও, তাহা হইলে পথে দাঁড়াইতে হইবে।

## জটিল বাক্য হইতে সরল বাক্যে রূপান্তর

এই জাতীয় রূপান্তরকালে জটিল বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্যধর্মী বিশেষণধর্মী ক্রিয়াবিশেষণধর্মী অপ্রধান বাক্য তথা উপবাক্যকে সংকুচিত করিয়া সমাসবদ্ধ পদ বা পদসমষ্টিতে পরিণত করিয়া কেবলমাত্র একটি কর্তা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া রাখিতে হইবে : যেমন,—

জটিল বাক্য—সূর্য যে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, ইহা কে না জানে।
সরল বাক্য—পশ্চিম দিকে অস্তগামী সূর্যের কথা কে না জানে।

জটিল বাক্য—যে বইখানি আমি কিনিয়াছি, তাহা আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।
সরল বাক্য—মৎক্রীত বইখানি আর কোথাও মিলিবে না।

জটিল বাক্য—অভাব আছে বলিয়াই জগৎ এরূপ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে।
সরল বাক্য—অভাবের দরুণ জগৎ এরূপ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে।

## জটিল বাক্য হইতে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

এই জাতীয় রূপান্তর করিতে হইলে জটিল বাক্যের অন্তর্ভুক্ত এক বা একাধিক ক্ষুদ্রতর উপবাক্যকে একটি বৃহত্তর বাক্যের অঙ্গীভূত করিয়া প্রয়োজনমতে সংযোজক অথবা বিযোজক অব্যয় জুড়িয়া নিরপেক্ষ অপ্রধান বাক্যাদিতে পরিণত করিতে হয়। সময়ে সময়ে অব্যয় যোগ না করিয়াও 'কমা' বা 'সেমিকোলন' দেওয়া হয়: যেমন,—

জটিল বাক্য—যদি সুনাম পাইতে চাও, তাহা হইলে নামের প্রতি লোভ ছাড়।
যৌগিক বাক্য—সুনাম পাইতে চাও, নামের প্রতি লোভ ছাড়।

জটিল বাক্য—সেদিন কলেজে যে ছাতাটি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহা আজ পাইয়াছি।
যৌগিক বাক্য—সেদিন কলেজে এই ছাতাটি হারাইয়াছিল, আজ ইহা পাইয়াছি।

জটিলবাক্য—যখন বড় ডাক্তার আসিয়াছেন, তখন আর রোগীর জীবনশঙ্কা নাই।
যৌগিক বাক্য—বড় ডাক্তার আসিয়াছেন, এখন আর রোগীর জীবনশঙ্কা নাই।

## দ্বিতীয় পর্যায়

| নিশ্চয়াত্মক বাক্য | নিষেধাত্মক বাক্য |
|---|---|
| (ক) দরিদ্রসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। | (ক) দরিদ্রসেবা অপেক্ষা আর কোনও ধর্ম বড় নয়। |
| (খ) তাহারা দুইজনেই সমান বলশালী | (খ) বলের দিক দিয়া তাঁহারা দুইজনেই কেহ কাহারও অপেক্ষা কম নহেন। |
| (গ) তাঁহার ন্যায় কর্মবীর অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। | (গ) তাঁহার ন্যায় কর্মবীর বড় একটা কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। |

| নিষেধাত্মক বাক্য | নিশ্চয়াত্মক বাক্য |
|---|---|
| (ক) মাতাপিতার প্রতি তাহার ভক্তির সীমা ছিল না। | (ক) মাতাপিতার প্রতি তাহার অসীম ভক্তি ছিল। |
| (খ) তাহাকে পরাস্ত না করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইব না। | (খ) তাহাকে পরাস্ত করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইব। |
| (গ) ইহা অপেক্ষা সুন্দর বস্তু আর নাই। | (গ) ইহা সুন্দরতম বস্তু। |

| নির্দেশাত্মক বাক্য | প্রশ্নাত্মক বাক্য |
|---|---|
| (ক) মহাত্মা গান্ধী অহিংসার পূজারী ছিলেন। | (ক) মহাত্মা গান্ধী কি অহিংসার পূজারী ছিলেন না? |
| (খ) ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই তপস্যা। | (খ) ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই কি তপস্যা নয়? |

| প্রশ্নাত্মক বাক্য | নির্দেশাত্মক বাক্য |
|---|---|
| (ক) মানুষ কি দুর্গ সেতু পরিখা প্রণালী পথ ঘাট মাঠ নির্মাণ করিয়াছিল? | (ক) মানুষ দুর্গ সেতু পরিখা প্রণালী পথ ঘাট মাঠ নির্মাণ করিয়াছিল। |
| (খ) জগতের পাপ তাপ জগতেই শেষ? | (খ) জগতের পাপ তাপ জগতেই শেষ হয়। |

## তৃতীয় পর্যায়

বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ উক্তির উদাহরণ প্রচুর মিলে। কিন্তু পরোক্ষ বা বক্র উক্তির উদাহরণ কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। হয়তো-বা বাংলা ভাষার আত্মধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ উক্তিরই আনুকূল্য আছে। সে যাই হোক,—ইংরাজির প্রভাবে আজকাল বাংলা সাহিত্যে পরোক্ষ উক্তির যৎকিঞ্চিৎ ব্যবহার হইতেছে, কিন্তু এখনও জোর প্রয়োগ দেখা যায় না।

### উক্তি-পরিবর্তনের বিধি

প্রত্যক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ-চিহ্ন [ " " ] থাকে, কিন্তু পরোক্ষ উক্তিতে ঐ চিহ্নের স্থানে 'যে'—এই সংযোজক অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষ উক্তির প্রথম ক্রিয়াপদের কাল পরিবর্তিত উক্তিতে অর্থাৎ পরোক্ষ উক্তিতেও অনেক স্থলে বজায় থাকে। প্রত্যক্ষ বাক্যের 'আজ', 'আগামী কাল', 'গতকাল', 'এখানে', 'এখন' পরোক্ষ বাক্যে যথা-ক্রমে 'সেই দিন', 'পর দিন', 'পূর্বদিন', 'সেখানে', 'তখন' ইত্যাদি রূপে দেখা দেয়। জিজ্ঞাসা, আদেশ প্রভৃতি মনের বিচিত্র ভাব বুঝাইবার ব্যাপারে সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ উক্তির প্রধান বাক্য ও উদ্ধরণ-চিহ্নের অন্তর্গত কথা মিলিয়া পরোক্ষ উক্তিতে একটি বাক্যরূপে প্রকাশ পায়। **সব চেয়ে বড় কথা এই যে কাজের অর্থ অনুযায়ী পরোক্ষ উক্তিতে অনেক সময়েই নূতন নূতন শব্দ জুড়িয়া দেওয়া হয়।**

### প্রত্যক্ষ উক্তি হইতে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন

(ক) সত্য বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, তুমি বুঝি খুব বই পড়?

রমণী কহিল, ইংরাজি জানিনে ত, বাংলা বই যা' বেরোয়, সব পড়ি। এক একদিন সারারাত্রি পড়ি—এই যে বড় রাস্তা—চল না আমাদের বাড়ি, যত বই আছে, সব দেখাব।

সত্য চমকিয়া উঠিল—তোমাদের বাড়ি?

হাঁ, আমাদের বাড়ি—চল, যেতে হবে তোমাকে।

হঠাৎ সত্যের মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, সে সভয়ে বলিয়া উঠিল,—না না, ছি ছি—

—শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' হইতে উদ্ধৃত ]

উত্তর। সত্য বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া দ্বিধাজড়িত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে খুব বই পড়ে কি না। রমণী প্রত্যুত্তরে জানাইল যে, ইংরাজি তো তাহার জানা নাই—তাই বাংলা বই যাহা বেরোয়, সবই সে পড়ে। এক একদিন সারারাত্রি সে পড়ে—সেই যে বড় রাস্তা—তাহা ধরিয়া তাহাদের বাড়িতে যাইবার জন্য সে সত্যকে অনুরোধ করিয়া এই প্রতিশ্রুতি দিল যে, বাড়িতে গেলে যত বই আছে সব সে দেখাবে। সত্য চমকিয়া উঠিয়া অস্ফুটকণ্ঠে তাহাদের বাড়ি যাইবার কথা উচ্চারণ করিল। ইহাতে রমণী তাহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া আরও দৃঢ়তার সহিত জানাইল যে, নিশ্চয়ই তাহাদের বাড়িতে তাহাকে ( অর্থাৎ সত্যকে ) যাইতে হইবে। রমণীর উক্তি শুনিয়া হঠাৎ সত্যের মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, সে সভয়ে ধিক্কারব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারণ করিয়া যাইতে অস্বীকার করিল।

(খ) এক ফাঁকে লীলা দুধের-গ্লাস হাতে তুলিয়া বলিল—তুমি খেয়ে নাও আদ্দেকটা—

অপু লজ্জিত সুরে বলিল—না।

—তোমাকে ভারি খোসামোদ কর্তে হয় সব তাতে—কেন ওরকম? আমাদের মুলতানী গরুর দুধ—খেয়ে নাও—ক্ষীরের মত দুধ, লক্ষ্মী ছেলে—

অপু চোখ কুঁচকাইয়া বলিল—ইঃ, লক্ষ্মী ছেলে! ভারি ইয়ে কিনা? উনি আবার—

লীলা দুধের-গ্লাস অপুর মুখে তুলিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আর লজ্জায় কাজ নেই—আমি চোখ বুজে আছি, নাও— [—'পথের পাঁচালি' হইতে উদ্ধৃত।]

উত্তর। এক ফাঁকে লীলা দুধের-গ্লাস হাতে তুলিয়া অপুকে আদ্দেকটা খাইয়া লইতে খোসামোদ করিল। অপু লজ্জিতসুরে খাইতে অস্বীকার করিল। লীলা বিরক্তিসূচক কণ্ঠে জানাইল যে, তাহাকে সব তাতে ভারি তোসামোদ করিতে হয় এবং জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে চাহিল যে, কেনই-বা ওরকম করে। অতঃপর লীলা অপুকে লক্ষ্মী ছেলে বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহাদের মুলতানী গরুর দুধ—ক্ষীরের মত দুধ খাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিল। অপু চোখ কুঁচকাইয়া মনঃকষ্টব্যঞ্জক স্বরে সেই আপ্যায়নসূচক সম্বোধনের পুনরাবৃত্তি করিয়া লীলাকে লক্ষ্য করিয়া নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত করিবামাত্রই লীলা দুধের-গ্লাস অপুর মুখে তুলিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া প্রবোধ দিল যে, আর তাহার লজ্জায় কাজ নাই—সে চোখ বুজিয়া আছে। অতঃপর লীলা অপুকে খাইয়া লইতে অনুরোধ করিল।

## পরোক্ষ উক্তি হইতে প্রত্যক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন

ব্রজ মাষ্টার বলেন, পূর্বে পিতার জীবিতকালে, একদিন কলিকাতায় গঙ্গার ধারে মাষ্টার মহাশয় নাকি বেড়াইতেছিলেন, তখন এক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। সাহেব তাঁহার ইংরাজি শুনিয়া লাট সাহেবের নিকট সে গল্প করিয়াছিল। লাট সাহেব মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়া ডেপুটি কালেক্টরি পদ তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তিনি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা ছিল না, এই প্রস্তাব তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আজ অভাবে পড়িয়া এই ২৫৲ টাকার চাকরি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। পুরুষস্য ভাগ্যং। [—"মাষ্টার মহাশয়" গল্প হইতে উদ্ধৃত।]

উত্তর। ব্রজ মাষ্টার বলেন, "পূর্বে পিতার জীবিতকালে, একদিন কলিকাতায় গঙ্গার ধারে আমি তো বেড়াচ্ছি—হেথায় এক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। সাহেব আমার ইংরাজি শুনিয়া লাট সাহেবের নিকট গল্প করিল। লাট সাহেব আমাকে ডেকে নিয়ে ডেপুটি কালেক্টরি পদ দিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু তখন আমি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা নাই, ঐ প্রস্তাব আমি বিনীতভাবে প্রত্যাখান করি। আজ অভাবে পড়িয়া এই ২৫৲ টাকার চাকরি আমাকে স্বীকার করিতে হয়। পুরুষস্য ভাগ্যং।"

## চতুর্থ পর্যায়

যে বাক্যে কর্তৃপদের প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ কর্তাই ক্রিয়ার কাজ করে আর ক্রিয়া কর্তার অনুসরণ করে, তাহা **কর্তৃবাচ্য**। কর্তার যে-পুরুষ, ক্রিয়ারও সেই পুরুষ হয়: যেমন,—'আমি বইখানি এখনও পড়ি নাই।' যে-বাক্যে কর্তা অপেক্ষা কর্মেরই সঙ্গে ক্রিয়ার ঘটনার প্রধান ভাবে যোগাযোগ থাকে, তাহা **কর্মবাচ্য**। কর্মবাচ্যে কর্তৃপদ হয় উহ্য থাকে, নয় করণ কারকের বিভক্তিযুক্ত হয় আর কর্মপদ কর্তৃকারকের বিভক্তিযুক্ত হয়; ক্রিয়াপদও কর্মপদের অধীন লইয়া থাকে। কর্মে যে-পুরুষ, ক্রিয়ারও সেই

পুরুষ হয়: যেমন,—'বইখানি এখনও পড়া হয় নাই।' (—এখানে কর্তৃপদ উহ্য আছে।) 'বইখানি এখনও আমা-কর্তৃক পড়া হয় নাই।' (—কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি।) যে বাক্যে ক্রিয়ারই প্রাধান্য থাকে, বক্তার নিকটে ক্রিয়ার ঘটনাই হয় প্রধান, কর্তা বা কর্ম প্রধান নয়, সেখানে হয় **ভাববাচ্য**। ভাববাচ্যের ক্রিয়া প্রথম পুরুষের হয় এবং কর্তায় দ্বিতীয়া, তৃতীয়া বা সপ্তমী বিভক্ত হয়: যেমন,—আমায় বইখানি এখনই পড়িতে হইবে।' যে বাক্যে ক্রিয়ার কর্তাকে নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে—যেন কর্মপদই কর্তৃপদের ন্যায় কাজ করে—সেখানে হয় **কর্মকর্তৃবাচ্য**; যেমন,—'পা চলে না। শাঁখ বাজে। কলসী ভরে। বইখানি বেশ কাটে। বরাতে আর কষ্ট সয় না।' মনে রাখিতে হইবে যে, **বাংলা ভাষার বাগ্‌ধারায় ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্যের বহুল প্রয়োগ ঘটিয়া থাকে। সাধারণ কথোপকথনে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ারও যথেষ্ট ব্যবহার আছে।** এক্ষণে বাচ্য-পরিবর্তনের পদ্ধতি লক্ষ্য করা যাক্।

| কর্তৃবাচ্য | কর্মবাচ্য |
|---|---|
| (ক) ও গান সে জানে। | (ক) ও গান তাহার জানা আছে। |
| (খ) এই বইখানি আমি লিখিয়াছি। | (খ) এই বইখানি আমারই লিখিত। |
| (গ) বইখানি এখনও পড় নাই। | (গ) বইখানি এখনও তোমার পড়া হয় নাই। |
| **কর্মবাচ্য** | **কর্তৃবাচ্য** |
| (ক) বইখানি পড়া হোক্। | (ক) বইখানি পড়। |
| (খ) গানটি আগেই আমার শোনা। | (খ) আমি আগেই গানটি শুনিয়াছিলাম। |
| (গ) চোর গৃহস্থ কর্তৃক প্রহৃত হইয়াছে। | (গ) গৃহস্থ চোরকে প্রহার করিয়াছে। |
| **কর্তৃবাচ্য** | **ভাববাচ্য** |
| (ক) ক্লাসে গল্প করিও না। | (ক) ক্লাসে গল্প করিতে নাই। |
| (খ) রাম কি বাজারে যাইবে? | (খ) রামের কি বাজারে যাওয়া হইবে না? |
| (গ) কখন আস্‌ছেন? | (গ) কখন আসা হচ্ছে? |
| **ভাববাচ্য** | **কর্তৃবাচ্য** |
| (ক) অবশেষে রণে ভঙ্গ দিতে হইল। | (ক) অবশেষে আমি রণে ভঙ্গ দিলাম। |
| (খ) ভোঁদড়কে দেখলেই হাসি পায়। | (খ) ভোঁদড়কে দেখ্‌লেই আমি হেসে উঠি। |
| (গ) কি কাজ করা হয়? | (গ) কি কাজ তুমি কর? |

## পঞ্চম পর্যায়

তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন—তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। তিনি অমরলোকে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি

ইহজীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আত্মা দেহপিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। ক. বি. মাধ্যমিক '৪৬

## অনুশীলনী

[ এক ] বন্ধনীস্থ নির্দেশ অনুসারে রূপান্তরিত কর :—(ক) যাহাতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকল সর্বদাই উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহের অধীন থাকে, সেইরূপ চেষ্টা করিবে। ( সরল বাক্যে )। (খ) প্রেমহীন জীবন নিরর্থক। ( মিশ্রবাক্যে )। (গ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে মনোযোগ সহকারে পড়। ( যৌগিক বাক্যে )।

[ দুই ] নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অর্থ পরিবর্তন না করিয়া প্রয়োজনমতে হয় নিষেধাত্মক বাক্যে, নয়, নিশ্চয়াত্মক বাক্যে রূপান্তরিত কর :—দেশসেবা আমার জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ। কায়েদে আজম জিন্নার প্রতি তাঁহার ভক্তির সীমা ছিল না।

[ তিন ] নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অর্থ পরিবর্তন না করিয়া প্রয়োজনমতে হয় প্রশ্নাত্মক বাক্যে, নয় নির্দেশাত্মক বাক্যে রূপান্তরিত কর :—শিশিরকুমারই বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কি রাজনীতিবিশারদ ছিলেন?

[ চার ] উক্তি পরিবর্তন কর :—আকবর কপালে হাত দিয়া খানিকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—"কারে বেইমান কয়, দিদি!—ঘরের মধ্যে ব'সে বেইমান কইচ, বড়বাবু, চোখে দেখ্‌লি জান্‌তি পার্‌তে ছোটবাবু কি!" বেণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল,—"ছোটবাবু কি? তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না! বল্‌বি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হয়ে তোরে মেরেচে।' আকবর জিভ কাটিয়া বলিল,—"তোবা তোবা! দিন্‌কে রাত কর্‌তি বল, বড়বাবু?"

[ পাঁচ ] বাচ্যপরিবর্তন কর :—( ক ) সভাপতিমহাশয় রমেনকে পুরস্কার দিলেন। ( খ ) পত্রখানি ডাকে দাও। ( গ ) এই সবাক্ চিত্রখানি এখনও দেখা হয় নাই।

[ ছয় ] অর্থসংগতি বজায় রাখিয়া প্রতিটি বাক্য যথেচ্ছভাবে গঠন কর :—( ক ) তিনি বিবাহ করিয়াছেন। ( খ ) সদা সত্য কথা কহিবে।

[ সাত ] দৃষ্টান্তযোগে ব্যাখ্যা কর :—প্রত্যক্ষ উক্তি; পরোক্ষ উক্তি; কর্তৃবাচ্য; কর্মবাচ্য; ভাববাচ্য; কর্মকর্তৃবাচ্য [ ক. বি. বি. এ. '৪৮; ঢা. বি. বি. এ. '৫১; ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫ ) ]।

[ আট ] 'ক্রিয়ার বাচ্য' বলিতে কি বুঝায়? বাংলায় কর্মকর্তৃবাচ্য কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। কর্মকর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন ক্রিয়ার বাচ্য পরিবর্তন করিয়া তাহাকে কর্মবাচ্যে বা কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করা যায় কি? ক. বি. বি. টি. '৫৭

[ নয় ] স্থূলাক্ষর অংশের বন্ধনীস্থ নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :—পুলিশের **গুলি চ'লছে** ( বাচ্য )। ক. বি. বি. এ. '৫৬

# তৃতীয় অধ্যায়

## বাক্যসংকোচন

উপকার করিবার ইচ্ছা—উপচিকীর্ষা

জয়লাভের ইচ্ছা—জিগীষা

হনন করিবার ইচ্ছা—জিঘাংসা

জানিবার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা

যে জানিতে ইচ্ছুক—জিজ্ঞাসু

লাভ করিবার ইচ্ছা—লিপ্সা

ভোজন করিবার ইচ্ছা—বুভুক্ষা

বমন করিবার ইচ্ছা—বিবমিষা

পরিচর্যা করিবার ইচ্ছা }
শুনিবার ইচ্ছা }

গোপন করিবার ইচ্ছা—জুগুপ্সা

ভৃগুর পুত্র—ভার্গব

ইতরার পুত্র—ঐতরেয়

জমদগ্নির পুত্র—জামদগ্ন্য

ব্যাসের পুত্র—বৈয়াসকি

পৃথার পুত্র—পার্থ

সূর্যের উপাসনা করেন যিনি—সৌর

তমঃ দূর করে যে—তমোঘ্ন

আকাশে চরে যে—খেচর

জলে ও স্থলে চরে যে—উভচর

ভূতলে চরে যে—ভূচর

রজনীতে চরিয়া বেড়ায় যে—নিশাচর

যাহা বলা হইয়াছে—উক্ত

দুঃখে যাওয়া যায় যেখানে—দুর্গম

পূর্বে যাহা ছিল—ভূতপূর্ব

বাবুর মত আচরণ—বাবুয়ানা

[illegible] যে—পড়ুয়া

যে নারীর সুন্দর দন্ত আছে—সুদতী

যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে—প্রোষিতভর্তৃকা

যে নারীর পঞ্চ স্বামী—পঞ্চভর্তৃকা

যে নারী প্রিয় বাক্য বলে—প্রিয়ংবদা

যে নারী কখনও সূর্যের মুখ দেখিতে পায় না—অসূর্যম্পশ্যা

যে নারীর সন্তান হয় না—বন্ধ্যা

যে নারীর একটিমাত্র সন্তান হইয়াছে—কাকবন্ধ্যা

যে নারী বিবাহের সম্পূর্ণ যোগ্যা—সমকন্যা

যে নারীর বিবাহ হয় নাই—অনূঢ়া

যে নারীর সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে—নবোঢ়া

যে নারী স্বয়ং পতিকে বরণ করে—স্বয়ংবরা

যে নারী অপরের অর্থে জীবনধারণ করে—পরভৃতিকা

যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে—বীরপ্রসূ

যে নারী পতিপুত্রহীনা—অবীরা

পূর্বে যাহা দেখা যায় নাই—অদৃষ্টপূর্ব, অদৃষ্টচর

পূর্বে যাহা কখনও অনুভব করা যায় নাই—অননুভূতপূর্ব

পূর্বে যাহা শোনা যায় নাই—অশ্রুতপূর্ব

পূর্বে যাহা আস্বাদিত হয় নাই—অনাস্বাদিতপূর্ব

পূর্বে যাহা ভস্ম ছিল না, কিন্তু এখন ভস্মে পরিণত হইয়াছে—ভস্মীভূত

পূর্বে যাহা দৃঢ় ছিল না, এখন দৃঢ় হইয়াছে—দৃঢ়ীভূত

যে পুনঃ পুনঃ কাঁদিতেছে—রোরুদ্যমান

যাহা বাষ্প উদ্গমন করিতেছে—বাষ্পায়মান

যাহা পুনঃ পুনঃ জ্বলিতেছে—জাজ্বল্যমান

যাহা শ্যাম হইতেছে—শ্যামায়মান

যাহা ধূম উদগীরণ করিতেছে—ধূমায়মান
যাহা অমৃতের মত কাজ করে—অমৃতায়ন
যাহা বিনা কষ্টে লাভ করা যায়—অনায়াসলভ্য
যাহা উচ্চারণ করা যায় না—অনুচ্চার্য
যাহা শোকের জন্য নয়—অশোচ্য
যাহা লাভ করিতে পারা যায় না—অলভ্য
যাহা বর্ণনা করা যায় না—অবর্ণনীয়
যাহা ধ্যানের যোগ্য—ধ্যেয়
যাহা ধ্যানের দ্বারা জানা যায়—ধ্যানগম্য
যাহা প্রশংসার যোগ্য—প্রশস্য, প্রশংসনীয়
যাহা চিরকাল মনে রাখিবার যোগ্য—চিরস্মরণীয়
যাহার নাম প্রাতে স্মরণ রাখা উচিত—প্রাতঃস্মরণীয়
যাহা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে—ক্রমবর্ধমান
যাহা সহজে অতিক্রম করা যায় না—দুরতিক্রমণীয়
যাহা সহজে নিবারণ করা যায় না—দুর্নিবার
যাহা সহজে দমন করা যায় না—দুর্ধর্ষ, দুর্দম
যাহাকে সহজে শাসন করা যায় না—দুঃশাসন
যাহা সহজে সাধন করা যায় না—দুঃসাধ্য
যাহা সহজে জানা যায় না—দুর্জ্ঞেয়
যাহা সহজে পাওয়া যায় না—দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ
যাহা সহজে অপনীত হইবার নয়—দুরপনেয়
যাহা সহজে পরিপাক হয় না—দুষ্পাচ্য
যাহা সহজে উচ্চারণ করা যায় না—দুরুচ্চার্য
যাহা সহজে লংঘন করা যায় না—দুর্লংঘ্য
যাহা সহজে চিকিৎসার দ্বারা প্রতিকার-প্রাপ্ত হয় না—দুশ্চিকিৎস্য
যাহা সহজে ভাঙিয়া যায়—ভঙ্গুর
যাহা বাক্য ও মনের অতীত—অবাঙ্মনসগোচর
যাহা মর্মকে আঘাত করে—মর্মন্তুদ, অরুন্তুদ
যাহার বুদ্ধি কুশের অগ্রভাগের মত তীক্ষ্ণ—কুশাগ্রধী
যাহার জন্ম সুক্ষণে হইয়াছে—ক্ষণজন্মা
যাহার দুই হাত সমান চলে / যাহার বাঁ হাতও চলে }—সব্যসাচী

যাহার সহিত গোত্র সমান—সগোত্র
যাহারা একই সময়ে একই গুরুর শিষ্য—সতীর্থ
যাহার চক্ষুলজ্জা নাই—চশমখোর
যে ব্যক্তি উপকারীর উপকার স্বীকার করিতে চায় না—অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন
যে মৃগকে বিদ্ধ করে—মৃগাবিৎ
যে আতপ হইতে ত্রাণ করে—আতপত্র
যে উষ্ণ সহ্য করিতে পারে না—উষ্ণালু
যে বাস্তু হইতে উৎখাত—বাস্তুহারা, উদ্বাস্তু
যে ভাঙের নেশা করে—ভাঙর
যে গলায় ফাঁসি দিয়া মারে—ফাঁসুড়ে
যে রোগনির্ণয়ে হাতড়াইয়া মরে—হাতুড়ে
যে সাপ খেলাইয়া জীবিকা অর্জন করে—সাপুড়ে
যে নৌকা চালাইয়া জীবিকা অর্জন করে—নাবিক
যে সন্তান পিতার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিয়াছে—মরণোত্তরজাতক
যে অন্তে (নিকটে) বাস করে—অন্তেবাসী
যে অভ্র লেহন করে—অভ্রংলিহ
যে অপরকে পোষকতা করে—পৃষ্ঠপোষক
যে হাতে-কলমে কাজ করিয়া দক্ষতা লাভ করিয়াছে—কর্মিৎকর্মা
যে আটমাসে জন্মিয়াছে—আটাসে
যে মায়া বা কাপট্য জানে না—অমায়িক
যে মমতা জানে না—নির্মম
যে সকল বস্তু ভক্ষণ করে—সর্বভুক্
যে কি করিবে তাহা বুঝিতে পারে না—কিংকর্তব্যবিমূঢ়
যে পারে গমন করে—পারগ
যে গমন করে না—নগ
যে ত্বরায় গমন করে—তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম্
যে বক্রভাবে গমন করে—ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম্
যে বুকে হাঁটিয়া গমন করে—উরগ
যে পূর্বজন্মের কথা মনে করিতে পারে—জাতিস্মর

যে শুনিবামাত্র মনে রাখিতে পারে—শ্রুতিধর
যে গাছ ফল পাকিবামাত্র মরিয়া যায়—ওষধি
যে গাছ অপর একটি গাছের উপর জন্মে—পরগাছা, উপবৃক্ষক
যিনি পূর্বে অধ্যাপক ছিলেন—অধ্যাপকচর
যিনি সেনায় চালনা করেন—সেনানায়ক, সেনানী
যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে—মুমূর্ষু
যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন—যুধিষ্ঠির
যিনি অতীত জানেন—অতীতবেদী
যিনি অধিক কথা বলেন না—মিতভাষী
যেখানে মাছিটি অবধি প্রবেশ করিতে পারে না—নির্মক্ষিক
বিধি অতিক্রম না করিয়া—যথাবিধি
দিবসের প্রথম ভাগ—পূর্বাহ্ণ
দিবসের মধ্য ভাগ—মধ্যাহ্ন
দিবসের শেষ ভাগ—অপরাহ্ণ
যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন—নৈয়ায়িক
যিনি স্মৃতিশাস্ত্র জানেন—স্মার্ত
যিনি ব্যাকরণ জানেন—বৈয়াকরণ
যিনি আপনাকে পণ্ডিত মনে করেন—পণ্ডিতম্মন্য
যিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন—কৃতার্থম্মন্য
যিনি পরের মুখ চাহিয়া কাজ করেন—পরমুখাপেক্ষী
দিনের আলো ও রাতের আঁধারের সন্ধিক্ষণ—গোধূলি
রাত্রির প্রথম ভাগ—পূর্বরাত্র
রাত্রির মধ্যভাগ—মধ্যরাত্র
রাত্রির শেষ ভাগ—পররাত্র
গভীর রাত্রি—নিশীথ
দিন ও রাত্রি ব্যাপিয়া—দিবারাত্র, অহোরাত্র

সন্তান হইতে ভেদ না করিয়া—অপত্যনির্বিশেষ
পুরোহিতের বৃত্তি—পৌরোহিত্য
কোন্‌টা দিক্ কোন্‌টা বিদিক্, এই জ্ঞান যাহার নাই—দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য
যাহার স্বাভাবিক বর্ণ প্রকাশ পায় না—বর্ণচোরা
যাহার স্বভাবের সহিত নামের মিল আছে—অবিসংগতনামা
যাহার গোঁফদাড়ি গজায় নাই—অজাতশ্মশ্রু
যাহার উপস্থিতবুদ্ধি আছে—প্রত্যুৎপন্নমতি
যাহার অন্য কোন সহায় নাই—অনন্যসহায়
যাহার পত্নীলাভ হয় নাই—অকৃতদার
যাহার পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছে—বিপত্নীক, মৃতদার
যাহার স্পৃহা দূর হইয়াছে—বীতস্পৃহ
যাহার কোন বিষয়ে শ্রদ্ধা নাই—বীতশ্রদ্ধ
যাহার হৃদয় শোভন—সুহৃৎ
যাহার কিছুই নাই—নিঃস্ব
যাহার প্রতিবিধান করা যায় না—অপ্রতিবিধেয়
যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে—আস্তিক
যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই—নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী
যাহার প্রভা দীর্ঘকাল থাকে না—ক্ষণপ্রভা
যাহার দুই প্রকার অর্থ হয়—দ্ব্যর্থক
যাঁহার অনেক দেখাশুনা আছে—বহুদর্শী
যাঁহার নয়ন কর্ণ অবধি বিস্তৃত—আকর্ণবিস্তৃতনয়ন
যাঁহার বাহু জানু অবধি লম্বমান—আজানুলম্বিতবাহু
যাহার ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা দেখিবার শক্তি নাই—অদূরদর্শী
যাহার পরিণামে কি হইবে তাহা দেখিবার ক্ষমতা নাই—অপরিণামদর্শী
যাহা অস্ত যাইতেছে—অস্তগামী, অস্তায়মান, অস্তোন্মুখ

যাহা মাটি ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে উঠে—উদ্ভিদ্
যাহা হইবে—ভাবী
যাহা অবশ্যই হইবে—অবশ্যম্ভাবী
যাহা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না—অনন্যসাধারণ
যাহা হৃদয়কে বিদীর্ণ করে—হৃদয়বিদারক
যাহা সারাদিন ব্যবহার করা হয়—আটপৌরে
যাহা সসম্মানে শিরে রাখিবার যোগ্য—শিরোধার্য
যাহা চাটিয়া খাইতে হয়—লেহ্য
যাহা চিবাইয়া খাইতে হয়—চর্ব্য
যাহা চুষিয়া খাইতে হয়—চুষ্য
যাহা লাফাইয়া চলে—প্লবগ, প্লবঙ্গ
যাহা মুষ্টির দ্বারা পরিমাণ করা যায়—মুষ্টিমেয়
যাহা লোকে বিদিত নয়—অলৌকিক
যাহা দ্বারা জানা যায়—বিদ্যা
যাহা দ্বারা লেখা যায়—লেখনী
যাহাতে পারিশ্রমিক শুধু দুইবেলা পেটের ভাত—পেটভাতা
যে বিচার না করিয়া কার্য করে—অবিমৃষ্যকারী
যে শত্রুকে পীড়া দেয়—পরন্তপ, অরিন্দম
যে সব সহ্য করে—সর্বংসহ
চক্ষু দ্বারা গৃহীত—গোচর, প্রত্যক্ষীভূত
অন্য ভাষায় রূপান্তরিত—অনূদিত
মনে যাহার জন্ম—মনসিজ
কুসুম ধনু যাহার—কুসুমধন্বা, পুষ্পধন্বা
গাণ্ডীব ধনু যাহার—গাণ্ডীবধন্বা
পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি যাহার—পুণ্ডরীকাক্ষ
ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় রঙ যাহার—ময়ূরকণ্ঠী
বৃহৎ অরণ্য—অরণ্যানী
অতি শীতলও নয়, অতি উষ্ণও নয়—নাতিশীতোষ্ণ
কষায় বর্ণে রঞ্জিত—কাষায়

কোথাও উন্নত, কোথাও নত—বন্ধুর, উচ্চাবচ
কোথাও হইতে যাহার ভয় নাই—অকুতোভয়
পথে বা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা—প্রত্যুদ্গমন
সাক্ষাৎ যে দেখে—প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষী
স্থান হইতে স্থানান্তরে যাহারা সর্বদা গমন করে—যাযাবর
নদীই মাতা যাহার (যে দেশের)—নদীমাতৃক
বৃষ্টির দেবতা মাতা (যে দেশের)—দেবমাতৃক
প্রথমে মধুর, কিন্তু পরিণামে নয় যাহা আপাততঃ মধুর—আপাতমধুর
যে সময়ের মধ্যে সূর্য দ্বাদশরাশি অতিক্রম করে—সংবৎসর
এক হইতে শুরু করিয়া—একাদিক্রমে
পংক্তিতে বসিবার অনুপযুক্ত—অপাংক্তেয়
আয়ুর পক্ষে হিতকর—আয়ুষ্য
বিশ্বজনের পক্ষে হিতকর—বিশ্বজনীন
সর্বজনের হিতকর—সর্বজনীন
ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার প্রীতিঘন সম্পর্ক—সৌভ্রাত্র
বর্ণমালার ক্রম বা পরম্পরা রক্ষা করিয়া—বর্ণানুক্রমিক
আদর্শ রাজা যে ভূমির—রাজন্বতী
নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে—নিদাঘ
স্বর্ণকারকে দেয় দক্ষিণা—বানি
গয়ায় বাড়ি যাহার—গয়ালী
অস্থায়ী ভাবে থাকিবার স্থান—বাসা
ছাইয়ের মত বর্ণ যাহার—খাকী
শিয়ালের মত বৃত্তি যাহার—শিয়ালে
হাতের অনুকরণ—হাতল, হাতা
বালকের অহিত—বালাই

কন্যাকালে জাত—কানীন
হেমন্তে জাত—হৈমন্তিক
চৈত্র মাসের ফসল—চৈতালি
এক মনুর শাসনকালান্তে অন্য মনুর শাসনারম্ভকাল—মন্বন্তর
হস্তী অশ্ব রথ পদাতিক-এই কয়েকটি সেনার সমাহার—চতুরঙ্গ
পা ধুইবার জল—পাদ্য
একই সময়ে বর্তমান—সমসাময়িক
স্বয়ং হয় সে—স্বয়ংভূ
ঈষদূন শিক্ষিত—শিক্ষিতকল্প
প্রায় আচার্যের ন্যায়—আচার্যকল্প
দুইয়ের মধ্যে একটি—অন্যতর, একতর
বহুর মধ্যে একটি—অন্যতম, একতম
ছোট কোষা—কুষি
ছোট ছোরা—ছুরি
যাহা তর্কবিচারের অতীত—অপ্রতর্ক্য
যেখানে মৃত-জন্তু ফেলা হয়—শল্য, ভাগাড়
যে শিক্ষা করিতেছে—শিক্ষানবীশ
যে বৃক্ষের ফুল হয় না, ফল হয়—বনস্পতি
যে সুপথ হইতে বিচলিত হইয়াছে—উন্মার্গগামী
যে নারীর হাস্য পবিত্র—শুচিস্মিতা
যাহার চোখ হইতে বারিধারা গড়াইয়া পড়ে—গলদশ্রু
যাহা প্রমাণ করা যায় না—অপ্রমেয়
যাহার মন এক বিষয়ে নিবিষ্ট—একাগ্রচিত্ত
সবচেয়ে বেশি—ভূয়িষ্ঠ
সবচেয়ে ছোট—কনিষ্ঠ
পূর্বকাল-সম্পর্কিত—প্রাক্তন

হৃদয়ের প্রীতিকর—হৃদ্য
বাঘের চামড়া—কৃত্তি
হরিণের চামড়া—অজিন
পরিব্রাজকের ভিক্ষা—মাধুকরী
সন্ন্যাস লইয়া ভ্রমণ—প্রব্রজ্যা, পরিব্রজ্যা
পিষ্ট দ্রব্যের গন্ধ—পরিমল, সৌরভ
অশ্বের ধ্বনি—হ্রেষা
হস্তীর চীৎকার—বৃংহিত, বৃংহণ
পক্ষীর কলরব—কূজন, কাকলি
ময়ূরের স্বর—কেকা
নূপুরের ধ্বনি—নিক্বণ, রুণুঝুনু
ভূষণাদির শব্দ—শিঞ্জিত, শিঞ্জন
জনরব শুনিয়া যে আসিয়া হাজির হয়—রবাহুত
হুজুর জল উঁচু বলিলে যে জল উঁচুই বলে—জলউঁচু
চৌতিশ অক্ষরের স্তব—চৌতিশা
বার মাসের (সুখ-দুঃখের) কাহিনী—বারমাস্যা
যাহা বিনা আদরে উৎপন্ন হয়—অযত্নসম্ভূত
যে অপরের আশ্রয় ছাড়া থাকে—নিরালম্ব
সন্দেহ সত্ত্বেও পারদর্শিতা—অনিশ্চিতপটুত্ব
যে তীর নিক্ষেপ করে—তীরন্দাজ
যাহা[illegible] রকমের জিনিস মিশানো—পাঁচমিশালি
[illegible] জন্মে নাই—অজাতশত্রু
[illegible] দূর করে—পাপঘ্ন
[illegible]আপনাকে হত্যা করে—আত্মঘাতী
[illegible] মায়া জানে—মায়াবী
ঋষি দ্বারা উক্ত—আর্ষ
যাহার বসন আলুগা—অসংবৃত

## অনুশীলনী

[ এক ] নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির প্রতিশব্দ লিখ :—সোনার চালনা যি[illegible] করেন; যাহা অস্ত যাইতেছে; যে মমতা জানে না; যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই; যাহার দুই হাতে চলে; ঈশ্বরে যাহার আস্থা নাই; যে সাপ খেলাইয়া জীবি[illegible] অর্জন করে; হরিণের চামড়া; হস্তীর চীৎকার; বৃহৎ অরণ্য; উপকারের ইচ্ছা; ধ্যানের যোগ্য; বাঘের চামড়া; পরিব্রাজকের ভিক্ষা; গভীর রাত্রি; নূপুরের ধ্বনি; পিষ্ট দ্রব্যের গন্ধ; অশ্বের ধ্বনি; ময়ূরের স্বর; পক্ষীর কলরব; ভূষণাদির শব্দ

যিনি পরিণাম দেখিয়া কার্য করেন না; যিনি পরের মুখ চাহিয়া কাজ করেন; যে অন্যকে পোষণ করে; শুনিবামাত্র যাহার মুখস্থ হইয়া যায়; পূর্ব জন্মের কথা যে স্মরণ করিতে পারে; বিধি অতিক্রম না করিয়া; যাহার সহিত গোত্র সমান; বর্ণমালার ক্রম বা পরম্পরা রক্ষা করিয়া; কিছুই যাহার নাই; নদীই মাতা যাহার (যে দেশের); কোথাও হইতে যাহার ভয় নাই; যাহার দুই প্রকার অর্থ হয়; যাহারা একই সময়ে একই গুরুর শিষ্য, যাহারা জলে স্থলে উভয় স্থানে বিচরণ করে; যাহা বর্ণনা করা যায় না; যাহা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে; যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে; প্রাতঃকালে যাহার নাম স্মরণ করা উচিত; পুরোহিতের বৃত্তি; জয়লাভের [illegible] হনন করিবার ইচ্ছা; সন্তান হইতে পৃথক্ না করিয়া।

**ক. বি. মাধ্যমিক '৪৬, '৪৯, (বিকল্প) '৫৩, ([illegible] '৫৭; বি. এ. '৪২, '৫০**

[ দুই ] নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ প্রকাশপূর্বক এক একটি বাক্য রচনা কর :— যাযাবর; উপচিকীর্ষা; পরিপন্থী; বেপথু; ভঙ্গুর; বহিত্র; পুষ্পধন্বা; লোকপরম্পরা; ক্ষণভঙ্গুর; অপৌরুষেয়; সর্বভুক্; সুদূরপরাহত। **ক. বি. বি. এ. '৪১, '৪২, '৪৬, '৪৯**

[ তিন ] যে কোন পাঁচটির এক একটি করিয়া শব্দ লিখ :—ময়ূরের স্বর; গোপন করিবার ইচ্ছা; চক্ষু দ্বারা গৃহীত; যে নারী প্রিয়বাক্য বলে; কোথাও উন্নত কোথাও অবনত; ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায়; অন্য ভাষায় রূপান্তরিত; যাহার কিছুই নাই; মনে যাহার জন্ম, যাহার দুই প্রকার অর্থ। **ঢা. বি. বি. এ. '৪৯**

[ চার ] নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে যে কোন পাঁচটি লইয়া তাহাদের পরিবর্তে একটিমাত্র করিয়া শব্দ বসাও এবং তাহাদের দ্বারা পৃথক্ বাক্য রচনা কর :—যে বাষ্প উদ্বমন করিতেছে; যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে; যে বিচার না করিয়া কার্য করে; প্রায় আচার্যের ন্যায়; সূর্যের উপাসনা করেন যিনি; কন্যাকালে জাত; ভগবানে যাহার বিশ্বাস আছে; সাক্ষাৎ যে দেখে; সর্বজনের হিতকর; কুসুম ধনু যাহার।

**গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫০**

[পাঁচ] নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলিকে এক একটি শব্দে পরিণত করিয়া উহাদের সার্থক প্রয়োগ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর (যে কোন পাঁচটি) :—কি করিতে হইবে নির্ণয় করিতে পারে না যে; যে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কাজ করে; অস্ত যাইতেছে এমন; যাহার দাড়ি গোঁফ উঠে নাই; যাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে; নদী যে দেশের মায়ের মতো; মুক্তি পাইতে ইচ্ছা যাহার; যাহার শত্রু জন্মে নাই; যাহা দুঃখে লাভ করা যায়; যাহা পূর্বে ছিল, কিন্তু এখন আর নাই; রোগনির্ণয়ে হাতড়াইয়া মরে যে; যাহা বলা হইয়াছে; যাহা হইবে; যাহা নিবারণ করা কঠিন; দুঃখে খাওয়া যায় যেখানে; পূর্বে যাহা ছিল; বাবুর মত আচরণ; পট আঁকে যে; সে জানিতে ইচ্ছুক। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৬, '৫৮**

# চতুর্থ অধ্যায়

## বাক্যসংযোজন ও বাক্যবিয়োজন

### বাক্যসংযোজন

পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অথচ বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলীর সংযোজন তথা একবাক্যে পরিণত করিতে হইলে কোন বাক্যকে সমাসবদ্ধ, কোন বাক্যকে তদ্ধিত পদে, কোন বাক্যকে কৃদন্তপদে, আবার কোথাও-বা সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করিতে হয়। সময়ে সময়ে আপেক্ষিক অব্যয়পদ বর্জনও বিধেয়। তবে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, **সংযুক্ত বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য বা কর্তা এবং একটিমাত্র বিধেয় বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকিবেই ঃ** যেমন,—

(ক) নাবিকেরা নৌকা সামলাইতে পারিল না। প্রবল জলপ্রবাহ-বেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে যাইতে লাগিল। একজন আরোহী কহিল, 'নবকুমার রহিল যে।' একজন নাবিক কহিল, 'আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।' **ক. বি. মাধ্যমিক '৪৬**

উত্তর। নৌকা সামলাইবার ব্যাপারে নাবিকগণের অক্ষমতাবশতঃ প্রবল জলপ্রবাহ-বেগে রসুলপুর নদীর মধ্যে তাড়িত তরণীর একজন আরোহী পরিত্যক্ত নবকুমার সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করিলে একজন নাবিক বিরক্তিব্যঞ্জক কণ্ঠে শৃগালভক্ষ্য হইয়া নবকুমারের নিধন-সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিল।

(খ) আজকাল অনেকে জনসাধারণের হীন অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। যাহাতে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি পড়িতেছে; জনসাধারণের শিক্ষা দিবার কথা উঠিয়াছে। বড় আহ্লাদের কথা। **ক. বি. মাধ্যমিক '৪৬ (কলিকাতা কেন্দ্র)**

উত্তর। জনসাধারণের ভীতিপ্রদ হীনাবস্থা দেখিয়া, তাহাদের উন্নয়নের দিকে আজিকালি অনেকের দৃষ্টি পড়ায়, জনসাধারণের শিক্ষামূলক প্রসঙ্গের উত্থাপন সত্যই বড় আহ্লাদের কথা।

(গ) তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর একটা আসিল। তারপর আর একটা আসিল। কত আসিল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই গৃহ নিশীথশ্মশানের মত ভয়ংকর হইয়া উঠিল।

**ক. বি. মাধ্যমিক '৪৬ (মফঃস্বল কেন্দ্র)**

উত্তর। তখন প্রথম ছায়ার পাশে তাহারই প্রতিচ্ছায়া একটির পর একটি করিয়া আরও কত আসিয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে থাকায় সেই গৃহ নিশীথশ্মশানের মত ভয়ংকর হইয়া উঠিল।

(ঘ) সেই রজনী শুভ্র জোৎস্নাপ্লাবিত ছিল। উহা রজনীগন্ধা, চম্পক, পারুল এবং কুন্দকুসুমে ভূষিত ছিল। উহা বহু সুহৃৎ-সমাগমে মুখরিত ছিল। সেই রজনী আমাদের স্মৃতিপথে চিরদিন বিরাজিত থাকার যোগ্য। **ক. বি. বি. এ. '৩৬**

উত্তর। রজনীগন্ধা-চম্পক-পারুল-কুন্দকুসুম-ভূষিত, বহু-সুহৃৎ-সমাগম-মুখরিত সেই শুভ্র জোৎস্না-প্লাবিত রজনী আমাদের চিরস্মরণীয়।

## বাক্যবিয়োজন

যে-ভাব একটিমাত্র বাক্যের মধ্যে ধৃত আছে, তাহাকে পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত অথচ বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলীতে প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহাকেই বলা হয় বাক্য-বিয়োজন। এক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ, তদ্ধিত, কৃদন্ত পদসমূহকে বিভিন্ন বাক্যে এবং অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করিতে হয়। প্রয়োজনমতে, আপেক্ষিক অব্যয় পদ-সংযোগও বিধেয়ঃ যেমন,—

'সুশীল লক্ষ্মণ ইহা দেখিয়া-শুনিয়া দুঃখে নিতান্ত কাতর ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া অবিরল-ধারে বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং রামচন্দ্রের অদৃষ্টচর ও অভূতপূর্ব লোকানুরাগপ্রিয়তাই এই অভূতপূর্ব অনর্থের মূল, ইহা ভাবিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণপ্রায় হইয়া কহিতে লাগিলেন, "যদি ইতিপূর্বে আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে এই লোক-বিগর্হিত ও ধর্ম-বিবর্জিত বিষম কাণ্ড দেখিতে হইত না।"

উত্তর। সুশীল লক্ষ্মণ ইহা দেখিলেন ও শুনিলেন। তিনি দুঃখে কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি শোকে একান্ত অভিভূত হইলেন। তাই তিনি অবিরলধারে বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের লোকানুরাগপ্রিয়তা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। এই লোকানুরাগপ্রিয়তার কথা পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই। এই লোকানুরাগপ্রিয়তাই অনর্থের মূল। এইরূপ অনর্থ ইতিপূর্বে কখনও ঘটে নাই। ইহার কথা তিনি ভাবিতে লাগিলেন। ফলে তিনি যার পর নাই বিষণ্ণ ও ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। তাই তিনি কহিতে লাগিলেন, "এই বিষম কাণ্ড জনগণের নিন্দার যোগ্য। ইহাতে ধর্ম নাই। ইতিপূর্বে আমার মরণ হওয়া ভাল ছিল। কারণ তাহাতে এহেন কাণ্ড দেখিতে হইত না।"

## অনুশীলনী

[ এক ] বাক্যসংশ্লেষণ কর:—আমি তোমার বাড়িতে যাইব। তারপর তথায় আহার করিব। দুই প্রহরের পর পর্যন্ত তোমার বাড়িতে অপেক্ষা করিব। শেষে নদীতীরে বেড়াইতে যাইব। **ক. বি. মাধ্যমিক '৩০**

[ দুই ] বাক্যবিয়োজন কর:—'তবুও কেমন করিয়া জানি না এই ভস্মাকীর্ণ মহাশ্মশানপ্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটি অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।'

# পঞ্চম অধ্যায়

## বাক্যবিন্যাসে সাধু ও কথ্য রীতি

প্রায় হাজার বছর আগে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা গদ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। অবশ্য ইহারও আগে দলিল-দস্তাবেজে, চিঠিপত্রে, দৈনন্দিন জীবনের ভাব-বিনিময়ের ব্যাপারে বাংলা গদ্যরীতির প্রচলন ছিল। পদ্যচ্ছন্দে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ধরিতে গেলে, বাংলা গদ্যের বয়স দেড়শত বছরের বেশি নয়। নিখিল বিশ্বের সমুন্নত ভাষাসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, ইহার রূপ নানাভাবে বিকশিত হইয়াছে। মোটামুটি ভাবে ভাষার দুইটি রূপ—একটি, সাহিত্যিক রূপ, অপরটি, প্রাত্যহিক প্রয়োজনানুগ রূপ। পৃথিবীর অপরাপর ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষাও সাহিত্যিক রূপ বা রীতি এবং ব্যবহারিক তথা কথ্য রূপ বা রীতি লাভ করিয়াছে। **সাহিত্যিক বা** '**লেখ্য ভাষা** সচরাচর বহু শ্রোতা বা পাঠকের উদ্দেশ্যে লিখিত হয় তাই ইহার ছাঁদ কথ্য ভাষার ধরণ হইতে কতকটা স্বতন্ত্র রকমের, অনেকটা প্রাচীন আদর্শের হইয়া থাকে। কথ্য **ভাষায়** স্থান এবং গোষ্ঠীবিশেষে কমবেশি স্বতন্ত্রতা থাকে; কিন্তু লেখ্য ভাষায় কথ্য ভাষার মৌলিক, সর্বজনীন রূপটিই পরিগৃহীত হয়। **সাধু ভাষা** বা **মার্জিত ভাষা** লিখিবার ভাষা।'

### উপভাষা হইতে ভাষার বিবর্তন

পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ লইয়া এই যে সমগ্র বাংলা দেশ, এখানকার অঞ্চলভেদে বাংলা ভাষার বিভিন্ন মৌখিক বা কথ্য রীতি প্রচলিত। বাংলা ভাষারই অন্তর্গত ছোট ছোট দল বা অঞ্চলবিশেষে যে প্রচলিত রূপান্তর দেখা যায়, তাহার নাম **উপভাষা**। 'ভৌগোলিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি কারণে ভাষা হইতে যেমন উপভাষার উদ্ভব হইয়া থাকে, তেমনি নানা কারণে কোন একটি উপভাষা শক্তিশালী হইয়া অপর উপভাষাগুলিকে আওতায় ফেলিয়া বা বিনষ্ট করিয়া ভাষায় পরিণত হইতে পারে।...যেখানে একাধিক উপভাষা আছে সেখানে ভাষার, অর্থাৎ লেখাপড়ার ভাষার, মূলে থাকে একটি বিশেষ উপভাষা; তাহার মধ্যে অন্যান্য উপভাষাগুলির শব্দ বা বিশিষ্ট প্রয়োগ বা ঈডিয়ম কমবেশি আসিয়া যায়।...যে-যে কারণে কোন একটি বিশেষ উপভাষা ভাষায় উন্নীত হয় তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে সেই উপভাষায় উন্নত সাহিত্যের সৃষ্টি,......অপর প্রধান কারণ হইতেছে, অঞ্চল-

বশেষের রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি।...... এমনি করিয়াই পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা বাংলা ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমনি করিয়াই কলিকাতার উপভাষা আজ মগ্র বাঙালী শিক্ষিত সমাজের কথ্য ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন বাংলার ধিকাংশ কবি পশ্চিমবঙ্গের লোক ছিলেন, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষাই বাংলা হিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত য়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গদ্যরচনার প্রথা চলিত হয় এবং বাংলা াধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকগণ প্রায় সকলেই পশ্চিমবঙ্গের সন্তান, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা হইতে জাত বাংলা সাহিত্যের ভাষার পক্ষে বাংলা সাধুভাষায় পরিণত হইতে কোনই বাধা রহিল না। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলিলে চলিবে না যে, অন্য উপভাষার প্রভাব বাংলা সাহিত্যের ভাষায় মোটেই পড়ে নাই।'

## সাধু ও কথ্য রীতি

বর্তমানে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক অথবা সাধু রীতির পাশাপাশি বাংলা দেশের বহুবিচিত্র আঞ্চলিক ভাষা উপভাষা থাকিলেও বাংলার সাম্প্রতিক শিক্ষিত সমাজে কথ্য ভাষারও একটা শিষ্ট রীতি উদ্ভূত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, বীরবল হইতে শুরু করিয়া অতি-আধুনিক কালের বহু খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাগণ এই কথ্য ভাষার শিষ্ট রীতির পক্ষপাতী। ফলে কথ্য ভাষার শিষ্ট রীতি আজিকার বাংলা সাহিত্যে লেখ্য ভাষা হিসাবে এমন দৃঢ়রূপে তাহার স্থান করিয়া লইতেছে যে, বাংলা ভাষার সাধু রীতি বুঝিবা অদূরভবিষ্যতে তাহার সহিত আঁটিয়াই উঠিতে পারিবে না। কলিকাতা অঞ্চলের এবং ভাগীরথী-তীরবর্তী স্থানের শিক্ষিত জনগণের মৌখিক ভাষা বর্তমানে বাংলা কথ্য ভাষার শিষ্ট রূপ গঠনে সহায়তা করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আজিকার বাংলা সাহিত্যে বাংলা বাক্যবিন্যাসের যে দুইটি রূপ কমবেশি ভাবে চলিতেছে, তাহার একটি হইতেছে সাধু রীতির ( Standard literary style ) এবং অপরটি হইতেছে কথ্য বা মৌখিক রীতির ( Standard colloquial style )।

বাংলা ভাষার সাধু এবং চলিত রীতির মধ্যে যে তারতম্য ও পারস্পরিক প্রভাব দেখা যায়, তাহা মোটামুটি এইরূপ :—[ এক ] উভয় রীতির সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের রূপের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সাধু রীতিতে সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদগুলির পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হইলেও চলিত রীতিতে উহাদের বেশ খানিকটা সংকোচ সাধিত হয় : যেমন,—সাধু রীতিতে প্রচলিত 'আসিয়াছি, শুনিবে, গাহিলাম' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ এবং 'ইহারা, তাহাতে' প্রভৃতি সর্বনামপদ চলিত রীতিতে হয় 'এসেছি, শুনবে, গাইলাম' এবং এরা,

তাতে'। [ দুই ]·· বাংলা ভাষার সাধু রীতিতে অবশ্য চলিত রীতিতে ব্যবহৃত সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদ পরিলক্ষিত হয়ঃ যেমন:—'আশুতোষকে বিশ্বতোষ চেনে, সে-ও আমি জানি।' এখানে বিশুদ্ধ সাধু রীতিতে 'চেনে'র পরিবর্তে 'চিনে', 'সে-ও-এর পরিবর্তে 'তাহা-ও' ব্যবহৃত হওয়া সমীচীন। [ তিন ] সাধু রীতির চেয়ে চলিত রীতিতে স্বরসংগতি অভিশ্রুতি-মূলক স্বরধ্বনির পরিবর্তন সমধিক লক্ষি হয়। [ চার ] সাধু রীতিতে তৎসম শব্দের ঘনঘটা বড়ই বেশি, কিন্তু চলিত রীতিতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ বড়ই অল্প। বিদেশী শব্দ সাধু রীতি অপেক্ষা চলিত রীতিতেই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। [ পাঁচ ] সাধু রীতি খানিকটা কৃত্রিম সত্য, এবং কৃত্রিম এইজন্য যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কথোপকথনের সঙ্গে ইহার সংগতি নাই। তবু এই রীতির যে গাম্ভীর্য এবং আভিজাত্যজনিত সৌষ্ঠব আছে তাহাকে অস্বীকার করা চলে না। পক্ষান্তরে, চলিত রীতি সাধু রীতির চেয়ে জীবন্ত হইলেও হাল্‌কা চালে ইহা চলে এবং প্রাত্যহিক মৌখিক আলাপ-আলোচনার রীতির সঙ্গে ইহার সংগতি বড়ই নিবিড়। 'The real and natural life of language is in its dialects.'—Maxmuller-এর এই উক্তিটি যে একান্তভাবে সত্য, ইহা বাংলা ভাষার চলিত বা কথ্য রীতি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই অনুভূত হয়। বাংলা বাক্যবিন্যাসের সাধু রীতি এবং চলিত রীতির উদাহরণ এইরূপ।

### সাধুরীতির উদাহরণ

'আর্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ জলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত অধিত্যকা-প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সততস্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।'

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

### কথ্য বা চলিত রীতির উদাহরণ

'যারা ভারি পণ্ডিত তারা সুন্দরকে প্রদীপ ধ'রে দেখতে চলে আর যারা কবি ও রূপদক্ষ তারা সুন্দরের নিজেরই প্রভায় সুন্দরকে দেখে' নেয়, অন্ধকারের মধ্যে অভিসার করে তাদের মন। আলোর বেলাতেই কেবল সুন্দর আসেন দেখা দিতে কালোর দিক থেকে তিনি দূরে থাকেন—একথা একেবারেই বলা চল্ল না, বিষ অন্ধকার না ব'লে ব'লতে হ'ল বিশদ অন্ধকার—যদিও ভাষাতত্ত্ববিদ্ এরূপ কথা দোষ দেখবেন। কালো দিয়ে যে আলো এবং রঙ সবই ব্যক্ত করা যায় সুন্দরভাবে তা রূপদক্ষ মাত্রেই জানেন। এই যে সুন্দর কালো, এর সাধনা বড় কঠিন।'—অবনীন্দ্রনাথ

## অনুশীলনী

[এক] বাংলা কথ্য ভাষা, সাধু ভাষা ও উপভাষা লইয়া একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা লিপিবদ্ধ কর। ক. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫৭

[দুই] নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলিকে সাধু রীতি হইতে কথ্য রীতিতে, নয় কথ্য রীতি হইতে সাধু রীতিতে পরিবর্তিত কর :—

(ক) একদা মধুমাসের সমাগমে কমলবন বিকশিত হইলে; চূত-কলিকা অঙ্কুরিত হইলে; মলয়মারুতের মন্দ মন্দ হিল্লোলে আহ্লাদিত হইয়া কোকিল সহকার-শাখায় উপবেশনপূর্বক সুস্বরে কুহুরব করিলে; অশোক কিংশুক প্রস্ফুটিত, বনমুকুল উদ্গত এবং ভ্রমরের ঝংকারে চতুর্দিক প্রতিশব্দিত হইলে, আমি মাতার সহিত এই অচ্ছোদসরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিলাম। ক. বি. মাধ্যমিক '২৭

(খ) ভ্রাতৃগণ! শ্রবণ কর; আমাদের পূর্বে ইক্ষ্বাকুবংশে যে মহানুভব নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অপ্রতিহতপ্রভাবে প্রজাপালন ও অশেষবিধ অলৌকিক কর্মসমুদায়ের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পবিত্র রাজবংশকে ত্রিলোকবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। ক. বি. মাধ্যমিক '২৭

(গ) "দিব্য লাবণ্য-পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্বচনীয় সুধাময় কিরণ বিকিরণপূর্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও-বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ বিতরণ করিতেছিলেন।"

ক. বি. মাধ্যমিক '৪৫

(ঘ) সেবার মাহেশে রথ দেখ্‌তে গিয়ে এমন ফ্যাঁসাদে পড়া গিছলো যে সে আর কহতব্য নয়। এক বাবু তাঁর তিন ইয়ার নিয়ে মোদের নায়ে চড়লেন আর নাওখানি সেই মোটাসোটা বাবুদের ভীষণ চাপে ডুব্‌তে ডুব্‌তে রয়ে গেল। তাই না দেখে সেই ভদ্রবেশী বাবুর দল হি হি করে হাসতে শুরু করে দিলেন।

ক. বি. মাধ্যমিক '৩৫

(ঙ) "আজ কি কাণ্ড বাধিয়ে ব'সে আছে। কারু মানা শুনবে না। যেখানে যত হতভাগা আছে, দেখ্‌লেই তার দিকে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে। আজ বৌ-ঠান আমাকে না-হক্ দশ কথা শুনিয়ে দিলেন।" ক. বি. মাধ্যমিক '৪৫

(চ) ছেলেটি দলে পড়ে একেবারে বিগ্‌ড়ে গেছে। নাই দিয়ে মাথায় তুলে এখন গোল্লায় গেল বলে বুক চাপড়ালে চলবে কেন?

ক. বি. মাধ্যমিক (কলিকাতা কেন্দ্র) '৪৬

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## বাক্যে ছেদচিহ্নের প্রয়োগ-বিধি

### কমা বা প্রথম ছেদের ( , ) ব্যবহার

"১"—এই সংখ্যাটির উচ্চারণে যেটুকু সময় লাগে, ঠিক ততটুকু সময়ই 'কমা-চিহ্ন' জিহ্বাকে বিরাম দিয়া থাকে। (ক) যখন একটি বিশেষ্য পদকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আর একটি বিশেষ্য পদ বসে, তখন শেষের বিশেষ্য পদের আগে-পিছে কমা বসে: যেমন,—দিল্লী, ভারতের রাজধানী, ইতিহাস বিখ্যাত নগরী। (খ) পর পর কয়েকটি অসমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে, তাহাদের প্রত্যেকটিরই পরে কমা বসানো হয়: যেমন,—আমি ইস্কুলে যাইয়া, প্রধান শিক্ষকমহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া, দোকানে যাইব। (গ) বাক্যের গোড়াকার ক্রিয়া-বিশেষণের পরে কমা বসে: যেমন,—বাস্তবিক, মহাত্মা গান্ধী অহিংসা-মন্ত্রের পূজারী ছিলেন। (ঘ) সম্বোধন-সূচক পদের পরে কমা বসে: যেমন,—নন্দ, এখন ওখানে যেয়ো না। (ঙ) প্রত্যক্ষ উক্তির উদ্ধরণ-চিহ্নের আগে কমা বসানো হয়: যেমন,—বীণার মা বলিলেন, "আজ বীণা নিমন্ত্রণ খাইতে পারিবে না।" (চ) ঠিকানা লিখিবার বেলায় কমার ব্যবহার হয়: যেমন,—৬১১ বি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬। (ছ) একই জাতের কয়েকটি বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়া ঠিক পর পর থাকিলে, কমা বসে: যেমন,—মিনতি, প্রণতি, বিনতি ইস্কুলে গিয়াছে। দিন যায়, রাত্রি যায়, আয়ু হয় ক্ষীণ। (জ) সহজবোধ্য করিবার জন্য মিশ্র ও যৌগিক বাক্যের ভিতরে কমা দিয়া ছোট ছোট বাক্য আলাদা করিয়া দেখানো হয়: যেমন,—যখন আমি ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, তখন ট্রেন ছাড়িয়া দিল। হরি নির্বোধ বটে, কিন্তু মিথ্যাবাদী নয়। (ঝ) কাহারও নামের শেষে উপাধি জুড়িতে হইলে উপাধির আগে কমা বসাইতে হয়: যেমন,—ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. লিট্।

### সেমিকোলন বা দ্বিতীয় ছেদের ( ; ) ব্যবহার

সেমিকোলনে কমার ডবল সময় জিহ্বাকে বিরাম দিতে হয়। (ক) দুই অথবা ততোঽধিক বাক্যের মধ্যে অর্থের নিকট-সম্পর্ক থাকিলে সেমিকোলন বসাইয়া তাহাদিগকে পৃথক্ করা হয়: যেমন,—পানু পড়াশুনা একেবারে করে না; পরীক্ষায় তাহার পাশ করিবার আশা নাই। (খ) পর পর রচিত বাক্যগুলির মধ্যে যখন একই ভাব বিদ্যমান অথচ কমা বা দাঁড়ির কোনটি বসে না, তখন সেমিকোলন হয়: যেমন,—গত তিন দিন হইতেই শরীরটা ভাল নয়; জ্বর ছাড়িয়া আবার জ্বর আসে।

**দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদের ( । ) ব্যবহার**

যেখানে বাক্য একেবারে শেষ হইয়া যায়, সেখানে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ বসে : যেমন,—আমি ওখানে যাইব না।

**কোলন ( ঃ ) এবং কোলন ড্যাশের ( ঃ— ) ব্যবহার**

( ক ) কমা ও সেমিকোলনের চেয়ে বেশি সময় বিরাম বুঝাইতে হইলে কোলনের ব্যবহার ঘটে, তবে বাংলায় ইহার ব্যবহার কদাচিৎ করা হয় : যেমন,—অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐ-কার হয় : ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। ( খ ) কোন-কিছুর উদাহরণ দিবার ক্ষেত্রে অথবা পূর্বলিখিত কোন বিষয়কে স্পষ্ট করিয়া জানাইতে হইলে কোলন-ড্যাসের ব্যবহার হয় : যেমন,—পদ পাঁচ প্রকার ঃ—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়।

**প্রশ্নবোধক চিহ্নের ( ? ) ব্যবহার**

( ক ) প্রশ্ন করিতে হইলে বাক্যের শেষে এই চিহ্ন বসাইতে হয় : যেমন,—তুমি কোন্ পাড়ায় থাক ? ( খ ) প্রশ্নের ভাব বুঝাইতে একটিমাত্র শব্দেরও পরে এই চিহ্ন বসে : যেমন,—মরণ ? মরণ কি আর বিধবার কপালে আছে ? ( গ ) সন্দেহ অথবা শ্লেষ বুঝাইতে এই চিহ্ন বসানো হয় : যেমন,—তোমার এই গবেষণাটি ( ? ) ছাপাইবে না কি ?

**বিস্ময়সূচক চিহ্নের ( ! ) ব্যবহার**

( ক ) ভয়, বিস্ময়, হর্ষ, বিষাদ, ঘৃণা প্রভৃতি প্রকাশক অব্যয়শব্দের পরে এবং বাক্যের শেষে এই চিহ্ন বসাইতে হয় : যেমন,—ছি ! ছি ! তোমার এই কাজ ! ( খ ) ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্বোধনপদের পরে এই চিহ্ন বসানো হয়। যেমন,—প্রভো ! আমায় রক্ষা করুন।

**উদ্ধরণ-চিহ্নের (" ") ব্যবহার**

( ক ) বক্তার বক্তব্য কোন বাক্যের ভিতরে অবিকল উদ্ধৃত করিতে হইলে উদ্ধরণ-চিহ্নের প্রয়োগ হয় : যেমন,—ঠাকুরদামশাই দুই এক টান টানিয়া বলিতেন, "বেশ ভাই, বেশ তামাক।"—রবীন্দ্রনাথ। ( খ ) অন্য লেখকের মন্তব্য কোন বাক্য বা অনুচ্ছেদের মধ্যে যদি কেহ অবিকল উদ্ধৃত করিতে চাহেন, তাহা হইলে উদ্ধরণ চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয় : যেমন,—মোগল বাদশাহেরা 'সমুদয় মানবজাতির স্বর্গতুল্য বঙ্গভূমি" বলিয়া অনুশাসনপত্রে যাহার উল্লেখ করিতেন, সে স্বর্গ এখন গৌরবচ্যুত।—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ( গ ) প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে উদ্ধৃত বাক্য বা বাক্যাংশের আগে কেবলমাত্র ড্যাশ ( — ) অথবা কমা ও ড্যাশ ( ,— ) অথবা

শুধু কমা-চিহ্ন ( , ) বসাইয়াও অর্থাৎ উদ্ধরণ-চিহ্ন একেবারে ব্যবহার না করিয়াও উদ্ধরণচিহ্নের কাজ করা যায়ঃ যেমন,—অপু বলিল—হোক্‌গে ঝড়, ঝড়েই তো ভালো, চল আরও যাই। —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠানের গাছ, বাবুমশায় ! —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

**বন্ধনীর [ ( ) ] ব্যবহার**

বাক্যের ভিতরকার পদ বা পদসমষ্টির ব্যাখ্যার ব্যাপারে বন্ধনী বসানো হয়ঃ যেমন,—পণ্ডিতমহাশয় শাস্ত্রগ্রন্থাদি ( ন্যায়, স্মৃতি, মীমাংসা, উপনিষদ প্রভৃতি ) পড়েন।

**লোপচিহ্নের ( ' ) ব্যবহার**

পদমধ্যবর্তী কোন অক্ষরের লোপ হইলে এই চিহ্নের ব্যবহার হয়ঃ যেমন,—আমি এখন বাড়ি যা'ব না। এখানে লোপচিহ্নটি 'ই' অক্ষরের লোপ বুঝাইতেছে।

**সংযোগচিহ্নের ( - ) ব্যবহার**

এই সংযোগচিহ্নটি—যাহাকে ইংরাজিতে বলা হয় হাইফেন—দুই বা ততোঽধিক পদের সংযোগ বুঝায়, সমাসবদ্ধ পদে সংযোগচিহ্নের ব্যবহার সুপ্রচলিতঃ যেমন,—রূপ-রস-গন্ধস্পর্শ।

## অনুশীলনী

যথাস্থানে ছেদচিহ্ন বসাওঃ—

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঁচিশ দিন পূর্বের কথা যুধিষ্ঠির সকালবেলা তাঁর শিবিরে বসে আছেন সহদেব তাঁকে সংগৃহীত রসদের ফর্দ পড়ে শোনাচ্ছেন এমন সময় প্রতিহার এসে জানালে ধর্মরাজ এক অভিজাতকল্প কুব্জপুরুষ আপনার দর্শনপ্রার্থী পরিচয় দিলেন না বললেন তাঁর বার্তা অতি গোপনীয় সাক্ষাতে নিবেদন করবেন

যুধিষ্ঠির বললেন এখনই তাঁকে নিয়ে এস

আগন্তুক বক্রপৃষ্ঠ প্রৌঢ় বলিকুঞ্চিত শীর্ণ মুণ্ডিত মুখ মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী গলার নীলবর্ণ হার পরণে ঢিলে ইজের তার উপর লম্বা জামা যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন কে আপনি সৌম্য

আগন্তুক উত্তর দিলেন মহারাজ ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন আমার বক্তব্য কেবল রাজকর্ণে নিবেদন করতে চাই

যুধিষ্ঠির বললেন সহদেব তুমি এখন যেতে পার

সহদেব বিরক্ত হয়ে সন্দিগ্ধমনে চলে গেলেন

[ —রাজশেখর বসু রচিত 'তৃতীয় দ্যূতসভা' গল্প হইতে উদ্ধৃত। ]

## ষষ্ঠ পর্ব
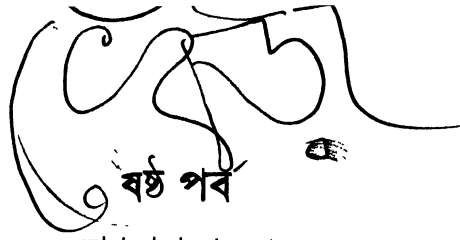
## বাগ্‌ধারা-প্রকরণ

## প্রথম অধ্যায়

### পদাদির শিষ্ট প্রয়োগ

### বিশেষ্যপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

**মন**

(১) মন উঠা [ তুষ্ট হওয়া ]—মেয়েটি এত আদুরে যে কিছুতেই তার মন উঠে না। (২) মন যোগানো [ খুশি রাখা ]—আপিসের বড় বাবুর মন যুগিয়ে চল্‌লে তোমার ভালই হবে। (৩) মন হওয়া [ ইচ্ছা হওয়া ]—মন হয়েছে বলে এবার পুরীভ্রমণে যাচ্ছি। (৪) মন করা [ সংকল্প করা ]—আমি দ্বারভাঙ্গায় যেতে মন করছি। (৫) মন লাগানো [ মন দেওয়া ]—পড়ায় সে মন লাগায় না। (৬) মন যাওয়া [ পছন্দ হওয়া ]—যাতেই মন যায়, তাই সে করে। (৭) মন রাখা [ বাহ্য ভালবাসা বজায় রাখা ]—ছেঁদো কথায় মন রাখ্‌তে চাও! (৮) মন পোড়া [ অন্তর্দাহ হওয়া ]—পুত্রের মৃত্যুতে মাতার মন পোড়ে। (৯) মনে ধরা [ পছন্দ হওয়া ]—অধিবাসের ডালা কনেপক্ষের মনে ধরেছে। (১০) মনে আনা [ স্মরণ করা ]—তোমার শৈশবকালের সেই কচি মুখখানিকে কিছুতেই মনে আন্‌তে পারছি না।

**মাথা**

(১) মাথা দেওয়া [ মৃত্যু বরণ করা ]—দেশের জন্য ক্ষুদিরাম মাথা দিয়েছেন। (২) মাথা ধরা [ মাথা ভারি মনে হওয়া ]—সর্দিতে মাথা ধরেছে। (৩) মাথা ঠেকানো [ প্রণাম করা ]—দেশের মাটিতে মাথা ঠেকাই। (৪) মাথা খাওয়া [ সর্বনাশ করা ]—নাই দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছ। (৫) মাথা কোটা [ দুঃখে মাটিতে মাথা ঠোকা ]—স্বামীর গঞ্জনাবাক্য শুনে অভিমানিনী স্ত্রী মাথা কুটতে লাগ্‌লেন। (৬) মাথা কাটা যাওয়া [ খুব লজ্জা পাওয়া ]—চুরির দায়ে পুত্রের কারাবাস হওয়ায় পিতার মাথা কাটা গেল। (৭) মাথায় ওঠা [ অযথা প্রশ্রয় পাওয়া ]—প্রশ্রয় দিলে ঝি-চাকর মাথায় ওঠে। (৮) মাথায় ঢোকা [ বোধগম্য হওয়া ]—আমার উপদেশ রবীনের মাথায় ঢোকে নাই।

**চোখ**

(১) চোখ টাটানো [ পরশ্রীকাতর হওয়া ]—বাঙ্গালী এমনই জাত যে, প্রতিবেশীর উন্নতি দেখ্‌লেই তার চোখ টাটায়। (২) চোখ খোলা, চোখ ফুটা, [ প্রকৃত অবস্থা বোঝা ]—গত দশ বছর ধ'রে আত্মীয়পোষণ করবার পর আজ্‌কের এই ঘটনায় আমার চোখ খুলেছে ( বা চোখ ফুটেছে )। (৩) চোখ উঠা [ চক্ষুরোগবিশেষ হওয়া ]—তার চোখ উঠেছে। (৪) চোখ খাওয়া, চোখের মাথা খাওয়া [ কানা বা অন্ধ হওয়া ]—আ মোলো! চোখ খেয়েছিস্ ( বা চোখের মাথা খেয়েছিস্ ) নাকি! (৫) চোখ রাঙানো [ রাগ দেখানো ]—চোখ রাঙিয়ে ছেলেকে কখনও বশে রাখা যায় না। (৬) চোখ রাখা [ দৃষ্টি রাখা ]—আমি ফিরে না আসা অবধি জিনিসগুলোর দিকে একটু দয়া করে চোখ রাখবেন। (৭) চোখ ঠারা [ চোখ নেড়ে ইসারা করা ]—সর্বসমক্ষে রেগে উঠতেই সে আমায় শান্ত হবার জন্য চোখ ঠারতে লাগল।

**দাঁত**

(১) দাঁত ফুটানো [ সমাধান করা ]—পরীক্ষার প্রশ্নগুলো এত কঠিন হয়েছে যে দাঁত ফুটানো যায় না। (২) দাঁত খিঁচানো [ উষ্মা প্রকাশ করা ]—ভাল কথা বললেও কোপনস্বভাব ব্যক্তি দাঁত খিঁচিয়ে থাকে। (৩) দাঁত লাগা [ মূর্ছাপন্ন হওয়া ]—যখনই সে খুব উত্তেজিত হয়, তখনই তার দাঁত লাগে। (৪) দাঁত ওঠা [ দন্তোদ্‌গম ]—শিশু সাধনের দাঁত যখন ওঠে তখন তার বয়স মাস ছয়েক। (৫) দাঁত বসানো [ কামড়ানো ]—রামবাবুর কুকুরটি হঠাৎ আমার পায়ে দাঁত বসিয়ে দিল। (৬) দাঁত ভাঙা [ দর্পচূর্ণ করা ]—আমি তার দাঁত ভাঙব। (৭) দাঁত পড়ে যাওয়া [ বৃদ্ধ হওয়া ]—তাঁর দাঁত পড়ে গিয়েছে।

**বুক**

(১) বুক দিয়া পড়া [ পরোপকার করা ]—পাড়াপ্রতিবেশীর আপদে-বিপদে একমাত্র নীরেনবাবুকেই বুক দিয়ে পড়তে দেখা যায়, অপর কাউকেই দেখা যায় না। (২) বুক ফাটা [ দুঃখে হৃদয় ভেঙে যাওয়া ]—বাংলা দেশের মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফুটে না। (৩) বুক ফোলানো [ গর্বপ্রকাশ ]—পুত্রের চাকরি পাওয়ার সংবাদে পিতার বুক ফুলে উঠল। (৪) বুক বাঁধা [ বিপদে মন দৃঢ় করা ]—দুঃখের রাতে যদি বুক বাঁধো, তবেই না সুখের দিন দেখবে। (৫) বুক ঠোকা [ সাহস প্রকাশ ]—বন্দুক হাতে নিয়ে বুক ঠুকে সে একাই সশস্ত্র ডাকাতদলের পিছু ধাওয়া করল। (৬) বুক বাড়া [ সাহস বৃদ্ধি হওয়া ]—মায়ের আদরে ছেলের বুক বেড়েছে। (৭) বুক ভাঙা [ সাহসহীন হওয়া ]—মায়েরমৃত্যুতে ছেলের বুক ভেঙেছে।

**মুখ**

(১) মুখ করা [ভৎর্সনা করা]—মাতা পুত্রের দুর্ব্যবহারে মুখ করতে লাগলেন। (২) মুখ চাওয়া [কাহারও নিমিত্ত অপেক্ষা করা বা কাহাকেও খাতির করা]—বেলা বারোটা অবধি আমি তার মুখ চেয়ে রইলাম, তবু তার পাত্তা পেলাম না! মনে করো না যে, আমি সুধীরবাবুর মুখ চেয়ে তাঁকে কম দামে জিনিস বেচেছি। (৩) মুখ রাখা [মান রাখা]—ছাত্রটি পাশ করে আমার মুখ রেখেছে। (৪) মুখ খাওয়া [বকুনি খাওয়া]—পুত্রবধূ প্রতিদিনই শাশুড়ীর মুখ খায়। (৫) মুখ ছুটা [অসংযত ভাষা ব্যবহার করা]—ছোট লোকের মত মুখ ছুটিও না। (৬) মুখ তাকানো [মুখাপেক্ষা করা]—তার মুখ তাকিয়ে কোন লাভ নেই। (৭) মুখ ফোটা [কথা বাহির হওয়া]—বেকায়দায় পড়লে নিরীহ ছেলেরও মুখ ফোটে। (৮) মুখ চলা [ভক্ষণ করা]—হাভাতের বেটার আজ দেখছি সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি মুখ চল্‌ছেই। (৯) মুখ লাগা [মুখ কুট্‌কুট্ করা]—বুনো ওল খেয়ে এমনই মুখ লেগেছে যে, আর কিছুই ভাল লাগছে না। (১০) মুখ দেখা [আশীর্বাদের জন্য দেখা]—ভাবী শ্বশুর কনের মুখ দেখে একটি স্বর্ণহার দিলেন। (১১) মুখ চুন করা [লজ্জাদিতে মুখ পাঁশুটে হওয়া]—টাকাটি হারিয়ে রমেন মুখ চুন করে রয়েছে।

**হাত**

(১) হাত গোনা [ভবিষ্যৎ গণনা করা]—আমাদের পাড়ার জ্যোতিষীটি ভাল হাত গোনেন। (২) হাত চলা [প্রহার করা]—একটুতেই তার হাত চলে। (৩) হাত পাকানো [অভ্যাস দ্বারা সিদ্ধ হওয়া]—গল্প লেখায় সে হাত পাকিয়েছে। (৪) হাত করা [বশে আনা]—বাদীপক্ষের প্রধান সাক্ষীটিকে যদি হাত করতে পার, তা'হলে এই মকদ্দমায় তোমার জয় অনিবার্য। (৫) হাত দেখা [নাড়ী দেখা]—কবিরাজ হাত দেখে বললেন, জ্বর নেই। (৬) হাত থাকা [কর্তৃত্ব থাকা]—আমার যদি হাত থাকৃত তো তোমায় নিশ্চয়ই চাকরি দিতাম। (৭) হাত পাতা [প্রার্থনা করা]—প্রজা জমিদারের কাছে খাজনা রেহাইয়ের জন্য হাত পাত্‌ল।

**গলা**

(১) গলা কাটা [ঠকানো]—আজকালকার অধিকাংশ দোকানদার খরিদ্দারের গলা কাটে। (২) গলা চাপা [কণ্ঠস্বর নীচু করা]—রোগীর ঘরে জোরে কথা বলতে নেই, গলা চেপে কথা বলিস্। (৩) গলা ছাড়া [কণ্ঠস্বর উঁচু করা]—ভদ্রপরিবারে গলা ছেড়ে কথা বলা শোভনীয় নয়। (৪) গলা সাধা [গীত অভ্যাস

করা ]—প্রতিদিন সকালে ও-বাড়ির মেয়েটি হারমোনিয়মের সঙ্গে গলা সাধে। (৫) গলা ধরা [ কণ্ঠস্বর বিকৃত হওয়া ]—রাত্তিরে ঠাণ্ডা লেগে আমার গলা ধরেছে। (৬) গলায় পড়া [ দায়িত্ব পড়া ]—বিত্তহীন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায়, তার অবিবাহিতা ষোড়শী কন্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গলায় পড়ল।

**গা**

(১) গা করা [ মনোযোগ করা ]—জমিদারবাবু যদি একটু গা করেন, তা'হলে এই গ্রামেই একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় বসাতে পারেন। (২) গা জুড়ানো [ শান্তি ও আরাম জন্মানো ]—ছেলেটি এযাত্রা রক্ষা পেয়েছে জেনে আমার গা জুড়াল। (৩) গা ঢালা [ শয়ন করা ]—ভিখারী বটবৃক্ষের ছায়ায় গা ঢেলেছে। (৪) গা বসা [ মন সংলগ্ন হওয়া ]—কাজে আমার গা বসে না। (৫) গা ভাঙা [ হাই ওঠা ]—দুপুর-বেলায় আহারের পর তোমার বড়ই গা ভাঙে। (৬) গা তোলা [ উঠা ]—গা তুলে এখন ভগবানের নাম কর। (৭) গা ঢাকা দেওয়া [ অজ্ঞাতবাস করা ]—পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বিপ্লবকুমার মেদিনীপুরের এক গাঁয়ে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। (৮) গায়ে মাখা [ গ্রাহ্য করা ]—পরনিন্দুকের কথা গায়ে মাখ্‌তে নাই। (৯) গায়ে ফুঁ দেওয়া [ বিনা দায়িত্বে ]—বাপ যে কদিন বেঁচে আছেন, সেই কদিনই গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াও। (১০) গা-ঝাড়া দেওয়া [ উঠ্‌বার উপক্রম করা ]—সন্ধ্যাবেলায় নির্জন নদীতীর থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌তেই কে যেন আমার নাম ধরে ডাক্‌ল! (১১) গায়ে থুতু দেওয়া [ ছি ছি করা ]—যে গুরুজনকে অপমান করে, লোকে তার গায়ে থুতু দেয়।

**পা**

(১) পা উঠা [ পদাঘাতবোধক ]—বিড়ালকে মারবার জন্য সে পা উঠাল। (২) পা বাড়ানো [ অগ্রসর হইবার জন্য পদসঞ্চালন ]—সে স্টেশনে যাবার জন্য পা বাড়াল। (৩) পা চাটা [ হীনতা স্বীকার করিয়া তোষামোদ করা ]—বড় সাহেবের পা চেটে বেশ কাজ গুছিয়ে নিচ্ছ তো? (৪) পা চালাইয়া যাওয়া [ দ্রুতবেগে চলা ]—ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, পা চালিয়ে যাও। (৫) পা ভারী হওয়া [ উচ্চ পদের জন্য গর্ববোধ ]—সাধারণ কর্মী হয়ে মন্ত্রিত্ব লাভ করায় আজ তাঁর পা ভারী হয়েছে। (৬) পায়ে রাখা [ আশ্রয় দেওয়া ]—হুজুর যদি পায়ে রাখেন তো এ যাত্রা বেঁচে যাই। (৭) পায়ে তেল দেওয়া [ তোষামোদ করা ]—বড়লোকের পায়ে তেল দিও না। (৮) পায়ে ধরা [ অত্যন্ত তোষামোদ করা ]—মরে গেলেও তোমার ন্যায় অর্থপিশাচের পায়ে ধরতে যাব না। (৯) পায়ে ঠেলা [ অনাদর করা ]—আজ সে নিঃস্ব হওয়ায় লোকে তাকে পায়ে ঠেলে।

**কান**

(১) কান পাতা [ শুনিতে মনোযোগী হওয়া ]—জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে কি শুনছ? (২) কান ভাঙানো [ বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা দেওয়া ]—আসামী পক্ষ ফরিয়াদীর প্রধান সাক্ষীর কান ভাঙিয়েছে। (৩) কান দেওয়া [ শোনা ]—ঝগড়া-ঝাঁটিই কর, কি কান্নাকাটিই কর, তোমার কথায় আমি কান দেব না। (৪) কানে লাগা [ শ্রুতিমধুর বোধ করা ]—কুমার শচীন দেব বর্মণের গানই সবচেয়ে বেশি আমার কানে লাগে। (৫) কানে উঠা [ কর্ণগোচর হওয়া ]—এ কথাও তোমার কানে উঠেছে দেখছি! (৬) কানে তোলা [ উত্থাপন করা ]—একথা আমি কর্তৃপক্ষের কানে তুলেছি।

**ঠোঁট**

(১) ঠোঁট ফুলানো [ কান্না অভিমান আদরের উপক্রম করা ]—বাপের গালাগালি শুনে ছেলেটি ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। (২) ঠোঁট উল্টান [ অবজ্ঞা প্রকাশ করা ]—কুৎসিত লোকটিকে দেখে সে ঠোঁট উল্টাল। (৩) ঠোঁট-কাটা [ স্পষ্টভাষী ]—নেহাৎ ঠোঁট-কাটা বলেই সে অমন লোকের মুখের উপর বলতে পেরেছে।

**নাক**

(১) নাক তোলা [ অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা ]—হীন আচরণ দেখলে কে না নাক তোলে? (২) নাক-কাটা [ নির্লজ্জ ]—তার মত নাক-কাটা আমি আর দেখি নি। (৩) নাক-ঝামটা [ তিরস্কার ]—তার নাক-ঝামটা আমি সইব না।

**হাড়**

(১) হাড় জ্বালানো [ অত্যন্ত জ্বালাতন করা ]—ছেলেটি মায়ের হাড় জ্বালাচ্ছে। (২) হাড়ে হওয়া [ সামর্থ্যে কুলানো ]—এ কাজ তার হাড়ে হবে না। (৩) হাড়-পেকে [ অতিশয় কৃশ ]—শরণার্থীরা অনাহারে অনিদ্রায় হাড়-পেকে হয়ে পড়েছে। (৪) হাড়-ভাঙা [ অতীব শ্রমসাধ্য ]—মজুরেরা হাড়-ভাঙা মেহনত করে।

## বিশেষণ পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

**উচ্চ**—উচ্চ মূল্য, উচ্চ কণ্ঠ, উচ্চ বেতন, উচ্চ মন, উচ্চ কুল, উচ্চ পদ, উচ্চ শিক্ষা।

**কড়া**—কড়া রোদ, কড়া পাক, কড়া আঁচ, কড়া ওষুধ, কড়া মনিব, কড়া শাসন।

**কাঁচা**—কাঁচা বয়স, কাঁচা বুদ্ধি, কাঁচা মাল, কাঁচা ঘুম, কাঁচা রং, কাঁচা সর্দি, কাঁচা রাস্তা, কাঁচা খাতা, কাঁচা হাত, কাঁচা ছেলে, কাঁচা কাজ, কাঁচা গাঁথুনি, কাঁচা ইট, কাঁচা কথা, কাঁচা টাকা, কাঁচা বাড়ি, কাঁচা মাংস।

**খোলা**—খোলা কথা, খোলা মন, খোলা বাতাস, খোলা ঘর, খোলা চুল।

**ছোট**—ছোট নজর, ছোট সাহেব, ছোট মন, ছোট বোন, ছোট মা, ছোট ঘর, ছোট আদালত, ছোট কথা, ছোট কাজ, ছোট মোট, ছোট লোক, ছোট মুখ, ছোট কাকা, ছোট ঠাকুর, ছোট ঠাকরুণ, ছোট ননদ।

**নরম**—নরম বাজার, নরম মাছ, নরম মেজাজ, নরম গলা, নরম স্থর, নরম বিছানা, নরম মাটি, নরম দেহ, নরম হাওয়া, নরম হৃদয়, নরম দর।

**পাকা**—পাকা ঘুঁটি, পাকা মাথা, পাকা সোনা, পাকা খাতা, পাকা ওজন, পাকা কথা, পাকা চোর, পাকা রং, পাকা হাড়, পাকা ব্যবস্থা, পাকা ফোড়া, পাকা রাস্তা, পাকা মাছ, পাকা দলিল, পাকা দানা, পাকা মাটি, পাকা মাল, পাকা লেখা, পাকা হাত, পাকা রান্না, পাকা লোহা, পাকা বাড়ি।

**বড়**—বড় বিগ্যা, বড় কুটুম, বড় দিন, বড় ঠাকুর, বড় লাট, বড় মন, বড় বৌ, বড় কথা, বড় গলা, বড় ডাল, বড় কারখানা, বড় চিংড়ি, বড় জোর, বড় দরের, বড় মুখ, বড় চাল, বড় ছেলে, বড় কাণ্ড, বড় দি, বড় মা।

**ভাঙা**—ভাঙা মন, ভাঙা হাট, ভাঙা আসর, ভাঙা টাকা, ভাঙা বাড়ি, ভাঙা বুক, ভাঙা কপাল, ভাঙা মন, ভাঙা মাথা, ভাঙা কথা, ভাঙা ঘর, ভাঙা মাল।

**মোটা**—মোটা বুদ্ধি, মোটা কাপড়, মোটা ভাত, মোটা বেতন, মোটা টাকা, মোটা গলা, মোটা কথা, মোটা কাজ, মোটা মাথা, মোটা ধার।

**সাদা**—সাদা কথা, সাদা চোখ, সাদা মন, সাদা মাথা, সাদা রং, সাদা কাপড়, সাদা কাগজ, সাদা রোস্‌নাই, সাদা হাত, সাদা জাতি।

**হাল্‌কা**—হাল্‌কা হাসি, হাল্‌কা গহনা, হাল্‌কা কাজ, হাল্‌কা স্বভাব, হাল্‌কা কথা, হাল্‌কা হৃদয়, হাল্‌কা মাথা, হাল্‌কা লোক, হাল্‌কা পেট।

**প্রয়োগ**

**কড়া** মনিবের **কড়া** হুকুম তামিল করবার জন্যে সেই **কড়া** রোদের মধ্যেই চাকরটি আবার বাজারে গেল। **কাঁচা** ছেলের চীৎকারে মায়ের **কাঁচা** ঘুম ভাঙল। **নরম** মাছ কিনে ফেলায় কর্তাবাবু গৃহিণীর ভয়ে **নরম** মেজাজেই গৃহে প্রবেশ ক'রলেন। **বড়** কুটুম শেষ অবধি **বড়** বিগ্যেও শিখেছে! **পাকা** চোর চৌকিদারের ভয়ে সময়ে সময়ে **পাকা** রাস্তা না ধরে **কাঁচা** রাস্তাই ধরে।

## ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

**উঠা**—খরচ উঠা, দোকান উঠা, খড়ি উঠা, লাটে উঠা, টাক উঠা, রং উঠা, অন্ন উঠা, জাতে উঠা, দাঁত উঠা, নাম উঠা, পাট উঠা, রক্ত উঠা, রব উঠা।

**কাটা**—রাত কাটা, তেড়ি কাটা, বই কাটা, পোকায় কাটা, চিমটি কাটা, তাল কাটা, ধারে কাটা, ভারে কাটা, ধান কাটা, বিপদ কাটা, মেঘ কাটা,

সুতো কাটা, চরকা কাটা, চেক কাটা, ছক কাটা, ছানা কাটা, জল কাটা, জিভ্ কাটা, ডানা কানা, তিলক কাটা, দর কাটা, দাগ কাটা, দিন কাটা, নাড়ী কাটা, নাম কাটা, নেশা কাটা, পথ কাটা, ফুল কাটা, ভেংচি কাটা।

**খাওয়া**—ধমক খাওয়া, খাবি খাওয়া, নুন খাওয়া, চাকরী খাওয়া, খাপ খাওয়া, কিল খাওয়া, ঘুরপাক খাওয়া, টাকা খাওয়া, হাওয়া খাওয়া, হিম খাওয়া।

**ছাড়া**—জ্বর ছাড়া, গাড়ী ছাড়া, বাড়ি ছাড়া, মদ ছাড়া, হাল ছাড়া, গলা ছাড়া, সঙ্গ ছাড়া, ডাক ছাড়া, ধাত্ ছাড়া, নজর ছাড়া, পেট ছাড়া, ভিটা ছাড়া।

**ডাকা**—বান ডাকা, বাজ ডাকা, ডাক্তার ডাকা, ভগবানকে ডাকা।

**তোলা**—তল্পী তোলা, পটোল তোলা, চাঁদা তোলা, হাই তোলা, জাতে তোলা, দুধ তোলা, গাছে তোলা, ঘরে তোলা, ছবি তোলা, পাল তোলা, সুর তোলা।

**দেওয়া**—ছুটি দেওয়া, ডাকে দেওয়া, চম্পট দেওয়া, সাড়া দেওয়া, আক্কেল দেওয়া, কাঁধ দেওয়া, লম্বা দেওয়া, দম দেওয়া, দুধ দেওয়া, ফক্কি দেওয়া, আঙ্গুল দেওয়া, কোল দেওয়া, ছাড় দেওয়া, জাত দেওয়া, ডালি দেওয়া, তা দেওয়া, তেল দেওয়া, থুতু দেওয়া, দিন দেওয়া, মাই দেওয়া, নাম দেওয়া, পিঠ দেওয়া, ফাঁক দেওয়া, টেক্কা দেওয়া, ভাতকাপড় দেওয়া।

**ধরা**—মদ ধরা, ট্রেন ধরা, রোগে ধরা, মাছ ধরা, যমে ধরা, কলম ধরা, গাল ধরা, ঘাড় ধরা, চাল ধরা, জন ধরা, হ্যাঁপা ধরা, তাল ধরা, দোর ধরা, ধামা ধরা, নাম ধরা, লাঙ্গল ধরা, হাল ধরা, ধুয়ো ধরা।

**পড়া**—শীত পড়া, গরজ পড়া, টান পড়া, ধার পড়া, মারা পড়া, টাক পড়া, গরম পড়া, ছাই পড়া, পাখি পড়া, পাতা পড়া, পাত্ পড়া, ওষুধ পড়া, পেট পড়া, পেটে পড়া, বেল পড়া, হাত পড়া, হাতে পড়া, রৌদ্র পড়া।

**মারা**—ঢুঁ মারা, ভাত মারা, ভাতে মারা, ডুব মারা, পকেট মারা, চাল মারা, ঢিল মারা, জাত মারা, টাকা মারা, পেটে মারা, হাত মারা, হাতে মারা, মট্‌কা মারা, চাকা মারা, বোমা মারা, পাহাড় মারা, পুকুর মারা, জড় মারা।

**রাখা**—মান রাখা, কথা রাখা, নাম রাখা, তোয়াক্কা রাখা, টিকি রাখা, লেজ রাখা, চাকর রাখা, মজুত রাখা, হৃদয়ে রাখা, হিংসা রাখা, টাকা রাখা, পা রাখা, পায়ে রাখা, ভাব রাখা, চোখ রাখা, প্রাণ রাখা, মুখ রাখা।

**লাগা**—দাগ লাগা, মন লাগা, বিষম লাগা, তাক লাগা, পিছনে লাগা, ভাল লাগা, বন্দরে লাগা, চারা লাগা, গ্রহণ লাগা, খোঁচা লাগা, কাঁটা লাগা, গান লাগা, তল লাগা, শাপ লাগা, আগুন লাগা, ঘুর লাগা, চমক লাগা, জোড়া লাগা, নোনা লাগা, নজর লাগা, প্যাঁচ লাগা, পিছু লাগা, ভাব লাগা, ভেল্‌কি লাগা।

**প্রয়োগ**

মন একবার ভাঙ্‌লে কি আর জোড়া **লাগে**! ভায়ে-ভায়ে ঝগড়াঝাঁটি করে নিজেদের মুখে চুনকালি **লাগিও** না। বাগবাজারে কাঠের আড়তে আগুন **লেগেছে**। সাবধান না হলেই চোখে খোঁচা **লাগবে**। খেতে বসে বিষম **লাগায়** সে যায় আর কি! পাট-বোঝাই নৌকা ঘাটে **লেগেছে**। আশা করা যায়, এই বইখানি ভালই **কাটবে**। ছোটবেলায় যার নুন **খেয়েছি** এখন তার গুণ গাইবই। বড় হয়ে বাপের নাম **রাখা** চাই। অন্ধকারে ঢিল **মেরে** কোন লাভ আছে কি? ধান্ত **ছেড়ে** পটোল **তোলবার** আগে মুমূর্ষু ব্যক্তিই হাই তোলে। চল্‌তি বাংলায় লক্ষ্যার্থ ক্রিয়ার প্রয়োগমাধুর্য অবাঙালীকে তাক **লাগিয়ে** দেবার ক্ষমতা রাখে।

## শিষ্ট প্রয়োগ কিনা, তাহার বিচার পদ্ধতি

(১) অত্যন্ত অত্যাচার—কাহারও কাহারও মতে, 'অত্যাচার' বলিলেই যথেষ্ট। নচেৎ Tautology বা পুনরুক্তিদোষ হয়। 'অতি' ও 'আচার'—এই দুইটি শব্দের সন্ধিজাত শব্দ হইতেছে 'অত্যাচার'; কিন্তু বাংলায় এই সন্ধিজাত শব্দ একটি পৃথক্ শব্দই সৃষ্টি করিয়াছে। ইংরাজি 'Oppression'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'অত্যাচার'; ' Great Oppression-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'অত্যন্ত অত্যাচার' ধরিতে বাধা কি? (২) অসম্ভব শীত—'চলন্তিকা'র মতে, ইহার শুদ্ধ রূপ 'অসম্ভাবিত শীত'। (৩) অসাধ্য রোগ—ইহা অশিষ্ট প্রয়োগ নয়, শিষ্ট প্রয়োগই। 'অসাধ্য' শব্দের একটি মানে 'অপ্রতিকার্য'। অতএব, 'অসাধ্য রোগ' কেন লেখা যাইবে না? তাহা ছাড়া, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অসাধ্য রোগে'র কথা আছে। 'মাধব-নিদানম্' গ্রন্থে মাধব কর সাধ্য রোগ, অসাধ্য রোগ, সুখসাধ্য রোগ, কষ্টসাধ্য রোগ—এই চারিটি জাতের রোগের কথা বলিয়াছেন। (৪) পঞ্চমবর্ষীয় শিশু—'পঞ্চবর্ষীয় শিশু' হওয়াই সমীচীন। (৫) ভীষণ বিভীষিকা—এই প্রয়োগটিও 'অত্যন্ত অত্যাচার' প্রয়োগেরই মত। 'বিভীষিকার মূল অর্থ যাহাই হোক না কেন, ইংরাজি 'Terror' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে যদি 'বিভীষিকা শব্দটি হয়, তাহা হইলে ইংরাজি 'Great terror' শব্দদ্বয়ের বাংলা প্রতিশব্দ 'ভীষণ বিভীষিকা' কেন হইবে না? (৬) বিশিষ্ট শিষ্ট—'চলন্তিকা'র মতে, 'বিশিষ্ট শব্দের একটি মানে 'বিলক্ষণ' বা 'অতিশয়' আর শিষ্ট' শব্দের মানে 'শান্ত বা ভদ্র'। অতএব, 'বিশিষ্ট শিষ্ট' শুদ্ধ প্রয়োগ। (৭) বিশ্রী গন্ধ—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে, এই প্রয়োগটি শিষ্ট। 'চলন্তিকা'র মতে, 'বিশ্রী', শব্দের একটি মানে 'দুষ্ট'। ইংরাজি 'Foul smell'-এর বাংলা অনুবাদে 'বিশ্রী গন্ধ', হইবে না কেন? (৮) সমূহ সমস্যা—সংস্কৃত-মতে 'সমূহ' শব্দের মানে 'গণ', কিন্তু বাংলায় ইহার অর্থ 'বহু'ও হয়। তাই 'সমূহ সমস্যা' প্রয়োগটি'চলন্তিকা'র

মতে, অশুদ্ধ নয়। (৯) যথেষ্ট ক্ষতি—'চলন্তিকা'য় 'যথেষ্ট' শব্দের অপরাপর অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হইতেছে 'প্রচুর বা ঢের'। অতএব, 'যথেষ্ট ক্ষতি' কেন হইবে না? (১০) স্বর্ণ স্বযোগ—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে, 'স্বর্ণময় স্বযোগ' হওয়া উচিত। কিন্তু 'দারুময় মূর্তি'র '-ময়ট্' প্রত্যয়টি উহ্য রাখিয়া যদি 'দারুমূর্তি' ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে 'স্বর্ণময়' শব্দের 'ময়ট্' প্রত্যয় উহ্য রাখা যাইবে না কেন? আর সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, কেবলমাত্র 'স্বযোগ তথা স্ব+যোগ' শব্দের দ্বারাই 'স্বর্ণ স্বযোগ'-এর অর্থ ফুটিয়া উঠিতে পারে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে এরূপ প্রয়োগ থাকিলেও যোগাভ্যাসের 'যোগ' বা অঙ্কের 'যোগ'-এর সহিত 'স্বযোগ'-এর 'যোগ' জড়াইয়া যাইবে না তো? তাহা ছাড়া, অভিধান-বিশেষে 'স্বর্ণ' শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ Fair' থাকায়, 'Fair opportunity' অর্থে 'স্বর্ণ স্বযোগ' কেন হইবে না? 'সোনার দেশ, সোনার তরী, সোনার চাঁদ' প্রভৃতিতে যদি আপত্তি না থাকে তো 'স্বর্ণ স্বযোগ' প্রয়োগটিতেই-বা আপত্তি থাকিবে কেন? (১১) স্বপ্নাগু ঔষধ—'স্বপ্নে লব্ধ' এই অর্থে ইহার প্রয়োগ শিষ্ট। (১২) সাংঘাতিক লোক—'সাংঘাতিক' শব্দের মানে 'মারাত্মক'। অতএব, এই প্রয়োগ শুদ্ধ। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ও এবিষয়ে একমত। এই 'সাংঘাতিক' শব্দের সহিত সংস্কৃত 'সংহনন' শব্দের কোন যোগাযোগ নাই। 'সাংখ্য বা সাঙ্খ্য' নামক পৃথক্ শব্দ হইতে ইহা আসিয়াছে। ক. বি. মাধ্যমিক (অতি) '৪৮

## বিশিষ্ট প্রয়োগমূলক অর্থ-পার্থক্য

গলা ধরা [ স্বরবদ্ধ হওয়া ]—সর্দিকাসিতে আমার গলা ধরেছে।
গলায় ধরা [ গলদেশ ধারণ ]—সে বালকটির গলায় ধ'রল।

গায়ের জল [ স্বাস্থ্য ]—ছেলেটির গায়ের জল ভাল বলে' অল্প বয়সেই সে বড় দেখায়।
গায়ে জল [ অঙ্গে জল ]—গায়ে জল দিও না।

গা দেওয়া [ মন লাগানো ]—সে কোন কথায় গা দেয় না।
গায়ে দেওয়া [ পরিধান করা ]—সে চাদর গায়ে দেয়।

গা সওয়া [ অভ্যস্ত ]—তোমার গালাগালি আমার গা-সওয়া।
গায়ে-সওয়া [ অঙ্গে সহ্য হওয়া ]—গায়ে-সওয়া উত্তাপ দেবে।

গা লাগা [ প্রবৃত্তি জন্মানো ]—কাজে গা লাগাও।
গায়ে লাগা [ আঘাত করা ]—ঢিলটি আমার গায়ে লেগেছে।

গায়ে হাত তোলা [ প্রহার করা ]—স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলবে না।
গায়ে হাত দেওয়া [ অনুভব করা ]—নিন্দা ক'রবার পূর্বে নিজের গায়ে হাত দেও।

গায় পড়া [ গাত্রস্পর্শ করা ]—টিকৃটিকি সরমার গায়ে প'ড়ল।
গায়ে-পড়া [ অত্যন্ত মিশুক ]—মেয়েটি বড়ই গায়ে-পড়া।

চোখ দেখা [ চক্ষু চিকিৎসা করা ]—চিকিৎসকে পাপিয়ার চোখ দেখ্‌ল।
চোখের দেখা [ মুহূর্তের দেখা ]—জাবহরলালকে চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই।

দাঁত দেখা [ দন্ত চিকিৎসা করা ]—ডাক্তার মজুমদার সাধনের দাঁত দেখ্‌বেন।
দাঁত দেখানো [ দাঁত খিঁচানো ]—হনুমান ছেলেটিকে দাঁত দেখাচ্ছে।

পায়-পড়া [ পাদস্পর্শ করা ]—পুত্র পিতার পায় প'ড়্‌ল।
পায়ে-পড়া [ খোসামুদিয়া ]—এরূপ পায়ে-পড়া লোক আমি দেখি নি।

মন লাগা [ মনোযোগ দেওয়া ]—পড়ায় মন লাগে না।
মনে লাগা [ পছন্দ হওয়া ]—কচি ছেলেটি আমার মনে লেগেছে।

মন পড়া [ স্নেহ জন্মানো ]—শিশু সাধনের উপরে আমার মন পড়েছে।
মনে পড়া [ স্মরণে আসা ]—উত্তরটি আমার মনে পড়েছে।

মন জানা [ অন্তরের কথা অবগত হওয়া ]—আমি তার মন জানি।
মনে জানা [ অনুভব করা ]—সবই আমি মনে জানি।

মন লওয়া [ অন্তরের রহস্য জানা ]—সে আমার মন লইয়াছে।
মনে লওয়া [ যুক্তিসংগত বোধ করা ]—তাহার কথাটি আমার মনে লইয়াছে।

মাথা রাখা [ শয়ন করা ]—সে বিছানায় মাথা রেখেছে।
মাথায় রাখা [ অতীব শ্রদ্ধা করা ]—দেবী চিত্তেশ্বরীর চরণামৃত মাথায় রাখ।

মাথা করা [ পণ্ড করা ]—তুমি অভিনয় করবে, না মাথা ক'রবে।
মাথায় করা [ অত্যন্ত প্রশ্রয় দেওয়া ]—ছেলেটিকে অত মাথায় করো না।

মাথা খেলানো [ মাথা ঘামানো ]—এই সমস্যার সমাধানে তিনি মাথা খেলাচ্ছেন।
মাথায় খেলা [ মনের মধ্যে নানা যুক্তি বা কৌশলের উদয় হইতে থাকা ]—দাবা খেলবার সময় অনেক চালই তার মাথায় খেলতে লাগল।

মুখ বন্ধ করা [ চুপ করা ]—গোলমাল না করে মুখ বন্ধ কর।
মুখবন্ধ করা [ ভূমিকা লেখা ]—লেখকেরা সাধারণতঃ মুখবন্ধ ক'রে থাকেন।

মুখ মারা [মুখের দিক মজবুত করা]—ভাল অভিনেতামাত্রেই অভিনয়ে মুখ মারেন।
মুখে মারা [ বদনমণ্ডলে আঘাত করা ]—রমেন হরেনের মুখে মেরেছে।

মুখ রাখা [ মান রক্ষা করা ]—তুমি আমার মুখ রেখেছ।
মুখে রাখা [ আহার করা ]—সে রসগোল্লা মুখে রাখ্‌ল।
মুখ দেওয়া [ খাওয়া—তুচ্ছার্থে ]—বিড়ালটা দুধে মুখ দিয়েছে।
মুখে দেওয়া [ খাওয়া —গৌরবার্থে ]—ছেলেটি দুধ মুখে দিয়েছে।
বুক লাগানো [ ঐকান্তিক সাহায্য করা ]—অপরের বিপদে সে বুক লাগায়।
বুকে লাগা [ অন্তরে আঘাত পাওয়া ]—তোমার কটুবাক্য স্বরেনের বুকে লেগেছে।
হাড় জোড়া [ ভগ্নাস্থি জোড়া লাগা ]—তার হাড় জুড়েছে।
হাড় জুড়ানো [ শান্তি ও আরাম পাওয়া ]—তার হাড় জুড়িয়েছে।
হাত খোলা [ অভ্যাসে হাতের সংকোচ না করা ]—সে হাত খুল্‌ল।
হাতে খোলা [ সর্বস্বান্ত ]—দান করে' সে আজ হাতে-খোলা।
হাত ধরা [ হস্ত গ্রহণ করা ]—সে আমার হাত ধরল।
হাতে ধরা [ মিনতি করা ]—সে আমার হাতে ধরল।
হাত আসা [ অভ্যাস হওয়া ]—কাজে তার হাত এসেছে।
হাতে আসা [ দখলে আসা ]—জমিটি তাহার হাতে এসেছে।
হাত করা [ হস্তগত করা ]— জমিটি সে হাত করেছে।
হাতে-করা [ হস্তদ্বারা নির্মিত ]—হাতে-করা পুতুলটি আমি চাই।
গালে হাত [ বিস্ময়ে ]—বোকা ছেলেটির পাশের সংবাদ শুনে সে গালে হাত দিল।
পায়ে হাত [ পাদস্পর্শ ]—পুত্র পিতার পায়ে হাত দিল।
বুকে হাত [ সাহস প্রকাশে ]—ডাকাত পড়েছে শুনে সে বুকে হাত দিল।
মাথায় হাত [ দুর্ভাবনায় ]—ব্যাঙ্ক ফেল মেরেছে শুনে সে মাথায় হাত দিল।

## অনুশীলন

[ এক ] 'কাটা' বা 'তোলা' ক্রিয়াপদকে ভিন্নার্থে প্রয়োগ করিয়া পাঁচটি বাক্য রচনা কর। ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৬

[ দুই ] নিম্নলিখিত ঈডিয়মগুলির স্পষ্টার্থবোধক বাক্যাদি রচনা কর :—মুখ রাখা, ধুয়ো ধরা, পায়ে-ঠেলা, পটোল-তোলা, নাম ডুবানো, হাড় জুড়ানো, গা করা, তাক লাগা, টেক্কা দেওয়া। ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৬ ; বি.এ. ,৫৭

তিন ] 'মাথা' শব্দটির পাঁচ রকম অর্থ বুঝাইতে পাঁচটি বাক্য রচনা কর। ক. বি. বি. এ. '৫৭

[ চার ] পাঁচটি বিভিন্ন অর্থে লাগ্‌ ধাতুর প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া বাক্য রচনা কর। ক. বি. মাধ্যমিক ( বিজ্ঞান ) '৫৭

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ ও প্রবচন

ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে 'ঈডিয়ম্' বাংলায় তাহাকেই বলে 'বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ'। বাংলা ভাষার ইহা এক অপরিমেয় মূল্যবান সামগ্রী। সাধু ভাষায় নয়, চলিত ভাষাতেই ইহার যাহা-কিছু প্রচলন। আবার ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কোন কোন বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ ভুল অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার যথাযথ অর্থ সম্পর্কে বক্তার মূঢ়তা ও অনভিজ্ঞতাই দায়ী। বাচ্যার্থের মধ্য দিয়া নয়, লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থের মধ্য দিয়াই ইহার সার্থকতা। ইংরাজি রচনা-রীতির 'ঈডিয়মে'র ন্যায় বাংলা রচনারীতিতেও যাহাতে এই বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশের সার্থক এবং বহুল প্রয়োগ ঘটে, তাহার প্রতি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনকারী মাত্রেরই সজাগ দৃষ্টি থাকা উচিত। ইহা ছাড়া, আমাদের প্রাত্যহিক কথোপকথনে সুপ্রচলিত প্রচলনও এক অমূল্য ভাণ্ডার। ইহাদেরও সার্থক অর্থ আমাদের জানা থাকা সমীচীন। নিম্নে অল্প কয়েকটি বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ ও প্রবচনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ দেওয়া হইল। বাগ্ধারার প্রয়োগ-কালে এই কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, যেন তেন প্রকারেণ না করিয়া উহার বিশিষ্ট অর্থটি যাহাতে অবলীলাক্রমে প্রকাশ পায় এমন ভাবেই বাক্য রচনা করা উচিত।

**অকাল কুষ্মাণ্ড**—[ অকর্মণ্য ]—ধনি পিতার 'অকাল কুষ্মাণ্ড' পুত্র হওয়া—ইহাও বুঝিবা প্রকৃতির এক খেয়াল। **অক্কা পাওয়া**—[ ঈশ্বর-প্রাপ্তি ]—ও-বাড়ির বুড়ীর 'অক্কা পাওয়া'র সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। **অগস্ত্য যাত্রা**—[ একেবারে প্রস্থান, ফিরিয়া আসিবার কোন প্রশ্ন নাই ]—ছাত্রটি শিক্ষক মহাশয়ের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়া বিদ্যালয় হইতে 'অগস্ত্য যাত্রা' করিল। **অগাধ ( বা গভীর ) জলের মাছ**—[ যে-ব্যক্তি কোন বিষয়ে ভাসা-ভাসা চিন্তা না করিয়া উহার গভীরতম প্রদেশে যাইয়া সার মীমাংসায় উপনীত হয় ]—'অগাধ ( বা গভীর ) জলের মাছে'র ন্যায় চাণক্যের মস্তিষ্কের গভীরতম প্রদেশস্থিত বুদ্ধির নিশানা করিবার ক্ষমতা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তেরও ছিল না। **অন্তরটিপুনী**—[ অন্তর্নিহিত খোঁচা, যাহা মর্মপীড়াদায়ক ]—স্ত্রীর কথাগুলির 'অন্তরটিপুনি' তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া বিবাগী হইয়া গেলেন। **অন্ধের নড়ি ( বা যষ্ঠি )**—[ অসহায়ের সহায় ] পিতার বার্ধক্যে পুত্রই 'অন্ধের নড়ি ( বা যষ্ঠি )'। **অমাবস্যার চাঁদ**—[ অদর্শনীয় ঘটনা ]—যে না পড়িয়া পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার আশা রাখে, সে 'আমবস্যার চাঁদ'ই দেখে। **অরণ্যে রোদন**—

[ নিষ্ফল রোদন, বৃথা অনুনয়-বিনয় )—এবারকার আয়ব্যয় আলোচনা-উপলক্ষে ভারতীয় লোকসভা-'অরণ্যে' দেশের প্রতিনিধিরা যথারীতি 'রোদন' করিয়াছেন। **অর্ধচন্দ্র দান করিয়া বিদায়**—[ গলাধাক্কা দিয়া বিতাড়ন ]—বিত্তশালী শ্বশুর দীনদরিদ্র ঘরজামাতাকে লাঠি-জুতায় আদর শুরু করিয়া শেষে 'অর্ধচন্দ্র দান করিয়া বিদায়' দিলেন। **অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী**—[ স্বল্প বিদ্যার শোচনীয় পরিণতি ]—তোমার 'অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী' বলিয়াই ছাত্রাবস্থায় তুমি বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক মেঘনাদকে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছিলে। **অষ্টবজ্র-সম্মিলন**—[ প্রতিভাধর ব্যক্তিগণের একত্র সমাবেশ ]—কবি-সমালোচক মোহিতলালের শোকসভায় বঙ্গ সাহিত্যের 'অষ্টবজ্র-সম্মিলন' হইয়াছিল। **অহি-নকুল, সাপে-নেউলে, দা-কুমড়া, আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক**—[ শাশ্বত বিরোধ বা বৈরীভাব ]—আমেরিকা ও রাশিয়ার রাজনীতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উভয় দেশবাসীর মধ্যে 'অহিনকুল [ বা সাপে-নেউলে, বা দা-কুমড়া বা আদায়-কাঁচকলায় ] সম্পর্ক' আছে।

**আক্কেল-সেলামী**—[ নির্বুদ্ধিতার নিমিত্ত দণ্ড ]—ভোলার কথামত শেয়ার-বাজারে নামিয়া আমাকে হাজার টাকা 'আক্কেল-সেলামী' দিতে হইল। **আকাশ থেকে পড়া**—[ অনভিজ্ঞতার ভাণ করা ]—তাঁর চাকরি গিয়েছে শুনে যে তুমি একেবারে 'আকাশ থেকে প'ড়লে'! **আকাশ-কুসুম**—[ কাল্পনিক বিষয় বা বস্তু ]—অলস চিন্তার প্রশ্রয়ে যাহা কিছুই করা যাক্ না কেন, তাহা 'আকাশ-কুসুম' রচনার ন্যায় ব্যর্থতায় ও হতাশায় পর্যবসিত হয়। **আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হওয়া**—[ অল্পদিনে অথবা অচিরে দরিদ্রের হঠাৎ ধনী হওয়া ]—মাসিক তিরিশ টাকা বেতনের ঐ বিত্তহীন কেরাণী তিন লক্ষ টাকা লটারিতে পাওয়ায়, তাহার 'আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে'। **আঠারো মাসে বছর**—[ দীর্ঘসূত্রী, কুঁড়ে স্বভাব ]—যেখানে পরীক্ষার আর কয়েক মাস ব্যবধান, সেখানে 'আঠারো মাসে বছর' করিলে অকৃতকার্য হইবে। **আদা জল খেয়ে লাগা**—[ উঠিয়া পড়িয়া লাগা ]—গত বছর ব্যবসায়ে লোকসান হলেও এবার সে লাভ করবার জন্য 'আদা জল খেয়ে লেগেছে'। **আদার ব্যাপারী**—[ সামান্য বিষয়ে ব্যাপৃত ব্যক্তি ]—'আদার ব্যাপারী' প্রজা জমিদার-জাহাজের সংবাদ লইতেও শঙ্কাবোধ করে। **আদিখ্যেতা**—[ ন্যাকামি ]—মেয়েটির 'আদিখ্যেতা' দেখে আমার গা জ্বলে যায়। **আমড়া কাঠের** বা **গাছের ঢেঁকি, জরদ্গব**—[ অপদার্থ ]—ছাত্র যদি 'আমড়া কাঠের বা গাছের ঢেঁকি [ বা জরদ্গব ]' হয়, তাহা হইলে তাহাকে যতই পড়ানো যাক্ না কেন, বছরের পর বছর সে অনুত্তীর্ণই হয়। **আমড়াগাছি করা**—[ তোষামোদে আত্মবিস্মৃত করা ]—নির্বোধ ধনী ব্যক্তিকে 'আমড়াগাছি করিয়া' চতুর ব্যক্তিরা নিজেদের কাজ হাসিল করিয়া থাকে। **আলালের**

**ঘরের দুলাল**—[ আদুরে ও আব্দারে ছেলে ]—সন্তানকে 'আলালের ঘরের দুলাল' করিয়া তুলিলে তাহার সর্বনাশই সাধিত হয়। **আষাঢ়ে গল্প**—[ অবিশ্বাস্য কাহিনী ]—রাঘব বোয়ালে হাতীকে গ্রাস করিয়াছে, এইরূপ 'আষাঢ়ে গল্প' গাঁজাখোরেরাই বিশ্বাস করিয়া থাকে। **আসমান-জমিন ফারাক্**—[ আকাশ-পাতাল প্রভেদ, অনেক প্রভেদ ]—শিল্প-সৌষ্ঠবের দিক দিয়া আগ্রার তাজমহল আর কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মধ্যে 'আসমান-জমিন ফারাক্' বিদ্যমান। **আসলে মুষল নেই, ঢেঁকিঘরে চাঁদোয়া**—[ যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাব ]—নিজের সংসারের প্রতি নজর না দিয়া অপরের সংসার চালানোর এই প্রচেষ্টার মর্মকথা হইতেছে—'আসলে মুষল নেই, ঢেঁকিঘরে চাঁদোয়া'।

**ইঁচড়ে পাকা**—[ অকালপক্ক ]—হরেনবাবুর দ্বাদশবর্ষবয়স্ক 'ইঁচড়ে পাকা' পুত্রটি বৃদ্ধের ন্যায় হুঁকা টানিতে শিখিয়াছে। **ইতরবিশেষ**—[ ভেদাভেদ ]—বিমাতা নিজের সন্তান ও সপত্নীর সন্তানের মধ্যে সাধারণতঃ 'ইতরবিশেষ' করিয়া থাকে। **ইঁদুরকপালে**—[ মন্দভাগ্য ]—'ইঁদুরকপালে' নীলা পিতৃহীনা।

**উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ**—[ যাহা হাতছাড়া হইয়াছে তাহা স্বেচ্ছায় সৎকার্যে নিয়োগ ও দান করার ভাণ ]—তামাদিপ্রায় দশ হাজার টাকা তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করিয়া 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ' করিলেন। **উত্তম মধ্যম**—[ বিলক্ষণ প্রহার ]—চোরকে ধরিয়া 'উত্তম মধ্যম' দেওয়া হইল। **উপরোধে ঢেঁকি গেলা**—[ নির্বন্ধাতিশয় রক্ষা করা ]—প্রধান পরীক্ষক মহাশয় সেন সাহেবের ছেলেটিকে পাশ করাইয়া দিয়া 'উপরোধে ঢেঁকি গিলিলেন'। **উলুবনে মুক্তা ছড়ানো**—[ অস্থানে অমূল্য জিনিস ছড়ানো ]—মজুরদের সভায় তিনি 'রবীন্দ্র-সাহিত্য মিষ্টিকতা' আলোচনা করিয়া 'উলুবনে মুক্তো ছড়াইলেন'।

**ঊনপঞ্চাশ বায়ু**—[ পাগলামি ]—অহোরাত্র পড়িতে পড়িতে সে এক্ষণে 'ঊনপঞ্চাশ বায়ু'তে আক্রান্ত হইয়াছে। **ঊনপাঁজুরে**—[ দুর্বল, হতভাগ্য ]—'ঊনপাজুরে' মেয়েটির ক্ষীণা নাম সার্থক।

**এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো**—[ সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট ]—এই পাঁচজন ব্যক্তি কেবল যে সহপাঠী তাহাই নয়, ইহারা 'এক ক্ষুরে মাথাও মুড়াইয়াছে'। **এক ঢিলে দুই পাখি মারা**—[ একটিমাত্র উপায় বা কৌশলে উভয় দিক রক্ষা করা বা দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা ]—এই বইখানি ইন্টারমিডিয়েট্ ও বি. এ. পরীক্ষার্থীদের জন্য লিখিয়া আমি 'এক ঢিলে দুই পাখি মারিতেছি'। **এক মাঘে শীত যায় না**—[ বিপদের সম্ভাব্যতা ]—দাগী চোর দারোগাবাবুকে ঘুষ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মুক্তি পাইয়া যখন তাঁহাকে কিছুই দিল না, তখন তিনি বলিলেন—"আচ্ছা! 'এক মাঘে শীত যায় না'।" **এক হাত (দেখে) লওয়া**—[ বিদ্রূপ করিয়া দোষকীর্তন করা; জব্দ করা ]—নিরুপায় নিঃসহায় ব্যক্তিকে 'এক হাত (দেখে)

লওয়া'র মধ্যে কোন বাহাদুরি নাই। **একচোখো**—[ পক্ষপাতদুষ্ট, অনুদার ]—'একচোখো' হাকিমের কাছে কোন সুবিচার আশা করা যায় না। **একাঘরের গিন্নি**—[ স্বচ্ছন্দ প্রভু ]—যে ছোট্ট কোম্পানীতে তুমি ইতিপূর্বে কাজ করিতেছিলে, সেখানে তো ছিলে 'একাঘরের গিন্নি'। **একাদশে বৃহস্পতি**—[ অত্যন্ত সৌভাগ্যের সময় ]—প্রথম বিভাগে আই. এ. পরীক্ষায় পাশ, তিন শত টাকা মাহিনার চাকরি, ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যাসন্তানকে বিবাহ—এই সব দেখিয়া মনে হয় যে, তোমার এখন 'একাদশে বৃহস্পতি'। **একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ**—[ যে যাহার বিরুদ্ধ, তাহার কাছে তাহাই করা ]—বিধবা-বিবাহের বিরোধী পণ্ডিত মহাশয়কে বিধবা-বিবাহের পুরোহিতরূপে নিযুক্ত করায় ব্যাপারটি ঘটিয়াছে এই যে 'একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ'। **এলোপাথারি, এলোধাবাড়ি**—[ বিশৃঙ্খল ]—পলায়নপর দস্যুদল 'এলোপাথারি ( বা এলোধাবাড়ি )'গুলি চালাইতে লাগিল।

**ওজন বুঝে চলা**—[ আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করা ]—এই সংসারে আপনার 'ওজন বুঝিয়া চলিতে' না পারিলে মানসম্ভ্রম বজায় রাখা খুবই কঠিন। **ওষুধ করা**—[ তুক করা ]—নিশ্চয় কোন দুষ্ট লোক তাকে 'ওষুধ করেছে' বলেই সে অমন ভ্যাবা গঙ্গারাম হয়ে পড়েছে। **ওষুধ ধরা**—[ ঈপ্সিত ফললাভ ]—শিক্ষকমহাশয়ের তিরস্কারে ছাত্রটি যখন পড়াশুনায় মন দিয়েছে, তখন 'ওষুধ ধরেছে' বলেই তো মনে হয়। **ওষুধ পড়া**—[ যথাযোগ্য প্রভাবে পড়া ]—এবারে 'ওষুধ পড়েছে', ছেলে শোধরাবে।

**ক-অক্ষর-গোমাংস**—[ বর্ণপরিচয়হীন ]—এত বড় বিদ্বান্ পিতার ছেলে কি না 'ক-অক্ষর-গোমাংস'! **কংস মামা**—[ নির্মম আত্মীয় ]—'কংস মামা'র হাতে যখন পড়েছ, তখন আর তোমার উদ্ধার নেই। **কই মাছের প্রাণ**—[ যাহা সহজে মরিবার নয় ]—দরিদ্রের 'কই মাছের প্রাণ' বলিয়াই তো সে এই সাত দিনব্যাপী উপবাস করিয়াও জীবিত আছে। **কড়ায়-গণ্ডায়**—[ পুরোপুরি হিসাব ]—দেনাদার পাওনাদারের পাওনা 'কড়ায়-গণ্ডায়' পরিশোধ করিয়া দিয়াছে। **কত ধানে কত চাল তার খবর**—[ ধানের পরিমাণ অনুসারে চাল অনেক কম হয়, এই তত্ত্ববোধ যাহার নাই অর্থাৎ সাংসারিক আয়-ব্যয় সম্বন্ধে যে দায়িত্বজ্ঞানহীন তাহার প্রতি এই ব্যঙ্গোক্তি ]—পরের টাকায় যে কাপ্তেনী করে, সে 'কত ধানে কত চাল তার খবর' রাখে না। **কথায় চিঁড়ে ভিজে না**—[ ফাঁকা আওয়াজে কাজ হয় না ]—পরোপকারী হইতে হইলে, শুধু 'কথায় চিঁড়ে ভিজে না', সক্রিয়ভাবে লোক-হিতৈষণা করিতে হয়। **কলির সন্ধ্যা**—[ কষ্টের বা দুঃখের সূচনা ]—পণ্যসামগ্রীর মূল্যের অনুপাতে বেতন বাড়েনি—'এই তো কলির সন্ধ্যে'। **কলুর বলদ**—[ যাহার স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত গতি নাই ]—সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া মানুষ '**কলুর বলদে**'র ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। **কল্কে পাওয়া**—[ পাত্তা পাওয়া ]—বাঙ্গালী জাতি আজ কোন প্রদেশেই 'কল্কে পাইতেছে' না। **কাকভুষণ্ডী**—[ দীর্ঘজীবী ব্যক্তি ]—মহাত্মা

গান্ধী অন্ততঃ একশত পঁচিশ বৎসর বাঁচিয়া 'কাকভুষণ্ডী' হইতে চাহিয়াছিলেন। **কান-পাতলা**—[ অতিশয় বিশ্বাসপ্রবণ ]—তিনি 'কান-পাতলা' বলিয়াই প্রতিটি লোকের কথা বিশ্বাস করেন। **কানে তুলো দেওয়া**—[ ভ্রূক্ষেপ না করা ]—স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনের অপরাধ সম্পর্কে 'কানে তুলো দিয়ে' থাক্‌তেন। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে**—[ বেদনার উপরে বেদনা দেওয়া ]—টাকা হারাইয়া ব্যথাহত, তাহার উপরে ভর্ৎসনা করিয়া 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে' না দেওয়াই ভাল। **কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা**—[ যে জাতীয় বস্তু-দ্বারা অনিষ্ট ঘটিয়াছে, সেই জাতীয় বস্তু-দ্বারাই কার্যসিদ্ধি করা ]—ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজনকে সরকারী সাক্ষীরূপে নিয়োগ করিয়া সমগ্র ষড়যন্ত্রকে এইভাবে প্রকাশ করা, ইহাই 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা'। **কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা**—[ অল্প বয়সে বিগ্‌ড়ানো ]—শৈশবকাল হইতে ছেলেদের দিকে নজর না রাখিলে অবশ্য 'কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিবে'। **কাঁঠালের আমসত্ত্ব, সোনার পাথরের বাটি**—[ বে-খাপ সামগ্রী ; অসম্ভব বস্তু ]—বিশ্বসভার বিশ্বশান্তি স্থাপনের প্রয়াস 'কাঁঠালের আমসত্ত্বের (বা সোনার পাথরের বাটির)' ন্যায় নিতান্তই বে-খাপ হইয়া উঠিয়াছে। **কাঠের পুতুল**—[ কাঠের ন্যায় অসাড় মূর্তি ]—পাপিয়া তাহার স্বামীর তিরস্কারে 'কাঠের পুতুলে'র ন্যায় বসিয়া রহিল। **কানু ছাড়া কীর্তন নাই**—[ একই বিষয়ের বার বার অবতারণা ]—পরীক্ষায় পাশ করিতে হইলে বোধিনী-সহায়িকা অবশ্যই চাই—এ যেন 'কানু ছাড়া কীর্তন নাই'। **কালনেমির লঙ্কাভাগ**—[ কর্মানুষ্ঠানের আগেই কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ]—গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তিকে পরাজিত করিয়া অক্ষশক্তি যে দেশগুলি আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবার আশা পোষণ করিয়াছিল, তাহা 'কালনেমির লঙ্কাভাগ'ই বটে! **কাষ্ঠহাসি**—[ কপট হাস্য ]—ভোটদাতার 'কাষ্ঠহাসি' দেখিয়া অনেক সময়েই নির্বাচনপ্রার্থীরা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝিতে পারেন না। **কুলকাঠের আঙার ( বা আগুন )**—[ তীব্র জ্বালা ]—আমার প্রাণের ভিতর 'কুলকাঠের আঙার ( বা আগুন )' জ্বলিতেছে। **কুলায় শুইয়া তুলায় করিয়া দুধ খাওয়া**—[ কপট সারল্য প্রকাশ করা ]—কর্তৃপক্ষস্থানীয় হইয়াও তুমি এমনভাবে কথা কহিতেছ যেন 'কুলায় শুইয়া তুলায় করিয়া দুধ খাইতেছ'। **কুণোবেঙ, কূপমণ্ডুক**—[ সীমাবদ্ধ জ্ঞান ]—সংস্কার অথবা কুসংস্কারের বশীভূত হইলে আমরা এমনই 'কুণোবেঙ ( বা কূপমণ্ডূক )' হইয়া পড়িব যে, আমাদের স্বাধীন বিচারশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। **কেঁচে গণ্ডুষ করা**—[ পুনরায় আরম্ভ ]—এই কবিতার মর্মার্থটি 'কেঁচে গণ্ডূষ করিয়া' লিখ। **কেঁচো খুঁড়্‌তে সাপ**—[ তুচ্ছ ব্যাপার হইতে গুরুতর ব্যাপারের উদ্ভব ]—সামান্য চুরির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে গিয়া রাজনৈতিক দলবিশেষের সক্রিয়তা বুঝা গেল—এ যেন 'কেঁচো খুঁড়্‌তে সাপ' বাহির হইল

**খয়ের খাঁ**—[ ধামা-ধরা ]—ইংরাজ আমলের 'খয়ের খাঁ'রা স্বাধীন ভারতের ঘোর কংগ্রেসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। **খাল কেটে কুমীর আনা**—[ স্বকৃত দোষে বিপদাপন্ন হওয়া ]—দুষ্টপ্রকৃতি মৈত্রেয়-ভ্রাতাকে জমিদারি দেখ্‌তে দিয়ে আমি 'খাল কেটে কুমীরই এনেছি'। **খুঁড়িয়ে বড়ো হওয়া**—[ প্রকৃত বড়ো বা মহৎ নয়, কিন্তু গায়ের জোরে বড়ো হওয়া ]—জমিদারের ছেলের বাবুগিরির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দরিদ্র ব্যক্তির সন্তানের বাবুগিরি করা তো 'খুঁড়িয়ে বড়ো হওয়ার'ই সামিল।

**গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা**—[ অপরের সামগ্রী দিয়াই অপরের তুষ্টিসাধন ]—কবি-সমালোচক মোহিতলালের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার লেখা কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া আমি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা' সাঙ্গ করিলাম। **গড্ডলিকা-প্রবাহ**—[ নিজে বিবেচনা না করিয়া ভেড়ার পালের ন্যায় পূর্ব-প্রচলিত মতের অন্ধ অনুগমন ]—আধুনিক চলচ্চিত্রশিল্প 'গড্ডলিকা-প্রবাহে' ভাসিয়া চলিয়াছে। **গণেশ উল্‌টানো, লাল বাতি জ্বালানো**—[ বিনষ্ট হওয়া ]—কামিনীবাবুর গুড়ের ব্যবসায়টি 'গণেশ উল্‌টাইয়াছে ( বা লালবাতি জ্বালিয়াছে )'। **গন্ধমাদন বহিয়া আনা**—[ অবান্তর অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বহন ]—আজিকার হনুমানবৃত্তিক ছাত্রেরা কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার কালে গোটা বস্তুসংক্ষেপ লিখিয়া 'গন্ধমাদন বহিয়া আনিয়া' থাকে। **গা ঢাকা দেওয়া**—[ লুকাইয়া পড়া ]—গৃহস্থের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় চোরটি রাতের অাঁধারে 'গা ঢাকা দিল'। **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল**—[ পাইবার কোন স্থিরতা নাই, অথচ সেই বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হওয়া ]—আই. এ. পরীক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বি. এ. শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক কিনিয়া 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল' মাখিল। **গাছেরও খায়, তলারও কুড়ায়**—[ সমুদায় আত্মসাৎ করা ]—সরকারী চাকরিতে উচ্চপদস্থ কোন কোন ব্যক্তি 'গাছেরও খান, তলারও কুড়ান'। **গায়ে কাঁটা দেওয়া**—[ অত্যন্ত ভয় পাওয়া ]—নির্জন শ্মশানে অকস্মাৎ মনুষ্যকণ্ঠের ধ্বনি শুনিয়া আমার 'গায়ে কাঁটা দিয়াছিল'। **গায়ে-গায়ে শোধ**—[ দেয় না দেওয়া ও প্রাপ্য না লওয়া, অথচ দেনাপাওনার শোধবোধ ]—তুমি আমার আছে যে পঞ্চাশ টাকা পাইবে, তাহা তোমার খোরাকি বাবদে খরচ করিয়া 'গায়ে-গায়ে শোধ' দিতে চাই। **গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না**—[ স্বদেশে গুণীর আদর নাই ]—নোবেল-পুরস্কার না পাওয়া অবধি রবীন্দ্রনাথের জীবনেও 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না'—কথাটির সার্থক প্রতিপত্তি ছিল। **গোঁয়ারগোবিন্দ**—[ কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি ]—'গোঁয়ারগোবিন্দ' রামলোচন শূন্যহস্তে বন্দুকধারী পুলিশকে আক্রমণ করিল। **গোঁফ-খেজুরে**—[ নিতান্ত অলস ]—বাহিরে না গিয়া ঘরের মধ্যে যাহারা লেজ নাড়ে তাহাদের ন্যায় 'গোঁফ-খেজুরে'র দ্বারা এই পৃথিবীতে কি কাজ করা যাইতে পারে? **গোকুলের**

**ষাঁড়**—[ স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি ]—লেখাপড়া না শিখিলে হলধর 'গোকুলের ষাঁড়ে'র ন্যায় পাড়ায় পাড়ায় যথেচ্ছাচার করিয়া বেড়াইবে। **গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া**—[ জ্ঞাতসারে অনিষ্ট করিয়া পরে সংশোধনের বৃথা প্রয়াস ]—শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে পদাঘাত করিয়া পরে ক্ষমা প্রার্থনা করা 'গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া'রই সামিল। **গোবর-গণেশ**—[ জড়বুদ্ধি ]—কাজের চাপে না রাখিলে তোমাদের ছেলেটি ধীরে ধীরে 'গোবর-গণেশ' হইয়া পড়িবে। **গোবরে পদ্মফুল**—[ কুৎসিৎ পরিবারে সুন্দর বালক বা বালিকা ; নীচকুলে মহৎ ব্যক্তি ]—নুলোর বংশে এমন সুন্দর ছেলে, এ যে সত্যই 'গোবরে পদ্মফুল' ! **গোলে হরিবোল, গোলেমালে চণ্ডীপাঠ**—[ বিশৃঙ্খল কার্য ]—প্রশ্নটির উত্তর যথাযথ হয় নাই, 'গোলে হরিবোল ( বা গোলেমালে চণ্ডীপাঠ )' হইয়াছে। **গৌরচন্দ্রিকা**—[ মুখবন্ধ ]—'গৌরচন্দ্রিকা' শেষ করিয়াই তিনি বক্তব্য বিষয়টি বলিলেন।

**ঘর থাকিতে বাবুই ভিজা**—[ অবিমৃষ্যকারিকা ; মূর্খতা ]—বিরাট্ প্রাসাদের অধিকারী হইয়াও প্রকাশবাবু খোলার ঘরে তাঁহার মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করিয়া 'ঘর থাকিতে বাবুই ভিজিতেছেন'। **ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়**—[ বিপদাশঙ্কা করা ]—যেমন 'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়', তেমনি কোন প্রকাশকের হাতে বই দিবামাত্র আমি শঙ্কিত হই। **ঘরভেদী বিভীষণ**—[ যে গৃহ-বিবাদ বাধায় ]—কংগ্রেসের মধ্যে এখনও অনেক 'ঘরভেদী বিভীষণ' আছেন। **ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে**—[ যে যন্ত্রণা কিছুকাল পরে নিজেকেই ভোগ করিতে হইবে, তাহার কথা বিস্মৃত হইয়া কোন লোক অপরের ঐ যন্ত্রণাভোগ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলে এই প্রবচনটি প্রয়োজ্য ]—বড়ো চোরকে প্রহৃত হইতে দেখিয়া যখন ছোটো চোর হাসে, তখন প্রকৃতই মনে হয় যে, 'ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে'। **ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখোনি**—[ কার্যের প্রথম অংশের সুখ অনুভব করিয়াছ, কিন্তু পরিণামে যে কি রকম ক্লেশজনক, তাহা এখনও বুঝ নাই ]—'ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখোনি' বলেই সবেমাত্র বিয়ে করে তুমি আজ এতো আনন্দিত ! **ঘোড়ার ঘাস কাটা**—[ বাজে কর্ম করা ]—সর্বদা মনে রেখো যে, কলেজে তোমরা পড়তে এসেছ, 'ঘোড়ার ঘাস কাট্‌তে' এসো নাই। **ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া**—[ বৃথা বা নিষ্ফল চেষ্টা করা ]—তোমার জরিমানা মাপ করাইবার জন্য কলেজের উপাধ্যক্ষকে অতিক্রম করিয়া সরাসরি অধ্যক্ষের কাছে গিয়াছ সত্য কিন্তু ইহাতে 'ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া'ই হইয়াছে। **ঘোড়ারোগ**—[ অবস্থার অতিরিক্ত বিষয়ে সাধ ]—প্রতিদিন সিনেমা দেখিবার এই 'ঘোড়ারোগ' তোমার ন্যায় গরীবের পক্ষে সর্বতোভাবে পরিহার্য। **ঘোড়া দেখে খোঁড়া**—[ সুযোগসন্ধানী

—নিপুণ সহকারীর উপরে সব কাজের ভার দিয়ে বড়বাবু 'ঘোড়া দেখে খোঁড়া' হলেন। **ঘোড়ার ডিম**—[ অলীক পদার্থ ]—কৃপণ হলধরের কাছে 'ঘোড়ার ডিম' পাবে।

**চক্ষুদান করা**—[ চুরি করা ]—পকেটমারে আমার তিন তিনটি কলম 'চক্ষুদান করিয়াছে'। **চক্ষে সরিষাফুল দেখা**—[ অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপদ অনুভব করা ]—নিশীথকালে প্রতিবেশী মাধবের বাড়ির ভাঙা সদর দরজার প্রতি নজর পড়িবামাত্র আমি 'চক্ষে সরিষাফুল দেখিলাম'। **চাটি-বাটি গুটান**—[ বাসত্যাগ করা ]—ওপাড়ার দুষ্ট ছেলেদের অত্যাচারে তিনি 'চাটি-বাটি গুটাইয়া' সপরিবারে এপাড়ায় আসিয়াছেন। **চিত্রগুপ্তের খাতা (**বা **খতিয়ান)**—[ যে খাতায় যমের লেখক চিত্রগুপ্ত নাকি মানুষের পাপপুণ্য বা জীবনমরণের হিসাব রাখে]—পোড়ারমুখোর মরণও হয় না—নিশ্চয়ই 'চিত্রগুপ্তের খাতা ( বা খতিয়ান )' বন্ধ রয়েছে। **চিনির বলদ**—[ কেবলমাত্র ভারবাহী, অথচ ফলভোগী নয় ]—শ্রমিক-সম্প্রদায় 'চিনির বলদে'র ন্যায় শ্রমজাত দ্রব্য ভোগ করিতে পারে না। **চুল-পাকানো**—[ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা ] সুদীর্ঘ এক যুগ ধরিয়া অধ্যাপনায় 'চুল পাকাইয়াছি'। **চোখে ধুলা দেওয়া**—[ ধোঁকা দেওয়া ]—বাল্যকালে যে-বালক গুরুজনের 'চোখে ধুলা দেয়', তাহার পরিণাম ভয়াবহ। **চোখের মাথা খাওয়া**—[ কানা বা অন্ধ হওয়া ]—'চোখের মাথা খেয়েছ' বলেই বই-খানি আলমারি থেকে দেখেশুনে আন্‌তে পারলে না। **চোখের পর্দা**—[ লজ্জা ]—'চোখের পর্দা' নাই বলিয়াই সে তাহার শ্যালকের কাছে এক সপ্তাহের খাওয়া-খরচ আদায় করিয়াছে। **চোখের নেশা**—[ মোহ ]—যেদিন চোখের নেশা কাটিল সেদিন বিল্বমঙ্গলের ভগবদ্‌প্রাপ্তি ঘটিল। **চোখের বালি**—[ চক্ষুশূল, অপ্রিয় ]—ও-বাড়ির নূতন বউ সকলের 'চোখের বালি' হওয়ায় তাহার দুঃখকষ্টের অন্ত নাই। **চোরাবালি**—[ প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ ]—আধুনিক সিনেমা ব্যভিচারের 'চোরাবালি'তে মানুষকে আটকাইয়া ফেলিতেছে। **চোরের মায়ের কান্না**—[ যে-বেদনা কাহাকেও জানাইবার নয় ]—যে-ব্যক্তি তাহার পুত্রকে শৈশবকাল হইতে অসৎকার্যে প্রবৃত্তি দিয়া আসিয়াছে, পরিণামে তাহাকে 'চোরের মায়ের কান্না'ই কাঁদিতে হয়।

**ছ'কড়া ন'কড়া**—[ সস্তা দর ]—তোমার অত বড়ো বাড়িখানি 'ছ'কড়া ন'কড়া'য় বেচে ফেল্‌লে! **ছাপোষা**—[ সংসার প্রতিপালনে রত ]—আমার ন্যায় 'ছাপোষা' কেরাণীর কাছে আর পঞ্চাশ টাকা চাঁদার প্রত্যাশা ক'রো না। **ছাইচাপা আগুন**—[ প্রচ্ছন্নতেজা ]—ছেলেটি 'ছাইচাপা আগুন'—ভবিষ্যতে সে কীর্তিমান হইবেই। **ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো**—[ অতি অকিঞ্চিৎকর কাজের জন্য নিয়োজিত অকিঞ্চিৎকর বা অপদার্থ পাত্র ]—জমিদারবাবুর তামাক সাজিবার জন্য বৃদ্ধ নিবারণ নিযুক্ত হওয়ায় 'ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো'রই ব্যবস্থা

হইল। **ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়**—[ সামান্যরূপে প্রবেশ করিয়া পরে বৃহৎ অনিষ্ট সাধন করিয়া প্রস্থান ]—চল্লিশ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হইয়া কালক্রমে প্রধান পরিচালকরূপে লক্ষ লক্ষ টাকা চক্ষুদান দিয়া যখন সে ব্যাঙ্কে লাল বাতি জ্বালাইল, তখনই বুঝা গেল যে, সে 'ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়'। **ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা**—[ নীচ ও ঘৃণিতকে দণ্ড দিতে গেলে নিজেরই হাতে গন্ধ হয়—ইহাতে গৌরব নাই ]—এই দাগী চোরকে পুলিশের হাতে না দিয়া স্বহস্তে শিক্ষা দিলে 'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা'ই হইবে। **ছেলের হাতের মোয়া**—[ প্রবঞ্চনাবোধক ]—লেখাপড়া ব্যাপারটি 'ছেলের হাতের মোয়া' নয় যে, ফাঁকি দিয়াই পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ করিবে।

**জগাখিচুড়ি পাকানো**—[ জট পাকানো ]—আলমারির মধ্যে জামা-কাপড়ে, কাগজপত্তরে 'জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে' রেখেছ। **জলাঞ্জলি দেওয়া**—[ বিসর্জন দেওয়া ; অপব্যয় করা ]—শেয়ার-বাজারে রামবাবু প্রভৃত টাকাকড়ি 'জলাঞ্জলি দিয়াছেন'। **জিলাপীর পাক ( বা প্যাঁচ )**—[ কুটিল বুদ্ধি ]—তোমার পেটের ভিতরে যে এত 'জিলাপীর পাক ( বা প্যাঁচ )' আছে, এ তো আমি আগে জানতামই না।

**ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো**—[ ইশারায় বা ঠেস দিয়া তিরস্কার করা ]—প্রতিবেশী রমেন্দ্রনাথের পুত্র নষ্টচন্দ্র-উপলক্ষে অপরের বাগান হইতে যে-তরিতরকারী চুরি করিয়াছিল, তাহার জন্য নগেন্দ্রনাথ তাঁহার পুত্রকে শাসাইয়া দেওয়ায় 'ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো' ব্যাপারটিই যেন ঘটিল। **ঝোপ বুঝে কোপ মারা**—[ অবস্থা বুঝিয়া সুযোগ লওয়া ]—গত য়ুরোপীয় মহাসমরের পরে গান্ধী-জিন্না 'ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়া' স্বাধীন ভারতবর্ষ ও স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টি করিলেন।

**টইটম্বুর**—[ জলে ভরপুর ]—বর্ষাকালে নদী খাল বিল এমন কি প্রান্তরভূমিও জলে 'টইটম্বুর' হইয়া পড়ে। **টনক নড়া**—[ সজ্ঞান হওয়া ]—শ্রমিকেরা ধর্মঘট শুরু করিয়াছে, অথচ এখনও কর্তৃপক্ষের 'টনক নড়ে' নাই। **টাকার কুমীর**—[প্রচুর টাকার মালিক] 'টাকার কুমীর' কুমার প্রমথনাথ দেহত্যাগ করিয়াছেন'। **টীকা-ভাষ্য**—[বিস্তৃত আলোচনা ]—প্রতিটি কথার 'টীকা-ভাষ্য' করিতে গেলে কাজ করা আর চলে না।

**ডান হাতের ব্যাপার ( বা কাণ্ড বা কাজ )**—[আহার]—অনেক রাত হওয়ায় আমরা তাড়াতাড়ি 'ডান হাতে ব্যাপারটি ( বা কাণ্ডটি বা কাজটি )' সারিয়া লইলাম। **ডামাডোলের বাজার**—[ গোলযোগের অবস্থা ]—এই 'ডামাডোলের বাজারে' ছেলেপিলে লইয়া মহাচিন্তায় পড়িয়াছি। **ডালভাঙা ক্রোশ**—[ অতি দীর্ঘ পথ ] —সেই ভোরে রওনা দিয়া, এখনও স্টেশনে পৌছাইতে না পারায় বুঝিতে পারিতেছি যে, 'ডালভাঙা ক্রোশে'র পাল্লায় আমি পড়িয়াছি। **ডুবে ডুবে জল খাওয়া**—[ অন্যের অগোচরে কোন গোপনীয় কু-কর্ম করা ]—ছাত্রজীবনে অভি-

ভাবকের অজ্ঞাতসারে প্রতিদিন সিনেমা দেখে যেভাবে 'ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ', তার পরিণাম আদৌ ভাল নয়। **ডুমুরের ফুল**—[ কচিৎদৃষ্ট সামগ্রী ]—টাকা ধার করিবার পর হইতেই বন্ধুটি 'ডুমুরের ফুল' হইয়া পড়িল।

**ঢলাঢলি**—[ পরস্পরের কেলেঙ্কারি ]—সহশিক্ষা যদি তরুণ-তরুণীর 'ঢলাঢলি'-ই সৃষ্টি করে, তবে তাহা অবশ্য পরিত্যাজ্য। **ঢাক ঢাক গুড় গুড়**—[ কপটতা ]—যাহা বলিব স্পষ্ট কথা, আমার কাছে 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' নাই। **ঢাকের বাঁয়া**—[ অকেজো ]—আসলে বড়-দা'ই সব করেছেন, মেজ-দা' তো 'ঢাকের বাঁয়া'। **ঢিমে তেতালা, গদাইলস্করী চাল**—[ খুবই মৃদুগতি ]—'ঢিমে তেতালায় ( বা গদাইলস্করী চালে )' চলিলে আজ আর সাত মাইল পথ অতিক্রম করা যাইবে না।

**তামার বিষ**—[ ধনের বিষময় প্রভাব ]—'তামার বিষে' অভিভূত ব্যক্তির হৃদয়ে মনুষ্যত্ব স্থান পায় না। **তালকানা**—[ মাত্রাজ্ঞানহীন ]—তুমি এমনই 'তালকানা' লোক যে ট্যাঁকে চাবির গোছা থাকিতেও এখানে-সেখানে উহা খুঁজিয়া মরিতেছ। **তালপাতার সেপাই**—[ অতি কৃশকায় ]—সে 'তালপাতার সেপাই' হইলেও, তাহার গায়ে বেশ জোর আছে। **তাসের ঘর**—[ কর্মানুষ্ঠানে বা পরিকল্পনায় ভঙ্গুরত্ব ]—'তাসের ঘরে'র ন্যায় এই জীবন মৃত্যুর স্পর্শমাত্রেই পরিসমাপ্ত হয়। **তিলকে তাল করা**—[ তুচ্ছকে অতিরঞ্জন-দ্বারা বড় করিয়া তোলা ]—এমন এক জাতের লোক এই পৃথিবীতে আছে, যাহাদের স্বভাবই হইতেছে 'তিলকে তাল করা'। **তীর্থের কাক**—[ সাগ্রহ প্রতীক্ষাকারী, লোভী ব্যক্তি ]—তেত্রিশ বৎসর বয়স অবধি 'তীর্থের কাকে'র ন্যায় পিতার অর্থোপার্জনের উপর নির্ভর করিয়াই যদি পুত্রকে দিনাতিপাত করিতে হয় তো সে নিজে রোজগার করিবে কবে? **তুলসীবনের কাক**—[ বাহিরে আচার-নিষ্ঠাসম্পন্ন, কিন্তু অন্তরে পশুবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ]—তিলককণ্ঠীধারী বৈষ্ণব হইলেই যে 'তুলসীবনের বাঘ' হইবে না, এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। **তেলে বেগুনে জ্বলা**—[ উত্তেজিত অথবা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হওয়ার ভাব ]—বিত্তহীন প্রজার ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্র পাঠ করিবামাত্র ঐশ্বর্যশালী জমিদার 'তেলে-বেগুনে জলিয়া' উঠিলেন। **ত্রাহি—ত্রাহি**—[ 'ত্রাণ কর, ত্রাণ কর'—বলিয়া যথাশক্তি চীৎকার ]—প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হইয়া নৌকারোহিগণ 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে লাগিল।

**থ হ'য়ে ( বা খেয়ে, মেরে ) যাওয়া, থতমত খাওয়া**—[ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া ]—ঐটুকু মেয়ের কথা শুনে আমি 'থ হ'য়ে ( বা খেয়ে, মেরে ) বা থতমত খেয়ে' গেলাম। **থ ( বা থৈ ) পাওয়া**—[ তল পাওয়া, সীমা পাওয়া ]—সারা দিনরাত খাটিয়াও কাজের 'থ (বা থৈ) পাইতেছি' না। **থাবাথুবি দিয়ে রাখা**—[ পিঠ চাপড়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখা ]—রোরুদ্যমান শিশুটিকে মাতা 'থাবাথুবি দিয়ে রাখ্‌লেন'।

**ব্যাপার**—[ বিশৃঙ্খল কাণ্ড ]—দুই দল ছাত্রেরা দলাদলি শেষ অবধি হৈ-চৈ এবং মারামারির মধ্য দিয়া 'দক্ষযজ্ঞের ব্যাপারে' পরিণত হইল। **দশচক্রে ভগবান ভূত**—[ সংস্কৃতে একটি প্রবাদ আছে, 'চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যা **ন** সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ। আহা চক্রস্য মাহাত্ম্যং ভগবান্ ভূততাং গতঃ॥' 'ভালই হউক আর মন্দই হউক, কেহ দশজনের ষড়যন্ত্রে নির্যাতিত হইলে' এই উক্তিটি ব্যবহৃত হয়। ] —যেমন 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হইয়াছিলেন সেইরূপ প্রতিভাবান ব্যক্তিও অজ্ঞ জনসাধারণের কাছে বাতুলরূপে পরিগণিত হন। **দহরম-মহরম** [ মাখামাখি বন্ধুত্ব ]—প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে জ্ঞানদা'র যখন 'দহরম-মহরম' আছে, তখন তোমার একটা ভাল চাকরি অবশ্যই হইবে। **দাঁও মারা**—[ লাভ করা ]—পুত্রের বিবাহে হরিচরণবাবুর টাকা-পয়সায় সোনাদানায় মোটা 'দাঁও মারিয়াছেন'। **দন্তস্ফুট করা**—[ কঠিন বিষয়ে প্রবেশ করা ]—অঙ্কটি এমনই দুরূহ যে সহজে 'দন্তস্ফুট করা' যায় না। **দাঁতে কুটো কাটা**—[ অতীব বিনীত হওয়া ]—দুর্ধর্ষ ব্যক্তিও বেকায়দায় প'ড়লে 'দাতে কুটো কাটে'। **দুধ-কলা দিয়া সাপ পোষা**— [ বিনাশের হেতুস্বরূপ খল বা শত্রুকে যত্ন করিয়া পালন করা ]—যাহার অভাবের সময়ে ধনসম্পত্তি দিয়া আমি রক্ষা করিয়াছিলাম, সে-ই আজ আমার ক্ষতি করিতে অগ্রসর হওয়ায় প্রকৃতই বুঝিতেছি যে, এতদিন আমি 'দুধ-কলা দিয়া সাপ পুষিয়াছি'। **দু-কানকাটা**—[ অতুলনীয় বেহায়া ]—প্রথমে সে গোপনেই মদ্যপান করিত কিন্তু একবার মাৎলামির জন্য জেল খাটিবার ফলে এখন সে সর্বসমক্ষেই মদ খাইয়া একেবারে 'দু-কানকাটা' হইয়াছে। **দু-মুখো সাপ**—[ যাহার মুখ দিয়া দুই রূপ বা বিপরীত কথা বাহির হয় ]—রমেন যখন এর কথা ওর কাছে এবং ওর কথা এর কাছে লাগায়, তখন তাকে 'দু'মুখো সাপ' অনায়াসেই বলা যায়। **দোহারা**— [ স্থূল ও কৃশের মধ্যবর্তী ]—'দোহারা' চেহারার মেয়েই দেখিতে ভাল।

**ধরাকে সরাজ্ঞান করা**—[ সমগ্র পৃথিবীকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা ]—সাধারণতঃ হাভাতের বেটা টাকার একটু মুখ দেখলেই 'ধরাকে সরাজ্ঞান করে'। **ধরি মাছ, না ছুঁই পানি**—[ কিছুমাত্র বেগ না পাইতে হয় এমন কৌশলে কার্যসিদ্ধি করা ]— বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে যাঁহারাই 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' বুঝিয়া কাজ করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারাই শেষ অবধি টিকিয়া থাকিবেন। **ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির**—[ মূলে 'আদর্শ সত্যবাদী' অর্থ থাকিলেও এক্ষণে 'ঘোর মিথ্যাবাদী' অর্থে বিদ্রূপোক্তি করা হয় ]— বিপদে পড়িবে, অথচ এই ছোট্ট কথাটিকে একটু ঘুরাইয়া বলিতে পারিবে না—কি 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির'ই না তুমি হইয়াছ! **ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, ধর্মের ঢাক আপনি বাজে**—[ পাপ কদাপি প্রচ্ছন্ন থাকে না ]—পুলিশ-সাহেবের ঘুষ খাইবার

কথা যখন প্রকাশিত হইল, তখন শহরের অনেক লোকই বলিতে লাগিল, 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ( বা ধর্মের ঢাক আপনি বাজে )'। **ধান ভান্‌তে শিবের গীত**—[ অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা ]—শরৎ-সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি চার্বাক-দর্শনের তত্ত্বকথা টেনে এনে 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' শুরু করলেন।

**নদীকূলে বাস**—[প্রতি মুহূর্তের ভাবনা ]—খামখেয়ালি মালিকের অধীনে অস্থায়ী চাকরি করা 'নদীকূলে বাসে'রই সামিল। **ননীর পুতুল**—[ কোমলদেহ ব্যক্তি ]—'ননীর পুতুল' হইলে রোদে দাঁড়াইয়া কষ্টসাধ্য কাজ করা যায় না। **নয়-ছয়**—[ ছড়াছড়ি ]—খাটের উপরে জামাকাপড়গুলা 'নয়-ছয়' হয়ে পড়ে রয়েছে। **নাই দেওয়া**—[ অত্যধিক আদর দেওয়া ]—কুকুরকে 'নাই দিতে' নাই। **নাকে তেল দিয়ে ঘুম্যানো**—[ নির্ভাবনায় সময় কাটানো ]—পরীক্ষার আর দেরি নাই, অথচ বীণা-পাণি রাত্তে তো বটেই, এমন কি দিনেও 'নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতেছে'। **নামকাটা সেপাই**—[ বহিস্কৃত কর্মী ]—সরকারী কর্মচারী থাকাকালে সাধারণ ধর্মঘটে যোগদান করায় আজ সে 'নামকাটা সেপাই'তে রূপান্তরিত হইয়াছে। **নিজের কোলে ঝোল টানা**—[ স্বার্থপর হওয়া ]—সার্থক জনসেবার ক্ষেত্রে 'নিজের কোলে ঝোল টানিতে' নাই। **নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ**—[ নিজের ক্ষতি করিয়া পরকে জব্দ করা ]—আজিকার যুদ্ধনীতিতে যে পোড়া-মাটি রীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে তাহা 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ' করারই সামিল। **নিস্‌পিস্ করা**—[ উস্‌খুস্ করা ]—ছাত্রটিকে মারিবার জন্য পণ্ডিতমহাশয়ের হাত 'নিস্‌পিস্ করিতেছে'। **নেই-আকড়া**—[ নাছোড়বান্দা ]—যা' ধরবে তাই চাই, এমন 'নেই-আকড়া' ছেলেও তো কখনও দেখি নাই। **নেক নজরে পড়া**—[ সুদৃষ্টিতে পড়া ]—আপিসের বড় সাহেবের 'নেক নজরে পড়িতে' পারিলে তুমি অবশ্যই বড় বাবু হইতে পারিবে।

**পগার পার**—[ ধৃত হইবার সম্ভাবনা অতিক্রম করিয়া পলায়ন ]—খুনী এতক্ষণে 'পগার পার' হইয়াছে, পুলিশে আর তাহাকে ধরিতে পারিবে না। **পথের কাঁটা**—[ গমনপথে বিঘ্ন বা বাধা ]—পরীক্ষাভবনে যাঁহারা প্রহরা দেন, তাঁহাদিগকে নকলনবীশ ছাত্রেরা 'পথের কাঁটা' ভাবিয়া থাকে। **পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা**—[ পরকে দিয়া নিজের কাজ হাসিল করা ]—নিজে উপার্জন না করিয়া আজীবন সে 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া' খাইয়া আসিয়াছে। **পরের মুখে ঝাল খাওয়া**—[ নিজ ব্যক্তিগত ভাবে না বুঝিয়া পরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন ]—'পরের মুখে ঝাল খাওয়া' যাহাদের অভ্যাস, তাহারা প্রতি পদে প্রতারিত হয়। **পাত্‌তাড়ি গুটানো**—[ দ্রব্যসামগ্রী গুছাইয়া বাঁধা ও তোলা ]—বিবাহ-শেষে বরযাত্রীরা 'পাত্‌তাড়ি গুটাইয়া' স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। **পাথরে পাঁচ কিল**—[ অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকিলে কপাল ভাঙিবার প্রয়াস বৃথা ; কারণ উহা পাথরের ন্যায় মজবুত ]—চোরা কারবার করিয়া হরেনের এখন 'পাথরে পাঁচকিল' বলিয়াই তো যেখানে ছুঁচ না চলে, সেখানে

সে বেটে চালায়। **পায়া ভারি**—[ অহংকার, গুমর, মুরুব্বির জোর ]—বড় চাকরি পাইয়া তাহার 'পায়া ভারি' হইয়াছে। বড় কাকা আপিসের বড় সাহেব—এই 'পায়া ভারি' থাকায় এত শীঘ্র তাহার উন্নতি হইয়াছে। **পুঁটি মাছের প্রাণ**—[ ক্ষীণপ্রাণ ]—ভারতবাসীদের যে 'পুঁটি মাছের প্রাণ' নয়, তাহা ইংরাজকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া তাহারা সপ্রমাণিত করিয়াছে। **পুকুর চুরি**—[কোন দ্রব্য বা বিষয় সমূলে ফাঁকি দেওয়া] —ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ এমন করিয়াই 'পুকুর চুরি' করিল যে, লালবাতি জ্বালানো ছাড়া ব্যাঙ্কের আর কোন গতি রহিল না। **পেঁজ-পয়জার দুইই হইল**—[ পেট ভরিল না, পৃষ্ঠেও সহিতে হইল ]—মামলা-মকদ্দমায় টাকার শ্রাদ্ধ ও জমিজমা বেদখলি হওয়ায় আমার 'পেঁজ-পয়জার দুইই হইল'। **পেট-ভাতা**—[ উদরপূরণ মাত্র ]—মাস-মাহিনায় নয়, 'পেট-ভাতায়' পূর্ববঙ্গীয় একজন শরণার্থীকে এই দোকানে কাজ দেওয়া হইয়াছে। **পোয়া-বারো**—[ সর্ববিষয়ে প্রতুল ]—গৃহিণীর অনুপস্থিতিতে আজ ঝি- চাকরের 'পোয়া-বারো'।

**ফাঁপা ঢেঁকির শব্দ বড়**—[ ভিতরে যাহার কিছু নাই, তাহার বাহিরের শব্দ কিছু বেশি রকম ]—ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলেও, ইংরাজি বুলি আওড়াইতে সে বেশ দড়—কারণ, 'ফাঁপা ঢেঁকির শব্দ বড়'। **ফুটো পয়সার লড়াই**—[ অর্থহীন বিবাদ ] —সামান্য বিষয় নিয়ে তোমাদের উভয়ের মধ্যে এই যে কথা কাটাকাটি, এ তো 'ফুটো পয়সার লড়াই'য়ের সামিল। **ফেন দিয়ে ভাত খায় গল্পে মারে দই, ভাজে ঝিঙে ত বলে পটোল**—[ প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া মান রাখিবার জন্য মিথ্যাচার ]—সংসারে এমন এক জাতের কপটাচারী নিঃস্ব লোকসম্প্রদায় আছে যাহারা ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্পে মারে দই ( বা ভাজে ঝিঙে ত বলে পটোল )'। **ফোঁড়ন দেওয়া**—[ উত্তেজনামূলক টিপ্পনী দেওয়া ]—দুই ভায়ের ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে আমি 'ফোড়ন দিতে' চাই না। **ফোপোল-দালালী**—[ উপর-পড়া হইয়া মধ্যস্থগিরি ]—আমাদের আলাপ আলোচনার মধ্যে তোমার আর 'ফোপোল-দালালী' করতে হবে না।

**বকধার্মিক**—[ বাহিরে বৈরাগী, অথচ অন্তরে পাপাচারী ]—অনেক 'বক-ধার্মিক'ই গঙ্গায় পুণ্যস্নান করিবার সময় নানাবিধ পাপ চিন্তা করিয়া থাকে। **বড় মাছের কাঁটাও ভাল**—[ মহৎ ব্যক্তির তুচ্ছ কথাও মূল্যবান ]—পরহিতৈষী জমিদার রাধামাধব তাঁহার এই দুর্দিনেও যে উপদেশ দান করেন, তাহা শুনিলে মনে হয় যে, 'বড় মাছের কাঁটাও ভাল'। **বড় মুখ**—[ আস্ফালন ]—'বড় মুখ' করিয়া আসিয়াছিলে, কিন্তু এক্ষণে সরিয়া পড়িতেছ কেন? **বর্ণচোরা আঁব** ( বা **আম** )—[ কপটী ব্যক্তি ] —নির্বাচনকালে 'বর্ণচোরা আঁব ( বা আম )'কে চিনিতে না পারিলে অবশ্যই প্রতারিত হইতে হইবে। **বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো**—[ কঠিন সতর্কতা-সত্ত্বেও অসাবধানতা ] —পিতা পুত্রকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিলেও, সিনেমা দেখিতে আপত্তি করিতেন না —এই 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'ই পুত্রের শোচনীয় পরিণতির কারণ। **বাগে**

**পাওনা**—[ আয়ত্ত করা ]—তাকে একবার 'বাগে পেলে' উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেব। **বাড়া ভাতে ছাই, পাকা ধানে মই**—[ ফললাভের সময় বিঘ্ন ]—আমি তাহার 'বাড়া ভাতে ছাই' দিতে যাই নাই, অথচ সে আমার 'পাকা ধানে মই' দিয়াছে। **বানরের গলায় মুক্তা-হার**—[ অপাত্রে উৎকৃষ্ট সামগ্রী দান ]—বেলার মত ডানা-কাটা পরীর বিয়ে হ'ল কিনা হাড়-হাবাতে সমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে—এ যেন 'বানরের গলায় মুক্তা-হার'! **বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো**—[ ভবঘুরে অনাদৃত ব্যক্তি ]—কে বলিতে পারে যে, এই 'বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো' ছেলেই একদিন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না! **বামন হ'য়ে চাঁদে হাত**—অসম্ভব আশা ]—সুশিক্ষিতা রূপবতী অলকাকে বিবাহ করিবার আশা পোষণ করিয়া তুমি 'বামন হ'য়ে চাঁদে হাত' বাড়াইতেছ! **বিনা মেঘে বজ্রাঘাত**—[ আকস্মিক বিপৎপাত ]—কায়েদ আজম জিন্নার আকস্মিক মৃত্যু 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে'র ন্যায় পাকিস্তানীদের প্রাণে শোকের শাগুন ঘনাইয়া তুলিয়াছিল। **বিশবাঁও জলে**—( কার্যসিদ্ধির অসম্ভাব্যতা )—খুনী ব'লে যখন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তখন তোমার উদ্ধারলাভের আশা এখন 'বিশবাঁও জলে'। **বুদ্ধির ঢেঁকি**—[ নিরেট বোকা ]—বিদ্যুৎকুমারের পুত্র সুকুমার যেরূপ 'বুদ্ধির ঢেঁকি' তাতে করে তার পক্ষে এ ব্যবসায় চালানোই দুষ্কর। **বেগার ঠেলা**—[ অযত্নের সঙ্গে কাজ করা ]—ফর্মা পিছু যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণালাভে যাঁরা বোধিনী লেখেন, তাঁরা 'বেগার ঠেলে' থাকেন। **বাঁ হাতের ব্যাপার**—[ ঘুষ ]—আমাদের আপিসের বড়বাবু 'বাঁ হাতের ব্যাপার' করিয়াই বালিগঞ্জে একটি বড় বাড়ি ফাঁদিয়াছেন। **বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা**—[ যে বিষয়ে একবার লিপ্ত হইলে নানা বিপদে বা ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হয় ]—আয়কর আইনের আওতায় একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই—একেবারে 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা'য়ের সামিল। **বাঘের আড়ি**—[ না-ছোড়বান্দা শত্রুতা ]—সে এমনই মামলাবাজ যে, সর্বস্ব হারাইয়াও রমাকান্তের বিরুদ্ধে 'বাঘের আড়ি' পাতিয়াছে। **বাঘের দুধ**—[ দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ]—টাকা থাকিলে কলিকাতায় 'বাঘের দুধ' মেলে। **বাঘের মাসী হওয়া**—[ নির্ভীক হওয়া ]—নীলিমা বাপের বাড়িতে আসিয়া 'বাঘের মাসী' হইয়াছে। **বারো ভূত**—[ অনাদরে বহুব্যক্তিবোধক ]—প্রৌঢ় পার্বতীনাথের পুত্রসন্তান হওয়ায় 'বারো ভূতে' আর তাঁহার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার সুযোগ পাইল না। **বালির বাঁধ**—[ ক্ষণস্থায়ী ]—শিবাজি ভেদবৈষম্যমূলক ধর্মসমাজকে লইয়া সারা ভারতবর্ষে জয়ী হইবার চেষ্টা করিয়া 'বালির বাঁধ'ই বাঁধিয়াছিলেন। **বিড়ালতপস্বী**—[ বাহিরে তপস্বীর আকার, কিন্তু অন্তরে কাম-ক্রোধাদির বশীভূত; ভণ্ড তপস্বী ]—অসৎকর্মে রত পিতার নীতি-উপদেশ শুনিলেও পুত্র তাঁহাকে 'বিড়ালতপস্বী' জ্ঞান করিয়া উপহাস করিবে। **বিদুরের ক্ষুদ**—

[ শ্রদ্ধাপূর্ণ সামান্য দান ]—আপনার ন্যায় মহাশয় ব্যক্তি যদি আমার ন্যায় দীনদরিদ্রের গৃহে পদার্পণ করিয়া 'বিদুরের ক্ষুদ' গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত তৃপ্তি পাইব। **বিনা মেঘে জল**—[ বিনা কারণেই কার্যের উৎপত্তি ]—নূতন কেরাণীবাবু আপিসে প্রথম দিন যাইবামাত্রই বড়সাহেবের সুনজরে পড়িয়া যাওয়ায় 'বিনা মেঘে জল' যেন বর্ষিত হইল। **বিন্দুবিসর্গ**—[ সামান্য কিছু ]—গত রজনীতে এত বড় কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল, অথচ তাহার 'বিন্দুবিসর্গ'ও আমি জান না। **বিসমিল্লায় ( বা গোড়ায়) গলদ**—[ কোন কাজের শুরুতেই ত্রুটি ]—'বিসমিল্লায় ( বা গোড়ায় ) গলদ' থাকিলে বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধ রচনা করা আদৌ সম্ভব নয়। **ব্যাঙের আধুলি**—[সামান্য ধনগর্বে গর্বিত ব্যক্তির ধন ]—অক্ষক্রীড়ায় মাত্র পাচ শত টাকার বাজী জিতিয়া তাহার যে পরিমাণ বাবুগিরি বাড়িয়া গেল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, সে 'ব্যাঙের আধুলি' পাইয়াছে। **ব্যাঙের সর্দি**—[অভ্যস্ত বিষয়ে কোনও কষ্ট হয় না অর্থাৎ অসম্ভাব্য ঘটনা ]—হাজতেই যাহার যৌবনকাল কাটিয়া গিয়াছে, আবার হাজতবাস তো তাহার কাছে 'ব্যাঙের সর্দি' তুল্য। **বুক দশ হাত হওয়া**—[আনন্দে ও উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ ও প্রসারিত হওয়া ]—এবারকার আই. এ. পরীক্ষায় পুত্র উদয়ন সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় পিতা পার্বতীনাথের 'বুক দশ হাত হইল'। **বুকের পাটা**—[ সাহসের সীমা ; সাহস ]—দশ বছরের ছেলের এমনই 'বুকের পাটা' যে সে একাকী অমাবস্যার রাতে গ্রামের একান্তে অবস্থিত শ্মশানে অনায়াসে উপনীত হইল। **বোঝার উপর শাকের আঁটি**—[অনেক-কিছুর উপরে অল্প-কিছু চাপানো।]—নিমন্ত্রণ-বাড়িতে প্রকাশবাবু সত্তরটি রসগোল্লা খাইবার পরেও পঁচিশটি পানিতোয়া খাইয়া 'বোঝার উপরে শাকের আঁটি'ই যেন রক্ষা করিলেন !

**ভরাডুবির মুষ্টিলাভ**—[ সর্বস্ব হারাইয়া সামান্য কিছু থাকা ]—জমিদারের সহিত মামলায় হারিয়া সমগ্র বিষয়-আশয় যাইবার পরে এই বাস্তুভিটাটুকুই এক্ষণে 'ভরাডুবির মুষ্টিলাভ' হিসাবে রহিয়াছে। **ভস্মে ঘি ঢালা**—[ যথাসময়ে কাজ না করিয়া, কাজ নষ্ট হইয়া গেলে তাহার জন্য পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করা কিংবা পরিশ্রম বা অর্থব্যয় ব্যর্থ হওয়া ]—সারা বৎসর না পড়িয়া, পরীক্ষার পূর্বরাত্রে মাত্র পড়িয়া তুমি 'ভস্মে ঘি ঢালিতেছ'। **ভাঁড়ে মা ভবানী**—[ ভাণ্ডারশূন্য ]—ছাত্রটির বেশভূষার চাকচিক্য অথচ মনের ভাণ্ডারে বিদ্যাবুদ্ধি কিছু নাই—একেবারে 'ভাঁড়ে মা ভবানী'! **ভাইয়ের ভাত ভাজের হাত**—[ যে স্ত্রীলোক ভ্রাতৃগৃহে বাস করে, সে ভ্রাতার অন্ন তো খায়ই, ভ্রাতৃজায়ারও কর্তৃত্ব সহ্য করে ]—রমা আজ বিধবা অসহায় বলিয়া তাহার অদৃষ্টে 'ভাইয়ের ভাত ভাজের হাত'—দুইই জুটিতেছে। **ভাগের মা গঙ্গা পায় না**—[ ভাগাভাগির কাজে কাহারও আন্তরিকতা না থাকায় কাজ সুসিদ্ধ হয়

না ]—পাঁচ শরীকের জমিদারিতে কেহই লাটের খাজনা দিতে চায় না—এ যেন 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'। **ভালুক-জ্বর**—[ ক্ষণিক কম্পজ্বর, ক্ষণস্থায়ী জ্বর ]—ম্যালেরিয়া-রোগী গফুর তাহার 'ভালুক-জ্বর' ছাড়িয়া যাইবামাত্রই ভাত খাইতে বসিল। **ভিজা বিড়াল**—[ কপটাচারী ]—তাহার ন্যায় 'ভিজা বিড়াল'কে শায়েস্তা করা আমার কর্ম নয়। **ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া**—[ প্রতিশোধপরায়ণ জনমণ্ডলীর ক্রোধ উদ্রেক বা উত্তেজিত করা ]—প্রচলিত জনমতের বিরোধী হওয়া আর 'ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া' একই কথা। **ভুঁইফোড়**—[ নূতন অভ্যুদিত, অর্বাচীন ]—সংগীতশাস্ত্রের অ-আ-ক-খ না শিখিয়াই নির্মলকুমার 'ভূঁইফোড়' ওস্তাদ বনিয়া গিয়াছে। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ**—[অপরিমেয় অপব্যয়]—অলিম্পিক-প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়েরা সরকারের টাকায় 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' করিয়াছে। **ভূতের বেগার**—[ লভ্যহীন কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কার্য ]—যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণার বিনিময়ে দীনদরিদ্র শিক্ষকসমাজ পুস্তক-প্রকাশকদিগকে যে গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় করিয়া থাকে তাহা মূলতঃ 'ভূতের বেগার' খাটা ছাড়া আর কিছুই নয়। **ভুষণ্ডী কাক**—[ অলস ব্যক্তি ] জগতের অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য তোমার এই যে নৈষ্কর্ম্য, 'ভুষণ্ডী কাকে'রই কথা মনে করাইয়া দেয়। **ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা**—[ বিপদের প্রতিকার-চেষ্টা নাই, অথচ কোলাহল-সৃষ্টি ]—সাপকে না মারিয়া এই যে চীৎকার, ইহা 'ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা'রই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

**মগের মুল্লুক**—[ অরাজক দেশ ]—আমাদের এই দেশ 'মগের মুল্লুক' নয় যে, পাচ টাকা দামের সামগ্রী বিশ টাকায় বিক্রীত হইবে। **মণিকাঞ্চন-যোগ**—[ স্বর্ণের সহিত মণির সংযোগের ন্যায় শোভন ও সংগত ]—গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার মিতালি 'মণিকাঞ্চন-যোগে'র ন্যায় হইয়াছিল। **মশা মারতে কামান দাগা** ( বা **পাতা** )—[ 'সামান্য কার্যে বৃহৎ আয়োজন করা'—এই উপহাস-ব্যঞ্জক অর্থে ব্যবহৃত হয় ]—একটি ছিঁচকে চোরকে গ্রেপ্তার করবার জন্য গোটা সৈন্যবাহিনীর তলব হওয়ায় মনে হচ্ছে, এ যেন 'মশা মারতে কামান দাগারই ( বা পাতারই)' সামিল। **মাকাল ফল**—[ অন্তঃসারহীন ব্যক্তি]—পদ্মলোচন দেখিতেই সুন্দর কিন্তু আকাট মূর্খ—ঠিক যেন 'মাকাল ফল'। **মাছের মার পুত্রশোক**—[ অর্থহীন বেদনাবোধ ]—চোরাবাজারের কৃপায় লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া যে কয়েকশত টাকা লোকসান দিয়াছে, তাহার অর্থশোক 'মাছের মার পুত্রশোকে'র সহিত তুলনীয়। **মাটির মানুষ**—[ অতীব নিরীহ বেচারী ]—হরিশবাবু অত্যন্ত ভদ্র, সত্যই 'মাটির মানুষ'। **মাঠে মারা যাওয়া**—[ দেখাশোনা করিবার লোক নাই, এমন স্থানে দস্যু কর্তৃক নিহত হওয়া; এমনভাবে বিনষ্ট হওয়া যে তাহার কোন খোঁজ-খবর

হয় না ]—হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় পরীক্ষার্থী নরেনের সকল পরিশ্রম 'মাঠে মারা যাইবে' বলিয়াই মনে হয়। **মাণিক-জোড়**—[ 'অভিন্নহৃদয় বন্ধুদ্বয়' অর্থে শব্দটি সাধারণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয় ]—পড়াশুনায় হেলাফেলা করিয়া ও খেলাধূলায় মাতোয়ারা হইয়া হরেন ও নরেন, এই দুটিতে যেন 'মাণিক-জোড়' হইয়াছে। **মাৎস্য-ন্যায়**—[ বড়ো মাছ যেমন ছোটো মাছকে গ্রাস করে, সেইরূপ বলবান কর্তৃক দুর্বলকে নাশ করা অর্থাৎ অরাজকতা ]—অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের ভারতবর্ষে 'মাৎস্য-ন্যায়' সূচিত হইয়াছিল। **মাথার মণি, মাথার ঠাকুর**—[ পরম শ্রদ্ধেয় বা ভক্তিভাজন ]—স্বামী বিবেকানন্দ শুধু বাঙ্গালী জাতির কেন, নিখিল বিশ্ববাসীর 'মাথার মণি ( বা মাথার ঠাকুর )'। **মাথা নাই তার মাথা ব্যথা**—[ কারণ অভাবে কার্যের কল্পনা, যাহা অকারণ ও উপহাস্যজনক ]—তোমার এক কপর্দকের সংস্থান নাই, অথচ লক্ষ টাকার ব্যবসায় ফাঁদিবার এই যে সংকল্প, ইহা 'মাথা নাই তার মাথা ব্যথা'রই সামিল। **মাথা হেঁট করা**—[ বশ্যতা স্বীকার করা ]—যতই মারধোর করা যাক না কেন, উদ্ধত সন্তান কিছুতেই পিতার নিকট 'মাথা হেঁট করে' না। **মান্ধাতার আমল** [ অতি প্রাচীন কাল ]—আমাদের দেশের চাষীরা 'মান্ধাতার আমলে'র সেই চাষ-পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়া থাকে। **মায়ের দয়া**—[ মা শীতলার কৃপা অর্থাৎ বসন্তরোগ ] —হরেনবাবুর গাত্রে 'মায়ের দয়া' হইয়াছে। **মিছরির ছুরি**—[ অন্তরে মিষ্ট, অথচ বাহিরে বেদনাদায়ক ]—'যেন জন্মান্তরে সুখী হই'—গোবিন্দলালের প্রতি মুমূর্ষু ভ্রমরের এই যে উক্তি, ইহাতে প্রেমের কোমলতা ও পুণ্যের কঠোরতা উভয়ই আছে—এ যেন 'মিছরির ছুরি'। **মুখপাত্র**—[ অগ্রণী, প্রধান ]—হরেনকে আমাদের দলের 'মুখপাত্র হিসাবে' গণ্য করিয়া কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত আমরা সাক্ষাৎ করিলাম। **মুখে ফুল-চন্দন পড়া**—[ শুভ সংবাদ শুনিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ]—পরীক্ষায় পাশ হইবার সংবাদ যখন আনিয়াছ, তখন তোমার 'মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক'। **মুসকিল আসান**—[ বিপদের শান্তি ; আপদ নিবারণ ]—বাত্যা-বিক্ষুব্ধ নদীবক্ষে মাঝিমাল্লারা শেষ অবধি পাঁচ পীরের নাম স্মরণ করিয়া 'মুসকিল আসান' করিবার প্রয়াস পাইল। **মেনিমুখো**—[ সলজ্জ ]—বিপিন এমনই 'মেনিমুখো' ছেলে যে সাহস করিয়া আপন মনের কথা সে কাহাকেও বলিতে পারে না। **ম্যাও ধরা**—[ ঝক্কি পোয়ানো ]—দিবারাত্র এত পরিশ্রম করবার দরুণ অসুখ হ'লে, শেষে 'ম্যাও ধ'রবে' কে ?

**যখের** বা **যক্ষের ধন**—[ অতিশয় কৃপণের ধন ]—মৃত্যুকাল অবধি জয়রাম আজীবন সঞ্চিত পাঁচ হাজার টাকা 'যখের বা যক্ষের ধনে'র ন্যায় আগলাইয়া রাখিয়াছিল। **যত গর্জে তত বর্ষে না**—[ মুখে দড়, কিন্তু কাজে বড়ো নয় ]—আপিসের

বড় বাবুটি সাধারণ কেরাণীদিগকে খুবই শাসায়, কিন্তু আর্থিক ক্ষতি করে না দেখিয়া মনে হয় যে, সে 'যত গর্জে তত বর্ষে না'। **যমের অরুচি, যমের ভুল**—['যাহার মৃত্যু নাই' এই ব্যঙ্গার্থে]—দুষ্টশিরোমণি বিনোদ 'যমের অরুচি' ( বা যমের ভুল )'।

**রগচটা**—[ কোপন-স্বভাব ]—'রগচটা' ব্যক্তির সঙ্গে নরম মেজাজে কথা কহিলে সুফল ফলে। **রক্তের টান**—[ স্ববংশীয়ের প্রতি মমতা ]—'রক্তের টান' আছে বলিয়াই বিবাদ-বিসংবাদের পরেও আবার দুই ভাই মিলিয়াছে। **রাই কুড়িয়ে বেল**—[ অল্প অল্প সঞ্চয় করিয়া প্রচুর অর্থ জমানো ]—পাকা গৃহিণী মাত্রেই প্রতি মাসে সংসারখরচের টাকা থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে 'রাই কুড়িয়ে বেল' সঞ্চয় করেন। **রাঘব বোয়াল**—[ অতীব লোভী ]—পুলিশের চাকরিতে এমন অনেক 'রাঘব বোয়াল' আছেন, যাঁহারা যথেষ্ট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। **রাজযোটক**—[ শুভফল-দায়ক মিলন ]—গত সার্বিক যুদ্ধে ইংরাজশক্তির সঙ্গে মার্কিনশক্তির সংযোগসাধনে যেন 'রাজযোটক' দেখা দিয়াছিল। **রাজা-উজীর মারা**—[ লম্বা-চওড়া কথা বলা ]—বেকার ব্যক্তি ঘরে বসিয়া যখন 'রাজা-উজীর মারিতে' থাকে, তখন তাহা শুনিয়া কৌতুক অনুভব করা যায়। **রাবণের চিতা**—[ চির অশান্তি ]—একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে বিধবার অন্তরে যে 'রাবণের চিতা' জ্বলিতেছে, কোনদিনই তাহা নিবিবে না। **রাসভারী**—[ গম্ভীরপ্রকৃতি ]—সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র এমন 'রাসভারী' ব্যক্তি ছিলেন যে ছাত্রগণ কেন, অধ্যাপকেরাও তাঁহার কাছে ঘেঁষিতে সাহসী হইতেন না। **রাহুর দশা**—[ অতীব দুঃসময় ]—'রাহুর দশা'য় পড়িলে মানুষকে নাস্তানাবুদ হইতে হয়। **রুই-কাৎলা**—[ নেতৃস্থানীয় ]—কংগ্রেসের চুনোপুটি নয়, 'রুই-কাৎলা'রাই ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী।

**লক্ষ্মীর বরযাত্রী, সুখের পায়রা, দুধের মাছি**—[ সুসময়ের বন্ধু, কিন্তু অসময়ে কেহ নয় ] —ধনীর দুলালের হাতে যে কয়দিন ধনরত্ন থাকে, সেই কয়দিনই তোষামোদকারীরা 'লক্ষ্মীর বরযাত্রীর ( বা সুখের পায়রার, দুধের মাছির )' ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া থাকে। **লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা মাগে**—[ সংগতি-শালিনী রমণীর অভাব-জ্ঞাপক ]—দশ-বিশটি বাড়ির অধিকারিণী হইয়া মেনকা যখন তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থভিক্ষা করিতে থাকে, তখন মনে হয়, সত্যই বুঝিবা 'লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা মাগে'। [ **মন্তব্য**ঃ 'লক্ষ্মীর মা' কথাটি প্রচলিত নয়, 'লক্ষ্মীর পুত' কথাটিই প্রচলিত। ] **লগন-চাঁদ**—[ ভাগ্যবান ]—সাধনকুমার 'লগন-চাঁদ' ছেলে বলিয়াই তো তাহার জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পিতা পার্বতীনাথ তিন হাজার টাকা পাইয়াছেন। **লম্বা দেওয়া**—[ চম্পট ]—গভীর রজনীতে চোর মূল্যবান অলংকারাদি চুরি করে 'লম্বা দিয়েছে'। **লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না**—[ পদাঘাতের যোগ্য

ব্যক্তি চড় খাইয়া কাজ দেয় না, অর্থাৎ লঘু শাসন মানে না ]—'লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না'—এই কথাটি যে ব্যক্তি জানে, সে মিষ্টি কথায় নয়, প্রচণ্ড প্রহারে দুষ্ট জনকে শায়েস্তা করিবে। **লেফাফা-দুরস্ত**—[ বাহিরের আচরণে দক্ষ, কিন্তু প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে বিপরীত ]—হিতেন্দ্রনাথ এমন 'লেফাফা-দুরস্ত' যে, তাহার চালচলনে দারিদ্রের ক্ষীণ রেখাও ফুটিয়া ওঠে না।

**শকুনিমামা**—[ অনিষ্ট কারী ব্যক্তি ]—গ্রামের বহুলোকের অনিষ্ট সাধন করিয়া যতীনবাবু সত্যই যে 'শকুনিমামা' তাহা সপ্রমাণিত করিলেন। **শনির দৃষ্টি**—[ ধনক্ষয়ী ও সর্বনাশকর দৃষ্টি ]—মাসখানেকের ভিতরেই তাঁহার পুত্রবিয়োগ ও চাকরিতে জবাব ঘটায় বুঝিতে পারিতেছি যে, তাঁহার উপরে এক্ষণে 'শনির দৃষ্টি' পড়িয়াছে। **শাঁখের করাত, জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ, দোটানায় পড়া**—[ উভয় সংকট ]—বিদেশস্থিত মৃত্যুপথযাত্রী প্রিয়জনকে না দেখিলে প্রাণ বাঁচে না, আবার দেখিতে গেলেও এখানকার চাকরি যায়—এ যেন 'শাঁখের করাত ( বা জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ, দোটানায় পড়া )'। **শাক দিয়ে মাছ ঢাকা**—[ গুরুতর কলঙ্ক সামান্য উপায়ে বা সহজে ঢাকিবার প্রচেষ্টা ]—প্রচুর উৎকোচ খাইয়া বাড়িখানি হাল ফ্যাসানের আসবাবপত্রে সাজাইয়াছ অথচ বলিয়া বেড়াইতেছ যে, এসবই তোমার কোন বন্ধুর দান—এ যেন তুমি 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকিতেছ'! **শাপে বর**—[ অকল্যাণের মধ্যে কল্যাণ ]—নূতন ট্রামরাস্তা বাহির করিবার দরুণ আমার পুরাতন বাড়ি ধূলিসাৎ হইল সত্য, কিন্তু উহার তিনগুণ দাম পাওয়ায় আমার 'শাপে বর'ও হইল। **শিয়ালের যুক্তি**—[ অর্থহীন নিষ্ক্রিয় পরামর্শ ]—তোমাদের এই নিত্যকার শলাপরামর্শ 'শিয়ালের যুক্তি' ছাড়া আর কিছুই নয়। **শিরে সংক্রান্তি**—[ আসন্ন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ]—কালবৈশাখীর মেঘে সমস্ত আকাশকে আচ্ছন্ন হইতে দেখিয়াও, তিনি 'শিরে সংক্রান্তি' রাখিয়া সুপরিসর নদীটি পার হইবার জন্য নৌকায় উঠিলেন। **শূন্যে সৌধ নির্মাণ**—[ অলীক কল্পনা ]—যৌবনে রচিত সোনালী স্বপ্ন আজ এই পরিণত বয়সে 'শূন্যে সৌধ নির্মাণে'র সামিল হইয়াছে।

**ষণ্ডামর্ক**—[ একগুঁয়ে ও বলিষ্ঠ ]—যতীন্দ্রনাথ এই পাড়ার 'ষণ্ডামর্ক' ছেলেদের লইয়া একটি ব্যায়াম-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। **ষাঁড়ের গোবর**—[ অপদার্থ ব্যক্তি ]—লেখাপড়া না শিখিলে পরিণামে 'ষাঁড়ের গোবর' হইতে হয়। **ষাটের ( বা ষেটের ) কোলে**—[ ষষ্ঠীদেবীর কৃপারূপ অঙ্কে ]—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে 'ষাটের ( বা ষেটের ) কোলে' আমার নস্ত এই পঞ্চনরোয় পা দিয়েছে। **ষোল আনা**—[ পুরাপুরি ; সম্পূর্ণ ]—'ষোল আনা' মন দিয়ে কাজ না করলে কার্যসিদ্ধি হয় না। **ষোল কড়াই কাণা**—[ সব ফাঁকি বা অসার ]—বীরেনের হাবভাব

কথাবার্তা চালচলন দেখিয়া মনে হয় যে, তাহার স্বভাবের 'ষোল কড়াই কাণা'। **ষোল কলায়**—[ পুরাপুরি ]—পুত্র শমীন্দ্রনাথ পিতা বীরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি একেবারে 'ষোল কলায়' পাইয়াছে।

**সবে ধন নীলমণি, শিবরাত্তিরের স'লতে**—[ জনক-জননীর একমাত্র বংশধর ]—সাধারণতঃ বাপ-মায়ে তাদের 'সবে ধন নীলমণি ( বা শিবরাত্তিরের স'লতে )' পুত্রকে নাই দিয়া তাহার পরকাল ঝরঝরে করিয়া থাকে। **সরফরাজি করা**—[ মনে মনে বিরূপ, কিন্তু বাহিরে মিত্রতা ]—আদালতে সেদিন আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে এসে আজ তো বেশ 'সরফরাজি' ক'রছ! **স-সে-মি-রা অবস্থা**—[ বাহ্যজ্ঞানশূন্য দশা ]—একদা সে তাহার এক উপকারী বন্ধুর সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল বলিয়াই আজ বিধির বিধানে সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া 'স-সে-মি-রা অবস্থা'য় কালাতিপাত করিতেছে। **সাক্ষীগোপাল**—[ কর্তৃত্বশূন্য কর্তা ]—প্রদেশের শাসন ব্যাপারে রাজ্যপালের কোন অধিকার না থাকায় তিনি নিছক 'সাক্ষীগোপাল'ই। **সাত খুন মাপ**—[ গুরুতর অপরাধেও অব্যাহতিলাভ ]—আপিসের বড় সাহেব তাহার বড় কুটুম্ব বলিয়া বিভাসের 'সাত খুন মাপ'। **সাত-সতেরো**—[নানান্ ]—প্রশ্নের উত্তর সোজা ভাবে না দিয়া 'সাত-সতেরো' ভাবে দিতেছ কেন? **সাপ হয়ে কামড়ানো, রোজা হয়ে ঝাড়া**—[একই সময়ে শত্রুতা-সাধন ও মিত্রতা-প্রদর্শন ]—হরিপ্রিয় মামলা বাধাইতেও যেমন ওস্তাদ, আপোষ করিতেও তেমনি নিপুণ বলিয়াই তো লোকে বলে যে, সে 'সাপ হয়ে কামড়ায়, রোজা হয়ে ঝাড়ে'। **সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে**—[ বিনা ক্ষতিতে কার্যসিদ্ধি, দুই দিক বজায় রাখা ]—ধরা পড়িয়া চাকরি হারাইবে না, অথচ আপিসের গোপন তথ্যাদি বাহির করিতে পারিবে, তবেই তো 'সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে'। **সাপের ছুঁচো গেলা**—[ নিতান্ত অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া কোন কাজ করা ]—তিনশত পৃষ্ঠার বই ছাপিতে গিয়া শেষ অবধি তেরো শত পৃষ্ঠার বই ছাপিতে বাধ্য হইয়া পুস্তক-প্রকাশক মহাশয় 'সাপের ছুঁচো গেলা'র ন্যায় কাজ করিলেন। **সাপের পাঁচ পা দেখা**—[ যাহা হয় না, গর্বান্ধ হইয়া তাহারই সম্ভাবনা দেখা ]—ধনবান ব্যক্তিটির পুত্রাদি থাকা সত্ত্বেও তাঁহার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া রমেন 'সাপের পাচ পা দেখিয়াছে'! **সুখে থাকিতে ভূতে কিলায়**—[ স্বেচ্ছায় দুঃখবরণকারী ]—'সুখে থাকিতে ভূতে কিলাইতেছে' বলিয়াই তিনি সরকারী চাকরি ছাড়িয়াছেন। **'সুশীতল বারি নিক্ষেপ'**—[ প্রশমন করা ]—তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে আমি মিষ্টবাক্যরূপ 'সুশীতল বারি নিক্ষেপ' করিলাম। **সোনা বাহির আঁচলে গেরো**—[ মূল্যবান জিনিস ফেলিয়া মূল্যহীন জিনিসের সমাদর ]—মানসম্মান বিসর্জন দিয়া তুচ্ছ প্রাণের প্রতি এই যে মমতা, ইহা সোনা বাহির আঁচলে

**সেরো'রই লাগিল। সোনায় সোহাগা, চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা**—[ **দুইটি বিষয় বা বস্তুর সংস্পর্শ-জনিত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোধক** ]—(ক) সে পৈত্রিক সম্পত্তি তো পাইলই, তদুপরি মাতুলের বিষয়-আশয়ও লাভ করিল—এ যেন 'সোনায় সোহাগা ( বা চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা )'। (খ) চোরে তো তাহার সর্বনাশ করিলই, অধিকন্তু বাটপাড়ের উপদ্রবে আরও উৎপীড়িত হইল—এ যেন 'সোনায় সোহাগা ( বা চূড়ার উপর ময়ূর পাখা )'। **স্বখাত সলিল**—[ নিজ হাতে খনিত ]—ক্ষুদ্র ব্যবসায়কে অতি সত্বর বৃহৎ করিতে গিয়া তিনি 'স্বখাত সলিলে' ডুবিয়া মরিলেন।

**হ-য-ব-র-ল**— [ বিশৃঙ্খলা ]—এক আরম্ভিতলকে রাজনীতি, দর্শনশাস্ত্র, ডাক্তারী-শাস্ত্রের উপরে লিখিতে দেখিয়া আমাদের মনে এই কথাই জাগে যে, তখনকার বিদ্যাগুলি 'হ-য-ব-র-ল, হইয়া একত্র ঠাসাঠাসি করিয়া থাকিত। **হরিষে বিষাদ** [ আনন্দ বিষাদে পরিণত বা হর্ষশোকের মিশ্রণ ]—বাংলায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়া পাশ করিবার খবর আসিবার পরই অসুস্থ ভূধর মৃত্যুপথযাত্রী হওয়ায় সমগ্র পরিবারে 'হরিষে বিষাদ' উপস্থিত হইল। **হস্তামলক**—[ করায়ত্ত সামগ্রী ] —লেখাপড়া না ক'রলে পরীক্ষায় পাশের ব্যাপারটি ঠিক 'হস্তামলক' হয়ে উঠ্‌বে না। **হাড়হদ্দ**—[ নাড়ীনক্ষত্র ]—জগন্নাথ আমাকে যতই জব্দ করিবার চেষ্টা করুক না কেন, আমি তাহার 'হাড়হদ্দ' জানি। **হাড়-হাবাতে**—[ হতভাগ্য ]—উচ্চবংশের ছেলে হইলেও ঐ 'হাড়-হাবাতে'র সঙ্গে তুমি একেবারে মিশিবে না। **হাড়ে দূর্বা গজানো**—[ অতীব কুঁড়ের লক্ষণ ]—কোন কাজকর্ম না করিয়া রাতদিন বসিয়া থাকিতে থাকিতে 'হাড়ে দূর্বা গজাইয়াছে'। **হাড়ির হাল**—[মলিন]—রোদ-বৃষ্টিতে কাজ করিতে করিতে তোমার চেহারাটি 'হাড়ির হাল' করিয়া তুলিয়াছ। **হাড়ে বাতাস লাগা**—[ শান্তি ও আরাম পাওয়া ]—পাড়া-কুঁদুলে পাঁচির-মা মারা যাওয়ায় পল্লীবাসি-গণের 'হাড়ে বাতাস লেগেছে'। **হাড়ে হাড়ে চেনা**—[ মর্মান্তিক রূপে পরিচয় পাওয়া ]—সেই নির্মম সুদখোর ব্যক্তিকে সর্বহারা জয়গোপাল 'হাড়ে হাড়ে চিনিয়াছে'। **হাত ধুইয়া বসা**—[ একেবারে নির্লিপ্ত হওয়া ]—এইবৃদ্ধ বয়সে সংসার হইতে যখন 'হাত ধুইয়া বসিয়াছি', তখন আর আমায় সাংসারিক ক্রিয়াকাণ্ডে জড়াইও না। **হাতে মাথা কাটা**—[ ঘোরতর অত্যাচার করা ]—তাঁহার ন্যায় অহংকারী ব্যক্তি যদি এই আপিসের বড় বাবু হন, তাহা হইলে তিনি অধীনস্থ কর্মচারীদের 'হাতে মাথা কাটিবেন'। **হাতের পাঁচ**—[ অধিকারের নিবিড়তা ]—'হাতের পাঁচ' চাকরি তো আছেই, তাহার উপর এই ব্যবসায়—তবে আর ভয় কি? **হাত দিয়া হাতী ঠেলা**—[অসম্ভবকে সম্ভব করিতে যাওয়া ]—'হাত দিয়া হাতী ঠেলিবার, মত দুরাশা আমার নাই। **হাত পা বাহির করা**—[ কল্পনাযোগে প্রকৃত বিষয়কে অতিরঞ্জিত করা ]—মূল ঘটনাটির 'হাত

পা বাহির করিয়াই' দেখিতেছি। **হাতে পাঁজি মঙ্গলবার**—[জানিবার সুযোগ থাকিতে বৃথা তর্ক]—শব্দটির অর্থ লইয়া তত আলোচনা না করিয়া 'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার' ঐ অভিধানটি দেখিলেই তো চলে। **হাতের জল না গলা**—[কৃপণতা করা]—যাহার 'হাতে জল গলে না' এমন লোকের নিকট হইতে পাঁচ টাকা চাঁদা আদায় করিয়াছ? **হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা**—(উপস্থিত সুযোগ ত্যাগ না করা]—আজ সরকারী চাকরি করিতে অস্বীকার করিয়া 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতেছ', কিন্তু একদিন ইহার জন্য পস্তাইবে। **হাত ঝাড়া দিলে পর্বত**—[ধনাধিক্যের চিহ্ন]—ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিবার প্রয়োজন নাই, তোমার কাছে যাহা আছে, তাহাই 'হাত ঝাড়া দিলে পর্বত' হইবে। **হাতে-খড়ি**—[শিক্ষারম্ভ]—আগামী সোমবার বিরাজের 'হাতে-খড়ি হইবে। **হাত-ধরা**—[বশীভূত]—আপিসের বড় সাহেব আমার 'হাত-ধরা' লোক হওয়ায় ছোট ভাইয়ের চাকরি হইয়াছে। **হাত-টান**—[চৌর্যবৃত্তি]—সুলেখক মণিবাবুর 'হাত-টান' থাকায় তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা সর্বদাই তটস্থ থাকেন। **হাটে হাঁড়ি ভাঙা**—[গোপন তথ্য প্রকাশ করা]—মন্ত্রী মহাশয়ের সম্পর্কে 'হাটে হাঁড়ি ভাঙিলে'ও তিনি নির্বিকারই থাকিবেন। **হাল ছাড়া**—[হতাশ হওয়া]—ভোট-গণনার সময়ে যখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাঁচ হাজার ভোটে অগ্রগামী হইতে দেখিলাম, তখনই আমি জয়লাভের ব্যাপারে 'হাল ছাড়িয়া' দিলাম। **হালে পানি পাওয়া**—[কোনরূপে সফল হওয়া]—সারা দুই বছর ধরিয়া যথানিয়মে না পড়িলে পরীক্ষাকালে 'হালে পানি পাওয়া' যায় না।

## অনুশীলনী

[এক] নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলি প্রয়োগ করিয়া পৃথক পৃথক বাক্য রচনা কর:—চিনির বলদ; কূপমণ্ডূক; ডুমুরের ফুল; পুকুর চুরি; মণিকাঞ্চনযোগ; সাপে-নেউলে; অরণ্যে রোদন; বিড়াল-তপস্বী; তাসের ঘর; উত্তমমধ্যম; অন্ধের যষ্ঠি; সোনায় সোহাগা; হাতের পাঁচ; শাঁখের করাত; মিছরির ছুরি; আকাশ-কুসুম; ব্যাঙের আধুলি; রাজযোটক; শিরে সংক্রান্তি; বিসমিল্লায় গলদ; তীর্থের কাক; গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল; ছেলের হাতের মোয়া; আঠারো মাসে বছর; দশচক্রে ভগবান ভূত; সাপের পাঁচ পা; কালনেমির লঙ্কাভাগ; বোঝার উপরে শাঁখের আঁটি; সুখের পায়রা; বিনা মেঘে জল; বালির বাঁধ; অমাবস্যার চাঁদ; তুলসীবনের বাঘ; গায়ে কাঁটা দেওয়া; হাড়ে হাড়ে চেনা; অর্ধচন্দ্র দান; ভিজা বিড়াল; 'সুশীতল বারি-নিক্ষেপ'; তালপাতার সেপাই; চক্ষে সরিষার ফুল দেখা; মাথা হেঁট করা; মুখে ফুলচন্দন পড়া; হাত ধুইয়া বসা; ডালভাঙা ক্রোশ; কলুর বলদ; বাঘের মুখ;

যখের ধন ; বিদুরের খুদ ; রাবণের চিতা ; জলাঞ্জলি দেওয়া ; হাতে-খড়ি ; মশা মারতে কামান দাগা ; হাটে হাঁড়ি ভাঙা ; মাঠে মারা যাওয়া ; ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে ; ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি ; রাই কুড়িয়ে বেল ; নামকাটা সেপাই ; ত্রাহি ত্রাহি ; আসমান-জমিন ফারাক্ ; টীকা-ভাষ্য ; ঊনপঞ্চাশ বায়ু। **ক. বি. বি.মাধ্যমিক '৩৪, '৩৯, '৪১, '৪২, '৪৩, ( অতি ) '৪৯, '৫২, ( বিকল্প) '৫৩, (বিকল্প ) '৫৮,(বিজ্ঞান) '৫৯**

[ দুই ] প্রত্যেকটির অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া অর্থোপযোগী এক একটি বাক্য গঠন কর :—সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে ; বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো ; এক মাঘে শীত যায় না ; আক্কেলসেলামী ; আদায়-কাঁচকলায় ; মুখরক্ষা ; হাতে মাথা কাটা ; মুখ চুন ; মুখে কালি ; চোখের বালি ; ঢলাঢলি ; চোখ ফোটা ; একচোখো ; কেঁচে গণ্ডূষ করা ; খুঁড়িয়ে বড় হওয়া ; নিজের কোলে ঝোল টানা ; শিয়ালের যুক্তি ; ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো ; সাপ হয়ে কামড়ানো, রোজা হয়ে ঝাড়া ; সাপের ছুঁচো গেলা ; ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা ; স্বখাত সলিল ; গৌরচন্দ্রিকা ; চিত্রগুপ্তের খতিয়ান ; কাক-ভূষণ্ডী ; হস্তামলক ; শাঁখের করাত ; দক্ষযজ্ঞ ; মুসকিল আসান ; আকাশ থেকে পড়া ; তাসের ঘর ; চিনির বলদ ; কাষ্ঠ হাসি ; কানে তুলো দেওয়া ; চোখে ধুলো দেওয়া ; দন্তস্ফুট করা ; ধান ভানতে শিবের গীত ; লম্বা দেওয়া ; হাড়ে বাতাস লাগা ; বিন্দু-বিসর্গ ; হাতটান ; কানপাতলা ; পথের কাঁটা ; ডুবে জল খাওয়া ; গা ঢাকা দেওয়া ; শিবরাত্রির স'লতে ; নদীকূলে বাস। **ক. বি. বি. এ. '৪৪, '৪৫, '৪৬, '৪৮, '৫২, '৫৭, '৫৮, '৫৯**

[ তিন ] নিম্নলিখিত যে কোনও পাঁচটি বাক্যাংশের অর্থ লিখ ও উদাহরণ-স্বরূপ বাক্য রচনা কর :—ভুঁই ফোড় ; অন্ধের নড়ি ; ষাঁড়ের গোবর ; দাকুমড়া ; তেলে-বেগুনে ; মাথার মণি ; ছেলের হাতের মোয়া ; সুখের পায়রা; তিলকে তাল ; কাঁঠালের আমসত্ব ; ভস্মে ঘি ঢালা ; ইঁচড়ে পাকা ; বালির বাঁধ ; আকাশকুসুম ; মুখপাত্র ; মাথা খাওয়া ; যক্ষের ধন ; মান্ধাতার আমল ; মাটির মানুষ ; মাৎস্য-ন্যায় ; গোবরে পদ্মফুল ; অমাবস্যার চাঁদ ; মিছরির ছুরি ; বাগে পাওয়া ; চোখের মাথা খাওয়া ; হাল ছাড়া ; বুকের পাটা ; তালকানা ; বিড়ালতপস্বী ; অকাল কুষ্মাণ্ড ; ডুমুরের ফুল ; ব্যাঙের সর্দি ; পুকুর চুরি ; আক্কেল সেলামী ; কলির সন্ধ্যা।

**ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫০, '৫৬, '৫৭, '৫৮**

[ চার ] যে কোনও পাঁচটি বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশের পৃথক্ পৃথক্ অর্থপূর্ণ বাক্য রচনা কর :—ষোল আনা ; বুক দশ হাত ; ধরাকে সরা-জ্ঞান ; কড়ায় গণ্ডায় ; আক্কেল-সেলামী ; ঘোড়ার ডিম ; ছাই ফেলিতে ভাঙা কুলা ; হাতের পাঁচ ; গোবরে পদ্মফুল ; যজ্ঞের অরুচি ; মায়ের দয়া। **গৌ. বি. বি. এ. '৫১**

[ পাঁচ ] যে কোনও পাঁচটি লইয়া স্বতন্ত্রভাবে পাঁচটি বাক্য রচনা কর :—কাঁচা হাত ; মুখ চুন ; ব্যাঙের সর্দি ; রগ্‌চটা ; হাতের পাঁচ ; সাত-সতেরো ; বড় মুখ ; একচোখো ; ধরি মাছ না ছুঁই পানি ; জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ ; ডুবে ডুবে জল খাওয়া ; ভাইয়ের ভাত ভাজের হাত ; ষাঁড়ের গোবর ; ছেলের হাতের মোয়া ; বর্ণচোরা আঁব ; বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ; অন্ধের নড়ি ; অকাল কুষ্মাণ্ড ; গোবরে পদ্মফুল ; বালির বাঁধ ; কালনেমির লঙ্কাভাগ ; বিড়ালতপস্বী ; মিছরির ছুরি ; আক্কেলসেলামী ; ক'লুকে পাওয়া ; বিস্‌মিল্লায় গলদ ; হ-য-ব-র-ল ; ডান হাতের কাজ : নেক নজরে পড়া ; ফুটো পয়সার লড়াই ; আমড়া গাছের ঢেঁকি ; দহরম-মহরম ; কাঁঠালের আমসত্ত্ব। **রা. বি. মাধ্যমিক '৫৪, '৫৫, '৫৬, '৫৭**

[ ছয় ] নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যে কোন চারিটিকে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের ভিতরে ভাষাপ্রয়োগের বিশিষ্ট রীতিগত ( idiom ) কোন্‌ও ত্রুটি লক্ষ্য করিলে তাহার সংশোধন কর :—( ৵০ ) দেখে শুনে মনে করেছিলুম লোকটা খুবই ধার্মিক, এখন দেখ্‌ছি বাঁশবনের বাঘ। ( ৶০ ) কত দেশ, কত তীর্থ ঘুরিলাম,—কিন্তু কই, হৃদয়ের মানুষ ত পাইলাম না। ( ৷৶০ ) তুমি যে ঘিয়ের পুতুল হে, এইটুকু রোদের তাপেই অস্থির! ( ৷০ ) দেখ্‌লেই বেশ বোঝা যায়, এ অতি অপক্ক হাতের কাজ। ( ৷৵০ ) প্রেমগঙ্গা আজ এমন করিয়া উদ্বেল হইল কেন ? ( ৷৶০ ) এই সামান্য ব্যাপারটাকে তিনি অদ্ভুতভাবে বাড়িয়ে তুলেছেন, একেবারে যেন এইটুকু সরষেকে তাল ক'রে তোলা। ( ৷৷৶০ ) তার সব ছেলেই কৃতী : এক ছেলে সাহিত্যিক, এক ছেলে বড় চাকুরে, এক ছেলে বৈজ্ঞানিক—আকাশে যেন সূর্যের মেলা বসে গেছে। [ **উত্তর**। ( ৵০ ) 'বাঁশবনের বাঘ' স্থলে হইবে 'তুলসীবনের বাঘ'। ( ৶০ ) 'হৃদয়ের মানুষ' স্থলে হইবে 'মনের মানুষ'। ( ৷৶০ ) 'ঘিয়ের পুতুল' স্থলে হইবে 'ননীর পুতুল'। ( ৷০ ) 'অপক্ক হাতের' স্থলে হইবে 'কাঁচা হাতের'। ( ৷৵০ ) 'প্রেমগঙ্গা' স্থলে হইবে 'প্রেমযমুনা'। ( ৷৶০ ) 'সরষেকে তাল' স্থলে হইবে 'তিলকে তাল'। ( ৷৷৶০ ) 'সূর্যের মেলা' স্থলে হইবে 'চাঁদের হাট'। **ক. বি. মাধ্যমিক '৫৪**

[ সাত ] নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ ও প্রবচনগুলির বিকল্প বাগ্‌ধারা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাদের অর্থ নির্ণয় কর :—

অকাল কুষ্মাণ্ড, আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক ; আমড়া কাঠের ঢেঁকি ; এলোপাথারি ; সোনার পাথরের বাটি ; কূপমণ্ডূক ; লাল বাতি জ্বালানো ; গোলেমালে চণ্ডীপাঠ ; ঢিমে তেতালা ; ধর্মের ঢাক আপনি বাজে ; ফেন দিয়ে ভাত খায় গল্পে মারে দই ; পাকা ধানে মই ; গোড়ায় গলদ ; মাথার মণি ; যমের ভুল ; দুধের মাছি ; শাঁখের করাত ; শিবরাত্তিরের স'লতে ; সোনায় সোহাগা।

# সপ্তম পর্ব

## অলংকার-প্রকরণ

### অলংকারশাস্ত্র ও অলংকার

ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় 'কাব্যালোকে' বলিয়াছেন,—"সংস্কৃত 'অলম্' শব্দের এক অর্থ 'ভূষণ'। অতএব, অলম বা ভূষণ করা হয় যাহা-দ্বারা, তাহাই 'অলংকার'। 'অলংকার' শব্দের ব্যাপক অর্থ তাই 'সৌন্দর্য', সংকীর্ণ অর্থ 'অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি বিশিষ্ট অলংকার-বস্তু'। 'অলংকার-শাস্ত্র'-এর প্রকৃত অর্থ 'সৌন্দর্য-শাস্ত্র' বা 'কাব্যসৌন্দর্য-বিজ্ঞান', ইংরাজিতে যাহাকে বলা যাইতে পারে *Aesthetic of Poetry*। কারণ, প্রাচীন আচার্যগণ বাস্তবিকই অলংকারশব্দ সৌন্দর্য-অর্থে গ্রহণ করিয়া কাব্যশাস্ত্র বা *Poetics*-এর তদ্রূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। 'অলংকার' শব্দ বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করিয়া অনুপ্রাস-উপমাদি, ইংরাজিতে যাহাদের বলে *Figures of speech*, তাহাও তাঁহারা বুঝাইয়াছেন, এবং একটি পৃথক্ অধ্যায়ে উহার আলোচনা সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রাচীনদের আলোচনা হইতে মনে হয়, তাঁহারা সকলেই বিশিষ্ট অলংকারকে কাব্যের অনিত্য বা অস্থির ধর্ম মনে করিতেন, তাহা যেন কাব্যশরীরে আত্মভূত বা অঙ্গভূতও নয়, তাহা শোভাবর্ধক কটককুণ্ডলাদির ন্যায় আরোপ্য বস্তু; এই ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন করিয়া অলংকারের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করেন ধ্বনিবাদিগণ ধ্বনিকার, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি।...

"আমাদের মনে হয় আসল ভ্রম হইয়াছে অলংকারকে শব্দার্থ হইতে একেবারে পৃথক্ করিয়া বিচার করায়। অলংকারের অলংকারত্ব শব্দার্থের সাধনে, শব্দার্থের উপাদানে। বস্তুতঃ অলংকার যেখানে কাব্যের সৌন্দর্যজনক, সেখানে তাহা কাব্যের শরীর শব্দার্থেরই অভিন্ন রূপ মাত্র। সে রূপ বাদ দিয়া রসের প্রকাশ হয় না। অবশ্য স্বভাবোক্তিময় নিরলংকার কাব্য হইতে পারে, কিন্তু অলংকার থাকিলে ভাষা হইবে কাব্যের ভাষা বা বাচ্য, রূপেরও রূপ, কাব্যের অভিন্ন সত্তা; অন্ততঃ উত্তম কাব্যে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিলে কাব্যের কাব্যত্ব থাকিবে না। অলংকার থাকিলে কাব্যের রূপই হইবে অলংকারময়, তাহা খসাইয়া লইলে কাব্যের রূপই হয় অন্তর্হিত, সে ক্ষেত্রে কাব্য হয় রূপহীন রসহীন তত্ত্ব বা তথ্যমাত্র। তাই শ্রেষ্ঠ কাব্যে বাচ্য ও অলংকারে কোন প্রভেদ নাই, কবির রসপ্রকাশের ভাষা, অর্থাৎ 'ভাবের রূপের মাঝারে অঙ্গ' লাভই প্রকৃত অলংকার। এই কথাটিই ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধন সুন্দর ও সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন।"

## শব্দালংকার ও অর্থালংকার

ডক্টর দাশগুপ্ত 'কাব্যশ্রী'তে বলিয়াছেন—"শব্দের দুইটি অংশ—ধ্বনি ( sound ) ও অর্থ ( sense )। 'ধ্বনি' হইতেছে 'সংকেত', 'অর্থ' হইতেছে 'সংকেতিত'। শব্দের সংকেতরূপ যে ধ্বনি, তাহার আশ্রয়ে শব্দালংকার, আবার শব্দের সংকেতিত রূপ যে অর্থ, তাহার আশ্রয়ে হয় অর্থালংকার। শব্দ যেখানে সংকেত-সংকেতিত সম্পর্ক ছাড়াই কেবল ধ্বনিরূপ বা sound value দ্বারা অর্থকে ধ্বনিত বা আভাসিত করিতে পারে, সেখানেই খাঁটি শব্দালংকার। ইহাতেই কাব্যের সংগীতধর্ম পরিস্ফুট। বাংলায় এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ধ্বন্যুক্তি ও অনুপ্রাস অলংকার দ্বারা।……অনুপ্রাসে বিভিন্ন শব্দের বর্ণসাম্যের ফলে ধ্বনিসাম্য এবং ধ্বনিসাম্য-দ্বারা অর্থ আভাসিত হয়। শব্দালংকারের আর একটি ভেদ আছে, তাহা ধ্বনিচাতুর্যমাত্র, তাহা কদাচ অর্থের ইংগিত বহন করে না। যমক, শ্লেষ প্রভৃতি অলংকার উহার অন্তর্গত।…ইহাতে ( অতিশয়োক্তি ইত্যাদিতে ) কাব্যের চিত্রধর্ম পরিস্ফুট। ইহার আশ্রয়ে ব্যঞ্জনার দ্বারা সূক্ষ্ম বিলাসও আস্বাদন করা যায়। বস্তুতঃ অনুপ্রাস ও উপমা—ইহারাই শ্রেষ্ঠ কাব্যালংকার। অনুপ্রাস যেমন বর্ণসাম্য বা ধ্বনিসাম্য, উপমা সেইপ্রকার রূপসাম্য বা অর্থসাম্য। একের কারবার শব্দ-জগৎ ও সংগীত লইয়া, অপরের কারবার দৃশ্য-জগৎ ও চিত্র লইয়া।"

## শব্দালংকার

শব্দালংকারের মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, ধ্বন্যুক্তি ও পুনরুক্তবদাভাস—এই পাচটিই প্রধান। শব্দালংকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, শব্দটির পরিবর্তন ঘটিলে অলংকারবিচ্যুতি হয়। পক্ষান্তরে, অর্থালংকারের ব্যাপারই এই যে, শব্দের যোগ্য প্রতিশব্দ দিতে পারিলে অলংকার-বিচ্যুতি আদৌ ঘটে না।

### অনুপ্রাস

একই বর্ণ অথবা বর্ণসমষ্টি, যুক্তভাবে বা ছাড়াছাড়ি ভাবে, যখন বারবার ধ্বনিত হয়, তখন হয় অনুপ্রাস অলংকার। বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির অনুপ্রাস হইবার ক্ষেত্রে সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির সঙ্গে মিলিত স্বরধ্বনি যদি আলাদাও হয়, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি নাই : যেমন,—

> 'কুটিল কুন্তল কুসুম কাঞ্চনি কান্তি কুবলয় ভাষায়।
> কুঞ্চিতাধর কুমুদকৌমুদী কুন্দকোরক হাসায়।' —গোবিন্দদাস।

—এখানে স্বরধ্বনির বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও অনুপ্রাস হইয়াছে। সাতটি ক-ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়াছে উ-ধ্বনি, দুইটি ক-ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়াছে আ-ধ্বনি, একটি ক-ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়াছে ঐ-ধ্বনি আর একটি ক-ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়াছে ও-ধ্বনি।

অনুপ্রাস হয় নানা রকমের। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, অনুপ্রাসের পাঁচটি রূপ: বৃত্ত্যনুপ্রাস, গুচ্ছানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস বা একানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, মালানুপ্রাস।

**(১) বৃত্ত্যনুপ্রাসে** বা **সরল অনুপ্রাসে** প্রধানতঃ একটি বর্ণই দুই বা ততোঽধিক বার ধ্বনিত হয়: যেমন,—

(ক) 'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে' —বঙ্কিমচন্দ্র।

(খ) 'দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিনী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোল আনা গৃহিণী।' —বঙ্কিমচন্দ্র।

(গ) 'একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটিরে
নীরবে ?' —মধুসূদন।

**(২) গুচ্ছানুপ্রাসে** ব্যঞ্জনবর্ণের গুচ্ছ বা সমষ্টি একই ক্রমে অনেকবার আবৃত্তি হয়। দুই বা ততোঽধিক ব্যঞ্জনবর্ণের এই গুচ্ছ হয় যুক্তভাবে, নয় অযুক্তভাবে ধ্বনিত হইয়া থাকে: যেমন,—

(ক) 'না মানে শাসন বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেল, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মত।' —রবীন্দ্রনাথ।

(খ) 'নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।' —গোবিন্দদাস।

**(৩) ছেকানুপ্রাসে** দুই বা ততোঽধিক ব্যঞ্জনবর্ণের একই ক্রমে একবার মাত্র আবৃত্তি অর্থাৎ দুইবার ধ্বনিত হয়। এইজন্য ইহাকে একানুপ্রাসও বলা হয়: যেমন,—

(ক) 'যদি না পাই কিশোরীরে, কাজ কি শরীরে।' —কৃষ্ণকমল।

(খ) 'কংগ্রেসের এবার ভোল ফিরেছে এবং সেই সঙ্গে তাদের বোল ফিরেছে।' —প্রমথ চৌধুরী।

(গ) 'আর এক ফল আছে নাম আনারস,
নন্দন-কানন থেকে বুঝি আনা রস।' —রঙ্গলাল

**(৪) শ্রুত্যনুপ্রাসে** কণ্ঠ তালু প্রভৃতি একই স্থান হইতে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রুতিমধুর সমাবেশ হয়: যেমন,—

'মোরে হেরি' প্রিয়া
**ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া**
আইলা সম্মুখে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এই উদাহরণের মধ্য-পংক্তিতে দাঁতের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থাৎ দন্ত্য বর্ণাদির (যথা,—'ধ' 'ধ' 'দ' 'ন' 'দ' 'ন') ধ্বনির সমাবেশ লক্ষ্য করিবার সামগ্রী।

**(৫) মালানুপ্রাসে** দুই বা ততোঽধিক অনুপ্রাস একই বাক্যে থাকিয়া বার বার ধ্বনির পরিবর্তন বা সামঞ্জস্য ঘটাইয়া থাকে: যেমন,—

(ক) 'শিশির-কণায় মানিক ঘনায়, দুর্বাদলে দীপ জ্বলে।' —সত্যেন্দ্রনাথ।

—এখানে 'ক', 'ণ', 'দ' ও 'ল'—এই চারিটি বর্ণে অনুপ্রাসের মালা রচিত হইয়াছে।

(খ) **কুন্তল-কুণ্ডলা মহী মুক্তামালা গলে।** —মধুসূদন।

—এখানে 'ক', 'ম' ও 'ল'—এই তিনটি বর্ণে অনুপ্রাসের মালা গাঁথা হইয়াছে।

**যমক**

সমোচ্চার্য অথচ ভিন্নার্থবোধক শব্দের পুনরাবৃত্তিফলে যে সৌন্দর্য তথা কবিচাতুর্য দেখা দেয়, তাহাই যমক অলংকার নামে অভিহিত। 'যমক' মানে 'যুগ্ম'; শব্দের দুইবার প্রয়োগ হয় বলিয়াই এই 'যমক' নাম; যেমন,—

(১) '**আনা**-দরে **আনা** যায় কত আনারস।' —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

—এখানে 'আনা' মানে 'চার পয়সা', আবার 'আনা' মানে 'কেনা'। পক্ষান্তরে, শেষের 'আনারস' শব্দটির সঙ্গে যমক অলংকার হয় নাই, হইয়াছে অনুপ্রাস অলংকার। চরণের আদিতে এই যমকটি থাকায় ইহার নাম **আদ্যযমক**।

(২) 'আহা তায় **রোজ রোজ** কত **রোজ** ফুটে।' —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

—এখানে ফারসী 'রোজ' শব্দের মানে 'দিন' এবং ইংরাজি 'রোজ' শব্দের মানে 'গোলাপ ফুল'। চরণের মাঝে এই যমকটি থাকায় ইহার নাম **মধ্যযমক**।

(৩) 'যত কাঁদে বাছা বলি **সর সর**,
আমি অভাগিনী বলি **সর্ সর্**।

—এখানে প্রথম 'সর' শব্দের মানে 'দুধের সর' এবং দ্বিতীয় 'সর্' শব্দের মানে 'সরিয়া যাও'। চরণের শেষে এই যমকটি থাকায় ইহার নাম **অন্ত্যযমক**।

যমকের রাজা গুপ্তকবি একই স্থানে পর পর আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য—এই তিন প্রকার যমকই ব্যবহার করিয়াছেন; যেমন,—

**অচল অচল** অতি, **পাষাণ পাষাণ** মতি,
কি হবে দুর্গার গতি, **যেতে নারি জেতে নারী** আমি হে!' —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

**শ্লেষ**

যখন কোন শব্দ একটিবার মাত্র প্রযুক্ত হইয়া বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় ও সৌন্দর্য তথা কবিচাতুর্য দেখা দেয়, তখনই হয় শ্লেষ অলংকার। শ্লেষ-অলংকারময় বাক্যের দুইটি অর্থই প্রাসঙ্গিক বা বক্তার অভিপ্রেত। নানা জাতের শ্লেষ অলংকার থাকিলেও, বাংলা ভাষায় তাহাদের অনেকগুলিই অসম্ভব বলিয়া অভঙ্গশ্লেষ ও সভঙ্গশ্লেষ—এই দুই জাতের শ্লেষের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে।

(১) **অভঙ্গশ্লেষে** শব্দকে না ভাঙ্গিয়া অর্থাৎ পূর্ণরূপে রাখিয়াই দুই বা ততোঽধিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়; যেমন,—

(ক) "পূজাশেষে কুমারী বললে, 'ঠাকুর, আমাকে একটি মনের মত বর দাও।'" —শ্যামাপদ।

—এখানে 'বর' শব্দের দুইটি অর্থ:—(১) আশীর্বাদ; (২) স্বামী।

(খ) 'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর?' —গুপ্তকবি।

—এখানে গুপ্তকবি দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া চরণ দুইটি রচনা করিয়াছেন—প্রথমতঃ, ভগবানের মহিমা-প্রকাশ; দ্বিতীয়তঃ, নিজ মহিমা-প্রকাশ।

(গ) 'যে **রস** অনেক কাল থেকে **নিম্নস্তরে** ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসে উবে যাবে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'রস' শব্দটির দুইটি অর্থ :—(১) জল; (২) আনন্দ। এবং 'নিম্নস্তরে' শব্দটির অর্থও দুইটি :—(১) ভূমধ্যের নিম্নস্তরে; (২) সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীতে।

(ঘ) '**মধু**হীন করো না গো, তব মনঃ-কোকনদে!' —মধুসূদন।

—এখানে 'মধু' শব্দের দুইটি অর্থ :—(১) মধুসূদন দত্ত; (২) মকরন্দ।

(২) **সভঙ্গশ্লেষে** মূল শব্দকে ভাঙিয়া বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায় এবং এই উদ্দেশ্য লইয়াই বক্তা শব্দপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। তবে, বাংলায় সভঙ্গশ্লেষের ব্যবহার খুবই কম : যেমন,—

'অপরূপ রূপ **কেশবে**।
দেখরে তোরা এমন ধারা কালো রূপ কি আছে ভবে।' —দাশরথি।

—এখানে 'কৃষ্ণ' সম্পর্কে অর্থটি খুবই স্পষ্ট। পক্ষান্তরে, 'কেশবে' শব্দটিকে ভাঙিয়া লিখিলে দাঁড়ায় এইরূপ :—'কে শবে' অর্থাৎ 'শবে বা শিবাকার শবের উপর কে?' শব্দটি ভাঙিবার পরে 'কালী'-সম্পকিত অর্থটিই সুস্পষ্ট। এই শ্লেষাশ্রিত রচনায় শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বনিরসন করিয়া কৃষ্ণ-কালীর অভিন্নত্ব বুঝানো হইয়াছে।

## বক্রোক্তি

কোন উক্তির যে অর্থটি বক্তার ঈপ্সিত, সেই অর্থটিকে না ধরিয়া শ্রোতা যদি তাহার অন্য অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বক্রোক্তি অলংকার হয়। বক্রোক্তি দুই জাতের—(১) **শ্লেষ-বক্রোক্তি**; (২) **কাকু-বক্রোক্তি**।

(১) যে-বক্রোক্তিতে শ্লেষ মেশানো থাকে তাহাই **শ্লেষ-বক্রোক্তি**। বক্তা যে অর্থে শব্দ প্রয়োগ করেন, প্রতিবক্তা তাহা অন্য অর্থে গ্রহণ করিলে এই অলংকার হয়। **শ্লেষ-বক্রোক্তি ও শ্লেষ অলংকারের মধ্যে পার্থক্য** এই দিক দিয়া যে, শ্লেষ-বক্রোক্তিতে বক্তা ও প্রতিবক্তা—দুইই থাকা চাই এবং দুইটি অর্থেরই প্রাসঙ্গিকতা বা বাচ্যত্ব দুই দিক হইতে সমর্থনীয়। কিন্তু শ্লেষ অলংকারে উভয় অর্থই একমাত্র বক্তারই অভিপ্রেত—ইহাতে উত্তর-প্রত্যুত্তর থাকে না। শ্লেষ-বক্রোক্তির উদাহরণ—

(ক) প্রশ্ন—'দ্বিজরাজ হ'য়ে কেন বারুণী সেবন?'
উত্তর—'রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।'

প্রশ্ন—'বলি এত সুরাসক্ত কেন মহাশয় ?'

উত্তর—'সুর না সেবিলে তার কিসে মুক্তি হয় ।' —হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন।

—এখানে প্রশ্নকর্তার অভিপ্রায় অনুসারে 'দ্বিজরাজে'র অর্থ 'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ', 'বারুণী'র র্থ 'মদ্য' 'সুরাসক্তে'র অর্থ 'সুরায় বা মদে আসক্ত'। কিন্তু প্রত্যুত্তরকারী প্রশ্নকর্তার প্রশ্নকে এড়াইয়া যাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই প্রতিবক্তা 'দ্বিজরাজে'র অর্থ রিয়াছেন 'চন্দ্র', 'বারুণী'র অর্থ ধরিয়াছেন 'পশ্চিম দিক্', 'সুরাসক্তে'র অর্থ ধরিয়াছেন সুর বা দেবতায় আসক্ত'।

(খ) 'রাজা। তোমাদের অক্ষরের ছাঁদটা সুন্দর, কিন্তু বোঝা শক্ত। এ কী চীনা অক্ষরে লখা নাকি ?

নটরাজ। বলতে পারেন অচিনা অক্ষরে।' —রবীন্দ্রনাথ

—এখানে উচ্চারণকালে 'চীনা' ও 'চিনা' একই রকমের। রাজা 'চীনা অক্ষর' বলিতে চীনদেশের লিপি বুঝাইয়াছেন; কিন্তু নটরাজ 'অ-চিনা অক্ষর' অর্থাৎ অক্ষরটি যে তাহার চেনা নয়, তাহাই জানাইয়া দিয়াছেন।

(গ) 'সভাকবি। ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ অর্থের বড় টানাটানি।

নটরাজ। নইলে রাজদ্বারে আসব কোন্ দুঃখে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে সভাকবি 'অর্থ' শব্দটিতে 'অভিধেয়, তাৎপর্য' বুঝাইয়াছেন; কিন্তু নটরাজ সভাকবির অভিপ্রেত অর্থ না ধরিয়া 'টাকাকড়ি' মানে ধরিয়া লইয়াছেন।

(২) যে বক্রোক্তিটি বক্তার কণ্ঠের স্বরভঙ্গীর (কাকুর) উপর নির্ভর করে, তাহাই **কাকু-বক্রোক্তি**। কাকু বক্রোক্তিতে কণ্ঠধ্বনির বিশেষ ভঙ্গীর গুণে নিষেধ (অর্থাৎ Negation) বিধি (অর্থাৎ (Affirmation-এ)-তে. আবার বিধি নিষেধে রূপান্তরিত হইয়া শ্রোতার দ্বারা গৃহীত হয়। এই অলংকার সম্বন্ধে Walker বলিয়াছেন,—The most powerful engine in tbe whole arsenal of oratory'. ইংরাজি অলংকারশাস্ত্রে এই অলংকারটির নাম 'Interrogation' বা Erotesis' : যেমন,—

(ক) 'কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ?' —মধুসূদন।

—বলা বাহুল্য, কেহই ছেঁড়ে না। 'পর্ণ' অর্থাৎ 'পাপড়ি'ই যখন পদ্মের পদ্মত্বের পরিচায়ক, ইহাই যখন পদ্মের সর্বস্ব, তখন এই সর্বস্ব হইতে পদ্মকে বঞ্চিত করিবার প্রয়াসী কেহই নাই—প্রশ্নবোধক চিহ্নের মধ্য দিয়া যে-জিজ্ঞাসাটি অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার ভিতরে এই অর্থটিই পাওয়া যাইতেছে। এই ভাষণটি সরমার ভাষণ—নিরাভরণা সীতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

( 'গান্ধারী। আমি কি মা নহি ? গর্ভভারজর্জরিতা

জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নি কি তারে ?' —রবীন্দ্রনাথ

—বলা বাহুল্য, গান্ধারীই মা এবং গর্ভধারিণী মা-ই বটে। এই প্রশ্নবোধক কাকু বা কণ্ঠস্বর-দ্বারা গান্ধারীর অভিপ্রেত অর্থের দৃঢ়ীকরণই হইয়াছে।

(গ) 'সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়, একথা অগ্রাহ্য। উর্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে-অগ্নি নির্গত হয়, উহার কি দাহশক্তি থাকে না? —কাদম্বরী।

—এখানে প্রশ্নবোধক কাকু বা কণ্ঠস্বর-দ্বারা বক্তার স-বিস্ময় আনন্দ প্রকাশিত।

(ঘ) 'যশোদা। প্রাণের গোপাল আমার,
এত দিনে এলি কি ঘরে?
মনে কি তোর আছে বাছা,
এ দুঃখিনী জননীরে?' —কৃষ্ণকমল।

—এখানে গোড়াকার বাক্যে স-বিস্ময় আনন্দ এবং শেষের বাক্যে দৃঢ়-স্থাপন প্রকাশ পাইয়াছে।

## ধ্বন্যুক্তি বা ধ্বনিবৃত্তি

যদি বর্ণ শব্দ বা বাক্যের ধ্বনিরূপ দিয়া আমাদের কর্ণপরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে অর্থ ব্যঞ্জিত হয়, স্পষ্ট অর্থবোধ হয়তো বা পরেই ঘটে, তাহা হইলে ধ্বন্যুক্তি বা ধ্বনিবৃত্তি অলংকার হয়। ইহাতে বর্ণের পুনরাবৃত্তির বিশেষ প্রয়োজন নাই। ভাবানুকারী যে কোন রকমের উৎকৃষ্ট বর্ণের প্রয়োগ ঘটিলেই যথেষ্ট। ইংরাজিতে যাহাকে বলে "sound echoing the sense', সেই ভাবদ্যোতক ধ্বনিই এই অলংকারের বিশিষ্ট সৌন্দর্য। তাই এই অলংকারকে ইংরাজি অলংকারশাস্ত্রমতে Onomatopœia বলা যায়: যেমন,—

(ক) ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে'। —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'ঐ' স্বরধ্বনির সাহায্যে ও ছন্দের পর্বধ্বনির সহায়তায় বর্ষার আগমন ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

(খ) 'শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের **গর্জন**;
**সিংহনাদ**; জলধির **কল্লোল**; দেখেছি
দ্রুত **ইরম্মদে**, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এহেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-**টংকার**।' —মধুসূদন।

—এখানে 'গর্জন', 'সিংহনাদ', 'কল্লোল', 'ইরম্মদ' ও 'টংকার'—এই শব্দগুলি যথাক্রমে অভিপ্রেত অর্থ ব্যঞ্জিত করিয়াছে; শব্দগুলি ভাবানুকারী সৌন্দর্য ফুটাইয়াছে।

(গ) 'এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজগর-গরজে সাগর ফুলিছে,
এ নহে কুঞ্জকুসুমরঞ্জিত
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।' —রবীন্দ্রনাথ

—এখানে প্রথম-তৃতীয় চরণ দুইটিতে রোম্যান্টিক স্বপ্নাবেশ এবং দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণ দুইটিতে নূতন মহাজীবনের আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে।

(ঘ) 'চর্‌কার ঘর্ঘর পড়্‌শীর ঘর ঘর!
ঘর ঘর ক্ষীর-সর,—আপ নায় নির্ভর।' —সত্যেন্দ্রনাথ।

—এখানে চরকার ঘর্ঘরধ্বনির তালটি পরিস্ফুট।

(ঙ) 'নদীর জল, অবিরল চল চল, চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্তে ডাকিতেছে।' —বঙ্কিমচন্দ্র।

—এখানে স্বাভাবিক চঞ্চল প্রবাহ হইতে শুরু করিয়া আবর্তে ডাক অবধি নদীজলের প্রতিটি অবস্থাই ধ্বনির মধ্য দিয়া ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

(চ) 'টং—টং—ভোঁ—ভস্‌
ট্‌-ডাউন ছাড়ে, বাস্‌!
ভস্‌ ভস্‌ চক্কোর,
চলে যায় টক্কোর!
ঘোস্‌ ঘোস্‌ ঘোস্‌ ঘোস্‌
গর্দিনাই দিই চৈস্‌।' —যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

—এখানে ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বারা রেলগাড়ীর স্টেশন ত্যাগের চিত্র ফোটানো হইয়াছে।

## পুনরুক্তবদাভাস

যদি কোন বাক্য শুনিবামাত্রই মনে হয় যে একাধিক শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত কিন্তু অর্থবোধ হইবামাত্র ঐ ধারণা অপসৃত হয়, তা হইলে পুনরুক্তবদাভাস অলংকার হয়ঃ যেমন,—

কোথা আজি **পঞ্চশর অনঙ্গ মদন**?' —শ্যামাপদ।

—এখানে এই বাক্যটি শুনিলেই মনে হয়, 'পঞ্চশর' 'অনঙ্গ' ও 'মদন' শব্দত্রয়ের অর্থ একই অর্থাৎ 'কন্দর্প'। কিন্তু ইহার অন্যবিধ অর্থ জানিবামাত্র ঐ ধারণা চলিয়া যায়। অর্থটি হইতেছে—'শিবের ললাটের আগুনে ভস্মীভূত, তাই অঙ্গহীন মদনকে ইহাই কবির জিজ্ঞাস্য যে, কোথায় আজ তাঁহার পাঁচখানি তীর?'

# অর্থালংকার

ধ্বনির উপরে নয়, অর্থের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল অলংকারই **অর্থালংকার।** ইহার বিশেষত্ব এই যে, কোন শব্দকে বদলাইয়া তাহার প্রতিশব্দ দিলেও অর্থালংকার বজায় থাকে। অর্থালংকারগুলি মোটামুটি ভাবে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্তঃ যেমন,—
[১] **সাদৃশ্যমূলক অলংকার**—উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, ভ্রান্তিমান্‌, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, সন্দেহ, উল্লেখ, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি ও প্রতীপ। [২] **বিরোধমূলক অলংকার**—বিরোধাভাস, বিষম, বিভাবনা,

বিশেষোক্তি ও অসংগতি। [৩] **শৃঙ্খলামূলক অলংকার**—কারণমালা, একাবলী, সার ও আরোহ। [৪] **ন্যায়মূলক অলংকার**—কাব্যলিঙ্গ ও অর্থাপত্তি। [৫] **গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূলক অলংকার**—অর্থান্তর-ন্যাস, ব্যাজস্তুতি, অপ্রস্তুত-প্রশংসা, আক্ষেপ, স্মরণ ও স্বভাবোক্তি অলংকার। অর্থালংকারের এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলংকারিকেরা প্রায় একমত। কিন্তু মতদ্বৈধও আছে: যেমন,—অর্থান্তর-ন্যাস অলংকারটি কাহারও মতে গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূলক, আবার কাহারও মতে ন্যায়মূলক। আবার আরও কয়েকটি অর্থালংকার আছে: যেমন,—বিরোধমূলক প্রতিবিন্যাস বা বিরুদ্ধবিন্যাস অলংকার, গূঢ়ার্থমূলক কাব্যস্মৃতি অলংকার। এই মুখ্য অলংকারগুলি ব্যতিরেকে কয়েকটি **গৌণ অলংকারও** আছে: যেমন,—তুল্যযোগিতা, দীপক, অধিক, অনুমান ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ ইহাও সবিশেষ লক্ষণীয় যে, একক অমিশ্র অলংকার পাওয়া যায় কমই একাধিক তথা মিশ্র অলংকারই পাওয়া যায় বেশি। এই **মিশ্র অলংকার** দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: যেমন,—সংসৃষ্টি ও সংকর।

## [১] সাদৃশ্যমূলক অলংকার

### উপমা

ভিন্ন জাতীয় বস্তু দুইটির মধ্যে পারস্পরিক বৈধর্ম্য থাকা সত্ত্বেও যদি তাহা অনুল্লিখিত থাকিয়া কেবলমাত্র প্রসঙ্গোচিত সাধর্ম্যই হয় উল্লিখিত, তাহা হইলে এহেন সাদৃশ্য-কথনের দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়, তাহাকেই বলা হয় উপমা অলংকার: যেমন,—'তাঁহার দাঁত মুক্তার ন্যায় শুভ্র।'—এখানে 'দাঁত' ও 'মুক্তা' ভিন্ন জাতীয় বস্তু—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈধর্ম্য যে অনেকটা রহিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। তবে উভয়ের মধ্যে সাধর্ম্য রহিয়াছে সৌন্দর্যসূত্রে অর্থাৎ শুভ্রত্বের দিক দিয়া।

উপমার সংজ্ঞা ও তাহার উদাহরণ লক্ষ্য করিলে **উপমার চারিটি অঙ্গ** আমাদের নজরে পড়ে:—প্রথমতঃ, **উপমেয়** বা বর্ণনীয় বিষয়; দ্বিতীয়তঃ, **উপমান** বা আক্ষিপ্ত অর্থাৎ আকৃষ্ট বাহিরের বস্তু; তৃতীয়তঃ, **সাধারণ ধর্ম** অর্থাৎ উপমেয় ও উপমানের সাধর্ম্য; চতুর্থতঃ, **সাদৃশ্যবাচক** তথা সাধর্ম্যবাচক **শব্দ**।

উপমা অলংকারের উল্লিখিত দৃষ্টান্তে 'দাঁত' **উপমেয়**। কেন না,—এই 'দাঁত' বস্তুটিকে তুলনা করা যায় অর্থাৎ ইহাই উপমার বিষয়ীভূত হইয়াছে। ইহাই তো 'প্রকৃত' বিষয় বা বর্ণনীয় বিষয় অথবা সোজা কথায় 'বিষয়' নামেও হয় অভিহিত। আবার 'মুক্তা' শব্দটি **উপমান**। 'মুক্তা' জিনিসটি বর্ণনীয় 'বিষয়' দাঁতেরই সাধর্ম্যসূত্রে আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট বাহিরের পদার্থ; ইহারই সহিত দাঁতের তুলনা দেওয়া হইতেছে। এই যে উপমান, ইহাকে 'অপ্রকৃত' বা 'বিষয়ী' নামেও অভিহিত করা হয়। 'শুভ্র

শব্দটি উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম[জ্ঞাপ]ক। অর্থাৎ এই ধর্মটি উপমেয় 'দাঁতে' ও উপমান 'মুক্তা'য় সমভাবে বিদ্যমান। এই সাধারণ ধর্মেরই বলে বাহিরের একটি বিশেষ বস্তু (যেমন,—মুক্তা) বর্ণনায় অক্ষিপ্ত হইয়া তুলনা সম্পন্ন করে। বলা বাহুল্য, এহেন **সাধারণ ধর্মই** উপমার বনিয়াদ। আর সাদৃশ্যজ্ঞাপক শব্দটি উপমেয় ও উপমানকে সাধর্ম্যসূত্রে একত্রগ্রথিত করে। 'যথা, যেমন, জনু, যেন, হেন, মত, মতন, তুল্য, সদৃশ, সম, সমান, ন্যায়, নিভ, সংকাশ, প্রায় বা পারা, ভাতি, রীতি, প্রতিম' প্রভৃতি শব্দ বা 'বৎ, ক্যঙ্' প্রভৃতি প্রত্যয় **সাদৃশ্যবাচক**।

উপমা চার জাতের : যথা, পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, মহোপমা এবং মালোপমা।

**পূর্ণোপমায়** উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবোধক শব্দ—উপমার এই চারিটি অঙ্গই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে : যেমন,—

(ক) 'আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণদীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম' —রবীন্দ্রনাথ

—এখানে উপামেয় 'ছুরি'; উপমান—'প্রভাতরশ্মি'; সাধারণ ধর্ম—'তীক্ষ্ণদীপ্ত'; সাদৃশ্যবাচক শব্দ—'সম'।

(খ) 'পক্ষ্ম-অগ্রভাগে
ছুলিল অশ্রুর বিন্দু, শিশির যেমতি
শিরীষকেশরে।' —মোহিতলাল।

—এখানে উপমেয়—'অশ্রুর বিন্দু'; উপমান—'শিশির' সাধারণ ধর্ম—'ছুলিল (তথা দোলন)'; সাদৃশ্যবাচক শব্দ—'যেমতি'।

(গ) 'বিদ্যুৎঝলা সম চক্‌মকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বরপ্রদেশে।' —মধুসূদন।

—এখানে উপমেয়—'কলম্বকুল' (=শরগুলি); উপমান—'বিদ্যুৎঝলা'; সাধারণ ধর্ম—'চক্‌মকি (তথা দীপ্তি)'; সাদৃশ্যবাচক শব্দ—'সম'।

**লুপ্তোপমায়** উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ—এই তিনটির মধ্যে একটি, অথবা তিনটি অঙ্গই লুপ্ত অর্থাৎ উহ্য থাকে : যেমন,—

(ক) 'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' —সঞ্জীবচন্দ্র।

—এখানে সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'যেমন' লুপ্ত রহিয়াছে।

(খ) 'চুল যার শাওনের মেঘ' —জীবনানন্দ।

[—]এখানে পূর্ণ বাক্যটি হইতেছে—'চুল যার শাওনের মেঘের মত কালো'। অর্থাৎ [ম]ত' এই সাদৃশ্যবাচক শব্দ এবং 'কালো' এই সাধারণ ধর্মটি লুপ্ত রহিয়াছে।

(গ) 'তিলেক না দেখি ও চাঁদবদন
মরমে মরিয়া থাকি।' —চণ্ডীদাস।

[—]এখানে উপমেয় **'বদন'** ও উপমান **'চাঁদ'** থাকিলেও সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক **শব্দ** [লু]প্ত রহিয়াছে।

(ঘ) 'বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকাসম।' —রবীন্দ্রনাথ

—এখানে উপমেয় 'বাসনা' উপমান 'মরীচিকা' ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'সম' থাকিলেও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত রহিয়াছে।

(ঙ) 'তড়িতবরণী হরিণ-নয়নী
দেখিনু আঙিনা-মাঝে।" —চণ্ডীদাস।

—এখানে উপমেয় 'তড়িতবরণী' 'হরিণ-নয়নী' তথা রাধা থাকিলেও উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ উহ্য রহিয়াছে।

**মহোপমায়** উপমেয়কে ছাড়িয়া আক্ষিপ্ত উপমানের শক্তি ও সৌন্দর্য বিশদভাবে বর্ণিত হইবার ফলে তাহা একটি প্রায় স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ চিত্রের আকার লইয়া থাকে, তাহা "স্বয়ং একটি সৌন্দর্যের নন্দন-কানন হইয়া দাঁড়ায়, পাঠক সে মুহূর্তে উপমেয়কে ভুলিয়া গিয়া উপমানের প্রতি বিস্মিত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে। পোপ বলেন,—'He makes no scruple to play with the circumstances." এই মহোপমাই **হোমরীয় উপমা** বা **এপিক উপমা :** যেমন,—

'কাঁদিল মাধব-প্রিয়া! উল্লাসে শুষিলা—
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে।' —মধুসূদন।

**মালোপমায়** একই উপমেয়কে কেন্দ্র করিয়া দুই বা ততোঽধিক উপমান কখনও-বা অভিন্ন, কখনও-বা বিভিন্ন সাধারণ ধর্ম লইয়া আক্ষিপ্ত হয় ও বিশিষ্ট সৌন্দর্য সৃষ্টি করে অর্থাৎ উপমার মালাই হইতেছে মালোপমা : যেমন,—

(ক) 'দেখি, কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায় বিকটমূর্তি এক সেনাপতি-সমভিব্যাহারে যমদূতের ন্যায় কতকগুলি কুরূপ ও কদাকার শবরসৈন্য আসিতেছে।'
—কাদম্বরী।

—এখানে উপমেয় 'সেনাপতি' এবং উপমান 'কৃতান্তের সহোদর,' 'পাপের সারথি' ও 'নরকের দ্বারপাল'। বলা বাহুল্য, সাধারণ ধর্মটি অভিন্ন।

(খ) 'এ কার প্রতাপ তুমি না জানহ সতী,
একা সিংহে নাহি পারে অজার সংহতি,
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে,
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে,
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা
সেই মত নৃপগণে নাশিব কি শঙ্কা? —কাশীরাম

—এখানে উপমেয় হইতেছে বক্তা 'অর্জুন' এবং উপমান 'সিংহ' 'গরুড়' ও 'হনুমান'। 'সিংহের সহিত যুঝিতে অসামর্থ্য', সকল 'পক্ষীনাশ' এবং 'লঙ্কাদহন'—এ সব বিভিন্ন প্রকারের সাধারণ ধর্ম।

(গ) 'কুন্দেন্দু তুষার শঙ্খ শুচিশুভ্র সৌন্দর্যের রাণী,
মূর্তিমাঝে উর বীণাপাণি।' —যতীন্দ্রমোহন।

—এখানে উপমেয় 'বীণাপাণি' এবং উপমান 'কুন্দ', 'ইন্দু', 'তুষার' ও' 'শঙ্খ'।

(ঘ) 'উদয়শিখরে সূর্যের মত সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত একটি নয়নসম' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে উপমেয় 'প্রাণ' এবং উপমান 'সূর্য' ও 'নয়ন'।

(ঙ) 'সিংহপৃষ্ঠে যথা
মহিষমর্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী ; খগেন্দ্র উপেন্দ্ররমণী
শোভে বীর্যবতী সতী বড়বার পিঠে' —মধুসূদন।

—এখানে উপমেয় 'সতী ( =প্রমীলা )' এবং উপমান 'দুর্গা' 'শচী' ও 'রমা'। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, নারীর সহিত নারীর তুলনায় বিজাতীয়ত্ব তো রক্ষিত হইল না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে প্রমীলা রাক্ষসবধূ এবং দুর্গা, শচী ও রমা স্বর্গের দেবী ; অতএব, উপমা অলংকারে যাহা আকাঙ্ক্ষিত, সেই বিজাতীয়ত্ব ঠিকই আছে।

**উৎপ্রেক্ষা**

প্রকৃত অর্থাৎ বিষয় বা উপমেয়কে প্রবল সাদৃশ্যহেতু পরাত্মা অর্থাৎ বিষয়ী বা উপমান বলিয়া উৎকট সংশয় দেখা দিলে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। 'যেন, বুঝি, মনে হয়, মনে গণি, জনু' প্রভৃতি সম্ভাবনাবাচক শব্দের উল্লেখ থাকিলে **বাচ্যা উৎপ্রেক্ষা** বা **বাচ্যোৎপ্রেক্ষা** হয়, আর যেখানে এই সম্ভাবনাবাচক শব্দ উহ্য অর্থাৎ প্রতীয়মান থাকিয়া অর্থের দিক দিয়া সম্ভাবনার ভাবটি ফুটাইয়া তোলে সেখানে হয় **প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা** বা **প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা**। একই উপমেয়কে কেন্দ্র করিয়া যখন অনেক উপমানের অভেদের সম্ভাবনা ঘটে, তখন হয় **মালা-উৎপ্রেক্ষা**।

(ক) 'রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি' মনস্তাপে
ফেলিয়াছে খুলি' সাজ!' —মধুসূদন।

—এখানে 'তরুমূলে রাশি রাশি কুসুম পড়িয়া যাওয়া'—এই প্রকৃত বিষয়টিকে গৌণ করিয়া তাহারই সদৃশ ব্যাপার 'অঙ্গের সাজ খুলিয়া ফেলা'—এই আক্ষিপ্ত বস্তুকেই কল্পনা করা হইয়াছে। 'যেন' এই সম্ভাবনাবাচক শব্দের উল্লেখ থাকায় একটি অভেদের 'সম্ভাবনা' স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।—ইহাই বাচ্যা উৎপ্রেক্ষা।

(খ) ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার,
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।' —নজরুল।

—এখানে 'ধরণীর এগিয়ে আসা'—এই প্রকৃত বিষয়টিকে গৌণ করিয়া তাহারই সদৃশ ব্যাপার 'দুলালী কনিষ্ঠা মেয়ের এগিয়ে আসা'—এই আক্ষিপ্ত বস্তুই কল্পিত হইয়াছে। 'যেন' এই সম্ভাবনাবা শব্দের উল্লেখ থাকায় একটি অভেদের 'সম্ভাবনা' ফুটিয়া উঠিয়াছে।—ইহাই বাচ্যা উৎপেক্ষার দৃষ্টান্ত

(গ) 'বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি, স্বর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল।' —মধুসূদন।

—ইহাও বাচ্যা উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

(ঘ) 'সীতাহারা আমি যেন মণিহারা ফণী।' —কৃত্তিবাস।

—ইহাও বাচ্যা উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

(ঙ) 'এ নিদাঘ যেন প্রেমাভিনয়ের বিরহ অঙ্কখানি ;
দুর্বাসা যেন অভিশাপ হানি, দেয় ব্যবধান আনি'।' —কালিদাস।

—ইহাও বাচ্যা উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

(চ) 'এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবন সনসন বনবীথিকা
গীতময় তরুলতিকা—
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।' —রবীন্দ্রনাথ।

—নবযৌবনা বর্ষার আবির্ভাবে বিশ্বে যে আনন্দগান বাজিয়া উঠিয়াছে তাহা এতই গভীর ও ব্যাপক যে কবির কাছে **মনে হইয়াছে যেন** যুগ-যুগান্তরের অসংখ্য কবি একই সাথে যুগযুগান্তরের গান ধ্বনিয়া তুলিয়াছেন।—এখানে 'যেন' এই সম্ভাবনাবাচক শব্দটি না থাকিলেও অর্থের দিক দিয়া, সম্ভাবনার কথাটি ফুটিয়া উঠায় একটি অভেদের 'সম্ভাবনা' স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।—ইহাই প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা।

(ছ) 'লুটায়-মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে!' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে স্নানার্থিনী সুন্দরী সরোবরে অবতরণ করিবার কালে তাঁহার কটির মেখলাখানি খুলিয়া শিলাতলে রাখিয়া গিয়াছেন। সেখানে উহা নীরবে পড়িয়া রহিয়াছে। তাই কবির কাছে মনে হইয়াছে যেন ঐ মেখলা সুন্দরীর কটিতট হইতে বিচ্যুত হইয়া মৌনভাবে অপমান সহিয়া চলিয়াছে। 'যেন' এই সম্ভাবনাবাচক শব্দটি না থাকিলেও অর্থের দিক দিয়া সম্ভাবনার কথাটি ফুটিয়া উঠায় একটি অভেদের 'সম্ভাবনা' স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।—ইহাও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

(ঞ) 'কি পেখলু নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম— কলপতরু সঞ্চরু
সুরধনী-তীরে উজোর॥' —গোবিন্দদাস।

—ইহাও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

(ঝ) 'সহজহি আনন সুন্দর রে ভঁউহ সুরে খলি আঁখি।
পঙ্কজমধ্য পিবি মধুকর রে উড়ইত পসারএ আঁখি।' —বিদ্যাপতি।

—ইহাও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

(ঞ) 'সারসন মণিময়; কবচ খচিত
সুবর্ণে ঃ—মলিন দোঁহে; সারসন, স্মরি,
হায় রে, সরু কটি! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগ!' —মধুসূদন।

—হাও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

(ট) 'মলিন গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া যেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বোধ হইল যেন গৃহ আলো হইল। বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোন গাছে কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন কোথায় গোলাপ জলের কার্বা মুখ-আঁটা ছিল, কে কার্বা ভাঙিয়া ফেলিল; যেন কে নিবান আগুনে ধূপ, ধুনা-গুগ্‌গুলু ফেলিয়া দিল।' —বঙ্কিমচন্দ্র (আনন্দমঠ)।

—এখানে চারটি বাচ্য উৎপ্রেক্ষা পরস্পর-শৃঙ্খলিত থাকায় মালা-উৎপ্রেক্ষা হইয়াছে।

### রূপক

বর্ণনীয় বিষয়ে উপমান অর্থাৎ আক্ষিপ্ত বস্তুর অভেদ আরোপ হইল, যখন সেই আরোপে বর্ণনীয় বিষয়ের অপহ্নুতি বা নিষেধ থাকে না, অর্থাৎ উপমেয়কে অস্বীকার না করিয়া স্বীকার করা হয় সত্য, কিন্তু তাহাকে অপ্রধানরূপে ধরিয়া আক্ষিপ্ত বস্তু বা উপমানকে প্রধান বলিয়া গণ্য করা হয়, তখন হয় রূপক অলংকার। অতএব, মোটের উপর ইহাই বলা যায় যে, স্বরূপতঃ অর্থাৎ বস্তুগত দিক দিয়া উপমেয় এবং উপমান আলাদা হইলেও, উভয়ের মধ্যে অতিসাম্য বুঝাইবার নিমিত্ত কাল্পনিক অভেদ আরোপ করিবার নামই রূপক। রূপক অলংকার নানা রকমের ঃ যেমন,—সাধারণ রূপক বা নিরঙ্গ রূপক, সাঙ্গ রূপক, পরম্পরিত রূপক, অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক।

**সাধারণ রূপকে** বা **নিরঙ্গ রূপকে** একটি উপমেয় একটি উপমানের অভেদ নির্দেশিত হয়। এই রূপকে উপমেয়ে উপমানের অঙ্গগুলির কোনও উল্লেখ না থাকায়, তাহাদের আশ্রয়ে নূতন রূপক সৃষ্টির কোন কথাই উঠে না। নিরঙ্গ রূপক দুই জাতের ঃ—**(১) কেবল, (২) মালা**। যেমন,—

(ক) 'যৌবনেরি মৌবনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি।' —মোহিতলাল

—এখানে 'যৌবনেরি মৌবনে' কথাটিতে নিরঙ্গ (কেবল) রূপক অলংকার হইয়াছে।

(খ) 'আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই,
কাব্যের জাল বুনি' —যতীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'কাব্যের জাল' কথাটিতে নিরঙ্গ ( কেবল ) রূপক অলংকার হইয়াছে।

(গ) 'ফুটায় মনে কি মন্তরে খুসীর শতদল' —সত্যেন্দ্রনাথ।

—এখানে 'খুসীর শতদল' কথাটিতে নিরঙ্গ ( কেবল ) রূপক অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপন করলগ্ন কাঁটা ? —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে নিরঙ্গ ( মালা ) রূপক অলংকার হইয়াছে।

(ঙ) 'শেফালীসৌরভ আমি, রাত্রির নিঃশ্বাস, ভোরের ভৈরবী। —বুদ্ধদেব।

—এখানে নিরঙ্গ ( মালা ) রূপক অলংকার হইয়াছে।

(চ) 'অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে নিরঙ্গ ( মালা ) রূপক হইয়াছে।

**সাঙ্গ রূপকে** মূল উপমেয়ে উপমানের অভেদ-নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অঙ্গগুলির যথাযথভাবে অভেদ দেখানো হয়। এই সাঙ্গ রূপকটি পরস্পরসম্বন্ধ অনেক রূপকের মালা। সাঙ্গ রূপকও দুই জাতের—**(১) সমস্তবস্তুবিষয়ক**; **(২) একদেশবিবর্তি**। আরোপিত উপমানগুলির সবই-শব্দ-প্রয়োগে প্রকাশিত হইলে সমস্তবস্তুবিষয়ক সাঙ্গ রূপক হয়। পক্ষান্তরে, উপমানগুলির কোনটি বা কোন-কোনটি ভাষায় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত না হইয়া অর্থে বা ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হইলে একদেশবিবর্তি সাঙ্গ রূপক হয় ঃ যেমন,—

(ক) 'শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু ঃ অশ্রু-বারি-ধারা
আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার-রব! —মধুসূদন

—এখানে 'শোক' হইতেছে মূল উপমেয় এবং 'ঝড়' হইতেছে মূল উপমান। 'শোক' ও 'ঝড়'—ইহারা উভয়ে অঙ্গী। 'শোকে'র অঙ্গী হইতেছে—'বামাকুল' 'মুক্তকেশ', 'ঘন-নিশ্বাস', 'অশ্রু-বারি-ধারা', 'হাহাকার-রব'। আবার 'ঝড়ে'র অঙ্গ হইতেছে—'সুরসুন্দরী' ( অর্থাৎ বিদ্যুৎ-রমণী' ), 'মেঘমালা', 'প্রলয়-বায়ু', 'আসার' ( অর্থাৎ বারিবর্ষণ ), 'জীমূত-মন্দ্র' (অর্থাৎ মেঘগর্জন)। এইভাবে শোকের প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে ঝড়ের প্রতিটি অঙ্গের অভেদ নির্দেশিত হইয়াছে। আরোপিত উপমানগুলির সবই শব্দপ্রয়োগে প্রকাশিত হওয়ায় সমস্তবস্তুবিষয়ক সাঙ্গ রূপক অলংকার হইয়াছে।

(খ) 'দেহদীপাধারে জ্বলিত লেলিহ যৌবন-জয়শিখা' —অচিন্ত্যকুমার।

—এখানে উপমেয় 'দেহ' অঙ্গী এবং তাহার অঙ্গ 'যৌবন' আবার উপমান 'দীপাধার' অঙ্গী এবং তাহার অঙ্গ 'শিখা'। একদিকে অঙ্গীতে অঙ্গীতে এবং অন্যদিকে অঙ্গে-অঙ্গে সবই শব্দপ্রয়োগে প্রকাশিত হওয়ায় সমস্তবিষয়ক সাঙ্গ রূপক অলংকার।

(গ) 'অশান্ত আকাঙ্ক্ষাপাখী
মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জর-পিঞ্জরে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানেও সমস্তবস্তুবিষয়ক সাঙ্গ রূপক অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'নীলপাহাড়ের ফুলদানীতে প্রফুল্ল জাফরাণীস্থান! —সত্যেন্দ্রনাথ।

—এখানে 'নীলপাহাড়' 'ফুলদানী'রূপে কল্পিত হইয়াছে। ফুল তো ফুলদানীতেই থাকে। অতএব, জাফরাণীস্থানে ফুলের কথা 'প্রফুল্ল' শব্দটিতেই নির্দেশিত হইতেছে। 'ফুল' শব্দটি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হইলেও অর্থে প্রকাশিত হইয়াছে। তাই একদেশবিবর্তি সাঙ্গ রূপক অলংকার হইয়াছে হইয়াছে।

(ঙ) 'আকাশের সর্বরস রৌদ্ররসনায়
লেহন করিল সূর্য!' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানেও একদেশবিবর্তি সাঙ্গ রূপক অলংকার।

**পরম্পরিত রূপকে** একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ অপর উপমেয়ে তাহার উপমানের আরোপের কারণ হইয়া থাকে ঃ যেমন,—

(ক) 'চেতনার নটমঞ্চে নিদ্রা যবে ফেলে যবনিকা,
অচেতন-নেপথ্যের অভিনয় কর প্রযোজন।' —বুদ্ধদেব।

—এখানে 'চেতনা'কে 'নটমঞ্চ' বলিয়া এই যে রূপক অলংকারটি করা হইয়াছে, ইহাই 'নিদ্রা'কে 'যবনিকা' আর 'অচেতন'কে 'নেপথ্য' বলিয়া রূপক করিবার কারণ। রূপক-সমূহের এই পারম্পর্যের জন্যই পরম্পরিত রূপকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

(খ) 'ষড়ধ্যায়ের বিশ্বকাব্য নব্যরসে মহামেলা,
মাঝখানে তার এই নিদাঘের বীররৌদ্রের খেলা।' —কালিদাস।

—এখানে 'বিশ্ব'কে 'কাব্য' বলিয়া এই যে রূপক অলংকারটি হইয়াছে, ইহাই 'নিদাঘ' (=গ্রীষ্ম)-কে 'বীররৌদ্ররস' বলিয়া রূপক করিবার কারণ। পূর্ববর্তী রূপকটি পরবর্তী রূপকের কারণ বলিয়া পরম্পরিত রূপক হইয়াছে।

(গ) 'বীর্যসিংহ 'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'জগদ্ধাত্রী'কে 'দয়া' বলিয়া এই যে রূপক অলংকারটি হইয়াছে, ইহাই জগদ্ধাত্রীর বাহন 'সিংহ'কে 'বীর্যে' আরোপিত করিয়া রূপক করিবার কারণ। তাই পরম্পরিত রূপক হইয়াছে।

(ঘ) 'যদিও সকল হাস্য ফেনপুঞ্জতলে
জানি ক্ষুব্ধ ব্যথাসিন্ধু দোলে।' —প্রেমেন্দ্র।

এখানেও পরম্পরিত রূপক অলংকার হইয়াছে।

**অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপকে** উপমানে কোন বিশেষ গুণ বা অসম্ভব ধর্ম কল্পনা করিয়া সেই বিশেষ গুণ বা অসম্ভব ধর্মসম্পন্ন উপমান উপমেয়ে আরোপ করা হয়ঃ যেমন—

(ক) 'ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ॥' —গোবিন্দদাস।

—এখানে 'ও (অঙ্গ)' কৃষ্ণ, 'ইহ' রাধা। উপমান 'বিদ্যুৎতরঙ্গ'কে 'থির' (অর্থাৎ স্থির) এই অসম্ভব কল্পনা করিয়া উপমেয় 'রাধা' আরোপিত হইয়াছে।

(খ) 'বয়ন শারদ সুধানিধি নিষ্কলঙ্ক' —জ্ঞানদাস।

—এখানে (রাধার) 'বয়ন' অর্থাৎ বদন 'শারদ সুধানিধি' অর্থাৎ শরতে চাঁদ। কিন্তু চন্দ্রে কলঙ্ক থাকিলেও রাধাবদনে নাই। চাঁদের পক্ষে নিষ্কলঙ্ক হওয়া অসম্ভব। চাঁদের মুখে এই অসম্ভব কল্পনাই আরোপিত হইয়াছে।

(গ) 'নাহি কালদেশ তুমি অনিমেষ মুরতি,
তুমি অপচল দামিনী।'

—এখানেও অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক অলংকার হইয়াছে।

## ভ্রান্তিমান্

খুব সাদৃশ্যহেতু উপমেয়কে উপমান বলিয়া ভুল এবং সেই ভুল যদি বাস্তব ভ্রম না হইয়া কবিকল্পনাজাত ভ্রম হইয়া চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে, তবে তাহা ভ্রান্তিমান্ অলংকার হয়। 'ভ্রম', ভরম', 'ভ্রান্তি' প্রভৃতি শব্দাদির প্রয়োগে এই অলংকারটি গঠিত হয়। মনে রাখিতে হইবে, আঁধার পথে 'দড়ি'কে 'সাপ' বলিয়া এই যে ভ্রম, ইহা বাস্তব বা সাধারণ ভ্রম—ইহার ভিতরে কবিকল্পার চমৎকারিত্ব নাই; তাই ইহা ভ্রান্তিমান্ অলংকার নয়। ভ্রান্তিমান্ অলংকারের দৃষ্টান্ত এইরূপঃ

(ক) 'দেখ সখে উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি—
প্রতিবিম্ব করি দরশন,
জলে কুবলয়-ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করেছি যতন!'

—এখানে পদ্মলোচনা রূপসী জলে নিজ নয়নের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া সেই প্রতিচ্ছবিকে সত্যকার পদ্ম ভাবিয়া বারবার ধরিবার প্রয়াস পাইতেছে।—কবি-প্রতিভায় উদ্ভূত এই যে মধুর ভ্রান্তির কল্পনা, ইহাই ভ্রান্তিমান অলংকারের জন্মকারণ। 'অক্ষি'র সঙ্গে 'উৎপলে'র সাদৃশ্যই এই মধুর ভ্রান্তির মূলে বিরাজমান।

(খ) 'কোন কোন পক্ষিশাবকের পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই, তাহাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে।'

—এখানে উদ্ভিন্নপক্ষ পক্ষিশাবকের সঙ্গে বৃক্ষফলের সাদৃশ্য এক মধুর ভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া ভ্রান্তিমান্ অলংকার হইয়াছে।

(গ) 'চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস
চন্দ্রকলাভ্রমে রাহু করিলা কি গ্রাস ? —কৃত্তিবাস।

—এখানে ভ্রান্তিমান্ অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'মণিময় মুকুরে দেখি পুন নিজমুখ চাঁদভরমে মুরছায়।' —বিদ্যাপতি।

এখানেও ভ্রান্তিমান্ অলংকার হইয়াছে।

## অপহ্নুতি

বর্ণনীয় বস্তু তথা প্রকৃত বা উপমেয়কে অপহ্নব অর্থাৎ নিষেধ বা অস্বীকার করিয়া আক্ষিপ্ত বস্তু তথা অপ্রকৃত বা উপমানের প্রতিষ্ঠা করা হইলে অপহ্নুতি অলংকার হয়। সরাসরিভাবে ইহাই বলা যায় যে, এই অলংকারে উপমেয়কে প্রতিষেধ করিয়া উপমানকে উজ্জ্বল করিয়া বর্ণনা করা হয়। উপমেয়কে এই যে অস্বীকার কর্ম, ইহা (১) হয় প্রত্যক্ষভাবে 'না' 'নয়' বা 'নহে' শব্দাদির সাহায্যে, (২) নয় অপ্রত্যক্ষভাবে 'ব্যাজ', 'ছল', 'বুঝি', 'ছদ্ম' প্রভৃতি অসত্যবাচক শব্দাদির সাহায্যে বুঝানো হয়। প্রত্যক্ষ অস্বীকার-কর্মের ব্যাপারে উপমান-উপমেয় বিভিন্ন বাক্যে, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ অস্বীকার-কর্মের বেলায় উপমান-উপমেয় একই বাক্যের মধ্যে থাকে। আমাদের সাহিত্যে প্রথম পদ্ধতির অপহ্নুতিই মেলে ঃ যেমন,—

(ক) 'তারাই আজ নিঃস্ব দেশে কাঁদছে হয়ে অন্নহারা,
দেশের যত নদীর ধারা, জল না, ওরা অশ্রুধারা !' —নজরুল ইসলাম।

—এখানে নদীর ধারা 'জল না'—এই কথা বলিয়া বর্ণনীয় বস্তুকে অস্বীকার করিয়া, 'ওরা অশ্রুধারা' এই কথা জানাইয়া আক্ষিপ্ত বস্তু তথা উপমানের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। 'জলধারা' ও 'অশ্রুধারা'র সাদৃশ্যই অপহ্নুতির মূলে বিদ্যমান।

(খ) 'হাসি যে রঙীন ধুলা, অশ্রু নয়, অভ্র সে কঠিন।' —মোহিতলাল।

—এখানে **প্রথম পদ্ধতির অপহ্নুতি** অলংকার হইয়াছে। হাসি 'অশ্রু নয়', এই কথা বলিয়া বর্ণনীয় বস্তুকে অস্বীকার করিয়া, 'অভ্র সে কঠিন' এই কথা জানাইয়া আক্ষিপ্ত বস্তু তথা উপমানের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

(গ) 'চোখে চোখে কথা নয় গো, বন্ধু, আগুনে আগুনে কথা।' —অন্নদাশংকর।

—এখানেও **প্রথম পদ্ধতির অপহ্নুতি** অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা' —মধুসূদন।

—এখানে **দ্বিতীয় পদ্ধতির অপহ্নুতি** অলংকার হইয়াছে।

(ঙ) 'ষড়্ঋতুছলে ষড়্রিপু খেলে কাম হতে মাৎসর্য !' —যতীন্দ্রনাথ।

—এখানেও **দ্বিতীয় পদ্ধতির অপহ্নুতি** অলংকার হইয়াছে।

**নিশ্চয়**

যদি উপমানকে নিষিদ্ধ করিয়া উপমেয়কে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়

অলংকার হয়। প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়ের সুদৃঢ় নির্ধারণই নিশ্চয় অলংকারের লক্ষ্য **নিশ্চয় অলংকারটি অপহ্নুতি অলংকারের বিপরীত** ঃ যেমন,

(ক) 'অসীম নীরদ নয়,
অই গিরি হিমালয়!' —বিহারীলাল।

—এখানে উপমান 'নীরদ (=মেঘ)'-কে নিষিদ্ধ করিয়া প্রকৃত বর্ণনীয় বস্তু তথা উপমেয় 'হিমালয়'কে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

(খ) 'এ নহে অরুণ-আভা, নহে শশধর-বিভা,
হিমমাঝে বুঝি গৌরীর গৌর আভা হাসে রে!' —নবীনচন্দ্র।

—এখানে উপমানদ্বয় 'অরুণ-আভা' ও "শশধর-বিভা'কে নিষিদ্ধ করিয়া প্রকৃত বর্ণনীয় বস্তু তথা উপমেয় 'গৌরীব গৌর আভা' প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

**সন্দেহ**

যদি উপমেয় ও উপমান উভয়েতেই সমভাবে সংশয় থাকে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে যে কোনটি হইবার সম্ভাবনা থাকে, আর সেই সংশয় কবি-প্রতিভাজাত হওয়ায় চমৎকার হয়, তাহা হইলে সন্দেহ অলংকার হয়। প্রসঙ্গতঃ, মনে রাখা সমীচীন যে, **সন্দেহ অলংকারে** উপমেয় এবং উপমান উভয় বিষয়েই সমান সংশয়, কিন্তু **উৎপ্রেক্ষা অলংকারে** কেবলমাত্র উপমান-বিষয়েই উৎকট সংশয়। ইহাই উভয়েব মধ্যে পার্থক্য।

(ক) 'দুইধারে একি প্রাসাদের সারি? অথবা তরুর মূল?
অথবা, এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল? —রবীন্দ্রনাথ

—এখানে উপমেয় ও উপমান উভয় পক্ষেই সমান সংশয়। প্রাসাদের সারিও হইতে পারে, তরুর মূলও হইতে পারে।

(খ) 'সোনার হাতে সোনার চুড়ী, কে কার অলংকার?' —মোহিতলাল।

—এখানেও সন্দেহ অলংকার হইয়াছে।

(গ) 'চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে;—
নিশীথে কি উষা আসি উতরিল হেথা?' —মধুসূদন

—এখানে উপমেয় প্রমীলা নয়, প্রমীলাদূতী সুন্দরী 'নৃমুণ্ডমালিনী' উহ্য রহিয়াছে। তবে এই উহ্য উপমেয় 'নৃমুণ্ডমালিনী' এবং উপমান 'উষা' উভয়েতেই সমান সংশয় বিদ্যমান

**উল্লেখ**

বহুবিধ গুণ থাকিবার ফলে একই বিষয়বস্তু যদি (১) বিভিন্ন মানুষের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে গৃহীত হয় কিংবা (২) একই লোক যদি তাহাকে নানাবিধ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখে তাহা হইলে উল্লেখ অলংকার হয় ঃ যেমন,—

(ক) 'স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ' —রবীন্দ্রনাথ

—এখানে চিত্রাঙ্গদা বিভিন্ন মানুষের দ্বারা বিভিন্নভাবে গৃহীত হইয়াছে। ইহাই **উল্লেখ অলংকারের প্রথম প্রকারের** দৃষ্টান্ত।

(খ) 'প্রভু মোর গুণের সাগর, রসময় রূপের নাগর,
রসিকের শিরোমণি, বিলাস ধনের ধন,—
নৃত্যগীতবাদ্যের আকর।' —ভারতচন্দ্র।

—এখানে একই 'প্রভু' একই লোকের নানাবিধ দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিদৃষ্ট হইয়াছেন। ইহাই **উল্লেখ অলংকারের দ্বিতীয় প্রকারের** দৃষ্টান্ত।

## প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা

এই তিনটি অলংকারকে এক সঙ্গে মিলাইয়া পড়িতে হইবে। ইহাদের সংজ্ঞা বুঝিবার আগে **বস্তু-প্রতিবস্তু** এবং **বিম্ব-প্রতিবিম্ব**—এই দুইটি পারিভাষিক শব্দ বুঝা প্রয়োজন। যেখানে উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম আলাদা অথচ অনেকটা সমার্থক শব্দের দ্বারা প্রকাশিত এবং কার্যতঃ একই বলিয়া সাদৃশ্য সহজেই বুঝা যায়, সেখানে উপমেয় ও উপমানের সম্বন্ধকে **বস্তু-প্রতিবস্তু-সম্বন্ধ** আর সাধারণ ধর্মকে **বস্তু-প্রতিবস্তু-ভাবাপন্ন** বলা হয়। আবার যেখানে উপমেয় ও উপমানের ধর্ম কিছুটা আলাদা আলাদা প্রকারের বলিয়া ভিন্ন শব্দের সাহায্যে প্রকাশিত হয় এবং কার্যতঃ এক না হওয়ায় সাদৃশ্য প্রণিধানগম্য হয় অর্থাৎ বুদ্ধির সাহায্যে ভাবিয়া চিন্তিয়া এই দূরগত সাদৃশ্য বুঝা যায়, সেখানে উপমেয় ও উপমানের সম্বন্ধকে **বিম্ব-প্রতিবিম্ব-সম্বন্ধ** আর সাধারণ ধর্মকে **বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবাপন্ন** বলা হয়। অতএব, কথাটি দাঁড়ায় এই যে, বস্তু-প্রতিবস্তু-সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ফলিতার্থে অর্থাৎ কাজের দিক দিয়া সাধারণ ধর্ম অভেদ—তাই সাদৃশ্য বেশ প্রকট ঃ অপর পক্ষে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য প্রণিধানগম্য—তাই সাদৃশ্য দূরগত।

**প্রতিবস্তূপমা অলংকারে** উপমেয় ও উপমান পাশাপাশি দুইটি পৃথক্ পৃথক্ বাক্যে থাকে, তবে ইহাদের যে সাধারণ ধর্ম উল্লিখিত হয়, তাহা একটিই কিন্তু প্রকাশিত হয় পৃথক্ অথচ সমার্থক ভাষায়, আবার 'সম', 'তুল্য' প্রভৃতি তুলনাবোধক শব্দেরও প্রয়োগ হয় না। **এই অলংকারে ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শুধু সাধারণ ধর্মটি বস্তু-প্রতিবস্তু-ভাবাপন্ন ঃ** যেমন—

(ক) 'একটি মেয়ে চ'লে গেছে জগৎ হতে নৈরাশে ;
একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজসাপের নিশ্বাসে।' —সত্যেন্দ্রনাথ।

—এখানে 'মেয়ে' উপমেয়, 'মুকুল' উপমান। পরস্পরসন্নিহিত দুইটি পৃথক্ বাক্যে ইহারা স্থান পাইয়াছে। তুলনাবোধক শব্দ নাই। সাধারণ ধর্ম—'লয়প্রাপ্ত হওয়া' ; কিন্তু এই সাধারণ ধর্মই প্রকাশিত হইয়াছে 'চ'লে গেছে' ও 'শুকিয়ে গেছে'—এই পৃথক্ পৃথক্ বাক্যাংশে।

(খ) 'গাভী যদি তৃণ খায়, করে জল পান.
তা'র সার দুগ্ধরূপে করে প্রতিদান।
পরদ্রব্য সাধু যদি করেন গ্রহণ,
জীবের মঙ্গল-হেতু করেন অর্পণ।' —রজনীকান্ত।

—এখানে 'সাধু' উপমেয়, 'গাভী' উপমান। পরস্পরসন্নিহিত দুইটি পৃথক্ বাক্যে ইহারা স্থান পাইয়াছে। তুলনাবোধক শব্দ নাই। সাধারণ ধর্ম—'পরহিতৈষণা'; ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে 'করে প্রতিদান' ও 'করেন অর্পণ'—এই দুইটি পৃথক্ বাক্যাংশে।

**দৃষ্টান্ত অলংকারে** উপমেয় ও উপমান পাশাপাশি দুইটি পৃথক্ বাক্যে থাকে, তবে ইহাদের সাধারণ ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সাহায্যে প্রকাশিত হয় এবং কার্যতঃ উহা এক না হওয়ায় সাদৃশ্য প্রণিধানগম্য হয়, আবার 'সম' 'তুল্য' প্রভৃতি তুলনাবাচক শব্দেরও প্রয়োগ থাকে না। **এই অলংকারে ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উপমেয়-উপমান ও তাহাদের সাধারণ ধর্ম—উভয়তঃই বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাব বিদ্যমান থাকে :** যেমন,—

(ক) 'ছোট শিশু যদি উঠিতে না পারে মায়ের কোলে,
নুয়ে প'ড়ে মাতা চুমা দিয়ে তা'রে বক্ষে তোলে।
সিন্ধু যদি বা কল্লোল তুলি' ছুঁতে না পারে,
নামি দিগন্তে দেয় পরশন গগন তা'রে!' —কালিদাস।

—এখানে উপমেয় 'শিশুর'র উপমান 'সিন্ধু' এবং উপমেয় 'মাতা'র উপমান 'গগন'। এক পক্ষের 'শিশু' ও 'মাতা' আর অপর পক্ষের 'সিন্ধু ও 'গগন'—উভয়ের সাধারণ ধর্ম বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবাপন্ন। অর্থে একটি দূরগত সাদৃশ্য আছে। এক পক্ষে অর্থাৎ একটি বাক্যে আছে উপমেয়, এবং অপর পক্ষে অর্থাৎ অপর বাক্যে আছে উপমান। অর্থাৎ বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবটি দুইটি পৃথক্ স্বাধীন ও স্বয়ং পূর্ণ বাক্যে আছে।

(খ) 'মনোভাব
যতক্ষণ মনে থাকে, দেখায় বৃহৎ;
কার্যকালে ছোট হয়ে আসে। বহু বাষ্প
গলে গিয়ে এক ফোঁটা জল।' —রবীন্দ্রনাথ

—এখানে উপামেয় এবং উপমান দুইটি পৃথক্ বাক্যে রহিয়াছে। তবে এক পক্ষের সঙ্গে অপর পক্ষের সাধারণ ধর্ম বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবাপন্ন। অর্থে সাম্যবোধ হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলংকার হইয়াছে।

(গ) 'তব যোগ্যা কন্যা মোর, তারে লহ তুমি।
সহকার মাধবিকালতার আশ্রয়!' —রবীন্দ্রনাথ

—এখানেও দৃষ্টান্ত অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'সবহুঁ মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল-বাণী॥

সকল সময় নহ ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখনারী নহ গুণবন্ত।' —বিদ্যাপতি।

—এখানে শেষ বাক্যে আছে উপমেয়—'পুরুখনারী' (=পুরুষনারী)। মোতির (=মুক্তার) মর্যাদা, কোকিল-বাণীর মাধুর্য, বসন্তের সৌন্দর্য ও গুণবত্তা আলাদা হইলেও তাৎপর্যে সাম্য বুঝাইতেছে। এই উদাহরণটি **মালাদৃষ্টান্তের**।

**নিদর্শনা অলংকারে** দুইটি বস্তুর সাধারণতঃ অ-সম্ভব, তবে কখনও-বা সম্ভব সম্পর্কে ব্যঞ্জনার সাহায্যে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাব অর্থাৎ উপমান-উপমেয়ভাব বোঝানো হয়। এই অলংকারে **বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবটি** সাধারণতঃ একটি বাক্যে, তবে কখনও কখনও দুইটি বাক্যে থাকে। **দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনা অলংকার দুইটির মধ্যে পার্থক্য এইরূপ ঃ** দৃষ্টান্ত অলংকারে দুইটি বস্তুর মধ্যে সর্বদা থাকে সম্ভবপর সম্বন্ধ, কিন্তু নিদর্শনা অলংকারে সম্বন্ধ সাধারণতঃ অ-সম্ভব। দৃষ্টান্ত অলংকারে বাক্যার্থ শেষ হইয়া গেলে প্রণিধানের সাহায্যে তাৎপর্য গ্রহণান্তে সাদৃশ্যজ্ঞানের উপলব্ধি ঘটে, কিন্তু নিদর্শনার বাক্যার্থ শেষ হইবামাত্র সাদৃশ্যবোধ অনুভূত হয়; নিদর্শনার অর্থ ই হইতেছে 'নিশ্চয়পূর্বক দর্শন, অর্থাৎ সাদৃশ্য আবিষ্কার' ঃ যেমন,—

(ক) 'শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার আবির্ভাব; বাহুযুগল কোমলবিটপশোভা ধারণ করিয়াছে।' —শকুন্তলা।

—এখানে শকুন্তলার অধর ও নবপল্লব, কিংবা তাহার বাহুযুগল ও কোমলবিটপ— একবাক্যগত এই বস্তু দুইটির সম্বন্ধ অ-সম্ভব সম্বন্ধ। কেন না,—অধরে নবপল্লবের শোভা আর বাহুযুগলে কোমলবিটপের শোভা ধরিতে পারে না—একের ধর্ম অপরে আরোপিত হইতে পারে না। এখানকার অর্থটি হইতেছে এইরূপ ঃ—অধর নবপল্লবের শোভার ন্যায় শোভা, বাহুযুগল কোমলবিটপের শোভার ন্যায় শোভা ধরিয়াছে। অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধই উপমান-উপমেয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছে। এই সম্বন্ধটি বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবাপন্ন—তাই অলংকারটি নিদর্শনা অলংকার।

(খ) 'আলোক যেথানে অধিক ফুটেছে সেথানে দুধের বান।' —মোহিতলাল।

—এখানে একটি বাক্যে 'আলোক' এবং 'দুধ'—এই দুইটি বস্তুর অ-সম্ভব সম্পর্কের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় নিদর্শনা অলংকার হইয়াছে।

(গ) 'অবরেণ্যে বরি'
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমলকানন।' —মধুসূদন।

—এখানেও নিদর্শনা অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'কিংবা কণ্টকিত, হায়। যে বিধি করিল
গোলাপকমল;

সে বিধি পাষাণ দহিতে সুকবিগণে
কবিত্ব-অমৃতে দিলা দারিদ্র্য-অনল।' —নবীনচন্দ্র।

—এখানে একটিমাত্র বাক্যে গোলাপকমলে কাঁটা ও কবিত্ব-অমৃতে দারিদ্র্য-অনল বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবাপন্ন হওয়ায় নিদর্শনা অলংকার হইয়াছে।

**অতিশয়োক্তি**

বর্ণনীয় বস্তু এবং আরোপ্যমান বস্তুর অভেদ সিদ্ধ হইবার দরুণ যদি বর্ণনীয় বস্তুর পূর্ণগ্রাস বা লোপ ঘটে, কিংবা ঐ বস্তুবর্ণনা কল্পনার আশ্রয়ে যে কোন রকমে লৌকিক সীমা ছাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে অতিশয়োক্তি অলংকার হয়। সৌন্দর্য সৃষ্টি করিবার জন্য আতিশয্যপূর্ণ উক্তির নাম অতিশয়োক্তি। উপমেয় ও উপমানের ভিতর ভেদ থাকিলেও অভেদ সিদ্ধ হইলে এবং উপমান উপমেয়কে পূর্ণগ্রাস করিয়া তাহার জায়গা অধিকার করিলে অতিশয়োক্তি অলংকার হয়। উপমানের দ্বারা উপমেয়ের এই যে পূর্ণগ্রাস—আলংকারিকদের মতে ইহারই নাম 'সিদ্ধ অধ্যবসায় বা অধ্যবসান'। **অতিশয়োক্তি অলংকার অভেদসর্বস্ব, পক্ষান্তরে রূপক অলংকার অভেদপ্রধান।** অতিশয়োক্তি অলংকার দুই জাতের—রূপকাতিশয়োক্তি ও অতিশয়োক্তি। অবশ্য সত্য কথা বলিতে কি, রূপকাতিশয়োক্তি অতিশয়োক্তিরই অন্তর্গত। তবে যে সকল অতিশয়োক্তি রূপকাশ্রিত এবং রূপকেরই পরিণত রূপ ধারণ করিয়া থাকে, তাহাদের একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়; এই নামটিই হইতেছে **রূপকাতিশয়োক্তি।**

এখানে **একটি কথা স্মরণীয়** যে, রূপকাতিশয়োক্তির পূর্ববর্তী অলংকারটি রূপক অলংকার, আর পরবর্তী অলংকারটি ব্যতিরেক অলংকার। 'মুখ-চাঁদ'—এই রূপক অলংকারটি 'চাঁদ' (যেমন,—চাঁদের হাট)—এই অতিশয়োক্তি অলংকারের স্তরে যাইয়া 'মুখের নিকটে চাঁদ নগণ্য অথবা চাঁদ জিনিয়া মুখ'—এই ব্যতিরেক অলংকারের রূপ লইতে পারে।

এবার অতিশয়োক্তি অলংকারের উদাহরণ দেওয়া গেল :

(ক) 'দাসীর এ তৃষ্ণা তোষ সুধা-বরিষণে।' —মধুসূদন।

—এখানে 'শুনিবার ইচ্ছা' ও 'সুমিষ্ট ভাষণ' এই উভয় উপমেয়কে একেবারে গ্রাস করিয়া 'তৃষ্ণা' ও 'সুধাবরিষণ'—এই উপমানদ্বয় প্রকটিত হইয়াছে।—তাই রূপকাতিশয়োক্তি অলংকার হইয়াছে।

(খ) 'সকলে কাঁদি বলে—দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরেও হানে!' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'কাশীরাজ' ও 'কোশল-নৃপতি' এই উভয় উপমেয়কে গ্রাস করিয়া 'রাহু' ও 'চাঁদ'—এই উপমানদ্বয় প্রকটিত হওয়ায় রূপকাতিশয়োক্তি অলংকার হইয়াছে।

(গ) 'যে মন রস সম্ভোগ করে সে যাতায়াত শুরু করেছে আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণশালার আঙিনায়। স্বভাবতঃই তার ঝোঁক পড়েচে সেই দিকটাকে যে-দিকে চলেছে মদের পরিবেষণ, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েছে মাতাল।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'আধুনিক গল্প-কবিতা-নাটকময় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য' ও 'যৌন-বাসনা-বিক্ষুব্ধ উগ্র উত্তেজক অথচ আপাতমধুর রসসাহিত্য'—এই উভয় উপমেয়কে গ্রাস করিয়া 'আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণশালা' ও 'মদ'—এই উপমানদ্বয় প্রকটিত হওয়ায় রূপকাতিশয়োক্তি অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইল লুকাইয়া॥ —ভারতচন্দ্র।

—এখানে বিদ্যার মুখে সুধার সম্বন্ধ না থাকিলেও উহা ঘোষিত হওয়ায় অসম্বন্ধে সম্বন্ধ-রূপ অতিশয়োক্তি অলংকার হইয়াছে।

(ঙ) 'দৃষ্টি হেথা পড়িতে না পড়িতে তোমার,
আগেই হইল দেখি বিস্ময়ে প্রস্ফার! —নিবাতকবচ-বধ।

—এখানে কারণের আগেই কার্যের উৎপত্তি হওয়ায় কার্যকারণের পৌর্বাপর্যের ব্যতিক্রমজনিত অতিশয়োক্তি অলংকার হইয়াছে।

(চ) এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি!
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥ —চণ্ডীদাস।

—এখানে অভেদ-ভেদ অথবা সম্বন্ধে-অসম্বন্ধ ঘটায় অতিশয়োক্তি অলংকার হইয়াছে।

**মন্তব্য :** সাহিত্যদর্পণকারের মতে, অতিশয়োক্তির প্রকার পাঁচটি। ভেদে অভেদ রূপ, এই যে একটি প্রকারের অতিশয়োক্তি, ইহাই রূপকাতিশয়োক্তি। ইহা ছাড়া, অভেদে ভেদ, সম্বন্ধে অসম্বন্ধ, অসম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং কার্যকারণের পৌর্বাপর্যের ব্যতিক্রম-রূপ আরও চার প্রকার অতিশয়োক্তিকে নিছক অতিশয়োক্তি অলংকার বলা হইয়াছে।

## ব্যতিরেক

যখন উপমেয়কে উপমানের অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট অথবা অধিকতর নিকৃষ্ট করিয়া দেখানো হয়, তখন হয় ব্যতিরেক অলংকার। কোন্ কারণে তুলনায় উপমেয় অধিকতর উৎকৃষ্ট অথবা অধিকতর নিকৃষ্ট—সে কথা কোথাও-বা থাকে উক্ত, আবার কোথাও-বা থাকে অনুক্ত। ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বলিয়াছেন,—'**রূপকে অভেদের** আরোপ, **অতিশয়োক্তিতে** অভেদের সিদ্ধি, **ব্যতিরেকে** পুনরায় ভেদ, কিন্তু এই ভেদকথনই উপমেয় বস্তুর সর্বাতিশয়ী সৌন্দর্য বা মহিমা ঘোষণা করে। এই অলংকারের তুলনায় রূপকও যেন বাহ্য। প্রথম প্রকার অতিশয়োক্তির সহিত ইহার সারূপ্য এত পরিস্ফুট যে, ইহাকে ব্যতিরেক না বলিয়া বিশেষ অতিশয়োক্তি বলিলে যেন আরও সার্থক নাম হয়।' উপমেয়ের উৎকর্ষ-বোধক ব্যতিরেক-জ্ঞাপক শব্দ হইতেছে—

'জিনি', নিন্দি', 'গঞ্জি', 'ছার' ইত্যাদি। ব্যতিরেক বুঝিবার উপায় তিনটি—**প্রথমতঃ,** ব্যতিরেক-জ্ঞাপক বা সাদৃশ্যশব্দের দ্বারা; **দ্বিতীয়তঃ,** অর্থের সাহায্যে; **তৃতীয়তঃ,** ব্যঞ্জনার গুণে: যেমন,—

(ক) 'গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ
মোতি-পাঁতি জিনিয়া দশন॥' —মুকুন্দরাম।

—এখানে 'জিনি', 'জিনিয়া'—এই ব্যতিরেক-জ্ঞাপক শব্দাদির প্রয়োগ উপমেয়ের উৎকর্ষ বুঝাইতেছে।

(খ) 'অঞ্জনা-গঞ্জন জগজন-রঞ্জন
জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা
দেখ সখি নাগর-রাজ বিরাজে।
শুধুই সুধাময় হাস বিকশিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে॥
ইন্দীবর বর- গরব-বিমোচন
লোচন মনমথ ফান্দে।' —গোবিন্দদাস।

—এখানে 'গঞ্জন', 'জিনি', 'মলিন ভেল' ও 'গরব-বিমোচন'—এই চারিটি শব্দ বা শব্দসমষ্টি প্রয়োগ করিয়া চার বারে চারটি ব্যতিরেক বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

(গ) 'শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জন;
সিংহনাদ; জলধির কল্লোল; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদ, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে, কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টংকার।
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ংকর! —মধুসূদন।

—এখানে মেঘের গর্জন, সিংহনাদ, জলধির কল্লোলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে 'কোদণ্ড-টংকার' আবার ইরম্মদের গতিকে তুচ্ছ করিয়া ভয়ংকর শর ছুটিয়াছে। দুইটি ব্যতিরেক থাকায় **মালা-ব্যতিরেক** অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'দিনে দিনে শশধর হয় বটে তনুতর,
পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু ক্রমশঃ হইলে তনু
আর ত নূতন নাহি হয়॥ —হরিশচন্দ্র কবিরত্ন।

—এখানে তুলনায় 'নরের তনু'—এই উপমেয়ের অপকর্ষ ও 'শশধর'—এই উপমানের উৎকর্ষ হওয়ায় ব্যতিরেক অলংকার হইয়াছে।

## সমাসোক্তি

যদি বর্ণনীয় বস্তুতে তথা উপমেয়ে উপমান-বস্তুর ব্যবহার অর্থাৎ অবস্থা সমারোপ করা হয়, তাহা হইলে সমাসোক্তি অলংকার দেখা যায়। এই যে অবস্থা সমারোপ

ব্যাপারটি—ইহা উভয় বস্তুর সমান কার্য, সমান বিশ্লেষণ, কখনও-বা সমান লিঙ্গ-প্রয়োগের মধ্য দিয়া ঘটিয়া থাকে। আলংকারিকদের মতে, 'ব্যবহার' শব্দের মানে 'অবস্থা বা অবস্থা-ভেদ'। এই 'ব্যবহারে'র আরোপ সম্যকরূপে সিদ্ধ হইলে সার্থক সমাসোক্তি অলংকার হয়। 'সমাস' কথাটির মানে 'সংক্ষেপ'। সমাসে তথা সংক্ষেপে উপমেয় ও উপমানের বিষয় উক্ত হয় বলিয়া, ইহাই সমাসোক্তি অলংকার। প্রসঙ্গতঃ, একটি কথা জানিয়া রাখা উচিত। এই সমাসোক্তি অলংকার অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথের লেখা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'চঞ্চলা', 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি কবিতাবলীর আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। এই অলংকারের প্রধান রূপই হইতেছে—অচেতনে চেতনের ব্যবহার সমারোপ। প্রকৃত সমাসোক্তিতে অচেতন বা নির্জীব বস্তুতে মানবধর্ম বা মানবব্যক্তিত্ব আরোপিত হয়। এই অলংকারটি ইংরাজি অলংকারশাস্ত্রের Personification, Personal Metaphor এবং Pathetic Fallacy-র প্রায় তুল্য: যেমন,—

(ক) 'এমনি সাঁঝে আমার প্রিয়া
যেতো ছোট কলসীখানি কোমল তাহার কক্ষে নিয়া;
সোহাগে জল উথলে উঠি বক্ষে তাহার পড়ত লুটি।' —কুমুদরঞ্জন।

—এখানে অচেতন 'জলে' চেতনধর্মী সোহাগময়ী 'সখী'র ব্যবহার সমারোপ করা হইয়াছে।

(খ) 'চাহিয়া ঈর্ষার দৃষ্টি স্ফুটমান কুমুদের পানে
পরিপাণ্ডু পদ্মদল মুদে আঁখি রুদ্ধ অভিমানে।' —যতীন্দ্রমোহন।

—এখানে অচেতন 'পদ্মদলে' চেতনধর্মী নায়কসঙ্গসুখবঞ্চিত নায়িকার ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে।

(গ) 'বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম-অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে।' —রবীন্দ্রনাথ

—এখানে অচেতন 'বসুন্ধরা'য় মানবধর্ম আরোপিত হইয়াছে।

(ঘ) 'কখন রস এল শুকিয়ে, এক পা এক পা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিলে প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে অচেতন 'মরু'তে চেতনধর্মী 'তৃষ্ণার অজগর সাপে'র ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে।

## প্রতীপ

যদি (১) উপমান উপমেয়-রূপে কল্পিত হয়, কিংবা (২) উপমেয় আপনার উৎকর্ষবশতঃ উপমানকে প্রত্যাখ্যান করে অর্থাৎ উপমানের নিষ্ফলতা বর্ণিত হয়, অথবা (৩) প্রসিদ্ধ বস্তুর অতিশয় উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়া তাহাকে উপমানরূপে কল্পনা

করা যায়, তাহা হইলে প্রতীপ অলংকার হয়। প্রতীপের এই দ্বিতীয় লক্ষণটি দেখিয়া ব্যতিরেক অলংকারের কথা মনে জাগে। **প্রতীপ ও ব্যতিরেক অলংকার দুইটির মধ্যে পার্থক্য** এই দিক দিয়া যে, ব্যতিরেকে উপমেয়ের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়, কিন্তু প্রতীপে উপমান প্রত্যাখ্যাতই হয়। প্রতীপে উপমেয় 'স্বয়ং' এতই উৎকৃষ্ট যে তাহার কাছে উপমান নিষ্ফল ; কিন্তু ব্যতিরেকে এই ভাবটি একেবারেই নাই। 'প্রতীপ' শব্দটির মানে 'বিপরীত'। অলংকারটির লক্ষণবিচারে এই নামটির সার্থকতা বুঝা যায় ঃ যেমন,—

( ক ) 'আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তল-সম
নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'মেঘ-সম কুন্তল' বলা হয় নাই, বলা হইয়াছে 'কুন্তল-সম মেঘ'। ইহাই **প্রতীপের প্রথম প্রকারের** দৃষ্টান্ত।

( খ ) 'অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেবদৈত্য ;' —মধুসূদন।

—এখানে প্রসিদ্ধ উপমান-বস্তু অমৃতের নিষ্ফলতা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই **প্রতীপের দ্বিতীয় প্রকারের** দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য, ব্যতিরেক অলংকার হয় নাই। কারণ,—ব্যতিরেকে **সাক্ষাৎভাবে** উপমেয়ের অতিশয় উৎকর্ষটি দেখানো হয়, প্রতীপে উপমানের নিষ্ফলতা বা নিরর্থকতা দেখানো হইয়াছে।

( গ ) 'সুদারুণ আছে যত সকলের গুরু—
হলাহল! হেন গর্ব না করিও মনে,
তোমার সদৃশ বহু দুর্জয়-বচন
আছে, ইহা সুনিশ্চিত জানে ত্রিভুবনে।'

—এখানে প্রসিদ্ধ বস্তু হলাহলের বর্ণনা করিয়া তাহাকে উপমানরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাই **প্রতীপের তৃতীয় প্রকারের** দৃষ্টান্ত।

## [ ২ ] বিরোধমূলক অলংকার

### বিরোধাভাস

যখন দুইটি বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাৎপর্যে সে বিরোধের অবসান ঘটাইয়া চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে, তখন হয় বিরোধ বা বিরোধাভাস অলংকার। এই অলংকারে বাচনভঙ্গী এক রকমের ছল আঘাত ; ইহা হঠাৎ বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া অর্থের ঘনীভূত রূপের দিকে দৃষ্টি টানিয়া লইয়া যায়। মনে রাখা দরকার যে, বাস্তবিক বিরোধে এই অলংকার হয় না। বিরোধাভাস অলংকারটি (১) হয় সমগ্র বাক্যগত, (২) নয় কেবলমাত্র নিকটবর্তী দুইটি শব্দগতও হইতে পারে

প্রথম জাতের বিরোধকে ইংরাজি অলংকারশাস্ত্রের Epigram-এর সহিত এবং দ্বিতীয় জাতের বিরোধকে Oxymoron-এর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে : যেমন,—

( ক ) 'অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্বত্র গতাগতি।' —ভারতচন্দ্র।

—এখানে বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও সর্বশক্তিমান নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ-বর্ণন বলিয়া বিরোধ কাটিয়া গিয়াছে।

( খ ) 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'মৃত্যুহীন প্রাণ' বাক্যাংশটি বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ঐহিক অমরতার কথা উদ্দিষ্ট হওয়ায় বিরোধ কাটিয়া গিয়াছে।

( গ ) 'মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃতহ্রদে।' —মধুসূদন।

—এখানে 'হ্রদে পতন' ও 'গলিত না হওয়া' পরস্পরবিরোধী। কিন্তু হ্রদটি যে অমৃতময় —অমৃত বিনাশ করে না, অমরই করে।

( ঘ ) 'ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে—
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।' —গোলাম মোস্তফা।

—এখানে বিরোধাভাস এবং ইংরাজি অলংকার-শাস্ত্রের Epigram লক্ষণীয়।

( ঙ ) 'সৃষ্টি-ছাড়া সৃষ্টি-মাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গিহীন রাত্রিদিন ;' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'সৃষ্টি-ছড়া সৃষ্টি' কথাটি বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও, সৃষ্টির অস্বাভাবিকতার কথা ব্যঞ্জিত হওয়ায় বিরোধ কাটিয়া গিয়াছে। বিরোধাভাসের একটি বিশিষ্ট জোরালো রূপ, ধরিতে গেলে চরম রূপই এখানে আছে। সন্নিহিত দুইটি শব্দগত এই যে বিরোধাভাস অলংকার, ইহাকে **বিরোধোক্তিও** বলা যাইতে পারে। ইংরাজি অলংকার-শাস্ত্রে ইহারই নাম Oxymoron।

( চ ) 'সেই দহনের মিঠা বিষে মোর মদনের আরাধনা!' —মোহিতলাল।

—এখানেও বিরোধাভাসের চরম রূপ লক্ষণীয়। ইহাও বিরোধোক্তি তথা Oxymoron।

( ছ ) 'পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্য লয়ে রহ রাজ্যহীন।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানেও বিরোধাভাস এবং ইংরাজি অলংকার-শাস্ত্রের Oxymoron লক্ষণীয়।

## বিষম

যখন বি-ষম অর্থাৎ বি-সদৃশ বস্তু দুইটির বর্ণনা-বিশেষ হইতে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়, তখন হয় বিষম অলংকার। (১) কারণ ও কার্যের গুণ বা ক্রিয়া পরস্পরবিরুদ্ধ হইলে, কিংবা (২) আরব্ধ কার্যের বিফলতা এবং নূতন অনর্থের উৎপত্তি হইলে, কিংবা (৩)

পরস্পর-বিরুদ্ধ বস্তু দুইটির একত্র মিলন হইলে—অর্থাৎ এই তিন রকমে বিষম অলংকার হয়ঃ যেমন,—

(১) 'উজ্জ্বল ঝলকে আলো কালো বরণ-ঘটায়॥' —গিরিশচন্দ্র।

—এখানে 'কালো বরণ-ঘটা' এই কারণের কার্য হইল 'উজ্জ্বল আলোক-ঝলক'। কারণ ও কার্যের গুণের পরস্পর-বিরুদ্ধতা লক্ষণীয়।

(২) 'পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।' —জ্ঞানদাস।

—'মেঘ জল না দেওয়া'য় আরব্ধ কার্যের বিফলতা এবং 'বজ্র পড়ার কথায়' নূতন অনর্থের উৎপত্তি-কথা বলা হইয়াছে। তাই বিষম অলংকার।

(৩) 'অঙ্গনা-জনের অন্তঃকরণ কি বিমূঢ়! অনুরাগের পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। তেজঃপুঞ্জ তপোরাশি মুনিকুমারই-বা কোথায়, সামান্যজনসুলভ চিত্তবিকারই-বা কোথায়!' —কাদম্বরী।

—এখানে একই আধার এই 'অঙ্গনা-জনের অন্তঃকরণে' 'তপোরাশি' ও 'চিত্তবিকার' —এই বিরুদ্ধ বস্তুদ্বয়ের কথায় একান্তভাবে অসম্ভব ঘটনার একত্র সংঘটন ঘটিয়াছে।

## বিভাবনা

কারণ ছাড়া অর্থাৎ প্রসিদ্ধ কারণ ছাড়া কার্যোৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হইলে বিভাবনা অলংকার হয়। 'বিভাবনা'র মানে 'যাহাতে কারণ বিভাবিত বা বিচারিত' হয়। কার্যোৎপত্তির মূলে যে অপ্রসিদ্ধ অথচ প্রকৃত কারণটি আছে তাহা কোথাও-বা উক্ত, আবার কোথাও-বা অনুক্ত থাকেঃ যেমন,—

(ক) 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত,
বিনা বাতে নিবে গেল মঙ্গল-প্রদীপ।' —অমৃতলাল।

—এখানে আশুতোষের আকস্মিক মৃত্যু, যাহা অপ্রসিদ্ধ অথচ প্রকৃত কারণ, তাহা অনুক্ত আছে।

(খ) 'সুরাপান না করিলেও, চক্ষুর দোষ না থাকিলেও, ধনমদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে।' —কাদম্বরী।

—এখানে 'ধনমদ' যাহা অপ্রসিদ্ধ অথচ প্রকৃত কারণ, তাহা উক্ত হইয়াছে।

## বিশেষোক্তি

কারণ-সত্ত্বেও কার্যোৎপত্তি তথা স্বাভাবিক কার্যোৎপত্তি না হইলে, এমন কি বিরুদ্ধ কার্যোৎপত্তি ঘটাইলে বিশেষোক্তি অলংকার হয়। কার্যোৎপত্তি অথবা ফলোৎপত্তি না হইবার প্রকৃত কারণটি কোথাও-বা উক্ত, অবার কোথাও-বা অনুক্তঃ যেমন,—

(ক) 'মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,' —রবীন্দ্রনাথ।

—ঐশ্বর্য, দৈন্য, সম্পদ ও বিপদ এই কারণগুলির স্বাভাবিক ফল যথাক্রমে ঔদ্ধত্য, নতি, সাহস, ভয়। অথচ এই স্বাভাবিক কার্যোৎপত্তি না ঘটিয়া বিরুদ্ধ ফল নম্রতা, নতিহীনতা, ভয় ও নির্ভীকতা দেখা দিয়াছে। —তাই বিশেষোক্তি অলংকার। অবশ্য এই দৃষ্টান্তটির অন্তর্গত চারটি চরণের পরেই ব্যাপারটির প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম'—সেই মহামানব, বিরুদ্ধগুণের মিলনাশ্রয় রামচন্দ্রেই ইহা সম্ভব।

(খ) "দিবাকর, নিশাকর, দীপ, তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তমোনিবারণ॥
তা'রা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার॥" —কৃত্তিবাস।

—এখানে অন্ধকারনাশরূপ কার্যের প্রসিদ্ধ কারণগুলি থাকিলেও কার্য হইতেছে না। কার্য-কারণের এই আপাতবিরোধের অবসান অবশ্য শেষ চরণে ঘটিয়াছে।

### অসংগতি

এক স্থানে কারণ এবং অন্য স্থানে কার্য থাকিলে অসংগতি অলংকার হয়। কারণ ও কার্য ভিন্নাশ্রয়ী বলিয়াই সংগতির অভাবজনিত এই অলংকারটির নাম অসংগতি। সময়ে সময়ে যমক বা শ্লেষ দ্বারা এই অলংকারটির পরিপোষণ হয়ঃ যেমন,—

(ক) 'একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন।' —ভারতচন্দ্র।

—এখানে আগুনটি শিবের ললাটে স্থিত, অথচ মদন ভস্মীভূত হওয়ায় স্ত্রী রতির কপালে দাহকার্য দেখা দিল অর্থাৎ তাঁহার সর্বনাশ হইল। 'এক' শিবকে এবং 'আর' রতিকে বুঝাইতেছে। 'কপাল' শব্দটির প্রয়োগে যমক অলংকারটিও লক্ষণীয়।

(খ) 'হৃদয়-মাঝে মেঘ উদয় করি।
নয়নের পথে বরিখে বারি॥' —জ্ঞানদাস।

—এখানে রাধার এই পূর্বরাগের বর্ণনায় ইহাই বলা হইয়াছে যে, হৃদয়ে শ্যাম-জলধর, নয়নে প্রেমাশ্রু। অর্থাৎ হৃদয়ে কারণ, কিন্তু নয়নে কার্য। তাই অসংগতি অলংকার।

## [৩] শৃঙ্খলামূলক অলংকার

### কারণমালা

যদি কোন কারণের কার্য পরবর্তী কোন কার্যের কারণ হইয়া কারণ-পরম্পরা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে কারণমালা অলংকার হয়ঃ যেমন—

(ক) 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।
অতএব কর সবে লোভ-সংবরণ॥' —হিতোপদেশ।

—এখানে লোভ কারণটির কার্য পাপ, আবার এই কার্য পাপ অপর কার্য মৃত্যুর কারণ হওয়ায় কারণমালা অলংকার হইয়াছে।

(খ) 'রণে যদি মর, ঘুষিবে যশ, যশ যার তার দেবতা বশ ;
যশ হ'লে দেব যাইবে দিবে, দিবে গেলে সদা সুখ ভুঞ্জিবে ॥ —নিবাতকবচ।

## একাবলী

প্রত্যেক পূর্ববর্তী বিশেষ্য যদি পরবর্তী বিশেষ্যের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে একাবলী অলংকার হয়। 'একাবলী' মানে 'একের আবলী বা শ্রেণী' : যেমন—

(ক) 'গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি
সুন্দর ধরাতল।' —যতীন্দ্রমোহন।

—এখানে পূর্ববর্তী বিশেষ্য 'ফুল' পরবর্তী 'অলি'র বিশেষণ। 'ফুল' 'অলি'র বিশেষণ মানে ফুলসংযোগে অলি বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

(খ) 'তাঁর কাব্য বর্ণনা-বহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্র-বহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণ-বহুল।' —বুদ্ধদেব।

—এখানেও একাবলী অলংকার হইয়াছে।

(গ) 'দুঃখের মজা ক্রন্দনে ; ক্রন্দনের মজা কীর্তনে।' —অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

—এখানেও একাবলী অলংকার হইয়াছে।

## সার

বস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বর্ণনা করা হইলে সার অলংকার হয়। ব্যঞ্জনা হইতেই উৎকর্ষের ধারণা হয় : যেমন,—

'পৃথিবীর মধ্যে আমার বাঙালা, বাঙালার মধ্যে আমার পল্লীখানি, পল্লীর মধ্যে আমার কুটীর, কুটীরে আমার মা জননী। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ মানি।'

—এখানে উত্তরোত্তর কে শ্রেষ্ঠ এবং কেহ-বা পরম শ্রেষ্ঠ, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

## আরোহ

বর্ণনা-গুণে যখন উদ্দিষ্ট ভাব বা অর্থ ক্রমে ক্রমে অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন ও হৃদয়গ্রাহী হইতে থাকে, তখন হয় আরোহ অলংকার। এই অলংকারে শুধু চিন্তা বা অর্থের আরোহই নয়, ধ্বনিরও আরোহ অর্থাৎ ক্রম-উত্থান দেখা যায়। ইংরাজি অলংকার-শাস্ত্রের Climax-এর অনুকরণে এই অলংকারটির নামকরণ হইয়াছে : যেমন,—

(ক) 'আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্বস্ব। —বঙ্কিমচন্দ্র।

—এখানে অর্থ ও ধ্বনির ক্রম লক্ষণীয় ; ইহাই তো আরোহ অলংকার।

(খ) 'ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর। ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ।' —স্বামী বিবেকানন্দ।

### [৪] ন্যায়মূলক অলংকার

## কাব্যলিঙ্গ

যদি কোন পদ বা বাক্যের অর্থ ব্যঞ্জনার সাহায্যে কোন বর্ণনীয় বিষয়ের কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে কাব্যলিঙ্গ অলংকার হয়। পদটি সমাসবদ্ধ অথবা

একক হইতে পারে। ব্যঞ্জনা থাকিলেই অলংকার হয়, সরাসরি কারণে অলংকার হয় না। কাব্যলিঙ্গ অলংকারকে কেহ কেহ 'হেতু অলংকার'ও বলিয়া থাকেন : যেমন,—

(ক) 'কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিনী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে ?' —মধুসূদন।

—এখানে ব্যঞ্জনা-গুণে 'পাবক-শিখা-রূপিনী' বিশেষণ পদটি মূল বর্ণনীয় বিষয়ের হেতু-রূপে দেখানো হইয়াছে। কবি বলিতে চাহিয়াছেন যে, এই পাবক-শিখার নিমিত্তই 'হৈম গেহ' অর্থাৎ স্বর্ণলঙ্কা ভস্মীভূত হইতে চলিয়াছে।

(খ) 'গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে। এ সংসারে যেথা যাও, সেথা থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম···' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে ব্যঞ্জনাগুণে 'এ সংসারে যেথা···' এই বাক্যটি মূল বর্ণনীয় বিষয়ের হেতু-রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। রাজা বিক্রমাদিত্য বলিতে চাহিয়াছেন যে, ঐ হেতুটির জন্যই গৃহহীন পলাতক কুমারসেন তাঁহার চেয়ে অধিকতর সুখী।

### অর্থাপত্তি

কোন অর্থ হইতে উহারই সামর্থ্যের দ্বারা অন্য অর্থ বুঝাইলে অর্থাপত্তি অলংকার হয় : যেমন,—

(ক) 'তুমিও জননী যদি খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার!' —রবীন্দ্রনাথ।

—যিনি চৈতন্যরূপিনী পরম স্নেহময়ী জগজ্জননী, তাঁহার পথ হিংসার পথ নয়। কিন্তু তাঁহাতেই যদি অস্বাভাবিক হিংসা সংক্রামিত হয়, তাহা হইলে হীনবুদ্ধি নরের বেলায় তো উহা সংক্রামিত হইবেই। 'হিংসা' তাই এখানে উভয় পক্ষেরই সাধারণ ধর্ম।

(খ) 'তুমি জানো, মীনকেতু, কতো ঋষি-মুনি
করিয়াছে বিসর্জন নারী-পদতলে
চিরার্জিত তপস্যার ফল। ক্ষত্রিয়ের
ব্রহ্মচর্য!' —রবীন্দ্রনাথ।

—কামপ্রবৃত্তিবশে মুনি-ঋষিই যখন নারীপদতলে চিরার্জিত তপস্যার ফল বিসর্জন দেন, তখন ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মচর্য তো কামপ্রভাবে বিনষ্ট হইবেই। 'কামপ্রবৃত্তি' তাই এখানে উভয় পক্ষেরই সাধারণ ধর্ম।

## [৫] গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূলক অলংকার

### অর্থান্তর-ন্যাস

বিশেষের দ্বারা সামান্য অথবা সামান্যের দ্বারা বিশেষ, কারণের দ্বারা কার্য অথবা কার্যের দ্বারা কারণ সমর্থিত হইলে অর্থান্তর-ন্যাস অলংকার হয়। 'অর্থান্তর' শব্দের

মানে 'অন্য অর্থ বা বিষয়' 'ন্যাস' অর্থ 'নিক্ষেপ'। সমর্থন-মানসে অন্য বিষয় নিক্ষিপ্ত বা আক্ষিপ্ত হইলে অর্থান্তর-ন্যাস অলংকার হয়ঃ যেমন,—

(ক) 'চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে॥ —কৃষ্ণচন্দ্র।

—এখানে বিশেষ উক্তির (Particular statement) দ্বারা সামান্য উক্তি (General statement) সমর্থিত হইয়াছে।—তাই অর্থান্তর-ন্যাস অলংকার।

(খ) 'একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলায় রতন ?' —ভারতচন্দ্র।

—এখানে সামান্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থিত। তাই অর্থান্তর-ন্যাস অলংকার।

(গ) 'সবই যায়, কিছুই থাকে না ; থাকে শুধু কীর্তি। কালিদাস গিয়াছেন' শকুন্তলা আছে।, —চন্দ্রশেখর।

—এখানে বিশেষের দ্বারা সামান্য সমর্থিত হইয়াছে।

(ঘ) 'দুঃসহ এ কাজ—তাই তো তোমার 'পরে,
দিতেছি দুরূহ ভার। অয়ি প্রাণাধিকে,
মহৎ হৃদয় ছাড়া কাহারা সহিবে
জগতের মহাক্লেশ যত।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে সুমিত্রার প্রতি কুমারসেনের উক্তিতে সামান্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থিত হইয়াছে।

(ঙ) 'সদ্‌বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয় একথা অগ্রাহ্য। উর্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না ? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয়, উহার কি দাহশক্তি থাকে না ? —কাদম্বরী।

—এখানে দুইটি বিশেষের দ্বারা সামান্য সমর্থিত হওয়ায় **মালা-অর্থান্তর-ন্যাস** হইয়াছে।

(চ) 'সহসা কোন কার্য করিবে না, কেন না—অবিবেচনা পরম বিপদের কারণ হয়, লক্ষ্মী গুণলুব্ধা হইয়া নিজেই বিমৃশ্যকারীকে বরণ করিয়া থাকেন।' —কিরাতার্জুনীয়।

—এখানে প্রথমে বিমৃশ্যকারিত্ব-রূপ কারণ এবং পরে উহার কার্য বা ফল বিবৃত হইয়াছে। তাই কার্যের দ্বারা কারণ সমর্থিত হওয়ায় অর্থান্তর-ন্যাস অলংকার হইয়াছে।

### ব্যাজস্তুতি

ব্যাজে স্তুতি অর্থাৎ (১) নিন্দাচ্ছলে স্তুতি এবং (২) ব্যাজরূপা স্তুতি অর্থাৎ স্তুতিচ্ছলে নিন্দা প্রতীয়মান হইলে ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়ঃ যেমন,—

(ক) 'সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।' —ভারতচন্দ্র।

—এখানে বক্তা দক্ষ শুধু নিন্দা-অর্থেই বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু কবির বাচনভঙ্গীর

গুণে স্তুতি-অর্থটিও প্রতীয়মান হইয়াছে।—অর্থাৎ নিন্দাচ্ছলে স্তুতি হওয়ায় **প্রথম প্রকারের ব্যাজস্তুতি** অলংকার হইয়াছে।

(খ) 'শুনহে কুমার! তোমার আজ কুলের উচিত হইল কাজ।
তব হে জনম অতি বিপুলে ভুবন-বিদিত অজের কুলে
জনক-দুহিতা বিবাহ করি তাহাতে ভাসালে যশের তরী।' —হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

—এখানে বালকগণ বিবাহ-প্রত্যাগত রামচন্দ্রের নিন্দা-পক্ষে 'অজ=ছাগ; জনক-দুহিতা=ভগিনী' শব্দার্থ যেমন ধরিয়াছে, আবার তেমনি স্তুতি-পক্ষে 'অজ=রামচন্দ্রের পিতামহ; জনক-দুহিতা=জনকরাজকন্যা সীতা' এই অর্থটিও ধরিয়াছে—এখানে স্তুতিচ্ছলে নিন্দা হওয়ায় **দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাজস্তুতি** অলংকার হইয়াছে।

**অপ্রস্তুত-প্রশংসা**

অ-প্রস্তুত মানে অ-প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রশংসা অর্থাৎ বর্ণনা হইতে প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতীতি হইলে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলংকার হয়। ব্যঞ্জনার দ্বারা এই প্রতীতি বা বোধ হয়। অ-প্রস্তাবিত বিষয় হইতে প্রস্তাবিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান পাঁচ রকমে হইতে পারে:—(১) অ-প্রস্তাবিত সামান্য অথবা সাধারণ পদার্থ হইতে প্রস্তাবিত বিশেষ পদার্থের বোধ; (২) অ-প্রস্তাবিত বিশেষ পদার্থ হইতে প্রস্তাবিত সামান্য পদার্থের বোধ; (৩) অ-প্রস্তাবিত কার্য হইতে প্রস্তাবিত কারণের বোধ; (৪) অ-প্রস্তাবিত কারণ হইতে প্রস্তাবিত কার্যের বোধ; (৫) অ-প্রস্তাবিত সমান পদার্থ হইতে প্রস্তাবিত সমান পদার্থের বোধ: যেমন,—

(ক) 'কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়াছে পায়,
তা ব'লে কুকুরে কামড়ানো কিরে
মানুষের শোভা পায়?' —সত্যেন্দ্রনাথ।

—এখানে কুকুরঘটিত বিশেষ অ-প্রস্তাবিত বিষয়ের দ্বারা সামান্য প্রস্তাবিত বিষয় অর্থাৎ অধমের আচরণ উত্তম অনুসরণ করে না, এই সাধারণ সত্যটি বর্ণিত হইয়াছে।

(খ) 'ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে।' —মধুসূদন।

—এখানে ব্যঞ্জনার দ্বারা অ-প্রস্তুত 'চূড়া', 'বজ্রাঘাত', 'ভূধরে'র বর্ণনা হইতে প্রস্তুত 'বীরবাহু', 'রামচন্দ্র' ও 'রাবণে'র অনুভূতি পাওয়া যাইতেছে। বিশেষ হইতে বিশেষের এই যে উপলব্ধি, ইহাই তো অ-প্রস্তুত সমান পদার্থ হইতে প্রস্তুত সমান পদার্থের উপলব্ধি। তাই কাহারও কাহারও মতে, ইহা **'সাদৃশ্যমাত্রমূলক অপ্রস্তুত-প্রশংসা' বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে'**

(গ) 'পায়ের তলার ধূলা—সেও, যদি কেউ পদাঘাত করে,
নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি' তার শিরোপরে।' —যতীন্দ্রমোহন।

—এখানে প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয় কিন্তু 'ধূলা' নয়—'ধূলা' তো অ-প্রস্তুত তথা অ-প্রস্তাবিত বিষয়। তবে,—প্রশংসা অর্থাৎ ব্যঞ্জনা-দ্বারা বর্ণনা করিয়া বুঝানো হইয়াছে—'মানুষ কি সেই ধূলি চেয়ে হীন, সহিবে যে অপমান?'—তাই বিশেষ অ-প্রস্তুত বিষয় হইতে সামান্য প্রস্তুত সম্পর্কে উপলব্ধি হওয়ায় অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'চাতক যাচিলে জল হইয়া কাতর,
মৌনভাবে কভু কি থাকয়ে জলধর?' —উদ্ভট।

—এখানে ব্যঞ্জনাবলে অ-প্রস্তুত 'চাতক' ও 'জলধরে'র উপরে প্রস্তুত যাচক ও দয়ালু চেতন মানুষের ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে। তাই এখানে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলংকার হইয়াছে।

(ঙ) রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থে বিশেষ হইতে সামান্যের উপলব্ধিবোধক অপ্রস্তুত-প্রশংসার অনেক উদাহরণ মিলে। 'উদারচরিতানাম্', 'কর্তব্যগ্রহণ', 'কুটুম্বিতা' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা অপ্রস্তুত-প্রশংসার উদাহরণ-রূপে স্মরণীয়।

**মন্তব্য : সমাসোক্তি** ও **অপ্রস্তুত-প্রশংসা**—এই দুইটি অলংকারের পার্থক্য লক্ষণীয়। সমাসোক্তি অলংকারে প্রস্তুত বা প্রকৃত বিষয় হইতে অ-প্রস্তুত বা অপ্রকৃত বিষয়ের অনুভব ঘটে; পক্ষান্তরে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলংকারে অ-প্রস্তুত বা অপ্রকৃত বিষয় হইতে প্রস্তুত বা প্রকৃত বিষয়ের উপলব্ধি হয়। ইহার কারণ এই যে, সমাসোক্তিতে প্রস্তুতের উপরে অ-প্রস্তুতের এবং অপ্রস্তুত-প্রশংসায় অ-প্রস্তুতের উপরে প্রস্তুতের ব্যবহার আরোপিত হয়।

## আক্ষেপ

(১) উক্ত এবং (২) বক্ষ্যমাণ বিষয়ে বিশেষ এক উদ্দেশ্যসাধনের ইচ্ছা লইয়া নিষেধাভাস থাকিলে আক্ষেপ অলংকার হয়। এই অলংকারে 'নিষেধ'টা মোটেই সত্য নয়। ফলে ইহার পর্যবসানে বিধিটাই জোরালো হয়ে ওঠে। তাই আক্ষেপ অলংকারে প্রকৃতপক্ষে নিষেধের (Negation বা Suppression) দ্বারা বিধি (Affirmation) ব্যঞ্জিত হয়: যেমন,—

(ক) 'নিজগৃহপথ, তা ত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য।' —মধুসূদন।

—এখানে **উক্তবিষয়ক আক্ষেপ** অলংকার হইয়াছে। পূর্বেই গঞ্জনাবাক্য উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ইন্দ্রজিৎ 'গুরুজন তুমি পিতৃতুল্য' বিভীষণকে আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে

গঞ্জনা করিবার পর 'নাহি গঞ্জি তোমা' বলিয়া উহার উপর যে নিষেধাভাস করিলেন, তাহাতে ঐ গঞ্জনার বিধিটিই ( Affirmation) ফুটিয়া উঠিয়াছে।

( খ ) 'ক্ষুব্ধ এ হিয়া শান্ত করিয়া
একটি বেদনা জানাইতে শুধু চাই ;
ওগো ফিরে চাও ক্ষণেক দাঁড়াও—
না, না চলে যাও, পাষাণের কাছে জানাবার কিছু নাই। —শ্যামাপদ।

—এখানে **বক্ষ্যমাণবিষয়ক আক্ষেপ** অলংকার হইয়াছে। নায়কের কাছে একটি বেদনা জানাবার জন্য নায়িকা নায়কের ক্ষণেকের অবস্থানপ্রার্থিনী। কিন্তু পর মুহূর্তেই 'জানবার কিছু নাই' বলিয়া দুর্বার অভিমান ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে 'না, না চলে যাও' নির্দেশ দিয়া উহার উপর যে নিষেধাভাস নায়িকা কর্তৃক বক্ষ্যমাণ, তাহাতে ঐ সনির্বন্ধ প্রার্থনার বিধিটিই (Affirmation) ফুটিয়া উঠিয়াছে।

**স্মরণ**

কোন বস্তুর অনুভব হইতে তৎসদৃশ বা তৎসম্পর্কিত অপর বস্তুর স্মৃতি, কিংবা বিসদৃশ বস্তুর স্মরণ ঘটিলে স্মরণ অলংকার হয়। এই অলংকারে স্মরণার্থক ক্রিয়ার প্রয়োগ লক্ষণীয়। সদৃশ বস্তুর স্মরণে আলোচ্য অলংকারটি উপমার গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া **স্মরণোপমা** নামে অভিহিত হয় ; কিন্তু **তৎ-সম্পর্কিত বস্তু বা বিসদৃশ বস্তুর স্মরণে নিছক স্মরণালংকারই হয় ঃ** যেমন,—

( ক ) 'সাধ্বী তিনি,
তাই এত দুঃখ তাঁর। তাঁরে মনে ক'রে
মনে পড়ে পুণ্যবতী জানকীর কথা।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে সুমিত্রাকে মনে করায় জানকীর কথা দেবদত্তের মনে জাগিতেছে। তাই ইহা **স্মরণোপমার** পর্যায়ভুক্ত।

( খ ) 'মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে,
কত দিনের লুকোচুরি কত ঘরের কোণে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানেও সদৃশ বস্তুর স্মরণ সংঘটিত হওয়ায় **স্মরণোপমা** বলা হয়।

( গ ) শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা॥
লক্ষ্মীর বিলাস ঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন॥ —লোচনদাস।

—এখানে 'চিন্তিয়া'র অর্থ 'স্মরিয়া' ধরিলে দেখা যায় যে, বর্তমান দুঃখদর্শনে পূর্বসুখ স্মরণে আসিতেছে। তাই এই বিসদৃশ বস্তুর স্মরণে **স্মরণালংকার** হইয়াছে।

**স্বভাবোক্তি**

পদার্থসমূহের স্বভাববিষয়ক উক্তি অথবা বর্ণনার দ্বারা সৌন্দর্য সৃষ্টি হইলে স্বভাবোক্তি অলংকার হয়। নিসর্গ, মানুষ বা যে কোন প্রাণী-জাতি-গুণ-দ্রব্যসম্পন্ন

সৃষ্টির যে-কোন বস্তুই 'পদার্থ'। বস্তুর অ-সাধারণ ধর্ম বা আপন মহিমা, যাহার দরুণ সে অথবা তাহার সৃষ্টির ভিতরে তুলনাহীন—অর্থাৎ বস্তুর বিশিষ্ট আকৃতি, প্রকৃতি, গতি, বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ড ও সূক্ষ্ম হাব-ভাব—ইহাই হইতেছে পদার্থের 'স্বভাব' বিবরণ, যাহার দরুণ অন্তরে ছবি রস সঞ্চারিত হয়, তাহাই 'উক্তি'। এই অলংকারে বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া কবিমানস বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয় না, কবিমানসকে কেন্দ্র করিয়া বস্তুই স্বমহিমায় শোভমান হয়। দণ্ডীর মতে, ইহাই 'আদ্য অলংকার' যেমন,—

(ক) 'কপোতদম্পতী
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চু চুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে কপোত-দম্পতীর মধুর বর্ণনা রহিয়াছে।

(খ) 'দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হ'য়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে;—পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে;
মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নীচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে,
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে।' —জীবনানন্দ

—এইভাবে স্বভাবোক্তি অলংকারে লিখিত এই 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি শুধুই ‘চিত্ররূপময়’ তাহা নয়, গন্ধস্পর্শময়ও বটে।

# কয়েকটি গৌণ অলংকার

## তুল্যযোগিতা

প্রস্তুত বা অ-প্রস্তুত বস্তুসমূহকে একই ধর্ম তথা গুণ বা ক্রিয়া-দ্বারা সম্বন্ধে আব করিলে তুল্যযোগিতা অলংকার হয়। 'প্রস্তুত বস্তু' বলিতে বুঝায় বর্ণনীয় বা প্রাসঙ্গি বিষয়' এবং 'অ-প্রস্তুত বস্তু' বলিতে বুঝায় 'অ-বর্ণনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়'। যেমন,-

(ক) 'শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার
আর কালান্তক যম—শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ।' —রবীন্দ্রনাথ

—এখানে 'রবে' ক্রিয়াটির দ্বারা 'অন্ধ পিতা', 'অন্ধ পুত্র', 'কালান্তক যম', 'পিতৃস্নেহ' ও 'বিধাতার শাপ'—এই পাঁচটি প্রস্তুত বস্তু সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে।

(ক) 'আমার যত লজ্জা-আশা-ভয়
সদা কম্পমান, পরশ নাহিক সয়
এত সুকুমার।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'কম্পমান' বিশেষণটি তথা গুণের দ্বারা লজ্জা আশা ও ভয়—এই তিনটি প্রস্তুত বিষয় সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে।

### দীপক

প্রস্তুত ও অ-প্রস্তুত এই দুইটি বস্তুকে একই ধর্ম তথা গুণ বা ক্রিয়া-দ্বারা সম্বন্ধে আবদ্ধ করিলে দীপক অলংকার হয়ঃ যেমন,—

(ক) 'শক্তির আধার বটে নদী আর নারী
পিপাসাবারিণী জীবনদায়িনী।' —অমৃতলাল।

—এখানে 'পিপাসাবারিণী', 'জীবনদায়িনী'—বিশেষণদ্বয় তথা গুণদ্বয়ের দ্বারা প্রস্তুত 'নারী' ও অ-প্রস্তুত 'নদী' বিষয়দ্বয় সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে।

(খ) 'সে প্রীতি বিলাক তারা পালিত মার্জারে,
দ্বারের কুক্কুরে আর পাণ্ডবভ্রাতারে॥' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'প্রীতি বিলাক' ক্রিয়া-দ্বারা প্রস্তুত 'পাণ্ডবভ্রাতা' ও অ-প্রস্তুত 'পালিত মার্জার' ও 'দ্বারের কুক্কুর'—উভয় পক্ষই সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া **অন্য কারণেও দীপক অলংকার হইতে পারে**। একই কারকের যদি অনেক ক্রিয়া থাকে, তাহা হইলেও দীপক অলংকার হয়। বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় দীপক অলংকারের প্রভূত উদাহরণ মিলেঃ যেমন,—

'যে প্রেম ফুলের মত গোপনে ফুটিয়া ওঠে রাঙিয়া লজ্জায়
স্পর্শমাত্র ঝ'রে পড়ে যায়।' —বুদ্ধদেব।

—এখানে 'প্রেম' এই একটি কর্তৃকারকেই 'ফুটিয়া' 'রাঙিয়া' 'ঝ'রে' ও 'পড়ে'—ক্রিয়া চারিটি সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে।

**মন্তব্যঃ তুল্যযোগিতা ও দীপক**—এই দুইটি অলংকারের পার্থক্য লক্ষণীয়। ধর্মের তথা গুণ বা ক্রিয়ার বন্ধন উভয় অলংকারেই আছে, তবে তুল্যযোগিতায় হয় প্রস্তুত, নয় অ-প্রস্তুত বাঁধা পড়ে, পক্ষান্তরে প্রস্তুত ও অ-প্রস্তুত উভয়ই বাঁধা পড়ে দীপকে। 'বহুক্রিয়াসম্পর্কিত এককারক' লক্ষণটি দীপকেই আছে, তুল্যযোগিতায় নাই।

### অধিক

আধার ও আধেয় অর্থাৎ আশ্রয় ও আশ্রিত পরস্পরের অযোগ্য হইলে অধিক অলংকার হয়ঃ যেমন,—

(ক) 'এক সঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে।' —জ্ঞানদাস।

—এখানে আধার 'নয়ন' আধেয় 'রূপ'কে ধরিতে অসমর্থ—তাই অযোগ্য।

(খ) 'দেখিতে দেখিতে কবির অধরে
হাসিরাশি আর কিছুতে না ধরে।' —রবীন্দ্রনাথ।

এখানে আধার 'অধর' আধেয় 'হাসিরাশি'কে ধরিতে অসমর্থ—তাই অযোগ্য।

**অনুমান**

কারণ হইতে কার্যের জ্ঞান হইলে এবং তাহা অন্য অলংকারযোগে চমৎকার হইয়া দেখা দিলে অনুমান অলংকার হয়ঃ যেমন,—

'মনে হেন অনুমানি
হৃদয়ে তোমার উদিয়াছে প্রিয়-বদন-চন্দ্রখানি;
তাহারি কিরণে অঙ্গ তোমার পাণ্ডুতামণ্ডিত,
তন্বী, তোমার নয়নকমল সেও দেখি নিমীলিত।' —শ্যামাপদ।

—এখানে বিরহিণী তন্বীর অঙ্গের পাণ্ডুতা ও নয়নকমলের নিমীলন হইতে ইহাই অনুমান হইতেছে যে, তাহার হৃদয়ে প্রিয়জনের মুখচন্দ্র উদিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য, এখানে রূপক অলংকারের যোগ থাকায় অনুমান অলংকার হইয়াছে।

অন্য অলংকারযোগ-জনিত চমৎকারিতা দেখা না দিলে নিছক অনুমান-সর্বস্বতায় অনুমান অলংকার হয় না।

## মিশ্র অলংকার

অলংকার অমিশ্রভাবে পাওয়া গেলেও বেশি পাওয়া যায় মিশ্রভাবেই। ফলে চারুত্বও বাড়ে। এই মিশ্র অলংকার দুই জাতের—সংসৃষ্টি ও সংকর অলংকার।

**সংসৃষ্টি**

দুই বা ততোঽধিক অলংকার যদি একই রচনায় পরস্পরনিরপেক্ষ হইয়া এমনভাবে অবস্থান করে যে অনায়াসেই তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া লওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে সংসৃষ্টি অলংকার হয়। এই অলংকারে (ক) দুই বা ততোঽধিক শব্দালংকার; (খ) দুই বা ততোঽধিক অর্থালংকার অথবা (গ) দুই বা ততোঽধিক শব্দ ও অর্থালংকারের মিশ্রণ থাকেঃ যেমন,—

(ক) 'ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুড়্ দুড়্॥ —কবিকঙ্কণ।

এখানে দুইটি শব্দালংকারের মিশ্রণে সংসৃষ্টি অলংকার হইয়াছে। প্রথম চরণে 'ন' ও 'ঘ' ধ্বনির দুইবার আবৃত্তিতে 'বৃত্ত্যনুপ্রাস' ও দ্বিতীয় চরণে 'দুড়্ দুড়্' শব্দে 'ধ্বন্যুক্তি'—এই উভয় শব্দালংকারই নিরপেক্ষভাবে বিদ্যমান।

(খ) 'সেই অপদার্থ চায় কন্যারত্নে মোর
ভাষারূপে লভিবারে! এত স্পর্ধা তার!
বামন হইয়া চায় ধরিবারে চাঁদ।
ক্ষুদ্র বাহু মেলি! —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে দুইটি অর্থালংকারের মিশ্রণে সংসৃষ্টি অলংকার হইয়াছে। 'কন্যারত্নে' রূপক কন্যারত্নকে অপদার্থের ভার্যারূপে লাভ করিবার বাসনার সহিত বামনের চাঁদ ধরিবার ইচ্ছায় অসম্ভব বস্তু-সম্বন্ধ-জাত নিদর্শনা—এই উভয় অর্থালংকারই নিরপেক্ষভাবে বর্তমান।

(গ) 'মহামৌন অসীমতা নিশ্চয় সাগর,
তারি মাঝখান হ'তে উঠে এস ধীরে
তরুণী লক্ষ্মীর মত হৃদয়ের তীরে
আঁখির সম্মুখে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে দুইটি শব্দালংকার ও তিনটি অর্থালংকারের মিশ্রণে সংসৃষ্টি অলংকার হইয়াছে। 'মহামৌনে' অনুপ্রাস, 'আঁখির সম্মুখে' অনুপ্রাস, 'অসীমতা…সাগর'-এ রূপক, 'তরুণী …মত'-এ উপমা, 'হৃদয়ের তীরে' রূপক—এই পাঁচটি অলংকারই পরস্পরনিরপেক্ষ।

**সংকর**

দুই বা ততোঽধিক অলংকার যদি একই রচনায় অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থান করিয়া এমন সন্দেহ সৃষ্টি করে, যাহার ফলে কোন অলংকারেরই প্রাধান্য উপস্থাপিত হয় না, তাহা হইলে সংকর অলংকার হয়। দুধ ও জলের একত্র মিশ্রণে যেমন একটিকে আরেকটি হইতে সহজে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, তেমনি এই জাতীয় অলংকারেও কোনটিই প্রধান নয়—প্রত্যেকটির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে জোরালো যুক্তি থাকে : যেমন,—

(ক) 'পুণ্য অদ্রিপদতলে পবিত্র সুন্দর
পুষ্পপাত্র বৃন্দাবন। —নবীনচন্দ্র।

—এখানে 'পুষ্পপাত্র বৃন্দাবন' বলিতে কি 'পুষ্পপাত্ররূপ বৃন্দাবন' বুঝাইতেছে? তবে কি ইহা রূপক? আবার 'পুষ্পপাত্রের ন্যায় পবিত্র সুন্দর বৃন্দাবন' ধরিলে তো উপমা হয়। কিন্তু পুনঃ সংশয় জাগে। 'পুণ্য-অদ্রিপদতলে বৃন্দাবন যেন পবিত্রসুন্দর পুষ্পপাত্র' এই ভঙ্গী কি উৎপ্রেক্ষার নয়? এমনিভাবে একটি আধারে রূপক উপমা ও উৎপ্রেক্ষা —তিনটি অলংকারই অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রধানরূপে বিদ্যমান। অধিকন্তু বৃত্ত্যনুপ্রাসও রহিয়াছে। তাই এখানে সংকর অলংকার হইয়াছে।

(খ) 'অপলক নেত্র তার আলোকসুষমা
গণ্ডূষে সাগরসম করিল নিঃশেষ।' —মোহিতলাল।

—এখানে সাদৃশ্যবাচক শব্দসমন্বিত 'সাগরসম' স্পষ্টই উপমা বুঝাইতেছে। আবার 'গণ্ডূষ' শব্দটির প্রয়োগ থাকায় নেত্রে অগস্ত্যমুনির ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে—ফলে সমাসোক্তি অলংকার। আবার বৃত্ত্যনুপ্রাসও আছে। তাই সংকর অলংকার হইয়াছে।

## অনুশীলনী

[ এক ] নিম্নলিখিত যে-কোন দুইটি অলংকারের ব্যাখ্যা কর ও উদাহরণ দাও ঃ—শ্লেষ ; উৎপ্রেক্ষ ; স্বভাবোক্তি ; লুপ্তোপমা ; উপমা ; যমক ; রূপক ; ব্যাজস্তুতি ; ব্যতিরেক ; অতিশয়োক্তি ; অর্থান্তরন্যাস ; বিরোধাভাস ; অনুপ্রাস ; দৃষ্টান্ত ঃ নিদর্শনা ।

**ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প)** '৪৯, '৫২, '৫৪, '৫৫, '৫৬, '৫৭, '৫৮, '৫৯

[ দুই ] নিম্নলিখিত যে কোনও অলংকার-যুগ্মকের মধ্যে পারস্পরিক কতখানি সাদৃশ্য, কতখানি পার্থক্য, তাহা সংজ্ঞা-নির্দেশে ও দৃষ্টান্ত-সহযোগে বুঝাইয়া দাও ঃ—অনুপ্রাস ও যমক ; বিরোধাভাস ও বিষম ; উপমা ও প্রতিবস্তূপমা ; দৃষ্টান্ত ও অর্থান্তরন্যাস । **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প)** '৫০, '৫১, '৫৩

[ তিন ] উদাহরণসহ যে কোন তিনটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর ঃ—ছেকানুপ্রাস ; ব্যাজস্তুতি , সাঙ্গরূপক ; সমাসোক্তি ; নিদর্শনা ; অর্থান্তরন্যাস ; সন্দেহ ; উৎপ্রেক্ষা ; ব্যতিরেক ; অপহ্নুতি ; মালোপমা ; বিরোধ বা বিরোধাভাস ; স্বভাবোক্তি ; প্রতিবস্তূপমা ; দৃষ্টান্ত ; বিষয় ; প্রতীপ ; অপ্রস্তুত-প্রশংসা ; অসংগতি ; ব্যাজস্তুতি ; যমক ; শ্লেষ ; উল্লেখ ; বিভাবনা ; লুপ্তোপমা ; অতিশয়োক্তি ; রূপক ; একাবলী ; ভ্রান্তিমান্ ।

**ক. বি. বি. এ. ( বিকল্প )** '৫০, '৫১, '৫২, '৫৩, '৫৪, '৫৫, '৫৬, '৫৭, '৫৮, '৫৯

[ চার ] উদাহরণসহ যে-কোন তিনটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর ঃ—উল্লেখ ; নিদর্শনা ; বক্রোক্তি ; উৎপ্রেক্ষা ; বিশেষোক্তি ; ভ্রান্তিমান্ ; ব্যাতিরেক ; অপহ্নুতি । অর্থান্তরন্যাস ; অতিশয়োক্তি , অর্থাপত্তি ; বিরোধাভাস ; স্মরণোপমা ; অসংগতি ; দৃষ্টান্ত ; সমাসোক্তি ; লুপ্তোপমা ; সাঙ্গ রূপক ; নিশ্চয় ; বিষম ; আক্ষেপ ; ছেকানুপ্রাস ; ব্যাজস্তুতি ; অনুমান ; প্রতিবস্তূপমা ; রূপক ; শ্লেষ ।

**ক. বি. বি. এ. ( অনার্স )** '৫৩, '৫৪, '৫৫, '৫৬, '৫৭, '৫৮, '৫৯

[ পাঁচ ] সাদৃশ্যমূল অলংকারের মধ্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ও অতিশয়োক্তির উপমেয় ও উপমানের সম্পর্ক-বিচারে কিরূপ ক্রমোৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়, তাহা উপযুক্ত উদাহরণ-সহযোগে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া লিখ । **উ. বি. বি. এ. (অতিরিক্ত)** '৫৬

[ ছয় ] নিম্নলিখিত পদ্যাংশগুলির মধ্যে যে কোন একটিতে ব্যবহৃত অলংকারগুলির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর ঃ—

(·০১) স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল, নিশীথ শীতল স্নেহ ।

(·০২) খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তন্যপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে ।

(৩০৩) জিনি কুঞ্জর গতি।

(৩০৪) হাল্কা হাসি হাস্‌ছে কেবল—ভাস্‌ছে যেন আল্‌গা স্রোতে।

(৩০৫) নবীনবঙ্গ-জীবনযজ্ঞে তোমার অর্ঘ্য অগ্রধার্য।

(৩০৬) শুভ্র-ললাটে ইন্দু সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।

(৩০৭) আবৃত-করা প্রাবৃট্ এল মেলিয়া মেঘ-পক্ষ,
বিবশ ধরা বিতথ বেশ শ্বসিছে মৃদু বক্ষ।
অজানা ভয়ে অচেনা সুখে
কথাটি কারো নাহিক মুখে,
পাখীর গেছে বচন হরি আঁখির থির লক্ষ্য।

(৩০৮) কপোলে সুধাংশু ভাস,
অধরেঅরুণ হাস,
নয়ন করুণাসিন্ধু প্রভাতের তারা জ্বলে।

(৩০৯) যুগান্তরে উল্কাসম দহিছে না আজ
এ মণি-মঞ্জীর তোরে? রত্ন-ললাটিকা
এ যে তোর সৌভাগ্যের বজ্রানলশিখা।
তোরে হেরি অঙ্গে মোর ত্রাসের স্পন্দন
সঞ্চারিছে,—চিত্তে মোর উঠিছে ক্রন্দন,—
আনিছে শঙ্কিত কর্ণে তোর অলংকার
উন্মাদিনী শংকরীর তাণ্ডব ঝংকার।

(৩১০) সৌন্দর্য-পাথারে
যে বেদনা বায়ুভরে ছুটে মনোতরী
সে বাতাসে কতবার মনে শঙ্কা করি,
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল।
অভয় আশ্বাস ভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই। বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে—আছে এক মহা-উপকূল,
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

(৩১১) কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি। কভু বা উঠিয়া
পর্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে?

('১২) পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা-ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥
দশদিক শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে।
সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে॥

**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৪৯, '৫১, '৫২, '৫৩, '৫৪, '৫৫, '৫৬**

[ **উত্তর সংকেত।** ( '০১ ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। ( '০২ ) পূর্ণোপমা। ('০৩) ব্যতিরেক। ( '০৪ ) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। ( '০৫ ) নিরঙ্গ রূপক। ( '০৬ ) পূর্ণোপমা।। ( '০৭ ) রূপক ও সমাসোক্তি। ('০৮) নিদর্শনা ও নিরঙ্গ রূপক। মতান্তরে, অতিশয়োক্তি, নিদর্শনা ও রূপক ( 'করুণা-সিন্ধু'তে )। ( '০৯ ) পূর্ণোপমা, নিরঙ্গ রূপক ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। মতান্তরে, উপমা ও বিরোধ ( তিন বার )। ( '১০ ) পরম্পরিত রূপক। মতান্তরে, রূপক ও সাঙ্গ রূপক। ( '১১ ) দীপক। তদুপরি মালোৎপ্রেক্ষা, উপমা ও রূপক। ( '১২ ) লাটানুপ্রাস, লুপ্তোপমা, বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, ভ্রান্তিমান্ ও বিষম। ]

[ সাত ] সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলংকার নির্ণয় কর ঃ—

('০১) দেবতা আজি জীবন-ধারা বরিষে মরুক্ষেত্রে।

('০২) দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়।

('০৩) বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

('০৪) হরি হরি বোলি ধরণী ধরি উঠই বোলত গদগদ ভাখ
নীল গগন হেরি তোহারি ভরম-ভরে বিহি সঞে মাগয়ে পাখ।

('০৫) হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা
সিন্ধু নিকট যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিপাসা॥

('০৬) অসীম নীরদ নয়
ওই গিরি হিমলয়।

('০৭) করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।

('০৮) ফাঁকের মধ্য দিয়ে মনোযোগটা বুনো পাখীর মত হুশ করে উড়ে পালায়

('০৯) অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

('১০) জড়তার পাষাণ দিয়ে ঘেরা
দুর্গমাঝে রেখেছিল প্রত্যহের প্রথার দৈত্যেরা।

('১১) সুদূর গোঠের শ্যামবার্তা কি
স্মরিছে রে বার্তাকু!
কচি বুক হাটে সুলভ করিতে
কলে কালা দিল চাকু!

(°১২) সভাকবি—ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ অর্থের বড়ো টানাটানি।

নটরাজ—নইলে রাজদ্বারে আসবো কোন দুঃখে।

(°১৩) লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষনি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥

(°১৪) প্রীতি-মন্ত্রবলে
শান্ত করে বন্দী কর নিন্দা-সর্পদলে

(°১৫) এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে ;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।

(°১৬) নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে একজামিনের পড়ায়
মনটা কিন্তু কোথা থেকে কোন্ দিকে যে গড়ায়
অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব সামনে আছে খোলা
কর্তৃজনের ভয়ে কাব্য কুলুঙ্গিতে তোলা।

(°১৭) হাতের দান হাতে হাতেই চুকিয়া দাও, নইলে শুকিয়ে যাবে ; হৃদয়ের দান যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়বে।

(°১৮) কাচ পড়ে থাকে যেখানে সেখানে,
ফিরেও দেখে না কেহ ;
হীরকখণ্ড লভিতে সবার
কতই না আগ্রহ।

(°১৯) অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে।

(°২০) বৃথাই হোল জন্ম রে তোর
সব হোল তোর মিছে,
সারা জীবন ছুটলি শুধুই
মরীচিকার পিছে।

(°২১) মেঘ ওতো নয়, মুক্তকেশীর
এলিয়ে পড়া চুলের রাশি।
বিদ্যুৎ কোথা? চেয়ে দেখ ও যে
পাগলী মেয়ের অট্টহাসি।

(°২২) মেঘের মলিন বসনেতে মুখ
ঢেকেছে চন্দ্র তারা।
শ্রাবণ গগন সারারাত ধরে
কেঁদে কেঁদে হল সারা।

(২৩) কিবা সে বদনশোভা, যাই বলিহারী ;
মুগ্ধ আলি ধেয়ে আসে পদ্ম মনে করি ।

(২৪) ঝরণার ধারা নয় ওতো নয়,
চেয়ে দেখ ভাল করে
কার মণিহার ছিঁড়ে গেছে, তাই
মণিরাশি ঝরে পড়ে ।

(২৫) কলোলিনী কলস্বরে করে কুল কুল ;
কি ছার বংশীর ধ্বনি নহে তার তুল ।

(২৬) সেই অপদার্থ ক্লীব হবে সেনাপতি ?
শ্রেষ্ঠ যত বীর রণে হইবে চালিত
তাহার ইঙ্গিতে ? শশক হইবে নেতা
মৃগেন্দ্রকুলের ?

(২৭) হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসব রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ততনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ ।

(২৮) নয় নয় ওতো আষাঢ়-গগনে
জলদের গরজন ;
দুনিয়ার যত চাপা ক্রন্দন
গুমরি উঠিছে শোন্ ।

(২৯) সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগবধূর,
উড়িয়া পড়িছে গায়ে ।

(৩০) যৌবন বসন্তসম সুখময় বটে,
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে ।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন
ফিরে না ফিরে না আর ফিরে না যৌবন ।

(৩১) বনে জঙ্গলে মৃগ আছে কত ?
কস্তুরী-মৃগ কয়টা মেলে ?
মানুষ ত কত দেখিলে জীবনে,
রসিক মানুষ কয়টা পেলে ?

(৩২) হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে । ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্র-মেখলা-পরা তব কটিদেশ ।

(·৩৩) সঘন মেঘে বরষা আসে, বরষে ঝরঝর,
কাননে ফুটে নবমালতী কদম্বকেশর।
স্বচ্ছহাসি শরৎ আসে পূর্ণিমা মালিকা,
সকল বন আকুল করে শুভ্র শেফালিকা।

(·৩৪) হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল॥
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ।
ভৈরবের ভীম নাদে কাঁপে ত্রিভুবন॥

(·৩৫) অগ্নি-আঁখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম,
চেন' কি তাদের ভাই?
দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
দুয়েরি বল্গা নাই?

(·৩৬) ছাড় আই ছলা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল॥
বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥

(·৩৭) হায়, সখি, জানতাম যদি
ফুলরাশিমাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল-সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে?

(·৩৮) তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্র কান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ॥

(·৩৯) শোকের ঝড় বহিল সভাতে,
শোভিল চৌদিকে পুরসুন্দরীর রূপে
বামকুল,; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিশ্বাস প্রবল বায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব।

(·৪০) শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।

(·৪১) একটি মেয়ে চলে গেছে জগৎ হ'তে নৈরাশে;
একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজ-সাপের নিশ্বাসে।

**ক. বি. বি. এ. (পাশ) '৫০, '৫১, '৫২, '৫৩, '৫৪, '৫৫, '৫৬, '৫৭, '৫৮, '৫৯**

[**উত্তর-সংকেত**। (·০১) রূপক। মতান্তরে, বিরোধাভাস। (·০২) রূপক। (·০৩) লুপ্তোপমা। মতান্তরে, তুল্যযোগিতা। (·০৪) ভ্রান্তিমান্। (·০৪) প্রকৃতির

বিপর্যাসদ্যোতক অতিশয়োক্তি বা বিশেষোক্তি। মতান্তরে, বিরোধাভাস। ('০৬) নিশ্চয়। ('০৭) বিরোধাভাস। ('০৮) পূর্ণোপমা। ('০৯) বিষম এবং অতিশয়োক্তি। মতান্তরে, বিরোধাভাস। ('১০) পরম্পরিত রূপক। ('১১) শ্রুত্যনুপ্রাস ('সু' 'শ্যা' ও 'স্ব'-তে), যমক ('বার্তা' ও 'বার্তাকু'র 'বার্তা'), ছেকানুপ্রাস, স্মরণোপমা, অতিশয়োক্তি ও সমাসোক্তি। ('১২) শ্লেষ-বক্রোক্তি। ('১৩) অতিশয়োক্তি। মতান্তরে, বিরোধাভাস। ('১৪) পরম্পরিত রূপক ও অনুপ্রাস। ('১৫) ধ্বন্যুক্তি, অনুপ্রাস এবং নিশ্চয়। ('১৬) বিরোধাভাস। ('১৭) ব্যতিরেক। ('১৮) অপ্রস্তুত-প্রশংসা। মতান্তরে, অতিশয়োক্তি। ('১৯) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। ('২০) অতিশয়োক্তি। মতান্তরে, কাব্যলিঙ্গ। ('২১) অপহ্নুতি। ('২২) সমাসোক্তি এবং রূপক। মতান্তরে, যমকও আছে। ('২৩) ভ্রান্তিমান্। ('২৪) অপহ্নুতি। ('২৫) ব্যতিরেক অথবা প্রতীপ। মতান্তরে, অনুপ্রাসও আছে। ('২৬) কাকু-বক্রোক্তি এবং দৃষ্টান্ত। ('২৭) অনুপ্রাস, সমাসোক্তি ও রূপক। এই অলংকারগুলির মধ্যে অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহকের ভাব ফুটিয়া ওঠায় সংকর অলংকার হইয়াছে। ('২৮) অপহ্নুতি। ('২৯) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। ('৩০) ব্যতিরেক। ('৩১) কাকু-বক্রোক্তি ও দৃষ্টান্ত। ('৩২) সমাসোক্তি এবং রূপক। মতান্তরে, পরম্পরিত রূপক। ('৩৩) ছেকানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস ও স্বভাবোক্তি। ('৩৪) ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস ও উদাত্ত। **অ-লোকসামান্য মহিমার বর্ণনা থাকিলে উদাত্ত অর্থালংকার হয়।** ('৩৫) শ্রুত্যনুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, উদাত্ত ও রূপক। ('৩৬) বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস ও নিদর্শনা। ('৩৭) বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, দীপক ও কাকু-বক্রোক্তি। ('৩৮) বৃত্ত্যনু-প্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, দীপক ও বিরোধাভাস। ('৩৯) সাঙ্গ রূপক। ('৪০) প্রতীয়-মানোৎপ্রেক্ষা। ('৪১) প্রতিবস্তূপমা। ]

[ আট ] সংজ্ঞানির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলংকার লিখ ঃ—

('০১) তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপ্‌টিছে ডানা,
মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা—মেলিতেছে অঙ্কুরের
পাখা লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

('০২) জোড়ি ভুজযুগ মোড়ি বেঢ়ল
বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
জৈসে শারদচন্দ ॥

('০৩) উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে ॥

(·০৪) আবৃত-করা প্রাবৃট্ এল মেলিয়া মেঘ পক্ষ
বিবশা ধরা বিতথ বেশ শ্বসিছে মুহু বক্ষ।
অজানা ভয়ে অচেনা সুখে
কথাটি কারো নাহিক মুখে,
পাখীর গেছে বচন হরি আঁখির থির লক্ষ্য।

(·০৫) ঘুমাও বন্ধু, ঘুমাও বন্ধু, সবই বন্ধনলীলা
চরকা ঘোরে ত ঘোরে নাকো টাকু রসি যদি হয় ঢিলা।

(·০৬) নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়ামৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন।

(·০৭) তার চেয়ে এস প্রভাত-আলোকে চেয়ে থাকি দূরে দূরে—
বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জরির ডুরে।

(·০৮) কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে ?

(·০৯) এ নিদাঘ যেন প্রেমাভিনয়ের বিরহ অঙ্কখানি ;
দুর্বাসা যেন অভিশাপ হানি দেয় ব্যবধান আনি।

(·১০) কপালে সিন্দুরবিন্দু নব অরবিন্দ বন্ধু
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
করিয়া তিমির মেলা ধরিয়া কুন্তল ছলা
বন্দী সে করিলা রবি-ইন্দু॥

(·১১) শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই,
আয় আয় কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।

(·১২) অহংকারের তন্ত্রী পীড়িয়া বাজায় যে ওংকার—,
ভাবের গঙ্গা শিরে যে ধরেছে ভাবনা র জটাভার।

(·১৩) চাঁদ নিবে যাক্ নিবুক জোছনা
তাতে কিবা আসে যায় !
হৃদয়-গগনে তুমি জেগে আছ
অম্লান মহিমায়।

(·১৪) সকলি ফুরায়ে যায় মায়াময় ভবে।
তোমার যৌবন শুধু স্থির হয়ে রবে
এক ঠাঁই চিরদিন ?

(·১৫) একি হেরিলাম আমি ?
গগনের শশী সহসা এল কি
ধরণীর বুকে নামি ?

(·১৬) যৌবন বসন্তসম শোভা সুখময় ;
কিন্তু হায় উভয়ের গতি এক নয়।
বসন্ত সে ফিরে ফিরে আসে বারবার
যৌবন চলিয়া গেলে ফেরে নাকো আর।

(১৭) সেই অপদার্থ চায় কন্যারত্নে মোর
ভার্যারূপে লভিবারে !—এত স্পর্ধা তার
বামন হইয়া চায় ধরিবারে চাঁদে
ক্ষুদ্র বাহু মেলি !

(১৮) পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোঁয়ালে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে
রতন হইল কত জনা॥

(১৯) সরসীর স্বচ্ছ জলে পড়িয়াছে ছায়া
চন্দ্রমার ; যেন শশী হেরিতেছে মুখ
জলের মুকুরে।

(২০) কণ্টকসম বুকে ফোটে সখি
কোমল কুসুমমালা ;
গগনের শশী অনল বরষি
বাড়ায় শুধু জ্বালা।

(২১) সংসার-সাগর-বক্ষে কামনার ঢেউ
উঠিতেছে ; নিরন্তর তাহারি আঘাতে
মানবের চিত্ত-তরী দুলিতেছে হায়
অবিরত।

(২২) মেঘ আপনারে নিঃস্ব করিয়া
ধরণীতে ঢালে জল।
সাধু আপনার সব দিয়া
করে জগতের মঙ্গল।

(২৩) তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, "যেতে নাহি দিব"।

(২৪) অভ্রভেদী চূড়া তুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে
গিরিবর ; অচঞ্চল, স্থির, সুগম্ভীর।
যেন কোন যোগীশ্বর রুধিয়া নিঃশ্বাস
নিমগ্ন গভীর ধ্যানে।

(২৫) বন্ধন চাহে না কেহ মুক্তি চায় সবে।
ভুজবন্ধনের মাঝে কিন্তু ভব হায়
কে না চায় ধরা দিতে ?

(২৬) পাণ্ডবের সখা তুমি, গোপিকা-মোহন,
যশোদা-নয়নমণি, দুর্জনের সাক্ষাৎ শমন।

(২৭) চাঁদের ছায়াটি আসি পড়িয়াছে সরসীর বুকে ;
যেন কোন্ দেববালা পরম কৌতুকে
দেখিতেছে নিজ-মুখ জলের মুকুরে
চুপি চুপি।

(·২৮) মুদ্রিত আলোর কমল কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে।
উতরিবে যবে নবপ্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

(·২৯) নিকুঞ্জের বর্ণচ্ছটা একদিন বিচ্ছেদবেলায়
ভেসে যাবে বৎসরান্তে রক্ত সন্ধ্যা স্বপ্নের ভেলায়
বনের মঞ্জীরধ্বনি অবসন্ন হবে নিরালায়
শ্রান্তিক্লান্তিভরে॥

(·৩০) সুকৃষক যেই হয়, পরিপক্ব শস্যচয়,
সে করে ছেদন সুসময়।
তুই কাল নিদারুণ, নাহি জ্ঞান গুণাগুণ,
কাটিস তরুণ শস্যচয়॥

(·৩১) স্থির দীপশিখা যেন তেন নাসা সাজে
ওষ্ঠাধর পক্ব বিম্বফল সম রাজে॥
দন্তাবলী কুন্দকলি করিছে প্রকাশ।
ঈষদ প্রফুল্ল পদ্ম জিনি সুধা হাস॥

(·৩২) ধবল ধবলগিরি উচ্চ অতিশয়
করিতেছে সুধাপান চন্দ্রমা-আলয়,
উজ্জ্বল কাঞ্চনশৃঙ্গ শৃঙ্গ উচ্চতর,
পরশন করিয়াছে শুক্র গ্রহবর।

(·৩৩) অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি।
রেখো না বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী
হে জননী, আপনার স্নেহকারাগারে
সন্তানের চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে

(·৩৪) এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে দান।

(·৩৫) গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে। এ সংসারে যেথা যাও, সেথা থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম।

(·৩৬) এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে।

**ক. বি. বি. এ. ( অনার্স ) '৫০, '৫১, '৫২, '৫৩, '৫৪, '৫৫, '৫৬, '৫৭, '৫৮, '৫৯**

[ **উত্তর সংকেত**। (·০১) রূপক (মাটির আকাশ); সমাসোক্তি (তৃণদল...... ডানা); সাঙ্গ রূপক (মেলিতেছে···বলাকা)। (·০২) উপমা। মতান্তরে, বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। (·০৩) বিষম। (·০৪) রূপক এবং সমাসোক্তি। (·০৫) বিশেষোক্তি। (·০৬) সাঙ্গ রূপক। মতান্তরে, রূপক দুই বার। (·০৭) ছেকানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, সমাসোক্তি ও ব্যতিরেক ('তার চেয়ে' কথাটিতে ব্যঞ্জিত)। (·০৮) কাব্যলিঙ্গ। (·০৯) মালা-বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। (·১০) অনুপ্রাস এবং অপহ্নুতি। মতান্তরে,

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। ( '১১ ) সমাসোক্তি। ( '১২ ) নিরঙ্গ এবং পরম্পরিত রূপক। মতান্তরে, রূপক তিন বার। ( '১৩ ) নিরঙ্গ রূপক, নিশ্চয় অথবা প্রতীপ। মতান্তরে, রূপক ও ব্যতিরেক। ('১৪) কাকু-বক্রোক্তি এবং অর্থান্তরে-ন্যাস। মতান্তরে, পর্যায়োক্তি। ( '১৫ ) সন্দেহ। মতান্তরে, বিষমগর্ভ সংশয়। ( '১৬ ) ব্যতিরেক। ( '১৭ ) দৃষ্টান্ত। মতান্তরে, প্রতিবস্তুপমা। ( '১৮ ) ব্যতিরেক। ( '১৯ ) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। ( '২০ ) বিষম। মতান্তরে, উপমা ও বিরোধ। ( '২১ ) সাঙ্গ রূপক। ( '২২ ) প্রতিবস্তুপমা। ( '২৩ ) সমাসোক্তি। ( '২৪ ) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। ( '২৫ ) কাকু-বক্রোক্তি ও বিরুদ্ধ-বস্তুর একত্র সমাবেশজনিত বিষম। মতান্তরে বিষম ও প্রশ্ন। ( '২৬ ) উল্লেখ। ( '২৭ ) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। ( '২৮ ) বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, ও সাঙ্গ রূপক। ( '২৯ ) বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, নিরঙ্গ রূপক ও সমাসোক্তি। ( '৩০ ) বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস ও ব্যতিরেক। ( '৩১ ) বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, পূর্ণোপমা, নিদর্শনা, ব্যতিরেক ও লুপ্তোপমা। ( '৩২ ) যমক, শ্রুত্যনুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস ও উদাত্ত। ( '৩৩ ) বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, সমাসোক্তি ও সাঙ্গ রূপক। ( '৩৪ ) বিরোধাভাস। ( '৩৫ ) কাব্যলিঙ্গ। ( '৩৬ ) অধিক। ]

[ নয় ] অলংকারগুলির পার্থক্য বুঝাইয়া দাও ঃ—( ক ) শ্লেষ-বক্রোক্তি ও শ্লেষ ; ( খ ) শ্লেষ-বক্রোক্তি ও কাকু-বক্রোক্তি ; (গ) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়-মানোৎপ্রেক্ষা ; (ঘ) সমস্তবস্তুবিষয়ক সাঙ্গ রূপক ও একদেশবিবর্তী সাঙ্গ রূপক ; (ঙ) অপহ্নুতি ও নিশ্চয় ; (চ) সন্দেহ ও উৎপ্রেক্ষা ; (ছ) প্রতিবস্তুপমা, দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনা ; (জ) অতিশয়োক্তি ও রূপক ; (ঝ) অতিশয়োক্তি ও অপহ্নুতি ; (ঞ) ব্যতিরেক ও অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক ; (ট) রূপকাতিশয়োক্তি ও অতিশয়োক্তি . (ঠ) ব্যতিরেক ও প্রতীপ ; (ড) বিরোধাভাস ও বিরোধোক্তি ; (ঢ) সমাসোক্তি ও অপ্রস্তুত-প্রশংসা ; (ণ) সার ও আরোহ ঃ (ত) তুল্যযোগিতা ও দীপক ; (থ) সংসৃষ্টি ও সংকর।

[ দশ ] অলংকারগুলির সংজ্ঞাসমেত উদাহরণ দাও ঃ—মালানুপ্রাস ; মালোপমা ; মালারূপক ; মালা-উৎপ্রেক্ষা ; মালাদৃষ্টান্ত ; মালাব্যতিরেক ; মালা-অর্থান্তর-ন্যাস।

এগারো ] অলংকারগুলির বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচয় দাও ঃ—অনুপ্রাস ; যমক ; শ্লেষ ; বক্রোক্তি ; উপমা ; উৎপ্রেক্ষা ; রূপক ; অপহ্নুতি ; উল্লেখ ; অতিশয়োক্তি ; প্রতীপ ; বিরোধাভাস ; বিষম ; অর্থান্তর-ন্যাস ; ব্যাজস্তুতি ; অপ্রস্তুত-প্রশংসা।

[ বারো ] উপমেয় 'মুখ' এবং উপমান 'চাঁদ'কে অবলম্বন করিয়া রূপক' ব্যতিরেক, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, সন্দেহ ও উৎপেক্ষা অলংকারবোধক দৃষ্টান্তাদি রচনা কর। [ **উত্তর**। (ক) রূপক—'মুখ-চাঁদ' ; (খ) ব্যতিরেক—'চাঁদ জিনি মুখ'। (গ) অপহ্নুতি—'মুখ নহে, চাঁদ ; (ঘ) নিশ্চয়—'মুখই, চাঁদ নহে' ; (ঙ) সন্দেহ—'মুখ? না চাঁদ ?' (চ) উৎপ্রেক্ষা—'মুখ যেন চাঁদ। ]

# অষ্টম পর্ব

## ছন্দ-প্রকরণ

যখন মানবহৃদয় জগৎ ও জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া ভাবাবেগে স্পন্দিত হইয়া ছন্দিত বাণী রচনা করে, তখনই হয় **কবিতার** সৃষ্টি। পরিমিত পদবিন্যাস, যাহা বাক্য-পরম্পরায় ভাষাগত ধ্বনিপ্রবাহের সুসমঞ্জস ও তরঙ্গায়িত ভঙ্গী রচনা করে, তাহাকেই বলা হয় **ছন্দ ( Metre )**। এই ধ্বনিগত সংগীতমধুর ও তরঙ্গঝংকৃত ভঙ্গীই **ছন্দোস্পন্দ ( Rhythm )** নামে অভিহিত। 'ছন্দ' ও 'ছন্দোস্পন্দ' এক নয়—ভিন্ন। ছন্দোস্পন্দ বাক্য-পরম্পরায় পরিমিত পদবিন্যাসের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে ছন্দের সৃষ্টি হয়। গদ্য রচনাতেও অনেক সময় ছন্দ প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহা আকস্মিক। পদ্যের ছন্দ আকস্মিক নয়—রচনার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সবটাই ছন্দোময়।

কবিতামাত্রেরই ছন্দসৌন্দর্য পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার **চরণকে** কেন্দ্র করিয়াই একটি পূর্ণ ধ্বনিপ্রবাহ সঞ্জাত হয়—এই ধ্বনিপ্রবাহকে তরঙ্গায়িত করিবার মূলে থাকে কতিপয় **পর্ব** আর এই পর্বগুলিকে একটি সামঞ্জস্যের মধ্যে বাঁধিয়া রাখে নির্দিষ্ট পরিমাণের **মাত্রা**। মোট কথা, পরিমিত মাত্রার পর্বযুক্ত চরণকে কেন্দ্র করিয়াই বাংলা ছন্দের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পদ্যের ন্যায় গদ্যেও নানা প্রকারের পর্ব থাকে। কিন্তু পদ্যে বিভিন্ন পর্বের মধ্যে যেমন মাত্রাগত সমতা থাকে, গদ্যে তাহা থাকে না। পদ্যের পর্ববিভাগ নির্ভর করে তাহার **রূপকল্প** বা **আদর্শের (Pattern)** উপর; আর গদ্যের পর্ববিভাগ নির্ভর করে বাক্যাংশের ভাবের উপর। বিভিন্ন 'রূপকল্প' অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ছন্দের সৃষ্টি হয়। পদ্যে ছন্দের এক একটি 'রূপকল্পে'র পুনরাবৃত্তিতে বাক্যসমূহের মধ্যে একপ্রকার ছন্দোগত ঐক্য উদ্ভূত হয়। এই ঐক্যানুভূতির সাহায্যে ছন্দবোধ জন্মে। ছন্দে স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতি বজায় রাখা প্রয়োজন। উচ্চারণের পার্থক্য-অনুসারে এবং ধ্বনিপ্রকৃতির জন্য বিভিন্ন ভাষায় ছন্দের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

## ছন্দগঠনের বিভিন্ন অংশ

### অক্ষর ( Syllable )

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রচেষ্টায় উচ্চারিত ধ্বনিকে **অক্ষর** বলে। অর্থাৎ—উচ্চারণ-সাধ্য হ্রস্বতম ধ্বনি'ই 'অক্ষর'। অক্ষর দুই প্রকার :—**স্বরান্ত** এবং **ব্যঞ্জনান্ত** বা **হলন্ত**। স্বরান্ত অক্ষর 'বিবৃত' ( open syllable ) যেমন,—'না, কে, ল' ইত্যাদি। ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর 'সংবৃত' ( closed syllable ) : যেমন,—'হাত্, বল্, নীচ্, ইত্যাদি।

**অনুপ্রাসের** উপর নির্ভর করিয়া অক্ষরকে আরো দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

যেমন,—**মিত্রাক্ষর** ও **অমিত্রাক্ষর**। **মিত্রাক্ষর**—সমধ্বনিময় অক্ষরসমূহকে **মিত্রাক্ষর** বলে। এই জাতীয় মিত্রতা বা মিল সৃষ্টি করিতে হইলে—( ক ) শব্দের শেষে হলন্ত ( হসন্ত ) অক্ষর থাকিলে শেষের ব্যঞ্জন ও ঠিক তাহার পূর্ববর্তী স্বরটি একজাতীয় হইবে ; ( খ ) শব্দের শেষে স্বরান্ত অক্ষর থাকিলে শেষের ব্যঞ্জন ও তাহার ঠিক পূর্ববর্তী স্বর এবং শব্দের সর্বশেষ স্বর একজাতীয় হইবে ঃ যেমন,—( হলন্ত অক্ষরের মিত্রতা ) 'ধন ও জন' ; 'বসন ও ভূষণ' ইত্যাদি ঃ ( স্বরান্ত অক্ষরের মিত্রতা ) 'রাকা ও ঢাকা' ; 'বালা ও কালা' ইত্যাদি। এই জাতীয় মিত্রাক্ষর অনুপ্রাস-সৃষ্টির জন্য পদ্যে চরণের শেষে বা চরণের মধ্যস্থ পর্ব বা পর্বাঙ্গের শেষেও ব্যবহৃত হয়। মিত্রাক্ষর সৃষ্টির নিয়ম এবং অনুপ্রাস গঠনের নিয়ম কিন্তু একই। পদ্য-রচনায় প্রতি দুই চরণে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে, প্রথম ও তৃতীয় চরণে সাধারণতঃ অনুপ্রাস বা মিত্রাক্ষর থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের মিলকে **মধ্যসম**, প্রথম ও তৃতীয় চরণের আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের মিলকে **পর্যায়সম অনুপ্রাস** বা **মিত্রাক্ষর** বলে। **অমিত্রাক্ষর**—পদ্য-রচনায় বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে পূর্বোক্ত মিত্রতা বজায় না থাকিলেই **অমিত্রাক্ষর** হয়।

যে-ছন্দে মিত্রাক্ষরের ব্যবহার থাকে, তাহাই **মিত্রাক্ষর ছন্দ**। তেমনি অমিত্রাক্ষরও একটি ছন্দের নাম। পয়ার বা মহাপয়ারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত চরণান্তিক অনুপ্রাসহীন পদ্যের ছন্দকে **অমিত্রাক্ষর ছন্দ** বলে।

**মাত্রা ( Mora বা Instant )**

অক্ষর উচ্চারণের সময়কে ( Duration ) **মাত্রা** বলে। হ্রস্ব-স্বরান্ত অক্ষর উচ্চারণের প্রয়োজনীয় সময়কে **এক মাত্রা** ধরা হয় ঃ যেমন,—মনে পড়ে ( ১+১ ১+১ )। ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর ( ঐ, ঔ ) উচ্চারণের সময়কে **দুই মাত্রা** ধরা হয়। কিন্তু পদ্যরচনায় ব্যঞ্জনান্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরকে প্রয়োজন বোধে এক মাত্রারও ধরা হয়। শব্দের শেষ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর দুই মাত্রার এবং শব্দের মধ্যবর্তী অন্য সব ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে এক মাত্রার বলিয়া ধরা হয় ঃ যেমন,—দীপ্+তি ( ১+১ ); কিন্তু অঞ্জন—অন্+জন্ ( ১+২ )। যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী অক্ষর সাধারণত দ্বিমাত্রিক। যেমন,—**বন্ধ, তপ্ত, নন্দ** প্রভৃতি শব্দের 'ব', 'ত', 'ন' অক্ষরগুলি দুই মাত্রার। অবশ্য ইহাও ধরাবাঁধা নিয়ম নয়। কারণ,—তানপ্রধান বা পয়ার জাতীয় ছন্দে এই অক্ষরগুলি একমাত্রিক। প্রসঙ্গতঃ, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্বাসাঘাতপ্রধান বা স্বরবৃত্ত ছন্দে শব্দশেষের হলন্ত অক্ষর, যাহা সাধারণতঃ দ্বিমাত্রিক, তাহা একমাত্রিকও হইতে পারে।

উচ্চারণকালে সংস্কৃত, গ্রীক, আরবী, ফারসী, ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষায় অক্ষরের মাত্রা সম্পর্কে পূর্বনির্দিষ্ট কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। **বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বা ঢঙের উপরে নির্ভর করিয়াই অক্ষরের মাত্রা স্থিরীকৃত হয়।** ছন্দের প্রকৃতি-ভেদে মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরের ( অ, আ, ই, উ ইত্যাদির ) এক মাত্রা দুই মাত্রার আবার যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরের ( ঐ, ঔ ইত্যাদির ) দুই মাত্রা এক মাত্রায় পরিণত হইতে পারে: যেমন,—'**আ**সিল যত। **বী**রবৃন্দ। **আ**সন তব। **ঘে**রি'—এই চরণটিতে 'আ', 'বী', 'আ' ও 'ঘে'—এই চারিটি মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরের প্রত্যেকটিই **দ্বিমাত্রিক**। আবার 'ফেরে দুরে, মত্ত সবে। উৎসব **কৌ**তুকে'—এই চরণটিতে 'কৌ'—এই যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরটি **একমাত্রিক**। ছন্দের প্রকৃতি-ভেদে দীর্ঘ অক্ষরের এই যে হ্রস্ব অক্ষরে এবং হ্রস্ব অক্ষরের এই যে দীর্ঘ অক্ষরে পরিণতির ব্যাপারটি, ইহাই যথাক্রমে **হ্রস্বীকরণ** ও **দীর্ঘীকরণ** নামে পরিচিত। অবশ্য হ্রস্বীকরণ সম্পর্কে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন পর্বে পর পর তিনটি হলন্ত অক্ষর থাকিলে, উহাদের মধ্যে দুইটিকে একমাত্রিক তথা হ্রস্ব ধরিয়া, বাকিটিকে দ্বিমাত্রিক তথা দীর্ঘ বলিয়া ধরিতেই হইবে। যেমন, 'চঞ্চল মন=চন্+চল্+মন্'—ইহাতে আছে ১+১+২ মাত্রা।

**শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত, প্রস্বর** বা **বল** ( **Accent** বা **Stress** )

শব্দের উচ্চারণে অনেক সময় কোন কোন অক্ষরে একটু বেশি ঝোঁক পড়ে। এই ঝোঁককেই **শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত, প্রস্বর** বা **বল** বলে। বাংলা শব্দ উচ্চারণে সাধারণতঃ প্রথম অক্ষরেই ঝোঁক পড়ে; কিন্তু বাক্য বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত হইলে, পর্বের প্রথম অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত পড়ে। বলা বাহুল্য, সজোরে উচ্চারণ করিতে গেলে সেই শ্বাসাহত স্বরের গাম্ভীর্য পর্বের অপরাপর অক্ষরের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করিবেই। হলন্ত অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়িলে তাহার মাত্রাসংখ্যা এক হয়, শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে পর্বের হলন্ত অক্ষরে ঝোঁক পড়িলে ঐ পর্বস্থ সকল অক্ষরই এক মাত্রার হইয়া যায়। শ্বাসাঘাতের দৃষ্টান্ত :—

'রাত পোহাল। ফরসা হল<br>ফুটল কত ফুল',

**ছেদ ( Sense-Pause ) ও যতি ( Metrical Pause )**

'ধ্বনিগত সমগ্র অংশ বা অর্থাংশ প্রকাশের প্রয়োজনে ধ্বনিপ্রবাহে যে উচ্চারণ-বিরতি আবশ্যক হয়, তাহার নাম **অর্থ-যতি**—ইহার প্রচলিত নাম **ছেদ**।' অর্থাৎ নিশ্বাস গ্রহণের সুবিধার জন্য **অর্থবোধের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া** বিভিন্ন বাক্যাংশের

শেষে যে বিরাম ব্যবহার করা হয়, তাহাকে **ছেদ** বা **অর্থ-যতি** বা **ভাব-যতি** বলে। **ছেদের** সঙ্গে বাক্যের অন্তর্গত ভাবের সম্পর্ক থাকে। বাক্যের শেষে **পূর্ণচ্ছেদ** এবং বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন বাক্যাংশের পরে **উপচ্ছেদ** ব্যবহার করা হয় : যেমন,—

ছিঁড়িয়াছি ফুলমালা, জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দনে চর্চিত দেহে ভস্মের লেপন।'

কবিতায় অনেক সময় ছেদ এবং যতি একই সঙ্গে পড়ে : যেমন,—

'গগনে গরজে মেঘ। ঘন বরষা, ॥
কূলে একা বসে আছি। নাহি ভরষা।' ॥

তবু **ছেদ** এবং **যতির পার্থক্য** লক্ষণীয়। ছন্দের বিভিন্ন আদর্শের (**Pattern**) প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পদ্যপাঠকালে নিশ্বাসের বিরামকে **যতি** বলে। যতির ব্যবহার বাক্যে **অর্থগ্রহণের উপর নির্ভর করে না**—এখানে লক্ষণীয় ছন্দের **রূপকল্পটি** (**Pattern**)। কবিতায় ধ্বনিপ্রবাহ যখন এক-একবারের ঝোঁকে (**Impulse**) কিছুটা উচ্চারিত হইবার পর জিহ্বা ক্ষণিক বিরাম গ্রহণ করে, তখনই পড়ে **যতি**। চরণের শেষে যে-যতির ব্যবহার হয়, তাহাকে **পূর্ণযতি** বলে। চরণের মধ্যস্থ পর্বের শেষে যে-যতি ব্যবহৃত হয়, তাহাকে **অর্ধযতি** বলে।

[ অর্ধযতি স্থাপনের সংকেত—( | ) এবং পূর্ণযতি স্থাপনের সংকেত—( ॥ )। দৃষ্টান্ত :

মহাভারতের কথা | অমৃত সমান ॥
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান ॥ ]

**পর্ব** ( **Bar** ) বা **পদ** ( **Foot** ) ও **পর্বাঙ্গ** ( **Beat** )

চরণস্থ অর্ধযতি-দ্বারা বিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহকে **পর্ব** বলে। কাহারও কাহারও মতে, পর্বেরই অপর নাম **পদ** ( **Cæsuric Foot** )। পর্বের ছোট ছোট বিভাগকে **পর্বাঙ্গ** বলে। পর্বাঙ্গের পরে যতির ব্যবহার হয় না। কিন্তু কবিতা পড়িবার সময় ইহা কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে অনুভূত হয়। **ইহা একান্তভাবে স্মরণীয়** যে, চার মাত্রার কমে পর্ব গঠিত হয় না এবং পর্বে দশের বেশি মাত্রা-সমাবেশ করা যায় না। দৃষ্টান্ত :

পর্ব

। । ।   । । । ।    । । ।   । । । ।    । । ।   । । । ।
ললাটে : জয়টীকা    প্রসূন : হার গলে    চলেরে : বীর চলে

পর্বাঙ্গ   পর্বাঙ্গ
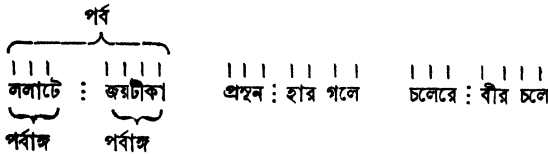
—এখানে পর্বাঙ্গদ্বয়ের একটিতে তিন মাত্রা এবং অপরটিতে চার মাত্রা থাকায় পর্বে মোট সাত মাত্রার সমাবেশ হইয়াছে। [ : ]—এই চিহ্নের সাহায্যে পর্বের বিভাগ অর্থাৎ পর্বাঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে।

**চরণ, ( Verse ), পংক্তি ( Line ) ও স্তবক ( Stanza )**

ছন্দের পূর্ণরূপে প্রকাশে যতগুলি পর্বের প্রয়োজন, ততগুলি পর্বকে লইয়া এক একটি **চরণ** গঠিত হয়। পূর্ণযতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পূর্ণ ধ্বনিপ্রবাহেরই নাম **চরণ**। চরণ কতকগুলি পর্বের সমষ্টি। সাধারণতঃ একটি চরণে দুই, তিন, চার এবং কদাচিৎ পাঁচটি পর্ব থাকে। **পংক্তি এবং চরণ এক কথা নয়।** অনেক সময় চরণকে ভাঙিয়া বিভিন্ন **পংক্তিতে** ( Line ) সাজানো হয় : যেমন,—ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দ। ত্রিপদীর চরণস্থিত তিনটি পর্বকে আলাদা করিয়া দুইটি পংক্তিতে সাজানো যায়। এইরূপ চৌপদীর চরণস্থ চারিটি পর্বকেও আলাদা করিয়া দুইটি পংক্তিতে সাজানো যায়। সাধারণতঃ চরণ-মধ্যবর্তী অনুপ্রাসের অবস্থান বুঝাইবার নিমিত্তই চরণকে ভাঙিয়া বিভিন্ন পংক্তিতে রাখা হয়। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কবিতাবিশেষের চরণগুলির দৈর্ঘ্য একই রূপ নাও হতে পারে। কারণ,—চরণের দৈর্ঘ্য নয়, পরিমিত মাত্রায় গঠিত পর্বই বাংলা ছন্দের মূল বনিয়াদ। দুই বা ততোঽধিক চরণ সুশৃঙ্খল ভাবে পর পর সন্নিবেশিত হইলে একটি **স্তবক** বা **চরণগুচ্ছ** গঠিত হয়। কবির ইচ্ছানুসারে দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় প্রভৃতি যে কোন সংখ্যক চরণ লইয়া **স্তবক** গঠন করা চলে। স্তবকের অন্তর্গত চরণগুলি নির্দিষ্ট হয় চরণশেষের অনুপ্রাস বা মিলনের সাহায্যে।

## বাংলা ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ

মনে হইতে পারে যে, বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার যখন একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, তখন সংস্কৃত ছন্দের ন্যায় বাংলা ছন্দের প্রকার-ভেদ বা শ্রেণী দুইটি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, কোন কোন বিষয়ে সংস্কৃত ছন্দের সহিত বাংলা ছন্দের মিল থাকিলেও উভয় ছন্দেরই প্রকৃতি প্রকৃতই পৃথক্। বলা বাহুল্য, উভয় ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতি ও উচ্চারণ-রীতির পার্থক্যই এই গরমিলের কারণ।

**সংস্কৃত ছন্দের দুইটি বিভাগ** বা **শ্রেণী** : যথা, —'বৃত্ত' ও 'জাতি'। অক্ষর সংখ্যার দ্বারা **বৃত্তচ্ছন্দ** আর মাত্রাসংখ্যার দ্বারা **জাতিচ্ছন্দ** নিয়মিত হয়। বৃত্তচ্ছন্দ অক্ষরসর্বস্ব ও জাতিচ্ছন্দ মাত্রাসর্বস্ব ; বৃত্তচ্ছন্দের অপর নাম **অক্ষরবৃত্ত** বা **বর্ণবৃত্ত** আর মাত্রাচ্ছন্দের অপর নাম **মাত্রাবৃত্ত**। বৃত্তচ্ছন্দের শ্রেণীতে পড়ে তোটক, স্রগ্বিণী তূণক, রুচিরা, মালিনী, পঞ্চচামর, মন্দাক্রান্তা, ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি আর জাতিচ্ছন্দের শ্রেণীতে পড়ে পজ্ঝটিকা, আর্যা প্রভৃতি।

কিন্তু **বাংলা ছন্দের তিনটি বিভাগ বা শ্রেণী** : যথা,—তান প্রধান, ধ্বনিপ্রধান ও শ্বাসঘাতপ্রধান। **তানপ্রধান ছন্দের অপর নাম অক্ষরবৃত্ত, অক্ষর-মাত্রিক, সংকোচনপ্রধান, যৌগিক বা মিশ্র-প্রকৃতিক ছন্দ।** বাংলা কাব্য-

কবিতার এই বহুল-ব্যবহৃত পয়ার জাতীয় ছন্দকে ইংরেজি **Mixed Metre** বা **Composite Metre** বলা হয়। **ধ্বনিপ্রধান ছন্দের অপর নাম মাত্রাবৃত্ত, ধ্বনিমাত্রিক** বা **বিস্তারপ্রধান ছন্দ**। ইংরাজিতে এই ছন্দের নাম **Moric Metre**। **শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের অপর নাম স্বরবৃত্ত, স্বরমাত্রিক, বলপ্রধান** বা **স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ**। অতি-ব্যবহৃত এই বাংলা **লৌকিক ছন্দটিকে** তথা **ছড়ার ছন্দটিকে** ইংরাজিতে **Stressed Metre** বা **Syllabic Metre** বলা হয়।

## [ এক ] তানপ্রধান ছন্দ

তানপ্রধান ছন্দে তিনটি **অক্ষর (Syllable)** একমাত্রিক; তবে শব্দের শেষের ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক। এই ছন্দের চালও দ্বিমাত্রিক; অর্থাৎ তান-প্রধান ছন্দে কবিতা পাঠ করিবার সময় যে কোন দুই মাত্রার পরে থামা যায়। এই ছন্দের প্রতিটি পর্বে যতই কেন না যুক্ত ব্যঞ্জন, যৌগিক স্বর অথবা যুগ্মধ্বনি সন্নিবেশিত হোক, উহাদের স্বরধ্বনিকে সর্ব স্থানেই হ্রস্ব ধরা হয়—তাই প্রতিটি অক্ষর এক মাত্রার। অক্ষর উচ্চারণের ধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিয়া একটা **অতিরিক্ত** তান বা সুরের তরঙ্গ চরণগুলির মধ্যে খেলা করে বলিয়াই এই ছন্দের নাম **তানপ্রধান**। তাই হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের বেলাতেই শুধু নয়, যুগ্মধ্বনির ক্ষেত্রেও সংকোচন-প্রসারণ অনায়াসেই ঘটিয়া থাকে। অন্য কোন প্রকার ছন্দেই অক্ষরের এতখানি স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয় না। তানপ্রবাহেরই দরুণ লঘু-গুরু অক্ষরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধিত হয়। তান-প্রভাবে যুগ্মধ্বনি অথবা যুক্তাক্ষরের এই যে একমাত্রায় সংকোচনশীলতা, ইহাই রবীন্দ্র-নাথের মতে **'পয়ারের শোষণশক্তি'**।

অতিরিক্ত সুর অর্থাৎ তানপ্রবাহ থাকায় ও দীর্ঘ পর্ব ব্যবহৃত হওয়ায় তানপ্রধান ছন্দের গতি মন্থর অর্থাৎ এই ছন্দটি **ধীর লয়ে** চলে; আবার ধ্বনিও বেশ গম্ভীর হয় বলিয়া এই তানপ্রধান ছন্দ গম্ভীর ভাবময় উচ্চশ্রেণীর কবিতার যথোপযুক্ত বাহন। সত্য কথা বলিতে কি, এই ছন্দের পর্বমধ্যে যে-কোন মাত্রার পর ছেদকে বসানো যায় এবং অর্ধযতি অথবা পূর্ণযতির অধীনতা হইতে ছেদ অনায়াসেই মুক্ত থাকে বলিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনাকালে তানপ্রধান ছন্দই ব্যবহার করিতে হয়।

পূর্বে অক্ষরের ( বর্ণের ) সংখ্যা-অনুযায়ী মাত্রা-সমাবেশ করা হইত বলিয়া তান-প্রধান ছন্দকে **অক্ষরবৃত্ত ছন্দও** বলে। অবশ্য তখন **'Syllable'** অর্থে 'অক্ষর' শব্দটি ব্যবহৃত হইত না।

**তানপ্রধান ছন্দের কয়েকটি উদাহরণ**

**লঘু পয়ার** বা **দ্বিপদী**—পয়ারের প্রতিটি চরণ দ্বিপর্বিক। চরণের মাত্রাসংখ্যা

চোদ্দ। দুই চরণে স্তবক গঠিত হয়। চরণশেষে অন্ত্যানুপ্রাস থাকে। এই ছন্দের লয় অর্থাৎ গতি ধীর। চরণস্থ পর্বের মাত্রা-সংকেত—( ৮+৬ ): যেমন,—

'কে যেন রচিতেছিল | ছায়া-রৌদ্রকরে ॥
অরণ্যের সুপ্তি আর | পাতার মর্মরে।' ॥

**তরল পয়ার**—ইহা লঘু পয়ারেরই একটি রূপভেদ। এই ছন্দে লঘু পয়ারের ন্যায় চরণশেষে অন্ত্যানুপ্রাস তো থাকেই, অধিকন্তু চতুর্থ এবং অষ্টম অক্ষরেও অতিরিক্ত অনুপ্রাস থাকে: যেমন,—

'দেখ দ্বিজ মনসিজ | জিনিয়া মুরতি ॥
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র | পরশয়ে শ্রুতি।' ॥

**মালঝাঁপ পয়ার**—ইহা লঘু পয়ারেরই আর একটি রূপভেদ। এই পয়ারে চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ অক্ষরে অনুপ্রাস থাকে। অর্থাৎ লঘু পয়ারের চরণান্তিক মিল ও তরল পয়ারের বৈশিষ্ট্য ( চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষরে মিল ) ছাড়াও দ্বাদশ অক্ষরে একটা অতিরিক্ত মিল সংযোজিত হয়: যেমন,—

'গুণহীন চিরদিন | পরাধীন রয় ॥
নাহি সুখ ম্লানমুখ | চিরদুখ সয়।' ॥

**পর্যায়সম পয়ার**—এই পয়ারে প্রথম-তৃতীয় চরণে এক ধরণের অনুপ্রাস এবং দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণে আর এক ধরণের অনুপ্রাস থাকে: যেমন,—

'মা আমার স্নেহময়ী | করুণারূপিণী, ॥
এ জগতে কোথা আছে | তুলনা তোমার ? ॥
স্নেহের মুরতিরূপে | আছ গো জননী—॥
অনুপম স্নেহ তব | অনন্ত অপার।' ॥

**মধ্যসম পয়ার**—এই পয়ারে দ্বিতীয়-তৃতীয় চরণে এক রকমের অনুপ্রাস এবং প্রথম-চতুর্থ চরণে আর এক রকমের অনুপ্রাস থাকে: যেমন,—

'স্বপনে ভ্রমিনু আমি | গহন কাননে ॥
একাকী দেখিনু দূরে | যুবা একজন, ॥
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে | প্রাচীন ব্রাহ্মণ, ॥
দ্রোণ যেন ভয়শূন্য | কুরুক্ষেত্র রণে।' ॥

**দীর্ঘ পয়ার বা দীর্ঘ দ্বিপদী বা মহাপয়ার**—এই পয়ারের মাত্রা-সংখ্যা আঠারো। চরণস্থ পর্বের মাত্রা-সংকেত—( ৮+১০ ): যেমন,—

পূর্ণিমা-নিশীথে যবে | দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি ॥
দূরস্মৃতি কোথা হতে | বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশী।' ॥

**অমিল মহাপয়ার**—এই পয়ারে চরণান্তিক অনুপ্রাস থাকে না : যেমন,—

'এই বাণী গাব আমি | প্রভাতে প্রথম-জাগা পাখী ॥
যে সুর ঘোষণা করে | আপনাতে আনন্দ আপন।' ॥

[ বি. দ্র. মহাপয়ার **সমিল** ও **অমিল**—দুই রকমেরই হইতে পারে। ]

**লঘু ত্রিপদী**—প্রতি চরণে তিনটি পর্ব। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের শেষে অনুপ্রাসের অবস্থান সুস্পষ্টরূপে দেখাইবার জন্য প্রতিটি চরণ ভাঙিয়া দুই পংক্তিতে সাজানো। পর্বের মাত্রা-সংকেত—( ৬+৬+৮ )। চরণান্তিক অনুপ্রাসও লক্ষণীয় : যেমন,—

সৌভাগ্যের দ্বার | খোলা অনিবার।
আছে সকলের তরে, ॥
উদ্যোগী যেজন | কর্মপরায়ণ |
প্রবেশিতে সেই পারে !' ॥

**দীর্ঘ ত্রিপদী**—প্রকৃতিগত দিক দিয়া নয়, মাত্রাগত দিক দিয়াই লঘু ত্রিপদীর সঙ্গে এই দীর্ঘ ত্রিপদীর পার্থক্য লক্ষণীয়। দীর্ঘ ত্রিপদীর পর্বস্থ মাত্রা-সংকেত—( ৮+৮+১০ ) : যেমন,—

'ব'লো না কাতর স্বরে | বৃথা জন্ম এ সংসারে।
এ জীবন নিশার স্বপন, ॥
দারা পুত্র পরিবার | -তুমি কার, কে তোমার |
ব'লে জীব ক'রনা ক্রন্দন।' ॥

**লঘু চৌপদী**—প্রতিটি চরণে চারিটি করিয়া পর্ব থাকে। চরণান্তিক অনুপ্রাসের ব্যবহার আছে। চরণগুলি ভাঙিয়া দুই পংক্তিতে সাজানো হয়। পর্বের মাত্রা-সংকেত—( ৬+৬+৬+৫ ) : যেমন,—

'চিরসুখী জন | ভ্রমে কি কথন |
ব্যথিত বেদন | বুঝিতে পারে ॥
কি যাতনা বিষে | বুঝিবে সে কিসে |
কভু আশীবিষে | দংশেনি যারে' ॥

**দীর্ঘ চৌপদী**—এখানে প্রকৃতির দিক হইতে নয়, মাত্রার দিক হইতেই লঘু চৌপদীর সঙ্গে এই দীর্ঘ চৌপদীর পার্থক্য লক্ষণীয়। এই চৌপদীর পর্বের মাত্রা-সংকেত —( ৮+৮+৮+৬ ) বা ( ৮+৮+৮+৭ ) বা ( ৮+৮+৮+১০ ) : যেমন,—

[ক] 'মিছা দারা সুত লয়ে | মিছা সুখে সুখী হয়ে |
যে রহে আপনা কয়ে | সে মজে বিষাদে' !

—ইহার মাত্রা-সংকেত—( ৮+৮+৮+৬ )। প্রথম তিন পর্বের শেষে অনুপ্রাস।

[খ] 'ভরদ্বাজ-অবতংস | ভূপতি রায়ের বংশ |
সদা ভাবে হত-কংস | ভুরশুটে বসতি' ॥

—ইহার মাত্রা-সংকেত—( ৮+৮+৮+৭ )। প্রথম তিন পর্বের শেষে অনুপ্রাস।

[গ] দুর্জয়ের জয়মালা | পূর্ণ করে মোর ডালা |
উদ্দামের উতরোল | বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে'।

—ইহার মাত্রা-সংকেত ( ৮+৮+৮+১০ )। প্রথম দুই পর্বের শেষে অনুপ্রাস।

**একাবলী**—পয়ার এবং ত্রিপদীর ন্যায় এই ছন্দেও দুইটি মিত্রাক্ষর চরণ এবং প্রতি চরণে দুইটি করিয়া পর্ব থাকে। চরণান্তিক অনুপ্রাস ব্যবহৃত হয়। পর্বের মাত্রা-সংকেত —( ৬+৫ ): যেমন,—

'যখন বিশ্বের | যে দিকে চাই ॥
সে দিকে তোমারে | দেখিতে পাই।' ॥

**দীর্ঘ একাবলী**—প্রকৃতির দিক দিয়া নয়, কেবলমাত্র মাত্রার দিক দিয়াই একাবলীর সঙ্গে দীর্ঘ একাবলীর পার্থক্য লক্ষণীয়। দীর্ঘ একাবলীর পর্বস্থ মাত্রা-সংকেত— ( ৬+৬ ): যেমন,—

'চলে কালস্রোত | নাহি দয়া-মায়া ॥
চলে সুখে নিয়া | শিশুবৃদ্ধকায়া।' ॥

## অমিত্রাক্ষর ছন্দ ( Blank Verse )

( ১ )

প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' রচনাকালে মহাকবি মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন যে, বাঁধনহারা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত না হইলে বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মধুকবি একথাটি মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকেও জানাইয়াছিলেন, এমন কি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনার প্রতিজ্ঞাও তিনি করিয়া বসিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার পূর্বে মধুকবি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,—'I want the public ear to be attuned to the melody of the Blank Verse'. কিছুদিনের মধ্যেই যখন মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য' রচনা করিলেন, তখন অনেকেই মধুপ্রতিভাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়াছিলেন; বন্ধু রাজনারায়ণ তো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মধুকবির এ কাব্যকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন,—'Your reward is very great indeed—immortality'. তবে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ পরবর্তী কালে রচিত 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'ই সার্থক পরিণতি লাভ করিয়াছে।

এই ছন্দটি পয়ারের পটভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'যে পয়ার বা মহাপয়ারের চরণে চরণান্তিক ছন্দোযতির (=পূর্ণযতির) সহিত অর্থগত ছেদের (=ভাবযতির) মিত্রতা বা একত্র অবস্থান অবশ্যম্ভাবী নহে, সেই পয়ার বা মহাপয়ারের বিশেষ নাম অমিত্র ছন্দ। অন্য কোন ছন্দে, চরণান্তিক যতি ও ছেদের অমিত্রতা ঘটিলেও তাহাকে অমিত্র ছন্দ বলা চলিবে না।' মাইকেল প্রতিটি চরণে চোদ্দটি করিয়া অক্ষরের ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি চরণান্তিক অনুপ্রাস ব্যবহার করেন নাই। প্রতিটি চরণে

দুইটি করিয়া পর্ব আছে এবং পর্বের মাত্রাসংকেত—( ৮+৬ )। এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ছেদ এবং যতির ব্যবহার একই সঙ্গে সর্বত্র দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীন পয়ার ছন্দে ছেদ এবং যতি একই সঙ্গে ব্যবহৃত হইত। মধুসূদন এই রীতির প্রথম পরিবর্তন করিয়া ছেদ এবং যতি স্থাপনের বিপর্যয় দ্বারা বাংলা ছন্দে প্রবহমানতা আনিয়াছেন। আধুনিক কবিগণ যে পয়ার ছন্দ ব্যবহার করেন, তাহা প্রায় ক্ষেত্রেই **প্রবহমান পয়ার**। এই জাতীয় পয়ার লঘু এবং দীর্ঘ, দুইই হইতে পারে।

যতিপ্রয়োগের ক্ষেত্রে পয়ার ছন্দ ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উভয় ছন্দেই প্রতি চরণের মাত্রা-সংকেত—৮+৬=১৪ আবার অর্ধযতি এবং পূর্ণযতির অবস্থানও একই রূপ : যেমন,—মধুকবির অমিত্রাক্ষর ছন্দে পাই—

'সম্মুখ-সমরে পড়ি, | + বীর-চূড়ামণি ॥
বীরবাহু, + চলি যবে | গেলা যমপুরে ॥
অকালে, + কহ, + হে দেবি | অমৃতভাষিণি ! ॥ +
কোন্ বীরবরে বরি | সেনাপতি-পদে, ॥ +
পাঠাইলা রণে পুনঃ | রক্ষঃকুলনিধি ॥ +
রাঘবারি ?' + +

আবার কাশীরামের পয়ার-ছন্দে পাই—

'মহাভারতের কথা | অমৃত-সমান। ॥ +
কাশীরাম দাস কহে, + | শুনে পুণ্যবান ॥' ॥ + +

উল্লিখিত দৃষ্টান্তদ্বয়ে যতির দিকে লক্ষ্য করিলে পয়ার ও অমিত্রচ্ছন্দের মধ্যে সাদৃশ্য অনুভূত হয় সত্য, কিন্তু ছেদের দিকে নজর দিলে উভয় ছন্দের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। অর্ধযতি ও পূর্ণযতি বুঝাইবার জন্য যথাক্রমে একটি দাঁড়ি ও দুইটি দাঁড়ি এবং উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ বুঝাইবার জন্য যথাক্রমে একটি যোগ-চিহ্ন ও দুইটি যোগচিহ্ন প্রয়োগ করিয়া ইহাই দেখানো হইয়াছে যে, এক ঝোঁকে চরণের যতটুকু অংশ উচ্চারণ করা যায়, ঠিক ততটুকুরই পরে পড়িয়াছে যতি-চিহ্ন, কিন্তু বাক্যের অর্থানুযায়ী পড়িয়াছে ছেদ-চিহ্ন। উদ্ধৃত নমুনা দুইটি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, পয়ারে যতি ও ছেদ একই স্থানে পড়ে, পক্ষান্তরে অমিত্রাক্ষর ছন্দে যতি ও ছেদ সর্ব সময়ে একই স্থানে পড়ে না। ছেদকে যতির পারবশ্য হইতে বিমুক্ত করিয়া ভাব-প্রকাশের জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দের এই যে মুক্তি-সাধনা, ইহাই প্রাচীন পয়ার ছন্দকে **প্রবহমান** করিয়াছে। তাই তো,—'বাংলা কবিতার প্রথম ছন্দোমুক্তিসাধক—মাইকেল মধুসূদন। তাঁহার ছন্দোমুক্তি' চেষ্টার ফলেই অমিত্র-ছন্দের জন্ম। তিনি ছন্দকে ভাঙিতে না পারিলেও চরণান্তিক অনুপ্রাস ও ছেদের বিপর্যয় ঘটাইয়া কবিতা

অর্থকে স্বাধীনতা দিয়াছেন ও কবিতাকে করিয়াছেন অপেক্ষাকৃত জীবনোপযোগী।' মধুকবির এই অমিত্রচ্ছন্দকে **চরণান্তিক অনুপ্রাসহীন প্রবহমান পয়ার** বলা চলে।

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—'সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সংগীত তরঙ্গিত হইতে থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা এবং যুক্ত-অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তথ্যটি অবগত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার মেঘনাদবধ-কাব্যে ছন্দের এমন তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।' স্বয়ং মধুকবি লিখিয়াছেন,—'Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the *toughest* of poets I mean old John Milton'. **চতুর্দশাক্ষর এই অমিত্রচ্ছন্দের বিরাম সম্বন্ধে মধুকবি নিজেই বলিয়াছেন**,—'I find that যতি, instead of being confined to the 8th syllable *naturally* comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 10th, 11th, 12th and so on. ডক্টর সুকুমার সেনের মতে,—'অমিত্রাক্ষর বিদেশী আমদানী নয়, ইহা পয়ারই। তফাতের মধ্যে এই যে, পয়ারের যেমন দুই চরণে (অর্থাৎ আটাশ অক্ষরে) শেষ যতি পড়ে, অমিত্রাক্ষরে তেমন নয়। অমিত্রাক্ষর পয়ারের শম যত খুশি চরণের পর যে-কোন পূর্ণযতিতে—অর্থাৎ আট বা শেষ ছয় অক্ষরের পরে, অথবা অর্ধযতিতে—অর্থাৎ প্রথম অর্ধে চার ও শেষ অর্ধে তিন অক্ষরের পরে, হইতে পারে। পয়ারের মিলযুক্ত দুই-চরণের মধ্যে ভাবকে পুরিয়া রাখিতে হয়। পয়ারের এই দুই-চরণের নিগড় ভাঙিয়া মধুসূদন ছন্দের প্রসার বাড়াইয়া ভাব-প্রসারের অবকাশ দিলেন—ইহাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের আসল কথা। বস্তুতঃ মিল না থাকাটাই বড় কথা নয়, যতির স্বাধীনতা অর্থাৎ ছন্দের প্রবহমানতাই অমিত্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্য।'

মোটের উপর, মধুকবির **অমিত্রাক্ষর ছন্দের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য** লক্ষণীয়:—**প্রথমতঃ**, এই ছন্দে ভাব এবং বাক্য যতির বশীভূত নয়, পক্ষান্তরে যতিই ভাব এবং বাক্যের বশীভূত। প্রতিটি পদেই যেমন যতির বৈচিত্র্য, তেমনি ভাবপ্রকাশের স্বাভাবিকতা পরিদৃষ্ট হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, এই ছন্দে যেমন আছে সংগীতের স্বাদ, তেমনি আছে রসবৈচিত্র্যানুযায়ী কখনও-বা সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতে শব্দচয়ন, আবার কখনও-বা ইংরাজী ভাষার অনুকরণে নব নব পদ গঠন। **তৃতীয়তঃ**, অমিত্রচ্ছন্দে নূতন নূতন ক্রিয়াপদ গঠিত হইয়াছে। ইংরাজিতে যেমন বিশেষ্য বিশেষণ পদাদি হইতে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তেমনি মধুকবিও এহেন বহু ক্রিয়াপদ বাংলা কাব্য-সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। **চতুর্থতঃ**, এই ছন্দে বাক্যবিন্যাসের স্বাভাবিকতা গুণ থাকায় সর্বজাতীয় রসই উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। **পঞ্চমতঃ**, এই ছন্দে মহাকবি মোটামুটি সংযমের সহিত অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া ইহার মধ্য হইতে হীরক-জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে।

অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মধুকবির প্রবর্তিত এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা অমিত্রচ্ছন্দের এক নবতর নাম দিয়াছেন **অমিতাক্ষর**। এই ছন্দে অক্ষর বা মাত্রার সংখ্যা ছেদের সম্পর্কে সুনিয়ন্ত্রিত নয় বলিয়াই অর্থাৎ **অমিত** হওয়াতেই সম্ভবতঃ অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই নবতর নামকরণের পক্ষপাতী। অবশ্য কবি-সমালোচক মোহিতলাল 'অমিতাক্ষর' নামকরণটি সম্পর্কে ঘোর আপত্তি তুলিয়াছেন।

(২)

মধুকবির অমিত্রাক্ষর ছন্দ হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র, উভয়েই তাঁহাদের কাব্যসাধনায় প্রয়োগ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু কেহই সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার-কাব্যে' বা নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' কাব্যত্রয়ে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা মধু-প্রবর্তিত সামগ্রী নয়—পয়ার ছন্দেরই যৎকিঞ্চিৎ রূপান্তর মাত্র যাহা প্রকৃতপক্ষে মিলহীন পয়ারই। সত্য কথা বলিতে কি, বাংলা কাব্য-কবিতায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রয়োগ-ব্যাপারে মধুসূদন-ব্যতিরেকে আর কোন কবিই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বাংলা সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের উদ্ভব ও পরিণতির জন্য প্রতিভাধর মধুসূদন সকল কৃতিত্বের অধিকারী।

(৩)

**গৈরিশ ছন্দটিও** পয়ারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের প্রবহমান রীতির অনুসরণ করিয়া এই ছন্দে গিরিশচন্দ্র ছন্দ-মুক্তিকে আরও কিছুটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। এই ছন্দকে **ভাঙা-অমিত্রাক্ষর**ও বলা হয়। ইহাতে পংক্তির পর্বসংখ্যা এবং দৈর্ঘ্য এক রকম নয় এবং অন্ত্য অনুপ্রাসের ব্যবহারও সর্বত্র দেখা যায় না। অভিনয়ের সুবিধার জন্য গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকে প্রথমে এই ছন্দের ব্যবহার করেন। এই ছন্দের আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে এই যে, ইহার পংক্তিগুলি ভাবযতিকে অনুসরণ করে: যেমন,—

'ব্রহ্ম সনাতন্।<br>
রাজীব-লোচন্।<br>
ধ্যানে জ্ঞানে হেরিছেন মোরে।' ॥

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নিজেই 'গৈরিশ ছন্দে'র যে কৈফিয়ৎটি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনকে দিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"আমি বিস্তর চেষ্টা করে দেখেছি, গদ্য লিখি সে এক স্বতন্ত্র, কিন্তু ছন্দোবন্ধ ব্যতীত আমরা ভাষা কথা কইতে পারি না। চেষ্টা ক'রলেও ভাষা-কথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে সেইজন্য ছন্দে কথা নাটকের উপযোগী। উপস্থিত দেখা যাক্—কোন্ ছন্দে অধিব কথা কয়। দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী বা যে যে ছন্দ বাঙলায় ব্যবহার হয়, সকলগুলি

পয়ারের অন্তর্গত। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়বার সময় আমার যেমন ভাঙা লেখা, তেমনি ভেঙে ভেঙে পড়তে হয়। যেখানে বর্ণনা, সেখানে স্বতন্ত্র, কিন্তু—যেখানে কথাবার্তা সেইখানেই ছন্দ ভাঙা। তারপর দেখা যাক্—কোন্ ছন্দ অধিক। দীর্ঘ ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণের সহিত শেষ চরণে মিলিত হয়ে অধিকাংশ কথা হয়।

'দেখিলাম সরোবরে কমলিনী বান্ধিয়াছে করী।'

লঘু ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেক সময় মিলিত হয়।

'বিরসবদন রাণীর নিকট যায়।'

এ সওয়ায় পয়ার লঘু ত্রিপদীর এক এক পদ বিশেষতঃ শেষ পদ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়। আমার কথা এই যে, এস্থলে নাটকের চোদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়া কেন? চোদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়লে দেখা যায়—সময়ে সময়ে সরল যতি থাকে না।

'বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে।'

এরূপ হামেসাই হবে। বাংলা ভাষায় ক্রিয়া 'হইয়াছিল' প্রভৃতি অনেক সময়েই যতি জড়িত করবে। কিন্তু গৈরিশ ছন্দে সে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করে সহজেই লেখা যাবে। আর এক লাভ, ভাষা নীচ হতে বিনা চেষ্টায় উচ্চ স্তরে সহজেই উঠ্‌বে। সে সুবিধা চোদ্দর কিছু কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময় তার প্রয়োজন।"

( ৪ )

রবীন্দ্রনাথও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অমিল নয়—সমিল। মধুসূদন প্রাচীন পয়ারের যতি হইতে ছেদকে বিযুক্ত তো করিয়াছেনই, তদুপরি চরণান্তিক অক্ষরধ্বনির মিত্রতা একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন; পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ ঐ অক্ষরধ্বনির মিত্রতাকে আবার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাই রবি-কবির অমিত্রচ্ছন্দকে **চরণান্তিক অনুপ্রাসযুক্ত প্রবহমান পয়ার** বলা চলে। **মধুকবির অমিল অমিত্রচ্ছন্দে** পর্বমধ্যে যুগ্মমাত্রিক ও অযুগ্মমাত্রিক যে কোন দৈর্ঘ্যের শব্দের পরে ছেদ বসিয়াছে; কিন্তু **রবিকবির সমিল অমিত্রচ্ছন্দে** যুগ্মমাত্রিক শব্দের পরেই সাধারণতঃ ছেদ বসিয়াছে। ইহাও সবিশেষ লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের সমিল অমিত্রচ্ছন্দে পর্বমধ্যে পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার প্রায়শঃই হয় না। পর্ববিন্যাসকালে রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানেই পয়ারের ছয় মাত্রার শেষে পর্বটিকে আট মাত্রার প্রথম পর্বের আগে বসাইয়া বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। মধুকবির অমিল অমিত্রচ্ছন্দে পর্বোদ্ভূত ধ্বনিতরঙ্গ উদাত্ত গাম্ভীর্যের সহিত প্রবল বেগে উৎসারিত

হইয়াছে, আর রবিকবির সমিল অমিত্রচ্ছন্দের চরণান্তিক অক্ষরের মিত্রতাহেতু কোমল গীতিধর্মী সুর স্পন্দিত হইয়াছে।

অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই **সমিল অমিত্রাক্ষরছন্দ** তথা চরণান্তিক অনুপ্রাসযুক্ত প্রবহমান পয়ার ছন্দকে নাম দিয়াছেন **মিত্রাক্ষর-অমিতাক্ষর**। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ছন্দ মূলতঃ এই সমিল অমিত্র-ছন্দেরই ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। মিত্রাক্ষরের অবস্থান বুঝাইবার নিমিত্তই পয়ার ও মহাপয়ারের অন্তর্গত পর্বাদিকে ভাঙিয়া তিনি **নানা পংক্তিতে** সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ফলে পংক্তিশেষে অনুপ্রাস থাকিলেও বিভিন্ন পংক্তির অক্ষরসংখ্যা অসমান এবং পূর্বের অক্ষরসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। এহেন পংক্তিসজ্জায় ভাবধারা পংক্তি লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হওয়ায় এই ছন্দকে **ধাবমান পয়ারও** বলা হয়। তবে 'বলাকা'র প্রত্যেকটি কবিতাতেই যে পয়ার অথবা মহাপয়ারের নির্দিষ্টসংখ্যক মাত্রা-বিন্যাস করিয়া চরণ সংগঠিত হইয়াছে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। অর্থাৎ 'বলাকা'র অনুসৃত ছন্দের চরণাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপূর্ণপদী। কাহারও কাহারও মতে, 'বলাকা' কাব্যের ছন্দটি **মুক্তক ছন্দ**।

[ক] পয়ার-ভিত্তিক সমিল অমিত্রচ্ছন্দ তথা চরণান্তিক অনুপ্রাসযুক্ত প্রবহমান পয়ার ছন্দের এই দৃষ্টান্তের মাত্রা-সংকেত—( ৮+৬ ): যেমন,—

'—আকাশের দূরান্তরে ॥
একে একে অন্ধকারে | হতেছে বাহির ॥
একেকটি দীপ্ত তারা, | সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মত | ' —রবীন্দ্রনাথ।

[খ] মহাপয়ার-ভিত্তিক সমিল অমিত্রচ্ছন্দ তথা চরণান্তিক অনুপ্রাসযুক্ত প্রবহমান পয়ার ছন্দের এই দৃষ্টান্তের মাত্রা-সংকেত—( ৮+১০ ): যেমন,—

'এবার ফিরাও মোরে, | লয়ে যাও সংসারের তীরে, ॥
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী | দুলায়ো না সমীরে সমীরে, ॥
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, | ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়, ॥
বিজন বিষাদ-ঘন | অন্তরের নিকুঞ্জ ছায়ায় ॥
রেখো না বসায়ে আর।' | —রবীন্দ্রনাথ।

[গ] 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত ধাবমান পয়ার বা মুক্তক ছন্দের দৃষ্টান্ত:

'যদি তুমি মুহূর্তের তরে।
ক্লান্তিভরে।
দাঁড়াও থমকি, ॥
তখনি চমকি,'।
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব | পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে; ॥ —রবীন্দ্রনাথ।

**চতুর্দশপদী কবিতা ( Sonnet )**

কবিতা চতুর্দশপদী হইলেই **সনেট** হয় না। একটিমাত্র অখণ্ড ভাবকল্পনা বা অনুভূতি-কণা যখন একটি বিশেষ গঠনভঙ্গির মধ্য দিয়া সমগ্রতায় ফুটিয়া উঠে, তখন তাহাকে বলা হয় **সনেট**। 'সনেট' কথাটি ইতালীয় 'সনেত্তো' (অর্থাৎ গীতময় মৃদুধ্বনি) হইতে আসিয়াছে। অনেকে মনে করেন, পেত্রার্কাই ইতালীয় সনেটের জন্মদাতা; কিন্তু ইহা ভুল ধারণা। পেত্রার্কা ১৩০৪ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৩৭৪ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু দান্তে তাঁহারও আগেকার লোক—দান্তের আয়ুষ্কাল ১২৬৫ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৩২১ খ্রীঃ অঃ অবধি। দান্তে বিয়াত্রিচ-কে এবং পেত্রার্কা লরা-কে উদ্দেশ করিয়া প্রেম ও সৌন্দর্যভূয়িষ্ঠ সনেট তথা চতুর্দশপদী কবিতাদি রচনা করিয়াছিলেন।—ঐগুলিই ইতালীয় সনেটের গৌরবময় প্রথম স্তর। আবার কেহ কেহ মনে করেন, একাদশ শতাব্দীর পর্তুগীজ কবি Guido D' Arezzoই সনেটের আদিস্রষ্টা। কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতার আদিযুগের একটি ইতিবৃত্ত ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র দিয়াছেন এইরূপ: "অনেকে গ্রীক কবিতার Epigram-এর সঙ্গে ইতালীয় সনেটের বিলক্ষণ মিল দেখিতে পান; এবং কোনো প্রাচীন কবি নাকি সনেট লিখে এপিগ্রাম নামে চালিয়েছেন। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে গ্রীক্ কালচার ইতালীতে অজ্ঞাত ছিল; কাজেই দান্তের পূর্বপুরুষগণ নিশ্চয়ই গ্রীক্ নন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, প্রভ স প্রদেশের ত্রুবাদুর ( Troubadour )-গণ তাদের মাতৃভাষায় যে গান ও ছড়া বেঁধে মুখে মুখে ছড়িয়ে বেড়াতো, তারি প্রভাবে ইতালীয় সনেট-এর আবির্ভাব। অন্য দলের মতে ( দান্তে ও পেত্রার্কা দু'জনেই নাকি এ-মতের পরিপোষক ছিলেন ), সিসিলিতে আরবদের সংস্পর্শে এসেই ইতালিয়নরা সনেট লিখ্‌তে শেখে। প্রাচীনতম ইতালিয়ন কবিতায় আর্‌বিয়ানা খুব বেশি ব'লে আজকাল এ মতই অভ্রান্ত ব'লে দাঁড়িয়ে গেছে।"

সনেটের গঠনকারুকলার দিক দিয়া যদিও পেত্রার্কাই মধুসূদনের গুরু, তবু বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য ও বহুমুখিতার দিক দিয়া তিনি মিল্টন, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, কীট্‌স্, শেলী প্রভৃতি ইংরাজ কবিদের মন্ত্রশিষ্য। কেন না,—পেত্রার্কার ন্যায় মধুকবির সনেটগুলির বিষয়বস্তু নিছক প্রেমেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রসঙ্গতঃ, ইহাও বলিয়া রাখি যে, ছন্দ-প্রকরণের দিক দিয়া পেত্রার্কার হুবহু অনুসরণ মধুকবি খুব কমই করিয়াছেন, বরং স্পেনসার সেক্‌স্‌পীয়র ব্যতীত অন্যান্য ইংরাজ কবিদের তিনি অনেকখানি অনুসরণ করিয়াছেন। তবু সত্যের খাতিরে ইহা বলিতেই হইবে যে, চতুর্দশপদীর আত্মা মধুসূদনের নজরে পড়ে নাই। Theodore Watts Dunton নিজের লেখা একটি সনেটের ষট্‌পদী বা ষড়কে বলিয়াছেন—

'A sonnet is a wave of melody
From heaving water of the impassioned soul
A billow of tidal music one and whole
Flows in the "Octave" ; then returning free ;
Its ebbing surges in the "Sestet" roll
Back to the deeps of Life's tumultuous sea'.

অষ্টপদী বা অষ্টকের ( Octave ) উচ্ছ্বাস, ষট্‌পদী বা ষড়কের ( Sestet ) অবরোহণে শেষ হয় ; অথচ এই দুই ধারার মাঝে অন্তর্নিহিত মেলবন্ধন থাকিলেও ইহারা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন—এই মূল তত্ত্বটিকে মধুসূদন বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। তাই সময়ে সময়ে এই প্রশ্নই আমাদের মনে জাগে—সনেট লিখিবার মত সত্যকার তাগিদ কি তাঁহার অন্তরে ছিল ?

গীতিকাব্যে আত্মকেন্দ্রিকতা থাকা চাই। তাই সনেটও আত্মকেন্দ্রিক কবিতা। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, আত্মকেন্দ্রিক কবিতা হইলেই সনেট হইবে না। সনেটের শরীরটি তথা আঙ্গিক যেমন হইবে নিখুঁত, অন্তরটিও হইবে তেমনি খাঁটি—এই দুইটি সামগ্রীর মেলবন্ধনেই তো চতুর্দশপদীর সফলতা। কোন বিদগ্ধ সমালোচক কহিয়াছেন, —'উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে প্রশান্ত সংযমের উদ্বাহ-বন্ধনেই সনেটের সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যসৃষ্টির কৌশল আয়ত্ত করার ধৈর্য অসংযত প্রতিভার পক্ষে অসম্ভব। রসিক মধুসূদন বিদেশী ভাষায় লেখা চতুর্দশপদী কবিতার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, দেশপ্রেমিক মধুসূদন মাতৃভাষার উৎকর্ষ-সাধনের তাগিদে য়ুরোপের কাব্য-কানন থেকে সনেট আহরণ করেছিলেন, কবিত্ব-শক্তি-গর্বিত মধুসূদন সনেটের ছাঁচে ঢেলে কিছু কবিতাও লিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি কবিতার জন্মলগ্নে আবেগ-স্পন্দিত সংযম-শাসিত কবিচিত্তের হিমাংশুকিরণপাত সম্ভব হয়েছে।'

সনেটের চোদ্দটি পংক্তি থাকে—ইহার বিভাগ দুইটি। প্রধান বিভাগ যাহাকে অষ্টপদী বা Octave বলা হয়, তাহাতে থাকে ভাব-কল্পনার সংকেত, আর দ্বিতীয় বিভাগ, যাহাকে ষট্‌পদী বা Sestet বলা হয়, তাহাতে থাকে সেই সংকেতের বিস্তৃতি, ব্যাখ্যা বা সম্প্রসারণ। অষ্টপদীতে থাকে দুইটি করিয়া চৌপদী বা Quatrain এবং ষট্‌পদীতে থাকে দুইটি করিয়া ত্রিপদী বা Tercet। সনেটের পংক্তিগুলির 'ছন্দপ্রকরণ' মোটামুটি হয় এইরূপ :—

| অষ্টপদী | | | ষট্‌পদী | | |
|---|---|---|---|---|---|
| চৌপদী | + | চৌপদী | ত্রিপদী | + | ত্রিপদী |
| ক খ খ ক | | ক খ খ ক | গ ঘ ঙ | | গ ঘ ঙ |
| ক খ খ ক | | ক খ খ ক | গ ঘ ঙ | | ঘ গ ঙ |
| ক খ খ ক | | ক খ খ ক | গ ঘ গ | | ঘ গ ঘ |

চরণে চরণে মিলের সংখ্যা মোট চার অথবা পাঁচ রকমের। ইহা ছাড়া, চৌপদীর পরে পূর্ণচ্ছেদ বিধেয়। মিল্‌টন এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ইতালীয় পন্থা প্রায়ই মানিয়াছেন; কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়র এই বিষয়ে একেবারেই বেপরোয়া। সেক্‌স্‌পীয়র অষ্টপদী ও ষট্‌পদীর বিভাগ তো স্বীকার করেনই নাই, উপরন্তু তাঁহার সনেটের পংক্তির সাধারণ রূপ হইতেছে এইরূপ :—

ক খ ক খ গ ঘ গ ঘ ঙ চ ঙ চ ছ ছ

ইংরাজি Sonnet-এর অনুসরণে মধুসূদন বাংলায় এই ছন্দের প্রবর্তন করেন। এই ছন্দ পয়ারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতি চরণে চোদ্দ মাত্রা থাকে; চরণস্থ পর্বের মাত্রা-সংকেত—৮+৬। চরণান্তিক অনুপ্রাসের ব্যবহার আছে এই ছন্দে। মধুসূদনের প্রবর্তিত রীতি-অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল প্রভৃতি কবিগণ চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতায় রীতির কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ সনেট-রচনায় মাইকেল-প্রবর্তিত বিধান পুরোপুরি অনুসরণ করেন নাই। সনেটের একটি দৃষ্টান্ত :

### কবি

'কে কবি—কবে কে মোরে? | ঘটকালি করি' ।।
শবদে শবদে বিয়া | দেয় যেই জন, ।।
সেই কি সে যম-দমী? | তার শিরোপরি ।।
শোভে কি অক্ষয় শোভা | যশের রতন? ।।
সেই কবি মোর মতে, | কল্পনাসুন্দরী ।।
যার মনঃ-কমলেতে | পাতেন আসন, ।
অস্তগামী-ভানু-প্রভা- | সদৃশ বিতরি ।।
ভাবের সংসারে তার | সুবর্ণ-কিরণ। ।।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, | যার আজ্ঞা মানে; ।।
অরণ্যে কুসুম ফোটে | যার ইচ্ছা-বলে; ।।
নন্দন-কানন হতে | যে সুজন আনে ।।
পারিজাত কুসুমের | রম্য পরিমলে; ।।
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে | যাহার খেয়ানে ।।
বহে জলবতী নদী | মৃদু কলকলে!'

—মধুসূদন।

## [ দুই ] ধ্বনিপ্রধান ছন্দ

যে ছন্দের চরণস্থ পর্বসমূহে প্রতিটি অক্ষরধ্বনিই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে, সেই ছন্দের নাম **ধ্বনিপ্রধান** ছন্দ। অক্ষরধ্বনির অতিরিক্ত কোন সুর এই ছন্দে থাকে না। স্পষ্টভাবে উচ্চারিত অক্ষরধ্বনিসমূহ হইতেই মাত্রার পরিমাণ স্থিরীকৃত হয় বলিয়া এই ছন্দ শুধু ধ্বনিপ্রধানই নয়, **ধ্বনিমাত্রিকও** বটে। ইহাতে

**সমস্ত** যৌগিক অক্ষরকেই দীর্ঘ অর্থাৎ দুই মাত্রার বলিয়া ধরা হয়, পক্ষান্তরে অন্যান্য সমস্ত অক্ষরই হ্রস্ব অর্থাৎ এক মাত্রার। অবশ্য মাত্রা-সম্পর্কিত এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। কারণ, মৌলিক স্বর, যাহা সাধারণতঃ হ্রস্ব, অর্থাৎ একমাত্রিক তাহাও সময়ে সময়ে দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক হইয়া থাকে। তবে, সাধারণতঃ ধ্বনিপ্রধান ছন্দের মাত্রা হিসাব করা হয় এইরূপ : (ক) একই শব্দের অন্তর্ভুক্ত যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বর, (খ) ব্যঞ্জনান্ত অর্থাৎ হলন্ত অক্ষরের স্বর, (গ) অনুস্বার ও বিসর্গের পূর্ববর্তী হলন্ত অক্ষরের স্বর, এবং (ঘ) ঐ ঔ স্বরদ্বয়—এই চার রকমের ক্ষেত্রেই দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক ধরা হয় ; এছাড়া অবশিষ্ট স্বরগুলি হ্রস্ব বা একমাত্রিক। এই ছন্দের এহেন মাত্রাসর্বস্বতার জন্য ইহা **মাত্রাবৃত্ত** ছন্দ নামেও পরিচিত। যৌগিক অক্ষর সর্বত্র সম্প্রসারিত হয় বলিয়াই এই ছন্দকে বলা হয় **বিলম্বিত লয়ের** ছন্দ। [ **মন্তব্য :** কিন্তু বিলম্বিত' শব্দটি ঠিক খাপ খায় না। ইহার বদলে বলা উচিত 'মধ্য' বা 'মধ্যম'। সংগীতশাস্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়াই ছন্দঃশাস্ত্রের বিষয়াদি ব্যাখ্যাত বা বিবৃত হওয়া সমীচীন। ]

ধ্বনিপ্রধান ছন্দের দৃষ্টান্ত :

| ‖ | | ‖ | | | | | |
[ক] 'শরৎ ডাকে | ঘর-ছাড়ান ডাকা |
‖ | | | | | |
কাজ-ভোলানো সুরে। (৫ + ৭ + ৭—মাত্রাবিন্যাস)

| ‖ | | | ‖ | | | |
চপল করে | হাঁসের দুটি পাখা, |
| ‖ | | | |
ওড়ায় তারে দূরে' ॥ (৫ + ৭ + ৭—মাত্রাবিন্যাস)

[ রেখা-চিহ্নিত শব্দগুলির মধ্যস্থিত যৌগিক অক্ষরে দুই মাত্রার সমাবেশ হইয়াছে। ]

‖ | | | | | | | | ‖
[খ] 'দক্ষিণবায়ে | করে যাব দান, ॥ (৬ + ৬—মাত্রাবিন্যাস)

| | ‖ | | | | | | ‖
রবিরশ্মিতে | কাঁপিবে যে তান, ॥ (৬ + ৬—মাত্রাবিন্যাস)

| | | | | | | | | | | ‖
কুসুমে কুসুমে | ফুটিবে সে গান |
| ‖ | |
লতায় গাছে' ॥ (৬ + ৬ + ৫—মাত্রাবিন্যাস)

[ রেখা-চিহ্নিত শব্দগুলির মধ্যস্থিত যৌগিক অক্ষরে দুই মাত্রার সমবেশ হইয়াছে। ]

প্রতি পর্বে মাত্রা-পরিমাণ যেমন তানপ্রধান ছন্দে, তেমনি ধ্বনিপ্রধান ছন্দে ঠিক রাখিতে হয় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া **উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও বড় কম নয়।**

**প্রথমতঃ,** তানপ্রধান ছন্দে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুগ্মধ্বনিসমূহ হ্রস্ব—তাই একমাত্রিক, কিন্তু ধ্বনিপ্রধান ছন্দে যুগ্মধ্বনিমাত্রেই দীর্ঘ—তাই দ্বিমাত্রিক। **দ্বিতীয়তঃ,** তানপ্রধান ছন্দে অক্ষরধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিয়া একটি তানপ্রবাহ তথা টানের স্রোত সমগ্র চরণের মধ্যে প্রবলভাবে বহিয়া চলে; পক্ষান্তরে, ধ্বনিপ্রধান ছন্দে প্রত্যেকটি স্পষ্ট উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনিই হয় প্রকটিত। তানপ্রবাহ ধ্বনিপ্রধান ছন্দে না থাকায়, ইহাতে 'পয়ারের শোষণশক্তি'ও নাই। **তৃতীয়তঃ,** অক্ষরের দীর্ঘীকরণের ঝোঁকটি তানপ্রধান ছন্দের চেয়ে ধ্বনিপ্রধান ছন্দেই অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। বহু ক্ষেত্রেই ধ্বনিপ্রধান ছন্দে স্বভাবতঃই হ্রস্ব মৌলিক স্বরকে টানিয়া দীর্ঘরূপে উচ্চারণ করিতে হয়, নচেৎ ছন্দপতন অবধারিত। **চতুর্থতঃ,** তানপ্রধান বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে আছে **তানের বিস্তার**; পক্ষান্তরে, ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে আছে **ধ্বনির বিস্তার**—তাই স্বরধ্বনিগুলিকে প্রয়োজনমতে প্রসারিত করিয়া টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করিতে হয়। এজন্য ধ্বনিপ্রধান ছন্দটি **বিস্তারপ্রধান ছন্দ** নামেও পরিচিত হইয়া থাকে। **পঞ্চমতঃ,** ধ্বনিপ্রধান ছন্দের চেয়ে তানপ্রধান ছন্দেই অধিক মাত্রা-সংবলিত দীর্ঘ পর্বের সন্নিবেশ করা যায়। তানপ্রধান ছন্দে অসম মাত্রার পূর্ণ পর্ব ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু ধ্বনিপ্রধান ছন্দে পাঁচ, সাত প্রভৃতি অসম মাত্রার পূর্ণ পর্ব ব্যবহৃত হয়। **ষষ্ঠতঃ,** তানপ্রধান ছন্দ স্বভাবতঃই উদার-গম্ভীর বলিয়া ধীর লয়-সংবলিত উচ্চশ্রেণীর কবিতামাত্রেই ইহার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়; পক্ষান্তরে, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ মূলতঃ ললিতমধুর বলিয়া উচ্ছল গীতিস্পন্দিত কবিতামাত্রেই ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

## [ তিন ] শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ

যে-ছন্দের প্রত্যেকটি চরণের প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় একটি করিয়া শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত পড়ে, তাহার নাম **শ্বাসাঘাতপ্রধান** বা **স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ।** শ্বাসাঘাত পড়িবার ফলে পর্বস্থ শব্দের ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত অক্ষর হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্রিক হয়। এই শ্বাসাঘাত বা বলই স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দের পরম বৈশিষ্ট্য। শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে প্রতি পর্বে সাধারণতঃ চার মাত্রার সমাবেশ থাকে। চরণস্থ শেষ পর্ব অপূর্ণ এবং চরণে চারটি করিয়া পর্ব বিদ্যমান। অবশ্য প্রতি চরণে চারটি করিয়া পর্বসমাবেশের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এই ছন্দের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রায় প্রতি পর্বেই একটি করিয়া যুগ্মধ্বনির ব্যবহার হয়; অনেক ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও থাকে; কিন্তু তাহাতে ছন্দের মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়। শ্বাসাঘাত ও যুগ্মধ্বনির প্রভাবে এই ছন্দে একপ্রকার ধ্বনিতরঙ্গের প্রকাশও এই শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য এই ছন্দে সমধিক পরিমাণে বজায় থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রত্যেকটি পর্বের গোড়াতেই শ্বাসাঘাত পড়ে বলিয়া শ্বাসাঘাত-

**প্রধান** ছন্দের কিছুটা বৈচিত্র্যহানি ঘটিয়াছে। ইহাতে বেশি মাত্রার পর্ব একেবারে **অচল**। দীর্ঘস্বরের সঙ্গে যেন এই ছন্দের একটা সহজাত বৈরিতা আছে। স্বরধ্বনির পরিমিত সংখ্যার উপর এই ছন্দ নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকটি পর্বের স্বরধ্বনি গণনা করিলে মাত্রাবিন্যাসের একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায় বলিয়া ইহা **স্বরমাত্রিক** বা **স্বরবৃত্ত ছন্দ** নামে পরিচিত। আমাদের লোকসাহিত্য ও গ্রাম্য ছড়া এই ছন্দেই সাধারণতঃ রচিত হওয়ায় ইহা **ছড়ার ছন্দ** বা **লৌকিক ছন্দ** নামেও সুপরিচিত। এই ছন্দটি **দ্রুত লয়ের**। রবীন্দ্রনাথের 'পলাতক' কাব্যগ্রন্থে এই ছন্দের সার্থক রূপ পরিলক্ষিত হয়। রবিকবি দুইটি হইতে শুরু করিয়া পাঁচটি এমন কি ছয়টি পর্ব অবধি এক-একটি চরণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের দৃষ্টান্ত :

/। । । । । | /। । । । | /। । । । | /। ।।। |
[ক 'রাত্‌ পোহাল | ফর্‌সা হল | ফুট্‌ল কত | ফুল—' |

[এখানে চরণে চারটি পর্বের ব্যবহার লক্ষণীয়। ৪+৪+৪+৪—মাত্রাবিন্যাস। শেষের পর্বটি অপূর্ণ। এক মাত্রা আছে, কিন্তু বাকি তিন মাত্রাই উহ্য।]

/। । । । | /। । । । | /। । । । | /। । ॥ |
[খ] 'আমার ঘরে | ছুটির বন্যা | তোমার লাফে | ঝাঁপে |
/॥ । । | /। । । । | /। । । । | /। । ॥
কাজকর্ম | হিসাবকিতাব | থরথরিয়ে | কাঁপে'

[এখানেও চরণে চারটি পর্বের ব্যবহার লক্ষণীয়। ৪+৪+৪+৪—মাত্রাবিন্যাস। শেষের পর্বটি অপূর্ণ—দুই মাত্রার সমাবেশ আছে, কিন্তু বাকি দুই মাত্রা উহ্য। 'কাজ' দুই মাত্রার।]

/। । । । | /। । ॥ ||
[গ 'টয়ের মার | বিয়ে ||
/। । । । || /। । ॥ ||
নাল্‌ গামছা || দিয়ে' ||

[এখানে চরণে চারটির কম পর্বেরও ব্যবহার আছে। ৪+৪—মাত্রাবিন্যাস কিন্তু শেষের পর্বে দুই মাত্রা করিয়া উহ্য।]

/। । । । || /। । । । ||
[ঘ] 'খোকা নাচে || কোন্‌ খানে ||
/।।।। | /। । । । |
শতদলের | মাঝখানে' |

[এখানে প্রতি চরণের দুইটি পর্বই পূর্ণ। ৪+৪—মাত্রাবিন্যাস।]

/।। ।। ।।/।। ।।
[ঙ] '(আমি) সোনার বাঁশি | বাঁধিয়ে দেব |

/।। ।।।/।। ॥
মুক্তা থরে | থরে—'

[ এখানে অতি-মাত্রায় পর্বের ব্যবহার লক্ষণীয়। রেখা-চিহ্নিত অংশটি অতি-মাত্রার পর্ব। অতিরিক্ত অংশটি শ্বাসাঘাতের বহির্ভূত।]

**তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান ও শ্বাসাঘাতপ্রধান—এই ছন্দত্রয়ের পার্থক্য** স্বর-ধ্বনির প্রাধান্য, অক্ষরের হ্রস্বীকরণ বা দীর্ঘীকরণ ইত্যাদির আলোচনায় বুঝা যাইবে না। **পার্থক্যের ধারাটি মোটামুটি এইরূপ ঃ** শ্বাসাঘাতের দরুণ পর্বস্থিত শব্দের হলন্ত অক্ষর এক মাত্রিক, কিন্তু তানপ্রধান ও ধ্বনিপ্রধান ছন্দে হলন্ত অক্ষর সাধারণতঃ দ্বিমাত্রিক। তানপ্রধান এবং ধ্বনিপ্রধান ছন্দের পর্বগুলিতেও শ্বাসাঘাত পড়ে সত্য, কিন্তু ইহার প্রাবল্য শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দেই সবিশেষ পরিদৃষ্ট হয়। তাই তানপ্রধান ও ধ্বনিপ্রধান ছন্দের পর্বগুলি **Syllabic** অর্থাৎ অক্ষরবৃত্তিক এবং শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের পর্বগুলি **Stressed** অর্থাৎ ঝোঁক-সমন্বিত। তানপ্রধান ছন্দে স্বরধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিয়া অতিরিক্ত একটা স্বরপ্রবাহ বহিয়া থাকে, কিন্তু শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে ইহার স্থান নাই।

## ছন্দোলিপি (Scansion)

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উত্তর-সহ ছন্দোলিপি রচনা করিতে হইবে ঃ—

(১) ছন্দের নাম ও লয় ;
(২) চরণের পর্ব-বিভাগ ;
(৩) পর্বে মাত্রাবিন্যাস ;
(৪) চরণের পর্বগুলি সমমাত্রিক, না অসমমাত্রিক ;
(৫) স্তবকের চরণ সংখ্যা ;
(৬) অতিমাত্রার পর্বের ব্যবহার আছে কি না।

উদাহরণ ঃ—

।।।। ।। ।। | ।।। ।।। ।।
[ক] 'কোথাও-বা বন্যা এসে | ফসল গিয়েছে ভেসে

।।।। ।। ।।।।
তার সাথে সব আশা সাধ,

।।। ।।। | ।।। ।।। ।
কোথাও হয়নি বৃষ্টি | পড়েছে শনির দৃষ্টি

।।।। ।।। ।।।
জলাভাবে হয়নি আবাদ।' |

অক্ষরবৃত্তের দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ ও ধীর লয়; প্রতি চরণে তিনটি করিয়া পর্ব; পর্বের মাত্রাবিন্যাস—৮+৮+১০; সমমাত্রিক ও অসমমাত্রিক পর্বের ব্যবহার; দুই চরণের স্তবক

[খ] 'এল আঁধার, দিন ফুরালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
জয় করো এই । তামসীরে।'

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ও বিলম্বিত লয়; চরণে দুইটি করিয়া পর্ব; পর্বের মাত্রা-বিন্যাস—৫+৫, কিন্তু শেষ চরণের পর্বস্থ মাত্রাবিন্যাস ৬+৪; সমমাত্রিক ও অসমমাত্রিক—দুই প্রকার পর্বেরই সমাবেশ; চার চরণের স্তবক।

( ১১১ মাত্রা )
'খোকা গেছে মাছ ধর্‌তে দেব্‌তা এল জল্‌—
( ১১১ মাত্রা )
(ও) দেবতা তোর পায়ে ধরি খোকন্‌ আসুক্‌ ঘর'—

স্বরবৃত্ত ছন্দ ও দ্রুত লয়; প্রতি চরণে চারটি করিয়া পর্ব; পর্বের মাত্রাবিন্যাস—৪+৪+৪+৪, কিন্তু প্রত্যেক চরণের শেষ মাত্রাগুলি অপূর্ণমাত্রিক—এক মাত্রার সমাবেশ আছে, বাকি তিন মাত্রাই উহ্য; চরণের পর্বগুলি সমমাত্রিক; দুই চরণের স্তবক; দ্বিতীয় চরণের রেখা-চিহ্নিত অংশটি অতি-মাত্রার পর্ব।

## অনুশীলনী

[ এক ] যে-কোন তিনটির উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দাও:—পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, সনেট। যতি, পর্ব, স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ, অমিত্রাক্ষর।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৮, '৫৯**

[ দুই ] বাংলা পয়ার-ছন্দের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া তাহার বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ। **অথবা,** বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া তাহার প্রয়োগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ। **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৭**

[ তিন ] নিম্নের ছন্দঃশাস্ত্রীয় প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:—

'পর্ব' সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। **অথবা,** বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া 'স্তবক' সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। **রা. বি. মাধ্যমিক '৫৭**

[ চার ] "বাংলা ছন্দে ছেদ ও যতি—এই দুই রকম বিভাগস্থল স্বীকার করিতে হইবে।" বাংলা ছন্দে এই উভয়ের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনপূর্বক বিস্তারিত আলোচনা কর।

**ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬**

[ পাঁচ ] বাংলা ছন্দোবিভাগে 'পর্ব' ও 'পর্বাঙ্গ' কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও। অক্ষরবৃত্তে ও মাত্রাবৃত্তে প্রভেদ কি? উদাহরণ-সাহায্যে উভয়ের ব্যবহার স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ কর। **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫**

[ ছয় ] 'যতি' কাহাকে বলে? বাংলা ছন্দে 'যতির' বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। **অথবা,** বাংলা পয়ার জাতীয় ছন্দে স্বরের ঝংকারের প্রাধান্য নির্ণয় কর।

**ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫২**

[ সাত ] 'অক্ষর-সংখ্যা বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয়।'—বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে এই মন্তব্য কতদূর সংগত তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্ত-সহযোগে আলোচনা কর। **অথবা,** ছন্দঃ-শাস্ত্রে মাত্রার তাৎপর্য কি? বাংলা ভাষায় অক্ষরের মাত্রা স্থির অর্থাৎ পূর্বনির্দিষ্ট কিনা তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাও। **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫১**

[ আট ] শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের মাত্রাবিচার-পদ্ধতি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। **অথবা,** যতি কাহাকে বলে? 'যতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের ঐক্যবোধ জন্মে' —কথাটিব অর্থ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। **ক. বি. বি. এ. ( পাস ) '৫৮**

[ নয় ] ছন্দের ভিতরে শোষণ-শক্তি দ্বারা কি বোঝা যায়? উপযুক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। **অথবা,** পর্ব ও পর্বাঙ্গ কাহাকে বলে? নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিকে পর্ব-পর্বাঙ্গে ভাগ কর :—

মৃত্যুর নিভৃত স্নিগ্ধ ঘরে
বসে আছ বাতায়ন 'পরে,
জ্বালায়ে রেখেছ দীপখানি
চিরন্তন আশায় উজ্জ্বল। **ক. বি. বি এ. ( পাস ) '৫৮**

[ দশ ] পয়ার ছন্দ হইতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। **অথবা,** ধ্বনিপ্রধান ছন্দে ধ্বনির প্রাধান্য সর্বত্রই কিভাবে স্বীকার করিতে হয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। **ক. বি. বি. এ. ( পাস ) '৫৭**

[ এগারো ] বাংলা ছন্দের বিচারে হ্রস্বমাত্রা ও দীর্ঘমাত্রা এইরূপ ভেদ করা চলে কি? এ-বিষয়ে আলোচনা কর। **অথবা,** বাংলা ছড়ার ছন্দের বৈশিষ্ট্য কি? দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া বল। **ক. বি. বি. এ. ( পাস ) '৫৬**

[ বারো ] বাংলা ছন্দে মৌলিক স্বর ও যৌগিক স্বর কাহাকে বলা হয়? মৌলিক স্বর এবং যৌগিক স্বরের মাত্রাবিচার সাধারণতঃ কিরূপ হইয়া থাকে, উপযুক্ত দৃষ্টান্তের

সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। **অথবা,** ধ্বনিপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য কি? এই ঢঙের ছন্দে মাত্রা-হিসাবের পদ্ধতি কি? দৃষ্টান্তের দ্বারা তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।

**ক. বি. বি. এ. ( পাস ) '৫৫**

[ তেরো ] বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ গ্রহণ করিবার কৌশল কি? একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার বক্তব্য পরিস্ফুট কর। **অথবা,** পয়ার ছন্দ হইতে ধ্বনিপ্রধান ছন্দের পার্থক্য কিরূপে নির্ধারণ করা যায় তাহা ভালভাবে বুঝাইয়া দাও।

**ক. বি. বি. এ. ( অনার্স ) '৫৯**

[ চোদ্দ ] বাংলা ছড়ার ছন্দের বৈশিষ্ট্য কি? উদাহরণসহ আলোচনা কর। **অথবা,** মাত্রাবিচারের জন্য বাংলা অক্ষরের ( Syllable ) কিরূপ শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে? প্রত্যেকটি বিভাগের উদাহরণ দাও। **ক. বি. বি. এ. ( অনার্স ) '৫৮**

[ পনেরো ] বাংলা কবিতার ছন্দকে তিনটি 'বৃত্তে' ভাগ না করিয়া তিন 'ঢঙ্'-এর বলিয়া বর্ণনা করিবার সার্থকতা কি? সংক্ষেপে এই বিষয়ে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা কর। **অথবা,** রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' বা 'পলাতকা'র কবিতার ছন্দোবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। **ক. বি. বি. এ. ( অনার্স ) '৫৭**

[ ষোলো ] বাংলা পয়ার ছন্দ, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও গদ্য ছন্দের পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। **অথবা,** বাংলার কোন্ জাতীয় ছন্দের কোনও রূপ শোষণ-শক্তি নাই? শোষণ-শক্তি না থাকিবার ফলে মাত্রার বিচার কিরূপ হইয়া থাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। **ক. বি. বি. এ. ( অনার্স ) '৫৭**

[ সতেরো ] নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির উদাহরণ-যোগে ব্যাখ্যা কর:—ছন্দ; অক্ষর; মিত্রাক্ষর; অমিত্রাক্ষর; শ্বাসাঘাত; ছেদ; চরণ; স্তবক।

[ আঠারো ] বাংলা ছন্দের প্রকার কয়টি? উদাহরণ-সহযোগে তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

[ উনিশ ] দৃষ্টান্ত-সহযোগে নিম্নলিখিত ছন্দগুলির পরিচয় লিখ:—মালঝাঁপ পয়ার; পর্যায়সম পয়ার; মধ্যসম পয়ার; প্রবহমান পয়ার; ধাবমান পয়ার; লঘু ত্রিপদী; দীর্ঘ ত্রিপদী; দীর্ঘ চৌপদী; একাবলী; দীর্ঘ একাবলী; অমিল ও সমিল অমিত্রাক্ষর; মহাপয়ার-ভিত্তিক অমিত্রাক্ষর; সনেট; গৈরিশ ছন্দ।

[ কুড়ি ] নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির পর্ব ভাগ করিয়া দেখাও। ইহাতে কোথায় কোথায় যতি পড়িয়াছে?

> **জন্ম বৃথা! কর্ম বৃথা! বৃথা বংশখ্যাতি!**
> **কীর্তিমান্ জনকের পুত্র হওয়া বৃথা,**
> **স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্বলোকে—**
> **জীবনে জীবন-অন্তে চিরস্মরণীয়!**

**ক. বি. বি. টি. '৫৬**

[একুশ] ছন্দোবিভাগ কর এবং বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর :—

(ক) আজ্‌কে তোমায় দেখ্‌তে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান!
সন্ধ্যা-রাতের অন্ধকার আজ জোনাক্‌-পোকায় স্পন্দমান!
বাংলা থেকে দেখতে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,
ইরাণ দেশের শকুন্তলা! কই সে তোমার রূপ অতুল?

**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৬**

(খ) অবগাহি' নীল পাবন প্রবাহে এ-অধম আজি ধন্য,
উধাও ছুটিছে মানস-তুরগ লঙ্ঘিয়া মায়ারণ্য।
আরাত্রিকের উদার শঙ্খ
ঘোষিছে কাহার অভয়-ডঙ্ক,
কোথা হিরণ্যবর্ণ মহান্, সৌম্য সুপ্রসন্ন? **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫**

[ বাইশ ] নিম্নের উৎকলিত অংশগুলির মধ্য হইতে যে-কোন একটির ছন্দো-বিশ্লেষণ কর :—

(১) উঠ্‌তি-বেলা পড়্‌তি-বেলা খেলছে খেলা দুই পাথায়,
কাজের খেলা নেইকো শুরু-শেষ।
আঁক্‌ছি ছবি আকুল প্রাণে বুলিয়ে তুলি ভুল-রেখায়
আলো-ছায়ার আব্‌ছা নিরুদ্দেশ॥

(২) হলুকুমে হানে তেগ ও কে বসে ছাতিতে?—
আফ্‌তাব ছেলে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে॥
আসমান ভরে গেল গোধুলিতে দুপুরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে॥

(৩) বউদের আজ কোন কাজ নাই, বেড়ায় বাঁধিয়া রসি,
সমুদ্রকলি শিকা বানাইয়া নীরবে দেখিছে বসি।
কেউবা রঙীন কাঁথায় মেলিয়া বুকের স্বপনখানি,
তারে ভাষা দেয় দীঘল সূতার মায়াবী আখর টানি।

**বা. বি. মাধ্যমিক '৫৭**

[ তেইশ ] যে কোন দুইটি বাক্যাংশের ছন্দোবিশ্লেষণ কর এবং অতি সংক্ষেপে সেই ছন্দের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর :—

(ক) আজ মনে হয় রোজ রাতে সে ঘুম পাড়াত নয়ন চুমে',
চুমুর পরে চুমু দিয়ে ফের হান্‌ত আঘাত ভোরের ঘুমে।
ভাব্‌তুম তখন এ কোন্‌ বালাই!
কর্‌ত এ প্রাণ পালাই পালাই।
আজ সে কথা মনে হ'য়ে ভাসি অঝোর নয়ন-ঝারে!
অভাগিনীর সে গরব আজ ধুলায় লুটায় ব্যথার ভারে॥

(খ) নীল নবঘন আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাইরে।

বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউশের খেতে জলে ভরভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে, দেখ চাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাইরে

(গ) দ্রাক্ষাপায়ী পারসীক
গোলাপকাননবাসী তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশি দিনমান
কর্ম-অনুরত,—সকলের ঘরে ঘরে
জন্ম লাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।

(ঘ) দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে।
তুরঙ্গম-অশ্বন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায়রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে। **রা. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫৬**

**[ চব্বিশ ]** যে কোনও দুইটির ছন্দোলিপি কর ঃ—

(ক) চম্পক দাম হেরি চিত অতি শঙ্কিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তর জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥

(খ) তটিনী-পারে অন্ধকারে
ক্রৌঞ্চসম বুঝিরে;
এপারে আমি ওপারে তুমি
ডাকিয়া দোঁহে খুঁজিরে।

(গ) তোমার এ দূত অন্ধকার
গোপনে আমার
ইচ্ছারে করিয়া পঙ্গু গতি তার করেছে হরণ,
জীবনের উৎসজলে মিশায়েছে মাদক মরণ।

(ঘ) থীর বিজুরি বরণ গৌরী
পেখলুঁ ঘাটের কূলে।
কানড় ছান্দে কবরী বান্ধে
নবমল্লিকার মালে॥

(ঙ) হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দনবৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?

(চ) কল্লোলে ভরে কান,
কণ্ঠে কাঁদিছে গান,
চিতার আলোকে আঁখি
রাঙায় অন্ধকার রাতি গো।

(ছ) একে কুল কামিনী     তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর     বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর ॥

(জ) ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।

(ঝ) ইন্দ্রলোকের রীত একি!
লুকিয়ে যেতে আস্‌তে হয়!
দেবতা হয়েও তোর, দেখি,
লুকিয়ে ভালো বাস্‌তে হয়!

(ঞ) চন্দন-তরু যব     সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব     নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি ॥

(ট) অন্ধ যে, কি রূপ কভু তার চক্ষে ধরে
নলিনী? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে?
কি কাক, কি পিকধ্বনি সমভাব তার।

(ঠ) উড়িয়ে ধোঁয়া ঘুরিয়ে ধোঁয়া
আকাশে আঁকি গাঙ
ভস্মাবৃত বহ্নি আর
রাংতা-মোড়া রাঙ্।

(ড) অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ।
করযোড়ে মাধব মাগে পরসাদ ॥
নয়নে গড়য়ে লোর গদগদ বাণী।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥

(ঢ) নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘবভিখারী
বধিল সম্মুখরণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

(ণ) কেবা শোনে কার কথা? কাঁদিসনে ফুঁপিয়ে;
কোপের উপরে কোপ ফ্যাল ঝুপ্ ঝুপিয়ে!
কোদালের মুখ হ'তে নে-রে চাপ লুফিয়ে,
চল্ মাটি কুপিয়ে:—
চৌকোর চার কোণ ঠিক মাপ জুপিয়ে।

**ক. বি. বি. এ. (পাস) '৫৯, '৫৮, '৫৭, '৫৬, '৫৫**

[ পঁচিশ ] যে কোনও **দুইটির** ছন্দোলিপি কর এবং উহাদের ছন্দোবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও :—

(ক) শীত-আতপ বাত-বরিখণ
এ দিন-যামিনি জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি রে॥

(খ) "প্রভু বুদ্ধ লাগি' আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি",—
অনাথ-পিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-
নিনাদে।

(গ) নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধারী রাঘবভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

(ঘ) কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

(ঙ) শ্রাবণের বৃষ্টিধারা, শরতের শিশিরের কণা,
প্রাণের প্রথম অভ্যর্থনা।
জন্ম সেই
এক নিমিষেই
অন্তহীন দান,
জন্ম সে যে গৃহমাঝে গৃহীর আহ্বান।

(চ) আহা, ঠুকরিয়ে মধু কুলকুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুলবুলি ;—
টুলটুলে তাজা ফলের নিটোলে
টাট্‌কা ফুটিয়ে ঘুলঘুলি।

(ছ) কুন্দ-বল্লী তরু ধরল নিশান।
পাটল তুণ অশোক-দল বাণ॥
কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির-ঋতু আগে দিল ভঙ্গ

(জ) প্রাণ্‌-প্রণবের দ্রষ্টা নব!
গানে সে অসপত্ন তব,—
অমৃত-সমুদ্ভব! জয়! জয়!
যুবন্‌ প্রাণের গাও আরতি,—

যে প্রাণ বনে বনস্পতি,
নবীন সবনের ব্রতী ! জয় ! জয় !

(ঝ) বাজ্‌ছে শূন্যে অভ্র-কম্বু
কাঁপ্‌ছে অম্বর কাঁপ্‌ছে অম্বু ;
লক্ষ ঝর্ণায় উঠ্‌ছে ঝংকার
"ওম্ স্বয়ম্ভু !" "ওম্ স্বয়ম্ভু !"

(ঞ) চঞ্চল চরণ কমল-তলে ঝংকরু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর ॥

(ট) কে নারী অঙ্গনে এলো, চিনতে না পারি।
অঙ্গনে দাড়াইয়ে—এ নয় আমার প্রাণকুমারী।
দশ দিক্ দীপ্ত-করা, এ রমণী দশ-করা,
বিবিধ আয়ুধ-ধরা, দনুজ-দলনী হেরি।

(ড) ঢং ঢং ও কৈলাসচূড়া ক্রাং ক্রাং—
হিমজটা বিগলিত গঙ্গা—য়াংসিকিয়াং,
হর হর হর থর গোমুখীপ্রপাতে
ভেসে-আসা পারিজাত পরে উমা খোঁপাতে।

ক. বি. বি. এ. ( অনার্স ) '৫৯, '৫৮, '৫৭, '৫৬

[ ছাব্বিশ ] নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশ দুইটি মিত্রাক্ষর-বর্জিত। উভয়ের মধ্যে ছন্দোগত কোন মৌলিক পার্থক্য আছে কি ?

(অ) যোজন সহস্র কোটি পরিধি বিস্তার—
বিস্তৃত সে রসাতল বিধূনিত সদা,
চারিদিক ভয়ংকর শব্দ নিরন্তর
সিন্ধু আঘাতে স্বতঃ নিয়ত উত্থিত।

(আ) স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে।
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে,
কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকুলে ?

ক, বি. বি. এ. (পাস) '৫১

[ সাতাশ ] মুক্তবন্ধ ছন্দ ( Free Verse ) কাহাকে বলে ? নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশটি মুক্তবন্ধ ছন্দে রচিত হইয়াছে কি ?

যতটুকু পাই ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে
নাই বা উচ্ছলিল,
সারা জীবনের দৈন্যের শেষে সঞ্চয় সে যে
সারা জীবনের স্বপ্নের আয়োজন।'

—রবীন্দ্রনাথ।

**অথবা,** নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশটিতে কোন ছন্দোদোষ আছে কিনা বিচার কর :—

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা।
ইটের পরে ইট মাঝে মানুষ-কীট,
নাই কো ভালবাসা নাই কো খেলা।

[ আটাশ ] ছন্দোলিপি রচনা কর ও ছন্দোবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও :—

(ক) লট্ট পট্ট দীর্ঘ জট্ট মুক্তকেশজালিকে।
ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচণ্ডভালিকে॥ —ভারতচন্দ্র।

(খ) ফলকের, ঝলকের, আলোকের ছাঁদ।
যেন জলে, সিন্ধুজলে, তারাদলে চাঁদ॥ —রঙ্গলাল।

(গ) শোকের ঝড় বহিল সভাতে;
শোভিল চৌদিকে সুরসুন্দরীর রূপে
বামাকুল; মুক্তকেশে মেঘমালা; ঘন
নিশ্বাস প্রবল বায়ু, অশ্রুবারিধারা
আসার; জীমূতমন্দ্র হাহাকার-রব। —মধুসূদন।

(ঘ) আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি. কালানল
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল।
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি' ভুবনে সহসা সঞ্চারি' ভূমিকম্প। —নজরুল।

(ঙ) সেই নদী-তটে দাঁড়ায়ে কখনো হেরিব সুদূর পারে
ক্ষীণ বালু-লেখা কল-ঢেউ সনে দুলিছে রূপালী হারে। —জসীম উদ্দীন।

(চ) হায়!
হৃদয় শুকায়!
নাহি বল, নাহিক সম্বল,
অন্তরে আনন্দ নাই, চক্ষে নাহি জল!
মূক হয়ে আছে মন, দীর্ঘশ্বাসে অবসান গান,
বিস্মৃত সুখের স্বাদ হৃদি অনুৎসক,—ধুক্ ধুক্ করে শুধু প্রাণ।
কে করিবে অনুযোগ? দেবতার কোপ; কোথা বা করিবে অনুযোগ?
চারিদিকে নিরুৎসাহ, চারিদিকে নিঃস্ব নিরুদ্যোগ।
নাহি বাষ্পবিন্দু নভে,—বরষা সুদূর;
দগ্ধ দেশ তৃষায় আতুর,
ক্লান্ত চোখে চায়;
হায়! —সত্যেন্দ্রনাথ।

# দ্বিতীয় খণ্ড

## অনুবাদ

### অবতরণিকা

একটি ভাষার বক্তব্য বিষয়কে অপর ভাষায় যথাযথভাবে রূপান্তরিত করা খুবই আয়াসসাধ্য ব্যাপার। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ভাষারই আছে ভাব-প্রকাশের নিজস্ব রীতি, বাক্যগঠনের স্বতন্ত্র পদ্ধতি, শব্দ ও বাক্যাংশ-বিশেষের বিশিষ্ট অর্থ। তাই দেখি,—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদ নিছক কথার কথার মানে হইয়া দাঁড়ায়, সাহিত্যরসমধুর হয় না। এ কথা খুবই সত্য যে, অনুবাদককে উভয়-সংকটের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। মূল ভাষার যথাযথ অনুবাদও যেমন চাই, আবার অনুবাদ-ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং সৌন্দর্যও তেমনি চাই। প্রথম প্রথম অনুবাদ-শিক্ষার্থীর নিকটে ভাষা অস্পষ্ট, দুর্বল ও আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে, মূল ভাষার ভাব ও ব্যঞ্জনা ঠিক মত বজায় থাকিবে না সত্য, কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। অভ্যাসবশে অনুবাদ সার্থকতায় ভরিয়া উঠিবে। অনুবাদকালে মূল ভাষার বাক্যগঠনরীতি ও বাগ্বিধি অনুবাদকের অনুবাদপ্রয়াসী বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এহেন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে থাকিয়াও **যে-অনুবাদক মূলের সহিত অনুবাদের যাথার্থ্য বজায় রাখিয়া অনুবাদভাষার রীতি, সংগতি ও সৌন্দর্য পূর্ণমাত্রায় পরিবেশন করিতে পারে, সেই অনুবাদকই যথার্থ অনুবাদক এবং তাহার অনুবাদই সার্থক অনুবাদ।**

অনুবাদ-সমস্যার স্বরূপ ও সার্থক অনুবাদের লক্ষণ

অনুবাদ আক্ষরিক অনুবাদ হইবে, না ভাবানুবাদ হইবে—ইহাই লইয়া ছাত্র-ছাত্রীরা বড়ই বিপাকে পড়িয়া থাকে। পরীক্ষাপত্র পরীক্ষা করিবার কালে দেখি, আক্ষরিক অনুবাদ সম্পর্কে যাহারা চরমপন্থী, তাহারা বাংলা হরফে লিখে সত্য, কিন্তু তাহাদের দুর্বোধ্য আড়ষ্ট ভাষার মধ্যে বক্তব্য বিষয়টি তলাইয়া যায়; আবার ভাবানুবাদ সম্বন্ধে যাহারা চরমপন্থী, তাহারা ভাবের পাথ্‌নায় ভর দিয়া এমন ভাবে চলে যে, মূলের বক্তব্য বিষয়ের সহিত অনুবাদের বক্তব্য বিষয়ের যোগসূত্র বাহির করা কঠিন হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, এরূপ অনুবাদ একেবারেই অচল।

আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ

অনুবাদ যথাসম্ভব আক্ষরিক হওয়াই উচিত। তবে আক্ষরিক অনুবাদ করিবার ফলে অনুবাদ-ভাষার আত্মধর্ম যেন কোন রকমেই ক্ষুণ্ণ না হয়। ইংরাজি অনুচ্ছেদের বাংলা অনুবাদে বাংলা ভাষার নিছক আত্মধর্ম—তাহার স্বতন্ত্র শব্দসম্পদ, বাগ্‌ধারা ও বাক্যগঠনপ্রণালী—যেন বজায় থাকে। আসল কথাটি এই যে, যে-ভাষাতেই অনুবাদ করা যা'ক্ না কেন, সেই ভাষার নিজস্ব রীতি, সংগতি ও শ্রুতিমাধুর্যও যেমন চাই, আবার অনুবাদেও তেমনি যথাযথতা বা যথার্থতা থাকা চাই। এক কথায় বলা যায় যে, অনুবাদ যথাসম্ভব আক্ষরিক হইলেও, অনুবাদ-ভাষার আত্মধর্মের তাগিদের দরুণ ভাবানুবাদকে একেবারে পরিহার করা চলে না। এই মধ্যপন্থী রীতিই সার্থক অনুবাদের বাহন। এই যোগ্য বাহনটিকে বাগ্ মানাইতে হইলে পরীক্ষার্থী পরীক্ষার্থিনীকে নিয়মিত ভাবে অনুবাদ আরম্ভ করিতে হইবে। অতঃপর অনুবাদকে অনুবাদ বলিয়া যখন মনে হইবে না, অনুবাদ যখন মূলেরই ন্যায় স্বাধীন ও মৌলিক রচনা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তখনই অনুবাদক-অনুবাদিকার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইবে।

মধ্যপন্থা পদ্ধতিই সার্থক অনুবাদের বাহন

অনুবাদের ভাষা কিরূপ হইবে, ইহা লইয়াও সমস্যা আছে। আমার মনে হয় মূলের ভাষার উপরেই অনুবাদের ভাষা নির্ভর করে। মূলের ভাষা যদি হয় সহজ, সাবলীল ও লীলায়িত, তাহা হইলে অনুবাদের ভাষাও হওয়া উচিত প্রাঞ্জল, বেগবান ও লীলাচঞ্চল। আবার মূলের ভাষা যদি হয় গুরুগম্ভীর ওজস্বিনী ও গূঢ়ার্থক, তাহা হইলে অনুবাদের ভাষাও হওয়া উচিত গুরুগম্ভীর ওজস্বিনী ও গূঢ়ার্থক। সম্প্রতি কথ্য ভাষায় অনুবাদ করিবার ঝোঁকও দেখা দিয়াছে। কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কথ্য ভাষায় অনুবাদ আদৌ অনায়াসসাধ্য নয়। সাধু ও মার্জিত ভাষায় অনুবাদ করিতে করিতে অনুবাদের হাত যখন পাকা হইয়া উঠিবে, কেবলমাত্র তখনই কথ্য ভাষায় অনুবাদ করিতে যাওয়া সমীচীন, তৎপূর্বে নয়। কাহিনীর কথনবিন্যাসের কালে কথ্যভাষার প্রয়োগ সাহিত্যরস সঞ্চারিত করে। এরূপ সুযোগ থাকিলে অনুবাদে কথ্যভাষার প্রয়োগ রচনারীতির শ্রী ও সৌষ্ঠব বাড়াইয়া তুলে।

অনুবাদের ভাষা

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ইংরাজি অনুচ্ছেদের বাংলা অনুবাদ করিতে বলা হয়। অনুবাদে থাকে সাধারণতঃ পনেরো নম্বর। কখনও-বা সঠিক অনুবাদের নিমিত্ত দশ নম্বর আর রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্যের উপরে পাঁচ নম্বর, এইভাবে পনেরো নম্বরের পূর্ণমান ধরিয়া থোক নম্বর দিবার নির্দেশ থাকে। আবার কখনও-বা ভাষান্তরিত অনুচ্ছেদের প্রতিটি বাক্যে স্বতন্ত্রভাবে নম্বর দেওয়া হয় এবং অনুবাদ-প্রশ্নের উত্তরের বাম দিকে ঐ স্বতন্ত্র নম্বরসমূহের মোট সংখ্যা লিখিত হয়; তদুপরি বাক্যের পর

বাক্য পরীক্ষা করিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে নম্বর দিবার পরেও, সমগ্র অনুবাদ সম্পর্কে পরীক্ষক বা পরীক্ষিকা যে অখণ্ড ধারণা পোষণ করেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি বাক্যপরম্পরায় প্রদত্ত নম্বরসমূহকে আর একবার মিলাইয়া লইয়া প্রয়োজনমত পরিবর্তন করেন। নম্বর দিবার এই পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে, অনুবাদে মূলের বাক্যগত বক্তব্য বিষয়ের যথার্থতা ও অনুবাদভাষার আত্মধর্ম্ম উভয়ই বজায় রাখা চাই। অতএব, তাড়াতাড়িতে সমগ্র অনুচ্ছেদের অধম অনুবাদ করা অপেক্ষা সতকর্তা-সহকারে কয়েকটি বাক্যের উত্তম অনুবাদ করাও শ্রেয়তর।

পরীক্ষায় অনুবাদে নম্বর দিবার নিয়ম ও সেই নিয়মানুসারে অনুবাদ রচনা

সার্থক অনুবাদ করিতে হইলে, ছাত্রছাত্রীগণকে নিম্নলিখিত উপদেশগুলি সম্পর্কে অতীব সচেতন থাকিতে হইবে ঃ—(ক) কোন্ অনুচ্ছেদটি অনুবাদ করিবে, তাহা প্রথম অথবা দ্বিতীয় বার পড়িবার পর সাব্যস্ত কর। (খ) সমগ্র অনুচ্ছেদ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পড়িয়া বাক্যপরম্পরাগত বক্তব্য বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা কর। যে সকল শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ তুমি জান না, তাহাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বক্তব্য বিষয়াদি বুঝিয়া লইয়া উহাদের যথাযোগ্য অর্থ অনুমান কর। (গ) অনুচ্ছেদটি অন্ততঃ-পক্ষে চার বার পড়। (ঘ) মূলের গুরুত্বপূর্ণ গুরুহার্থক শব্দ ও বাক্যাংশাদির নীচে দাগ কাট এবং অনুবাদকালে তাহাদের যথাযোগ্য অবস্থান্তর কর। (ঙ) বঙ্গানুবাদে বাংলা বাক্যগঠনপ্রণালীকে ও বাংলা বাগ্বিধিকে অনুসরণ কর। (চ) ইংরাজি রচনা-রীতির অন্তর্গত Phrase, Clause এবং Compound words-কে বাংলায় যথাসম্ভব সমাসবদ্ধ পদাদির সাহায্যে অনুবাদ কর। (ছ) ইংরাজির Direct Narration এবং Indirect Narration-কে বাংলায় যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তির মাধ্যমে অনুবাদ কর। (জ) মূলে যে বাচ্য ও ক্রিয়ার প্রকার থাকিবে, অনুবাদেও সেই বাচ্য ও ক্রিয়ার প্রকার রক্ষা কর। (ঝ) বাংলা বাক্যে অনেক সময় ক্রিয়াপদ দিবার প্রয়োজন নাই। বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার খুবই বেশি। তবে পর পর কতকগুলি অসমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে রচনা শ্রুতিকটু হয়—এই কথাগুলি স্মরণ রাখিও। (ঞ) মূলের জটিল ও মিশ্র বাক্যকে অনুবাদেও যতটা সম্ভব রক্ষা কর। যদি এরূপ করিতে নাই পারা যায় তো অনুবাদে ইহাকে পৃথক্ পৃথক্ সরল ও যৌগিক বাক্যাদিতে রূপান্তরিত কর। (ট) ইংরাজি বাক্যের শেষাংশ বাংলা বাক্যের প্রথমাংশ-রূপে আসিবার দাবি করিতেছে কিনা, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া যথাযথ ভাবে বঙ্গানুবাদ কর। (ঠ) যে সকল ইংরাজি পারিভাষিক শব্দের বাংলা পরিভাষা

অনুবাদ-রচনা সম্পর্কে ইতিবাচক ত্রয়োদশ নির্দেশ

সুপ্রচলিত, তাহা লিখ। পক্ষান্তরে, যেখানে বাংলা পরিভাষা সুস্থির নয়, সেখানে ইংরাজি পারিভাষিক শব্দকেই বাংলা বানান দিয়া লিখ। (ড) প্রথমে সমগ্র অনুচ্ছেদের একটি খসড়া অনুবাদ কর ; তারপর মূলের ভাবের সহিত এই অনুবাদের ভাবসংগতি আছে কিনা, তাহাই বাক্য-পরম্পরায় বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনমত সংশোধন কর। সংশোধন-শেষে অনূদিত অনুচ্ছেদকে পরিষ্কার করিয়া লিখ।

ইহা ছাড়া, আরও কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীকে অবহিত হইতে হইবে :—( ক ) মূলের বাক্যগঠনরীতি ও বাগ্বিধিকে অনুবাদে হুবহু অনুসরণ করিও না। (খ) অনুবাদকালে মূলের একটি বাক্যের সঙ্গে অপর বাক্যকে জুড়িয়া দিও না। (গ) অনুবাদকালে মূলের ব্যাখ্যা অথবা ভাবার্থ লিখিও না। (ঘ) মূলের কোন বিশেষ শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্যের অর্থ বুঝিতে না পারিলে হতাশ হইও না। ( ঙ ) ইংরাজি নাম বাংলায় অনুবাদ করিও না। (চ) ইংরাজি ভাষার নিজস্ব বাক্-পদ্ধতি ও বাক্যাংশের আক্ষরিক অনুবাদ করিও না। কারণ,—এরূপ অনুবাদের ফলে অর্থহীন ও হাস্যকর অবস্থা গড়িয়া উঠে। পক্ষান্তরে, আক্ষরিক অনুবাদের স্থলে ভাবানুবাদ করিলে ভাষার নিজস্ব রীতি ও সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়া রচনাকে সাহিত্যপদবাচ্য করিয়া তুলে।

অনুবাদ-রচনা সম্পর্কে নেতিবাচক ষষ্ঠ নির্দেশ

পরিশেষে, ছাত্রছাত্রীগণকে আর একটি কথা জানাইয়া রাখি। অনুবাদকে যাচাই করিয়া লইবার একটি চমৎকার পদ্ধতি আছে। মনে মনে বঙ্গানুবাদের ভাষাকে পুনরায় অনুবাদ করিয়া মূল ইংরাজি ভাষার আত্মধর্মে তথা বাক্যগঠনপ্রণালী ও বাগ্বিধিতে যদি ফিরিয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে বাংলায় কৃত অনুবাদের যাথার্থ্য সার্থকতা ও গৌরব বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। অনুবাদের সার্থকতা বিচারের এই ক্রিয়াকাণ্ডটিকে রাসায়নিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যায় যে, ইহাই অনুবাদের "য়্যাসিড্ টেস্ট্"।

অনুবাদ-ক্রিয়ার "য়্যাসিড্ টেস্ট্"

# প্রথম অধ্যায়

## সহজ অনুচ্ছেদাদির অনুবাদ

### [ এক ]

A certain Knight growing old, his hair fell off and he became bald, to hide which imperfection he wore a wig. But as he was riding out with some others a-hunting, a sudden gust of wind blew off the wig and exposed his bald pate (head). The company could not forbear

laughing at the accident ; and he himself laughed as loud as anybody, saying, "How was it to be expected that I should keep strange hair upon my head, when my own could not stay there ? "

*C. U. Inter. (Arts) '59*

বৃদ্ধ হইয়া পড়িলে কোন একজন নাইটের মাথার চুলগুলি খসিয়া পড়িল এবং তাঁহার মাথায় টাক পড়িল—যে দোষটি ঢাকিবার জন্য তিনি একটি পরচুলা পরিলেন। কিন্তু কয়েকজন সঙ্গী লইয়া তিনি যখন ঘোড়ায় চড়িয়া শিকারে যাইতেছিলেন, সহসা দমকা বাতাস আসিয়া তাঁহার পরচুলাটি উড়াইয়া লইয়া গেলে টাক-পড়া মাথাটি বাহির হইয়া পড়িল। দুর্ঘটনায় সঙ্গিদল না হাসিয়া থাকিতে পারিল না ; এবং তিনি নিজেও অপর সকলের ন্যায় উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমার নিজের চুল যেখানে থাকিতে পারে নাই, সেখানে অপরের চুল যে আমার মাথায় রাখিতে পারিব—তাহা কেমন করিয়া প্রত্যাশা করিতে পারা যায় ?"

[ দুই ]

As to the books which you should read, there is hardly anything definite that can be said. Any good book, any book that is wiser than yourself, will teach you something, indirectly and directly, if your mind be open to learn. This old counsel of Johnson's is also good and universally applicable. "Read the book you do honestly feel a wish and curiosity to read." Flimsy desultory readers who fly from foolish book to foolish book, get good of none and mischief of all.

*C. U. Inter. (Arts) '59*

কোন্ কোন্ বই তোমাদের পড়া উচিত—এবিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু বলা যায় না। যদি তোমার মন জ্ঞানলাভের জন্য উৎসুক থাকে, তাহা হইলে তোমার যতটা জ্ঞান তাহার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানপূর্ণ যে কোন বই—যে কোন ভাল বই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তোমাকে কিছু শিক্ষা দিতে পারে। "যে বই সম্বন্ধে তোমার প্রকৃত ইচ্ছা ও কৌতূহল জাগে সেই বই পড়িবে"—জনসনের এই প্রাচীন উপদেশটিও ভাল এবং সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পল্লবগ্রাহী অব্যবস্থ পাঠকেরা, যাহারা কোন একখানি বাজে বই হইতে আর একখানি বাজে বইএর দিকে ছুটিয়া যায়, তাহারা কোন বই হইতেই উপকার পায় না, বরং সব কয়খানি বই হইতেই অপকার পাইয়া থাকে।

[ তিন ]

The invention of writing was of a very great importance in the development of human societies. It put agreements, laws, commandments on record. It made a continuous historical consciousness possible. The command of the priest or king and his seal could go far beyond his sight and voice and could survive his death. It is interesting to note that in ancient Sumeria seals were greatly used. A king or nobleman would have his seal very artistically carved, and would impress it on any clay document he wished to authorise.

*C. U. Inter. (Science) '59*

মানব-সমাজের উন্নয়নে লেখার আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহা চুক্তি, আইন ও রাষ্ট্রবিধিকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইহারই দ্বারা অনবচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক চেতনাবোধ সম্ভব হইয়াছে। রাজা কিংবা ধর্মযাজকের আদেশ এবং তাঁহার নামাঙ্কিত মোহর তাঁহাদের দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বরের বাহিরে প্রসারিত হইয়া তাঁহাদের মৃত্যুর পরও বর্তমান থাকিত। একথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন সুমেরিয়াতে সীলমোহরের বহুল ব্যবহার ছিল। কোন রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত শিল্পসম্মতভাবে সীলমোহরটি খোদাই করাইতেন এবং তিনি যে মৃত্তিকার উপর লিখিত দলিলকে স্বীকৃতিদান করিতে চাহিতেন তাহার উপর ইহার ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিতেন।

## [ চার ]

Experience will tell any man, that he is most successful in his own pursuits, when he is most careful as to method. A man of my acquaintance has a slate, which hangs at a study table. On that he generally finds, in the morning, his work for the day written down; and in the evening he reviews it, sees if he has omitted anything and if so chides himself that all is not done. If, at the close of the day, he finds the items all accomplished, he feels that the day has not been lost. *C. U. Inter. (Science) '59*

পদ্ধতির সম্বন্ধে সবিশেষ যত্নবান হইলে যে কার্যে সর্বাধিক সাফল্যলাভ করা যায়—ইহা যে কোন ব্যক্তি তাহার অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারিবে। আমার পরিচিত এক ব্যক্তির পড়িবার টেবিলে একটি শ্লেট ঝোলান থাকে। ইহাতে প্রতিদিন সকালে তাহার দৈনিক কার্যের তালিকা লিখিত রহিয়াছে—সে ইহা দেখিতে পায়; এবং কোন কাজ সে বাদ দিয়াছে কিনা তাহা সন্ধ্যায় পুনরায় আলোচনা করিয়া দেখে এবং যদি এমন হয়, তবে সবটা করা হয় নাই বলিয়া সে নিজেকে ভৎসনা করে। দিনের শেষে যদি সে দেখে যে কার্যগুলি সবই সুসম্পন্ন হইয়াছে, সে ভাবে দিনটি নষ্ট হয় নাই।

## [ পাঁচ ]

A worthy soldier had saved a good deal of money out of his pay; for he worked hard, and did not spend all he earned in eating and drinking, as many others do. Now he had two comrades who were rogues, and wanted to rob him of his money, but behaved outwardly towards him in a friendly way. "Comrade," said they to him one day "why should we stay here shut up in this fown like prisoners, when you at any rate have earned enough to live upon for the rest of your days in peace and plenty at home by your own fire-side?" They talked so often to him in this manner; but they all the time thought of nothing but how they should manage to steal his money from him. *C. U. Inter. (Arts) '58*

এক সুযোগ্য সৈনিক তাহার বেতন হইতে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল; কারণ সে কঠোর পরিশ্রম করিত, এবং অন্যান্য সৈনিকের মত খাদ্যে ও পানীয়ে, অর্জিত অর্থের সবটুকুই ব্যয় করিয়া ফেলে নাই। তাহার দুইটি সহকর্মী ছিল, ইহারা খুবই অসৎ; এই সৈনিকের অর্থ অপহরণ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। অথচ বাহ্যতঃ, ইহারা এই সৈনিকের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিত। একদিন তাহারা সৈনিকটিকে বলিল, "বন্ধুবর! আমরা এই শহরে বন্দীর মত আবদ্ধ হইয়া থাকিব কেন, অন্ততঃ তুমি যে অর্থ উপার্জন করিয়াছ তাহাতে নিজের বাড়িতে আগুনের পাশে বসিয়া শান্তি ও প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনের বাকি দিনগুলি সুখে অতিবাহিত করিতে পারিবে।" তাহারা এইভাবে তাহাকে প্রায়ই এই কথা বলিত, কিন্তু তাহারা, সর্বদাই কিভাবে সৈনিকের নিকট হইতে অর্থ অপহরণ করিতে সমর্থ হইবে, এই কথা ছাড়া আর অন্য কোন কথা ভাবিত না।

## [ ছয় ]

The invention of the telescope led to enormous progress in the study of the heavens, and chiefly responsible for our modern ideas of the universe. As we turn to these ideas, we must remember how much our knowledge has advanced since the time of Galileo and we must be prepared for some surprises. Modern astronomical ideas are astonishing, and to some people incredible. For one thing, astronomers are able to measure the distances between the different things in the universe. The measurement is not exact, but we can get a fairly good idea of these distances. Some of them are enormous. They are so enormous that astronomers long ago abandoned the use of miles and kilometres to express them.

*C. U. Inter. (Arts) '58*

নভোমণ্ডল সম্বন্ধে জ্ঞানান্বেষণে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার প্রভূত উন্নতির সহায়ক হইয়াছে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের আধুনিক ধারণার মূলে ইহারই কৃতিত্ব রহিয়াছে। এই সকল ধারণা সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, গ্যালিলিওর সময় হইতে আমাদের জ্ঞানের কতখানি অগ্রগতি হইয়াছে এবং কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনার জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি বিস্ময়কর এবং কাহারও কাহারও নিকট অবিশ্বাস্যও বটে। প্রথমতঃ, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কতখানি দূরত্ব আছে তাহার পরিমাপ করিতে পারেন। পরিমাপ একেবারে নির্ভুল নহে, কিন্তু এই দূরত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারি। কোন কোন স্থানে দূরত্ব বিরাট্। এই দূরত্ব এতই বিরাট যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পূর্বেই মাইল ও কিলোমিটার দিয়া দূরত্ব প্রকাশ করিবার প্রণালী একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিলেন।

## [ সাত ]

Pain, brute, physical suffering is by far the most dreadful thing in the world. Imagine what it must have been like to have been a soldier wounded, let us say in the leg and to have had your leg sawn off without anything to dull the pain. Bad as this must have been, operations which meant cutting people open must have been a hundred times worse—so bad indeed, that for all practical purposes operations were impossible. Wounded soldiers were made drunk with rum, and people who were to be operated upon were rendered unconscious by a blow on the head. But clearly the complicated taking to bits and putting together again of people's bodies which doctors do now was out of the question, and people died in great numbers whose lives would now be saved by timely operations,

*C. U. Inter. (Science) '58*

বেদনা, তীব্র, কঠিন শারীরিক যন্ত্রণা নিশ্চয়ই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভীষণ ব্যাপার। মনে কর তুমি একজন সৈনিক, ধরা যাক্, তুমি পায়ে আহত হইয়াছ। যন্ত্রণাবোধকে একেবারে অসাড় করিয়া ফেলার কোন উপায় নাই, অথচ তোমার পা করাত দিয়া কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। এস্থলে তোমার অবস্থা কিরূপ হইত, তাহা কল্পনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা কর। এ ব্যাপারটা যতই যন্ত্রণাদায়ক হউক, যে সকল অস্ত্রোপচারে মানুষের দেহাভ্যন্তর কাটিয়া উন্মুক্ত করিতে হইত, সেগুলি নিশ্চয়ই আরও শতগুণে বেশি ক্লেশদায়ক। এতই ক্লেশদায়ক যে কার্যতঃ এইরূপ অস্ত্রোপচার অসম্ভবই ছিল। আহত সৈনিকদের, রাম মদ খাওয়াইয়া মাতাল করিয়া ফেলা হইত, এবং যে সকল ব্যক্তির অস্ত্রোপচার করিতে হইবে তাহাদের মাথায় আঘাত করিয়া সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন করিয়া ফেলা হইত। কিন্তু অধুনা চিকিৎসকগণ যেরূপ দেহের বিভিন্নাংশ কাটিয়া লইয়া, আবার অন্যান্য অংশের সহিত জুড়িয়া দেন, সেই সকল জটিল পদ্ধতি সে সময়ে চিন্তার অতীত ছিল। আজকাল যথাসময়ে অস্ত্রোপচার করিয়া যে সকল জীবনরক্ষা হইতেছে, তখন অতীতে বহু ব্যক্তি এরূপ স্থলে প্রাণ হারাইত।

## [ আট ]

If Blondeau sharpened his shoe-knife the monkey sharpened it after him ; if he waxed his thread, the monkey also did it. If he soled some old boots, the monkey came and took a boot between its knees and tried to do the same. Having studied the matter in this way, Blondeau sharpened his shoe-knife till it cut like a razor. Then, when the monkey came out to watch him, he took up the shoe-knife and drew it backwards and forwards over his throat. And when he had done this long enough to attract the notice of the monkey he left his booth and went to dinner. The monkey came down in

desperate haste. For is wished to try this new game that it had just been studying. It took the shoe-knife and put it against its throat drawing it backwards and forwards and cut its throat so badly that it died within an hour. *C. U. Inter.* (*Science*) '*58*

ব্রোঁদো যখন তাহার জুতা মেরামত করিবার ছুরিটিতে শান দিয়া ধার করিত, বানরটিও তখন তাহার অনুকরণ করিয়া ছুরিতে ধার দিত; সে যখন সূতায় মোম লাগাইত, বানরটিও সেইরূপ করিত। সে যখন পুরাতন জুতার তলা বদলাইত, বানরটিও সেইখানে আসিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে একটি জুতা রাখিয়া সেইরূপ করিবার চেষ্টা করিত। এইভাবে ব্যাপারটি লক্ষ্য রাখিয়া ব্রোঁদো জুতা মেরামতের ছুরিটিতে এমন বেশি ধার দিল যে, ছুরিটি ক্ষুরের মতই সুতীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। তাহার পর বানরটি যখন আবার আসিয়া তাহার কাজটি লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল, তখন ব্রোঁদো নিজের গলার উপর ছুরিটি সামনে ও পিছন দিকে টানিতে লাগিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া এইরূপ করার পর বানরটির মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হইল, তখন সে দোকান হইতে উঠিয়া গিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতে গেল। বানরটি তখন ভীষণ দ্রুতবেগে (পড়ি কি মরি ভাবে) নামিয়া আসিল। কারণ সে এতক্ষণ যে নূতন খেলাটি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল, সে খেলাটি সে নিজে পরখ করিয়া দেখিতে উৎসুক হইল। সে জুতা মেরামতের ছুরিটি লইয়া গলার উপর বসাইয়া সামনে পিছনে ঘসিতে লাগিল, এমন করিয়া গলা কাটিয়া ফেলিল যে এক ঘণ্টার মধ্যে মারা গেল।

[ নয় ]

The greatest results in life are usually attained by simple means and the exercise of ordinary qualities. The common life of everyday with its cares, necessities and duties afford ample opportunity for acquiring exprience of the best kind; and its most beaten paths provide the true with abundant scope for effort and room for self-improvement. The road of human welfare lies among the old highway of steadfast well doing; and they who are most persistent and work in the truest spirit will usually be the most successful. Fortune has often been blamed for her blindness; but fortune is not so blind as men are. Those who look into practical life will find that fortune is usually on the side of the industrious, as the winds and waves on the side of the best navigators. *D. U. Inter.* '*58*

সহজ সরল পথে এবং সাধারণ গুণাবলীর অনুশীলনের মাধ্যমেই জীবনের শ্রেষ্ঠতম ফল অর্জন করা যায়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সতর্কতা, প্রয়োজন এবং কর্তব্য শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা অর্জনের যথেষ্ট সুযোগ করিয়া দেয়; এবং ইহার বহু পদাঙ্কচিহ্নিত পথ প্রকৃত কর্মীর জন্য চেষ্টা এবং আত্মোন্নতির অনেক সুযোগই আনিয়া দেয়। প্রাচীন স্থিরসংকল্প মঙ্গলকর্মের রাজপথেই নিহিত রহিয়াছে মানবকল্যাণের পথ; এবং যাহারা

অধ্যবসায়ী ও সত্যকার মনোবল লইয়া কাজ করে তাহারাই হয় সফলকাম। যখন তখন অদৃষ্টের অন্ধত্বের অভিযোগ করা হয়, কিন্তু মানুষের মত তত অন্ধ অদৃষ্ট নয়! বাস্তব জীবনের প্রতি যাহাদের লক্ষ্য আছে তাহারাই জানে যে, বাতাস এবং তরঙ্গ যেমন দক্ষ নাবিকের পক্ষে থাকে, অদৃষ্টও তেমনি থাকে অধ্যবসায়ীরই অনুকূলে।

[ দশ ]

A generation ago little or nothing was known in Europe of this great faith of Asia, which had nevertheless existed during twentyfour centuries, and at this day surpasses, in the number of its followers and the area of its prevalence, any other form of creed. For hundred and seventy millions of our race live and die in tenets of Gautama; and the spiritual dominions of this ancient teacher extend, at the present time, from Nepal and Ceylon, over the whole of the Eastern Peninsula, to China, Japan, Tibet, Central Asia, Siberia and even Swedish Lapland. India itself might fairly be included in this magnificent Empire of belief; for though the profession of Buddhism has for the most part passed away from the land of its birth the mark of Gautama's sublime teaching is stamped ineffaceably upon modern Brahmanism. *C. U. Inter. (Arts) '57*

চতুর্বিংশ শতাব্দীব্যাপী বিদ্যমান এসিয়ার এই মহান্ ধর্মমতের প্রায় কিছুই এক পুরুষ পূর্বেও ইউরোপে জ্ঞাত ছিল না এবং অধুনা অন্য যে কোন ধর্মমত অপেক্ষা ইহার অনুসরণকারীর সংখ্যা ও বিস্তৃতির ক্ষেত্র অধিকতম। মানবজাতির প্রায় সাতচল্লিশ কোটি লোক গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মে বিশ্বাস রাখিয়াই জীবনযাপন ও মৃত্যুবরণ করে এবং প্রাচীন এই আচার্যের আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য বর্তমানে নেপাল এবং সিংহল হইতে সমগ্র প্রাচ্য ভূমণ্ডলের মধ্য দিয়া চীন, জাপান, তিব্বত, মধ্যএসিয়া, সাইবেরিয়া, এমন কি সুইডেনীয় ল্যাপল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতবর্ষও এই গৌরবময় ধর্মসাম্রাজ্যের প্রায় অন্তর্গত; কারণ, যদিও বৌদ্ধধর্মের চর্চা তাহার উৎপত্তিস্থল হইতে বেশির ভাগই অন্তর্হিত হইয়াছে, তথাপি গৌতমের মহান্ শিক্ষার চিহ্ন আধুনিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে অনপনেয়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

[ এগারো ]

The Emperor of Persia was stting one day with his august feet in a basin of rose-water, an ingenious method which he employed in order to cause happy ideas to occur to him when he was troubled. Half-slumbering by reasson of the sublime thoughts which crowded to his brain, he nodded two or three times, rubbed his eyes and reclining his head on a cushion, fell asleep. The court with silent respect contemplated the gentle sleep of His Majesty, when a loud sneeze filled the courtiers with horror and suddenly awakened his Majesty.

"Who was it ?" asked the monarch.

"Sire !" exclaimed the youth, "it was I, I could not help it."

"You have just interrupted the sweetest dream of my life. Your duty is now to guess my dream. If you can remind me of it, I forgive you ; but if not, I will have your nose shortened so that you will never sneeze again as long as you live." *C. U. Inter.* ( *Arts* ) *'57*

একদা পারস্যের সম্রাট্ গোলাপজলের একটি পাত্রে মহান্ পাদযুগল স্থাপিত করিয়া বসিয়াছিলেন, যখনই কষ্টবোধ করিতেন তখনই আনন্দদায়ক ভাবোদয়ের জন্য তিনি এই চাতুর্যপূর্ণ উপায়টি অবলম্বন করিতেন। তাঁহার মস্তিষ্কে যে মহান্ ভাবরাশি ভিড় করিতেছিল, তাহাদের প্রভাবে অর্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া তিনি দুই তিনবার মাথা নাড়িয়া চোখ দুইটি রগড়াইয়া তাকিয়ায় মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। সভাসদ্‌গণ নীরব শ্রদ্ধাসহকারে মহামান্য সম্রাটের নিদ্রা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় একটি হাঁচির উচ্চ শব্দে সভাসদ্‌গণ আতঙ্কিত হইলেন এবং সম্রাটের হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল।

সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ইহা করিল ?"

যুবক বলিল, "মহারাজ, আমি। নিরুপায় হইয়া আমিই হাঁচিয়াছি।"

"তুমি আমার জীবনের মধুরতম স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়াছ। আমার স্বপ্নটি অনুমান করাই তোমার এখন কর্তব্য। যদি তুমি আমাকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে পার, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব ; কিন্তু যদি তাহা না পার, তাহা হইলে তোমার নাক এত ছোট করাইয়া দিব যে, তুমি যতকাল বাঁচিবে ততদিন আর কখনও হাঁচিতে পারিবে না।"

## [ বারো ]

The Suez Canal has been the highway of shipping between East and West for nearly a century, but some of the most interesting travellers through this famous waterway between Asia and Europe pay no tolls and cannot be checked by any embargoes or military force. They are the marine creatures which have thereby gained access to the Mediterranean, not just as rare stragglers, but have spread up the Palestine coast to Syria and appear regularly on the fish markets of the Levant. Along this 100 mile waterway more than a score of kinds of fish, crabs, prawns and other forms of marine life have travelled from the salty waters of the Red Sea to the sweeter waters of the Mediterranean. *C. U. Inter.* ( *Science* ) *'57*

প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী সুয়েজ খাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে জাহাজ চলাচলের প্রশস্ত জলপথ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী এই বিখ্যাত জলপথে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ভ্রমণকারীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক কোন শুল্কই দেয় না এবং কোনও নিষেধাজ্ঞা বা সামরিক শক্তির দ্বারা উহাদিগকে বাধা দেওয়া যায় না। উহারা

লাভ করিয়াছে তাহা নয়, বরং প্যালেস্টাইনের উপকূল হইতে সিরিয়া পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলবর্তী দেশসমূহের মাছের বাজারে নিয়মিত ভাবেই উহাদের আগমন ঘটে। এই শত মাইল জলপথ দিয়া বিশ রকমেরও বেশি মাছ, কাঁকড়া, বাগ্‌দা চিংড়ি এবং অন্যান্য রকমের সামুদ্রিক প্রাণী লোহিত সাগরের লবণাক্ত জল হইতে ভূমধ্যসাগরের মিষ্টতর জলে গমন করে।

[ তেরো ]

When Napoleon Bonaparte, after his defeat at Waterloo by the British and Prussians was sent off to St. Helena, not many people were very sorry. Even the French people, who had admired Napoleon and were very proud of the glory he had conferred on France, were tired of constant war ; and so they were inclined to say, "Well he was a great man, but he turned the world upside down too much."

The kings, statesmen and nobles of Europe, of course, were very glad indeed to get rid of Napoleon. They regarded the French Revolution of 1789 as a kind of wild outburst of anarchy and Napoleon's exploits as the natural result of the Revolution. After Napoleon's fall for the first time they felt secure.

*C. U. Inter. (Seience) '57*

প্রুসীয় ও ব্রিটিশদিগের দ্বারা ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে যখন সেণ্ট-হেলেনায় পাঠানো হইল, তখন বেশি লোক খুব দুঃখিত হয় নাই। এমন কি, যাহারা নেপোলিয়ানকে প্রশংসা করিত এবং ফরাসীদেশকে গৌরব-মণ্ডিত করার জন্য গর্ব অনুভব করিত, সেই ফরাসীরাও অবিরাম যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; সুতরাং তাহাদেরও এইরূপ বলার প্রবণতা দেখা গেল,—"হ্যাঁ, তিনি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি পৃথিবীকে অত্যধিক বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।"

নেপোলিয়ানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ায় ইউরোপের রাজন্যবর্গ, রাজনীতিবিদ্‌গণ এবং অভিজাতেরা অবশ্য খুবই খুশি হইয়াছিলেন। তাঁহারা ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবকে অরাজকতার একপ্রকার বন্য বহিঃপ্রকাশ এবং নেপোলিয়নের কার্যাবলীকে বিপ্লবের স্বাভাবিক ফলরূপে মনে করিতেন। নেপোলিয়নের পতনের পর সর্বপ্রথম তাঁহারা নিরাপত্তা বোধ করিলেন।

চোদ্দ

The tiger sprang at me and buried its teeth, one under my right eye, one in my chin and the other two here at the back of mp neck. Its mouth struck me with a great blow and I fell over on my back, while the tiger lay on top of me chest to chest, with its stomach between my legs. When falling backwards I had flung out my arms and my right hand had come in contact with an oak sapling. My legs were free, and if I could draw them up and insert my feet under and

against the tigers belly, I might be able to push the tiger off, and run away. The pain, as the tiger crushed all the bones on the right side of my face, was terrible ; but I did not lose consciousness.

*R. U. Inter. '57*

বাঘটি আমার দিকে তাড়া করিয়া আমার ডান চোখের নীচে একটি দাঁত, আমার গালে একটি এবং আর দু'টি দাঁত এখানে ঘাড়ে ফুটাইয়া দিল। ইহার মুখের খুব জোর এক আঘাতে আমি চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলাম, এবং বাঘটি আমার পায়ের মধ্যে উদরটি রাখিয়া আমার বুকের উপর বুক রাখিল। পিছনে ফিরিয়া পড়িবার সময় আমি হাতগুলি ছড়াইয়া দিয়াছিলাম এবং ডান হাত দিয়া একটি ওক গাছের চারা স্পর্শ করিয়াছিলাম। আমার চরণদ্বয় মুক্ত ছিল, সুতরাং বাঘের পেটের নীচে এগুলিকে যদি গুটাইয়া আনিতে পারিতাম, তাহা হইলে বাঘকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে সক্ষম হইতাম এবং পলাইয়া যাইতে পারিতাম। আমার মুখের ডানদিকের হাড়গুলিকে বাঘটি ভাঙিয়া দেওয়ায় অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল ; কিন্তু জ্ঞান হারাই নাই।

[ পনেরো ]

The famous traveller and discoverer, Sir Walter Raleigh lived in the reign of Queen Elizabeth. He was the first man to indulge in the habit of smoking in England. He brought tobacco with him from the newly discovered continent of America and introduced the use of it in Europe. One day he sat smoking in his garden. A servant passed by, carrying a pail of water. The man had not yet heard of his master's strange habit. He glanced at his master. He saw a cloud of smoke and thought his clothes must have caught fire. He was a man of great quickness and presence of mind. He rushed to this beloved master and raising the pail of water, flungs the contents over him and without waiting for thanks, fled away for some more.

*D. U. Inter. '57*

সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী এবং আবিষ্কারক স্যর ওয়াল্টার র‍্যালে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডে ধূমপানের অভ্যাস আরম্ভ করেন। নবাবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশ হইতে তিনি স্বয়ং তামাক আনিয়া ইহার ব্যবহার ইউরোপে প্রবর্তন করেন। একদিন তিনিই বাগানে বসিয়া ধূমপান করিতে-ছিলেন। একটি চাকর এক বাল্‌তি জল লইয়া পাশ দিয়া যাইতেছিল। চাকরটি তখনও অবধি তাহার প্রভুর এই বিচিত্র নেশার কথা শোনে নাই। সে প্রভুর দিকে তাকাইল। ধোঁয়ার মেঘ দেখিয়া সে ভাবিল যে, তাঁহার পরিচ্ছদে নিশ্চয়ই আগুন লাগিয়াছে। সে খুব ছটফটে এবং উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। সে তাহার প্রিয় প্রভুর নিকট ছুটিয়া গিয়া জলের বাল্‌তিটি উঠাইয়া তাহার উপর জল ফেলিয়া দিল এবং ধন্যবাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া আরও জল আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

[ ষোলো ]

Although no amount of theoretical knowledge of the technique of cooking, it is rightly held, can make a good cook of a person if he or she has no native talent for cooking—just as no amount of book knowledge of the technicalities of music can make a good musician—cookery, it is suggested, can be learnt by any one who will seek to learn it in the true spirit of genuine devotion. A person who learns to cook in this way will not only know how to prepare all the well-known and traditional dishes, but will invent new preparations and thus augment the literature of cookery. A good cook has a hand which is quick, yet sure ; preparing many dishes simultaneously, yet preserving clean hands and a clean kitchen, making his taste the test not of his own pleasure but of others. *C. U. Inter. (Arts) '56*

যদিও একথা সত্য যে, কোন ব্যক্তির বা মহিলার রন্ধন-বিষয়ে কোন জন্মগত প্রতিভা না থাকিলেও রন্ধনকৌশল সম্বন্ধে যত বেশিই পুঁথিগত জ্ঞান তাহার থাকুক না কেন, সে কখনও ভাল রাঁধুনী হইতে পারে না—যেমন সংগীতবিদ্যার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে খুব বেশি পরিমাণে পুঁথিগত জ্ঞান থাকিলেও ভাল গায়ক হওয়া যায় না—রন্ধনবিষয় সম্বন্ধেও বলা হয় যে, যে-কেহ সত্যিকারের আগ্রহ এবং যথার্থ অনুরাগের সহিত যদি ইহা শিখিতে চায়, সে-ই রন্ধন শিখিতে পারে। যে ব্যক্তি এই ভাবে রন্ধন করিতে শিখে, সে যে কেবল সমস্ত সুপরিচিত ও গতানুগতিক খাদ্যগুলি প্রস্তুত করিতে শিখিবে তাহাই নয়, পরন্তু নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া এইভাবে রন্ধন সাহিত্যকে পুষ্ট করিবে। ভাল রন্ধনকারীর হাত দ্রুত অথচ নির্ভুল ; সে একই সঙ্গে অনেকগুলি খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারে অথচ হাত এবং রন্ধনগৃহ পরিষ্কার রাখে, তাহার রুচি স্বীয় আনন্দের মাপকাঠি নয়—বরং অপরেরই।

[ সতেরো ]

Most newspapers which you read so freely every morning and every evening, contain nothing but abuse of the other side. If, for instance, you read some extremist organs, there is nothing but abuse of the other fellows. They are all people that are accustomed to wait in the anti-chambers of big officials, people that make private applications for titles and honours, or ask for consideration in a sympathetic and favourable spirit of the applications that their nephews and sons-in-law are sending up. It would appear the accusers are above all such considerations. It is all angels on one side and devils on the other ; upon one side all unworthy citizens, upon the other all saints. *C. U. Inter. (Arts) '56*

প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় যে সংবাদপত্রগুলি তোমরা অবাধে পাঠ কর, তাহার অধিকাংশতেই অপর পক্ষের নিন্দাবাদ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা

যায় যে, যদি কোন চরমপন্থীর মুখপত্র পড়, তাহা হইলে প্রতিপক্ষের নিন্দা ছাড়া আর কিছুই তাহাতে পাওয়া যায় না। যেন তাহারা সকলেই এমন লোক যাহারা বড় বড় রাজকর্মচারীর বসিবার স্থানের পাশের ঘরে সর্বদা অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহারা উপাধি ও সরকারী সম্মানের জন্য গোপনে আবেদন করিয়া থাকে, অথবা তাহাদের ভাইপো-ভাগ্নে-জামাইরা যে-সব দরখাস্ত পাঠাইতে থাকে সেগুলিকে সহানুভূতিপূর্ণ এবং অনুগ্রহপূর্ণ ভাবে বিবেচনা করিয়া থাকে—এই অনুরোধ করিতেই আসে। যেন অভিযোগকারীরা নিজেরা এই রকম ব্যবহার কখনই করে না। যেন একদিকে সকলেই দেবতা, আর অপরদিকে সকলেই দানব; একদিকে সকলেই অপদার্থ নাগরিক, অপরদিকে সকলেই মহাত্মা সাধুব্যক্তি।

[ আঠারো ]

The joys of freedom are indeed difficult to describe ; they can only be fully appreciated by those who have had the misfortune to lose them for a time. With grief and sorrow I occasionally notice that here and there are people who speak of freedom as though it were a mechanical invention, or a quack specific for which they have taken a patent. "Our ancestors", say they, "have fought, have struggled, and have suffered for freedom. It is ours exclusively. We will not share it with those who have not shared our troubles, trials and misfortunes to attain it." I take it that that is not an exalted view of freedom. What a man has fought for and won he must without reserve share with his fellowmen *C. U. Inter. (Science) '56*

স্বাধীনতার আনন্দ বাস্তবিকই বর্ণনা করা কঠিন; ইহাকে তাহারাই সম্পূর্ণভাবে সমাদর করিতে পারে, যাহাদের ইহাকে সাময়িকভাবে হারাইবার দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে। দুঃখ এবং বেদনার সহিত আমি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করি যে, এখানে সেখানে লোকেরা স্বাধীনতা সম্বন্ধে এরূপ কথা বলে যেন ইহা একটি যান্ত্রিক উদ্ভাবন অথবা যেন রোগীর উপরে প্রযোজ্য একটি হাতুড়ে দাওয়াই। তাহারা বলিয়া থাকে, "আমাদের পূর্বপুরুষগণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন, সংগ্রাম করিয়াছেন এবং কষ্টভোগ করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণভাবে আমাদেরই। যাহারা ইহা অর্জন করিবার জন্য আমাদের সহিত কষ্ট দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যের অংশভাগী হয় নাই, তাহাদিগকে আমরা ইহার অংশ দিব না।" আমি মনে করি যে, স্বাধীনতা সম্বন্ধে উহা একটি অতি উচ্চ ধারণা নয়। মানুষ যাহা-কিছু সংগ্রাম করিয়া অর্জন করিয়াছে, তাহা সঞ্চয় না করিয়া সঙ্গিগণকে ভাগ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

[ উনিশ ]

The standard of living and hours of working of an English farmer of three centuries ago would probably not do for us to-day. Nor, I

imagine, would his stay-at-home life. Outside their own little world everything was just a blank to our forefathers; a man from a neighbouring country was a foreigner. New ideas seldom came their way, and when they did they distrusted them—they were foreigners, too, in fact. But whatever had been tried and found to work, they stuck to with dogged persistence. Their life was a round of routine, ordered by countless generations who had gone before them. Probably this all sounds terribly narrow and dull. Yet when one examines their life a little more closely, one finds it to have been far more rich than one had at first supposed. *C. U. Inter. (Science) '56*

তিন শতাব্দী পূর্বের একজন ইংরাজ কৃষকের জীবনধারণের মান ও কর্মসময় আমাদের পক্ষে আজকাল উপযোগী হইবে না। আমার মনে হয়, তাহারা ঘরকুণো জীবনও আমাদের কাজে লাগিবে না। আমাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট স্বীয় ক্ষুদ্র পৃথিবীর বাহিরের আর কিছুই জ্ঞাত ছিল না এবং প্রতিবেশী দেশের যে কোন লোকই ছিল বিদেশী। নূতন চিন্তাধারা কদাচিৎ তাঁহাদের কাছে পৌছাইত এবং আসিলেও উহাকে তাঁহারা অবিশ্বাস করিতেন—বস্তুতঃ তাঁহাদের কাছে উহা বিজাতীয়ই ছিল। কিন্তু যাহা-কিছুই পরীক্ষা-দ্বারা স্থিরীকৃত এবং কার্যকর হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহারা নাছোড়বান্দার ন্যায় লাগিয়া থাকিতেন। পূর্বতন অসংখ্য পুরুষ কর্তৃক স্থিরীকৃত বিধির আবর্তনই তাঁহাদের জীবন। বোধ হয় ইহা শুনিতে অত্যধিক সংকীর্ণ ও নীরস লাগে। কিন্তু কেহ যদি একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহাদের জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখে, তাহা হইলে পূর্বানুভূত ধারণার চেয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ মনে হইবে।

## [ কুড়ি ]

There is an old legend that soon after creation the gods announced that mankind would, on a given day, be permitted to divine the earth between them. As soon as the appointed time arrived, the agriculturists—occupied the fertile fields; merchants the roads and seas; monks the valleys suitable for vines; noblemen the woods and forests for the sake of the game; kings the bridges and defiles where they could raise taxes. The poet who was deep in meditation, came when all was over and lamented his lot. What was to be done? The gods had nothing more to give. "Come", they said, "and live with us in eternal heaven". *R. U. Inter. '56*

একটি প্রাচীন কিংবদন্তী আছে যে, সৃষ্টির পর পরই দেবতাগণ ঘোষণা করিয়া দিলেন, মনুষ্যজাতি একটি নির্দিষ্ট দিনে নিজেদের মধ্যে পৃথিবী ভাগ করিবার অনুমতি পাইবে। নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকগণ উর্বর ভূমিসকল, বণিকগণ পথ এবং সমুদ্রসমূহ, সাধুগণ দ্রাক্ষালতার উপযোগী উপত্যকাসমূহ,

অভিজাতগণ শিকারের জন্য বনজঙ্গল এবং রাজারা রাজস্ব আদায়ের জন্য সেতু ও গিরিসংকট দখল করিয়া লইলেন। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন কবিরা সব শেষ হইয়া যাইবার পর আসিলেন এবং দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ করিতে লাগিলেন। এখন কি কর্তব্য? দেবতাদের এখন দিবার কিছুই নাই। তাঁহারা বলিলেন, 'আইস, আমাদের সহিত শাশ্বত স্বর্গে বাস কর।"

[ একুশ ]

What happened in Spain happened also in other places. Wherever the Muslims entered a change came over the countries; order took the place of lawlessness, and peace and plenty smiled on the land. As war was not the privileged profession of one caste, so labour was not the mark of degradation to another. The pursuit of agriculture was as popular with all classes as the pursuit of arms.

*D. U. Inter. '56*

স্পেনে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা অন্যান্য স্থানেও ঘটিয়াছিল। যেথানেই মুসলমানেরা প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দেশেই পরিবর্তন আসিয়াছিল; অরাজকতার পরিবর্তে আসিয়াছিল শৃঙ্খলা ও শান্তি এবং প্রাচুর্যে দেশ গিয়াছিল ভরিয়া। সংগ্রাম যেমন কোন জাতির বিশেষ অধিকৃত পেশা নয়, তেমনি শ্রমও অন্য জাতির পক্ষে অধোগতির পরিচায়ক নয়। অস্ত্রানুশীলনের ন্যায় কৃষিকার্যও সর্বশ্রেণীরই নিকট জনপ্রিয়।

[ বাইশ ]

All such knowledge should be given to a young girl as may enable her to understand, and even to aid, the work of men; and yet it should be given, not as knowledge,—not as if it were, or could be, for her an object to know; but only to feel, and to judge. It is of no moment, as a matter of pride or perfectness in herself, whether she knows many languages or one; but it is of the utmost, that she should be able to show kindness to a stranger, and to understand the sweetness of a stranger's tongue. It is no moment to her own worth and dignity that she should be acquainted with this science or that; but it is of the highest that she should be trained in habits of accurate thought; that she should understand the meaning, the inevitableness, and the loveliness of natural laws; and follow at least some one path of scientific attainment. *C. U. Inter. (Arts) '55*

তরুণী বালিকাকে এরূপ শিক্ষাদান করা উচিত যাহাতে সে পুরুষের কর্মধারা বুঝিতে, এমন কি, তাহাতে সাহায্য করিতে পারে, তথাপি এই শিক্ষা, জ্ঞানের বিষয় হিসাবে—যেন তাহা তাহার পক্ষে জানিবার বস্তুই হইবে বা হইতে পারে—দেওয়া উচিত নয়, কেবল অনুভূতির বা বিচারের বিষয় হিসাবেই দেওয়া উচিত। সে অনেকগুলি ভাষা বা একটি ভাষা শিক্ষা করিয়া অহংকার বা আপনার

মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিল কি না তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়, তবে সে যে বিদেশীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে পারিবে এবং তাহার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারিবে, ইহাই খুব বেশি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। সে যে কোনও বিশেষ বিজ্ঞানের পরিচয় লাভ করিবে, তাহাতে যে তাহার বিশেষ মূল্য বা মর্যাদাবৃদ্ধি হইবে তাহা নয়, তবে সে যে নির্ভুলভাবে চিন্তা করিবার অভ্যাস গঠন করিবার শিক্ষা পাইবে, সে যে প্রকৃতির নিয়মগুলির তাৎপর্য এবং এগুলি যে অপরিবর্তনীয় এবং চিরসুন্দর—একথা উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং অন্ততঃ বৈজ্ঞানিক সাফল্যের কোন একটি পথ অনুসরণ করিতে পারিবে, ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

[ তেইশ ]

Walled by the lofty range of the snow-capped Himalayas on the North, surrounded by seas and oceans on the other sides and thus cut off from the outer world, India has been the chosen land of Nature herself. Freed from the struggle of existence and away from the tumult of the outside world, the mind of the people turned inward and investigated into her inner nature. Their intensive culture in that direction yielded in time a rich harvest from the fields of religion and philosophy, ethics and theology, science and astronomy, art and literature. India thus became the central seat of a culture and civilization that found their way through Arabia, Egypt and Assyria to the farthest corners of Europe, a culture and civilization that became her glory.
*C. U. Inter. (Arts) '55*

উত্তরে তুষারমৌলি হিমালয়-পর্বতমালায় প্রাচীর-দ্বারা এবং অন্যান্য দিকে সাগর মহাসাগর-দ্বারা পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত এবং এইভাবে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতভূমি স্বয়ং প্রকৃতিদেবীরই স্বনির্বাচিত লীলাক্ষেত্র। জীবনসংগ্রামের সমস্যা হইতে মুক্ত হইয়া এবং বহির্জগতের কোলাহল হইতে বহুদূরে ভারতের জনসাধারণের মন অন্তর্মুখী হইয়া আত্মার স্বরূপের অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। ঐ দিকে তাহাদের তীব্রগভীর অনুশীলনের ফলে ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, অধ্যাত্মজ্ঞান, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্প ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচুর ফল উৎপন্ন হইতে পারিয়াছিল এইভাবে ভারতবর্ষ সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারিয়াছিল, এই সংস্কৃতি ও সভ্যতা আরব মিশর এবং আসিরিয়ার মধ্য দিয়া ইয়োরোপের দূরতম প্রান্তেঃ ছড়াইয়া পড়ে, এই সংস্কৃতি ও সভ্যতাই ভারতের গৌরবস্থল হইয়াছে।

[ চব্বিশ ]

It has been held authoritatively that the cloth we produce if hand spun and hand-woven would not only provide part-time work fo nearly 7 crores of people working three hours daily but, on top of that would mean a saving of the many crores which the poorest of the poo

have to spend out of their very slender earnings for buying their clothing. At the same time, it would also give them nearly double the amount of clothes they can afford to use to-day. The only expenditure to which they would be put would be the actual cost of the cotton and that for weaving the yarn spun by them. This would provide that spare time and profitable occupation of which the agriculturist of India stands in such sore need to-day.

*C. U. Inter. (Science) '55*

একথা প্রামাণ্যভাবে গৃহীত হইয়াছে, আমাদের পরিধেয় বস্ত্র যদি হাতে-কাটা সূতায় তাঁতে বোনা হইত, তাহা হইলে উহা প্রায় সাত কোটি লোকের রোজ তিন ঘণ্টা আংশিক কাজের সংস্থান যে করিয়া দিতে পারিত তাহা নয়, অধিকন্তু দীনতম ব্যক্তিরা বস্ত্রক্রয়ের জন্য তাহাদের অতি সামান্য সংগতি হইতে যে বহু কোটি টাকা ব্যয় করে তাহাও বাঁচিয়া যাইত। আবার, এখন তাহারা যে পরিমাণ বস্ত্র ক্রয় করিতে পারে, এই অবস্থায় তাহারা তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করিতে পাইবে। কার্পাস কিনিতে ঠিক যতটুকু অর্থ লাগিবে এবং তাহাদের হাতে-কাটা সূতায় বুনিয়া কাপড় তৈয়ারী করিতে যে অর্থব্যয় হইবে, মাত্র এইটুকুই তাহাদের খরচ পড়িবে। অধুনা ভারতের কৃষকদের যাহা সর্বাপেক্ষা বেশি দরকার, সেই অবসর সময় যাপনের লাভজনক উপায় মিলিয়া যাইবে।

### [ পঁচিশ ]

There is just now beginning a contact which may have important results in the future. Climbers of the highest peaks have to employ as porters some of the hardier peoples of the Himalayas, and between European climbers and Himalayan porters a strong feeling of comradeship is growing up. This is important enough; but not nearly so important in its eventual results as the touch which is just beginning to be made between the European lover of the mountains and those spiritual Hindus from the plains of India who come to visit the sacred shrines of the Himalayas, and who, having come there, will be as impressed as their remote predecessors had been by the solemn grandeur of the mountains and by the exquisite beauty of the Himalayan scene.

*C. U. Inter. (Science) '55*

জনতা-সংযোগের একটা সূচনা মাত্র সম্প্রতি দেখা দিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহার খুব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ফল ফলিবে বলিয়া মনে হয়। সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গে আরোহণকারীদের হিমালয়বাসী কয়েকটি দৃঢ়শরীর জাতীর ব্যক্তিদিগকে কুলী হিসাবে নিযুক্ত করিতে হয়। এবং ইয়োরোপীয় পর্বত-আরোহণকারীদের এবং হিমালয়বাসী কুলীদের মধ্যে একটা আন্তরিক প্রীতির ভাব বর্ধিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ভবিষ্যৎ ফলপ্রসবের দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার

হইতেছে ইউরোপীয় পর্বত-অনুরাগীদের এবং ভারতের সমতল প্রদেশ হইতে আগত ধার্মিক হিন্দুদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন; ইঁহারা হিমালয়ের পবিত্র তীর্থস্থানাদি দর্শন করিতে আসেন, ইঁহারা এখানে আসিয়া ইঁহাদের বহু অতীতের পূর্ব-পুরুষেরা যেমন পর্বতমালার মহান্ গাম্ভীর্য এবং হিমালয়ের দৃশ্যাদির মনোরম সৌন্দর্যে অভিভূত হইতেন, তেমনি অভিভূত হইবেন।

[ ছাব্বিশ ]

Agamemnon set foot on the soil of his fathers with a happy heart and as he touched it kissed his native earth. The warm tears rolled down his cheeks, he was so glad to see his land again. But his arrival was observed by a spy in a watchtower, whom Aegisthus had had the cunning to post therewith the promise of two talents of gold for his services. This man was on the look-out for a year in case the king should land unannounced, slip by, and himself launch an attack. He went straight to the palace and informed the usurper. Then Aegisthus set his brains to work and led a clever trap.

*R. U. Inter.'55*

আগামেমনন তাঁহার পিতৃভূমিতে আহ্লাদিত চিত্তে পদার্পণ করিলেন এবং ইহা স্পর্শ করিবামাত্র তিনি তাঁহার জন্মভূমির মৃত্তিকা চুম্বন করিলেন। পুনরায় স্বদেশ দর্শন করিয়া তিনি এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, উত্তপ্ত অশ্রুধারা তাহার গণ্ডদেশ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু পাহারাদারের বুরুজ-ঘরে অবস্থিত জনৈক গুপ্তচর কর্তৃক তাঁহার আগমন পরিলক্ষিত হইয়াছিল—গুপ্তচরকে তাহার কাজের জন্য দুইটি স্বর্ণমুদ্রা (ট্যালেণ্ট) দিবার প্রতিশ্রুতিতে চতুর ঈজিস্‌থাস্ ঐ স্থানে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কি জানি রাজা যদি বিনা ঘোষণাতেই স্থলে অবতীর্ণ হইয়া গোপনে সরিয়া পড়িয়া নিজেই যুদ্ধে প্রথম প্রবৃত্ত হইয়া পড়েন —তাই এই লোকটি বৎসরখানেক ব্যাপী সর্বদা সতর্ক ও অবহিত ছিল। সে সরাসরি প্রাসাদে গমন করিয়া রাজ্যাপহারককে জ্ঞাপিত করিয়াছিল। অতঃপর ঈজিস্‌থাস্ সক্রিয়ভাবে বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া একটি নিপুণ ফন্দী আঁটিল।

[ সাতাশ ]

I could not refuse this challenge to my adventurous spirit. So off I went to the ship and the sea-shore. I found my good fellows by the ship in a woebegone state, with the tears streaming down their cheeks. Indeed I was reminded of the scene at a farm when a drove of cows come home full-fed from the pastures to the yard and are welcomed by all their frisking calves, who burst out from the pens to gambol round their mothers and fill the air with the sound of their lowing.

*D. U. Inter.'55*

আমার দুঃসাহসী অন্তরের প্রতি এই স্পর্ধিত আহ্বান আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। তাই আমি তৎক্ষণাৎ জাহাজ এবং সমুদ্রতীরের দিকে রওনা হইয়া পড়িলাম। জাহাজের নিকট আমার প্রিয় অনুচরদিগকে বিষণ্ণ অবস্থায় দেখিতে পাইলাম, তাহাদের গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। বস্তুতঃ একটি গোলাবাড়ির দৃশ্য আমার মনে পড়িয়া গেল, সেখানে সবেমাত্র এক পাল গাভী গোচারণ-ক্ষেত্র হইতে পেট ভরিয়া খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের বাছুরগুলি আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে থাকে, তাহারা খোঁয়াড় হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া তাহাদের মায়েদের চারিদিকে উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে, এবং হাম্বারবে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলে।

## অনুশীলনী

[ এক ]

In many parts of the world it is customary to put the extracted milkteeth of the children in some place where they will be found by a mouse or a rat in the hope that through the sympathy which continues to subsist between the teeth and their former owner, the newly grown teeth of the owner may acquire the same firmness and excellence as those of rats. For example, in Germany the people will never forget to insert a tooth in a mouse's hole. In the Slav countries people go behind the store and throwing the extracted tooth backwards over their head say, 'Mouse, give me your iron tooth. I am giving you my bone tooth.' Far away from Europe at Raratonga in Pacific when a child's tooth is extracted, the aborigines recite the following prayer, "Big rat, little rat, here is the old tooth ; give me a new one." In Basutoland, the Basuto natives conceal their extracted teeth inside the mole-mounds with the same belief. In some parts of India specially in Bengal and in Gujrat the same practice prevails. The prayer to the rat is of the following strain. "Take my flat tooth, and give me a tooth as such as yours." The Mexicans and Peruvians of South America throw their teeth on the rat-frequented thatches of farm-houses with the object that they would be touched by the sharp-toothed rats which would produce magical benefits on new grown tooth. —*Frazer, Golden Bough.*

[ দুই ]

"I've learned", said Sir James casually, "that a once famous man died here early in the years—the pirate Lafitte."

"Oh, Lafitte !" Lopez nodded. His features, strongly lined as though by sorrow and suffering, were grave. His dark haunted eyes rested on his auditors. "Yes, I knew him ; I buried him. He had lost his wife and child ; life did not interest him."

"I should like to see his grave", the Englishman observed.

"Of course. It is behind the church."

The four men talked, reviving the name of Lafitte, his piracies, his share in the New Orleans battle.

"My brother was killed in that battle", said Sir James, "Six years later, my father was aboard a vessel off Cuba when Lafitte's pirates seized it ; he was killed." "You should not love the name of Lafitte, Sir James. He was not entirely a bad man", Lopez declared slowly.

*C. U. Inter. (Alter.) '59*

[ তিন ]

Who the invaders were, or from where they had come, none knew. Three of their scout ships appeared one day over America. Later those same ships were seen over Europe. Then they had vanished back into space.

At first there was no fear. There was only world-wide curiosity and speculation. A week later, with the aid of the 200 inch telescope astronomers at the Mount Palomar observatory reported a fleet of the strange spheres gathering on the Moon.

Quickly, curious speculation became frightened speculation. Eyes, wide with a new fear, were turned to the skies. What was the purpose of all those mysterious spheres ? What were they going to do ?

Earth soon learned. One day, when the astronomers looked through their telescopes, there were no longer spheres on the Moon. Terror-stricken message came from England.

Invasion ! *C. U. Inter. (Atler.) '59*

[ চার ]

The Emperor Shahjahan one day went to an elephant fight, taking his sons with him. Prince Aurangzeb sat on his horse, very near to the fighting animals. Suddenly one of the elephants turned and attacked Auranzeb. He kept his seat and threw a spear at the elephant. The elephant charged him again and threw hlm from his seat. But Aurangzeb get up and attacked the elephant with his sword. This made the Emperor and the nobles very anxious, and Prince Suja and Raja Jai Singh went to help Aurangzeb. But the elephant turned and resumed its fight with the other elephant. The Emperor sent for Aurangzeb, who was only fourteen years of age, and scolded him. But the Prince said : "Father, even kings have to die some day or other. If I had run away, people would have called me a coward. If I had been killed, it would have been a glorious death."

*D. U Inter. '58*

[ পাঁচ ]

The high land of the northern court of Celebes remained in sight for some days, as we pursued our course to the westward ; but

the pirate fleet did not make any descent on it; indeed their ships had already as much cargo on board as they could well carry. One day we stood close in, and I observed the ranges of lofty blue mountains, with rocks, and precipices and waterfalls, and groves of trees, and green fields, forming altogether a most enchanting and tempting prospect. We, however, stood off again; aud whatever was the intention of the pirates, either to rob or to obtain water, it was frustrated. The inhabitants of Celebes are called Bugis. They are very industrious, and are the chief traders in the Archipelago. They are said not to be altogether averse to a litle piracy, when they can commit it without fear of opposition or detection. They are, at all events, far more civilised than any of the surrounding people, and they are in proportion deceitful and treacherous.

*C. U. Inter. (Alt.) '58*

[ ছয় ]

A rectorial election is a peculiarly Scotch institution, and however it may strike the impartial observer, it is regarded by the students themselves as a rite of extreme solemnity and importance on which grave issues may depend. To hear the speeches and addresses of rival orators one would suppose that the integrity of the constitution and the very existence of the empire hung upon the return of their special nominee. Two candidates are chosen from the most eminent of either party and a day is fixed for the polling. Every undergraduate has a vote, but the professors have no voice in the matter. As the duties are nominal and the position honourable, there is never any lack of distinguished aspirants for a vacancy. Occasionally some well-known literary or scientific man is invited to become a candidate, but as a rule the election is fought upon strictly political lines, with all the old-fashioned accompaniments of a Parliamentary contest. *C. U. Inter. (Alt.) '58*

[ সাত ]

There is no denying the fact that the standard of our education has suffered a deterioration. The causes are many. The most important of them is the system of private tuition. A student cannot now-a-days think of passing the examination without the help of a private teacher.

Our teachers are mostly poor. They cannot make their both ends meet without undertaking private tuition. Once appointed a tutor, he cannot generally assert himself before his student. He is asked by the student to suggest important questions. If the teacher is honest and cannot foretell exactly the same questions set in the examination, his service will be terminated by the recommendation of the ward on the plea of inefficiency. With these suggestions it

becomes very easy for the students to know which of the pages of the books containing the answers are to be taken to the examination hall. *D. U. Inter.* '57

[ আট ]

Mr. Jinnah had special regards for students and nothing gave him greater pleasure than addressing them. To the students he used to speak with great regard, but there is not a single instance he tried to drag them into active politics. He inspired with thousand messages, exhorted them to cultivate toleration and mutual respect and esteem. Addressing the "Muslim Youths' Majlis Branch" at Aligarh he told some home truths to them. "Try your level best to learn the sense of responsibility and duty. Build up your character, that is more than all the degrees. All degrees and no character is mere waste of time. You should also develop the sense of honour, integrity and duty." *R. U. Inter,* '57

[ নয় ]

"When Russia took advantage of her pact with Bonaparte," explained Mr. Braun, "to fall upon Finland, I was one of those who fought. What use was it ? What could Finland do against all the might of Russia ? I was one of the fortunate ones who escaped. My brothers are in Russian gaols at this very minute if they are alive, but I hope they are dead. Sweden was in revolution—there was no refuge for me there, even though it has been for Sweden that I was fighting. Germany, Denmark, Norway were in Bonaparte's hands, and Bonaparte would gladly have handed me back to oblige his new Russian ally. But I was in an English ship, one of those to which I sold timber, and so to England I came. One day I was the richest man in Finland, where there are few rich men, and the next I was the poorest man in England where there are many poor." *C. U. Inter. ( Alter. )* '57

[ দশ ]

If we are to discover the foundations of any system or cult, if we are to excavate the soil religious as we would the soil archaeological in the hope of coming upon the basis of any particular faith, we must undertake the work in a manner as thorough as that of the antiquary who, pick in hand, delves his way to the lowest foundations of palace or temple. The earliest Babylonian religious ideas—that is, subsequent to the entrence of that people into the country watered by the Tigris and Euphrates—were undoubtedly coloured by those of the non-semitic Sumerians whom they found in the country. They adopted the alphabet of that race, and this affords strong presumptive evidence that the immigrant Semites, as an unlettered people, would naturally accept much, if not all, of the religion of the more cultured folk whom they found in possession of the soil. *C. U. Inter. ( Alter. )* '57

[ এগারো ]

It was half-past twelve in the morning and a cold night. I was almost frozen. I took off my shoes, and walked to and fro upon the sand, barefoot and beating my breast with infinite weariness. There was no sound of man or cattle. Not a cock crew. I heard only the surf breaking in the distance. By the sea at that hour in the morning, and in a place so desert-like and lonesome, I had a kind of fear.

*D. U. Inter. '56*

[ বারো ]

It happened one day, about noon, going towards my boat, I was exceedingly surprised with the print of a man's naked foot on the shore, which was very plain to be seen on the sand. I stood like one thunderstruck or as if I had seen a ghost. I listened, looked round me, but I could hear nothing, nor see anything. I went up to a rising ground, to look further ; I went up the shore and down the shore, but it was all one ; I could see no other impression but that one. I went to it again to see if there were any more and to observe if it might not be my fancy, but there was no room for that, for there was exactly the print of a foot, toes, heel and every part of a foot. How it came thither, I know not, nor could I in the least imagine.

*R. U. Inter. '56*

[ তেরো ]

It did me a world of good to be shown my manifest intellectual inferiority. I had thought in my ignorance of all clergymen as simple-minded and imbecile. I found George far better read and far quicker-witted than I. I had but to go to his study and to look at the backs of the books that lined his shelves to be ashamed of the airy impudence with which I had hitherto dismissed Christianity. Like so many other moderns, I had carelessly dismissed it without ever bothering to inquire the names, let alone the arguments, of better men than I who had given their lives to the refutation of my doubts.

*C. U. Inter. (Alter.) '56*

[ চোদ্দ ]

Try to read only what is good. And by 'good" you will not suppose me to mean what used to be called "improving books", books written in a sort of Sunday school spirit for the moral benefit of the reader. A book may be excellent in its ethical tone, and full of solid information, and yet be unprofitable, that is to say, dull, heavy, uninspiring, wearisome. Contrariwise, a book is good when it is bright and fresh, when it rouses and enlivens the mind, when it provides materials on which the mind can pleasurably work, when it leaves the reader not only knowing more but better able to use the knowledge he has received from it.

*C. U. Inter. (Alter.) '5*

[ পনেরো ]

My friends, I said East and West mean nothing to us here: Where the Sun is rising from, when he comes to light the world, and where he is sinking; we do not know. So the sooner we decide on a sensible plan the better—if one can still be found (which I doubt). For when I climbed a crag to reconnoitre I found that this is an island, and for the most part lowlying, as all round it in a ring I saw the sea stretching away to the horizon. What I did catch sight of, right in the middle, through dense oak-scrub and forest, was a wisp of smoke.
*R. U. Inter.* '55

[ ষোলো ]

You are asking me about my early days. Let me give you the tale. There is an island called Syrie—you may have heard the name out beyond Ortygie, where the sun turns in his course. It's not so very thickly peopled, though the rich land is excellent for cattle and sheep and yields fine crops of grapes and corn. Famine is unknown there and so is disease. No dreadful scourges spoil the islanders' happiness.
*D. U. Inter.* '55

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## কঠিন অনুচ্ছেদাদির অনুবাদ

## আদর্শমালা

[ এক ]

As the breeder of children and the physically weaker sex, woman has, with few exceptions, been more closely associated with the home than man. Temperamentally also she may crave home life more than man. The seclusion of oriental women is not as great a hardship as it appears to be to Western eyes. The Bengalee poet Tagore is perhaps right in comparing the sexes as follows : "Man may be well likened to a tree which needs extension, space, open air and all sorts of things. So if his roots are torn away he cannot but writhe in great pain. Woman, on the other hand, is like a creeper that seeks fulfilment through embracing the tree and may flourish merely by clinging round the tree."
*C. U. B. A.* '5

শিশুর জননীরূপে এবং দৈহিকবলে পুরুষ অপেক্ষা দুর্বলতর বলিয়া ( কয়েক স্ত্রীলোককে বাদ দিলে ) নারীরা, নর অপেক্ষা গৃহের জীবনের সহিত অধিকতর ঘনি ভাবে জড়িত হইয়া আছে। স্বভাবের দিক দিয়াও নারী পুরুষ অপেক্ষা গৃহের জীবনে বেশি কামনা করে। প্রাচ্যদেশীয় নারীর অবরোধবাস, পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে যতটা বে কষ্টকর বলিয়া মনে হয়, ( প্রকৃতপক্ষে ) ততটা নহে। বাঙালী কবি ( রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর নরনারীকে যে এইভাবে তুলনা করিয়াছেন, তাহা যথার্থই হইয়াছে, "পুরুষকে যথার্থই তরুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, তাহার (তরুর) পক্ষে বিস্তার, চারিদিকে প্রচুর (উন্মুক্ত) স্থান, মুক্তবায়ু এবং আর সকল প্রকার জিনিসই প্রয়োজন। সুতরাং যদি তাহার মূলকে সবেগে ছিন্ন করা হয়, তাহা হইলে সে তীব্র যন্ত্রণায় অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারে না। অপরপক্ষে নারী লতার মতই, সে তরুকে আলিঙ্গন করিয়াই আত্মবিকাশ কামনা করে, সে কেবল তরুকেই চারিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া ( সর্বাঙ্গীণ ) উন্নতি লাভ করিতে পারে।"

[ দুই ]

The revolutionary novel, play and film can create all kinds of characters draw from life to inspire the masses to push history forward. There are, for example, many people who suffer from starvation and oppression while, at the same time, there are people who exploit and oppress their fellowmen. This state of affairs is so general and widespread that people have begun to take it for granted. But it is the function of literature and art to crystallise these everyday phenomena in an organised, systematic form. Such literature and art can stir the people into action, awaken them and impel them to unite to carry on an organised struggle. *C. U. B. A.'58, (Comp.)'57*

বিপ্লবাত্মক উপন্যাস, নাটক ও ছায়াচিত্র জনসাধারণকে মানবের ইতিহাসটির সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, জীবন হইতে আহরণ করিয়া সর্ববিধ চরিত্রসৃষ্টি করিতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, এমন অনেক লোক আছে যাহারা অনশন ও অত্যাচার ভোগ করিতেছে, আবার সেই একই সময়ে এমন লোকও আছে যাহারা স্বজাতির উপর অত্যাচার ও শোষণ চালাইতেছে। এইরূপ অবস্থা এতই ব্যাপক ও সাধারণ যে লোকে এটিকে অনিবার্য বলিয়াই ধরিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এই সব প্রাত্যহিক ঘটনাকে সুসংহত ও সুসংবদ্ধভাবে রূপ দেওয়াই সাহিত্য ও শিল্পের কাজ। এইরূপ সাহিত্য ও শিল্প জনগণকে কর্মে প্রেরণা দেয়, তাহাদের জাগাইয়া তোলে এবং সংঘবদ্ধরূপে সংগ্রাম চালাইবার জন্য ঐক্যবদ্ধ করে।

[ তিন ]

Hannibal. Marcellus! Ho! Marcellus! He moves not—he is dead. Did he not stir his fingers? Stand wide, soldiers—wide, forty paces—give him air—bring water—half! Gather those broad leaves, and all the rest, growing under the brush-wood—unbrace his armour. Loose the helmet first—his breast rises. I fancied his eyes were fixed on me, they have rolled back again. Who presumed to touch my shoulder? This horse? It was surely the horse of Marcellus! Let no man mount him. Ha! Ha! the Romans too sank into luxury. Here is gold about the charger Gaulish chieftain.

Execrable thief! The golden chain of our King under a beast's grinders! The vengeance of the gods hath overtaken the impure.
*D. U.B. A.'58*

হানিবল। মার্সেলাস্, ওহে মার্সেলাস্! ও কি, ও তো নড়ছে না—সে যে মরে গিয়েছে। ঐ যে ওর আঙ্গুলগুলো নড়ল না কি? সৈনিকগণ, সরে দাঁড়াও, তফাৎ যাও, চল্লিশ পা তফাৎ যাও—ওকে একটু হাওয়া পেতে দাও—জল নিয়ে এস—তোমাদের মধ্যে অর্ধেক অংশ। বাকি আর সকলে ঝোপের নীচে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঐ বড় বড় পাতা একত্র কর—ওর বর্ম খুলে দাও। শিরস্ত্রাণটি আগে আল্‌গা করে দাও—(ঐ দেখ) ওর বুক ফুলে উঠ্‌ছে। ঐ তো আমার মনে হল ওর চোখের দৃষ্টি যেন আমার দিকে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে, কিন্তু, না ঐ তো আবার ওর চোখ সরে গিয়েছে। ও কে, কে সাহস করে আমার কাঁধ ছুঁয়েছে? এই ঘোড়াটা? নিশ্চয়ই এটি মার্সেলাসেরই ঘোড়া! দেখো, কেউ যেন না ওর পিঠে উঠে বসে। হা! হা! রোমীয়েরাও দেখ্‌ছি, বিলাসে মগ্ন হয়ে গেছে। গল্ দেশের সেনাপতি, দেখো, এই যুদ্ধের ঘোড়াটার গায়ে সোনা রয়েছে। ঘৃণ্য চোর! একি, আমাদেরই রাজার সোনার হার আজ এই পশুর দাঁতের তলায়! দেবতাদের প্রতিহিংসা ঐ সব অশুচির উপরে গিয়ে পড়েছে।

[ চার ]

An obvious characteristic of poetry of the Greeks was that it told some sort of story. It made some statements about the ways of gods or men or the emotions of the poet, which, even though it was not true, seemed true. The epic is a false history, and the drama a feigned action. The essence of poetry, therefore, seemed to the Greeks to be illusion, a conscious illusion.

To Plato this feature of the poet's art appeared so deplorable that he would not admit poets to his Republic. Such reactionary or Fascist philosophies as Plato's are always accompanied by a denial of culture.
*C. U. B. A.'57*

গ্রীকদেশীয় কবিতার একটি স্বভাবিক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, ইহা কোন এক প্রকারের গল্প বলিত। ইহা মনুষ্য অথবা দেবতার জীবনধারা কিংবা কবির অনুভূতি বিবৃত করিত; এইগুলি সত্য না হইলেও সত্যরূপে বোধ হইত। মহাকাব্য হইল অলীক ইতিহাস এবং নাটক কৃত্রিম ক্রিয়াকলাপ মাত্র। সুতরাং গ্রীকদিগের নিকট কবিতার সত্তা ভ্রম এবং সজ্ঞান ভ্রম বলিয়া মনে হইত।

কাব্যকলার এই দিক প্লেটোর নিকট এতই শোচনীয় বলিয়া বোধ হইত যে, তিনি তাঁহার প্রজাতন্ত্রে কবিদিগের প্রবেশাধিকার দিবেন না। প্লেটোর দর্শনের ন্যায় এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল বা ফ্যাসীবাদী দর্শন কৃষ্টির অপহ্নুতি-দ্বারা সর্বদাই সংগতি-প্রাপ্ত।

[ পাঁচ ]

**On the continent almost every nation whether little or great has openly declared at one time or another that it is superior to all other**

nations: the English fight heroic wars to combat these dangerous ideas without ever mentioning which is really the most superior race in the world. Continental people are sensitive and touchy; the English take everything with an exquisite sense of humour—they are only offended if you tell them that they have no sense of humour. People on the continent erther tell you the truth or lie; in England they hardly ever lie, but they would not dream of telling you the truth.

*D. U.B.A.'57*

(ইউরোপ) মহাদেশে প্রায় প্রত্যেক ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ জাতি একদিন না একদিন প্রকাশ্যে নিজেকে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে; জগতে কোন্ জাতি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা কখনও উল্লেখ না করিয়া ইংরাজগণ এই বিপজ্জনক ধারণা প্রতিরোধ করিবার জন্যই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করে। মহাদেশীয় জনগণ সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর; ইংরাজগণ সব-কিছুই কৌতুকরসবোধের সহিত গ্রহণ করে—কেবল যখন বলা হয় তাহাদের কৌতুকরসবোধ নাই—তখনই তাহারা অসন্তুষ্ট হয়। মহাদেশের লোকেরা হয় সত্য, নয় মিথ্যা বলে। ইংলণ্ডের লোকেরা কদাচিৎ মিথ্যা বলে কিন্তু তোমাকে সত্য বলিবার কথা স্বপ্নেও ভাবে না।

## [ ছয় ]

There was once in times of yore and ages long before, a great and puissant King, of the Kings of Persians, Sabur by name, who was the richest of all the Kings in store of wealth and dominion and surpassed each and every in wit and wisdom. He was generous, openhanded and benificient, and he gave to those who sought him and repelled not those who resorted to him; and he comforted the broken-hearted and honourably treated those who fled to him for refuge.

*R. U. B. A.'57*

বহু প্রাচীনকালে একদা পারসিকগণের নৃপতিবৃন্দের মধ্যে সাম্রাজ্যে ও ঐশ্বর্যে সর্বাপেক্ষা ধনী এবং বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে অদ্বিতীয় সবুর নামে এক মহান্ ও পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি উদার মুক্তহস্ত এবং দয়ালু ছিলেন, তাঁহার নিকট যাহারা প্রার্থী হইত, তাহাদিগকে তিনি দান করিতেন এবং যাহারা তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হইত, তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতেন না; এবং তিনি ভগ্নহৃদয় ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিতেন আর যাহারা তাঁহার নিকট আশ্রয়ের জন্য যাইত তাহাদিগকে সম্মান সমাদর করিতেন।

## [ সাত ]

Ours is a vast country with a population of 350 millions. Our vastness in area and population has hitherto been a source of weakness. It is to-day a source of strength if we can only stand united and boldly face our rulers. From the standpoint of Indian unity

the first thing to remember is that the division between British India and the Indian States is an entirely artificial one. India is one and the hopes and aspirations of the people of British India and of the Indian States are identical. Our goal is that of an independent India and in my view that goal can be attained only through a federal republic in which the Provinces and the States will be willing partners. *C. U. B. A. '56*

আমাদের দেশ বিশাল এবং ইহার জনসংখ্যা পঁয়ত্রিশ কোটি। সাম্প্রতিক কাল অবধি আয়তনের ও জনসংখ্যার বিশালতা আমাদের দুর্বলতার কারণস্বরূপ ছিল। বর্তমানে আমরা যদি কেবলমাত্র সংঘবদ্ধ হইয়া সাহসভরে শাসকদের সম্মুখীন হইতে পারি, তাহা হইলে ইহা শক্তির উৎসস্বরূপ হইবে। ভারতীয় ঐক্যের দিক হইতে বিচার করিলে প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষ এবং দেশীয় রাজ্যের বিভেদ সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম। ভারতবর্ষ অখণ্ড এবং ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের জনগণের আশা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা অভিন্ন। স্বাধীন ভারতবর্ষই আমাদের লক্ষ্য এবং আমার মতে যে সংযুক্ত সাধারণতন্ত্রে প্রদেশসমূহ ও রাজ্যাদি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অংশীদার হইবে, তাহারই মাধ্যমে ঐ লক্ষ্য অর্জিত হইতে পারে।

## [ আট ]

Now that you are going a little more into the world, I will take this occasion to explain my intentions as to your future expenses, that you may know what you have to expect from me, and make your plan accordingly. I shall neither deny nor grudge you any money that may be necessary for either your improvement or pleasures; I mean the pleasures of a rational being. Under the head of improvement, I mean the best books and the best masters, cost what they will; I also mean all the expenses of lodgings, coach, dress, servants etc., which shall be necessary to enable you to keep the best company. *D. U. B. A. '56*

তুমি এখন আরও একটু বেশি সংসারে প্রবেশ করিতেছ—আমি এই সুযোগে তোমার ভবিষ্যতের ব্যয় সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করি যাহাতে তুমি আমার নিকট যতটুকু আশা করিতে পার সেই অনুযায়ী স্বীয় পরিকল্পনা নির্ধারণ করিতে পার। তোমার উন্নতি বা আমোদপ্রমোদের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা দিতে আমি অস্বীকার বা কুণ্ঠাবোধ করিব না; আমি বুদ্ধি-বিবেচনা-সম্পন্ন ব্যক্তির আমোদ-প্রমোদের কথাই বলিতেছি। উন্নতির দফায় সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং শিক্ষকদের কথাই বলিতেছি তাহাতে যত ব্যয়ই হউক না কেন, উত্তম সঙ্গ রাখিবার জন্য তোমার আবাস, চতুর্চক্রযান, পোশাক, ভৃত্য ইত্যাদির সমুদয় ব্যয়ের কথাও আমি বলিতেছি।

[ নয় ]

A Farmer being on the point of death, and wishing to show his sons the way to success in farming, called them to him, and said, "My children, I am departing from this life, but all that I have to leave you, you will find in the vineyard," The sons, supposing that he referred to some hidden treasure, as soon as the old man was dead, set to work with their spades and ploughs and every implement that was at hand. and turned up the soil over and over again. They found indeed no treasure ; but the vines, strengthened and improved by this thorough tillage, yielded a finer vintage than they had ever yielded before and more than repaid the young husbandmen for all their trouble. So truly is industry in itself a treasure. *R. U. B. A. '56*

কৃষিকার্যে কিরূপে সফলতা লাভ করিতে হয় তাহা দেখাইবার জন্য একজন মুমূর্ষু কৃষক পুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিল, "মোর বৎসগণ, আমি ইহজীবন ত্যাগ করিতেছি, কিন্তু তোমাদের জন্য যাহা কিছু রাখিবার তাহা তোমরা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পাইবে।" সে কোন গুপ্তধনের কথা বলিতেছে, ইহাই অনুমান করিয়া পুত্রগণ বৃদ্ধলোকটি মারা যাইবামাত্র তাহাদের কোদালি, লাঙ্গল এবং হাতের কাছে বিদ্যমান যন্ত্রপাতি লইয়া বারবার ভূমি-কর্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা বস্তুতঃ কোন গুপ্তধন দেখিতে পাইল না, কিন্তু এই সুগভীর কর্ষণের ফলে সতেজ ও পরিপুষ্ট দ্রাক্ষালতাগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দ্রাক্ষা-মদিরা উৎপন্ন করিল এবং কৃষকগণ তাহাদের সকল কষ্টভোগের জন্য অনেক বেশি প্রতিদান পাইয়াছিল। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পরিশ্রমই সম্পদ।

[ দশ ]

You always had the advantage. You could hypnotize me when I was wide awake, so that I neither saw nor heard, but merely obeyed; you could give me a raw potato and make me imagine it was a peach; you could force me to admire your foolish caprices as though they were strokes of genius. But when at last I awoke, I realised that my honour had been corrupted and I wanted to blot out the memory by a great deed, an achievement, a discovery, or an honourable suicide. I wanted to go to war, but was not permitted. It was then that I threw myself into science. And now when I was about to reach out my hands together in its fruits, you chop off my arms. *C. U. B. A. '55*

(আমার উপর) তোমার সর্বদাই অনেকটা জোর ছিল [ অথবা আমার উপর তুমি সর্বদাই জোর খাটাইতে পারিতে ]। যখন আমি সম্পূর্ণ জাগ্রৎ থাকিতাম, তখন তুমি আমাকে সম্মোহিত করিতে পারিতে, যাহার ফলে আমি কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইতাম না—কেবলমাত্র তোমার আদেশ পালন করিয়া যাইতাম ; তুমি আমাকে একটা কাঁচা আলু দিয়া তাহাকে পিচ্ ফল বলিয়া কল্পনা করিতে বাধ্যকরিতে

পারিতে ; তোমার নির্বোধের মত খেয়ালগুলিকে [ বা ছেলেমানুষীকে ] প্রতিভার দান বলিয়া প্রশংসা করিতে আমাকে বাধ্য করিতে পারিতে। কিন্তু শেষে যখন আমি জাগিয়া উঠিলাম, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার ধর্ম নষ্ট হইয়াছে এবং আমি একটি মহৎ কার্য বা একটি কীর্তি বা একটি আবিষ্কার অথবা সসম্মানে আত্ম-হত্যার দ্বারা তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছিলাম। আমি যুদ্ধে যোগদান করিতে চাহিয়াও অনুমতি পাই নাই। তখনই আমি বিজ্ঞান-চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। আর এখন আমি উহার ফল আহরণ করিবার জন্য যেই হাত বাড়াইতে উদ্যত হইয়াছি, তখনই তুমি আমার বাহু দুইটিকে কাটিয়া ফেলিলে।

## [ এগারো ]

It was the night before the day fixed for his coronation, and the young king was sitting alone in his beautiful chamber. His courtiers had all taken their leave of him, bowing their heads to the ground, according to the ceremonious usage of the day, and had retired to the great hall of the palace to receive a few last lessons from the professor of etiquette ; there being some of them who had still quite natural manners, which in a courtier is, I need hardly say, a very grave offence. The lad—for he was only a lad, being but sixteen years of age—was not sorry at their departure. *D. U. B. A. '55*

তাঁহার অভিষেকের জন্য নির্দিষ্ট দিনটির পূর্বরাত্রে তরুণ নৃপতি একাকী তাঁহার সুদৃশ্য কক্ষে বসিয়াছিলেন। তৎকালীন প্রচলিত আনুষ্ঠানিক প্রথা-অনুসারে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সভাসদেরা সকলেই বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, এবং আচারব্যবহারের শিক্ষকের নিকট হইতে শেষ উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য রাজপ্রসাদের প্রকাণ্ড সভাগৃহে মিলিত হইয়াছিল ; তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের তখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আচরণের অভ্যাস ছিল। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সভাসদের পক্ষে এরূপ ব্যাপার অতি সাংঘাতিক গুরুতর অপরাধ। বালকটি—নৃপতি তখনও বালকমাত্রই ছিলেন, মাত্র ষোড়শবর্ষের তরুণ—তাহাদের বিদায়গ্রহণে দুঃখিত বোধ করেন নাই।

## [ বারো ]

To-morrow as yesterday, the fittest will survive in the struggle for existence. But whereas in the past selfishness was the measure of fitness, in the future survival value will be determined by breadth and depth of love. Modern science is teaching, as it never was taught before, that no one lives to himself alone. Co-operation between individuals, and then between families, was essential to the life of man when he competed with the brutes of field and forests. Still greater co-operation between clans and nations is now essential to his continued

life on the earth. Now, as always, individuals and peoples who are not in line with the great forward movements in the evolutionary trend are doomed to die. *R. U. B. A. '55 ; C. U. B. A. '51*

গতকালের ন্যায় আগামী কালেও জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন হইবে। কিন্তু অতীতে যেখানে স্বার্থপরতারই ছিল যোগ্যতার পরিমাপ, ভবিষ্যতে সেখানে প্রেমের প্রসারতা ও গভীরতা-দ্বারা উদ্বর্তন-মূল্য নির্ধারিত হইবে। ইহা পূর্বে কখনও শেখানো না হইলেও, আধুনিক বিজ্ঞান ইহাই শিক্ষা দিতেছে যে, কেহই একাকী বসবাস করে না। যখন প্রান্তর এবং অরণ্যাদির পশুদিগের সহিত মানুষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছিল, তখন ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, পরিবারে-পরিবারে সহযোগিতা মানবজীবনের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। এক্ষণে জগতে ধারাবাহিক জীবনযাপনের জন্য সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, জাতিতে-জাতিতে আরও অধিকতর সহযোগিতা অপরিহার্য। এক্ষণে এবং সব সময়েই যে সকল ব্যষ্টি-মানুষ ও সমষ্টি-মানুষ ক্রমাভিব্যক্তির প্রশ্রয়ে বলিষ্ঠ অগ্রগতির সহিত পংক্তিবদ্ধ নয়, তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য।

[ তেরো ]

The chief trouble in this perplexing world is that there are so many people afflicted with the mania of owning things that really do not need to be owned in order to be enjoyed. Their experience must be exclusive or they have no pleasure in them. I have heard of a man who countermanded an order for a portrait when he found that some one else in the same town had forestalled him in the possession of a copy. It was not the beauty of the painting that appealed to him : It was the petty and childish notion that he was the fortunate and privileged owner of a rare artistic specimen, and with the discovery that others also shared his good fortune his interest in the object of beauty vanished.

*C. U. B. A. '54*

এই বিভ্রান্তকারী জগতে সর্বাপেক্ষা প্রধান বিপদ হইল এই যে, যে সব জিনিসকে উপভোগ করিতে হইলে তাহাদিগের অধিকারী হইবার প্রয়োজন নাই এমন জিনিসের মালিক হইবার বাতিক এত বেশি লোককে এই জগতে পাইয়া বসিয়াছে। তাহাদের অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র তাহাদের নিছক একারই হওয়া চাই, তাহা না হইলে তাহারা ইহাতে কোনই আনন্দ পায় না। আমি জানি, একটি শহরে যখন একটি লোক দেখিতে পাইল যে, সেই শহরের আর এক ব্যক্তি এই ছবির আর একটি প্রতিলিপি আগেই কিনিতে চাহিয়াছে, তখন সে নিজে এই ছবিটির অর্ডার বাতিল করিয়াছিল। ছবিটির সৌন্দর্যই যে তাহার কাছে আদরণীয় ছিল তাহা নয়। সে যে একটি অতি দুষ্প্রাপ্য শিল্পনিদর্শনের একমাত্র বিশেষ ভাগ্যবান্ অধিকারী, এই অতি হীন শিশুসুলভ ধারণাই তাহার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে যেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে অন্যেরাও

তাহারই সৌভাগ্যের তুল্য অধিকারী, তখনই সেই সৌন্দর্য-নিদর্শনের প্রতি তাহার আগ্রহ অন্তর্হিত হইয়া গেল।

[ চোদ্দ ]

I continue my letter. It is night, everybody is asleep ; I am sitting up late writing to you, before the open window. The garden is full of scents : the air is warm. Do you remember when we were children, whenever we saw or heard anything very beautiful, we used to say to ourselves, 'Thanks, Lord, for having created it.' To-night I said to myself with my whole soul, 'Thanks, Lord, for having made the night so beautiful !' And suddenly I wanted you there—close to me—with such violence that perhaps you felt it. Yes, you were right in your letter when you said. 'In generous hearts admiration is lost in gratitude.' *D. U. B. A. '54*

আমার চিঠি শুরু ক'রছি। এখন রাত, প্রত্যেকেই ঘুমন্ত ; তোমাকে লেখার জন্য এত রাতে খোলা জানলার সামনে বসেছি। উদ্যানটি সৌরভে পরিপূর্ণ, বাতাস উত্তপ্ত। যখন আমরা শিশু ছিলাম, যেখানেই আমরা অতীব সুন্দর কিছু দেখ্তাম বা শুনতাম, আমরা নিজেদের মধ্যে ব'লতাম, হে প্রভো ! এহেন সৃষ্টির জন্য তোমায় ধন্যবাদ !'—সে কথা কি তোমার মনে আছে ? আজ রাতে আমার সারা অন্তর দিয়ে আমি আপন মনে ব'লছিলাম, 'হে প্রভো ! রাতটিকে এত সুন্দর করে তৈরী করায় তোমায় ধন্যবাদ !' আর অকস্মাৎ তোমায় সেখানে চেয়েছিলাম—আমার ঠিক পাশেই —এমন দুরন্ত ব্যাকুলতা নিয়ে যে সম্ভবতঃ তুমি এটা অনুভব করেও থাকতে পার ! হ্যাঁ, 'মহান্ হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার মাঝে বিস্ময় যায় হারিয়ে'—তোমার চিঠিতে এটা যা লিখেছিলে, তা ঠিক।

[ পনেরো ]

In the last World War the Allies accused Germany of using poison gas and thus violating a sacred convention. The same charge was returned by Germany. Very likely both parties violated the law. What happened in the last war will be repeated in the next war. To prevent the use of atom bomb war inself must be outlawed There is no other remedy. Possibly scientists are busy devising some defensive measures against atom bomb. In the last war we crawled in slit trenches as a measure of safety. In the next war we shall probably be asked to go down in deep under-ground caves to escape from atom bomb. *R. U. B. A. '54*

গত বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি এই অভিযোগ করিয়াছিল যে, জার্মানী বিষবাষ্প ব্যবহার করিয়া একটি পবিত্র নীতি লঙ্ঘন করিয়াছে। জার্মানী ( উহাদের বিরুদ্ধে ) পাল্টা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। সম্ভবতঃ উভয় পক্ষই এই বিধিটি ভঙ্গ করিয়াছিল। গত যুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছিল, আগামী যুদ্ধেও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে। আণবিক বোমার

ব্যবহার বন্ধ করিতে হইলে যুদ্ধমাত্রকেই অবশ্য বর্জন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আর কোনও প্রতিকার নাই। সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিকেরা আণবিক বোমার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত আছেন। গত যুদ্ধে আমরা নিরাপত্তার জন্য পরিখা কাটিয়া তাহার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম। আগামী যুদ্ধে আণবিক বোমা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সম্ভবতঃ গভীর ভূতলস্থ গহ্বরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতে আমাদের বলা হইবে।

## [ ষোলো ]

Cricket as I know and love it, is part of that holiday time which is the Englishman's heritage—a play-time in a homely countryside. It is a game that seems to me to take on the very colours of the passing months. In the spring, cricketers are fresh and eager ; ambition within them breaks into bud. The showers of May drive the players from the field, but soon they are back again, and every blade of grass around them is a jewel in the light I like this intermittent way of cricket's beginning in spring weather. A season does not burst on us, as football does, fullgrown and arrogant ; it comes to us every year with a becoming modesty and hesitation. *C. U. B. A.'53*

ক্রিকেট্‌কে আমি যেভাবে জানি ও ভালবাসি, সেটি অবকাশের অঙ্গ, ইংরাজদের ঐতিহ্য—সাধারণ গ্রামাঞ্চলে ক্রীড়াকৌতুকের সময়। আমার ত মনে হয়, এই খেলাটি তৎকালীন মাসগুলির বৈশিষ্ট্য দিয়াই রঞ্জিত হয়। বসন্তকালে ক্রিকেট্‌ খেলোয়াড়েরা সতেজ সজীব উন্মুখ থাকে। তাহাদের অন্তরের উচ্চাভিলাষ বিকচোন্মুখ হইয়া পড়ে। মে মাসের বৃষ্টিধারা খেলোয়াড়দের ক্রীড়াভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য করে, কিন্তু তাহারা শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসে। আর তাহাদের চারিদিকে প্রত্যেকটি ঘাসের শীষ আলোয় রত্নের ন্যায় যেন ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠে। বসন্তকালে এইভাবে ক্রিকেটের আবির্ভাব আমার কাছে ভালই লাগে। ফুট্‌বল খেলা যেমন সম্পূর্ণাঙ্গ ভাবে সগর্বে আমাদের উপর আসিয়া পড়ে, ক্রিকেট্‌ খেলার মরসুম তেমনি করিয়া আমাদের উপর সহসা আসিয়া পড়ে না। প্রতি বৎসর যথোচিত নম্রভাবে এবং দ্বিধাসংকোচের সহিত ক্রিকেটের মরসুম আমাদের কাছে আসিয়া থাকে।

## [ সতেরো ]

Among the famous men of Bengal in the nineteenth century no name deserves a more honoured place than that of Rājā Rām Mohan Rāy. At once the pioneer of the great Renaissance that was slowly dawning in Bengal and the first representative of India to the British people, he opened up to his fellow countrymen new paths of progress and reform. When as yet the old traditions and the old beliefs, clothed in the gathe-

red ignorance of centuries, still held their ground unchallenged, he zealously sought fresh knowledge, and when found, proclaimed it unafraid. *D. U. B. A.'53*

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের অপেক্ষা বেশি শ্রদ্ধাভাজন আসনের দাবি আর কেহই করিতে পারেন না। বাংলায় ধীরে ধীরে যে মহান্ নবযুগের প্রভাত হইতেছিল, তিনি একাধারে তাহার পথপ্রদর্শক এবং ব্রিটিশজাতির নিকট ভারতের প্রথম প্রতিনিধি। তিনি স্বদেশীয়দের সম্মুখে উন্নতি ও সংস্কার-সাধনের নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যখন বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অজ্ঞতার মধ্যে প্রাচীন কুসংস্কার এবং প্রাচীন অন্ধবিশ্বাস অপ্রতিহতভাবে বিরাজ করিতেছিল, তখন তিনি উৎসাহসহকারে নবীন জ্ঞানালোকের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, এবং সেই জ্ঞানালোক আবিষ্কার করিয়া নির্ভয়ে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন।

## অনুশীলনী

[ এক ]

My whole being was too tortured—every heart-beat only crying out for my children. The night I passed in waiting for the morning. Then I would rise and swim out into the sea. I thought I would swim so for that I should be unable to return, but always my body, of itself, turned landward—such is the force of life in a young body.

One grey autumn afternoon, I was walking alone along the sands, when suddenly, I saw going ahead of me the figures of my childrin, hand in hand. I called to them, but they ran laughing. I ran after them—followed—called and suddenly they disappeared in the midest of the seasbray. *C. U. B. A.'59*

[ দুই ]

Never has the French soldier given any indication other than that he fights for his country, his cities, his farms, his homes. Never does he give way to the lust of battle for battles' sake. He sees in this war an evil, a scourge laying waste his beloved country, and he consideres it to be his duty to his forefathers, himself and his children to rid the earth of this plague. The cultivated Frenchman will take pains to explain to you how illogical, un-intelligent uncivilised is war ; yet you will see this same cultivated Frenchman wearing the uniform of his motherland racing like a fighting fury to the muzzle of the machine-guns. *D. U. B. A.'5[illegible]*

[ তিন ]

Is it not that in all the universe there is but one great cry containing Sorrow, Joy, Ecstasy, Agony—the Mother-cry of Creation I heard my cries—the same cries as I had heard at their birth. From

my earliest childhood I have always felt a great antipathy for anything connected with the churches. The readings of Ingersoll and Darwin and Pagan philosophy had strengthened this antipathy. As I had the courage to refuse to have my children baptised, so now I refused to admit in their death the ridiculous ceremonial one calls Christian burial. I had one desire—that this horrible accident should be transformed into beauty. How splendid was the act of Byron in burning Shelley's body on the pyre by the sea ! *C. U. B. A. '58*

[ চার ]

Not only has the religious belief declined, but the fear of consequences has declined, too. Prison is not so terrible a thought as it used to be. People believe that prisoners are fairly well treated and prison is no longer thought of as shameful. With this decline of religion and failure of discipline has come greater temptation. Not only are many things scarce, but people need more pocket money than they used to do for cinemas, cigarettes, football pools, dog races, always travelling about by buses and so on. All this incessant need for money puts a premium on fraud.

*D. U. B. A. 57*

[ পাঁচ ]

There was once a musician named Kreuzberg. He was fond of Sun and flowers and children ; but he could not live on the Sunny side because of his delicate instruments. In a tall champagne glass with a gold rim he used to have a red rose standing every day as a memorial and an offering to her who had once been his life's sun. Now yesterday evening he had put an absolutely fresh rose in the water and to-day it was witherd, shrunken, dead, with its head bowed on its breast—a bad sign ! He brought a new rose that evening, a really fresh one. Next morning—alas ! the petals of the rose had fallen from the stalk. He thought, 'She who was my all, my conscience, my muse, disapproves of me ; what have I done ?'

*C. U. B. A. '57*

[ ছয় ]

There lived in the city of Baghdad, during the reign of the Commander of the Faithful, Harun-al-Rashid, a man named Sindabad, the Porter, one in poor condition who bore burdens on his head for hire. It happened to him one day of great heat that whilst he was carrying a heavy load, he became exceedingly weary and sweated profusely, the heat and the weight alike oppressing him. Presently, as he was passing the gate of a merchant's house, before which the ground was swept and watered, and there the air was temperate, he sighted a broad bench beside the door ; so he set his load thereon, to take rest and smell the air. *R. U. B. A. '57*

[ সাত ]

Rip Van Winkle was one of those happy mortals, of foolish, well-oiled dispositions, who take the world easy. If left to himself, he would have whistled life away in prefect contentment : but his wife kept continually dinning into his ears about idleness, his carelessness, and to ruin he was bringing on his family. Morning, noon, and night, her tongue was incessantly going, and everything he said or did was sure to produce a torrent of household eloquence. Rip had but one way of replying to all lectures of the kind, and that, by frequent use, had grown into a habit. He shrugged his shoulders, shook his head, cast up his eyes, but said nothing.

*D. U B. A.'56*

[ আট ]

Certain it is, that the whole of the most ancient literature of the Indians arose without the art of writing and continued to be transmitted without it for centuries. Whoever wished to become acquainted with a text had to go to a teacher in order to hear it from him. Therefore, we repeatedly read in the older literature, that a warrior or a Brahman, wished to acquire a certain knowledge, travels to a famous teacher, and undertakes unspeakable troubles and sacrifices in order to participate in the teaching, which cannot be attained in any other manner. Therefore to a teacher, as the bearer and preserver of the sacred knowledge, the highest veneration is due, according to ancient Indian law ;—as the spiritual father he is venerated, now as an equal, now as a superior, of the physical father.

*C. U. B. A.'56*

[ নয় ]

There was a Prince who was very much famed throughout all the countries ; he was a great conquerer, and was patent, rich and just. One day he said to his minister, "Put on the best speed : I will run my horse against thine, that we may see which is the swiftest ; I have a long time had a strange desire to make this trial". The minister, in obedience to his master, spurred his horse, and rode full speed, and the king followed him. But when they were got at a great distance from the grandees and nobles that accompanied them, the king, stopping his horse, said to the minister. "I had no other design in this but to bring thee to a place where we might be alone ; for I have a secret to impart to thee, having found thee more faithful than any other of my servants."

*R. U. B. A.'56*

[ দশ ]

Oriental praise is apt to be somewhat high flown ; but Cordova really deserved the praise that has been lavished upon it. In its present state it is impossible to form any conception of the extent

aud beauty of the old Moorish capital in the days of the great Calif. Its narrow streets of white-washed houses convey but a faint impression of its once magnificent extent; the palace, Alcazar, is in decay, and its ruins are used for the vile purpose of a prison; the bridge still spans the Guadalquivir, however, and the noble mosque of the first Omeyyad is still the wonder and delight of travellers.

*D. U. B. A.'55*

[ এগারো ]

The problem, which must be solved, if the future of the world is to be less terrible than its present, is the problem of preventing nations from getting into the moods of England and Germany at the outbreak of the war. These two nations might be taken as almost mythical representatives of pride and envy—cold pride and hot envy. Germany declaimed passionately: "You, England, swollen and decrepit, you overshadow my whole growth—your rotting branches keep the sun from shining upon me and the rain from nourishing me. Your spreading foliage must be lopped, that I too may have freedom to grow."

*C. U. B. A.'55*

[ বারো ]

The choicest flowers were to be seen in the garden; and to the prettiest of these, little silver bells were fastened, in order that their tinkling might prevent any one from passing by without noticing them. Yes! Everything in the Emperor's garden was wonderfully well arranged; and the garden itself stretched so far that even the gardener did not know the end of it. Whoever walked farther than the end of the garden, however, came to a beautiful wood with very high trees, and beyond that to the sea. The tall trees went down quite to the sea, which was very deep and blue, so that large ships could sail close under their branches.

*R. U. B. A. '54*

[ তেরো ]

I sometimes look into the past for some set of memoirs out of which to make myself a story, but there are none in which I can recognize myself, none that contain my overflowing life. I realize then that I only live in each fresh succeeding moment. What people call 'withdrawing into oneself' is to me an impossible constraint; I can no longer understand the word 'solitude'; to be alone with myself is to be nobody; I am peopled. For that matter, I am never at home save everywhere; and desire always drives me out. *D.U.B.A' 54*

[ চোদ্দ ]

It is the imaginative people who suffer most from fear. Give them only a hint of peril, and their minds will explore the whole circumference of disastrous consequence. It is not a bad thing in this world to be

born a little dull and unimaginative. You will have a much more comfortable time. And if you have not taken that precaution, you will do well to have prosaic person handy to correct your fantasies. Therein Donn Quixote showed his wisdom. In the romantic theatre of his mind perils rose like giants on every horizon ; but there was always Sancho Panza on his donkey, ready to prick the bubbles of his master with the sword of his incomparable stupidity. *C. U.B. A.'54*

[ পনেরো ]

The Muhammadan community of Bengal owes a debt of gratitude to Nawab Abdul Latif Bāhādur which it behoves it never to forget. He found it backward and apathetic, sunk in ignorance and prejudice and content to see itself surpassed in every walk of life by the non-Muslim community, helplessly clinging to its old ideals and traditions and obstinately refusing to recognize the march of events and the necessity of change. He left it awake and eager to regain its ground that had been lost, struggling manfully against great odds and assiduously equipping itself with the weapons which it had so long despised. *D. U. B. A.'53*

[ ষোল ]

A diary need not be a dreary chronicle of one's movements ; it should aim rather at giving a salient account of some particular episode, a walk, a book, a conversation. It is a practice which brings its own reward in many ways ; it is a singularly delightful to look at old diaries, to see how one was occupied ten years ago ; what one was reading, the people one was meeting, one's earlier point of view. And then further it has the immense advantage of developing style ; the subjects are ready to hand ; and one may learn, by diarizing, the art of sincere and frank expression. *C. U. B. A.'53*

[ সতেরো ]

Who will care to assert that a few years hence he will be found still clinging to the attitude he adopts now ? A few years ago he probably held a different view, and held it equally firmly. In retrospect we can see that the tenacity of our beliefs is no measure of their accuracy. The fact that we have come to change our outlook is a good sign. Whether it be regarded as a progress or the reverse, however, what is inescapable is that beliefs can almost be dated. They are events in our history, they are our land-marks. You can look back on that succession of finger-posts and recognise the *being* that was you gradually being transformed and culminating in the *being* that is you now. *C. U. B. A.'52*

# তৃতীয় খণ্ড

## ভাব-সম্প্রসারণ ঃ ভাবার্থ ঃ সারাংশ ঃ বস্তুসংক্ষেপ ঃ ব্যাখ্যা ঃ গূঢ় মম ঃ কেন্দ্রীয় ভাব ঃ ভাব বিবৃতি

## অবতরণিকা

[ এক ]

পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন পদ্যাংশ অথবা গদ্যাংশ হইতে ভাব-সম্প্রসারণ, ভাবার্থ, সারাংশ, বস্তুসংক্ষেপ, ব্যাখ্যা, ভাব-বিবৃতি ইত্যাদি লিখিবার প্রশ্ন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌টারমিডিয়েট্‌ ও বি. এ. পরীক্ষায় আসিয়া থাকে। এই প্রশ্নে থাকে পনেরো নম্বর। কিন্তু পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীগণ এই সামগ্রীগুলির সম্যক পরিচয় ও ইহাদের রচনা-পদ্ধতি জানে না বলিয়াই একটি লিখিতে বসিয়া লিখিয়া বসে অন্যটি। অবশ্য প্রশ্নকর্তাগণও প্রশ্নাদিতে ভাষা-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীগণের এই সামগ্রীগুলি সম্পর্কিত বোধশক্তিকে যাচাই করিয়া লইবার প্রয়াস পান। ফলে পরীক্ষামণ্ডপে ছাত্রছাত্রীগণ বড়ই বিপন্ন বোধ করে। তাই সর্বাগ্রে এই সামগ্রীগুলির স্বরূপ-পরিচয় ও নির্মাণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হইবার প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য।

ভূমিকা

গোড়াতেই বলি ভাব-সম্প্রসারণের কথা। বীজাকারে যে ভাবটি কোন পদ্যাংশ অথবা গদ্যাংশের মধ্যে নিহিত থাকে, তাহাকে আরও বিস্তৃত, আরও সম্প্রসারিত, আরও স্ফীত করিয়া প্রকাশ করিবার নামই **ভাব-সম্প্রসারণ**। ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় **Amplification of Idea** বা **Expansion of Idea**। গভীর ভাব বা গূঢ় তত্ত্বকথাকে সংহত রচনার মধ্যে রাখিতে পারিলে ইহা স্বতঃই বিশিষ্ট সৌন্দর্যে বিমণ্ডিত হয়। ঠিক এই কারণেই আমাদের প্রবাদ-প্রবচনগুলির এত সৌন্দর্য, এত মাধুর্য! প্রচলিত ও স্বল্পপরিসর প্রবাদ-প্রবচনগুলির বাচ্যার্থ বা আভিধানিক অর্থ যাহাই হউক না কেন, উহাদের ভিতরকার অর্থ বা লক্ষ্যার্থই তো উহাদের আত্মা। উহাদের মধ্যে কি বিপুল ভাবই-না বীজের ন্যায় অবস্থান করে। এমনি ভাবে ছোট ছোট কবিতায়, বড় কবিতার অংশে অংশে, ছোট ছোট পদ্যাংশেও বিপুল ভাব ভ্রূণাকারে অধিষ্ঠান করে। ভাব-সম্প্রসারণ করিতে হইলে এই ভাববীজটিকে শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত এক বিরাট্‌ ভাববৃক্ষরূপে পরিণত করিতে হয়। ভাব-সম্প্রসারণের বেলায় ইহাই সবিশেষ লক্ষণীয় যে, মূলভাবটি বুঝাইবার জন্য উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত হয় নাই, এমন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়। 'ভাব-সম্প্রসারণ

ভাব-সম্প্রসারণ

কর'—এই নির্দেশটি 'মর্মবাণী বিস্তৃত কর', 'মর্মসত্য সম্প্রসারণ কর', 'অর্থ সম্প্রসারণ কর', 'ভাবার্থ সম্প্রসারিত কর', 'ভাববিস্তার কর' ইত্যাদি রূপে প্রশ্নপত্রে লিখিত হয়।

অতঃপর ভাবার্থের কথা! উদ্ধৃতাংশের মধ্যে ব্যাপকভাবে, সাধারণরূপে যে মূলভাবটি সংগুপ্ত থাকে, তাহারই অর্থ লিখিতে বলা হয় বলিয়া এই সামগ্রীটির নাম **ভাবার্থ**। ভাবার্থে উদ্ধৃতাংশের কল্পনাবস্তু ( **Imagery** ) আদৌ থাকিবে না। উদ্ধৃতাংশের কোন বিশেষ নির্দিষ্ট ভাব নয়, নির্বিশেষ ব্যাপক ভাবটিই ভাবার্থে পরিস্ফুট করা হয়। উদ্ধৃতাংশের উপমা অলংকারাদি ভাবার্থ লিখিবার কালে বর্জন করিতে হয়। ভাবার্থে সাহিত্যশিল্পগত সৌষ্ঠব থাকা সমীচীন। ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় **Sense**।

ভাবার্থ

অনেকে মনে করেন, ভাবার্থ ও সারাংশ একই রকমের সামগ্রী। কিন্তু আকার ও প্রকার, কোনটির দিক দিয়া উভয়ে এক নয়, বিভিন্ন। ভাবার্থে নির্বিশেষ ব্যাপক ভাবটিরই অর্থ পরিস্ফুট করা হয়, কিন্তু সারাংশে কেবলমাত্র প্রধান ভাবটিই যুক্তিপরম্পরায় অভিব্যক্ত হয়। অর্থাৎ একটিতে হয় ভাবের অর্থ-পরিস্ফুটন, অপরটিতে হয় প্রধান ভাবের যুক্তিসংবলিত সার-সংকলন মাত্র। আবার ইহাও সবিশেষ লক্ষণীয় যে, সর্ব ক্ষেত্রেই সারাংশ উদ্ধৃতাংশের চেয়ে ক্ষুদ্রায়তন-বিশিষ্ট হইলেও, ভাবার্থের বেলায় ইহার আয়তন অনির্দিষ্ট। আয়তনের দিক দিয়া ভাবার্থ উদ্ধৃতাংশের চেয়ে ছোট বা বড়, অথবা সমানও হইতে পারে। তবে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীকে ভাবার্থ লিখিবার আয়তন সম্পর্কে প্রশ্নকর্তা সময়ে সময়ে নির্দেশ দিয়া থাকেন। 'ভাবার্থ লিখ', 'ভাবসত্য ব্যাখ্যা কর', 'মর্মার্থ লিপিবদ্ধ কর' এইরূপ প্রশ্ন থাকিলে অবশ্য ইহার আয়তন রচনা সম্পর্কে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীকে এক দিক দিয়া যেমন স্বাধীনতা দেওয়া হয়, অপর দিক দিয়া তেমনি তাহাদের বোধ-শক্তি ও মাত্রাজ্ঞান পরখ করা হয়। কিন্তু ভাবার্থের আয়তন ছোট, মাঝারি বা বড় কিরূপ হইবে, সে সম্পর্কেও প্রশ্নকর্তা পরোক্ষভাবে নির্দেশ দিয়া থাকেন ঃ যেমন,—'ভাবার্থ নিজ ভাষায় পরিস্ফুট কর', 'ভাবার্থ বিশদভাবে ব্যক্ত কর', 'ভাবার্থ সংক্ষেপে লিখ' ইত্যাদি।

তারপরেই ধরা যাক্—সারাংশের কথা। উদ্ধৃতাংশের যে বিষয়টি নানা কথা, নানা যুক্তি, নানা দৃষ্টান্ত, নানা উপমা-অলংকার কল্পনা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, তাহারই একটি সংহত ক্ষুদ্র বাহুল্যবর্জিত রূপেরই নাম **সারাংশ**। ইহাতে উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত হয় নাই এমন কোন প্রসঙ্গের অবতারণা তো চলিবেই না, এমন কি

সারাংশ

উদ্ধৃতাংশের অপ্রধান ভাবগুলি একেবারে পরিহার করিয়া কেবলমাত্র প্রধান ভাবটিকেই যুক্তিপরম্পরায় ব্যক্ত করিতে হয়। শাখা-প্রশাখা-সম অপ্রধান ভাবগুলির একেবারে বর্জন ও যুক্তিসংবলিত প্রধান

ভাবটিকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ—ইহাই সারাংশের মুল কথা। সারাংশের ইংরাজি নাম **Substance**। 'সারাংশ লিপিবদ্ধ কর'—এই নির্দেশটি 'মর্ম প্রকাশ কর', 'মর্মবাণী লিপিবদ্ধ কর', 'মর্মসত্য লিখ', 'সারমর্ম লিখ' ইত্যাদি রূপে প্রশ্নপত্রে লিখিত হইয়া থাকে।

সারাংশ ভাব-সম্প্রসারণের ঠিক বিপরীত কর্ম। উদ্ধৃতাংশের মুলভাবটিকে কল্পনাশক্তি ও যুক্তিশৃঙ্খলার সাহায্যে বিশদভাবে বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত করার নাম ভাব-সম্প্রসারণ; কিন্তু সারাংশ লিখিবার কালে উদ্ধৃতাংশের যুক্তিপরম্পরাকে ও নানা কথার ভিতর হইতে কেবলমাত্র প্রধান ভাবটিকেই বাহির করিয়া লইতে হয়। মুলভাবের সহিত নানা কথা, নানা যুক্তি, নানা উপমা-অলংকার, নানা দৃষ্টান্ত জুড়িয়া ভাব-সম্প্রসারণ করা যায়; পক্ষান্তরে, নানা কথা, নানা বিষয় নানা উপমা-অলংকার, নানা দৃষ্টান্তের ডালপালা ছাঁটিয়া দিয়া অর্থাৎ সম্প্রসারিত ভাবকে সংক্ষিপ্ত আকারে রক্ষা করিয়া প্রধান ভাবটিকে প্রতিষ্ঠা করিলে সারাংশ-লিখন সমাধা হয়। ভাব-সম্প্রসারণ করিবার সময়ে ফাঁপাইয়া লেখা সহজতর, কিন্তু সারাংশ রচনাকালে স্বল্পায়ত করিয়া লেখা কঠিনতর। ভাবসম্প্রসারণে নিজের ইচ্ছামত শব্দ ও বাক্যের আতিশয্য রাখিতে বাধা নাই। অপর পক্ষে সারাংশ লিখিবার বেলায় এই সুযোগ নাই। তাই সারাংশ-লিখনের ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণশক্তি প্রয়োগ করিয়া বেশ ওজন করিয়া শব্দবিন্যাস ও বাক্যগঠন করিতে হয়। অবশ্য ভাব-সম্প্রসারণের পদ্ধতিটি জানা থাকিলে ভাল হয়। কেন না,—ইহা পরোক্ষভাবে সারাংশ লিখিতে সাহায্য করে।

ভাব-সম্প্রসারণ ও সারাংশ-লিখনের মধ্যে পার্থক্য

অনেকের ধারণা বস্তুসংক্ষেপ, ও সারাংশ এক সামাগ্রী। কিন্তু ধারণাটি ভ্রমাত্মক। উভয়ের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য আছে। **বস্তুসংক্ষেপে** প্রধান-অপ্রধান-নির্বিশেষে সকল ভাবই বিবৃত হয়। পক্ষান্তরে, সারাংশে কেবলমাত্র প্রধান ভাবটিই যথাযোগ্য যুক্তিপরম্পরায় প্রকট হয়। উভয়ের মধ্যে এই বৈসাদৃশ্যটুকু সবিশেষ লক্ষণীয়। তবে বস্তুসংক্ষেপ ও সারাংশ লিখিবার বেলায় এই দিক দিয়া সাদৃশ্য আছে যে, উদ্ধৃতাংশের সকল অপ্রয়োজনীয় বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ, শব্দালংকার, ভাবাতিরেক ও বাগ্‌বাহুল্য একেবারেই বর্জন করিতে হয়। অল্প কথায় প্রধান ও অপ্রধান ভাবগুলিকে বস্তুসংক্ষেপে এবং কেবলমাত্র প্রধান ভাবটিকেই যুক্তিপরম্পরায় সারাংশে গুছাইয়া বলিতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই সামগ্রীর আয়তন উদ্ধৃতাংশ হইতে ছোট হইবে সত্য, তবে ক্ষুদ্রায়তন করিবার পদ্ধতিটি বিভিন্ন। সারাংশ-লিখনে সাহিত্যশিল্পগত সৌষ্ঠব একান্তভাবে কাম্য, কিন্তু বস্তুসংক্ষেপে বিষয়গত সংহতিই সর্বাগ্রগণ্য। ইংরাজিতে বস্তুসংক্ষেপকে বলা হয়

বস্তুসংক্ষেপ ও সারাংশের মধ্যে পার্থক্য

**Summary**। 'বস্তুসংক্ষেপ কর'—এই নির্দেশটি 'বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে লিখ,' 'সংক্ষেপে বিষয়বস্তু লিখ' ইত্যাদি রূপেও প্রশ্নপত্রে লিখিত হইয়া থাকে।

প্রশ্নপত্রে সময়ে সময়ে অপঠিত উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যা লিখিবার নির্দেশও থাকে। পাঠ্যপুস্তক হইতে উদ্ধৃত কোন গদ্যাংশ বা পদ্যাংশের ব্যাখ্যা লিখিতে হইলে, রচয়িতা ও রচনার নাম, প্রসঙ্গ, উদ্ধৃতাংশের অর্থ, বিশিষ্ট ভাবপ্রকাশক বাক্য বা শব্দের প্রয়োগনৈপুণ্য, প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয়ের উল্লেখাদি করিতে হয়। তবে, অপঠিত উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যা করিবার কালে রচয়িতা বা রচনার নাম স্পষ্টভাবে জানা না থাকিলে দিবার প্রয়োজন নাই। অ-পূর্বপঠিত পদ্যাংশ বা গদ্যাংশের **ব্যাখ্যা** লিখিবার বেলায় উদ্ধৃতাংশের প্রধান-অপ্রধান-নির্বিশেষে সমগ্র ভাবেরই সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়। অতঃপর ব্যাখ্যার শেষ অনুচ্ছেদটিতে উদ্ধৃতাংশের বিশিষ্ট ভাব-প্রকাশক শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগমাধুর্য বিশ্লেষণ করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহা ছাড়া, উদ্ধৃতাংশে যদি কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিষয়ের উল্লেখ থাকে, তবে তাহাও ব্যাখ্যাত হওয়া চাই। এই ব্যাখ্যাকেই ইংরাজিতে বলা হয় **Explanation**। ব্যাখ্যা লিখিবার আয়তন সম্পর্কেও প্রশ্নকর্তা কখনও-বা নির্দেশ দিয়া থাকেন আবার কখনও-বা পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীর স্বাধীন বিচার-বিবেচনার উপরেও তিনি নির্ভর করেন। 'বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট কর', 'তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর', 'বিস্তৃত ব্যাখ্যা কর', 'আশয় বিশদ করিয়া সংক্ষেপে লিখ', 'ব্যাখ্যা কর' ইত্যাদি নির্দেশমূলক আয়তন সম্পর্কিত প্রশ্নাদির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ব্যাখ্যা

ইহা ছাড়া, আরও কয়েক প্রকারের সামগ্রী আছে **গূঢ় মর্ম** বা **ভাবসূত্র** বা **ভাবসংকেত**, যাহাকে ইংরাজিতে বলা হয় **Gist**, তাহা লিখিবার বেলায় নিছক বীজকল্প প্রধান ভাবের উল্লেখ থাকে। পক্ষান্তরে, সারাংশে প্রধান ভাবের সংক্ষিপ্ত সংহত পরিচয় থাকে আর ভাবার্থে নির্বিশেষ ব্যাপক ভাবটির অর্থ পরিস্ফুট করা হয়। সারাংশ এবং ভাবার্থ লিখিবার ক্ষেত্রে যুক্তিশৃঙ্খলা থাকে সত্য, কিন্তু গূঢ় মর্ম রচনাকালে কোন রকমেরই যুক্তিশৃঙ্খলা থাকে না। উদ্ধৃতাংশের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টির সরল স্পষ্ট এবং অতীব সংক্ষিপ্ত নির্দেশই গূঢ় মর্ম রচনার লক্ষ্য। **কেন্দ্রীয় ভাব**, যাহাকে ইংরাজিতে বলা হয় **Cantral Idea**, তাহা লিখিবার বেলায় কেন্দ্রগত মূলভাবটি বিবৃত করিতে হয়। 'মর্ম সত্য বিশদ কর', 'মর্মসত্য ব্যাখ্যা কর', 'কেন্দ্রীয় ভাব লিখ' ইত্যাদি প্রশ্নে কেন্দ্রগত মূলভাব-বিবৃতির আয়তন কিরূপ হইবে, তাহারই পরোক্ষ নির্দেশ দেওয়া থাকে। অবশ্য যেখানে 'ভাব বিবৃত কর' এইরূপ প্রশ্ন থাকে, সেখানে উদ্ধৃতাংশের প্রধান-অপ্রধান-নির্বিশেষে সমগ্র ভাবমণ্ডলেরই বিবৃতি লিখিতে হয়। ইহাই **ভাববিবৃতির মূল** নীতি।

গূঢ় মর্ম : কেন্দ্রীয় ভাব : ভাব-বিবৃতি

## [ দুই ]

সার্থক **ভাব-সম্প্রসারণ** করিতে হইলে, তোমাদিগকে নিম্নলিখিত উপদেশগুলি মনে রাখিতে হইবেঃ—( **ক** ) ভাব-সম্প্রসারণ করিবার পূর্বে প্রশ্নপত্রে উদ্ধৃত পদ্যাংশ অথবা গদ্যাংশ মনোযোগসহকারে অন্ততঃ চার বার পড়। ( **খ** ) প্রতিবারই পড়িবার কালে উদ্ধৃত অংশের ভিতরকার অর্থ তথা ভাববস্তুটি বুঝিবার চেষ্টা কর। ( **গ** ) প্রতিটি শব্দ ও বাক্যাংশের প্রয়োগ-সার্থকতা লক্ষ্য করিয়া সমগ্র উদ্ধৃতাংশটির যুক্তি-পরম্পরাগত অর্থ নিজের মনের মধ্যে ধারণা করিয়া ভাব-সম্প্রসারণ করিবার জন্য অগ্রসর হও। ( **ঘ** ) মূল ভাববস্তুর সঙ্গে উদ্ধৃতাংশের প্রতিটি শব্দ ও বাক্যাংশের যে অন্তর্নিহিত যোগসূত্র আছে, তাহা তোমার লেখার মধ্যে ফুটাইয়া তোল। ( **ঙ** ) উদ্ধৃতাংশে যদি রূপক, উপমা প্রভৃতি অলংকার, কিংবা উদাহরণাদি থাকে, তাহা হইলে ভাব-সম্প্রসারণের বেলায় তাহাদিগের প্রয়োগ-সার্থকতা ফুটাইয়া তোল। ( **চ** ) উদ্ধৃতাংশের সহিত ইতিহাস-পুরাণ গল্প-উপমার যদি কোন ভাবগত সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে ভাব-সম্প্রসারণকালে তাহার উল্লেখ কর। ( **ছ** ) ভাবানুষঙ্গের দরুণ অর্থাৎ ভাবের দিক দিয়া উদ্ধৃতাংশের সহিত কোন কবিতা বা কবিতাংশ, গদ্য-বাচন, কিংবা প্রবাদ-প্রবচনের মিল বা সাদৃশ্য থাকিলে তাহাও ভাব-সম্প্রসারণের বেলায় জুড়িয়া দাও। ( **জ** ) ভাব-সম্প্রসারণ করিবার কালে উদ্ধৃতাংশের তিনটি অঙ্গকে ফুটাইয়া তোল। এই তিনটি অঙ্গ হইতেছে—প্রথম, বাচ্যার্থ বা আভিধানিক অর্থ; দ্বিতীয়, লক্ষ্যার্থ বা অন্তর্নিহিত ভাববস্তু; তৃতীয়, লক্ষ্যার্থ বুঝাইবার উপযোগী কোন দৃষ্টান্ত।

ভাব-সম্প্রসারণ সম্পর্কে ইতিবাচক আটটি নির্দেশ

ভাব-সম্প্রসারণ করিবার কালে এই ইতিবাচক নির্দেশগুলি ছাড়া কয়েকটি নেতিবাচক নির্দেশও মনে রাখিবে। নেতিবাচক নির্দেশগুলি এইরূপঃ—( **ক** ) উদ্ধৃতাংশের মূল ভাববস্তুটি লিখিবার কালে এই মূলভাবের সহিত একান্তভাবে সম্পর্কিত কোন কথা বাদ দিও না, আবার নিঃসম্পর্কিত কথার অবতারণাও করিও না। ( **খ** ) উদ্ধৃতাংশে কথার কথার মানে দিয়া অথবা মূলের সহিত সম্পর্কিত নয় এমন শব্দাদির সম্মেলন ঘটাইয়া, আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টা করিও না। ( **গ** ) ভাব-সম্প্রসারণের আয়তন প্রবন্ধের ন্যায় বড় বা সারাংশের ন্যায় ছোট করিও না। অর্থাৎ সত্যকার ভাল ভাব-সম্প্রসারণ লিখিতে বিশ একুশ ছত্রের বেশি লিখিবার প্রয়োজন নাই। তবে যেখানে প্রশ্নকর্তা ভাব-সম্প্রসারণ করিবার পংক্তিসংখ্যা নির্দেশ করিয়া দেন, সেখানে তাঁহার কথা অবশ্যই মানিবে। ( **ঘ** ) একই কথা বারবার

ভাব-সম্প্রসারণ সম্পর্কে নেতিবাচক ছয়টি নির্দেশ

বিভিন্ন বাক্যের মধ্য দিয়া লিখিবার চেষ্টা করিও না। কেন না,—এইরূপ অপপ্রয়াসে যুক্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। (ঙ) কোন শব্দ বা বাক্যাংশের যদি আভিধানিক অর্থ তোমার মনে না জাগে, তাহা হইলে নিরাশ হইও না। মূল উদ্ধৃতাংশটি বারবার পড়িতে পড়িতে আসল ভাববস্তুটি মনের গভীরে প্রতিবিম্বিত হইবেই। (চ) 'কবি প্রার্থনা করিতেছেন', 'কবি বলিতেছেন' ইত্যাদি ধরণের কথা ভাব-সম্প্রসারণকালে কথনও লিখিবে না।

সার্থক **ভাবার্থ** লিখিতে হইলে তোমরা নিম্নলিখিত উপদেশানুযায়ী কার্য করিবে :—(ক) ভাবার্থ লিখিবার আগে প্রশ্নপত্রে উদ্ধৃত পদ্যাংশ অথবা গদ্যাংশ মনোযোগসহকারে অন্ততঃ বার চারেক পড়। (খ) প্রতিবারই পাঠ করিবার সময়ে উদ্ধৃত অংশের অন্তর্নিহিত অর্থটি বুঝিবার চেষ্টা কর। (গ) প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্যাংশের প্রয়োগ-সার্থকতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমগ্র উদ্ধৃতাংশের যুক্তি পরম্পরাগত অর্থ উপলব্ধি কর ও ভাবার্থ লিখিবার জন্য অগ্রসর হও। (ঘ) উদ্ধৃতাংশের নির্বিশেষ ব্যাপক ভাবটির অর্থ ভাবার্থে ফুটাইয়া তোল। (ঙ) ভাবার্থ-রচনার সাহিত্য-শিল্পগত সৌষ্ঠব রক্ষা কর। (চ) ভাবার্থের প্রারম্ভবাক্যটিতেই উদ্ধৃতাংশের মূলভাবটি প্রকট কর। প্রারম্ভবাক্যের ভাব ও ভাষার অপরূপ মেলবন্ধন যেন পরীক্ষক-পরীক্ষিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। (ছ) উদ্ধৃতাংশে যদি কথোপকথনের ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ থাকে, তবে তাহার ব্যাপক নির্বিশেষ ভাবটির অর্থ নিজের জবানিতে ফুটাইয়া তোল। (জ) উদ্ধৃতাংশের মধ্যে কোন উদ্ধৃতি থাকিলে তাহারও ভাবার্থ লিপিবদ্ধ কর।

ভাবার্থ সম্পর্কে ইতিবাচক আটটি নির্দেশ

অবশ্য ভাবার্থ-লিখনের জন্য ইতিবাচক নির্দেশসমূহ ছাড়া কয়েকটি নেতিবাচক নির্দেশ তোমরা মনে রাখিবে :—(ক) উদ্ধৃতাংশের মূলভাবটির অর্থ লিখিবার সময়ে, ইহার সহিত নিঃসম্পর্কিত কোন কথার উল্লেখ করিও না। (খ) উদ্ধৃতাংশের কথাগুলিই তোমার উত্তরপত্রে সন্নিবেশিত করিবার অথবা উহাদের নিছক আভিধানিক অর্থ লিখিবার প্রয়াস পাইও না। (গ) একই কথা বার বার বিভিন্ন বাক্যের মধ্য দিয়া লিখিবার চেষ্টা করিও না। (ঘ) ভাবার্থের আয়তন উদ্ধৃতাংশের চেয়ে ছোট বা বড় হওয়া ছাড়া সমান সমানও হইতে পারে। মোটের উপর, উদ্ধৃতাংশের মূলভাবটি সংযত ও সংহত রূপে পরিস্ফুট করিতে হইলে যেরূপ আয়তন প্রয়োজনীয়, তাহা অবশ্যই গ্রহণীয়। অবশ্য প্রশ্নকর্তা ভাবার্থের আয়তন সম্পর্কে যদি কোন নির্দেশ দেন তো তাহা অবশ্যই পালনীয়। (ঙ) উদ্ধৃতাংশের মূল

ভাবার্থ সম্বন্ধে নেতিবাচক ছয়টি নির্দেশ

ভাবটি বুঝাইবার জন্য বাহির হইতে কোন তথ্য, কোন দৃষ্টান্ত, কোন কল্পনাবস্তু ভাবার্থ-লিখনের মধ্যে আমদানী করিও না। (চ) উদ্ধৃতাংশের সহিত কোন পদ্যাংশ বা গদ্যাংশের ভাবগত সাদৃশ্য থাকিলে তাহার উল্লেখ আদৌ করিও না।

সার্থক **সারাংশ** লিখিবার কালে তোমরা নিম্নলিখিত উপদেশগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকিবে। উপদেশগুলি এইরূপ :—(ক) উদ্ধৃতাংশটি অন্ততঃ বার চারেক অতীব যত্নের সহিত পাঠ কর। আর সেই সঙ্গে উদ্ধৃতাংশটির সমগ্র বক্তব্যটি বুঝিবার চেষ্টা কর। (খ) তৃতীয় বার পাঠকালে বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্তরপরম্পরা ও ভাববস্তু বুঝিয়া লইয়া তাহাদের নিম্নে দাগ কাট। (গ) বক্তব্য বিষয়ের দাগ-দেওয়া এই যে গুরুত্বপূর্ণ স্তরপরম্পরা ও ভাববস্তু—ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার করিয়া বেশ একটি যুক্তিসিদ্ধ ক্রম নির্ধারণ করিয়া উত্তর লিখিবার জন্য অগ্রসর হও। (ঘ) সারাংশের প্রারম্ভবাক্যটি এমন ভাবে লিখিবে, যাহাতে গোড়াতেই উদ্ধৃতাংশের মূল ভাবটি প্রকট হয়। ইহাতে ভাব ও ভাষার ঘন সন্নিবেশ-মাধুর্য ও বিস্ময়কর মৌলিকতা সঞ্চারিত হওয়া চাই। (ঙ) মূল ভাববস্তু বুঝিবার ব্যাপারে অসুবিধা না ঘটিলে অপ্রধান ভাবগুলি বাদ দাও। অথবা মুল ভাববস্তু যদি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত থাকে, তাহা হইলে অপ্রধান ভাবগুলি একেবারেই পরিত্যাগ কর। (চ) অবান্তর প্রসঙ্গমাত্রই বর্জন কর। (ছ) নিছক প্রধান যুক্তিগুলিই রাখ, আর অপ্রধান যুক্তিগুলি ছাঁটিয়া দাও। (জ) মুল উদ্ধৃতাংশের অন্তর্গত অপ্রয়োজনীয় বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ, সর্বপ্রকার শব্দালংকার ও অর্থালংকার এবং দৃষ্টান্ত বর্জন কর। তবে,—মূল উদ্ধৃতাংশে যদি দৃষ্টান্তটি ফলাও করিয়া লেখা থাকে, সারাংশ-লিখনের সময়ে তাহার কিঞ্চিৎমাত্র উল্লেখ কর। (ঝ) সারাংশ-লিখনের বিষয়বস্তু যদি কথোপকথনের আকারে ব্যক্ত থাকে, তবে তাহা তোমার নিজের জবানিতে সংক্ষেপে প্রকাশ কর। (ঞ) মূল উদ্ধৃতাংশের মধ্যে যদি কোন উদ্ধৃতি থাকে তা সেই উদ্ধৃতির সংক্ষিপ্ত ভাবটুকু লিখ। (ট) সারাংশ লিখিবার পরে তোমার লেখা উত্তরটি পড় এবং মূল বক্তব্য বিষয়ের কোন প্রধান অংশ বাদ পড়িয়াছে কিনা, তাহাই যাচাই করিয়া লইবার জন্য সাবধানতা-সহকারে মুল উদ্ধৃতাংশটি লক্ষ্য কর।

সারাংশ-লিখন সম্পর্কে ইতিবাচক এগারোটি নির্দেশ

উপরিলিখিত ইতিবাচক নির্দেশ ছাড়াও নিম্নলিখিত নেতিবাচক নির্দেশগুলি স্মরণীয় :—(ক) সারাংশ-লিখনের সময়ে কোন জটিল বা অস্পষ্ট ভাবসম্পন্ন বাক্য লিখিবে না। (খ) মূল উদ্ধৃতাংশ হইতে বাক্য অথবা বাক্যাংশাদি বেমালুম লইয়া তোমার উত্তরের মধ্যে সন্নিবেশিত করিবে না। মূলের শব্দাদি গ্রহণ করিও না। তবে, মূল উদ্ধৃতাংশের যে সকল শব্দে ভাববস্তুটি ঘনীভূত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে,

তাহা বাদ দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। (গ) নিছক কথার কথার মানে জুড়িয়া সারাংশ লিখিও না (ঘ) ভাব ও ভাষার অসারতা আতিশয্য ও পুনরুক্তিকে আদৌ আমল দিবে না। (ঙ) কোন বিশেষ শব্দ বাক্যাংশ অথবা বাক্যের অর্থ যদি না-ই বুঝিতে পার তো নিরাশ হইও না। মনে রাখিবে, সমগ্র উদ্ধৃতাংশের প্রধান ভাববস্তু প্রকাশই তোমার লক্ষ্য, অপ্রধান ভাবগুলি তোমার লক্ষ্যীভূত নয়। (চ) উদ্ধৃতাংশের অন্তর্গত কোন বিশেষ ভাব বা ভাবনিচয় ব্যখ্যা অথবা বিশদ করিবার প্রয়াস পাইও না। (ছ) মূলের বক্তব্য বিষয়ের পারম্পর্য একেবারে অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করিও না। (জ) সারাংশ-লিখনের আয়তন সম্পর্কে মাথা ঘামাইও না। প্রধান ভাবকথা প্রকাশই তোমার লক্ষ্য। উদ্ধৃতাংশের প্রকৃতির উপরে সারাংশের আয়তন নির্ভর করে। সাধারণতঃ চিন্তামূলক উদ্ধৃতাংশের সারাংশ অপেক্ষা বর্ণনামূলক উদ্ধৃতাংশের সারাংশ ছোট হয়। উদ্ধৃত পদ্যাংশে সাধারণতঃ মূলভাব একটিই থাকে আবার অলংকার-বাহুল্য, এবং পুনরাবৃত্তিও অনেকখানি স্থান জুড়িয়া অবস্থান করে—তাই গদ্য-রচনা অপেক্ষা পদ্য-রচনার সারাংশ বেশ ছোট হয়। তোমার লেখা সারাংশ যেন মূল উদ্ধৃতাংশের দৈর্ঘ্যকে কোনক্রমেই ছাপাইয়া না যায়। (ঝ) সারাংশ একেবারে ছোট করিয়া লিখিও না। সারাংশ-লিখনের মানে গূঢ় মর্ম রচনা নয়।

সারাংশ-লিখন সম্পর্কে নেতিবাচক নয়টি নির্দেশ

# প্রথম অধ্যায়

## ভাব-সম্প্রসারণ

## আদর্শমালা

**[ এক ]** ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের মধ্যে যদি কিছু পরিমাণ কপটতাও থাকে, তবে সে পরিমাণ কপটতা সমাজরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। **ক. বি. মাধ্যমিক ( অতি ) '৫১**

এমন এক জাতের লোক এই পৃথিবীতে আছে, যাহারা স্পষ্টবাদিতার দোহাই দিয়া মুখে যাহা আসে, তাহা বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ তো করেই না, বরং গর্বই অনুভব করে। তাহারা মনে করে, বাক্যের ঐ যে সংযম, যাহা ভদ্রসমাজে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার নামে সুবিদিত, তাহা কপটতারই নামান্তর। কিন্তু সমাজে যেখানে সকলের মন সমান নয়, তাহার অনুষ্ঠানে সদ্ভাবমূলক ও সুরুচিব্যঞ্জক লোকব্যবহার করিতে হয়। লোকের সঙ্গে এই যে সদ্ব্যবহার, ইহারই নাম ভদ্রতা ও শিষ্টাচার। সত্য কথা বলিতে

ক, মন ও মুখের মধ্যে একটা পাকা বাঁধ বাঁধিয়া রাখিতে পারিলে দুই দিনও সমাজ ;কিতে পারে না। বাক্‌সংযম সব চেয়ে বড় জিনিস। বেশি করিয়া তলাইয়া বুঝিয়া ভ নাই। কেন না,—অনেক সময়েই কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়া ড়। ফলে সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, সমাজে দেখা দেয় অকল্যাণ। তাই ক্‌সংযমের মধ্যে কিছুটা কপটতা থাকিলেও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের মুখে চাহিয়া া অবশ্যই বরণীয়।

**[ দুই ]** জাতীয় জীবনে সন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষা দুইয়েরই মাত্রা বাড়িয়া গেলে বিনাশের কারণ ।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( অতি ) '৫১**

অধিক লাভের ক্ষমতা ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যখন কোন জাতি সাত্ত্বিক নিরাসক্ত বে নিজের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, জাতীয় জীবনের ঐ ন্নত অবস্থার মূলে রহিয়াছে সন্তোষ। কিন্তু জাতি যদি এই ভাবে নিজের অবস্থায় ন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে জাতীয় জীবনে অভাববোধ না থাকায় কর্মোদ্যম নষ্ট হইয়া ায়। নিত্য নূতন অভাবের তাড়নাই নব নব সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়। প্রয়োজন-বাধের তাগিদই জাতিকে সক্রিয় রাখে। তাইতো দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—'অসন্তোষ উন্নতির মূল। ইহা কার্যটিকে উত্তেজিত করে, সভ্যতাপথ প্রশস্ত করে। কি রাজ-নৈতিক, কি সামাজিক, কি পারিবারিক উন্নতি—সকলের মূলেই এই অসন্তোষ।' ন্তোষের আতিশয্য যেমন জড়ত্ব ও কর্মবিমুখতার কারণ-স্বরূপ এই জাতীয় জীবনকে াসের পথে টানিয়া লয়, অত্যাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষার তাড়নাতেও তেমনি জাতি দশাহারা হইয়া ক্ষমতার অতীত অনেক অকাজের সৃষ্টি করিয়া থাকে। আকাঙ্ক্ষার র আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া গেলে, ইহার নিবৃত্তি না ঘটিলে, 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব'। আগুনে ি ঢালিলে যেমন আগুন না নিবিয়া আরও দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠে, আকাঙ্ক্ষার আগুনও তেমনি একটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে নূতনতর আকাঙ্ক্ষার শিখা বিস্তার করিয়া দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিণতি লাভ করে দুরাকাঙ্ক্ষায়। সুতরাং ন্তোষের আতিশয্যের ন্যায় অতি-আকাঙ্ক্ষাও বর্জনীয়।

**[ তিন ]** অধিক বয়স না হইলে অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হয় না। কিন্তু ভয়ের সঞ্চার জন্মাবধিই ইয়া থাকে।

**ক. বি. মাধ্যমিক '৫১**

জন্মগ্রহণসূত্রে জীব প্রাণ-ব্যতিরেকে আরও দুইটি জিনিস পায়—একটি, দেহ এবং অপরটি, মন। শৈশবে জীব দেহ লইয়াই, প্রবৃত্তির দাস হইয়াই, কালাতিপাত করে। কিন্তু ঐ জীবশিশুই সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে পড়িয়া কালক্রমে আপন অন্তরের মধ্যে দয়ামায়া, স্নেহমমতা প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তিগুলি আত্মসাৎ করিয়া মনের দিক দিয়া সমুন্নত হয়। ভয় তো দেহগত ব্যাপার। তাই আত্মরক্ষার প্রেরণাবশে

অত্যন্ত নিরাপদ ও সুকোমল আশ্রয় পাইবার আশায় জীবশিশু মাতৃক্রোড় ভালবাসে এমন কি, জৈব প্রবৃত্তির নিবৃত্তিসাধনের ক্ষেত্রে জননীর অভাবে যদি ধাত্রীমাতাও মিলে, তাহাতেও জীবশিশুর আপত্তি নাই। ইহাতে বুঝা যায়, স্বার্থপর জীবশিশুর অন্তরে সূক্ষ্মতর বৃত্তি সত্যই সুষুপ্ত। কিন্তু স্নেহ জিনিসটি স্বতঃস্ফূর্ত, দান-প্রতিদানের অতীত ও অনপেক্ষ। অন্তরের অন্তরতম কোণে, মনের নিভৃততম প্রদেশে ইহা উৎসরূপে থাকিয়া এই দুঃখের ধরণীতে জীবনকে রসায়িত করিয়া তুলে। তাই দেখি,—যতই দিন যায়, জীবের বয়স যতই বাড়িতে থাকে, এই স্নেহ যেন লক্ষকোটি ধারায় আত্মপরনির্বিশেষে সকলেরই উপর হয় বর্ষিত।

**[ চার ]** কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যা-রবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি॥

**ক. বি. মাধ্যমিক ( অতি ) '৪৯ ; বি. এ. '৩৮ ; গৌ. বি. বি. এ. '৫:**

শেষ বিদায়ের আগে আলো বিকিরণের ভার কে লইবে. সন্ধ্যা-রবি ইহাই সবাইকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন। সকলে নিরুত্তর। এমন সময়ে ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপ সবিনয়ে নিবেদন করে, 'প্রভু আমার এই ক্ষীণ শিখায় যেটুকু আলো দান করিতে পারি, আমি তাহা যথাসাধ্য করিব।'

এই স্বল্পপরিসর জীবনে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত কর্তব্যের শৃঙ্খলেই না মানুষ আবদ্ধ। সেই মানুষের শক্তিও আবার সীমাবদ্ধ, তাহাও সকলের একরূপ নয়। কিন্তু তাহাতেই-বা কি আসে যায়! কোন কর্তব্য, যত বৃহৎ, যত ক্ষুদ্রই হউক এবং সেই কর্তব্যপালনে শক্তিও যাহার যেমনই থাকুক, কর্মে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও একগ্রতার মূল্যবিচারই সত্যকার বিচার। কর্মের আহ্বান যখন আসে, তখন আমাদের অনেকেই নানা হিসাব-নিকাশের মুসাবিদায় বসিয়া যায়, লাভ-ক্ষতির শক্তি-অশক্তির অঙ্ক কষিতে শুরু করে—কর্তব্যপালনে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। মানুষ অপ্রমেয় শক্তির অধিকারী নয়—ইহা জানিয়া আত্মশক্তি-সচেতন যে-মানুষ নিছক ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাকে সম্বল করিয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল কর্মের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে, সে-ই যথার্থ কর্মী, সে-ই খাঁটি মানুষ। সুতরাং কোন কর্তব্য-কর্মের বিচারে সফলতার বা বিফলতার বিচারই বড় কথা নয়, সেই কর্তব্যপালনের সাহস গণনীয়—সামর্থ্যের ক্ষুদ্রতা বা অসীমতা নয়, সামর্থ্য-প্রয়োগের দক্ষতাই প্রশংসা। রাত্রির অন্ধকারে সূর্যের বিপুল কিরণধারা ঢালিবার শক্তি কাহারই-বা আছে! ইহা জানিয়া, আপন তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও মাটির প্রদীপ কর্তব্যপালনের দায়িত্ব লইয়াছে

**[ পাঁচ ]** পেঁচা রাষ্ট্র করে দেয় পেলে কোন ছুতা—
জান না আমার সঙ্গে সূর্যের শত্রুতা ?

**ক. বি. বি. এ. '৩৪, '৩৬ ; মাধ্যমিক (বিকল্প ) '৫১**

পেঁচা দিনের আলো সহ্য করিতে পারে না, রাত্রির অন্ধকারে সে আত্মগোপন করিয়া থাকে। সুতরাং সূর্যের সঙ্গে শত্রুতা ছাড়াও সূর্যের আলোক যে তাহার দৃষ্টির পীড়াদায়ক।

যে ব্যক্তি নীচাশয়, অতিশয় ক্ষুদ্রমনা, তাহার দৃষ্টির আবিলতা—হৃদয়ের সংকীর্ণতা যে মহৎ ও মহীয়ানের সংস্পর্শকে বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ! চারিদিকে দুর্বলতা ও হীনতা, হৃদয়-মনের নীচতা ও ক্ষুদ্রতা ঢাকিবার জন্যই যে সে কেবলমাত্র উচ্চাশয় ব্যক্তির মহত্ত্ব ও চরিত্রশক্তিকে খর্ব করিতে চায় তাহা নয়, যাহা-কিছু বিরাট্ ও সংকীর্ণতার পরিপন্থী এবং মনুষ্যত্বের নিদান, তাহারও প্রতি একটা সহজাত বৈরীভাব সে পোষণ করে। এই কারণেই বড়োর সঙ্গে একটা কাল্পনিক শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া ছোটো আত্মশ্লাঘা বোধ করিয়া থাকে। কাল্পনিক শত্রুতা এইজন্য যে, সত্যকার মহৎস্বভাব ও উদারচরিত ব্যক্তি কখনও ঈর্ষাপরায়ণ হন না, কাহারও প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হন না। ক্ষমা ও করুণা সেই চরিত্রকে শোভন-সুন্দর করে।

**[ ছয় ]** প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্-ধিক্ করে তারে কাননে সবাই ;
সূর্য উঠি' বলে তারে, ভাল আছ, ভাই ?

**ক. বি. মাধ্যমিক '৪৬, '৪৮**

প্রাচীরের গায়ে ফুটিয়াছে ছোট্ট একটি অনামা ফুল। তাহার না আছে রূপ-গন্ধ, না আছে আভিজাত্য-গৌরব। সযত্নরচিত কাননের ফুলেদের কত রূপ ! কিই-না তাহাদের দেহ-সৌষ্ঠব ! তাই বুঝি গরবিনীরা ঐ অযত্নবর্ধিত ফুলটির প্রতি এমন কৃপাকটাক্ষ হানে, তাহাকে দেয় ধিক্কার ! কিন্তু তাহাতেই বা কি ! প্রভাতের অরুণ তাহাকেই জানায় সস্নেহ প্রথম অভিনন্দন, কিরণ-সম্পাতে প্রথম চুম্বন আঁকিয়া দেয় তাহারই ললাটে।

সংসারে উদারচরিতদের ইহাই তো রীতি। তাঁহারা সমাজে ধন মান আভিজাত্যের মানদণ্ডে মানুষকে বিচার করেন না,—আপন হৃদয়ের মহত্ত্বে ও উদারতায় সকল মানুষকে সমজ্ঞানে বরণ করিয়া লন ; কিন্তু যাহারা ক্ষুদ্রচেতা, মানুষের গড়া উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, অভিজাত-অনভিজাত ভেদবুদ্ধিই তাহাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন, তাহাদের বিচারশক্তিকেও করিয়া দেয় পঙ্গু। কাননের ফুল যেমন আভিজাত্যগর্বে, বর্ণ ও গন্ধের মিথ্যা মোহে প্রাচীরের ফুলকে সগোত্র বলিয়া চিনিতে চায় না, আপন জন বলিয়া স্বীকার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে, ক্ষুদ্রমনা সংকীর্ণচেতা ব্যক্তিও তেমনি ঐশ্বর্য আভিজাত্য ও বংশগৌরবের অলীক মোহে স্বজন-পরিজনকে ঘৃণায়-অবহেলায়,

বিদ্রূপে-লাঞ্ছনায় পীড়িত করিয়া তোলে। কিন্তু উদারচরিত মহৎপ্রাণ ব্যক্তি অকৃপণ সূর্যালোকের মত উচ্চ-নীচ, ধন-নির্ধন-নির্বিশেষে সকল মানুষকে প্রাণের প্রীতিরসে সিঞ্চিত করিয়া থাকেন, উদারতার বৃহৎ ক্ষেত্রে সকলকেই সমজ্ঞানে হৃদয়ের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া আপনিই ধন্য হন। জাগতিক যত-কিছুর যথার্থ মূল্যজ্ঞানের ফলে তাঁহার হৃদয়ে যে বিস্ফারণ হয়, যে আত্মচৈতন্য প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহাতে সকল ভেদাভেদ-জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, সমগ্র জগৎ সেই হৃদয়ে আসিয়া কোলাকুলি করিতে থাকে। সংসার ও সমাজের মিথ্যা উচ্চ-নীচ-ভেদের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে তিনি তাঁহার শুচি-শুভ্র চরিত্রমাহাত্ম্যে সহজে অতিক্রম করিয়া যান, মানুষ হিসাবে মানুষের মহত্ত্বকে স্বীকার করিয়া, আপন অন্তরের অকলুষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া আপনিই গৌরবান্বিত বোধ করেন—দীনদরিদ্র, খ্যাতিপ্রতিপত্তিহীন স্বজন-প্রতিবেশীকে ভ্রাতৃস্নেহে বুকে তুলিয়া লইয়া যেন তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়—দানগ্রহীতার সম্মুখে নতজানু হইয়া দানগ্রহণের জন্য তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করিতে হয়, তিনি কৃপা করিয়া দান গ্রহণ করিলে তবেই-না দাতার দান সার্থক হইয়া উঠে।

**[ সাত ]** ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি-কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে। **ক. বি. মাধ্যমিক '৪৪, (বিকল্প) '৫২**

ধ্বনিই প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। কিন্তু পাছে এই সত্যটুকু শ্রোতাদের নিকট ধরা পড়িয়া যায় অর্থাৎ প্রতিধ্বনি যে স্বয়ম্ভূ নয়, ঐ ধ্বনি আছে বলিয়াই সে আছে—এ সত্য গোপন করিবার জন্য সে ধ্বনির এমন আশ্চর্য অনুকরণ করিয়া থাকে যে, নিজেকেই ধ্বনি প্রতিপন্ন করিয়া সে যেন ধ্বনির নিকটে তাহার অস্তিত্বের সকল ঋণ মুছিয়া ফেলিতে চায়। আসলকে ব্যঙ্গ করিয়া সকলের আসল সাজিবার এহেন প্রয়াস নিতান্তই উপহাসাস্পদ।

সমাজে এমন একদল মানুষ আছে, যাহারা সদাশয় ব্যক্তির দয়া ও উপকারকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িয়া উঠে। তাহাদের জীবনে যাহা-কিছু গৌরব বা সাফল্য, তাহার মূলে ঐ সকল মহদাশয় ব্যক্তির অকপট আনুকূল্য এবং অকৃপণ ঔদার্য এমন গূঢ়-রসসঞ্চারী হইয়া থাকে যে, সেই ঋণ কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই কারণেই অর্থাৎ উপকারীর ঋণ অবশ্য স্বীকার্য বলিয়াই যেন উপকৃত ব্যক্তি উপকারীর বিরুদ্ধে অন্তরে অন্তরে একটা বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করে। ঐ উপকার গ্রহণ তাহার হৃদয়ে একটা অক্ষয় ক্ষতরূপে চিরকাল জড়াইয়া থাকে। এই কারণেই তাহার ঐশ্বর্য মান ও প্রতিপত্তির মূলে কোন ব্যক্তির আনুকূল্য ও দয়ার অপরিশোধ্য ঋণ যে রহিয়াছে, এরূপ বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও সে সহ্য করিতে পারে না। তাই জীবনের

সেই কলঙ্কময় অধ্যায় নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিবার জন্য উপকৃত ব্যক্তি শুধু অকৃতজ্ঞতা তো দূরের কথা, এমন কি কৃতঘ্নতারও শরণাপন্ন হয়—উপকারীর দান বা ঋণ শুধু অস্বীকার করা নয়, তাহাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য সে নানা জঘন্য উপায়ও অবলম্বন করিয়া থাকে। উপকারীর উন্নত মহৎ চরিত্রকে নিন্দার দ্বারা কলুষিত করিতে সে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু উপকারীর উপকার স্বীকারে সত্যই অগৌরবের যে কোন কারণ নাই, বরং তাহাতে হৃদয়ের বিস্ফারণ ও মহত্ত্বই সূচিত করে—এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিলে অকৃতজ্ঞতা বা কৃতঘ্নতাকে আশ্রয় করিতে হয় না। জীবনে যাহা-কিছু সুখ-সমৃদ্ধি সে অর্জন করিয়াছে, যে খ্যাতি ও যশের অধিকারী সে হইয়াছে, তাহাতে পরানুকূল্য বা পরঋণ স্বীকারের সঙ্গে যে পরিমাণ আত্মশক্তির সংযোগ ঘটিয়াছে, তাহার গৌরবও তো কম নয়—ইহাই সত্যকার উপলব্ধি।

[ **আট** ] কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে—
আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কিরে।
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে। **ক. বি. মাধ্যমিক '৪২ ; বি. এ. '২৮**

ভিক্ষার ঝুলি এবং টাকার থলি একই পদার্থে নির্মিত। দুয়ের উপাদানে সামান্যতা আছে, কিন্তু কৌলীন্যে কতই-না তফাৎ! এই ভিক্ষার ঝুলি যখন সগোত্রতার দাবিতে টাকার থলির আত্মীয়তা বাঞ্ছা করে, তখন ব্যঙ্গ এবং লাঞ্ছনাই ঘটে তাহার ভাগ্যে। কেন না,—ভিক্ষার ঝুলি শূন্য, টাকার থলি পূর্ণ; শূন্যতা এবং পূর্ণতার মধ্যে বৈষম্য থাকিবেই—তাই কুটুম্বিতাও প্রায় অসম্ভব।

এই সংসারে অবয়ব ও জন্মের দিক দিক দিয়া মানুষে মানুষে সত্যকার কোন ভেদ নাই, কোন বৈষম্য নাই। জীবনের ধারা দেশে ও কালে খণ্ডিত হইলেও যে মানুষজাতি সেই ধারাকে বহন করিতেছে, তাহা অখণ্ড ও এক। জন্মলগ্নে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই বটে, যেমন ভিক্ষার ঝুলি ও টাকার থলিতে সত্যকার কোন বৈসাদৃশ্য নাই, তথাপি জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে—সমাজে ও রাষ্ট্রে, মানুষের গড়া বিধি-বিধানে, আকাশচুম্বী ব্যবধানের প্রাকার গড়িয়া উঠিয়াছে। এক দিকে দীন-দরিদ্রের শত লাঞ্ছনাপূর্ণ বিকৃত জীবন, অন্য দিকে ধনীর অফুরন্ত ঐশ্বর্য-বিলাস; এক দিকে সর্বহারার মর্মন্তুদ হাহাকার, অপর দিকে প্রাচুর্যের অট্টহাসি।—মনে হয়, দরিদ্র এবং ধনী এক জাতের মানুষ নয়। দীন-ভিখারী যখন ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে বহন করিয়া ধনীর দুয়ারে ভিক্ষার জন্য মাগিয়া ফিরে, যেন বলিয়া উঠে—'ওগো ধনীর দুলাল, একবার চাহিয়া দেখ, আমি তোমারই মত মানুষ, আমরা এক মানুষ জাতিরই বংশধর, তোমার ঐ টাকার থলিতে আর আমার এই ভিক্ষার ঝুলিতে কোন তফাৎ

নাই'—তখন ঐশ্বর্যের বিদ্রূপে দারিদ্র্যের কণ্ঠস্বর যায় ডুবিয়া। জীবনের বৃহৎ ক্ষেত্রেই যে অর্থের বৈষম্য অনর্থতার কারণ হইয়াছে তাহা নয়, আমাদের পারিবারিক সামাজিক আত্মীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেও একই নীতি মানুষে মানুষে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। স্নেহ মমতা ও হৃদয়ের মধুর সম্পর্ককে আচ্ছন্ন করিয়া অর্থই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দরিদ্র আত্মীয় বিত্তবান ও অভিজাত আত্মীয়ের নিকটে কুটুম্বিতার পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায় হৃদয়হীন অমানুষোচিত ব্যবহার। কেন না, —ধনী আত্মীয়ের সঙ্গে দরিদ্রের যে আত্মীয়তা তাহা গরজের আত্মীয়তা—সে আত্মীয়তা-যাচ্ঞা দরিদ্রের নিকটে কখনও সম্মানজনক হয় না, বরং লাঞ্ছনা ও অবমাননার কারণই হইয়া থাকে। সমাজে সমানে-সমানেই কুটুম্বিতার সম্পর্ক গৌরবজনক হইতে পারে, পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে; মানুষে মানুষে সত্যকার কোন প্রভেদ নাই বটে, কিন্তু লোকব্যবহার, সামাজিক রীতিতে সকল নীতি আজিও প্রশ্রয় পাইয়া আসিতেছে, তাহাতে ধনী ও দরিদ্রে, সর্বহারা ও সর্বাধিকারীতে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান না থাকিয়া পারে না।

**[ নয় ]** কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে,—
ভাই ব'লে ডাকো যদি দেব বলে গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা;
কেরোসিন বলি' উঠে, "এসো মোর দাদা।"

**ক. বি· মাধ্যমিক '৪৬, '৪৭, '৪৯; বি. এ. '৩১, '৩৬**

কেরোসিন-শিখা যেমন প্রখর উজ্জ্বল, মৃৎপ্রদীপের শিখা তেমনই মৃদু অথচ স্নিগ্ধ; কিন্তু এই উজ্জ্বলতার জন্য কেরোসিন-শিখার এমনই গর্ব, এমনই অহংকার ও ঔদ্ধত্য যে, সে অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে। ঐ যে মাটির প্রদীপ—উহা তাহার সগোত্র হইলেও ক্ষুদ্র; তাই তাহার কুটুম্বিতাকে—'ভাই' সম্বোধনকে—কেরোসিন-শিখা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু এমনই কৌতুকের বিষয় যে, আকাশে যখন চাঁদ উঠে আর স্নিগ্ধ-মধুর আলোয় সমস্ত বিশ্বসংসার প্লাবিত হইয়া যায়, কেরোসিন-শিখা তখন অধীর হইয়া উঠে চাঁদের বন্ধুত্ব-কামনায়। মৃৎ-প্রদীপের 'ভাই' সম্বোধন যে সহ্য করিতে পারে নাই, সে-ই চাঁদকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতে কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করে না।

এমনই হয় বটে! মনুষ্যসমাজে ছোটো, বড়ো, আরো-বড়ো—বিভেদ-বৈষম্যের কত দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরই-না কালে কালে গড়িয়া উঠিয়াছে! ফলে মানুষে মানুষে জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের নূতনতর মাপকাঠি গড়িয়া উঠিয়াছে—ধন, মান, পদমর্যাদা ও আভিজাত্য-গৌরব। এই মিথ্যা অহংকারের মোহে আমরা সহজ মনুষ্যত্ববোধ হারাইয়াছি—ধন নয়, মান নয়—মানুষ হিসাবেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে আমরা কুণ্ঠা

বোধ করি; দীন-দরিদ্র খ্যাতিহীন প্রতিবেশীর, এমন কি দারিদ্র্য-পীড়িত পরমাত্মীয় স্বজন-পরিজনেরও বন্ধুত্ব আমরা কামনা করি না, তাহাদের সাহচর্য সভয়ে পরিহার করি; আমরা চাই বড়োর, আরো-বড়োর সঙ্গ-সুখ, তাহাদের কৃপালাঞ্ছিত স্নেহ দৃষ্টি! কিন্তু একথা বুঝিতে চাই না যে, বড়ো হইলেও আরো-বড়োর তুলনায় আমরা ছোটোই; তাই যে-ছোটোকে আমরা মদগর্বে, আভিজাত্যের স্পর্ধায় ধিক্কৃত করি, আরো-বড়োর নিকট হইতে সেই ধিক্কার-লাঞ্ছনাই সহস্রগুণে জমা হইয়া উঠে, তাহার সঙ্গকামনা আমাদের পক্ষে যতই স্বাভাবিক হোক্ না কেন, তাহাতে সত্যকার কোন গৌরব নাই। রাত্রির দেশে চন্দ্রের পার্শ্বে ক্ষুদ্র জোনাকি হইতে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ পর্যন্ত সকলেই স্ব স্ব গৌরবে ও মহিমায় অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া আছে; ঊর্ধ্ব আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রমালার মধ্যমণি চাঁদ, নিম্নে বনে-উপবনে জোনাকির পাঁতি—জ্যোতির্লোকে কি অপূর্ব সংগতি-সুষমা! এই বিধাতার রাজ্যে, মনুষ্যসংসারে, সকল বৈষম্য ও বৈরূপ্যের মধ্যেও একটি সংগতি-সুষমা আছে—ধন-মান-আভিজাত্যের মিথ্যা আত্মঘাতী মোহই সেই সংগতির ছন্দ-পতনের কারণ।

[ **দশ** ] উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে। **ক. বি. মাধ্যমিক '৪৪, (বিকল্প) '৫৬**

সংসারে যত প্রকারের ভেদ-রীতি এযাবৎ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে মূলগত শ্রেণীভেদ বোধ হয় উত্তম, মধ্যম এবং অধম। উত্তম ও অধমের পার্থক্য বা ভেদরেখা অতিশয় স্পষ্ট, কিন্তু গোল বাধে মধ্যমকে লইয়াই। কেন না, প্রথমতঃ, লোকনীতিতে উত্তম-মধ্যমে যে পার্থক্য নির্দিষ্ট হইয়া আছে, মধ্যম উহাকে আদৌ অর্বাচীন মনে করে; অতএব, ঐরূপ মানদণ্ড এবং সেই মানদণ্ডের বিচারে আখ্যাত যে উত্তম—দুয়ের প্রতি তাহার আক্রোশের সীমা নাই। মধ্যম উত্তমের সহিত তুলনায় নিজেকে মধ্যম বলিয়া মতেই মানিয়া লইতে চায় না। কাজেই উত্তমের সঙ্গে একপ্রকারের একটা ব্যবধান সে সযত্নে রক্ষা করিয়া চলে। ইহাকে একরূপ আত্মদৈন্যের অভিমান বলা যাইতে পারে। অপর দিকে মধ্যমের বিচারে অধম এতই অধম যে সে তাহাকে গণনীয় বলিয়াই মনে করে না এবং অতিশয় নগণ্য ও তুচ্ছ বলিয়াই অধম তাহার নিকট অপাংক্তেয়; অতএব উহার কোনরূপ সান্নিধ্য বা সংস্পর্শ মধ্যমের পক্ষে সর্বথা বর্জনীয়। ইহাও একরূপ আত্মশ্লাঘা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই দ্বিবিধ কারণে উত্তম ও অধমের নিকট হইতে মধ্যম একটা ব্যবধান রচনা করিয়া আত্মরক্ষার্থে সদা-সচেতন থাকে।

কিন্তু হৃদয়ের মহত্ত্বে ও চরিত্র-শক্তিতে যে মানুষ সকলের বরণীয় হইয়াছেন, সমাজে উত্তম বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, তিনি আপামরসাধারণকে অভিনন্দন জানাইয়া থাকেন। লোকব্যবহারে যাহারা অধম, অতিশয় হেয় ও হীন বলিয়া অবজ্ঞাত, তাহারা সেই

ব্যক্তির সঙ্গসুধা হইতে বঞ্চিত হয় না। বরং এমনও বলা যাইতে পারে যে, অধম: সঙ্গ ও সাহচর্য দিতে উত্তম যেন আগ্রহশীলই হইয়া থাকেন। সেই উত্তম পুরুষ নি জানেন, তাঁহার চরিত্রে নীচসংসর্গজনিত মালিন্যদোষ কখনও ঘটিবে না। বির হৃদয়ে গভীর করুণা ও আকুল প্রেমের সংস্পর্শে লোহাও যে সোনা হইয়া যায়!—ইহ মত সত্য আর কি হইতে পারে? কিন্তু মাঝারির সতর্কতা কিছুতেই ঘুচিতে চায় ন উত্তমের সুগভীর আত্মপ্রত্যয় ও হৃদয়ের প্রসার তাহার নাই বলিয়া সে যেমন উত্তমে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় এবং ঈর্ষাপরবশ হওয়ায় উত্তম হইবার সুযোগ হই বঞ্চিত হয়, তেমনি আত্মস্খলন ও পতনের আশঙ্কায় অধর্মের সংস্পর্শও সে সভয়ে প হার করিতে বাধ্য হয়।

**[ এগারো ]** বোল্‌তা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউচাক,
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক।
মধুকর কহে তারে, তুমি এসো ভাই।
আরো-ক্ষুদ্র মউচাক রচ দেখে যাই। ক. বি. বি. এ. '৬

মৌমাছির এত যে আয়োজন, এত যে কর্মব্যস্ততা, দিবারাত্র এত যে অক্ল গুঞ্জরণ—সে তো কেবল ঐ ক্ষুদ্র মৌচাক-সৃষ্টিরই জন্য।—বোল্‌তা এই বলিয় মৌমাছির সৃষ্টিকে বিদ্রূপ করিয়া থাকে। জাঁকজমকের তুলনায় সৃষ্টির ক্ষুদ্রত্ব সবিনয়ে স্বীকার করিয়া আরো-ছোটো একটি মৌচাক রচনা করিয়া দিবার ে মৌমাছি বোল্‌তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। বোল্‌তা অনায়াসে বা স্বল্পায় বৃহৎ চাক রচনা করিতে সক্ষম হইলে, মধুর উৎস ক্ষুদ্রতম 'মউ'-চাক রচনা করাও তাহার সাধ্যাতীত।

বোল্‌তা লোকসমাজে সেই জাতীয় মনুষ্যচরিত্রের প্রতিই ইঙ্গিত ক মৌমাছির মধুচক্র রচনাকর্মের মত কোন শুভ প্রচেষ্টাকে যাহারা ক্ষুদ্র ব বিদ্রূপের হুল ফুটাইতে পিছ্-পা হন না। পরচ্ছিদ্রান্বেষণ করা, পরনিন্দায় পঞ্চমু হওয়াতেই তাহাদের সুখ। সাজসরঞ্জাম, জাঁকজমকের বাহুল্যের উল্লেখ কর তাহারই তুলনায় অনুষ্ঠিত কর্মকে হেয় ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিতে উহারা সদাসচেষ্ট, অ হাতে-কলমে অনুরূপ বা তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র কর্ম সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই তুচ্ছ ক্ষুদ্র বলিয়া যে-কাজকে তাহারা অবজ্ঞা ও অবহেলা করে, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে রসে রসায়িত করিয়া লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই কর্মপ্রচেষ্টার মাঝে আছে একটা নিজস্ব গৌরব। উহাতেই আছে সেই শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তি সাধনার পরিচয়, যাহা না থাকিলে কোন রচনা বা সৃষ্টিকর্মই সার্থক হয় না এবং এ সত্যের উপলব্ধি সেই মানুষেরই ঘটে, যিনি নিজে পুণ্যকর্মা, যিনি নিজে সৃষ্টিকর্মের অধিকারী।

[ **বারো** ] আম্র কহে, একদিন হে মাকাল ভাই ;
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই ;
মানুষ লইয়া এল আপনার রুচি,—
মূল্যভেদ শুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি' ॥

আমও ফল, মাকালও ফল ; দুয়েরই আদি নিবাস ছিল বনভূমি। তারপর একদা মানুষ বহুযত্নে আমাকে আহরণ করিয়া আনিয়া আপন গৃহাঙ্গনে ঠাঁই দিল। মাকাল পড়িয়া রহিল বনে আর মানুষের রুচিতে আম পাইল কৌলীন্য, সে হইল অমৃতফল। সেইদিন হইতে আম্রে এবং মাকালে সাম্য ঘুচিয়া গেল।

সংসারে মানুষের রুচি ও প্রয়োজনবোধের দ্বারাই যাবতীয় পদার্থের মূল্যনিরূপণ হইয়া থাকে, ফলে মূল্যভেদের কারণেই অসাম্যের সৃষ্টি অনিবার্য হইয়া উঠে—পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম, উচ্চ-নীচ, ভালমন্দ প্রভৃতি নানা ভেদ-বৈষম্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ইহা জাগতিক সত্য, ব্যবহারিক সত্য। কালে কালে, দেশে দেশে মানুষের রুচি ও প্রয়োজন বোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যের নানা মূর্তি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, কিন্তু এক রূপে না এক রূপে এই বিভেদ বা বৈষম্য থাকিয়াই যায়। এই জাতিভেদ বা মূল্যভেদ কেবল বস্তুজগতেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের রসনার অধিকতর তৃপ্তিদায়ক বলিয়া আম্রফলই যে কেবলমাত্র আভিজাত্য-গৌরব লাভ করিয়াছে তাহা নয়, প্রাণিজগতের নিম্নতম হইতে উচ্চতম স্তর—পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ হইতে চেতনার শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি যে-মানুষ, তাহারও মধ্যে ঐ মূল্য বা রুচিভেদে বহু স্তর ও বহু ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সাম্য ঘুচিয়া গিয়াছে। যে-মানুষ জন্মলগ্নে এক ও অভিন্ন এবং সকল বৈষম্যের অতীত, সেই মানুষের মাঝে ব্রাহ্মণ্য, ক্ষাত্র, বৈশ্য ও শূদ্রধর্মের অধিকারীভেদে বিবিধ জাত্যন্তর ঘটিয়া থাকে :এবং কালের গতিধারায় রুচি ও মূল্যভেদের প্রয়োজনে এক এক সমাজে এক এক জাতি অপর জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকে।

[ **তেরো** ] যথাসাধ্য-ভালো বলে, ওগো আরো-ভালো,
কোন্ স্বর্গপুরী তুমি করে থাক আলো।
আরো-ভালো কেঁদে কহে, আমি থাকি হায়
অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায় ॥

মানুষ 'ভালো' যাহা করিতে পারে, তাহা 'যথাসাধ্য-ভালো'ই—'আরো-ভালো' নয়। কারণ,—'আরো-ভালো'র কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই, উহা 'অসম্ভব-ভালো'রই সামিল। কিন্তু 'আরো-ভালো', 'অসম্ভব-ভালো' এই দুইটি কথাও মানুষের অভিধানে প্রচলিত আছে। যে-মানুষ 'যথাসাধ্য-ভালো' দূরের কথা, কোন-ভালোই করিতে পারে না, কেবল দম্ভই করিতে জানে এবং যে-'যথাসাধ্য-ভালো'ই মাত্র

মানুষের সাধ্যায়ত্ত, সে উহার প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া সকল কাজে 'আরো-ভালো'র দাবি করে। কিন্তু এই আরো-ভালো যে অলীক কল্পনামাত্র, আকাশ-কুসুমের মতই রঙিন এবং সবৈধ ভুয়া—তাহা ঐ মানুষ কিছুতেই স্বীকার করিতে চায় না। কোন মানুষ নিজের জীবনে সৎ, শুভ ও পুণ্যের অনুষ্ঠান যদি সাধ্যানুসারে করিয়া থাকিতে পারে, তবে তাহাতেই তাহার চরম সার্থকতা ঘটিয়াছে। তদতিরিক্ত তাহার কাছে দাবি করিবার কিছু নাই। কারণ, সাধ্যের অতীত কে কবে করিতে পারিয়াছে? আর করিতে পারাই কি সম্ভব? কিন্তু যে মানুষ নিজে কিছুই করিল না—সারা জীবন অলস কল্পনার রঙিন স্বপ্নে বিভোর হইয়াই কাটাইল, কোন ভালোই যে কাহারও কখনও করে নাই—আত্মশক্তির অনুশীলনে সেই ব্যক্তিই অক্ষম বলিয়াই মানুষমাত্রেরই সাধ্যায়ত্ত যাহা, তাহাও যেমন সে সম্পন্ন করিতে পারে না, তেমনই কোন অনুষ্ঠিত কর্মের মূল্যনিরূপণেও সে একটা মিথ্যা আদর্শের শরণাপন্ন হয়। বিধাতার এই সৃষ্টিকে, এই দুর্লভ মানবজন্মকে আমরা পরম রমণীয় ও সার্থক সুন্দর করিয়া তুলিতে পারি, যদি আমরা সকলেই আপন আপন কর্তব্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করিবারা নিমিত্ত সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে কুণ্ঠীত না হই।

[ **চোদ্দ** ] রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম,—
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব', হাসে অন্তর্যামী ॥ **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৮**

জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব, মহা ধূমধাম, পথ লোকে লোকারণ্য। ভক্তজন দেবতার উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে তাহাদের প্রাণের প্রণাম নিবেদন করিতেছে; পথ, রথ এবং রথারূঢ় মূর্তি প্রত্যেকেই আপন আপন মনে ভাবিতেছে সে-ই দেবতা, ভক্তের প্রণাম তাহারই উদ্দেশে, কিন্তু অন্তর্যামী ভগবান, যিনি সত্যস্বরূপ, তিনি জানেন এই প্রণাম তাঁহারই কাছে পৌছিতেছে; ভক্ত যে তাঁহার—তিনিও যে ভক্তেরই। তাঁহাকে অন্তরঙ্গভাবে পাইবে বলিয়াই-না তিনি ইন্দ্রিয়ের দুয়ারে মূর্তিরূপে ধরা দিয়াছেন, ঐ রথ তো তাঁহারই বাহন হইয়াছে, ঐ পথ তো তাঁহারই যাত্রাপথ বলিয়া ধন্য; কিন্তু উহাদের কেহই ত তিনি নহেন, তাঁহার প্রতীক মাত্র।

সত্য শুভ্র নিরঞ্জন। সর্ব রূপ-রং-রেখা-বর্জিত সেই নিত্যবস্তু একমাত্র ধ্যানেরই গোচর, ভক্তহৃদয়ের অনুভূতিগোচর হইয়া থাকে। সেই সত্যকে সর্বজনহৃদয়সংবেদ্য করিয়া তুলিতে হইলে তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ চাই, মূর্তি চাই। সেই যে মহাকবি বলিয়াছেন—'রূপং-রূপবিবর্জিতস্য যন্ময়া ধ্যানেন কল্পিতম্'। তাই ভক্ত-কবি সেই অব্যক্তকে নানা শাস্ত্র-সংহিতায় ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, সেই অরূপকে নানা রূপে ও মূর্তিতে কল্পনা করিয়াছেন, সেই অসীম চরাচরব্যাপ্তকে তীর্থসীমায় বাঁধিয়া

দিয়াছেন। কিন্তু লোকাচার উৎসব-অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গের নানা জাঁকজমক কালে কালে এমনই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে যে, নকল আসলের জায়গা জুড়িয়া বসে, প্রতীক প্রতীতিকে লঙ্ঘন করে।—আমরাও হই সত্যভ্রষ্ট। লোকাচারের বাহ্যাড়ম্বর আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে বলিয়াই সাধারণ মানুষ আমরা জঞ্জালস্তূপ হইতে শাশ্বত-সনাতনকে, সেই শান্ত, শিব-অদ্বৈতকে চিনিয়া লইতে পারি না, কিন্তু ভক্ত জানে য, পথ নয়, রথ নয়, মূর্তিও নয়, সে তাহার অন্তর্যামী ভগবানকে ইন্দ্রিয়ের দুয়ারে প্রাণের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া ধন্য হয়।

[ **পনেরো** ] শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির,—
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির॥ **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫২**

দীঘির অগাধ জলে এক ফোঁটা শিশিরবিন্দু ঢালিয়া শৈবাল দীঘিকে বলে, সে যেন তাহার দানের কথা স্মরণ রাখে—ভুলিয়া না যায়। আশ্চর্যই বটে! দীঘির জলেই যাহার জন্ম স্থিতি ও লয়, তাহারই নাকি এমন উপকার-দম্ভ, এত স্পর্ধা—এক ফোঁটা জল দান করিয়াছে বলিয়া!

যে মানুষ পরের উপকার করিয়া সদম্ভে উহা প্রচার করিতে গর্ব বোধ করে, উপকৃতকে অনুক্ষণ স্মরণ করাইয়া দিতে সংকোচ বোধ করে না, বুঝিতে হইবে তাহার হৃদয়ে বিরাটের স্পর্শলাভ ঘটে নাই, মনের আবিলতা ঘুচে নাই। কারণ—উপকার করা ত নয়, সেবার সৌভাগ্যলাভ করাই তাহার লক্ষ্য। যাঁহার প্রাণে অপার করুণার উদয় হইয়াছে, বিরাট্-বিপুলের স্পর্শ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাতে আত্মপর-জ্ঞান ঘুচিয়া যায়, জীবের দুঃখ-নিবৃত্তির সাধনায়, তাহার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-কামনায় তিনি নিয়তই সেবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ান, কোন আড়ম্বর আত্মপ্রচারের কোন মিথ্যা মোহই যে তাঁহার থাকে না। একান্ত নিভৃতে লোকচক্ষুর অগোচরে পরের সেবায়, পরদুঃখ-মোচনের ও পরের উপকার-সাধনের পুণ্যকর্মে নিঃশেষে ও নিঃস্বত্বে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া তিনি ধন্য হন। দীঘির বিপুল জলভাণ্ডারের দ্বার জীবের সেবার জন্য, তৃষিতের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য চির-অবারিত। তৃষিতের তৃষ্ণা মোচন করিয়া মানুষের কাজে আপনাকে অকাতরে দান করিয়া সে শৈবালের মত সেই দানের হিসাব লিখিয়া রাখিতে বলে না। উদারচরিত মহৎপ্রাণ ব্যক্তির সেবা ও পরোপকারের ইহাই তো সত্যকার অভিজ্ঞান।

[ **ষোলো** ] নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,—
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে॥

**ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) ৫৫; বি. এ. '৩৪**

মানুষ কি চায় জিজ্ঞাসা কর, একবাক্যে সকলে বলিবে, সুখ: কিন্তু কোথায় সুখ, সন্ধানের তো শেষ নাই। আজিও সুখ মিলিল কই? নদীর এপার বলিতেছে, সুখ এপারে নয়, ওপারে; ওপার বলিতেছে, এপারে নয়, ওপারে। রামকে জিজ্ঞাসা কর,—কে সুখী? সে বলিবে, শ্যাম। শ্যামকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, রাম। আপনার পরমায়ু ও পরের বিত্ত ও সুখের প্রতি মানুষের অসাধারণ পক্ষপাতিত্ব আছে। সকলে মরিবে জানিয়াও মানুষ নিজের মৃত্যুভাবনাকে আমল দেয় না, বোধ হয় ভাবে মৃত্যুকে সে কোন-রকমে ফাঁকি দিতে পারিবে। তেমনই মানুষ নিজের চেয়ে পরের ঐশ্বর্য ও সুখ খুব বড়ো করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত। সুখ মায়ামৃগের মত মানুষকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে আর মানুষ তাহারই পশ্চাতে অন্ধবেগে ছুটিতেছে। মায়ামৃগ দূর হইতে দূরান্তরে পলাইতেছে আর মানুষ অ-ধরাকে কিছুতেই ধরিতে পারিতেছে না। কিন্তু সন্ধানেরও তো শেষ নাই। এমন মারাত্মক মোহ মানুষকে পাইয়া বসিয়াছে—ঝিছুতেই ছুটি মিলিতেছে না। তাই দিবারাত্র এই অন্ত-হীন কোলাহল আর অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল। মানুষ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না বলিয়া, আপনার মধ্যে সুখের সন্ধান পাইতেছে না বলিয়াই, পরস্বের মধ্যে সুখ খুঁজিতেছে। তাই না আজ সমাজে-রাষ্ট্রে, মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে এত হানাহানি এত মারামারি, এত রেষারেষি। তাই সেই যে মায়ামৃগ—এপার নয় ওপার, ওপার নয় এপার—উহার ছলনার কি আর শেষ আছে?

[ **সতেরো** ] হে সমুদ্র, চিরকাল কী তোমার ভাষা।
সমুদ্র কহি·, মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা॥
কিসের স্তব্ধতা তব ওগো গিরিবর।
হিমাদ্রি কহিল, মোর চির-নিরুত্তর॥

সৃষ্টির রহস্য দুরবগাহ। এই রহস্য উন্মোচন করিবার জন্য মানুষের কীই-না প্রাণান্ত প্রয়াস! একদিকে হাস্যলাস্যময়ী চিরচঞ্চলা প্রকৃতি, ভ্রূকুটিকুটিল কাল এবং নৃত্যোন্মত্তা মহামায়া—সমুদ্রের অনন্ত জিজ্ঞাসা; অন্যদিকে শান্তস্থির পুরুষ-আত্মা, ওষ্ঠলগ্ন-অঙ্গুলি মহাকাল এবং নৃত্যোন্মত্তা মহামায়ার চরণতলে শায়িত নির্বিকার শিব চির-নিরুত্তর স্তব্ধ হিমাদ্রি। দুই-ই প্রশ্নের অতীত। প্রকৃতিপন্থী য়ুরোপ সমাজে ও সাহিত্যে, দর্শনে ও বিজ্ঞানে নিত্যচপল প্রকৃতির নব নব তত্ত্ব ও তথ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; সেই প্রকৃতির সাধনায় তাহার জিজ্ঞাসার যেমন অন্ত নাই, ক্ষুধারও তো তৃপ্তি নাই। কালের কুটিল চক্রান্তে সে নিরন্তর বিভ্রান্ত, কিন্তু প্রকৃতি আজিও চিরদূরায়মান, চির-অলভ্য হইয়া আছে। এই জীবনসমুদ্রের তীরে বসিয়া মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ নাই—প্রকৃতির ছলনারও অন্ত নাই। কিন্তু শাশ্বত মহাকাল নিত্যমুক্ত পুরুষের নিকট প্রকৃতি তাহার সকল ছলনা, নটীলীলা সংহরণ করিতে বাধ্য হয়,

নৃত্যোন্মত্তা মহামায়ার চঞ্চল পাদক্ষেপ অটল শিবের বুকে আসিয়া থামিয়া যায়। ভারতবর্ষ কালের এই নৃত্যচ্ছন্দের মধ্যে মহাকালের লয় যুক্ত করিয়া দিয়া তালে-লয়ে সৃষ্টির সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে, নতুবা এই সৃষ্টির কোন অর্থই হয় না। কল্লোল-মুখর সমুদ্রের সম্মুখে যখন আমরা দাঁড়াই, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তখন অশেষ প্রশ্ন-কাতরতায় আমাদের মন উদ্বেল হইয়া উঠে, আবার সেই অশান্ত মন স্তব্ধ-মৌন হিমাদ্রির সম্মুখে মহাশান্তির স্নিগ্ধ সুষমায় ভরিয়া উঠে, সকল জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নকাতরতা তখন স্তম্ভিত হইয়া যায়। এই অনন্ত জিজ্ঞাসারও শেষ নাই, কিন্তু অধীরতা আছে; এই মহামৌন স্তব্ধতারও সমাপ্তি নাই, কিন্তু গভীর প্রশান্তি আছে।

[ **আঠারো** ]  অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে।
সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি'
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি॥

চন্দ্রসূর্য হইতে গ্রহ-উপগ্রহ পর্যন্ত, উদ্ভিদজীবন হইতে মনুষ্যজীবনের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় অবধি, সকলই অর্থাৎ এই সমগ্র জগৎ ও জীবন এক মহাকার্যকারণের নিয়মশৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে, ইহার কোথাও কোন আইন বা নিয়মের শাসন নাই, যেন এক অন্ধ নিয়তি জীবন ও জগৎ-ব্যাপারের অন্তরালে বসিয়া খেয়াল-খুশির অমোঘ-নিষ্ঠুর রাজত্ব চালাইতেছেন। কিন্তু এই শাসন যতই অমোঘ, যতই নিষ্ঠুর হউক, তাহাতে খেয়াল-খুশির স্থান নাই। অকূলবিস্তার সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে, মিশিয়া যাইতেছে, মনে হইবে বুঝি ইহার কোন অর্থই নাই, কিন্তু একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যায়, পশ্চাতের ঢেউ সম্মুখের ঢেউকে এক সুনিশ্চিত গতিমুখে ঠেলিয়া দিতেছে। এই জীবনের দিকে তাকাইলেও—আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত একটি মনুষ্যজীবন সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিলেও—জানা, এই মানুষ সারা জীবন ধরিয়া যাহা-কিছু করিয়াছে, উহার কোন কাজ, জীবনের কোন ঘটনাই স্বয়ম্ভূ নয়। প্রত্যেক অনুষ্ঠিত কর্মের, প্রত্যেক ঘটনার পিছনে রহিয়াছে কারণ-পরম্পরা, রহিয়াছে অচ্ছেদ্য নিয়মশৃঙ্খল। পূর্বের কর্ম পরবর্তী কর্মধারাকে সুনির্দিষ্ট করিতেছে—আজিকার তুমি-আমি গত দিনের তুমি-আমির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। অতএব, কোন নিয়তির শাসন নয়, অদৃষ্টের কোন বিধানও নয়, মানুষই আপনাকে আপনি গড়িতেছে, ইটের পর ইট গাঁথিয়া ইমারত-রচনার মত, কর্মের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে সে জীবনেরই সৌধ রচনা করিতেছে।

[ **উনিশ** ]  রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা।
সূর্য নাহি ফিরে শুধু ব্যর্থ হয় তারা॥  **ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৯**

রাতের আকাশে অযুত নক্ষত্রের সভায় সূর্যের স্থান নাই—ইহা জানিয়াও যে মূখ অধ্রুব-দিবাকরের ধ্যান করে, সূর্যালোকের শোকে অধীর হইয়া উঠে, সূর্যকে সে তো ফিরিয়া পায়ই না, এমন কি ধ্রুবতারা-লোকের উপভোগ হইতেও হয় বঞ্চিত—দৃপ্ত জীবনরসায়ন সূর্যকিরণের সঙ্গে নক্ষত্রের ক্ষীণালোকের কোন তুলনাই হয় না বটে, তথাপি সেই নয়নলোভাকর স্তিমিতালোকের যে একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আছে, তাহার মাধুর্য উপভোগ ঐ মূর্খের নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়।

আমরা নিকটকে করি তুচ্ছ, কিন্তু দূরের স্বপ্নেও তো মশগুল হই, বাস্তবের সত্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হই, কিন্তু আদর্শের কল্পনাতেও তো বিভোর হইয়া থাকি। চিরপরিচিত অ-পরিচিতের সুখস্বপ্নে হারাইয়া যায়,—সুলভকে দুর্লভের ভাবনায়, কণ্ঠলগ্নাকে চির-অধরার আকাঙ্ক্ষায় প্রতি মুহূর্তে লাঞ্ছিত করি। ফলে সেই অপ্রাপণীয়কেও যেমন পাই না,—করায়ত্তকেও তেমনি হারাইয়া ফেলি। সহজ-সুলভকে অগ্রাহ্য করিয়া দুরূহ-দুর্লভের কামনা মানুষ অহরহঃ করিতেছে; কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে সহজ-সুলভ হইতে যেমন আমরা বঞ্চিত হইতেছি, আবার দুরূহ-দুর্লভকেও তেমনি লাভ করিতে পারি না—সহজ-সুলভ হইয়াও উঠে না। তাই বিশ্বকবি মানুষের এই দুরাকাঙ্ক্ষাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় লিখিয়াছেন,—

> 'যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই
> যাহা পাই তাহা চাই না।'

[ **কুড়ি** ]

> শেফালি কহিল, আমি ঝরিলাম, তারা।
> তারা কহে, আমারো তো হল কাজ সারা,—
> ভরিলাম রজনীর বিদায়ের ডালি
> আকাশের তারা আর বনের শেফালি॥

রজনীর শেষযামে শেফালি ঝরিয়া যাইবার কালে আকাশের তারাকে বলে, 'ভাই, চলিলাম'। তারা বলে, 'আমারও কাজ সারা হইল, রাত্রিও যাই যাই করিতেছে।'

এই সৃষ্টির অন্তর্গত সকল বস্তুই পরিণামশীল—সকল সামগ্রীই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়যুক্ত এক অমোঘ শাসনের অধীন হইয়া আছে, ইহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। কাজ সারা হইলেই ছুটি লইতে হইবে, এক মুহূর্তও তর সইবে না। ফুল ফোটে, গন্ধ বিলায়, ঝরিয়া পড়ে; সূর্য উঠে, সারাদিন অজস্র কিরণধারা ঢালিবার পর পশ্চিম দিগন্তে অস্তাচলশায়ী হয়। মানুষও কৈশোর যৌবন ও বার্ধক্যসমন্বিত জীবনের একটি পূর্ণমণ্ডল রচনা করিয়া অবশেষে জীবন হইতে অব্যাহতি পায়।— সকলেরই এক পরিণাম! বিধাতার এই অন্তহীন অখণ্ড সৃষ্টিধারাকে জড় ও চেতনে মিলিয়া নিজ নিজ অবদানের দ্বারা অব্যাহত ও অপ্রতিহত রাখিয়াছে। প্রকৃতির অন্তর্গত ক্ষুদ্র-বিহৎ সকল পদার্থই যেমন আপন আপন কাজ সম্পন্ন করিয়া একই

নিয়মের অধীন হইতেছে, মনুষ্যসংসারেও তেমনি বলবান-দুর্বল, খ্যাত-অখ্যাত সকল মানুষই জীবনের ঋণ শোধ করিতেছে। ছুটি সকলকেই লইতে হইবে,—বনের শেফালি, আকাশের তারা, ত্রিযামা যামিনী সকলই ফুরাইয়া যাইবে। কেবল যাইবার আগে নিজ নিজ কাজ শেষ করিতে চাই এবং বিধির বিধান এমনই অমোঘ যে কাজ সারা না হইলে ছুটিও মিলিবে না।

**[একুশ]** ফুল কহে ফুকারিয়া, ফল, ওরে ফল,
কত দূরে রয়েছিস্ বল্ মোরে বল্।
ফল কহে মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি,—
তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি॥

ফুল খুঁজিয়া বেড়ায় আকুল হইয়া ফলকে। কারণ,—ফল-পরিণামেই ফুলের সার্থকতা। কিন্তু ফুল জানে না যে, ফলের বাস তাহারই অন্তরে। তারপর ফুলের সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় সেদিন, যেদিন ফুলের অন্তর হইতে ফল বাহিরিয়া আসে পরিপূর্ণ গৌরবে।

মানুষও এমনি করিয়া বিশ্বময় কস্তূরীমৃগসম আপন গন্ধে আকুল হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—কোথায় মানুষ্যজীবনের সার্থকতা, কোথায় মনুষ্যত্বরূপ পরম ধন! এই আকুল অভিযানে কত দীর্ঘকাল ধরিয়া সে যে কত অ-বিদ্যার সাধনা করিতেছে, কত অলীক মিথ্যার সুখস্বপ্ন বয়ন করিতেছে, কত দুরূহ জিজ্ঞাসায় আপনার যাত্রাপথ জটিল হইতে জটিলতর বন্ধুর করিয়া তুলিতেছে, তথাপি সেই প্রশ্নের জবাব এখনও তো মিলে নাই। সার্থকতার সন্ধানে, মনুষ্যত্বের সাধনায়, বিজ্ঞানের দুর্গম পথে মানুষ যাত্রা শুরু করিয়াছে, দর্শনের সূক্ষ্মতম তর্কজাল সে বিস্তার করিয়াছে, সাহিত্যে নব নব সৃষ্টির উন্মাদনায় সে উন্মত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে, ঐশ্বর্যের গগনস্পর্শী স্তূপ সে রচনা করিয়াছে। খ্যাতি ও আভিজাত্যের তাসের ঘর, ভেদ-বৈষম্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সে গড়িয়া তুলিয়াছে। মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে হিংসা-হানাহানির দক্ষযজ্ঞে মাতিয়া উঠিয়াছে। মানুষ এখনও বুঝিতে পারে নাই—এই সন্ধানের শেষ কথাটি। এখনও সে অনুভব করে নাই যে, সাধনার সিদ্ধি তাহার নিজেরই মধ্যে আছে লুকাইয়া। অন্তশ্চৈতন্যের পূর্ণজাগরণে, প্রবুদ্ধ চেতনার শুভ লগ্নে, বাহিরে নয়—অন্তরেই মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসার, বিচিত্র সন্ধানের নির্বাণ ঘটিবে। সেইদিন সে বুঝিতে পারিবে যে, ধন নয়, মান নয়, জ্ঞান নয়, এমন কি বিজ্ঞানও নয়—অন্তরে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার উদ্বোধনেই মনুষ্যজীবনের চরম সার্থকতা, দুর্লভ মনুষ্যত্বের পরম পরাকাষ্ঠা।

**[ বাইশ ]** সুখেতে আসক্তি যা'র আনন্দ তাহারে করে ঘৃণা।
কঠিন বীর্যের তারে বাঁধা আছে সম্ভোগের বীণা। **তা. বি. বি. এ. '৪৯**

নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে মানুষের অন্তরাত্মা আলোড়িত হয়। পৃথিবীর অন্তহীন ভোগৈশ্বর্যের প্ররোচনায় মানুষ শেষ অবধি কিন্তু প্রবৃত্তিকেই দেয় প্রাধান্য। যে-আনন্দ তন্দ্রার ঘোর কাটাইয়া আনে কর্মমুখর জীবন, যে-আনন্দ সুপ্তির মাঝে দেয় আগামী দিনের পথ-চলার ইঙ্গিত, যে-আনন্দ ক্লান্তির মাঝে আনে স্নিগ্ধ প্রশান্তি—সে-আনন্দ ভোগাসক্ত জীবনে নাই। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতার পথে এই ভোগ দেখায় এক স্বপ্নবিধুর আনন্দের আলেয়া। ভোগবাদী জীবনযাত্রার মাঝে আছে জীবনের অভিশাপ-বাণী, আছে করুণ দীর্ঘশ্বাস, আছে হতাশার নির্মম অভিব্যক্তি। কিন্তু মানুষ এই দুরন্ত আলেয়ারই পিছনে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ছুটিয়া বেড়ায় এক অতৃপ্ত ভোগ-লালসার লোভে। আর অতৃপ্ত পিপাসা তাহাকে করে আরও শ্রান্ত—আরও নিরানন্দময়—আরও বিভ্রান্ত।

এই পৃথিবীতেই এক দিকে যেমন আছে ভোগাসক্ত জীবনের প্রাচুর্য, অন্য দিকে তেমনি আছে নিরাসক্ত জীবনের পরিমল আনন্দ। আসক্তিকে যে নিজের অন্তর হইতে দূর করিতে পারিয়াছে, যে আপন বীর্যবত্তাকে উপলব্ধি করিয়াছে, সে-ই এই পৃথিবীতে নির্মল আনন্দের অধিকারী। ভোগাসক্তির বিষবাষ্পে তাহার জীবন বিষময় নয়। শাশ্বত প্রশান্তি তাহাকে দেয় নূতন জীবনের বাণী। সম্ভোগকে যে প্রশ্রয় দেয় না—সে নিরাসক্ত জীবনে বীর্যকেই দেয় প্রাধান্য। ভোগলালাসার অন্তিম পরিণতি তাহার জীবনে রূপায়িতও হয় না। সে পায় নির্মল আনন্দের মাঝে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত।

[ **তেইশ** ] নবোদিত সাহিত্যসূর্যের আলোক প্রথমে অত্যুচ্চ পর্বতশিখরের উপরেই পতিত হইয়াছিল, এখন ক্রমে নিম্নবর্তী উপত্যকার মধ্যে প্রসারিত হইয়া ক্ষুদ্র কুটিরগুলিকেও প্রকাশমান করিয়া তুলিতেছে।

**ঢা. বি. বি. এ. '৪৯**

মানুষের বহুবিচিত্র কর্মধারার মধ্যে একদা সাহিত্যানুশীলনও প্রথম দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ঐ নবোদিত সাহিত্যসূর্যের কিরণে তখনও চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয় নাই। মানুষের সমগ্র সমাজজীবনে তখনও সাহিত্যের আলোক বিকিরিত হইতে পারে নাই। কারণ,—সাহিত্যবিকাশের প্রাথমিক অবস্থা মুষ্টিমেয় প্রতিভাধর জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাহিত্যের ঐ প্রথম চর্চায় উহার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয় নাই। তবে সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ফলে উহার বিভিন্ন দিক ধীরে ধীরে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে চলিল। বিভিন্ন সাহিত্যিক তাঁহাদের স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ হইতে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে লাগিল। অতঃপর আসিল সমালোচক-গোষ্ঠী। অবান্তর অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সাহিত্যের বিস্তৃত চত্বর হইতে দূরীভূত হইল। সাহিত্যিকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে সমাজের বিভিন্ন স্তরেও সাহিত্যের আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হইতেছে। সমাজের নিছক নিম্নস্তরকে কেন্দ্র করিয়াই এক শ্রেণীর

লেখকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে। সত্যই সাহিত্য আজ এক বিশালতায় বিমণ্ডিত। সমাজজীবনে ও ব্যক্তিজীবনে সাহিত্যই আনিয়াছে নূতন আশার বাণী। সমষ্টি ও ব্যষ্টির সুখদুঃখ, তাহাদের আশা-নিরাশা, তাহাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিবার দায়িত্ব লইয়াছে সাহিত্যই। তাই আজ সাহিত্যে মধুর হইয়া উঠিয়াছে মানুষের প্রেম-প্রীতি, মানুষের স্নেহ-মমতা, মানুষেরই সংশয়-ভীতি।

প্রসঙ্গতঃ বাংলা সাহিত্যের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। বাংলা সাহিত্যের সেই শৈশবে খুব কম ব্যক্তিই উহার চর্চা করিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় সাহিত্যসৃষ্টি হইত রাজকাহিনী বা ঈশ্বরস্তুতি লইয়া, আমাদের নিম্ন স্তরের প্রসঙ্গ উহাতে খুব কমই থাকিত। ক্রমে সাহিত্যের বিস্তৃতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সাহিত্যের বিভিন্ন রূপকার, সাহিত্যকে নানা ভাব ও কল্পনা দিয়া, উহাকে ঐশ্বর্যশালী করিয়াছে। তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে দেখা যায়—উহার কত বিস্তৃতি, উহার কত সম্পদ! সমাজের উচ্চতর হইতে অতি নিম্নস্তর অবধি মানুষের জীবনের সহিত সাহিত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, বিশ্বসাহিত্যেরও অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে ঠিক এমনি ভাবেই।

## অনুশীলনী

**[ এক ]** বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। **ক. বি. মাধ্যমিক(কলা) '৫৯**

[ **দুই** ] পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। **ক. বি. মাধ্যমিক (অতিরিক্ত বিকল্প)'৫৯**

[ **তিন** ] সন্তোষের বিকৃতি আছে বলিয়াই অত্যাকাঙ্ক্ষার বিকৃতি নাই। একথা কে মানিবে? প্রথমটিতে যদি রোগে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয়টিতে অপঘাতে মৃত্যু হয়। **ক. বি. মাধ্যমিক ( অতিরিক্ত বিকল্প) '৫৯**

[ **চার** ] 'আমাদের সব ভালো' বলিয়া কেহ কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যাহা যথার্থ মাহাত্ম্যের জিনিস তাহা বুঝিয়া নিতে পারিলে স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে মাহাত্ম্য জিনিসটার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। যে কারণে এই প্রাচীন মাহাত্ম্য ডুবিয়া গেল, তাহাও সযত্নে বুঝিয়া নিতে পারিলে 'সব ভালো'র অল্পতা চলিয়া যায়, আর উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়। **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৯**

[ **পাঁচ** ] গতিই জাগতিক নিয়ম—স্থিতি নিয়মবোধের ফল মাত্র। জগৎ সর্বত্র সর্বদা চঞ্চল।...যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইখানেই চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল। **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৯**

[ ছয় ] সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়,
আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়। **ক. বি. মাধ্যমিক ( কলা ) '৫৮**

[ **সাত** ] "প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।" **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিজ্ঞান ) '৫৮**

[ **আট** ] বলের দ্বারা বলকে ঠেকাইয়া রাখা কেবল একটা উপস্থিত-মতো কাজ চালাইবার প্রণালী-মাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ইহাকেই পরিণাম ব স্বীকার করিতে পারে না। **ক. বি. মাধ্যমিক ( অতিরিক্ত বিকল্প ) '৫৮**

[ **নয়** ] সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না। এই জন্য সন্দেহ এবং প্রতিবাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে লড়াই করিয়া তবেই বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
**ক. বি. মাধ্যমিক ( অতিরিক্ত বিকল্প ) '৫৮**

[ **দশ** ] দিগন্তের মুখচ্ছবি রাত্রি ধীরে কয়,
আমি মৃত্যু তোর মাতা, নাহি মোরে ভয়,
নব নব জন্মদানে পুরাতন দিন
আমি তোরে ক'রে দিই প্রত্যহ নবীন॥ **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৮**

[ **এগারো** ] যা রাখি আমার তরে মিছে তারে রাখি,
আমিও রব না যবে সেও হবে ফাঁকি।
যা রাখি সবার তরে সেই শুধু রবে—
মোর সাথে ডোবে না সে, রাখে তারে সবে। **ক. বি. মাধ্যমিক (কলা) '৫'**

[ **বারো** ] দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাবো কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা। **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিজ্ঞান ) '৫'**

[**তেরো**] "অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজিকালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশূন্য ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি।" **ক. বি. মাধ্যমিক (অতিরিক্ত বিকল্প) '৫৭**

[ **চোদ্দ** ] জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে।
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে॥
**ক. বি. মাধ্যমিক (অতিরিক্ত বিকল্প) '৫'**

[**পনেরো**] ভাবে শিশু বড় হ'লে শুধু যাবে কেনা
বাজার উজাড় করি সমস্ত খেলেনা।

বড় হ'লে খেলা যত ঢেলা বলি মানে,
দুই হাত তুলে চায় ধনজন পানে।
আরো বড় হবে নাকি হবে অবহেলে
ধরার খেলার হাট হেসে যাবে ফেলে॥ ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৭

**[ ষোলো ]** তৃষিত গর্দভ গেল সরোবর-তীরে,
ছি ছি কালো জল, বলি চলি এলো ফিরে।
কহে জল, জল কালো জানে সব গাধা,
যে জন অধিক জানে বলে জল শাদা! ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৭

[ **সতেরো** ] মানুষের পক্ষে কিছু ত্যাগ করা, যথা উপাধি কিংবা ওকালতি, শুনতে মহা কঠিন ; কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি কঠিন, কিছু করা, অর্থাৎ কৃতী হওয়া। জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন ; কেন না, এ লড়াই চিরজীবনব্যাপী, এক মুহূর্ত তার বিরাম নেই। ক. বি. মাধ্যমিক (কলা) '৫৬

[ **আঠারো** ] আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার জন্যই উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।

ক. বি. মাধ্যমিক ( কলা ) '৫৬

[ **উনিশ** ] মানুষ যেমন জানবার জিনিস ভাষা দিয়ে জানায় তেমনি তাকে জানাতে হয় সুখদুঃখ, ভালোলাগা—মন্দলাগা, নিন্দা-প্রশংসার সংবাদ। ভাবে-ভঙ্গীতে, ভাষাহীন আওয়াজে, চাহনিতে হাসিতে চোখের জলে এই সব অনুভূতির অনেকখানি বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু সুখদুঃখ ভালোবাসার বোধ অনেক সূক্ষ্মে যায়। তখন তাকে ইশারায় আনা যায় না, কেবল ভাষার নৈপুণ্যে যতদূর সম্ভব নানা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ক. বি. মাধ্যমিক ( বিজ্ঞান ) '৫৬

[ **কুড়ি** ] বক্তা ও লেখক একজাতীয় জীব নন ; ইহাদের পরস্পরের প্রকৃতিও ভিন্ন, রীতিও ভিন্ন। বক্তা চাহেন, তিনি শ্রোতার মন জবরদখল করেন ; অপর পক্ষে লেখক পাঠকের মনের ভিতর অলক্ষিতে এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে চাহেন। বক্তা শ্রোতার মনকে বিশ্রাম দেন না ; লেখক পাঠকের অবসরের সাথী।

ক. বি. মাধ্যমিক ( বিজ্ঞান ) '৫৬

**[ একুশ ]** শর ভাবে, ছুটে চলি, আমি তো স্বাধীন,
ধনুকটা এক ঠাঁই বদ্ধ চিরদিন।
ধনু হেসে বলে, জান না সে কথা
আমারি অধীন জেনো তব স্বাধীনতা। ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৬

[**বাইশ**] প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কী উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যখন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায়, তখন হইতেই সেই বিরাট্ মানবের কলেবর পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় সে কেবল ভারস্বরূপ বিরাজ করে। বস্তুতঃ কেবল টিকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫**

[**তেইশ**] অক্ষমতাই মহত্ত্বের উপর বিরক্তির প্রধান কারণ। আলস্য পরিহার করিয়া কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য নির্ভয়ে খাটিয়া খাওয়া অনেকের পোষায় না। তাহারাই আপনাকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় মহত্ত্বের নিন্দা রটাইয়া বেড়ায়।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫**

[**চব্বিশ**] চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলোক দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে, তাহা আছে মোর গায়ে।

**ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫ ; বি. এ. '৩১**

[**পঁচিশ**] মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়া দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। মানুষকে দুঃখ দিয়া ঈশ্বর মানুষকে সার্থক করিয়াছেন,—তাহাকে নিজের পূর্ণশক্তি অনুভব করিবার অধিকারী করিয়াছেন। **গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫১**

[**ছাব্বিশ**] এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন তাহা তত অন্ধকার। **ক. বি. বি. এ. '৫৯**

[**সাতাশ**] একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান। **ক. বি. বি. এ. '৫৯**

[**আটাশ**] যেখানটা সর্বদা আমাদের চোখে পড়ে অথচ দেখতে পাইনে, সেইখানেই দেখবার জিনিসকে দেখানো হচ্ছে আর্টিষ্টের কাজ। আর্ট পুরাতনকে বারে বারে নূতন করে। **ক. বি. বি. এ. '৫৮**

[**উনত্রিশ**] আজ যে পুষ্পকলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে। **ক. বি. বি. এ. '৫৮**

[**ত্রিশ**] শুনহ মানুষ ভাই,—
সবার উপরে মানুষ সত্য, স্রষ্টা আছে বা নাই। **ক. বি. বি, এ. '৫৭**

[**একত্রিশ**] লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে ; কুবেরের অন্তরের কথা হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। **ক. বি. বি. এ. '৫৭**

[**বত্রিশ**] বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও

তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন ; শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষসীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহিত করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন। **ক. বি. বি. এ. '৫৬**

[ **তেত্রিশ** ] হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ ক'রে যাও গোপনে গোপনে ; **ক. বি. বি. এ. '৫৬**

[ **চৌত্রিশ** ] রাখালকে কেউ ভুলেও রাজসিংহাসনে আমন্ত্রণ করে না। এই জন্যেই বটতলায় সে বাঁশি বাজাবার সময় পায়। কিন্তু যদি দৈবাৎ কেউ করে বসে, তা'হলে পাচনিকে রাজদণ্ডের কাজে লাগাতে গিয়ে রাখালি এবং রাজত্ব দুয়েরই বিঘ্ন ঘটে **ক. বি. বি. এ. '৫৫**

[ **পঁয়ত্রিশ** ] নাই ভগবান নাইকো যদি ধর্ম যাদের শিক্ষামূলে,
ছিন্নমস্তা শিক্ষা যে শুধু সয়তানী ইস্কুলে !
দূর করি সেই ঝুটো সভ্যতা ফুঁকো শিক্ষার,
দূর করি সেই ভেক্-নেওয়া যত আপনার ভিক্ষার,
আপনার মত আপন শিক্ষা নিজে হবে জিনে',
মুক্তির পথ মিলিবে তবে তো দেশজোড় দুর্দিনে। **ক. বি. বি. এ. '৫৫**

[ **ছত্রিশ** ] ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না; তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিজ আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে ; উৎপাতের দ্বারা সেই তপঃসাধনকে চঞ্চল সুতরাং নিষ্ফল করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়। ফলকে পাকিতে দেওয়াকেই সে ঔদাসীন্য বলিয়া জ্ঞান করে, টান দিয়া ফলকে ছিঁড়িয়া লওয়াকেই সে একমাত্র পৌরুষ বলিয়া জানে। সে মনে করে যে, মালী প্রতিদিন গাছের তলায় জলসেচন করিতেছে—গাছের ডালে উঠিবার সাহস নাই বলিয়াই তাহার এই দীনতা। **ক. বি. বি. এ. '৫৪**

[ **সাঁইত্রিশ** ] দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি,
সত্য বলে, তবে আমি কোথা দিয়ে ঢুকি ?
উভয় সংকটে পড়ি' দ্বার রাখি খুলি',—
ঘরের ভিতরে বেধে গেল চুলোচুলি। **ক. বি. বি. এ. '৫৪**

[ **আটত্রিশ** ] বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে। **ঢা. বি. বি. এ. '৪৯**

[ **উনচল্লিশ** ] অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ-সম দহে। **ক. বি. বি. এ. '৪৬**

[ **চল্লিশ** ] সুখ দুঃখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়ে যে করিবে আশ
দুঃখ যাবে তার ঠাঁই। **ক. বি. বি. এ. '৪০**

[ **একচল্লিশ** ] মৃত পদার্থের মধ্যে চিত্তকে অবরুদ্ধ করে তার মধ্যে সর্বত্র বিরাজ করা আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে সর্বত্র লক্ষ্যগোচর হয়, এমন কি আমাদের দেশের যুবকদের মুখেও এর সমর্থন শোনা যায়। প্রত্যেক দেশের যুবকদের উপর ভার রয়েছে সংসারের সত্যকে নূতন করে যাচাই করে নেওয়া, সংসারকে নূতন পথে বহন করে নিয়ে যাওয়া, অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। প্রবীণ ও বিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা সত্যের নিত্যনবীন বিকাশের অনুকূলতা করতে ভয় পান, কিন্তু যুবকদের প্রতি ভার আছে তারা সত্যকে পরখ করে নেবে।

সত্য যুগে যুগে নূতন করে আত্মপরীক্ষা দেবার জন্যে যুবকদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। সেই সকল নবযুগের বীরদের কাছে সত্যের ছদ্মবেশধারী পুরাতন মিথ্যা পরাস্ত হয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, আমাদের দেশের যুবকেরা এই আহ্বানকে অস্বীকার করেছে। সকল প্রকার প্রথাকেই চিরন্তন বলে কল্পনা করে কোনো রকমে শান্তিতে ও আরামে মনকে অলস করে রাখতে তাদের মনের মধ্যে পীড়া বোধ হয় না, দেশের পক্ষে এইটেই সকলের চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়—রবীন্দ্রনাথ।

**ক. বি. বি. এ. ( অনার্স ) '৫৯**

[ **বিয়াল্লিশ** ] একথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভারতবাসী আর্যদের কৃতিত্ব সাম্রাজ্যগঠনে নয়, সমাজগঠনে ; এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় শিল্পে-বাণিজ্যে নয়, চিন্তার রাজ্যে। শাস্ত্রের ভাষায় 'পৃথিবীর সর্বমানব'কে আর্য-আচার শিক্ষা দেওয়া এবং সেই আচারের সাহায্যে সমগ্র ভারতবাসীকে একসমাজভুক্ত করাই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। তার ফলে, হিন্দু-সমাজের যা-কিছু গঠন আছে তা আর্যদের গুণে, এবং যা-কিছু জড়তা আছে তাও তাঁদের দোষে। এই বিরাট্ সমাজের ভিতরে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রভুত্ব রক্ষা করবার জন্য তাঁরা যে দুর্গ গঠন করেছিলেন, তাই আজ আমাদের কারাগার হয়েছে। দর্শনে-বিজ্ঞানে কাব্যে-অলংকারে অভিধানে-ব্যাকরণে তাঁদের অপূর্ব কীর্তি, যে ভাষার তুলনা নেই সংস্কৃত ভাষায়, অক্ষয় হয়ে রয়েছে। **ক. বি. বি. এ. ( অনার্স ) '৫৮**

[ **তেতাল্লিশ** ] প্রতিমার মাটি সত্য নয়, তাকে যতই গয়না দিয়ে সাজাইনে কেন ? অথচ প্রতিমার মধ্যে যে সত্য নেই এত বড়ো ঘোর ব্রাহ্মিক গোঁড়ামিও ঠিক নয়। আসল কথা তাকে আঁকড়ে ধরতে গেলেই ভুলটাকে ধরা হয়, তখনই সত্য দেয় দৌড়। যে পোকা বইএর কাগজ কেটে খায় সেই পৌত্তলিক, যে তাকে চিত্ত দিয়ে পড়তে পারে, কাগজ তার কাছে থেকেও নেই।—রবীন্দ্রনাথ। **ক. বি. বি. এ. (অনার্স) '৫৭**

[ **চুয়াল্লিশ** ] বুদ্ধির জায়গায় বিধি এবং আত্মশক্তির জায়গায় ভগবানকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যারা আত্মাবমাননা করে তারাই দুঃখ পায়, মনের জড়ত্ববশতঃই সে কথা তারা বোঝে না। বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে আর শাস্ত্রকে মানাই যাদের ধর্ম, রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্মের মধ্যাহ্নকালকেও সুপ্তির নিশীথরাত্রি বানিয়ে তোলে। **ক. বি. বি. এ. ( অনার্স )'৫৬**

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## ভাবার্থ

### আদর্শমালা

#### ঝর্ণার গান

[এক] পাহাড়! ওগো পাহাড়! তোমার বুকের নীড়ে,
বৃথাই তুমি চাইছো মোরে রাখ্‌তে ঘিরে।
বাইরে যে-জন বেরিয়েছে সে ফিরবে নাক'
অচল তুমি, পথ-চলা সুখ পাওনিক' তাই দাঁড়িয়ে থাক';
সৃষ্টি-করার আনন্দ কি বিপুলতরা,—
—উষরমাটি শস্পে-ভরা।
অরণ্য গো, অরণ্য! হায়, ডাকছো মোরে,
লক্ষ শাখার ব্যাকুল বাহু প্রসার ক'রে!
বিধুর তোমার ছায়া আমার পড়েছে বুকে,—
মর্মরিয়া দীন মিনতি গুঞ্জরিছ অ-বোল মুখে।
থামার সময় নেইক' আমার;—তোমার দেহে
রাঙিয়ে গেলাম সবুজ স্নেহে।
আকাশ আমায় আভাস দেছে সমুদ্ররূপ,—
বাতাস্ দেছে পোঁছে অতল-বার্তা অনুপ।
গান গেয়ে ঐ ডাক্‌ছে বিহগ,—'আয়লো ত্বরা,
রত্নাকরে আপ্‌না সঁপে উর্মিলা হও স্বয়ংবরা—'
ঢেউগুলি মোর ভাব্‌ছে—সাগর কখন্ পাবো;
যাবোই ওগো! যাবোই যাবো। **গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫৯**

ক্ষুদ্র সংকীর্ণ সীমিত জীবনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভগ্ন করিয়া সুদূর, বিপুল সুদূরের আহ্বানে মুক্ত প্রাণের অবাধ হিল্লোলে ছুটিয়া চলাতেই তো যত-কিছু সুখ, যত-কিছু আনন্দ। অচল পর্বতের ন্যায় স্থিরস্থাণু হইয়া জড়ের স্বস্তি পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু নিখিল বিশ্বের সঙ্গে নিগূঢ় যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইলে প্রাণচঞ্চল মুক্তধারা নির্ঝরেরই ন্যায় অবারণ গতিতে, অজানার পানে, ভাবনাশূন্য হইয়া অগ্রসর হইতে হয়। পার্শ্ববর্তী অরণ্যের বিপুল মায়া, তাহার কাতর মর্মধ্বনি নির্ঝরের চলার উল্লাসকে স্তম্ভিত তো করিতেই পারে না, পরন্তু বাঁধনহারা ঝর্ণাধারা তাহার নিরাসক্ত মুক্ত প্রাণের রতিরসে অনুর্বরা ভূমিকে করে উর্বরা, করে শস্যশ্যামলা। ঠিক এমনি ভাবেই চলার-পথের অভিযাত্রী মুক্ত প্রাণের অবাধ হিল্লোলে শুধু যে ছোট আশা, ছোট সুখ, পিছনের সুনিবিড় বেদনা-বিহ্বল আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া চলে তাহা নয়, যাত্রাপথে নব

নব সৃষ্টির বিপুল আনন্দেও সে উঠে ভরিয়া। যে নিত্যপথের পথিক, ঊর্ধ্বে অন নীলাকাশ যাহাকে বিরাটের আভাস জানাইয়াছে, অপ্রতিহতগতি বায়ু যাহাকে গভীর-গহনের অতুলনীয় বার্তা শুনাইয়াছে, বিরাটের সহিত মহামিলনলাভের জন্য যাহার প্রা উতলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গতি অবরুদ্ধ করিবে কে?

[ দুই ] একদল লোক আছেন যাঁরা বলেন 'আর্ট ক'রে কি পেট ভরবে?' এখানে একটা কথ মনে রাখ্‌তে হবে। ভাষা-চর্চার যেমন দুটো দিক আছে—একটা আনন্দ ও জ্ঞানের দিক আর-একটা অর্থলাভের দিক, তেমনি শিল্পচর্চারও দুটো দিক আছে—একটা আনন্দ দেয়, আর-একটা অর্থ দেয়। এই দুটি ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্প। চারুশিল্পের চর্চা আমাদের দৈনন্দিন দুঃখ-দ্বন্দ্বে সংকুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, আর কারুশিল্প আমাদের নিত্য প্রয়োজনের জিনিসগুলিতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর ক'রে তোলে তাই নয়, অর্থাগমেরও পথ ক'রে দেয়।

শিল্পশিক্ষার অভাব যে শুধু আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা অসুন্দর ক'রে তুলেছে তাই নয়, আমাদের অতীত যুগের রসস্রষ্টাদের সৃষ্ট সম্পদ থেকেও আমাদের বঞ্চিত ক'রেছে। আমাদের চোখ তৈরি হয়নি তাই দেশের অতীত গৌরব যে চিত্র ভাস্কর্য ও স্থাপত্য এতদিন আমাদের কাছে অবোধ্য ও অবজ্ঞাত ছিল বিদেশ থেকে সমঝদার প্রয়োজন হ'ল সেগুলি আবার আমাদের বুঝিয়ে দিতে।

**ক. বি. মাধ্যমিক '৫:**

শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান নাই—ইহাই একদল লোকের ধারণা। কারণ, শিল্পচর্চা করিয়া অন্নসংস্থান হইবে না। কিন্তু এই ধারণা সর্বতোভাবে ভ্রমাত্মক। একথা মনে রাখা সমীচীন যে, শিল্পানুশীলন শুধু যে আনন্দই দেয় তাহা নয়, অর্থও দেয়। শিল্পের দুটি দিক—যেটি আনন্দের দিক তাহার নাম চারুশিল্প আর যেটি অর্থের দিক তাহার নাম কারুশিল্প। চারুশিল্প প্রাত্যহিক দুঃখদ্বন্দ্বে কুণ্ঠিত আমাদের মনকে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে; পক্ষান্তরে কারুশিল্প আমাদের নিত্য প্রয়োজনের সামগ্রীগুলিকে সৌন্দর্যে মাধুর্যে ভরিয়া আমাদের চলার পথে উপস্থাপিত করিয়া আমাদের অর্থোপার্জনের সুযোগ বহিয়া আনে।

বলিতে কি, শিল্পশিক্ষার অভাবই আমাদের জাতীয় জীবনকে দুই দিক দিয়া বিধ্বস্ত করিতেছে: প্রথমতঃ, আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার পথ অসুন্দর হইয়া উঠিতেছে; দ্বিতীয়তঃ, চিত্রে-ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে আমাদের দেশ অতীতে যে কতখানি সমুন্নত হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার মত মনোভঙ্গী হারাইয়া ফেলায় ঐ অবোধ্য অবজ্ঞাত স্বদেশীয় শিল্পকৃতিত্ব আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য বিদেশীয় সমঝদারের আসিবার প্রয়োজন ঘটিল। ইহা আমাদেরই লজ্জার কথা।

[ **তিন** ] দুঃখী বলে,—বিধি নাই, নাহিক বিধাতা;
চক্রসম অন্ধ ধরা চলে।'
সুখী বলে,—'কোথা দুঃখ, অদৃষ্ট কোথায়?
ধরণী নরের পদতলে।'

জ্ঞানী বলে,—'কার্য কাছে, কারণ দুজ্ঞের্য় ;
এ জীবন প্রতীক্ষা-কাতর।'
ভক্ত বলে,—'ধরণীর মহারাসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিক-শেখর।'
ঋষি বলে,—'ধ্রুব তুমি, বরেণ্য ভূমান্।'
কবি বলে, 'তুমি শোভাময়।'
গৃহী আমি, জীবযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে,—
'দয়াময় হও হে সদয়।' ক. বি. মাধ্যমিক '৫১

বিপুল এই বিশ্বসংসারের মানুষের মনোভঙ্গীও বহুবিচিত্র। পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও মানস-অবস্থাই বিভিন্ন মানুষের অন্তরে বিভিন্ন মনোভাব সংক্রামিত করিয়া থাকে। ঈশ্বর আছেন কি নাই—থাকিলে তিনি কোথায়—কিই-বা তাঁহার স্বরূপ—কেমনই-বা তাঁহার রূপ—কখনই বা তাঁহার প্রসাদ-লাভ ঘটিবে ইত্যাদি জিজ্ঞাসায় মানবমাত্রই মুখর। নিত্য দুঃখজ্বালায় জর্জরিত মানুষ বিধাতার বিধান সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়ে; সে মনে করে, এই পৃথিবী এক নিয়মবহির্ভূত নিষ্করুণ পদ্ধতিতে ঘূর্ণ্যমান। পক্ষান্তরে, যে-ব্যক্তির জীবন দুঃখকণ্টকে কণ্টকিত নয়, তাহার কাছে অদৃষ্ট বলিয়া কিছুই নাই। এহেন সুখী ব্যক্তি মনে করে, মানুষই বিশ্বেশ্বর। আবার যে-ব্যক্তি বহির্জগৎ সম্বন্ধীয় বিচারশক্তিসম্পন্ন, সে কার্যমাত্রেরই কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য সমুৎসুক; কিন্তু এই বিচিত্র বিপুল সৃষ্টিকার্যের সেই রহস্যময় স্রষ্টাকারণকে জানিবার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতীক্ষা করিতে থাকে। পক্ষান্তরে, যে-ব্যক্তি জ্ঞানের পথে না চলিয়া ভক্তির পথে চলে, সে অন্তরধর্মে বলীয়ান হইয়া অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে যে, এই পৃথিবী সেই আনন্দময়েরই লীলাপ্রাঙ্গণ। যে-ব্যক্তি সত্যদ্রষ্টা ঋষি, সে কিন্তু লীলাময় রসিকচূড়ামণির ধ্রুবত্ব, তাঁহার নিত্যতা, তাঁহার বিরাটত্ব কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকে। আর কবি তো সেই অরূপকে রূপের অধিকারী, সকল শোভার মূলাধার, সকল সৌন্দর্যের কেন্দ্র রূপে কল্পনা করে। পরিশেষে জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সংসারী ব্যক্তি ঐ অপরূপ-সুন্দরকে করুণাময় ভগবান রূপে ভাবিয়া তাঁহার অকৃপণ করুণা যাচ্ঞা করে। দুঃখী, সুখী, জ্ঞানী, ভক্ত, ঋষি, কবি ও গৃহী—ইহাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভাব ও ভাবনার আশ্রয়ে এমনি ভাবেই অগ্রসর হইয়া থাকে।

[চার] বিদায় সিন্ধু! আসি,
প্রবাস-বন্ধু, লীলাছন্দের লীলানন্দের রাশি।
ফুরালো জীবনে নয়নোৎসব লহরীপুঞ্জ গোণা
সন্ধ্যা-প্রভাতে তোমার নান্দী বন্দনা-গান শোনা।
তোমার ফেণর ছুঁয়ে ভয়ে ভয়ে ফুরাইল ছেলেখেলা,
ফুরালো বালুকা-মন্দির-গড়া আনমনে সারা বেলা।

হেরিব না হায় তোমার ফণায় নিশীথে মণির দ্যুতি,
মহানীলিমায় ইন্দ্রিয়াতীত লভিব না অনুভূতি।
হেরিব না আর পুলিন-মাতার স্নেহের অঙ্ক 'পরে
উর্মিমালার ফেনিল মূর্ছা শ্রান্তি-হরণ তরে!
লভিব না আর প্রীতির শঙ্খ শুক্তির উপহার,
ফুরালো অবাধ প্রাণের প্রসার মুক্তির অধিকার। **ক. বি. মাধ্যমিক '৫০**

সমুদ্র নিছক সমুদ্রই নয়, সে যে প্রবাসী কবির বন্ধু। উহার অসীম নীল বিস্তারে, অবিরাম তরঙ্গভঙ্গীতে, অশ্রান্ত কলগীতিতে কবির চক্ষু কর্ণ মন এমনই অভিভূত হইয়াছে যে, তাঁহার প্রবাসজীবন যাপনের একমাত্র বন্ধুই বুঝিবা ঐ সমুদ্র। সকাল-সাঁঝে সাগর-সংগীত শুনিয়া সভয়ে উর্মিমালার সঙ্গে খেলিয়া, বেলাভূমিতে বালুকা-মন্দির গড়িয়া নিশীথ-সমুদ্রের রূপবৈচিত্র্য দেখিয়া তীরদেশে ধাবমানা উর্মিমালার বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়া, কূলে কূলে শঙ্খ ও শুক্তি আহরণ করিয়া ধীরে ধীরে সমুদ্রের সঙ্গে কবির এক নিবিড় মিতালি হইয়াছিল। কালক্রমে দিগন্তহারা সমুদ্রের বিরাট্ প্রাণের মধ্যে কবিচিত্ত শুনিয়াছে এক বিপুল মুক্তির সাড়া। তাই আজ সমুদ্রের কাছে বিদায় লইবার ক্ষণে এতদিনের বন্ধুত্ব, এতদিনের প্রীতি ও এতদিনের একাত্মতা স্মরণ করিয়া কবির অন্তর তীব্র বেদনায় বিমথিত হইয়াছে।

**[ পাঁচ ]** বুদ্ধদেবের সময়ে যদি সিনেমাওয়ালা এবং খবরের কাগজের রিপোর্টারের চলন থাকত, তাহ'লে তাঁর খুব একটা সাধারণ ছবি পাওয়া যেত। তাঁর চেহারা, তাঁর চালচলন, তাঁর মেজাজ, তাঁর ছোটখাট ব্যক্তিগত অভ্যাস, তাঁর রোগতাপ ক্লান্তিভ্রান্তি সব নিয়ে আমাদের অনেকের সঙ্গে মিল দেখতুম। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এই সাধারণ প্রমাণটাকেই যদি প্রামাণিক বলে গণ্য করা যায় তা'হলে একটা মস্ত ভুল করি। সে ভুল হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিতের—ইংরাজিতে যাকে বলে পারস্পেকটিভ্। যে জনতাকে আমরা সর্বসাধারণ বলি, সে কেবল ক্ষণকালের জন্য মানুষের মনে ছায়া ফেলে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। অথচ এমন সব মানুষ আছেন যাঁরা শত শত শতাব্দী ধরে মানুষের চিত্তকে অধিকার করে থাকেন। যে-গুণে অধিকার করেন সেই গুণটাকে ক্ষণকালের জাল দিয়ে ধরাই যায় না। ক্ষণকালের জাল দিয়ে যেটা ধরা পড়ে সেই হল সাধারণ মানুষ; তাকে ডাঙায় তুলে মাছ কোটার মত কুটে বৈজ্ঞানিক যখন তার সাধারণত্ব প্রমাণ ক'রে আনন্দ করতে থাকেন তখন দামী জিনিসের বিশেষ দামটা থেকেই তাঁরা মানুষকে বঞ্চিত করতে চান। সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষ অসামান্য মানুষকে এই বিশেষ দামটা দিয়ে এসেছে। সাধারণ সত্য মত্ত হস্তীর মত এসে এই বিশেষ সত্যের পদ্মবনটাকে দলন করলে সেটা কি সহ্য করা যাবে?

**ক. বি. মাধ্যমিক '৫০**

সাধারণ মানুষ ও মহামানবকে একই মাপকাঠি দিয়া বিচার করা চলে না। প্রাত্যহিক জীবনের তথ্যস্তূপে ভারাক্রান্ত যে-মানুষটি, সে ঐ সাধারণ মানুষ ও মহামানব উভয়েরই মধ্যে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, ক্ষণকালের এই প্রাকৃত জীবন, নিত্যধ্বংসশীল এই জনতা-জীবনকে এড়াইয়া যে গোপন মানুষটি শাশ্বতকালব্যাপী বাঁচিয়া থাকে, সে থাকে

তাহার অন্তর্নিহিত বৃহত্তর মহত্তর ভাবজীবনকে কেন্দ্র করিয়া। অতএব, বুদ্ধদেবের ন্যায় মহাপুরুষের জীবনতথ্যের ছবি বা বিবরণ সম্ভব হইলে সিনেমা ও খবরের কাগজের কল্যাণে সংগ্রহ করা গেলেও, তাঁহার জীবনসত্যের পরিচয় ঐভাবে পাওয়া অসম্ভব। কেন না, জীবনতথ্য নয়, জীবনসত্যই কেবলমাত্র অনুভূতিগম্য। বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ-বুদ্ধির প্রাখর্যে সর্বসাধারণের সাধারণত্ব উদ্ঘাটিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু মহামানবের অসাধারণত্ব উদ্ঘাটন করা ঐ বিশ্লেষণবুদ্ধির অতীত। মহামানবজীবনের এই বিশেষ মূল্যবোধ অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই।

[ ছয় ] অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিসটাকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ-বিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালিত্ব লইয়া অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সে উচ্চ চূড়া, অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে। ক. বি. মাধ্যমিক (বিশেষ) '৫০

বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যাঁহারা কীর্তিমান খ্যাতিমান যশস্বী বলিয়া সুপরিচিত, তাঁহারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে যে কত তুচ্ছ, কত নগণ্য, তাহা বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত পাঠ করিলেই বুঝা যায়। বাঙ্গালিত্বের তিনি সর্বোত্তম অধিকারী। চারিদিকের অধঃপতন হীনতা নীচতাকে উপেক্ষা করিয়া বিদ্যাসাগর চারিত্রিক দৃঢ়বত্তার এমনই এক সু-উচ্চ আসনে সমাসীন যে, চরিত্রবত্তায় তাঁহাকে অতিক্রম করা অথবা তাঁহার সমকক্ষ হওয়া কোনও বাঙ্গালীর সাধ্যায়ত্ত নয়।

[ সাত ] কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি'।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে?"
দেবতা কহিলা, "আমি।" শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, "কে তোরা, ওরে মায়ার ছলনা।"
দেবতা কহিলা, "আমি।" কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, "তুমি কোথা, প্রভু।"।
দেবতা কহিলা, "হেথা।" শুনিল না তবু
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি',
দেবতা কহিলা, "ফির।" শুনিল না বাণী।
দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!" ক. বি. মাধ্যমিক (অতি) '৫১

সুখদুঃখে-ভরা এই যে জীবন ও জগৎ—ইহাকে ভালবাসা, ইহার মহিমা অনুভব করা, ইহাই তো মানবজীবনের সব চেয়ে বড় কথা। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনেরই মধ্যে পাতা রহিয়াছে ভগবানের আসন। মায়ার ছলনা বলিয়া ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে ভগবানকেই পরিত্যাগ করা হয়। সংসারকে অস্বীকার করিয়া যে-বৈরাগ্য, তাহা ভগবানকেই করে ব্যথিত। কেন না,—এই জগৎ ও জীবন তো তাঁহারই অভিব্যক্তি—ইহারই মাঝে তিনি আত্মগুপ্ত। তাই ছোটো-বড়োতে, ভালো-মন্দে, দুঃখ-সুখে মেশানো এই যে জগৎ ও জীবন—ইহারই মাঝে হয় চিরসুন্দরের প্রকাশ আর সংসারের ভিতরে থাকিয়া আনন্দানুভূতিই তো সেই চিরানন্দময় ভগবানের উপাসনা।

[ **আট** ] পাখিটি মরিল। কোন্ কালে যে, কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, "পাখি মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, একটি কথা শুনি।"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।"

রাজা শুধাইলেন, "ওকি আর লাফায়!"

ভাগিনা বলিল, "আরে রাম।"

"আর কি ওড়ে!"

"না।"

"আর কি গান গায়!"

"না।"

"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়।"

"না।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাখিটাকে আনো তো দেখি।"

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়-সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল। ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৩৫

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক ধর্ম, স্বাভাবিক পরিবেষ্টনী হইতে যাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া আনিয়া নূতন-কিছু প্রবৃত্তি, নূতন-কিছু ধর্ম, নূতন-কিছু পরিবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাক্ না কেন, মুক্ত জীবনের স্বাদ ও সহজাত প্রকৃতি-ধর্ম সে কখনও ভুলিতে পারে না। লাফালাফি করা, উড়িয়া বেড়ানো, গান গাওয়া, ক্ষুধায় চীৎকার—ইহাই তো মুক্ত পাখির জীবনধর্ম। এই জীবনধর্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া যে-শিক্ষাই তাহাকে দেওয়া হোক্ না কেন, তাহার মৃত্যু তো ঘটিবেই। সেইরূপ-যে-মানুষ মুক্ত জীবনের স্বাদ বুঝিয়াছে, তাহাকে বন্ধনদশার মধ্যে রাখিয়া যে-শিক্ষাই দেওয়া হোক্ না কেন, সে-শিক্ষা তাহার অন্তরকে ভরিয়া তুলে না। কেন একটা আলাদা ও স্বতন্ত্র সত্তা লইয়া সেই বহিরাগত শিক্ষা হয় প্রকটিত। হয়তো

বা এই যে শিক্ষা—ইহা শিক্ষার্থীর মৃত্যুরও কারণ হইয়া পড়ে। স্বভাবের সঙ্গে শিক্ষার মেলবন্ধন না ঘটিলে এইরূপই হইয়া থাকে।

[ নয় ] বহু দিন গত চৈতি গাজন,
মেঘে মাঠে আজ অম্বুবাচন
থামাও তোমার পাগলে নাচন
বেঁধে নাও জটাজুট,
হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া
প্রলয়-শালায় পিটিয়া রাঙিয়া
গ'ড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল
ধরো লাঙ্গলের মুঠ।
আমাদেরি সাথে চলো গো ঠাকুর
ওই নাচে-পোড়া মাঠে,
দুই হাতে চেপে চালাও লাঙ্গল
পাথরও যেন গো ফাটে।
শংকর! হও সংকর্ষণ,
মাটি-ছোঁয়া মেঘে নামে বর্ষণ,
শস্যে শ্যামল করো ধরাতল
বাঁচুক অন্নপূর্ণা। ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৪৯

চৈত্রমাসে হয় শিবের গাজন-উৎসব। বৈশাখে যে প্রচণ্ড সূর্যকিরণ পৃথিবীর বুকের উপরে পড়ে, তাহাতে সকল সরসতা উবিয়া গিয়া দেয় আত্যন্তিক নীরসতা। সংহারত্রিশূল-হস্তে রুদ্র ভৈরবের তাণ্ডবনৃত্য তখন প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে শুরু হয়। ইহারই কিছু দিন বাদে আসে আষাঢ় মাস। তখন পৃথিবী হয় রজঃস্বলা। অবিরাম বারিবর্ষণে মাঠ ও প্রান্তর যায় জলে ভরিয়া, রৌদ্রদগ্ধ নীরস মাটি হয় সরস, অনুর্বরা ভূমি হয় উর্বরা। দিগন্তবিস্তৃত মেঘ আর তাহার বর্ষণ—এই সময়ে প্রলয়ংকর শিবকে হলধর বলরামের বেশে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হইতে হয়। নচেৎ,—ধরণী যে শস্যশ্যামলা হয় না। আর ধরণী যদি শস্যশ্যামলা না হয়, তাহা হইলে শিবগৃহিণী অন্নপূর্ণারও তো লজ্জা! তাই অন্নপূর্ণা যাঁহার নাম, তাঁহারই নামগৌরব রক্ষা করিবার জন্য রুদ্র শিবকে শেষ অবধি সৃষ্টিরূপ লইয়াই আত্মপ্রকাশ করিতে হয়।

[ দশ ] চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন
ঢালি' সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি;—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন
কঠোরে গঙ্গায় পূজি' ভগীরথ ব্রতী,
( সুধন্য তাপস ভবে নর-কুল-ধন ! )

সাগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি ;
পবিত্রিলা আনি' মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেইরূপে ভাষাপথ খননি' স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি,
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়-ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি! কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান॥ ক. বি. মাধ্যমিক '৪৯

গঙ্গা ছিলেন মহাদেবের জটাজালের মধ্যে আবদ্ধ। ভগীরথ মহাদেবের কঠোর তপস্যা করিয়া গঙ্গাকে সেই জটাজাল হইতে বাহির করিয়া আনিয়া ভস্মীভূত সগর-সন্তানদিগকে শাপমুক্ত করিয়া তাহাদিগের মহদুপকার সাধন করেন। বেদব্যাস রচিত মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তাই কবি কাশীরাম দাস মূল সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহভারতের বাংলায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর অতুলনীয় উপকার করিয়াছেন। এই জন্যই সগরবংশের শাপ-বিমোচনকারী ভগীরথের সহিত বাঙ্গালীর অজ্ঞানতাবিতাড়নকারী কাশীরাম দাসের নাম একই সঙ্গে স্মরণীয়।

[এগারো] সমস্ত সৌরজগৎ যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতেছে, তেমনি অন্য দিক দিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন মানবজীবনকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত বিশ্বচরাচর দিবারাত্র ঘুরিতেছে। এই যে এক বিপুল বিশ্বব্যাপী নিগূঢ় আকর্ষণ, ইহাকে এক হিসাবে বিশ্বের কেন্দ্রগামিনী শক্তি বলা যাইতে পারে। মানব এই বহুধাবিভিন্ন শক্তিসংঘের অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাতে সর্বদা স্পন্দিত জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ। এই যে এক অচেনা অজানা বিপুল ব্রহ্মাণ্ড-শক্তিনিচয়ের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া মানব ধীরে ধীরে আপনার শক্তি সঞ্চয়পূর্বক অন্য সকল শক্তিকে অভিভূত করিবার নিয়ত চেষ্টায় কখনও উঠিতেছে, কখনও বা পড়িতেছে, ইহাই মানবের সংসার, ইহাই মানবের ভাগ্য। সুখ এবং দুঃখ এই ভাগ্যেরই অবস্থা-বিপর্যয়। কখনও সুখ-রবির খর কিরণে সে ভাগ্য প্রসন্ন, নির্মল, জাজ্বল্যমান ; আবার কখনও সে সুখ কেন্দ্রীয় উষার ন্যায় ক্ষণিক ম্লান আলোকে দুঃখের তমিস্র কথঞ্চিৎ অবসান করিয়া দেয়।

ক. বি. মাধ্যমিক (অতিরিক্ত) '৪৮

সারা বিশ্বচরাচর ব্যাপিয়া এক রহস্যময় শক্তিসত্তার তাহার লীলা প্রকটিত করে। আর মানুষ সেই শক্তি-অভিব্যক্তির মাঝে থাকিয়া আপন শক্তি অপহরণ করিয়া জগতের সকল বিরুদ্ধ ও বিচিত্র শক্তির সহিত সংঘর্ষে কখনও-বা উত্থান, কখনও-বা পতন, আবার কখনও-বা সুখ, কখনও-বা দুঃখ, এই উভয়ের মধ্যে যে-কোন একটির সাক্ষাৎ লাভ করে। সংঘর্ষই তো মানুষকে করে আত্মপ্রবুদ্ধ। সংঘাতের মধ্য দিয়াই তো ঘটে মানবজীবনের অভিব্যক্তি। আর এই সংঘর্ষের ফলেই একটানা প্রগাঢ় সুখ মানুষের অদৃষ্টে দেখা দেয় না, দেখা দেয় সুখের তারতম্য, দেখা দেয় দুঃখেরও মাঝে সুখের ক্ষীণ আলোক।

[ বারো ] কলা সম্বন্ধে রাস্কিনের মত খুব প্রশস্ত এবং উদার। তাহাতে কোনরূপ সংকীর্ণতা নাই—কলাসম্ভোগ হইতে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করিতে চাহেন না। ধনী নির্ধন সকলেই তাহাতে আমন্ত্রিত। কেবল তাহাই নয়। পরম ভক্ত ভাগবতকার যেমন বলেন, 'ধর্ম' সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি ভগবানে ভক্তি উৎপাদন না করে, তবে তাহা "শ্রম এব হি কেবলং", রাস্কিনও সেইরূপ বলেন, 'যে জীবনে পরিশ্রম নাই, সে জীবন যেন একটি গুরুতর অপরাধ; এবং যে পরিশ্রমে কলার আনন্দ নাই, তাহা পশুত্ব।' তাঁহার সমুদয় শিক্ষার মধ্যে এই একটি কথা নিরন্তর প্রতিধ্বনিত—মানব-চরিত্রের উন্নতিসাধনে কলাবিদ্যা শ্রেষ্ঠ সহায়। কারণ, এই জগতে যাহা কিছু আছে—অসীম বাহ্য প্রকৃতির বিরাট ব্যাপার হইতে সূক্ষ্মতম পরমাণু পর্যন্ত, এবং অনন্ত দুরবগাহ মানবহৃদয়ের সুখ-দুঃখের গভীর আলোড়ন হইতে সামান্য সাধটি পর্যন্ত সকলই কলাবিদ্যার বিষয়ীভূত হইতে পারে। **ক. বি. বি. এ. '৪৯**

কলাবিদ্ রাস্কিনের মতে, নিসর্গজগৎ ও মানবজীবন উভয়ই ললিতকলার অঙ্গীভূত। বিশ্বপ্রকৃতির সীমাহীন রহস্য, সে এখন বৃহত্তমই হোক্, কি ক্ষুদ্রতমই হোক্ এবং অন্তহীন রহস্যে-ভরা সুখ-দুঃখের আলোড়নে আলোড়িত এই যে মনুষ্যচিত্ত—এ সকলেরই মাঝে আছে শিল্পবোধ ও শিল্পানুভূতির উপকরণ। এই কলাবিদ্যাই মানুষকে করে পূর্ণ, তাহার চরিত্রকে করে সমুন্নত ও সমুজ্জ্বল। যে মানুষ তাহার সমগ্র জীবনানুশীলনের মধ্যে বা তাহার সকল প্রয়াসের মধ্যে শিল্পচর্চার আনন্দ উপভোগ করিতে না পারে, তাহার জীবন বৃথা ও ব্যর্থ। বলিতে কি, এহেন শিল্পবোধবর্জিত জীবন পশুত্বেরই নামান্তর। তাই শিল্পচর্চা এমনই একটি জিনিস যে, ইহা এক দিকে যেমন উচ্চনীচনির্বিশেষে সর্বজনভোগ্য, অপর দিকে তেমনি ইহার অভাব মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি এবং পূর্তির পথে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়ও বটে।

[ তেরো ] যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অন্তরের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবনের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ; সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন দেয়, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে। **ক. বি. বি. এ. '৫০, '৫২**

সেই নিরাকার অরূপ-সুন্দর অনন্তকে অনুভব করা যায় কেবলমাত্র প্রেমেরই দর্শনে। নিসর্গজগতে প্রসারিত অন্তহীন সৌন্দর্যের মধ্যে ঘটিয়াছে সেই অরূপ-সুন্দরেরই রূপময় অভিব্যক্তি। যিনি প্রকৃতি-প্রেমিক, তিনি সেই প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরকে অনুভব করিতে সক্ষম। আবার যিনি মানব-প্রেমিক, তিনিও এই মনুষ্য-

জগতের নরনারীগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বিভিন্ন সম্পর্কের অন্তরালে সেই অসীম প্রেম-স্বরূপেরই আবির্ভাব অনুভব করিতে সমর্থ। মানবপ্রেমের সীমায় সেই অসীমকে, সেই প্রেমময়কে উপলব্ধি করাই তো বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা। সন্তানের প্রতি মাতৃহৃদয়ের অজস্র স্নেহধারা-সিঞ্চনে উদ্ভূত যে বাৎসল্যভাব, প্রভুর জন্য দাসের আত্মোৎসর্গে সৃষ্ট যে দাস্যভাব, বন্ধুর জন্য বন্ধুর স্বার্থবলিদানে বিকশিত যে সখ্যভাব, নরনারীর অকৃত্রিম আত্মসমর্পণে পরিস্ফূর্ত যে মধুর ভাব—এ সমস্তই তো প্রেমভাব। এই প্রেমানুভূতিই ঈশ্বরানুভূতির সোপান।

[ **চোদ্দ** ] ধরণীর শ্যাম করপুটখানি ভরি' দিব আমি সেই গীত আনি'
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী অর্থভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি' নব মায়া এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া
ক'রে দিয়ে যাব বসন্তকায়া বাসন্তীবাস পরা
ধরণীর তলে, গগনের গায়, সাগরের জলে, অরণ্যছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায় রঙিন করিয়া দিব।
সংসার-মাঝে কয়েকটি সুর রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দুয়েকটি কাঁটা করিয়া দিব দূর, তারপর ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ 'পরে শিশিরের মত রবে।
না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে.
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে, মাগিছে তেমনি সুর।
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা
বিদায়ের আগে দু'চারিটি কথা রেখে যাব সুমধুর। **ক. বি. বি. এ. '৫০, '৫২**

এই নিখিল বিশ্বের অন্তর্গত নিসর্গপ্রকৃতি ও মনুষ্যপ্রকৃতি হইতে সৌন্দর্য-সুষমা তিলে তিলে আহরণ করিয়া ছন্দে-গানে, ভাবে-ভাষায় অনন্তলোক-বিরচনই তো কবির কর্ম। নবীন আষাঢ়ের মায়া-কুহেলিকা, ভূতল ও নভোমণ্ডলের সৌন্দর্য, সাগর ও বনানীর মাধুর্য—রূপ-রস-শব্দ-গন্ধে-ভরা এই যে বিচিত্রসুন্দর ধরণী, ইহা মনুষ্যমনে সঞ্চারিত করে বিস্ময়রস, জাগায় সীমাহীন ভাবাবেশ। ইহারই গাতি-ছন্দস্পন্দিত বাণীমূর্তি ফুটিয়া উঠে কবির কাব্য-কবিতায়। কিন্তু কেবলমাত্র নিসর্গ-প্রকৃতির কথা লইয়াই নয়, মনুষ্যপ্রকৃতির কথা লইয়াও কবি মুখর। রূঢ় বাস্তবতার আঘাতে জর্জরিত এই যে মনুষ্যজীবন, ইহাও কবির [illegible] রহস্যমধুর মোহমদির সুরঝংকারে যায় ভরিয়া। কবিই আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া মানুষের হর্ষবিষাদকে এমন সমুজ্জ্বল, মানুষের আনন্দবেদনাকে এমন সৌন্দর্যময় করিয়া তোলেন

যে, মানবসংসার স্নেহামৃতধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া যেন আরও আপনার হইয়া উঠে। প্রেয়সী নারীর অন্তরে প্রেমের উদ্বোধন, শিশুর সদাহাস্যময় বদনমণ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া স্নেহের পরিপ্রকাশ—এসবই তো কাব্য-কবিতার সামগ্রী। এক দিকে নিসর্গপ্রকৃতি এবং অন্য দিকে মনুষ্যপ্রকৃতি—ইহাদের সাহচর্যে আসিয়া সাধারণ মানুষের অন্তরের গভীর তীব্র ভাবানুভূতি অনুভূত হয় সত্য, কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করিবার ভাষা সাধারণ মানুষের নাই। সেই নিগূঢ় অব্যক্ত প্রকাশ-বিহ্বল ভাবানুভূতিকে বাণীভঙ্গির মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া, অনির্বচনীয়কে বচন-মহিমায় বিমণ্ডিত করিয়া যে কবি-ভাষা স্ফূর্ত হয় তাহারই গুণে এই নিখিল বিশ্বপ্রকৃতি এক মধুর অর্থময়তায় উঠে ভরিয়

## অনুশীলনী

**[ এক ]** নব্য বাঙ্গালীর অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে অনুকরণানুরাগ সর্ববাদিসম্মত। অনুকরণমাত্র কি দূষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানুসরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কার্যসকল দেখিয়া কার্য করিতে শিখে, অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সংগত এবং যুক্তিসিদ্ধ। যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা সর্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল? তাহাও রোমক ও ইউনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। যে পরিমাণে বাঙ্গালী ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরাবৃত্তজ্ঞ জানেন, ইউরোপীয়েরা প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে য়ুনানীয়ের—বিশেষতঃ রোমকের অনুকরণ করেন নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন এ উচ্চ সোপানে দাঁড়াইয়াছেন। শৈশবে পরের হাত ধরিয়া যে জলে নামিতে না শিখিয়াছে সে কখনই সাঁতার দিতে শিখে নাই। কেন না ইহজন্মে তাহার জলে নামাই হইত না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই। বাঙ্গালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে ইহাই বাঙ্গালীর ভরসা। ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, বাঙ্গালী যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য এবং তাহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটিই মহাদুঃখ। এইজন্যই আমরা বাঙ্গালীর অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে গালি পাড়ি। **ক. বি. মাধ্যমিক ( কলা ) '৫৯**

**[ দুই ]** এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন জানি না কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা

যে সব কবিতা ভালবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতঃই যে সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি, তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা-আপনি সেই সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তিলাভ করিল। একটা শ্লেট লইয়া কবিতা লিখিলাম। সেটাও বোধ হয় একটা মুক্তির লক্ষণ। তাহার আগে কোমর বাঁধিয়া যখন খাতায় কবিতা লিখিতাম তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই রীতিমত কাব্য লিখিবার একটা পণ ছিল।···কিন্তু শ্লেটে যাহা লিখিতাম তাহা লিখিবার খেয়ালেই লেখা। শ্লেট জিনিসটা বলে, ভয় কি তোমার, যাহা খুশি তাহাই লেখ না, হাত বুলাইলেই তো মুছিয়া যাইবে। কিন্তু এমনি করিয়া দুটো একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল—বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই। এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম।···স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার করিবার সময় নিয়মকে ভাঙ্গে, তাহার পর নিয়মকে আপন হাতে সে গড়িয়া তুলে। তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন হয়। **ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৯**

[ **তিন** ]

পথের প্রান্তে
আমার তীর্থ নয়,
পথের দু'ধারে
আছে মোর দেবালয়। **ক. বি মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৯**

[ **চার** ]

তপন-উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়,
তবু প্রভাতের চাঁদ শান্ত মুখে কয়,
'প্রতীক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধু তীরে,
প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে'॥ ক. বি. **মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৯**

[ **পাঁচ** ] তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালি ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীতবর্ষার কেহ নও। রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নশীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়—কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চস্‌মার হাট লাগিয়া যায়—কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজি, মেঠো ইংরেজি, চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজিতে নশীবাবুর বৈঠকখানা পারাবতকাকলিসংকুল গৃহসৌধবৎ বিকূজিত হইয়া

উঠে। যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ব উপস্থিত হয় তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া, তাঁহার ঘরবাড়ি আঁধার করিয়া তোলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নশীবাবু বাগানে যান, তখন মানুষ-কোকিল, তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নশীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও "অসুখ", এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও বড় সুখ—একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না। কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা, সেদিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে কেন?

ক. বি. মাধ্যমিক (কলা)'৫৮

[ **ছয়** ] আমাদের জাতীয় সাহিত্য আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালাতেই হইবে। কোন জাতি কেবল বিদেশী ভাষার চর্চায় কখনও বড় হইতে পারে নাই। ইউরোপ যখন লাটিন ছাড়িয়া দেশী ভাষা ধরিয়াছিল, তখন হইতেই ইউরোপের অন্ধকার যুগের অবসান হইয়া আধুনিক উজ্জ্বল যুগের আরম্ভ হইয়াছে। যেদিন ইংল্যাণ্ড নর্ম্যান-ফ্রেঞ্চ ত্যাগ করিয়া তাহার এক সময়ের ঘৃণিত সাকসন ভাষাকে বরণ করিয়া লইল, সেইদিন ইংল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনের তথা উন্নতির সূত্রপাত হইল। যখন হইতে জার্মানি ফরাসী ভাষার মোহপাশ কাটিয়া তাহার মাতৃভাষাকে পূজার স্থান দিল, তখন হইতে জার্মানির জাতীয় জীবনের উন্নতি হইল। সাহিত্যের দুই-একটি শাখা বিদেশী মাটিতে টিকিতে পারে; কিন্তু সমগ্র সাহিত্য বিদেশী আবহাওয়ায় সহজে বাঁচিবে না। রোমান যুগের পরবর্তী কালের ইউরোপের বিপুল লাটিন সাহিত্য কোথায়? আমাদের দেশেই পাঠান ও মোগল যুগের পারসীনবীশদের সে সব কেতাব কোথায়? বঙ্কিমের Rajmohan's Wife-এর কিংবা মাইকেলের The Captive Lady-র সন্ধান গ্রন্থকীট ব্যতীত এখন কে আর রাখে? সাহিত্যসাধনা যদি সম্পূর্ণরূপে সার্থক করিতে চাও, তবে তোমাকে মাতৃভাষার মধ্য দিয়া সাহিত্য রচিতে হইবে। ছাত্রগণের অনেকের বিশ্বাস, যেন বাংলা ভাষা মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে অনায়াসে বাঙ্গালীর আয়ত্ত হয়, যেন তাহার জন্য কোন সাধনার, কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। কেবল গলার স্বর থাকিলেই কি কেহ সুগায়ক হইতে পারে? না, একটা যন্ত্র হাতে থাকিলেই যে সে সুবাদক হইতে পারে? যেমন সুগায়ক সুবাদক হইতে বহু পরিশ্রম করিতে হয়, তেমনি সুলেখক হইতে গেলে এই ছাত্রজীবন হইতেই রীতিমত রচনা অভ্যাস করিতে হইবে। ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৮

[সাত] একালে যা'কে আমরা এডুকেশন বলি, তার আরম্ভ শহরে।......... শহরবাসী একদল মানুষ.........শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে, তারাই হ'ল এন্‌লাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগ্‌ল পূর্ণগ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে ব'সে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ ব'লতে বুঝলেন শিক্ষিত সমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বল পথকষ্ট বল, রোগ বল, অজ্ঞান বল, জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হ'ল সুজলা, সুফলা টানাপাখাশীতলা, সেইখানেই মাথা তুল্‌লে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে এত বড় বিচ্ছেদের ছুরি আর কোনদিন চাপানো হয়নি। ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৮

[আট] যা'রা ক্ষুদ্র কবি তারাই জবরদস্তি ক'রে নূতনত্ব আনবার চেষ্টা করে,—তাতে এই প্রমাণ হয় যে, পুরাতনের মধ্যে যে চিরনূতনত্ব আছে, সেটা তাদের অসাড় কল্পনা অনুভব করতে পারে না। তেমনি অনেক বোধশক্তিবিহীন পাঠকও আছে যারা নূতনকে কেবল তার নূতনত্বের জন্যেই পছন্দ করে। কিন্তু ভাবুক নূতনত্বের ফাঁকিকে প্রবঞ্চনা বলে ঘৃণা করে। তা'রা এ জানে, যতক্ষণ আমরা অনুভব করি, ততক্ষণ কিছুই পুরোনো হতে পারে না। কিন্তু যা অনুভব করিনে, জ্ঞানে জানি মাত্র, তা মানুষের প্রেম হোক্‌, দেশের প্রেম হোক্‌, বা ধর্মই হোক্‌,—তাকে অনুভূতির অমৃতে কোনমতে বাঁচিয়ে তোলবার জন্যে আমরা যথাসাধ্য বাড়াবাড়ি করি—খুব প্রবল কিংবা খুব একটা নূতন কথা বলবার চেষ্টা করি, কিন্তু যথার্থ নূতন কথা এবং যথার্থ প্রবল কথা মুখ দিয়ে বেরতে চায় না। ক. বি. মাধ্যমিক বিকল্প '৫৮

[নয়] ভূগর্ভের নিম্নস্তরে যেমন বহিরুপদ্রব হইতে নিরালায় বহু পূর্বতন যুগের কঙ্কালাবশেষ পাষাণ হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মবিপ্লব সেইরূপ বহিঃশত্রুর নিরন্তর আক্রমণ হইতে দূরে উড়িষ্যার উপকূলে পাষাণখোদিত হইয়া কথঞ্চিৎ রহিয়া গিয়াছে। সিন্ধুপার হইতে মুসলমান আক্রমণের বন্যা এত দূরপ্রান্ত অবধি আসিয়া পঁহুছিত না, এবং কাঠজুড়ি ও মহানদীর তীর হইতে মুসলমান সেনাকে দুই চারি বার এমন বিফলমনোরথ হইয়াও ফিরিতে হইয়াছে। অবশেষে উড়িষ্যা যদিও মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, তথাপি এই নদী-পাহাড়-বন-জঙ্গল-সমাকীর্ণ ভূখণ্ডের সর্বত্র তাহার স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মন্দিরে মন্দিরে দেবতাগণ মধ্যে মধ্যে লাঞ্ছিত হইয়াছেন এবং প্রাচীন কীর্তিও দু'একটা বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত দেবমন্দিরের পাষাণে মসজিদের প্রাচীর নির্মাণ করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। সেই জন্যই উড়িষ্যা এখনও মন্দিরের দেশ। রাজধর্ম যখন যাহা প্রবল হইয়াছে আপনার উন্নত

মহিমা প্রচার করিতে অভ্রভেদী পাষাণ-শির উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে, এবং এইরূপে ভারতবর্ষের বিলুপ্তপ্রায় ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন দেবতার চরণতলে উৎসৃষ্ট হইয়া পুরাতন দিনের জীবন-গৌরব রক্ষা করিতেছে। **ক. বি. মাধ্যমিক (কলা) '৫৭**

[ **দশ** ] য়ুরোপে যে-সকল দেশ অতীতের আঁচল-ধরা, তাঁরা মানসিক আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রিক সকল ব্যাপারেই অন্য দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। স্পেন দেশের ঐশ্বর্য ও প্রতাপ এক সময় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল, কিন্তু আজ কেন সে অন্য য়ুরোপীয় দেশের তুলনায় সেই পূর্বগৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে, স্পেনের চিত্ত ধর্মে-কর্মে প্রাচীন বিশ্বাস ও আচারপদ্ধতিতে অবরুদ্ধ, তাই তার চিত্তসম্পদের উন্মেষ হয়নি। যারা এমনিভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞা করে, বর্তমানকে প্রহসনের বিষয় বলে, সকল পরিবর্তনকে হাস্যকর দুঃখকর লজ্জাকর ব'লে মনে করে, তারা জীবন্মৃত জাতি। তাই ব'লে অতীতকে অবজ্ঞা করাও কোনো জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়, কারণ অতীতের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু মানুষকে জান্‌তে হবে যে, অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবী কালের পথেই তাকে অগ্রসর করার জন্যে। আমাদের চলার সময়ে যে পা পিছিয়ে থাকে সেও সামনের পা-কে এগিয়ে দিতে চায়। সে যদি সামনের পা-কে পিছনে টেনে রাখ্‌ত তা'হলে তার চেয়ে খোঁড়া পা শ্রেয় হত। তাই সকল দেশের মহাপুরুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মিলনসেতু নির্মাণ করে দিয়ে মানুষের চলার পথকে সহজ করে দিয়েছেন। **ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৭**

[ **এগারো** ] মৃত্যুর তুলায় যে-সব জাতির তৌল হইয়া গিয়াছে, তাহারা পাস মার্কা পাইয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে, নিজের কাছে ও পরের কাছে তাহাদের আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। মৃত্যুর দ্বারাই তাহাদের জীবন পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে; যাহার প্রাণ আছে, তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয়, সে-ই মরিতে কৃপণতা করে। **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৭**

[ **বারো** ] নকল করার মধ্যে কোনও গৌরব বা মনুষ্যত্ব নেই। মানসিক শক্তির অভাববশতঃই মানুষে যখন কোনও জিনিস রূপান্তরিত ক'রে নিজের জীবনের উপযোগী ক'রে নিতে পারে না, অথচ লোভবশতঃ লাভ করতে চায়, তখন তার নকল করে। নকলে বাইরের পদার্থ বাইরেই থাকে, আমাদের অন্তর্ভূত হয় না, তার দ্বারা আমাদের মনের এবং চরিত্রের কান্তি পুষ্ট হয় না, ফলে মানসিক শক্তির যথেষ্ট চর্চার অভাববশতঃ দিন দিন সে শক্তি হ্রাস হ'তে থাকে। **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৭**

[ **তেরো** ] আমি চলে গেলে ফেলে রেখে যাব পিছু,
চিরকাল মনে রাখিবে, এমন কিছু,
মূঢ়তা করা তা নিয়ে মিথ্যে ভেবে।

ধুলোর খাজনা শোধ করে নেবে ধুলো
চুকে গিয়ে তবু বাকি র'বে যতগুলো
গরজ যাদের তারাই তা খুঁজে নেবে।
আমি শুধু ভাবি, নিজেরে কেমনে ক্ষমি,
পুঞ্জ পুঞ্জ বকুনি উঠেছে জমি,'
কোন্ সৎকারে করি তার সদ্গতি।
করিব গর্ব নেই মোর হেন নয়,
করিব লজ্জা পাশাপাশি তারি রয়,
ভারতীর আছে এই দয়া মোর প্রতি।
লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে
সময় রাখিনি ওজন দেখিতে মেপে,
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী,
এ অপরাধের জন্যে যে জন দায়ী
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে।

**ক. বি. মাধ্যমিক ( কলা ) '৫৬**

**[ চোদ্দ ]** সেই কথা স্মরি বার বার আজ
লাগে ধিক্কার প্রাণে,
অজানা জনের পরম মূল্য
নাই কি গো কোনোখানে।
এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে
কোথা হতে খুঁজে আনি
ছুরির আঘাত যেমন সহজ
তেমন সহজ বাণী।
কারো কবিত্ব কারো বীরত্ব
কারো অর্থের খ্যাতি,
কেহ-বা প্রজার সুহৃদ্ সহায়
কেহ-বা রাজার জ্ঞাতি,
তুমি আপনার বন্ধুজনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া
ফুরাতে ফুরাতে র'বে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া। **ক. বি. মাধ্যমিক(বিজ্ঞান) '৫৬**

**[ পনেরো ]** দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের বিরোধ ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিরোধ প্রয়োজন; এইরূপ প্রতিরোধের অভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে শান্তি ও সুশাসন দুর্লভ ছিল। এই প্রতিরোধকে কার্যকর করিতে গেলে, ধীরভাবে সংযতভাবে চালাইতে গেলে, স্থায়ী করিতে গেলে, প্রতিরোধ যাহারা করিবে তাহাদের দলবদ্ধ হওয়া চাই। দল না

াকিলে, বহু সুচিন্তিত বিধান লিপিবদ্ধ হইতে পারিত না, সদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি বৈষম্যপূর্ণ থাকিয়া যাইত, অতি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও সম্ভব হইত না, স্বাধীন রাজ্যের নীতির কোনও স্বাধীনতা থাকিত না। সমাজ চপলমতির ক্রীড়নক হইয়া দাঁড়াইত। বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নির্ভর করে ইচ্ছামত কর্ম করিবার শক্তির উপর; সে শক্তি অর্জন করিতে হইলে জনগণের মধ্যে সমবায়ের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে থাকা চাই, নতুবা ভ্রান্ত, উন্মত্ত, অত্যাচারী যখন স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করিতে থাকিবে, তখন বিরোধী দলের সৃষ্টি না হইলে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে কে?

ক. বি. মাধ্যমিক (কলা) '৫৫

[ষোলো] [শরৎঋতুর বর্ণনা]

আমার কবির চিত্ত দেখেছে তোমার সত্য ছবি;—
তোমার হৃদয়ে সখা, নাই দৈন্য, নাই কোন ব্যথা,
লভিয়াছে আপনাতে আপনার পূর্ণ সার্থকতা,
হে শরৎ, হে কিশোর কবি!
মনের মাধুরী তব স্নিগ্ধতর করেছে জোছনা,
স্বর্ণাভ করেছে রৌদ্র দীপ্ত তব গোপন বাসনা,
মরমের গভীরতা একান্ত যা তোমারি আপনা,—
সে-ই তো করেছে এই নীল নভ সুনীল গভীর;
প্রাণের তারুণ্য তব শ্যামতর করেছে রচনা
শ্যামাঞ্চল এই পৃথিবীর।

ক. বি. মাধ্যমিক (কলা) '৫৫

[সতেরো]

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনে ঘেরা সহস্র কুটিরে,
দোহন-মুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণ ঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে।
শরৎ-মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে
হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোতকূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছ মাতঃ, প্রফুল্ল অধরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা; স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়
ধৈর্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দিকময়
ক্ষমাপূর্ণ আশীর্বাদ করে বিকিরণ।
হেরি সে মঙ্গলচ্ছবি মৌন অবিচল,
নতশির কবিচক্ষে ভরি আসে জল।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৫

[ **আঠারো** ] আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের ওপরে নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে; মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে, যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই, এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়। যাঁরা বলেন শ্রমিকরাজ বা গণরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁরাও বোধ হয় একটু ভুল করেন, কারণ 'রাজ' কথাটাই তো উর্ধ্বলোকের কথা। প্রকৃত সাম্যবাদের ভিত্তি যথার্থ সমানাধিকারের ওপরে গড়ে ওঠাই কাম্য। এ অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই এবং দ্রুত গতিতেই আসা খুবই বাঞ্ছনীয়। প্রতিশোধ-স্পৃহার মধ্য দিয়ে নয়, সর্ব মানবের যথার্থ কল্যাণ কামনার ভেতর দিয়েই যেন আমরা সমাজের একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নূতন রূপকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। **ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৫**

[ **উনিশ** ]

ধুলোট হয়ে গেছে, ভাঙ্গিয়া গেছে মেলা,
পাতের ঠোঙা লয়ে, কাকেরা করে খেলা।
ভাসান হয়ে গেছে, বিজন পূজাবাড়ি,
জাগিছে উৎসব-স্মৃতিটি বুকে তারি।
ফুরায়ে গেল ধীরে বিবাহ-উৎসব,
নীরব নহবৎ নীরব হুলুরব।
যেতেছে পায়ে পায়ে মুছিয়া আলিপনা,
বিদায় লোকজন, বিরল আনাগোনা।
এই তো শেষ, ওগো, এই তো সমাপন,
হৃদয় খালি ক'রে কাঁদায় প্রাণমন!
সহে না প্রাণে ওগো, আসিয়া চলে-যাওয়া,
পাওয়ার চেয়ে ভাল ছিল যে পথ-চাওয়া।
এ যেন প্রভাতের মলিন রাকা-শশী,
সুখের চেয়ে এতে দুখ যে মাখা বেশী!

**ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫**

[ **কুড়ি** ]

পরম আত্মীয় ব'লে যারে মনে মানি
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি।
অসীম কালের মাঝে তিলেক মিলনে
পরশে জীবন তার আমার জীবনে
যতটুকু লেশমাত্র চিনি দুজনায়
তাহার অনন্ত গুণ চিনি নাকো হায়।
দুজনের একজন একদিন যবে
বারেক ফিরাবে মুখ, এ নিখিল ভবে
আর কভু ফিরিবে না মুখামুখি পথে,
কে কার পাইবে সাড়া অনন্ত জগতে।

এ ক্ষণমিলনে তবে, ওগো মনোহর,
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর।
মুহূর্ত-আলোকে কেন হে অন্তরতম,
তোমারে চিনিনু চিরপরিচিত মম॥ **ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫৫**

[ **একুশ** ] একটা বরফের পিণ্ড ও ঝরণার মাঝে তফাৎ কোন্‌খানে। না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এই জন্য বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায়, তার ক্ষয় হতে থাকে—এই জন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু ঝরণার যে গতি সে তার নিজের গতি ;—সেই জন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এই জন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মনেও যখন রসের অবির্ভাব না থাকে, তখনই সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা-তৃষা ভয়-ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনই তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার-বিচার, যত শাস্ত্র-শাসন। তখনই মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ।

**ক. বি. মাধ্যমিক '৫৪**

[ **বাইশ** ]

শক্তি-দম্ভ স্বার্থ-লোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।
দেহ হতে দেহান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার।
যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে।
বস্তুভারহীন মন সর্ব জলেস্থলে
পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে। আজি তাহা নাশি
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর। **ক. বি. মাধ্যমিক '৫৪**

[ **তেইশ** ] শত সহস্র বৎসরের মহারণ্য অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে, যুগ-যুগান্তরের প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষাররত্নমুকুট সহজেই অম্লান হয়ে বিরাজ করে, কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখ্‌তে দেখ্‌তে জীর্ণ হয়ে যায় এবং তার লজ্জিত ভগ্নাবশেষ একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলতে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও মানুষের সেই রাজপ্রাসাদের মত। চারিদিকের জগৎ নূতন থাকে আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার কারণ, বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তুলেছে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে চারিদিকে বিরাট্‌ প্রকৃতি থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেই ক্রমশঃ বিকৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। এমনি করে মানুষই এক চিরনবীন বিশ্বজগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন—সে আপনাকে আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে উঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে তার বহুকালের আবর্জনা সঞ্চিত থাকে—অবশেষে সেই স্তূপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে চারিদিকে সমস্তই সহজ, কেবল সেই মানুষই সহজ নয়। **ক.বি. মাধ্যমিক '৫৩**

[ **চব্বিশ** ] আজকের দিনে ইউরোপের কোনো ভাষাই অপর কোনো ভাষার আওতায় পড়ে নেই, সে-ভূভাগে এখন সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান ; অথচ সে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই জাতি-স্বাতন্ত্র্যের যুগেও স্বদেশি ভাষা ব্যতীত আরও অন্ততঃ তিনটি বিদেশি ভাষা সাগ্রহে এবং সানন্দে শিক্ষা করেন। এর কারণ কি ? এর কারণ, সভ্য জগতের এ জ্ঞান জন্মেছে যে, মানুষের মনোজগৎ কেউ আর এক-হাতে গড়েনি, এর ভিতর নানা যুগের নানা দেশের হাত আছে। সে কারণ, বিদেশি ভাষা ও বিদেশি সাহিত্যের চর্চা ছেড়ে দিলে মানুষকে মনোরাজ্যে একঘরে এবং কুণো হয়ে পড়তে হয়। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চর্চায় মানুষের মন জাতীয় ভাবের গণ্ডির মধ্যেই থেকে যায়, এবং এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই যে, মনোরাজ্যে কূপমণ্ডূক হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, সে কূপের পরিসর যতই প্রশস্ত ও তার গভীরতা যতই অগাধ হোক্‌ না কেন। এবং একথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, যে জাতি মনে যতই বড় হোক্‌ না কেন, তার মনের একটা বিশেষ রকম সংকীর্ণতা আছে, এবং তার মনের ঘরের দেয়াল ভাঙবার জন্য বিদেশি মনের ধাক্কা চাই। বিদেশির প্রতি অবজ্ঞা বিদেশি মনের অজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করে এবং এই সূত্রে জাতির প্রতি জাতির দ্বেষ-হিংসাও প্রশ্রয় পায়। সুতরাং বিদেশি সাহিত্যের চর্চায়, শুধু আমাদের মন নয়, হৃদয়ও উদারতা লাভ করে ; আমরা শুধু মানসিক নয়, নৈতিক উন্নতিও লাভ করি।

**ক. বি. মাধ্যমিক '৫৩ ; গৌ. বি. বি. এ. '৫৮**

[ পঁচিশ ] গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশে জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা বাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা যে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে ॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ॥ **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫২**

[ ছাব্বিশ ] বনের পাখি বলে, "আকাশ ঘননীল
কোথাও বাধা নাহি তার।"
খাঁচার পাখি বলে, "খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার।"
বনের পাখি বলে, "আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।"
খাঁচার পাখি বলে, "নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে।"
বনের পাখী বলে, "না;
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই।"
খাঁচার পাখি বলে, "হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই।" **ক. বি.. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫২**

[ সাতাশ ] মনে হয় শেষ করি—কিন্তু কোথায়?
বলিবার যাহা ছিল সব র'য়ে যায়!
এ বাদলে কোনো কথা জমে নাকো ভালো
এ বাতাসে আর্দ্র বক্ষে নাহি জ্বলে আলো।
নিবিড় তিমির ভরে ঘনায় যে ব্যথা
মন-অন্তস্তলে, ভাষা তার নাহি কোথা
পাই খুঁজে খুঁজে। মেঘমন্দ্রে, বৃষ্টিধারে,
তড়িত-চকিতে, সূচীভেদ্য অন্ধকারে,
ঘননীল মেঘে, নিবিড় তামল-বনে,
আর্দ্র-বসুধা সৌরভে, বিরহ-গহনে,
কোন্ ব্যর্থ অভিসারে, কখন কোথায়
ফুটে ফুটে করি' যেন মিলাইয়া যায়।

মিছে আশে দিশে দিশে ঘুরিছে হৃদয়
বলিতে আসিয়া আর বলা নাহি হয়। ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫১

[ আটাশ ] বক্ষে তব বক্ষ দিয়ে শুয়ে আছি আমি,
হে ধরিত্রি, জীবধাত্রি! নিত্য দিনযামী
মাতৃহৃদয়ের মোর ব্যাকুল স্পন্দন
প্রবাসী সন্তান লাগি', নিয়ত ক্রন্দন
তারি লুপ্তস্পর্শ তরে, করি' দাও লয়
বিপুল বক্ষের তব মহাশব্দময়
অনন্ত স্পন্দন-মাঝে; শিখাও আমায়
সে পুণ্য-রহস্য-মন্ত্র—যার মহিমায়
প্রত্যেক নিমেষে সহি' বিয়োগ-বেদন
লক্ষ কোটি সন্তানের, প্রশান্তবদন :
তবু ফুটাতেছে ফুল জ্বালিছ আলোক
উজলিয়া রাত্রিদিন দ্যুলোক, ভূলোক ! ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫১

[ উনত্রিশ ] মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে? ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫২

[ ত্রিশ ] সাহিত্য আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের, রূপকের, ছন্দের, আভাস-ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। অরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাটিকে রক্ষা করিতে । নারীর যেমন শ্রী ও হ্রী, সাহিত্যের অনির্বচনীয়তাটিও সেইরূপ। তাহা অনুকরণের অতীত, তাহা অলংকারকে অতিক্রম করিয়া উঠে—তাহা অলংকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রচলিত ভাষার দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে—চিত্র ও সংগীত। চিত্র ভাবকে আকার দেয়, এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ, এবং সংগীত প্রাণ। সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র।
ক. বি. মাধ্যমিক ( বিকল্প ) '৫১

[ একত্রিশ ] বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়!
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারংবার

তোমার অমৃত ঢালি' দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি' যোগাসন, সে নহে আমার ;
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া। **ক. বি. বি. এ. '৫১**

[ **বত্রিশ** ] মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলের এক একটি বহ্নি আছে। সকলেই মনে করে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে ;—কেহ মরে, কেহ কাঁচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাঁচময়। কাঁচ না থাকিলে সংসার এতদিনে পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম মানসপ্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাঁচিত ? অনেকে জ্ঞানবহ্নির আবরণ-কাঁচে ঠেকিয়া রক্ষা পায় ; সক্রেতিস্, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপবহ্নি, ধর্মবহ্নি, মানবহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে, আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মানবহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন ;—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল ! জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত প্যারাডাইস লষ্ট্। ধর্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি, সেণ্ট্ পল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ এণ্টনি ক্লিওপেত্রা। রূপ-বহ্নির রোমিও-জুলিয়েত, ঈর্ষা-বহ্নির ওথেলো। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতা-পতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কি, আমরা জানি না। তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি ? **ক. বি. বি. এ. '৫১**

[ **তেত্রিশ** ] বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতি-রাজবাড়ির নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা। কিন্তু খোলা থাকিলে কি হইবে ? এক-এক ঋতুতে এক-এক মহল হইতে যখন উৎসবের নিমন্ত্রণ আসে, তখন মানুষ যদি গ্রাহ্য না করিয়া আপন আড়তের গদিতে পড়িয়া থাকে, তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল ? পুরা মানুষ হইতে হইলে তাহাকে সবই হইতে হইবে, এ-কথা না মনে করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বকে বিশ্ববিদ্রোহের একটা সংকীর্ণ ধ্বজাস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে কেন ? কেন সে দম্ভ করিয়া বার বার একথা বলিতেছে, আমি জড় নহি, উদ্ভিদ্ নহি, পশু নহি,

আমি মানুষ—আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্রোহ করি। কেন সে এ-কথা বলে না, আমি সমস্তই, সকলের সঙ্গেই আমার অবারিত যোগ আছে—স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা আমার নহে।

হায় রে সমাজ-দাঁড়ের পাখি! আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোখ দু'টির মত স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মত নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মত চঞ্চল—তবু তোর পাখাদুটো আজ বন্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া বাজিতেছে—এই কি মানবজন্ম! **ক. বি. বি. এ. '৫৩**

[ **চৌত্রিশ** ] বুনিয়াদি শিক্ষা-ব্যাপারে হাতের কাজ মাধ্যমমাত্র, শিশুশ্রমনিয়োগের ছদ্ম উপায়মাত্র নয়, এই সত্যের উপর জোর দিবার ইচ্ছায়, এবং প্রয়োজনের বিশেষ তাগিদে, পুরাতন পদ্ধতির পুস্তকসর্বস্ব শিক্ষকদের কোন প্রকারে অসম্পূর্ণভাবে হস্তশিল্প শিখাইয়া, তাঁহাদের দ্বারা বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করা হয়। তাঁহারা যাহাতে হস্তশিল্পের শিক্ষকের কাজ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের জন্য অল্প সময়ে একটা অসম্পূর্ণ শিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। হস্তশিল্পের জন্য এই উপায়ে তৈয়ারি করা শিক্ষকদের উপর আমার কোন আস্থা নাই। আমার ধারণা ইহাতে অর্থের অপব্যয় হইয়াছে এবং ইহাতে ওয়ার্ধা-পদ্ধতিকেই অশেষরূপে নিন্দনীয় করিয়া তোলা হইয়াছে। যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন প্রতারক নিজের শিক্ষাকে কাগজে-কলমে যোগ্যতা অর্জনের উপায় বলিয়া মনে করে, তাহার চেয়ে যে অক্ষরজ্ঞানহীন হস্তশিল্পী শিল্পকাজ করিয়া সংসার চালায় ও শিল্পকাজের আদ্যন্ত সব জানে, তাহার নিকট হইতে নীরবে অনেক কিছু শেখা যায়, এই আমার দৃঢ় ধারণা। **গৌ. বি. বি. এ. '৫৫**

[ **পঁয়ত্রিশ** ] জীবন বৃথা গেল। যাইতে দাও। কারণ, যাওয়া চাই। যাওয়াটাই একটা সার্থকতা। নদী চলিতেছে—তাহার সকল জলই আমাদের স্নানে এবং পানে এবং আমন-ধানের ক্ষেতে ব্যবহার হইয়া যায় না। তাহার অধিকাংশ জলই কেবল প্রবাহ রাখিতেছে। আর কোনো কাজ না করিয়া কেবল প্রবাহরক্ষা করিবার একটা বৃহৎ সার্থকতা আছে। তাহার যে জল আমরা খাল কাটিয়া পুকুরে আনি তাহাতে স্নান করা চলে, কিন্তু তাহা পান করে না; তাহার যে জল ঘটে করিয়া আনিয়া আমরা জালায় ভরিয়া রাখি তাহা পান করা চলে, কিন্তু তাহার উপরে আলোছায়ার উৎসব হয় না। উপকারকেই একমাত্র সাফল্য বলিয়া জ্ঞান করা কৃপণতার কথা, উদ্দেশ্যকেই একমাত্র পরিণাম বলিয়া গণ্য করা দীনতার পরিচয়। **গৌ. বি. বি. এ. '৫৬**

[ **ছত্রিশ** ] জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য-সংসারের মহানিকেতনে,
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে
ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে

অর্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মত।
তবু তো প্রভাতে শির করিয়া উন্নত
যখনি নয়ন মেলি' নিরখিনু ধরা
কনক-কিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা,
নিরখিনু সুখে-দুঃখে খচিত সংসার,
তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমিষেই মনে হল, মাতৃবক্ষসম
নিতান্তই পরিচিত একান্তই মম।
রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরেছে আমার কাছে জননী-মূরতি। **ক. বি. বি. এ. ৫৩, (অনার্স) '৫৯**

**সাইত্রিশ ]** হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারং বার
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মূরতি!
ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি,
দুর্গম দুঃসহ মৌন; জটাপুঞ্জ তুষার সংঘাত
নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরশ্মিপাত
পূজাস্বর্ণপদ্মদল! কঠিন প্রস্তর কলেবর
মহান-দরিদ্র, রিক্ত, আভরণহীন দিগম্বর।
হের তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে একি লীলা করেছে বেষ্টন—
মৌনেরে ঘিরিছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
সফেন চঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনের ঐ চুমে
কোমল শ্যামল শোভা নিত্যনব পল্লবে কুসুমে
ছায়ারৌদ্রে মেঘের খেলায়। গিরিশিরে রয়েছেন ঘিরি
পার্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি। **ক. বি. বি. এ. (অনার্স) '৫৯**

**আটত্রিশ ]** হায় দেহ। নাই তুমি ছাড়া কেহ—জানি তাহা প্রাণে-প্রাণে,
মূরতি-পাগল মনের মমতা তাই ধায় তোমাপানে।
তোমারি সীমায় চেতনের শেষ,
তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ,
দুঃখ-সুখের মহাপরিবেশ!—
দেহলীলা অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি দর্শনে-বিজ্ঞানে।
তোমারেই চিনি, হে দেহ-দেবতা।—
প্রলয়ের একাকার
তুমিই রুধিছ বহুবিধ রূপে
তোমারে নমস্কার!

দেহে-দেহে তুমি, এত অভিনব!
দেহের বাহিরে কোথা বাস তব?
হাসি-ক্রন্দন—তব উৎসব!
পিরীতির পারাবার।
অধরে, উরসে, চরণ-সরোজে
আরতি যে অনিবার! ক. বি. বি. এ. (অনার্স) '৫৮

[ঊনচল্লিশ] এ মাটির ঢেলা কবে কে ছুঁড়িল সূর্যের পানে ভাই
পৃথিবী যাহার নাম।
লক্ষ্যভ্রষ্ট চিরদিন সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফেরে
সূর্যেরে অবিরাম।
তারি সন্ততি আমাদেরও ভাই ব্যর্থ যে সন্ধান,
লক্ষ্য গিয়াছি ভুলি।
মোদের সকল স্বপনের গায় জানি না কেমন করি'
লেগেছে মলিন ধূলি।
মাটি ও পাথর কাটি' আর কুঁদি দেবতা গড়িনু ঢের,
মাগিলাম কল্যাণ।
বেদীমূলে তার তবু শোণিতের দাগ লেগে থাকে ভাই,
দেবতার অপমান!
লক্ষ্যভ্রষ্ট পৃথিবীর ভাই সে আদিম অভিশাপ
বহি মোরা চিরদিন;
আকাশের আলো যত করি জয়, মিটিবে না কভু ভাই
আদি পঙ্কের ঋণ! ক. বি. বি. এ. (অনার্স) '৫৮

[চল্লিশ] সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক আদর্শের ভালোমন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থাভেদে। কখনো কখনো ক্লান্ত হয় তার শুভবুদ্ধি, যে বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজয়ের শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয়, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার রুচি বিকৃত হতে থাকে, শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে, রোগজর্জর স্বভাবের বিষাক্ত প্রভাব হয়ে ওঠে সাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামকতা বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে দূরে দূরে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ্ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য। শুক্তির মধ্যে মুক্তো দেখা দেয় ব্যাধিরূপে। শীতের দেশে শরৎকালের বনভূমিতে যখন মৃত্যুর হাওয়া লাগে তখন পাতায় পাতায় রঙিনতার বিকাশ বিচিত্র হয়ে ওঠে, সে তাদের বিনাশের উপক্রমণিকা। সেই রকম কোনো জাতির চরিত্রকে যখন আত্মঘাতী রিপুর দুর্বলতায় জড়িয়ে ধরে, তখন তার সাহিত্য তার শিল্পে কখনো কখনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে। তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ করে' যে রসবিলাসীরা অহংকার করে তারা মানুষের শত্রু। কেন না, সাহিত্যকে

শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।

মানুষ যে কেবল ভোগরসের সমঝদার হয়ে আত্মশ্লাঘা করে বেড়াবে তা নয়, তাঁকে পরিপূর্ণ করে বাঁচতে হবে, অপ্রমত্ত পৌরুষে বীর্যবান হয়ে সকল প্রকার অমঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। স্বজাতির সমাধির উপরে ফুলবাগান না হয় নাই তৈরি হল। ক. বি. বি. এ. ( অনার্স ) '৫৮, '৫৬,

[ **একচল্লিশ** ] মানুষ যে দিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল সে দিন তার এক মহা দিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবা মাত্র, যে বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাঁধে। সেই তো ঠিক, কেন না জড়ই তো শূদ্র। জড়ের তো বাহিরের সত্তার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সত্তা নেই; মানুষের আছে। তাই মানুষমাত্রই দ্বিজ; চাকা অসংখ্য শূদ্রকে শূদ্রত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই চাকাই চরকায়, কুমোরের চাকে, গাড়ির তলায়, স্থূল সূক্ষ্ম নানা আকারে মানুষের প্রভূত ভার লাঘব করেছে। এই ভারলাঘবের মতো ঐশ্বর্যের উপাদান আর নেই, এ কথা মানুষ বহু যুগ পূর্বে প্রথম বুঝতে পারলে যেদিন প্রথম চাকা ঘুরল। ইতিহাসের সেই প্রথম অধ্যায়ে যখন চরকা ঘুরে মানুষের ধন-উৎপাদনের কাজে লাগল, ধন তখন থেকে চক্রবর্তী হয়ে চলতে লাগল, সেদিনকার চরকাতেই এসে থেমে রইল না। এই তথ্যটির মধ্যে কি কোনো তত্ত্ব নেই? বিষ্ণুর শক্তির যেমন একটা অংশ পদ্ম, তেমনি আর-একটা অংশ চক্র। বিষ্ণুর সেই শক্তির নাগাল মানুষ যেই পেলে অমনি সে অচলতা থেকে মুক্ত হল। এই অচলতাই হচ্ছে মূল দারিদ্র্য। সকল দৈব শক্তিই অসীম, এই জন্য চলনশীল চক্রের এখনও আমরা সীমায় এসে ঠেকিনি। এমন উপদেশ যদি মেনে বসি যে, সুতো কাটার পক্ষে আদিম কালের চরকাই শেষ তা'হলে বিষ্ণুর পূর্ণ প্রসন্নতা কখনোই পাব না, সুতরাং লক্ষ্মী বিমুখ হবেন। বিজ্ঞান মর্ত্যলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাড়াচ্ছে একথা যদি ভুলি, তা'হলে পৃথিবীতে অন্য যে সব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হবে।—রবীন্দ্রনাথ।

ক. বি. বি. এ. ( অনার্স ) '৫৭

[ **বিয়াল্লিশ** ] কার্পণ্য কুঞ্চিত করে
তিন সন্ধ্যা কাঁচ্চা পোয়া ছটাকের জপ
একদিন ভুলাও উৎসব!
দিনেকের তরে
ভারে ভারে মণে মণে মাঠের সম্পদ
বহিয়া আনহ মোর ঘরে।

অনর্জন অসঞ্চয় ঋণ
এক পাত্রে গণি'
একরাত্রি করো মোরে ধনী ;—
ঋণোজ্জ্বল পূর্ণচাঁদে পূর্ণিমা-রজনী সম।
মিথ্যা করি ভাগ্যলিপি, লঙ্ঘিয়া বিধাতা,
বারেক করহ মোরে দাতা।
ল'য়ে তুচ্ছ অকাঞ্চন কাচে,
প্রাণ যদি এতকাল বাঁচে,
কাঞ্চনে করহ আজ কাচ,
কুবেরের কনক-মন্দিরে
লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে উড়ে' লাগুক ছেঁয়াচ্
হাঘোরিয়া উড়নচণ্ডীর !

ক. বি. বি. এ. (অনার্স) '৫৭

[ তেতাল্লিশ ]

অসীমের দান

ক্ষণিকের করপুটে, তার পরিমাণ
সময়ের মাপে নহে।
কাল ব্যাপি রহে নাই রহে
তবু সে মহান্ ;
যতক্ষণ আছে তারে মূল্য দাও পণ করি প্রাণ।
ধায় যবে বিদায়ের রথ
জয়ধ্বনি করি তারে ছেড়ে দাও পথ
আপনারে ভুলি।
যতটুকু ধূলি
আছ তুমি করি অধিকার
তার মাঝে কী রহে না তুচ্ছ সে বিচার।
ছেড়ে এসো আপনার অন্ধকূপ,
মুক্তাকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দস্বরূপ।
ওরে শোকাতুর, শেষে
শোকের বুদ্বুদ্ তোর অশোক-সমুদ্রে যাবে ভেসে।

ক. বি. বি. এ. ( অনার্স ) '৫৭

[ চুয়াল্লিশ ]

দণ্ডিতের সাথে

দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার ! যার তরে প্রাণ
কোন ব্যথা নাহি পায়, তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে, সে কারে দিওনা।
যে তোমার পুত্র নহে, তারো পিতা আছে ;
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে,

বিচারক। শুনিয়াছি, বিশ্ববিধাতার
সবাই সন্তান মোরা, পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ ; ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে,
নতুবা বিচারে তাঁর নাহি অধিকার। ক. বি. বি. এ. ( অনার্স )'৫৬

[ পঁয়তাল্লিশ ] এক সময়ে মনে ছিল আধেক রাজ্য এবং রাজার কন্যে
পাবার আমার ছিল দাবি,
মনে ছিল ধনমানের রুদ্ধ ঘরের সোনার চাবি
জন্মকালে বিধি যেন দিয়েছিলেন রেখে
আমায় গোপন শক্তিমাঝে ঢেকে।
আজকে দেখি নব্যবঙ্গে
শক্তিটা মোর ঢাকাই রইল, চাবিটা তার সঙ্গে।
মনে হচ্ছে ময়নাপাখির খাঁচায়
অদৃষ্ট তার দারুণ রঙ্গে ময়ূরটাকে নাচায় ;
পদে পদে পুচ্ছে বাধে লোহার শলা,
কোন্ কৃপণের রচনা এই নাট্যকলা।
কোথায় মুক্ত অরণ্যানী কোথায় মত্ত বাদল-মেঘের ভেরী।
এ কী বাঁধন রাখ্‌ল আমায় ঘেরি। ক. বি. বি. এ. (অনার্স) '৫৬

ছেচল্লিশ ] সেই পৃথিবী, সেই পৃথিবীর আমি সাধনা করি—
যেখানে অন্নের সঙ্গে পুষ্পের হয় না প্রতিদ্বন্দ্বিতা,
—একে হনন করে না অপরকে।
যেখানে মানুষ ভোলে না মধুপের আনন্দ,
মধুপ হরণ করে না মানুষের কর্মশক্তি। —অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়।

সাতচল্লিশ ] সলজ্জ বধূর মত সন্ধ্যাতারা জাগে
সুদূরের আকাশের পূর্ব-প্রান্ত ভাগে,
নয়নে ক্ষরিছে তার শুধু কোমলতা ;
বিশ্ব তার পানে চেয়ে ভুলেছে রুক্ষতা।
মাটির প্রদীপটিরে অতি ধীরে ধীরে
তুলিয়া ধরিল বিশ্ব মাটির মন্দিরে।
অনন্তের সাথে হলো অন্তের ইসারা,—
মাটির প্রদীপ আর আকাশের তারা।
পরস্পর কহে যেন আলোর শিখায়,
প্রতীক্ষা হইল পূর্ণ এবার সন্ধ্যায়। —সুধীর গুপ্ত।

[ আটচল্লিশ ] তৃপ্তিহীন বেদনায়
নিখিলের হিয়াখানি কাঁপে যেন মোর মর্মছায়।
নিখিল ভুবন
ঘিরিয়াছে যেন আজ অতীতের ব্যথার স্বপন।

জ্যোছনা—সে ব্যথায় উদাস,
অঙ্গে অঙ্গে চামেলির লাবণ্য-বিলাস,
মূর্ছাতুর যেন কোন্ প্রেমিকের স্মৃতি-সৌধ 'পরে,
করুণ কামনাটুকু লেগে আছে ব্যথিত অধরে
ধরায় কোমল প্রাণ পরশিছে আমার পরাণ
তাহার অন্তরে শুনি আমারি সে বেদনার গান।
আমারি অতৃপ্তিসুর মাখা আজি উদাস জ্যো'স্নায়,
ধরিত্রীর বক্ষপাত্র ভরা মোর প্রেম-বেদনায়। —ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

[ ঊনপঞ্চাশ ]

একা নই একা নই পত্রে পত্রে মহাবনস্পতি ;
মহাপ্রাণ বন্যাধারা! প্রতি প্রাণশিরায় মিলন।
স্পর্শমাত্র কেঁপে উঠি ; এক পত্র ছিঁড়ে আনো যদি
অমনি সমস্ত দেহে এক ব্যথা—একক ক্রন্দন।
বিন্দু বিন্দু বারি নিয়ে গড়ে উঠি মহাজটাজাল
দুরন্ত ঝঞ্চার সনে ছেয়ে চলি নীল নীলাম্বর।
ছোট ছোট পঙ্গ নিয়ে গড়ে উঠি মহাপঙ্গপাল
মেঘে মেঘে মন্দ্রিত বজ্রবাণে পৃথ্বী থরোথর।
একা নই একা নই প্রতি অণু অণুতে বন্ধন—
সারাদেহে এক রক্ত, এক ব্যথা—একক স্পন্দন। —আশরাফ্ সিদ্দিকী।

[ পঞ্চাশ ]

বেদনার ধূপ জ্বালি পূজিনু তোমারে,
বেদনা ধরিল মোর সুরময় রূপ।
হৃদয়-সর্বস্ব দিনু অর্ঘ্য-উপহারে,
শূন্য বক্ষে বাজে বাঁশী অপূর্ব অনুপ।
দুঃখের প্রদীপ লয়ে করিনু বরণ,
দুঃখদীপ ঝলি উঠে চন্দ্র-করোজ্জ্বল॥
অশ্রুর মালিকা গাঁথি করিনু অর্পণ,
অশ্রু মোর ফিরে এল মুকুতা-ধবল।
এই তো প্রেমের রীতি, সুধাবিষে ভরা
এ জগতে সত্য কিবা আছে তার আগে?
হৃদয় ভাঙিয়া পড়ে, তবু মধুক্ষরা,
মনোহরা নাম তব জপি অনুরাগে।
এরি লাগি যুগে যুগে জনম-জাঙ্গাল
ঘুরিবারে চাহি আমি প্রেমের কাঙাল। —জীবনকৃষ্ণ শেঠ।

[একান্ন

আজি কোথায় লুকালো সেই প্রাণধারা, সে নব-সঞ্জীবনী,
যুগের যাত্রীকণ্ঠে কেন এ আর্ত করুণ ধ্বনি!
দগ্ধ মরুর উষর উরসে যে-ধারা হয়নি হারা
কাজল-রেখায় শ্যামল মায়ায় হারাইল গতিধারা!

ওগো নিখিলের প্রাণের উৎস ধরণীর মরু-রাশি!
মহতী স্মৃতির ধাত্রী-জননী যুগে যুগে তুমি জানি।
গোপন উৎস খোল আরবার—সোমরস করি পান,
মহা-উৎসবে প্রাণ ভ'রে গাহি জীবনের জয়গান। —শাহাদাৎ হোসেন।

[**বায়ান্ন**] নিয়তির নিয়ম হল বিধাতার নিয়ম, আর নিয়তির নিয়ম থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র নিয়ম হল আর্টের নিয়ম। কিন্তু একেবারে যে নিয়তির নিয়ম লঙ্ঘন করলে, সে আর্ট রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-নিরপেক্ষ আর্ট—হয়তো আছে হয়তো নেই। এই সৃষ্টির নিয়মকে মানিয়ে যে আর্ট, তাই নিয়েই রূপদক্ষের কারবার। একটা মাটির খেলনা তাকে ছেলের সাথী হবার উপযুক্ত করে' ক্ষণিকের জীবন নিয়ে ছেড়ে দিলে আর্টিষ্ট—কেন না যুগ যুগ ধরে' মানুষের সঙ্গে খেলার সম্পর্ক পাওয়া চাই তার। ঠিক এই নিয়ম দেখি বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে কাজ করছে। নক্ষত্র একটা গড়লেন বিশ্বকর্মা,—যুগ যুগ ধরে' ফুলঝুরি জ্বালিয়ে খেলে চল্লো সে, একটা খদ্যোত গড়লেন তিনি—ক্ষণিক খেলার অবসর পেলো সে বিধাতার কাছে। আর্টিষ্টও ঠিক এর জবাব দিলে, ঘরের মধ্যে তার সে ঘরের প্রদীপের তারার মতোই জ্বল্লো—শুধু রূপটি পেলে সে ক্ষণিকের।

—অবনীন্দ্রনাথ

# তৃতীয় অধ্যায়

## সারাংশ : বস্তুসংক্ষেপ : ব্যাখ্যা : বিতর্ক-পরিস্ফুটন

## আদর্শমালা ও অনুশীলনী

## প্রথম পর্যায়—সারাংশ

[**এক**] বর্ণবিজ্ঞান জগতের রঙ্‌মহলে যাহা দেখে না, চিত্রকার তাহা দেখেন। শব্দবিজ্ঞান আকাশের শব্দভাণ্ডারে যাহা শুনিতে পায় না, গায়ক এবং সংগীতজ্ঞ তাহা শোনেন। দেহবিজ্ঞান বা অস্থিবিজ্ঞান জীবদেহের মধ্যে যে বস্তুর কোনও সন্ধান পায় না, চিত্রকর ও ভাস্কর তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাতেই মজিয়া যান। জ্যোতির্বিদ্ গ্রহনক্ষত্রখচিত, শতরঞ্জিত গগনপটে যে ছবি দেখেন না, কবি তাহা দখিয়া বিভোর ও বিহ্বল হইয়া যান। এইরূপ ভাবে, এ সকল ক্ষেত্রে চিত্রকর, গায়ক, ভাস্কর ও কবির অন্তরের প্রস্ফুট-রঞ্জিনী-বৃত্তি বর্ণের, স্বরের, জীবদেহের কিংবা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যাহা কেবল বাহ্য ও বাহিরের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাকে আপনার রসের রঙে রঞ্জিত করিয়া তাহার অদ্ভুত রূপান্তর ঘটাইয়া থাকেন। এই বস্তুকেই সাহিত্যের রূপান্তর বলিতে পারা যায়। **ক. বি. বি. এ. '৪৮**

বিশ্বের আছে দুইটি দিক—একটি, বস্তুবিশ্ব ; অপরটি, ভাববিশ্ব। বর্ণবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান, দেহবিজ্ঞান বা অস্থিবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান বস্তুবিশ্বের যে পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা বাহিরের পরিচয়—ভিতরের পরিচয় নয়। ভাববিশ্বের রহস্যময় প্রকৃতির সন্ধান

বিজ্ঞানী পায় না, পায় শিল্পী। বর্ণবিজ্ঞানের বহির্ভূত বর্ণবৈচিত্র্য চিত্রশিল্পে, শব্দ-বিজ্ঞানের বহির্ভূত শব্দমাধুর্য গায়ক ও সংগীতবেত্তার শিল্পানুভূতিতে, দেহবিজ্ঞানের অপরিচিত জীবদেহের সৌন্দর্য চিত্রকলায় মূর্তিশিল্পে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনধিগম্য গ্রহ-উপগ্রহ-শোভিত গগনপটের চমৎকারিত্ব কবির কাব্যশিল্পে সঞ্চারিত হয়। আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া বস্তুবিশ্বকে ভাববিশ্বের রহস্যময়তার মাঝে অভিসঞ্চিত করিয়া এই যে চমৎকারিত্বে ভরা রূপান্তর, ইহাই সাহিত্যের রূপান্তর।

[ **দুই** ] পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত গতিবিজ্ঞানে একটা সিদ্ধান্ত আছে যে, সময় মত থাকিয়া থাকিয়া একটু একটু ধাক্কা দিলে হিমালয়ের মত প্রকাণ্ড পদার্থটাকেও কাঁপাইতে বা ধরাশায়ী করা যাইতে পারে। কৈলাসপর্বত তুলিবার জন্য রাবণের এবং গন্ধমাদন উত্তোলনের জন্য হনুমানের মত মহাবীরের দরকার হইয়াছিল। কিন্তু পদার্থবিদ্যার পেণ্ডুলম-তত্ত্ব অবগত থাকিলে পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালকেও এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটা সহজেই সম্পন্ন করিয়া ফেলিতে পারিত। মনস্তত্ত্ববিদের ভ্রূকুটিভয় সত্ত্বেও আমি মনুষ্যের চিত্তটিকে একটা সুবৃহৎ মস্কোনগরের ঘণ্টার মত পদার্থ বলিতে চাহি অর্থাৎ অনেক সময়ে বাহ্যশক্তি প্রভূত পরিমাণে বলপ্রয়োগ করিয়া মানুষের অন্তঃকরণকে স্থানভ্রষ্ট ও বিচলিত করিতে পারে না। আবার অতি মৃদু পবন-হিল্লোল যদি সময় মত আসিয়া আস্তে আস্তে ছোট ছোট ধাক্কা দেয়, তাহা হইলে ঘণ্টাটি বেগে আন্দোলিত হইয়া দিগন্ত নিনাদিত করিয়া তুলিতে পারে। কোন কোন মহাকায় অর্ণবযান বড় বড় ঝটিকার বেগ অতিক্রম করিয়া সামান্য হাওয়ায় জলমগ্ন হয়। আবার উত্তাল তরঙ্গমালার উপর সের-কতক কেরোসিন ঢালিয়াও তাহাদের ক্ষোভ প্রশমিত হইতে দেখা যায়। মানুষের মনও কতকটা সেইরূপ।

ক. বি. বি. এ. '৪৮

যত বড় কঠিন কাজই হোক্ না কেন, অনুকূল পরিবেশে ও উপযুক্ত সময়ে তাহা করিবার জন্য অগ্রসর হইলে সেই কঠিন কাজই অতি সহজে সম্পাদিত হয়। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে ও অনুপযুক্ত সময়ে তাহা শত চেষ্টাতেও সম্পন্ন করা যায় না। বিজ্ঞান-জগতে স্বীকৃত এই সত্যটি মনোজগতেও সমভাবে প্রকটিত। মানুষের মন জিনিসটি বড়ই রহস্যময়, সন্দেহ নাই। বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই মনকে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায় না। মনেরও আছে গতি এবং সে গতিও বহুবিচিত্র রূপে প্রসারিত। ইহা না বুঝিয়া যত শক্তিই প্রয়োগ করা যাক্ না কেন, কোন ফলই হয় না। ভয় দেখাইয়া বা প্রলুব্ধ করিয়া যে-মানবমনকে আকর্ষণ করা যায় না, তাহাকেই হয়তো-বা আকর্ষণ করা যায় সহৃদয় অন্তরের দরদভরা স্পর্শ লাগাইয়া। সদম্ভ শক্তি-প্রাচুর্যের দ্বারা মানবচিত্ত জয় করা যায় না; মানবসম্পর্কিত অভিজ্ঞতা, স্থিরবুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তিকে লইয়া আগুয়ান হইলে দৃঢ়সংকল্প মানবমনকে বশীভূত করা যায়।

[ **তিন** ] আমাদের মনের ভাবের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই যে, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করিতে চায়। প্রকৃতিতে আমরা দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিকিয়া থাকিবার জন্য, প্রাণীদের মধ্যে সর্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। যে জীব

সন্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে, তাহার জীবনের অধিকার তত বেশি বাড়িয়া যায়, নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে। মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেই রকম একটা চেষ্টা আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, প্রাণের অধিকার দেশে ও কালে, মনোভাবের অধিকার মনে এবং কালে। মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বহু মনকে আয়ত্ত করা।

এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীন কাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত লিপি'—কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই,—কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে,—কত তুলিতে, খোন্তায়, কলমে, কত আঁকজোক, কত প্রয়াস—বাঁ দিক হইতে ডাহিনে, ডাইন দিক হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নীচে, এক সার হইতে অন্য সারে। কি?—না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না, তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া অনুভূত হইয়া, প্রবাহিত হইয়া চলিবে। আমি যাহা ভাবিয়াছি, তাহা চিরদিন মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝখানে বাচিয়া থাকিবে। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৮**

**[ চার ]**

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাড়াইবে বিচারের আশে
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
"মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৮**

**[ পাঁচ ]**

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেরে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হোতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা। **রা. বি. বি. মাধ্যমিক '৫৭**

[ **ছয়** ] ধীরে ধীরে আত্মাকে উন্নত করতে হবে। চিন্তা ও দৃষ্টির সাহায্যে তোমার সকল দোষ হ'তে তুমি মুক্ত হও! গুরুর আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের কোন মূল্য নাই। তুমিই তোমার শ্রেষ্ঠ গুরু। গুরু মানুষকে মুক্তি দেন না। মুক্তির মালিক তুমি—এ যদি না মানো, তা'হলে বুঝবো তোমার আত্মার মৃত্যু হয়েছে। জাতি যখন অন্ধ হ'য়ে যায় তখন তারা গুরুর নাম বেশি ক'রে নেয়। নিজের আত্মাকে সে একেবারে অস্বীকার করে।

চরিত্রকে উন্নত করো—মিথ্যা, নীচতা, অন্যায়, পরের ভাবের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঔদাসীন্য, অসভ্যতা, স্বার্থপরতা যাবে। ধার্মিক ও সাধক কোন আশ্চর্য জীব নয়।

নীচ, স্বার্থপর, মূর্খ, চোর, পরের সুখ ও পয়সা অপহরণকারী, ঘুষখোর উপাসনা ও উপবাস করুক, তাতে কোন লাভ নাই। পরমেশ্বর তোষামোদে ভোলেন না—তিনি চান সত্য প্রাণ—তিনি চান মানুষ। শুধু উপাসনা ক'রে মানুষ মুক্তি পাবে না। তাকে কর্মী ও পরদুঃখকাতর, জ্ঞানী ও দৃষ্টিসম্পন্ন, চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী, মনুষ্যত্বসম্পন্ন এবং ন্যায়নিষ্ঠ হ'তে হবে। সে কখনও অন্ধের মত ধর্ম পালন করবে না। পিতা রৌদ্রের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করতে নিষেধ করেছেন—পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন-ভয়ে সুবোধ বালকের মত অগ্নিদগ্ধ ঘরখানিকে রক্ষা ক'রতে সংকুচিত হয়ো না। আত্মার এই জ্ঞানমৃত্যু—জাতির পক্ষে সর্বনাশের কথা। **রা. বি. মাধ্যমিক '৫৭**

[ **সাত** ] সাধারণ মানুষ পুত্র পরিবারের সুখের জন্য হৃদয়ের রক্ত ঢালে, মহাপুরুষ মানুষের মঙ্গলতরে জীবনশোণিত প্রদান করেন। অন্যের জন্য জীবনধারণে মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা, অন্যের মধ্যে ডুবিয়া ও মুছিয়া যাওয়া মানুষের পূর্ণানন্দময় পরিণাম।

আত্ম লইয়া আমি তৃপ্ত নহি, জীবন আমার আর কাহাকেও নিবেদন করিতে চাই। কে আমার বাঞ্ছিত জন, কাহাকে আমার জীবন দিয়া জন্ম আমার সার্থক করিব? ক্ষুদ্র লইয়া আমি বাঁচিতে পারি না, নিজেই যে ভাঙিয়া ও মুছিয়া যায়, তাহার মধ্যে ডুবিয়া আমার প্রাণের তৃষ্ণা মিটিতে পারে না। আমি চাই চিরসত্য ও চিরানন্দ, মরণে মহাজীবন। চাই সর্বাপেক্ষা মহৎ ও মধুর যে, আমার উৎস ও লক্ষ্য যে, সেই পরম পবিত্র মহামহীয়ান্ প্রভুর কাছেই সর্বস্ব আমার লুণ্ঠিত করি, তাহারই মধ্যে অস্তিত্ব আমার লুপ্ত করিয়া অক্ষয় আনন্দে মগ্ন হই। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭**

[ আট ] তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ় বলে অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর, বীর্য দেহ সুখের সহিতে
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহ দুঃখে
যাহে দুঃখ আপনার শান্তস্মিত মুখে
পারি উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহ
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে উঠে ফুটি। বীর্য দেহ ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীন জ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহ চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।
বীর্য দেহ তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭**

[ **নয়** ] আজ ভোর বেলাতেই উঠে শুনি, বিয়েবাড়ীতে বাঁশি বাজছে। বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতিদিনের সুরের মিল কোথায়? অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য, অবহেলা, অপমান, অবসাদ, তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নিরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য—বাঁশীর দৈববাণীতে এ-সব বার্তার আভাস কোথায়?

গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত চেনা কথার পর্দা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হ'য়ে পড়ল।

যখন সেখানকার মালাবদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠ্‌ল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেম—তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দু'গাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে।

সুরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ ব'লে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাশি বলে, এই কথাই সত্য। —রবীন্দ্রনাথ।

## দ্বিতীয় পর্যায়—বস্তুসংক্ষেপ

[ **দশ** ] এমন গাছ আছে, যে গাছে বোল ধরিয়াই ঝরিয়া যায়। ফল হইয়া ওঠা পর্যন্ত টেঁকে না। তেমনি এমন মনও আছে, যেখানে ভাবনা কেবলই আসে-যায়, কিন্তু ভাব আকার ধারণ করিবার পুরা অবকাশ পায় না। কিন্তু ভাবুক লোকের

চিত্রে ভাবনাগুলি পুরাপুরি ভাব হইয়া উঠিতে পারে, এমন রস আছে, এমন তেজ আছে। অবশ্য অনেকগুলা ঝরিয়া পড়ে বটে, কিন্তু কতকগুলা ফলিয়াও উঠে। গাছে ফল যে কয়টা ফলিয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে দরবার এই যে, ডালের মধ্যে বাঁধা থাকিলেই আমাদের চলিবে না—আমরা পাকিয়া রসে ভরিয়া রঙে রঙিয়া গন্ধে মাতিয়া আঁটিতে শক্ত হইয়া গাছ ছাড়িয়া বাহিরে যাইব, সেই বাহিরের জমিতে ঠিক অবস্থায় না পড়িতে পাইলে আমাদের সার্থকতা নাই। ভাবুকের মনে ভাবনাগুলা ভাব হইয়া উঠিলে, তাহাদেরও সেই দরবার। তাহারা বলে, কোনো সুযোগে যদি হওয়া গেল, তবে এবার বিশ্বমানবের মনের ভূমিতে নবজন্মের এবং চিরজীবনের লীলা করিতে বাহির হইব। প্রথমে ধরিবার সুযোগ, তাহার পরে ফলিবার সুযোগ, তাহার পরে বাহির হইয়া ভূমিলাভ করিবার সুযোগ—এই তিন সুযোগ ঘটিলে পর তবেই মানুষের মনের ভাবনা কৃতার্থ হয়। **গৌ. বি. বি. এ. '৫১**

[ **এগারো** ] ভগবানের আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে, মানবচরিত্রের মধ্যে, আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিতেছে। মানুষের হৃদয়ও সাহিত্যে আপনাকে সৃজন করিবার, ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার অন্ত নাই, ইহা বিচিত্র। কবিগণ মানবহৃদয়ের এই চিরন্তন চেষ্টার উপলক্ষ্য মাত্র।

ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত—মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎসৃষ্টির আনন্দগীতের ঝংকার আমাদের হৃদয়-বীণাতন্ত্রীকে অহরহঃ স্পন্দিত করিতেছে—সেই যে মানসসংগীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ। বিশ্বের নিঃশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিণী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী। বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালোমন্দ, তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, এই বাণীও তেমনি দেশে দেশে, ভাষায় ভাষায়, আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

**গৌ. বি. বি. এ. '৫০**

## তৃতীয় পর্যায়—ব্যাখ্যা

[ **বারো** ] যন্ত্রচালিত বড়ো বড়ো কারখানায় মানুষকে পীড়িত ক'রে যন্ত্রবৎ করে ব'লে আমরা আজকাল সর্বদাই তাকে কটূক্তি করে থাকি। এই উপায়ে পশ্চিমের সভ্যতাকে গাল পাড়ছি জেনে মনে বিশেষ সান্ত্বনা পাই। কারখানায় মানুষের এমন পঙ্গুতা কেন ঘটে? যেহেতু সেখানে তার বুদ্ধিকে ইচ্ছাকে কর্মকে একটা বিশেষ সংকীর্ণ ছাঁদে ঢালা হয়, তার পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। কিন্তু লোহা দিয়ে গড় কলের কারখানাই একমাত্র কারখানা নয়। বিচারহীন বিধান লোহার চেয়ে শক্ত, কলের চেয়ে সংকীর্ণ। যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র অতি নিষ্ঠুর শাসনের বিভীষিকা সর্বদা

উদ্যত রেখে বহু যুগ ধরে বহু কোটি নরনারীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের পুনরাবৃত্তি করতে নিয়ত প্রবৃত্ত রেখেছে সেই দেশজোড়া মানুষপেষা জাঁতাকল কি কল হিসাবে কারও চেয়ে খাটো? বুদ্ধির স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা ক'রে এত বড় সুসম্পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ চিত্তশূন্য বজ্রকঠোর বিধি-নিষেধের কারখানা মানুষের রাজ্যে আর কোনো দিন আর কোথাও উদ্ভাবিত হয়েছে বলে আমি তো জানি নে। —রবীন্দ্রনাথ।

**ক. বি. বি. এ. (অনার্স) '৫৯**

[ **তেরো** ] আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়; এই জন্য সুখের পক্ষে ধুলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধুলা ভূষণ। সুখ কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত, আনন্দ যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে, আনন্দ সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে; এই জন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে-বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখ সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে, আনন্দ দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে; এই জন্য কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত, আর আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ দুইই সমান। **গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫৭**

[ **চোদ্দ** ]

কবি তবে দুই কর জুড়ি বুকে
বাণী বন্দনা করে নতমুখে,—
"প্রকাশো, জননী, নয়ন সমুখে
প্রসন্ন মুখছবি।
বিমল মানস-সরস-বাসিনী,
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী,
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা,
তোমাব হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
খেপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।
চারিদিকে সব বাটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছ গুনিয়া,
আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া,
পেয়েছি স্বরগসুধা।
সেই মোর ভালো, সেই বহু মানি—
তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী,

সুরের খাদ্যে জান তো, মা বাণী,
নরের মিটে না ক্ষুধা।
যা হবার হবে, সে কথা ভাবি না—
মাগো, একবার ঝংকারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনা
অমৃত উৎসধারা।"—রবীন্দ্রনাথ। **গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫৬**

[ **পনেরো** ] বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উত্তম জন্মে। অভিলাষমাত্রেই কখনও উত্তম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগলাভ করে যে, তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উত্তম জন্মে। অভিলষিতের অপূর্তির জন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাই যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহা তদভাবে সুখ বলিয়া বোধ হয় না।

যখন বাঙ্গালীমাত্রেরই হৃদয়ে অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালীই তজ্জন্য আলস্য সুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উত্তমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।

সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে, তজ্জন্য প্রাণ বিসর্জনও শ্রেয়ঃ বোধ হইবে তখন সাহস হইবে।

অতএব যদি কখনও বাঙ্গালীমাত্রেরই হৃদয়ে জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোক প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, যদি এই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালীর অবশ্য বাহুবল হইবে।—বঙ্কিমচন্দ্র।

**গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫৬**

[ **ষোলো** ] জ্ঞান যে বাহুতে বল দেয়, জ্ঞানের তাই শ্রেষ্ঠ ফল নয়; জ্ঞানের চরম ফল যে তা' চোখে আলো দেয়। জনসাধারণের চোখে জ্ঞানের সেই আলো আন্‌তে হবে, যাতে মানুষের সভ্যতার যা' সব অমূল্য সৃষ্টি,—তার জ্ঞানবিজ্ঞান, তার কাব্যকলা,—তার মূল্য জান্‌তে পারে। জনসাধারণ যে বঞ্চিত, সে কেবল অন্ন থেকে বঞ্চিত ব'লে নয়, তার পরম দুর্ভাগ্য যে সভ্যতার এই সব অমৃত থেকে সে বঞ্চিত। জনসাধারণকে যে শেখাবে একমাত্র অন্নই তার লক্ষ্য, মনে সে তার হিতৈষী হ'লেও, কাজে তার স্থান জনসাধারণের বঞ্চকের দলে। পৃথিবীর যে সব দেশে আজ জনসংঘ মাথা তুল্‌ছে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচারেই তা সম্ভব হয়েছে। তার কারণ কেবল এই নয় যে, শিক্ষার গুণে পৃথিবীর হালচাল বুঝতে পেরে জনসাধারণ জীবনযুদ্ধে জয়ের কৌশল আয়ত্ত করেছে। এর একটি প্রধান কারণ সংখ্যার অনুপাতে জনসাধারণের সমাজে শক্তিলাভের যা গুরুতর বাধা অর্থাৎ সভ্যতালোপের আশঙ্কা, শিক্ষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে সে বাধার ভিত্তি ক্রমশঃই দুর্বল হ'য়ে আসে। **গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫২**

[ **সতেরো** ] শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে;

সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখি-জল—
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুঃখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল। **গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫২**

[ **আঠারো** ] ফুল, তুমি মানব-গুরু। মানুষে মানুষ আছে, আর পশু আছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা সেই পশুত্বটুকু নষ্ট করিয়া মনুষ্যত্বটুকু প্রবল করে। সেই নিমিত্ত মানুষ পৃথিবীতে উদ্ভব হইয়া আজ পর্যন্ত কত চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এই প্রভূত চেষ্টার প্রথম কার্য—ফুল তোলা। যেদিন আদিম মনুষ্য আদিম পশুর ন্যায় ক্ষুধার জ্বালায় মহারণ্যে বিচরণ করিয়া পশু বধ করিয়া কাঁচা মাংস চিবাইয়া খাইয়া…অপরাহ্ণে সহসা অস্তাচলগামী সূর্যের সুবর্ণজ্যোতি দেখিয়া, কি জানি কেন, বিলম্বিত লতা হইতে একটি পুষ্প ছিঁড়িয়া মাথার চুলে গুঁজিল, সেইদিন মনুষ্যের বিশাল ইতিহাসের সূত্রপাত হইল। সেইদিন জানা গেল যে সহচর সিংহ ব্যাঘ্র অনন্তকাল মহারণ্যেই বাস করিবে, কিন্তু তাহাদের আদিম সহচর মানুষ মহারণ্য বিনষ্ট করিয়া মহাসম্পদ সৃষ্টি করিবে। **গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫২**

[ **উনিশ** ] মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে' যায়
আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
অহংকার ভেঙ্গে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত।
বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা? **ঢা.বি.মাধ্যমিক '৫১**

[ **কুড়ি** ] "হায়, গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা।
ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি না সেবা।"
শিশির কহিল কাঁদিয়া—
"তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি, এমন নাহিকো আমার বল।
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অশ্রুজল।"
"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি, বাসিতে পারি যে ভালো।"

শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া—
"ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি'
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব হাসির মতন করি।" গৌ. বি'. বি. এ '৫১

[ **একুশ** ] ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ, বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহারাই পঞ্চভূত, আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ হইতে নূতন বিজ্ঞানশাস্ত্র আসিয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন। ভূত বলিয়া আর কেহ তাঁহাদিগকে মানে না। নূতন বিজ্ঞানশাস্ত্র বলেন, "আমি বিলাত হইতে নূতন ভূত আনিয়াছি, তোমরা আবার কে?" যদি ক্ষিত্যাদি জড়সড় হইয়া বলেন যে, "আমরা প্রাচীন ভূত কণাদ-কপিলাদি দ্বারা ভৌতিক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতি জীবশরীরে বাস করিতেছি," বিলাতী বিজ্ঞান বলেন, "তোমরা আদৌ ভূত নও। আমার Elementary Substances দেখ—তাহারাই ভূত; তাহাদের মধ্যে তোমরা কই? তুমি আকাশ—তুমি কেহই নও—সম্বন্ধ-বাচক শব্দমাত্র। তুমি তেজঃ, তুমি কেবল একটি ক্রিয়া, গতিবিশেষ মাত্র। আর ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ—তোমরা এক-একজন দুই তিন বা ততোঽধিক ভূত-নির্মিত তোমরা আবার ভূত কিসের? গৌ. বি. বি. এ. '৫১

[ **বাইশ** ] এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি'
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ এই জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার,
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি' অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে' যাবো যবে ধরণীর
ব'লে যাবো, "তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।"
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি॥

শান্তিনিকেতন, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। গৌ. বি. বি. এ. '৫

[ **তেইশ** ] বাংলার তথা ভারতের এক মহাগৌরবময় যুগের প্রবর্তয়িতা রামমোহন। সে সম্মান তাঁকে সবাই অকুণ্ঠিতচিত্তে নিবেদন ক'রে থাকেন। আজকা

এই স্মরণ-বাসরে যদি শুধু এই ব্যাপারটাই আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি, তবে তাতেও তাঁর মহিমা-কীর্তন কম হবে না। কাল তো চির-পরিবর্তনশীল। বহুকাল পূর্বে গ্রীক্ দার্শনিক ব'লেছিলেন, "আমরা একই নদীতে দুইবার স্নান করি না।" জীবনের সব ক্ষেত্রেই এ স্বীকৃত সত্য। তাই রামমোহন যদি বাংলার ও ভারতের এই গৌরব-যুগের প্রবর্তয়িতা মাত্র হন,—অন্য কথায়, তাঁর দেশ যদি কর্মে ও চিন্তায় কালে কালে এতখানি ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করে থাকে যে তাঁর সেই শতবর্ষ পূর্বের নির্দেশ তার জন্য আর সার্থক নির্দেশ ব'লে গণ্য করা সম্ভবপর না হয়, তবে তাও তাঁর জন্য শোচনীয় নয়, বরং শ্লাঘনীয় ;—পুত্র ও শিষ্যের কাছে পরাজিত হওয়া তো মানুষের সৌভাগ্যের কথা।

**গৌ. বি. বি. এ. '৫২**

[ **চব্বিশ** ] প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সহিত আমাদের এতই বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে যে, তাঁহাদের সহিত আমাদের পার্থক্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও আমরা হারাইয়াছি। আমরা মনে করি, সেকালের ভারতবর্ষের সহিত এখনকার কালের কেবল নূতন পুরাতনের প্রভেদ। সেকালে যাহা উজ্জ্বল ছিল এখন তাহা মলিন হইয়াছে, সেকালে যাহা দৃঢ় ছিল এখন তাহাই শিথিল—অর্থাৎ আমাদিগকেই যদি কেহ সোনার জল দিয়া পালিশ করিয়া কিঞ্চিৎ ঝক্‌ঝকে করিয়া দেয় তাহা হইলে সেই অতীত ভারতবর্ষ সশরীরে ফিরিয়া আসে। আমরা মনে করি, প্রাচীন হিন্দুগণ রক্তমাংসের মনুষ্য ছিলেন না। তাঁহারা কেবল শাস্ত্রের শ্লোক ছিলেন—তাঁহারা কেবল বিশ্বজগৎকে মায়া মনে করিতেন এবং সমস্ত দিন জপতপ করিতেন। তাঁহারা যে যুদ্ধ করিতেন, রাজ্যরক্ষা করিতেন, শিল্পচর্চা ও কাব্যালোচনা করিতেন, সমুদ্র পার হইয়া বাণিজ্য করিতেন—তাঁহাদের মধ্যে যে ভালো-মন্দের সংঘাত ছিল, বিচার ছিল, বিদ্রোহ ছিল, মতবৈচিত্র্য ছিল—এক কথায়, জীবন ছিল, তাহা আমরা জ্ঞানে জানি বটে কিন্তু অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি না।

**উ. বি. বি. এ. '৫৫**

## চতুর্থ পর্যায়—বিতর্ক পরিস্ফুটন

[ **পঁচিশ** ] প্রাচীনের বিরুদ্ধে আধুনিকের অভিযোগ এই যে, তাঁহারা প্রধানতঃ আকাশকুসুমই রচিয়া গিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাদের সৃষ্টি সুন্দর অর্থাৎ নয়নাভিরাম হইতে পারে, কিন্তু ঠিক এই জন্যই তাহা চিত্তের অন্তরঙ্গ বস্তু হইতে পারে না।...একালের শিল্পী বলিতেছেন, যেমন আছে তেমনটি করিয়া দেখাও, তাহা সুন্দর হইল কি না সেদিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই। জগতে অসুন্দর শ্রীহীন জিনিসের অভাব নাই—সৃষ্টিরহস্যের অনেকখানিই তাহারা জুড়িয়া আছে। সেগুলি বাদ দিয়া ফল কি ? বা রাখিয়া ঢাকিয়া দেখাইবার চেষ্টাতেই বা লাভ কি ? "মা বিরাজেন সর্বঘটে",—সুতরাং দেখাও তাঁহার সত্যকার মূর্তি। সত্যের কোন অলংকার, কোন প্রসাধনই প্রয়োজন নাই। শিশুর মত সত্যেরও উলঙ্গ মূর্তিই স্বাভাবিক ও সুন্দর। সত্যকে সত্য হিসাবেই দেখাও, তাহাতেই সত্যের সৌন্দর্য।

**ক. বি. বি. এ. '৫৪**

# চতুর্থ খণ্ড

## প্রবন্ধ

## অবতরণিকা

### ॥ এক ॥

'প্রবন্ধ' এক জাতীয় 'রচনা' সত্য, কিন্তু 'রচনা'মাত্রই 'প্রবন্ধ' নয়। 'রচনা'র অর্থ খুবই ব্যাপক। যাহার সৃষ্টিমূলে আছে নির্মাণ-কৌশল তাহাই রচনা। তাই দেখি,—

'রচনা'র ব্যাপক অর্থ

যেমন 'মাল্য-রচনা', 'শয্যা-রচনা', 'বেণী-রচনা' প্রভৃতির বেলায়, তেমনি 'কবিতা-রচনা', 'গল্পরচনা', 'উপন্যাস-রচনা' প্রভৃতির ক্ষেত্রেও কতকগুলি উপকরণ বা উপাদানকে সংগ্রহ করিয়া, নির্বাচন করিয়া, সংযোজন করিয়া, তাহাদের মধ্যে গঠনসৌষ্ঠব তথা সংগতি-সুষমা রক্ষা করিয়া বস্তু বা বিষয় নির্মাণ করিতে পারিলেই রচনা-কর্ম সম্পাদিত হয়। এহেন শিল্পকর্মের অবসর থাকায় প্রবন্ধও এক জাতের রচনা।

বাংলার 'প্রবন্ধ' অর্থেই 'রচনা' শব্দটির প্রচলন। কিন্তু এমনি মজার ব্যাপার যে, 'রচনা' শব্দটির বিশেষ অর্থ-সম্বন্ধে প্রয়োগকর্তার কোন বিশেষ ধারণা নাই। রচনার আছে দুইটি দিক : প্রথমতঃ, কোন ভাব বা বিষয় আশ্রয় করিয়া তাহাকে যুক্তিতথ্য-সহকারে, চিন্তাপারম্পর্যে সন্নিবেশিত করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, সুরচিত বাণীভঙ্গীও চাই। মনের উদ্ভাবন-নৈপুণ্য ও লিপিকৌশলেরই উপর নির্ভর করে রচনাসৌষ্ঠব। এই যে রচনাশক্তি, ইহার প্রাণরস যোগাইয়া থাকে ভাবুকতা। বিষয়ের উল্লেখকে নিছক একটি উপলক্ষ্য হিসাবে ধরিয়া ভাবুকতার পাখায় ভর করিয়া সহজ সাবলীল সরস-সুসম্বদ্ধ বাণীভঙ্গীতে এই যে প্রকাশ-ব্যাপারটি, ইহা তো সাহিত্যিক প্রতিভারই পরিচায়ক। অবশ্যই এহেন রচনাশক্তি পরীক্ষামণ্ডপে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীর কাছে আশা করা যায় না। তাহাদিগের কাছে যে বস্তুটি প্রত্যাশিত, তাহা 'প্রবন্ধ'ই বটে, সার্থক 'রচনা' নয়। ইহাই সবিশেষ লক্ষণীয় যে, প্রশ্নকর্তা প্রবন্ধলিখনের সংকেত দিয়া একটি বিষয়গত বন্ধন ছাত্রছাত্রীদিগের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে সংক্রামিত করিয়া তাহাদিগের মনের উদ্ভাবননৈপুণ্যকে খর্ব করিয়া, ঐ বিষয়গত বিদ্যাবুদ্ধির বন্ধনকর্মকে

'রচনা' ও 'প্রবন্ধে'র স্বরূপ-প্রকাশ

পরখ করেন। অতঃপর ভাষার একটু মাধুর্য, একটু লাবণ্য একটু সৌষ্ঠব থাকিলেই পরীক্ষার 'প্রবন্ধ'কে 'রচনা' নামাঙ্কিত করিয়া আমরা সাধারণতঃ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি। আবার 'ভাষা-রীতি' বলিতে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীগণ সাধারণতঃ শব্দাড়ম্বরের ঢক্কা-নিনাদই বুঝিয়া থাকে। ছাত্রছাত্রীগণ তথ্য সংগ্রহ করিয়া যদি তাহাদের সেই আহৃত জ্ঞান স্ব স্ব বুদ্ধিমত্তা ও ভাবগ্রাহিতার আলোকে রচনার ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে সেই নির্মাণ-কর্মটি তথ্যভারপ্রপীড়িত লেখা হইবে না, হইবে স্বীয় ভাবচিন্তাসমৃদ্ধ বক্তব্য। কিন্তু পরীক্ষামণ্ডপে যে বস্তুটি পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীরা নির্মাণ করে, তাহা 'রচনা' নয়—একটি আত্যন্তিক শ্রমকর্ম, যাহা মুখস্থশক্তি ও সংগ্রহশক্তিরই চিরাচরিত সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এহেন লেখা 'রচনা' নয়—পরীক্ষায় পাশ করিবার ব্যায়ামমাত্র।

ইংরাজিতে যাহাকে আমরা বলি 'Essay', বাংলায় তাহারই নাম 'প্রবন্ধ'। ইংরাজি 'Essay' শব্দটির মূলগত অর্থ 'প্রয়াস'। ইহাতে লেখকের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় তো থাকেই, তাহা ছাড়া তাঁহার ব্যক্তিগত মনোভঙ্গীও আছে। ফলে সকল তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশের মধ্য দিয়া লেখকের ব্যক্তিগত ভাবুকতা আমাদের মনের তারে করে আঘাত, ঘটে চিত্তচমৎকার। আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য লেখকের এই যে প্রয়াস, ইহা ভাষার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী, যাহাকে বলা হয় 'স্টাইল', ইহাকেই অবলম্বন করিয়া আমাদের অন্তরে জাগে সাড়া। 'Essay'র মূলগত অর্থের দিক দিয়া ইহা রচনাই বটে। য়ুরোপীয় সাহিত্যেই ইহার উদ্ভব। উচ্চাঙ্গের 'Essay'তে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশই ঘটিয়া থাকে। এহেন রচনায় বিষয়ের লঘু-গুরু-বিচার নাই।

**'Essay'ও 'প্রবন্ধে'র স্বরূপ-বিচার**

মনের মাধুরী মিশাইয়া যে কোন বিষয়েরই উপরে খাঁটি সাহিত্যিক 'Essay' লেখা চলে। কিন্তু 'Essay'র ঐ মূলগত অর্থ-অনুযায়ী পরীক্ষামণ্ডপের 'Essay' লেখা হয় না বা বলা চলেও না। অন্তরের কথা নয়, নিজেরও কথা নয়—বাহিরের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান-বিচার বিদ্যা-বুদ্ধি খেলাইয়া তত্ত্ব ও তথ্য সংযোজিত করিয়া যে কোন প্রকারে একটি সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারিলেই পরীক্ষার তথাকথিত 'Essay' হইল। অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমে প্রকৃষ্টরূপে একটা বন্ধনকর্মই বর্তমানে 'Essay'র লক্ষ্য। এই হিসাবে 'Essay' এক্ষণে 'প্রবন্ধ'ই বটে।

প্রবন্ধকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ [ এক ] রচনাধর্মী প্রবন্ধ তথা খাঁটি সাহিত্যিক প্রবন্ধ, যাহাকে 'সন্দর্ভ'ও বলা চলে ; [ দুই ] জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ। রচনাধর্মী প্রবন্ধ ফরমায়েসী সামগ্রী নয়। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব-লঘুত্বের উপর ইহার নির্মাণকর্ম নির্ভর করে না। মানসিক অবস্থায়, মনের খেয়ালে, অন্তরের অনুভূতিতে

লেখক রচনাধর্মী প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। কোথাও-বা ইহা হয় মনঃপ্রধান—খেয়াল-খুশির উন্মাদনায়, বাক্‌চাতুর্যের বৈশিষ্ট্যে, গুরুগম্ভীর তত্ত্বের লঘু হাস্যরসাশ্রিত প্রকাশভঙ্গীতে রচনাধর্মী প্রবন্ধ এক সাহিত্যগত কলাশিল্পের পরাকাষ্ঠা ফুটাইয়া তোলে। এই ধরণের লেখায় লেখকের 'অহং-বোধ' অত্যন্ত প্রকট। নানাবিষয়গত অভ্যস্ত সংস্কারকে আঘাত দিয়া বেশ একটি সাহিত্যিক কালোয়াতী এই ধরণের প্রবন্ধে মেলে। মনের বিশিষ্ট ভঙ্গী ও ভাষার ছলাকলাই মনঃপ্রধান রচনাধর্মী প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। বিষয় নয়, মনোবিলাসই এই ধরণের লেখায় মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া থাকে। বীরবলের অধিকাংশ রচনাই এই ধরণের। আবার কোথাও-বা রচনাধর্মী প্রবন্ধ হয় লেখকের অন্তররসে রসায়িত। তাঁহার হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথাবেদনা, হর্ষবিষাদ যেন লেখার ছত্রে ছত্রে হয় উৎসারিত। ইহা একটি অপূর্ব সামগ্রী—উচ্চস্তরের সাহিত্য-রসধারায় ইহা অভিসিঞ্চিত। লেখকের আত্মগত উপলব্ধির তাগিদে লেখা এই ধরণের রচনাধর্মী প্রবন্ধ আমাদের সাহিত্যে একরূপ নাই বলিলেই চলে। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে' ইহার খানিকটা আভাস মেলে মাত্র, কিন্তু আসলে উহা ভাবাবেগসমৃদ্ধ তরল গদ্যকাব্য ছাড়া আর কিছু নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র লেখাগুলিতে রচনাধর্মী প্রবন্ধের বহু লক্ষণ আছে। তবে উহা এমনই একটি সমন্বয়ধর্মী সাহিত্যিক রূপ যে গল্প, কাব্য, সমাজদর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমালোচনা, আত্মচিন্তা সব-কিছুই বিদ্যমান। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিছক হৃদয়রসে অভিষিক্ত কিছু কিছু রচনাধর্মী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মোহিতলালের 'জীবনজিজ্ঞাসা'ও এই ধরণের সার্থক শিল্পসৃষ্টি। ইংরাজি সাহিত্যকার Lamb-এর *'Essays of Elia'*, Oscar Wilde-এর *'De Profundis'*—এই জাতীয় খাঁটি সাহিত্যিক প্রবন্ধ।

প্রবন্ধের শ্রেণী-পরিচয়

[ ১ ] রচনাধর্মী প্রবন্ধ

আর এক জাতের প্রবন্ধ, যাহাকে জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ বলা যায়, তাহাই সাধারণতঃ প্রবন্ধ নামে পরিচিত। এই জাতীয় প্রবন্ধে থাকে বস্তু বা বিষয়ের পরিচয়, মতবিশেষের উপস্থাপনা ও আলোচনা, তথ্য বা তত্ত্বের আবিষ্কার বিদ্যা-বুদ্ধির প্রকাশ, চিন্তাশক্তির অভিব্যক্তি, ভাবুকতার আভাস এবং আরও থাকে যথাযোগ্য ভাষাজ্ঞান, অথবা লেখনী-চালনার অভ্যাস। এই ধরণের লেখায় তীক্ষ্ণ বোধশক্তি খুবই প্রয়োজনীয়। সাহিত্যিক প্রতিভা নয়, মনস্বিতাই জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধলিখনের নিদান। তবে একটি কথা। মননশক্তিসম্ভূত এই ধরণের প্রবন্ধলিখনের ক্ষেত্রে রচনা-

[২] জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ

ধর্মিতাও অর্থাৎ মানস-দৃষ্টিভঙ্গীও সংক্রামিত থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধ-গ্রন্থখানি রসনিবিড়তা, চিন্তাগভীরতা, লিপিনৈপুণ্য এবং ভাবুকতায় ভরিয়া উঠিয়া প্রতিভা ও মনস্বিতার এক অপূর্ব সম্মেলন হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ মনে করা যাইতে পারে Oliver Wendell Holmes-এর লেখা '*Autocrat of the Breakfast Table*'-এর কথা। ইহাও ঐ উভয় শক্তির সংমিশ্রণজাত।

জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ

জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক বা সাধারণ প্রবন্ধকে মোটামুটি সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: [এক] বিবৃতিমূলক প্রবন্ধ অর্থাৎ কোন কাহিনী বা ঘটনার সংক্ষিপ্ত এবং সুস্পষ্ট বিবরণ: যথা,—'মহাত্মা গান্ধীর জীবনবৃত্তান্ত'; 'কায়েদে-আজম জিন্নার জীবনকথা'; '১৫ই আগস্ট'; 'কাশ্মীর-ভ্রমণের কথা'। [দুই] মত বা তত্ত্ববিশেষের ব্যাখ্যানমূলক প্রবন্ধ: যথা,—'সাম্যবাদ'; 'ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'; 'ভারতের জাতীয়তাবাদ'। [তিন] বর্ণনামূলক প্রবন্ধ: যথা,—'বাংলার ঋতুচক্রের আবর্তন-লীলা'; 'সমুদ্রতীরে সূর্যোদয়'। [চার] তত্ত্ববিচারমূলক বা বিতর্কমূলক প্রবন্ধ: যথা,—'ছাত্র ও রাজনীতি'; আমাদের স্বাধীনতা; 'বিশ্বশান্তি ও বিশ্বযুদ্ধ; 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি'; 'হিংসা ও অহিংসা'। [পাঁচ] ভাবনামূলক প্রবন্ধ: যথা,—'শ্রেষ্ঠ মানব'; 'জীবনের উদ্দেশ্য'; 'চরিত্র'। [ছয়] তথ্যবাহী প্রবন্ধ: যথা,—'বেতার ও বর্তমান জগৎ'; 'বাংলার উৎসব'; 'ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাস ও ধারা'; 'ভারতীয় চিত্রকলা'। [সাত] নীতিকথার ব্যাখ্যানমূলক প্রবন্ধ: যথা,—'যে সহে সে রহে'; 'ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে'। অবশ্য জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধের এই শ্রেণীবিভাগটি যে একেবারেই ক্রটিহীন, এমন কথা বলা চলে না। কারণ,—এমন বহু প্রবন্ধই আছে যাহাদের মধ্যে একাধিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, একটি শ্রেণীর উপকরণ অপর শ্রেণীরও মধ্যে সংক্রামিত। তাই এই শ্রেণীবিভাগ যুক্তিবিচারসহ নয়। তবে একটি কথা। শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকিলে প্রবন্ধের প্রকৃতি বুঝিয়া সেই অনুসারে উপযুক্ত তথ্য ও যুক্তির সমাবেশ, যথাযথ ভাববিন্যাসের সৌকর্য ফুটাইয়া তোলা যায়। এই জন্যই পরীক্ষামণ্ডপে প্রবন্ধরচনাকালে এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকিলে কাজের সুবিধা হয়।

## ॥ দুই ॥

যাহার কিছু বলিবার আছে, প্রবন্ধ লেখা কেবলমাত্র তাহারই সাজে। নচেৎ নানারকমের যতিচিহ্ন বসাইয়া, কমবেশি বানান ভুল করিয়া, উপর্যুপরি বাক্যরচনা করিতে পারিলে কিছুটা সময় বেশ নষ্ট করা যায় সত্য, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই

হয় না। কয়েকটি শব্দের মালা গাঁথিয়া বাক্য, কয়েকটি বাক্যের মালা গাঁথিয়া অনুচ্ছেদ এবং কয়েকটি অনুচ্ছেদের মালা গাঁথিয়া একটি তথাকথিত প্রবন্ধ রচনা করিয়া কোন লাভই হয় না। নিজেকে প্রকাশ করিতে শিক্ষা করাই হইতেছে সব চেয়ে বড় কথা।

প্রবন্ধরচনা-শিল্পের গুরুত্ব

ছাত্রছাত্রীরা শব্দ বাক্য অনুচ্ছেদাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের মাঝে তাহাদের নিজেদের কোন দৃষ্টিভঙ্গী ফুটিয়া ওঠে না। বলিতে কি, আমরা ইট তৈয়ার করিতেই জানি, কিন্তু কেমন করিয়া সৌধনির্মাণ করিতে হয়, তাহার খবর রাখি না। আবার এই সৌধটি কোন্ উদ্দেশ্যে নির্মাণ করিতে হইবে, তাহাও জানা দরকার। হাসপাতাল, না ইস্কুল-বাড়ি, না সিনেমা-বাড়ি, না গৃহস্থ-বাড়ি—কোন্‌টির জন্য সৌধনির্মাণ, তাহা না জানা অবধি কোন কাজই তো হইতে পারে না। নিছক অনুশীলনী হিসাবে প্রবন্ধ-রচনা—কোন কিছু আন্তরিকতাপূর্ণ মূল্যবান চমকপ্রদ বক্তব্য বলিবার নাই অথচ পরীক্ষার জন্য না লিখিয়াও তো উপায় নাই, এমনি ভাবে যাহা কিছুই লেখা যা'ক্ না কেন, সে লেখা পরীক্ষক-পরীক্ষিকার মনের মাঝে কোন দাগ না কাটিয়া এক গভীর বিতৃষ্ণাই ছড়াইয়া দেয়—ফলে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীদের আশা পূর্ণ হয় না। অতএব, প্রবন্ধ লিখিতে হইলে দুইটি জিনিস জানা দরকার: একটি হইতেছে—'কি বলিতে হয়?' অপরটি হইতেছে—'কেমন করিয়া বলিতে হয়?' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌টারমিডিয়েট্ ও বি. এ. বাংলা পরীক্ষায় যে প্রবন্ধ রচনা করিতে বলা হয়, তাহাতে এই দুইটি সামগ্রীই পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীর কাছে চাওয়া হয়। প্রবন্ধে থাকে ২০ নম্বর, তার মধ্যে বিষয়বস্তুর জন্য ধরা হয় ১২ নম্বর ও বাণীবিন্যাস তথা স্টাইলের জন্য ধরা হয় ৮ নম্বর। কিন্তু এমনই মজার ব্যাপার যে, নিরঙ্কুশ স্টাইলের জন্য শতকরা প্রায় ৯০ জনই পায় শূন্য নম্বর আর বিষয়বস্তুর জন্য অনেকেই পায় ৫।৬ নম্বর। ফলে প্রবন্ধের ২০ নম্বরের মধ্যে অনেকেরই অদৃষ্টে একুনে ঐ ৫।৬ নম্বরই মিলিয়া থাকে। তাই বলি,—'কিমাশ্চর্যমতঃপরম্'!

প্রবন্ধকারের দুইটি সমস্যা

## ॥ তিন ॥

লেখক সেই বিষয়টিকে লইয়াই মনের মত একটা প্রবন্ধ রচনা করিতে সমর্থ হন, যাহার সম্পর্কে তাঁহার কিছু জানা আছে, যাহার সম্পর্কে তাঁহার কিছু কৌতূহল আছে, যাহার ভিতরকার সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বেশ একটি জোরালো অভিমতও পোষণ করেন। কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের চারপাশের জগৎ সম্পর্কে জানে খুব

কমই—মনের মত প্রবন্ধ-রচনার উপযোগী বিষয়বস্তুর ভাণ্ডারীও তাহারা নয়। তাই দেখা যায়, পরীক্ষাগৃহে ছাত্রছাত্রীরা অপরিচিত প্রবন্ধ দেখিয়া ঘাব্ড়াইয়া যায়। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, প্রবন্ধলিখন-বিদ্যার একটি অন্যতম লক্ষ্যই হইতেছে নিজের একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জগৎকে বুঝা। উত্তরজীবন গড়িয়া তুলিবার পক্ষে যে সকল বিষয়বস্তু পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীদের অধিগত, তাহাদেরই সম্পর্কে তাহারা বেশ প্রাণ ভরিয়া লিখিতে পারে। কেন না,—এই সম্পর্কে বলিবার উপকরণে তাহাদের মনটি খুবই সমৃদ্ধ। সুতরাং জগৎ সম্পর্কে জানিতে হইলে আলোচ্য বিষয়মাত্রেরই পরিপ্রেক্ষিতে যে তথ্য ও ভাবমণ্ডল আছে, তাহা জানিবার জন্য মনটিকে সর্বদাই উন্মুখ করিয়া রাখিতে হয়। তারপর মনের কষ্টিপাথরে বিষয়গত সমস্যার সমাধানটিকে উপলব্ধি করিতে হয়। সমাধানে অগ্রসর হইতে হইলে প্রবন্ধের উপাদান তথা মালমশলার নির্বাচন-প্রক্রিয়ার দুইটি স্তর লক্ষ্য করা দরকার। **প্রথম স্তর হইতেছে—যথাযোগ্য মালমশলার যোগাড় অর্থাৎ ভাবসংগ্রহ এবং দ্বিতীয় স্তরটি হইতেছে যথাসাধ্য আহৃত ঐ উপাদান-নিচয়ের মধ্যে প্রাসঙ্গিক ও সংগত সামগ্রীমাত্রেরই নির্বাচন অর্থাৎ ভাবসজ্জা।**

প্রবন্ধের মালমশলা নির্বাচনপ্রক্রিয়ার দুইটি স্তর

ভাবসংগ্রহ ব্যাপারটিকে আর কিছু না বলিয়া অনেকটা প্রণালীরূপে, অনেকটা সুশৃঙ্খল বিন্যাস বা পদ্ধতিরূপে দেখাই সংগত। ভাবানুসন্ধান, মনের গোপন মণি-কোঠার খবর বাহির করা—মোটামুটি প্রণালীসম্মত ভাবে করা যাইতে পারে। যখন কোন প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিবে, তখনই ইহার সম্পর্কিত যত-কিছু প্রশ্ন তোমার মনে জাগে, তাহা লইয়া মানসগত একটা জিজ্ঞাসার পটভূমিকা রচনা করিবে। শিরোনামটি লইয়া এইভাবে ভাবিতে শুরু কর—'বিষয়টি কি ?···ইহা ভাল, কি মন্দ ?···ইহা কি আমার পছন্দসই ?···অন্যান্য লোকেও কি ইহাকে পছন্দ করে ?...ইহা কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ?···'এমনি করিয়া একটির পর একটি প্রশ্ন তুলিয়া জিজ্ঞাসার একটি পরিবেশ গড়িয়া তোল।

প্রথম স্তর—প্রবন্ধের ভাবসংগ্রহ-পদ্ধতি

আচ্ছা, একটা দৃষ্টান্তই দেওয়া যাক্। ধর, তোমার প্রশ্নপত্রে একটি প্রবন্ধের শিরোনাম দেওয়া আছে। এই প্রবন্ধটির নাম—'কলিকাতার রাস্তা'। উপর উপর দেখিতে গেলে বলা যায় যে, বিষয়টি বড়ই অস্পষ্ট, বড়ই নিষ্প্রভ, বড়ই দুর্বল। কেন না, —এই প্রবন্ধটি লিখিবার প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু জড়াইয়া আছে। আমাদের প্রাত্যহিক

জীবনের অভিজ্ঞতাই এই প্রবন্ধের তথ্যভাণ্ডারী। সুতরাং খোলা মন লইয়া একবার এই প্রবন্ধটির পটভূমিকা তুমি রচনা করিবার চেষ্টা কর তো দেখি। নিজেকে এইভাবে প্রশ্ন করিতে থাক—'রাস্তা জিনিসটা কি?...আচ্ছা, কাহার সঙ্গেই-বা ইহার তুলনা মিলে?...কলিকাতার রাস্তা ছোট, মাঝারি, বড়—এমন করিয়া নানা আয়তনের কেন?... এই বৈসাদৃশ্য এই বৈচিত্র্যের কিই-বা উদ্দেশ্য?...কেমন করিয়া এই রাস্তাগুলি নির্মিত হয়?...কলিকাতার রাস্তায় পথিকেরা পথ চলে কেন?...তাহাদের মতে, 'ভাল রাস্তা' কোন্‌টি এবং কেন?...হয়তো-বা এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে যে রাস্তাটি 'ভাল রাস্তা', অপর শ্রেণীর লোকের পক্ষে তাহাই 'খারাপ রাস্তা'—এইরূপ ধারণাবৈষম্য ঘটিবার কারণ কি?...বিভিন্ন যানবাহনের সজ্জায় সজ্জিতা কলিকাতানগরীর রূপবৈচিত্র্য কিরূপ?...কলিকাতার রাস্তায় কোন সময়ে বা কোন ঋতুতে চলাফেরা করিতে আমার অন্তর বিষিয়ে ওঠে কি, বিতৃষ্ণায় ভরিয়া যায় কি?...যদি হয়ই তো কেন হয়?...কোন বিশেষ রাস্তার চিন্তা কি আমাকে উত্তেজিত করে?...দিনের কলিকাতার রাস্তা আর রাতের কলিকাতার রাস্তা কি একই ভাব পথিকের মনে সঞ্চারিত করে?...যদি একই ভাব সঞ্চারিত না করে তো কি ভাববৈষম্য পথিকের মনে জাগায় এবং কেন?...কলিকাতার অনেক রাস্তাই তো পরিচিত—এই পরিচিত রাস্তাগুলির মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং কোন্‌টি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট?...উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট রাস্তার মধ্যে পার্থক্য কিরূপ?..."এই রকমের প্রশ্নপরম্পরার গুণে প্রবন্ধরচনার বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি সংগৃহীত হইয়া গেলে মানব জীবনে রাস্তার কি মূল্য, তাহাই একবার ভাবিয়া দেখ তো...'ভ্রমণের জন্যই পথের সৃষ্টি—কিন্তু কেন লোক পথ চলে, কেনই-বা ভ্রমণ করে? কেহ-বা চলিয়াই আনন্দ পায়, পথই হয় তাহার আনন্দের উৎস...কেহ-বা পথ চলে দুঃখের বোঝা অন্তরে বহিয়া...আবার কেহ-বা পথ চলে ব্যবসায় বাণিজ্যের, কাজ-কর্মের প্রয়োজনে।... ইত্যাদি ইত্যাদি'। অতঃপর এহেন ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতার রাস্তাও যে বহুকালের সুখদুঃখ, হর্ষবিষাদ, আনন্দবেদনার এক নীরব সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এই কথাটি তোমার মনের গভীরে আঁকিয়া যাইবে।

'কলিকাতার রাস্তা' এই প্রবন্ধটিকে লইয়া ভাব-সংগ্রহের পদ্ধতি প্রদর্শন

এমনি ভাবে মনের ভিতরে টানিয়া আনিলেই দেখিতে পাইবে যে, তোমার মন কলিকাতানগরীর রাস্তার স্মৃতির মাঝে বেশ আনাগোনা করিয়া এমন অনেক ভাবসম্পদ আহরণ করিয়াছে, যাহার বলে তুমি ইচ্ছা করিলে একখানি পূর্ণাবয়ব পুস্তকও রচনা করিতে পার। আহৃত এই ভাবসম্পদসমূহের মধ্যে কলিকাতার রাস্তাসম্পর্কিত সহজে দৃষ্টিগোচর কিছু কিছু সামগ্রী থাকিলেও এমন অনেক সামগ্রীও থাকিবে যাহা

কেবলমাত্র তোমারই ভাব ও ভাবনারাজ্যে বিদ্যমান। অতঃপর প্রবন্ধের এই খসড়া সামগ্রী, যাহা তোমার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে কাগজে একটু টুকিয়া রাখ এবং এই বিক্ষিপ্ত এলোমেলো উপাদানগুলিরই মধ্য হইতে একটি সুসমঞ্জসীভূত সুবিন্যস্ত যুক্তিধারা প্রতিষ্ঠা কর, যাহা অনুসরণ করিবামাত্রই পাঠক-পঠিকার মন কৌতূহলে যাইবে ভরিয়া, সরসতায় যাইবে মজিয়া।

ভাবসংগ্রহের পদ্ধতিতে স্বকীয়ত্বের ছাপ

ভাবসংগ্রহের পরেই আসে ভাবসজ্জার কথা। আহৃত মালমশলার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়, আর কোন্‌টিই-বা বর্জনীয়? এই ব্যাপারটি ঠিক করিতে পারিলেই ভাবসজ্জা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। মনের গভীরে যে সকল ভাব ও ভাবনা উদিত হয়, তাহাদিগকে এলোমেলো ভাবে ঠাসাঠাসি যুক্তি-পরম্পরা রচনা করা খুব সহজ কথা নয়।

দ্বিতীয় স্তর—ভাবসজ্জা

বিভিন্ন মাসিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা, দৈনিক পত্রিকার রচনাপদ্ধতির কথাই ধরা যাক্ না কেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকরা কেবলমাত্র নিজেরই দৃষ্টীভঙ্গী প্রকাশ করেন না, পক্ষান্তরে জনসাধারণ যাহা পছন্দ করে তাহা জানিয়া লইয়াই তাঁহারা প্রবন্ধ রচনা করিয়া থাকেন। পাঠকসাধারণের মতানুসারী মন্তব্য যে শুধু নির্বাচন করিতে হয় তাহা নয়, সেই মন্তব্যের পরিপোষক তথ্য আহরণ এবং নির্বাচন করিতে হয়। 'সত্য, সমগ্র সত্য, সত্য ছাড়া অন্য কিছু নয়'—এই মূল নীতিবাক্যের উপর আধুনিক সাংবাদিকের ধর্ম নির্ভর করে না, পক্ষান্তরে 'যে সত্য আমি দেখি অথবা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের রুচিসংগত যে-সত্যটি প্রতীয়মান' তাহারই উপরে আধুনিক সাংবাদিকের ধর্ম কেন্দ্রিত। অবশ্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া ইহা আমি বলিতে চাই না যে, আধুনিক সাংবাদিকের পদ্ধতিকে পুরাপুরি অনুসরণ করিয়া তুমি প্রবন্ধ-রচনায় অগ্রসর হও, পক্ষান্তরে এ প্রসঙ্গের মধ্য দিয়া ইহাই আমি বলিতে চাই যে, কি করিয়া প্রচুর মালমশলার পাহাড় হইতে কৌতূহলোদ্দীপক অংশবিশেষ বাছাই করিয়া পাঠকগোষ্ঠীর জন্য প্রবন্ধ লেখা যায়, এই সূক্ষ্ম শিল্পবোধটি আধুনিক সাংবাদিকের নিকট হইতে শিক্ষা করা যাইতে পারে।

সাংবাদিকের ভাবসজ্জার বৈশিষ্ট্য

যখনই কোন প্রবন্ধের শিরোনাম তোমায় দেওয়া হয়, তখন ইহাকে সাধারণ নিয়মগত একটা ধুঁয়ার পরিবেশে দেখিবার চেষ্টা করিও না। 'দেশ ও নেতা, সম্পর্কে তোমাকে প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। বেশ, ভাল কথা। দেশকে তুমি নিজে যে-দৃষ্টিতে

দেখিয়া থাক আর তুমি নিজে যে সকল নেতাকে চোখে দেখিয়াছ—তাঁহাদের কথা ভাবিতে সুরু কর। 'বেতার ও বর্তমান জগৎ' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে। বেশ তো। বেতারবার্তা তো অনেক সময়েই শুনিয়া থাক, বেতারবার্তায় যাহা শুনিতে পাও তাহা তোমার ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে, এমন কি আন্তর্জাতিক জীবনেও কি প্রভাব সূচিত করিয়া থাকে, ইহাই একবার গভীরভাবে মনের মাঝে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা কর। ধর, 'শিয়ালদহ ষ্টেশনের রেখাচিত্র', কি 'সাঁঝের চৌরঙ্গীর ভাষাচিত্র' রচনা করিতে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতেই বা ঘাব্ড়াইবার কি আছে? তোমার নিজের মনটিকে 'শিয়ালদহ ষ্টেশনে'র গণ্ডির মাঝে অথবা 'সাঁঝের চৌরঙ্গী'র পাশে টানিয়া লইয়া গিয়া সব-কিছুকে বেশ একটু সরস ও সূক্ষ্ম মানসদৃষ্টির সাহায্যে ছাকিয়া লইয়া লিখিতে শুরু কর। 'বাংলার পল্লী' সম্পর্কে কোন প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। তাহাতেই-বা চিন্তার কারণ কি? তোমার নিজের পল্লী কিংবা তোমার পরিচিত অন্যান্য পল্লীর কথা ভাবিতে শুরু কর। দেখিবে, সেই চিন্তার মধ্য দিয়া প্রবন্ধরচনার অনেক মালমশলা তোমার আয়ত্তের ভিতর আসিয়া পড়িবে।

প্রবন্ধাদির ভাবসংগ্রহে ও ভাবসজ্জায় ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর কৌলীন্য রক্ষা করিবার পদ্ধতি

এইভাবে যে সকল প্রবন্ধ তোমার নিজের ধারণাশক্তি, নিজের অভিজ্ঞতার নিবড়তার মধ্যে পড়ে, সেগুলিকে তোমার নিজস্ব বোধ ও অনুভূতির স্রোতে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিবে। কেন না,—তোমার এই যে ভাব ও ভাবনা, ইহা প্রবন্ধকে এক দিক দিয়া যেমন বাস্তব পরিচ্ছদ পরাইবে অপর দিক দিয়া তেমনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর স্পন্দনে স্পন্দিত করিয়া তুলিবে। যে বিষয়টি ধারণার ও জ্ঞানের বহির্ভূত, সেখানে অপরের চিন্তাধারা অনুসরণ না করিয়া উপায় থাকে না, কিন্তু যাহা নিজের অনুভূতি ও বোধের অন্তর্গত তাহাকে কোন প্রবন্ধ হইতে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিবে না। হয়তো-বা 'রেলপথে ভ্রমণ' সম্পর্কে কাহারও লেখা কোন প্রবন্ধ তুমি পড়িয়াছ। 'রেলপথ মানবের জীবনে এক পরম আশীর্বাদ'—ঐ প্রবন্ধকারের এই মন্তব্যটি তোমার কাছে এতই ভাল লাগিয়াছে যে, শিথিলতানিবন্ধন তুমিও ঐ কথা বলিয়াই তোমার প্রবন্ধটি আরম্ভ করিয়া দিলে। কিন্তু একথা জানিয়া রাখিও যে, রেলপথ সম্পর্কে ভাবিতে বসিয়া কোনও জ্ঞানী হৃদয়বান্ ব্যক্তিই ঐ ভাবের ভাবনায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে না। বরং সেই সুধী ব্যক্তির ভাব ও ভাবনায় যাহা চমৎকারিত্বের আমেজ সংক্রামিত করিতে পারে, তাহা এইরূপ: 'প্রভাতরবির রশ্মিতে উজ্জ্বল ইস্পাতের রেলপথ··· ইঞ্জিনের শব্দ ও ধুঁয়া······দ্রুতগামী ট্রেনের চাপে ধরণীর মর্মস্পর্শী শিহরণ······

হয়তো-বা নিদাঘতাপে তাপিত দিনে কষ্টসাধ্য ভ্রমণ······দিগন্ত আচ্ছাদনকারী ধুলি··· ষ্টেশনের অখাদ্য ও কুখাদ্য খাবার সম্পর্কে নিজস্ব অভিজ্ঞতা······ইত্যাদি ইত্যাদি।' এই কথাটি সর্বদা মনে রাখিও যে, **নিজের অভিজ্ঞতা ও ধারণাই প্রকৃত প্রবন্ধ-লিখনের উপাদান; পুরাতন একঘেয়ে মন্তব্য দিলে নিজের চিন্তার জড়তাই প্রকাশ পায়।** এই কথাটি ছাত্রছাত্রীদিগকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, **স্বীয় ভাব ও ভাবনাকে এড়াইয়া গেলে প্রবন্ধ-রচনাশিল্পের আত্মধর্মকেই করা হয় অস্বীকার।**

অবশ্য যখন প্রবন্ধ-রচনার সংকেত-সূত্র প্রশ্নপত্রে দেওয়া থাকে, তখন ভাব-সংগ্রহ অনেকখানি সহজসাধ্য হয় সত্য, কিন্তু ভাবসজ্জায় ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর কৌলীন্য বজায় রাখা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, রচনার সাধারণ সংকেত-সূত্র থাকিলেই পরীক্ষার্থী-পরিক্ষার্থিনীরা আর মাথা খেলাইতে চাহে না। ঐ সংকেত-সূত্র অবলম্বন করিয়া প্রতিটি সংকেতের ভাব প্রসারণ করিয়া এবং সংকেত-পরম্পরার মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ না রাখিয়া প্রবন্ধ-রচনা কারতেই সাধারণতঃ পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীরা অভ্যস্ত। ফলে চিন্তাভাবনাহীন, শিথিলবিন্যস্ত, যুক্তিলেশবিহীন, একঘেয়ে প্রবন্ধই বস্তুতঃ পরীক্ষামণ্ডপে রচিত হইয়া থাকে। ধর, তোমাদের প্রশ্নপত্রে যে প্রবন্ধটি

সংকেতসূত্র-সংবলিত প্রবন্ধ-রচনার পদ্ধতি

রচনা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার নাম 'বাংলা দেশে ছাত্রসংঘ-প্রতিষ্ঠান' এবং রচনাকল্পে যে সংকেত-সূত্র রহিয়াছে তাহা এইরূপ: 'স্কুল-কলেজে ছাত্রসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও নীতিগত আদর্শ—ছাত্রজীবনের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ—ইহার দ্বারা ছাত্রসমাজের ঐক্যবোধ ও স্বাবলম্বনশক্তি কতটা স্ফুরিত হয়—ইহার হিতকর ও অনিষ্টকর দিক—বর্তমান অবস্থায় ইহার মৌলিক আদর্শের আংশিক বিকৃতি—ছাত্রদের মধ্যে বিভেদপরায়ণতার প্রবণতা পুষ্টি—স্বাধীন দেশে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কিরূপ আদর্শে পরিচালিত হওয়া উচিত।' এই সংকেত-সূত্রের মধ্যে মোট সাতটি সংকেত আছে। এই সাতটি সংকেতের প্রতিটি সংকেতের জন্য একটি করিয়া অনুচ্ছেদ এবং প্রতিটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় যোগসূত্র রচনা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিবে, যেখানে রচনার সংকেত-সূত্র দেওয়া থাকে, সেখানে তাহা অনুসরণ না করিয়া লিখিলে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীরা দণ্ডপ্রাপ্ত হয়। এই প্রবন্ধটির যে সংকেত-সূত্র আছে, তাহার সহিত তোমার 'কলেজের ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন'-এর কার্যাবলী একটু মিলাইয়া দেখিলে এবং তোমার নিজস্ব চিন্তাধারা আরোপ করিলেই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর কৌলীন্য প্রকট হইবে। অতঃপর তোমার সমগ্র বক্তব্য ঐ 'ছাত্রসংঘ প্রতিষ্ঠান' বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া যাহাতে পরিস্ফুট হয়,

সে দিকে লক্ষ্য রাখিলেই প্রবন্ধরচনা-কর্মটি একটি অখণ্ড সৌষ্ঠবময় রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিবে।

সময়ে সময়ে প্রশ্নকর্তা নির্দিষ্টসংখ্যক শব্দ লইয়া প্রবন্ধ-রচনা করিবার নির্দেশ দিয়া থাকেন। হয়তো-বা ৩০০।৩৫০ শব্দ লইয়া কোন প্রবন্ধ রচনা করিতে বলা হইল। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীরাই যাহাতে ভাব ও ভাষার সংযম রক্ষা করিয়া সুন্দর সুঠাম সুবলিত ব্যঞ্জনাময় প্রবন্ধ রচনা করে, তাহাই দেখা হয়। সংযম সকল শিল্পকর্মেরই বাহন, একথাটি সবদা মনে রাখিতে হইবে। অনেক-কিছু জানা আছে, অনেক-কিছুই লিখিবার জন্য অন্তর ব্যাকুল হইতেছে, অথচ প্রশ্নকর্তার নির্দেশানুযায়ী নিদিষ্টসংখ্যক শব্দ অতিক্রম করিবার উপায় নাই, এক্ষেত্রে বাঁধনের মধ্যে থাকিয়া যদি রচনাকর্ম সুসম্পন্ন করিতে পারা যায়, তবেই তো বাহাদুরি।

*নির্দিষ্টসংখ্যক শব্দ লইয়া প্রবন্ধ-রচনার কথা*

## ॥ চার ॥

প্রবন্ধ লিখিবার আগে একটি বিষয়ে সজ্ঞান থাকা দরকার। কোন্ শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা তোমার প্রবন্ধের লক্ষ্য—এই বিষয়ে তোমার সম্যক্ ধারণা থাকা চাই। এই ধারণা না থাকার জন্যই অনেক প্রবন্ধ অস্পষ্টভাবে লিখিত হয় এবং পড়িতেও হয় ক্লেশদায়ক। কারণ,—নিছক শূন্যবিলম্বী যে প্রবন্ধ-রচনা, তাহাতে কোন পাঠক-পাঠিকাই উদ্দিষ্ট নয়। কিন্তু একটু ভাবিলেই টের পাওয়া যায় যে, বিষয়বস্তু ছাড়া যেমন কিছু লেখা যায় না, তেমনি পাঠক-পাঠিকাকে অস্বীকার করিয়াও লেখা চলে না। নিজেকে প্রকাশ করাই যদি হয় লেখার উদ্দেশ্য, তাহা হইলে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রকাশের ব্যাপারটি তাহাও লেখকের জানা থাকা উচিত। যাহাই তোমার বক্তব্য হোক না কেন, তাহা একান্তভাবে নির্ভর করে তোমার লেখার লক্ষ্য ঐ পাঠক-পাঠিকারই উপরে। পাঠক-পাঠিকাকে অস্বীকার করিয়া লেখা চলে না। অবশ্য পরীক্ষা 'হলে' যে প্রবন্ধ লিখিতে হয়, তাহার লক্ষ্য প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষক বা পরীক্ষিকাই সত্য, কিন্তু প্রবন্ধের মালমশলা সংগ্রহ ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই কথাটি সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, পরীক্ষক বা পরীক্ষিকা ছাড়া পরোক্ষভাবে আরও অনেক বুদ্ধিমান ও সুধী ব্যক্তির জন্যই যেন তোমার প্রবন্ধটি লিখিত।

*পাঠকসমাজের প্রবন্ধের লক্ষ্য*

একটি নূতন বাড়ি তৈয়ার করিতে হইলে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়া যায় তাহার নক্সা করিতেই। কামরাগুলির যথাযথ সন্নিবেশ, দরজা-জানালাগুলিকে যথাস্থানে

স'নো, এমন কি নানাবিধ দেওয়াল ও মেঝে তৈয়ার করিবার ব্যাপারে কতটুকু রিমাণ মালমশলা লাগা সম্ভব, তাহারও একটা বরাদ্দ করিয়া গৃহস্থকে জানাইয়া ওয়া হয়। সত্য কথা বলিতে কি, নক্‌সা ছাড়া সামান্য একটা রান্নাঘরও তৈয়ার করা ঠিন। প্রস্তাবিত নূতন বাড়ির সমগ্র কাঠামোটির একটা নক্‌সা যদি বেশ যত্ন ও তকতা-সহকারে কাগজের উপরে আঁকিয়া না লওয়া হয় তো ইটের পর ইট গাথিয়া শেষ অবধি এক মারাত্মক অবস্থারই সম্মুখীন হইতে হয়। হয়তো-বা নূতন বাড়ি তৈয়ার হইবার পরে টের পাওয়া যায় যে, বাড়িটি আদৌ বাসযোগ্য নয়—তাহার নানা গলদ, নানা অব্যবস্থা, নানা প্রতিবন্ধক। আবার এমনও হইতে পারে যে, বাড়িটি সম্পূর্ণরূপে শেষ হইবার আগে গৃহস্থের আর্থিক অভাবহেতু উহা অসমাপ্তই যায়। ঠিক এইরূপেই প্রবন্ধরচনারও আছে পরিকল্পনা, আছে খসড়া, নক্‌সা। যুক্তির নানা স্তর, একটি যুক্তিসূত্র হইতে অপর যুক্তিসূত্রে পৌঁছাইয়া যাওয়া—এই ব্যাপারটি সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে প্রবন্ধ-রচনার একটা খসড়া তৈয়ার করা দরকার। সকল পদ্ধতিকে অতিক্রম করিয়াই হয় প্রতিভার প্রকাশ—কেহ কেহ এই কথা বলিয়া হয়তো-বা শৃঙ্খলাসম্মত ব্যক্তি-কে আমল দিতে চাহিবেন না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ব্যক্তিমাত্রেরই মানসে আপাতদৃষ্টিতে কোন নির্দিষ্ট প্রণালী দেখা না গেলেও, ইহা গভীর ভাবেই অনুভব করা য যে, একটি নির্দিষ্ট রীতিই প্রতিভাধরদিগের অন্তরে প্রবাহিত থাকে। একথা খুবই ত্য যে, বড় বড় চিন্তাশীল লোকমাত্রেই শৃঙ্খলাসম্মত ভাবে চিন্তা করেন। ইঁহারা হাঁদিগের প্রবন্ধের জন্য কোন 'পরিকল্পনা' না করিতে পারেন, কিন্তু খসড়া না রিবার কারণ হইতেছে এই যে, ইঁহাদের মনটিই আসলে সু-পরিকল্পিত। সুতরাং আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাধর হইবার দাবি করেন না, কোন-কিছু লিখিবার আগে তাঁহাদিগকে লেখার কাঠামোটি সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত হইতে হইবে—এই বলিতে চাই। অনুশীলন বা অভ্যাস যখন বেশ পাকাপোক্ত হইয়া যায়, তখন কাগজে কোন খসড়া না করিয়াই প্রবন্ধ লিখিতে পারা যায়। কারণ—খসড়াটি কাগজে লিখিত না থাকিলেও মনের নয়নে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যে প্রথম শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনী, যাহার মনে বিষয়গত কত কত সমস্যাই-না ঘা দিয়া থাকে, তাহাকে সম্যকরূপে এবং সুস্পষ্টভাবে প্রবন্ধের খসড়াটি করিয়া ও তাহারই অনুসরণ করিয়া যত্নসহকারে রচনাকর্মটি সম্পন্ন করিতে হইবে

প্রবন্ধ-রচনার খসড়া বা পরিকল্পনার অনিবার্যতা

অতএব, প্রবন্ধ কেমন করিয়া লিখিতে হয়—এই অতিপরিচিত প্রশ্নের উত্তরে আমরাই বলিতে চাই যে, রচনা-ব্যাপারটি একটি ধারাবাহিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ

করে। এই ধারাবাহিক ক্রিয়ার যে পাঁচটি স্তর আছে তাহাই অনুসরণ করিবে প্রথমতঃ, প্রবন্ধের শিরোনামটি কি অর্থ বহন করে, তাহা বুঝিয়া লও। কিন্তু এমনি মজার ব্যাপার যে, এই প্রথম স্তরটিকেই ছাত্রছাত্রীরা দারুণ উপেক্ষা করিয়া থাকে দ্বিতীয়তঃ, প্রবন্ধের মালমশলা আহরণ কর। তৃতীয়তঃ, এই মালমশলাগুলির মধ্যে যেগুলি তুমি ব্যবহার করিতে চাও, মাত্র সেইগুলিই নির্বাচন কর। চতুর্থতঃ, নির্বাচিত মালমসলাগুলিকে লইয়া একটা লক্ষ্যকেন্দ্রিক অবয়বের মাঝে সাজাইয়া রাখ অর্থাৎ সোজা কথায় একটি খসড়া তৈয়ার কর। পঞ্চমতঃ, এবার তোমার প্রবন্ধটি লিখ। অর্থাৎ পর পর চারিটি ধাপ অতিক্রম করিয়া তোমার নির্বাচিত ভাব ও ভাবনাকে একটি প্রকৃষ্ট বন্ধনের মধ্যে বাঁধিয়া রাখ। আর এইরূপ করিতে পারিলেই তো 'প্রবন্ধ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও ফুটিয়া উঠিবে। তাই বলি,—নিছক প্রবন্ধলিখন ব্যাপারটি একটি সমগ্র ধারাবাহিক ক্রিয়ার পাঁচটি স্তরের একটি স্তরমাত্র। প্রথম চারিটি স্তর যদি তুমি সম্যকরূপে এবং মানসিক নৈপুণ্যসহকারে অতিক্রম করিতে পার তো শেষ স্তরটি অর্থাৎ নিছক প্রবন্ধলিখন ব্যাপারটি তোমার কাছে অতীব সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে। অবশ্য রচনার ভাষারীতি সম্পর্কে যদি তোমার দক্ষতা থাকে, তবেই তাহা সম্ভব।

প্রবন্ধ-রচনার মূলে আছে একটি ধারাবাহিক ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ার আত্ম-প্রকাশ ঘটে পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়া

কোন্ শ্রেণীর অট্টালিকা নির্মাণ করিতে হইবে—এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াই যেমন স্থপতিকে নক্সা করিতে হয়, তেমনি কোন প্রবন্ধের খসড়া রচনা করিবার আগে তুমি তোমার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও যে, প্রবন্ধটিতে তুমি কি কি করিতে চাও। কেন না,—ভিন্ন ভিন্ন জাতের প্রবন্ধের লক্ষ্যও ভিন্ন ভিন্ন। ধর প্রবন্ধটি যদি হয় 'ভারতীয় সভ্যতার প্রাণধারা গঙ্গা'র উপর, তাহা হইলে এই প্রবন্ধের শিরোনামটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিয়া লইয়া ধারাবাহিক ক্রিয়াটি ঠিক করিয়া লও। বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধটির লক্ষ্য হইতেছে কাহারও কাছে কিছু বর্ণনা করা। সুতরাং তুমি তোমার নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও যে, কোন্ কোন্ জিনিস তুমি বর্ণনা করিতে চাও এবং কাহার কাছে? কিংবা ধর, প্রবন্ধটি যদি হয় 'আমাদের শিক্ষা-সংস্কারের'র উপরে, তাহা হইলে এই বিতর্কমূলক প্রবন্ধ লিখিবার সময় সর্বদাই এই কথাটি মনে রাখিবে যে, তুমি কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া কিছু একটা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইতেছ। কিন্তু কি প্রমাণ কবিবার চেষ্টা করিতেছ এবং কাহার কাছেই-বা এই প্রমাণ করিবার প্রয়াস? —এই প্রশ্নটি নিজের কাছে করিয়া তুমি তোমার যথাকর্তব্য স্থির কর। অথবা ধর,

নানা জাতের প্রবন্ধের নকসা রচনা করিবার পদ্ধতি

'ফট্‌কি-নাট্‌কির ওজর'—ইহারই উপর প্রবন্ধ লিখিতে বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই রচনাধর্মী প্রবন্ধে কোনরূপ বর্ণনা বা কোনরূপ প্রমাণ করিবার অবকাশ নাই—এখানে ব্যক্তির চিত্তবিনোদনই একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব, এইরূপ প্রবন্ধ-রচনার কালে তোমার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও যে, ঠিক কি ভাবে তুমি চিত্তবিনোদন করিবার জন্য অগ্রসর হইবে।

সময়ে সময়ে এমন প্রবন্ধও রচনা করিতে বলা হয়, যাহার সম্পর্কে বলিবার অনেক-কিছু থাকে। এই অনেক কিছু বক্তব্য থাকায়, পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীরা খেই হারাইয়া ফেলে। কিন্তু খেই হারাইলে তো আর চলিবে না। লিখিতে তো হইবেই। একটা দৃষ্টান্তই লওয়া যাক্। ধর, 'বাংলার পল্লী'—ইহারই উপরে তোমাকে একটি প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। পল্লীজীবনের যে বৈশিষ্ট্য তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং অপরের মনোযোগও ওতপ্রোতভাবে, অথচ খুব সহজেই, আহ্বান করিয়া থাকে, তাহারই মধ্যে তোমার প্রবন্ধের ভাব ও ভাবনাকে গড়াইয়া দিবে। প্রবন্ধের মালমশলাকে ধাপের পর ধাপ ধরিয়া এমনভাবে সাজাও, যাহাতে দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে পল্লীকথা স্বাভাবিক এবং ন্যায়সংগত রূপে আগাইয়া যায়। যদি তুমি পল্লীদৃশ্যের বিনম্র প্রশান্তির দিকটাই ফুটাইয়া তুলিতে চাও তো নীরব মাধুর্যে-ভরা দৃশ্যগুলিকেই এক সাথে জড় কর এবং তাহারই সঙ্গে পল্লীর জীবন্ত দৃশ্যগুলিকে তুলনা করিয়া তোমার অন্তরের মূল কথাটিকে ফুটাইয়া তোল। অথবা, ধর তুমি পল্লীর সহজ জীবনটাকেই বর্ণনা করিতে চাও। তোমার এই বিশেষ মনোভাবটিকে কি ভাবে প্রবন্ধের স্তর-পরম্পরায় প্রকটিত করিয়া তুলিবে বল তো? ··কিন্তু করা আদৌ কঠিন নয়। পল্লীর রাস্তাঘাট, হাট-বাজার, ঘরবাড়ী হইতে শুরু করিয়া পল্লীবাসীর পোশাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব, আচার-ব্যবহার, জীবনধারার মধ্যে যে অপরিমেয় সারল্য ছড়াইয়া আছে তাহাকে ফুটাইয়া তোল। অগণিত পল্লীবাসী জনসাধারণের এই বিরাট সারল্যের সুযোগ লইয়াই হয়তো-বা দারিদ্র্য, সামাজিক পদমর্যাদা অস্পৃশ্যতা আজ পল্লীজীবনকে তচ্‌নচ্‌ করিতে উদ্যত। অতঃপর তুমি তোমার প্রবন্ধের ক্রিয়াস্থলের আয়তন বাড়াইবার জন্য অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সাম্প্রতিক হরিজন-আন্দোলন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক দিয়া পল্লী-উন্নয়ন-কথা বলিয়া সহজ সরল স্বচ্ছন্দ পরিষ্কৃত এবং শিক্ষাস্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল আদর্শ পল্লীর চিত্র তোমার প্রবন্ধে পরিস্ফুট কর। কিন্তু একটি কথা। প্রবন্ধের মধ্যে যাহা কিছুই বল না কেন, পল্লী-জীবনের সারল্য দেখানোই এই রচনাকর্মের উদ্দেশ্য।

প্রবন্ধের প্রভূত মালমশলার মধ্য হইতে কি করিয়া প্রয়োজনীয় মালমশলা নির্বাচন করিতে হয়

বর্ণনামূলক প্রবন্ধের সব চেয়ে বড় ত্রুটি হইতেছে এই যে, কোন অতি-নির্দিষ্ট যোগসূত্র বজায় না রাখিবার ফলে ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময়েই একটি নীরস তালিকা, একঘেয়ে পঞ্জিকা রচনা করিয়া বসে। এই একঘেয়ে তালিকা রচনা করিবার দুর্বুদ্ধি পরিহার করিবার একটিমাত্র সহজ উপায় আছে। তাহা হইতেছে—বর্ণিতব্য বিষয়-বস্তুর কোন বিশেষ গুণকে ধীরে ধীরে সব-কিছুর মধ্য দিয়া প্রতিফলিত করিয়া তোলা। এইরূপ করিতে পারিলে অযথা-বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলিকে একটি সূত্রে গাঁথিতে পারিবে, তোমার প্রবন্ধটিকে সহজপাঠ্য এবং সহজসাধ্য করিতে পারিবে, প্রবন্ধের মাঝে একটি স্পষ্ট মনোভাব ফুটিয়া উঠিবে। শুধু তাহাই নয়। পাঠকমনের উপর বেশ একটি স্থায়ী ছাপও রাখিতে পারিবে। একথা স্মরণ রাখিও যে, প্রবন্ধের গোড়া হইতে যাহাই পড়িয়া আসা যাক্ না কেন, কাহারও মনে সে সকল কথা থাকে না—বিশেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার এক গাদা খাতার মধ্যে সমাসীন পরীক্ষক বা পরীক্ষিকার মনে তো নয়ই। তাই যদি তোমার যুক্তি ধারা স্পষ্টভাবে বিবৃত না হয়, তোমার প্রবন্ধের সমগ্র পরিবেশের মধ্য দিয়া যদি তাহা একান্তভাবে উৎসারিত না হয়, তাহা হইলে তুমি যে নিশ্চিত ভাবেই পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় নিরুদ্দেশের যাত্রী বা যাত্রিনী হইবে—একথা বলাই বাহুল্য। আর নিরুদ্দেশের যাত্রায় পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীরা শেষ অবধি অসীম ব্যর্থতাই বরণ করিয়া লয়।

বর্ণনামূলক প্রবন্ধ যাহাতে একঘেয়ে তালিকায় পরিণত না হয়, তাহার কৌশল সম্পর্কে ইঙ্গিত

বিতর্কমূলক প্রবন্ধ লিখিতে হইলে অবশ্য একটু আলাদা ধরণের প্রকাশভঙ্গী অবলম্বন করিতে হয়। ধর, একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলা হইল, তাহার নাম—'ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতিতে যোগদান করা কি সমীচীন?' এখানে এই প্রবন্ধটির সকল দিক দিয়া আলোচনা করিয়া একটা নির্দিষ্ট মনোভাব শেষ অবধি তুমি গ্রহণ করিবে —ইহাই আশা করা যায়। এই সমস্যাটি এমন একটি সমস্যা যে, ইহা রাজনীতিতে অনুরাগী ছাত্রমাত্রেরই সহিত সম্পর্কিত। এই প্রবন্ধে যাহা তোমার বক্তব্য, তাহা বেশ প্রত্যক্ষভাবেই ছাত্রসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া—জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া নয়। এই সমস্যা সম্পর্কে যদি পূর্বেই তুমি বেশ কিছু চিন্তা করিয়া থাক, তাহা হইলে প্রবন্ধটির একটি খসড়া রচনা করিয়া রচনাকার্যটি সম্পন্ন করা খুবই অনায়াসসাধ্য। কিন্তু যদি তুমি এই সমস্যাটি সম্পর্কে কোনরূপ চিন্তা না করিয়া থাক, তাহা হইলে প্রবন্ধ-রচনার পূর্বে তোমার মনোভাবটিকে সর্বাগ্রে স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লও। বুঝিয়া লইবার স্তর-পরম্পরা এইরূপ ঃ

বিতর্কমূলক প্রবন্ধ-রচনার পূর্বকৃত্য—একটি প্রবন্ধ লইয়া আলোচনা

'ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতিতে যোগদান করা কি সমীচীন?'—এই নামটির ঠিক অর্থটিই-বা কি তাহাই নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর। 'ছাত্র' বলিতে কি বুঝ? 'ছাত্রধর্ম'ই বা কি?...' যখন এই সব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর তোমার মনের ভিতরে ফুটিয়া উঠিবে তখনই বুঝিবে যে, রাজনীতি ছাত্রদের পক্ষে ন্যায়সংগত ক্রিয়াকাণ্ড কিনা। সম্ভবতঃ তুমি তোমার মনের মাঝে এই উত্তরটি পাইবে—'যাহারা শিক্ষা করে, যাহারা অনুশীলন করে, যাহারা পড়ে, তাহারাই ছাত্র।' বেশ কথা। আচ্ছা, 'কেন তাহারা শিক্ষা করে? কেনই-বা তাহারা পাঠ করে?' 'উত্তরজীবনে দেশের সেবায়, সমাজের সেবায়, জাতির সেবায় উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবার জন্যই তাহাদের এই শিক্ষা, তাহাদের এই প্রস্তুতি। উত্তরজীবনে বুদ্ধিমত্তার সহিত নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অনেক বিষয়ই ছাত্রদিগের পঠনীয়। অতএব, ছাত্রদের পক্ষে পাঠই একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।'

পূর্ববর্তী বিতর্কমূলক প্রবন্ধের খড়সা রচনা করিবার পদ্ধতি—প্রথম স্তর

অতঃপর রাজনীতিতে যোগদানের প্রশ্নটি কিভাবে তুমি বিশ্লেষণ করিবে, তাহারই পন্থা বাত্‌লাইয়া দিতেছি। 'ছাত্রগণ যদি রাজনীতিতে যোগদানই করে, তাহা হইলে তাহারা কতটুকু অংশই বা গ্রহণ করিতে পারিবে! তাহারা ভোট দিতে পারিবে না; তাহারা পরিষদের সভ্য হইতে পারিবে না; তাহারা রাষ্ট্র-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না; তাহারা শাসননীতিকে প্রভাবান্বিত করিতে পারিবে না। যেটুকু তাহারা করিতে পারিবে, তাহা তো হইতেছে এই—ঝাণ্ডা উড়ানো, রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করিয়া বেড়ানো, প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে 'পিকেট করা', ধর্মঘট চালানো এবং সময়ে সময়ে ছোট-বড় 'স্পিচ্' দেওয়া। এখন কথাটি হইতেছে এই যে, এই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড রাজনৈতিক অবস্থার সত্য তথ্যটিকে সংগ্রহ করিবার পক্ষে কতখানিই-বা সাহায্য করিয়া থাকে, অথবা কতটুকুই-বা জ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত বহন করিয়া আনে? বলা বাহুল্য,—কিছুই না। ভবিষ্যৎ-জীবনে ছাত্রকে যদি নেতা হইতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে জাতির জীবন-গঠনে ও জাতির চিন্তা নিয়ন্ত্রণে কিছু-একটা মৌলিক দান দিতে হইবে। পূর্ববর্তী যুগের নেতারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই তোতাপাখীর মত মুখস্থ বলিয়া কোন লাভ নাই। যতদিন অবধি নিজস্ব, যুগোপযোগী, সুসমঞ্জসীভূত, সুবলিত, দৃঢ়মূল প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত কোন বাণী ছাত্রদের অন্তরে ফুটিয়া না ওঠে, ততদিন তাহাকে পড়িতেই হইবে, ভাবিতেই হইবে। আগে চাই বিদ্যাবুদ্ধির পবিস্ফুরণ, আগে চাই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, তারপর রাজনীতীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ।

পূর্ববর্তী বিতর্কমূলক প্রবন্ধের খড়সা রচনা করিবার পদ্ধতি—দ্বিতীয় স্তর

এই সমস্যাটি সম্বন্ধে তোমার চিন্তা যখন একটা স্পষ্ট আকার ধারণ করিবে, তখনই তোমার যুক্তিগুলিকে পারম্পর্য রক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠা কর। একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী সরাসরিভাবে প্রকাশ করিও না। তোমার দৃষ্টিভঙ্গীকে যাহারা সমর্থন করে না অর্থাৎ যাহারা বিরুদ্ধমতাবলম্বী, তাহাদের দাবিটিকেও তোমায় মিটাইতে হইবে। বিতর্কমূলক প্রবন্ধমাত্রেরই স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিধারা বিশ্লেষণ করিয়া তোমার নিজস্ব মনোভাবটি স্পষ্ট করিয়া তুলিবে—ইহাই তো পরীক্ষক বা পরীক্ষিকা তোমার কাছে আশা করেন। একপেশে যুক্তিধারায় বিতর্কমূলক প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া ওঠে না। মনে রাখিবে, এই জাতীয় প্রবন্ধে বিতর্কের পরিবেশ থাকা চাইই। আসল কথা, সর্বপ্রথমে তোমার প্রাবন্ধিক মনটিকে দ্বৈত সত্তায় বিভক্ত করিয়া ফেলিবে—উভয় সত্তারই মধ্যে চূড়ান্তরূপে প্রতিবাদী মনোবৃত্তি সংক্রামিত করিবে—আবার এই দ্বৈতসত্তার মধ্য দিয়া তোমার নিজস্ব ব্যক্তিগত সত্তাটিকে যেন বিষয়বস্তুর কেন্দ্রগত সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করিতেও সক্ষম হয়। তাই বলি, —আলোচ্য প্রবন্ধটির খসড়া নির্মাণের পূর্বে তুমি বিপরীত যুক্তিধারাও টুকিয়া রাখিতে পার ঃ যেমন—

পূর্ববর্তী বিতর্কমূলক প্রবন্ধের খসড়া-রচনার পদ্ধতি—তৃতীয় স্তর

| রাজনীতিতে যোগদানের স্বপক্ষে যুক্তি | রাজনীতিতে যোগদানের বিপক্ষে |
| --- | --- |
| [ **এক** ] অধিকাংশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাজনীতিতে কিছু-না-কিছু অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। | [ এক ] কিন্তু ছাত্রসম্প্রদায় বুদ্ধিমান হইবার প্রণালী-অনুসরণকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। |
| [ দুই ] ছাত্রেরা সভাসমিতিতে প্রস্তাবাদি 'পাশ' করিয়া জনমতকে প্রভাবিত করিতে পারে। | [ দুই ] কিন্তু ছাত্রদের এই যে প্রস্তাব, ইহা আরও সুন্দর এবং আরও জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিতে পারে, যদি রাজনীতিতে যোগদানেচ্ছু ছাত্রগণ আরও কিছুকাল অবস্থাটিকে পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তির মধ্য দিয়া আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে। |
| [ তিন ] ছাত্রেরা গণসমাবেশকে বেশ ফাঁপাইয়া তুলিয়া রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে। | [ তিন ] কিন্তু অপরিণতবুদ্ধি ছাত্রেরা কেন অপরের নেতৃত্ব স্বীকার করিবে? সভাসমিতি শোভাযাত্রার হুজুগে না মাতিয়া আজিকার ছাত্রেরা যদি প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা আগামী কালের মনস্বী ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রেও মৌলিক দান দিবার সার্থক শক্তি বহন করিতে সক্ষম হইতে পারে। |

তারপর কোন্ দিক দিয়া তুমি যাইবে, ইহা যখনই তোমার মনের মধ্যে বেশ স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিবে, তখনই তুমি একটা খসড়া-পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করিবে। ধর, পূর্বকথিত পর পর তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া আলোচ্য প্রবন্ধটির খসড়া-পরিকল্পনার চরম স্তরটি দাঁড়াইল এইরূপ:—(১) ভূমিকা। সমস্যার প্রকৃতি। প্রায় সকল ছাত্রেরই উপরে কমবেশি ভাবে, বিশেষ করিয়া যে সকল ছাত্র অর্থনীতি, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি পড়ে তাহাদেরই উপর বেশি করিয়া, রাজনৈতিক প্রভাব পড়ে। (২) ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য—শিক্ষা, যাহা উত্তরজীবনে দেশ ও সমাজের পূর্ণতর সেবার প্রস্তুতি আনিয়া দিয়া থাকে। ইহার আলোচনার মূলে আছে তিনটি জিনিস—(ক) যথাসাধ্য তথ্য আহরণ; (খ) উন্নততর বিচারবুদ্ধির অনুশীলন; (গ) মৌলিক নেতৃত্বের ভিত্তিভূমি গঠন। (৩) উক্ত প্রকার লক্ষ্য অনুসরণই ছাত্র-কর্তব্য। এই কর্তব্যপালনে প্রতিবন্ধক এড়াইবার জন্য যথাসাধ্য বুদ্ধি ও শক্তি নিয়োগ। (৪) কাহারও কাহারও ধারণা, কোন বিষয়ের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থাকিলে সেই বিষয়টি অনুশীলন করা একেবারেই অসম্ভব। তাই ভবিষ্যতের উত্তম নাগরিক হইতে গেলে রাজনীতিতে যোগদান না করিয়া উপায় নাই। এই মতের বিরুদ্ধে ইহাই বলা যায় যে, সক্রিয়ভাবে যোগদান না করিয়াও উক্ত বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করিতে পারা যায়। বলিতে কি, রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের বেগপ্রচণ্ডতা এবং চাপপ্রাবল্যের বাহিরেই সত্যকার জ্ঞানবুদ্ধিসম্মত বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব। (৫) উপসংহার। ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবনে যাহাতে পূর্ণতম সত্য প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, তাহারই জন্য একটু সাময়িক ধৈর্য ধরিবার জন্য ছাত্রসমাজের কাছে আবেদন। খসড়ার এই পাচটি সংকেতকে অনুসরণ করিয়া এখন সম্পূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্য অগ্রসর হও। সত্যানুরাগই যে ছাত্রধর্ম এবং মানুষের ধর্মও বটে—এই জিনিসটিই হইবে তোমার প্রবন্ধের মূল সুর। বিতর্কমূলক প্রবন্ধমাত্রই রচনা করিবার কালে অতীব যত্ন এবং সতর্কতার সহিত এমন ভাবে অগ্রসর হইবে, যাহাতে চূড়ান্তভাবে বিপরীতমুখী মতদ্বৈধের মধ্যে তোমার নিজস্ব মতটি যেন প্রতিবাদের অতীত বলিয়া প্রকটিত হয়।

পূর্ববর্তী বিতর্কমূলক প্রবন্ধের খসড়া-রচনার পদ্ধতি —সর্বশেষ স্তর

কিন্তু যে প্রবন্ধ বর্ণনামূলক নয়, বা বিতর্কমূলকও নয়, পক্ষান্তরে কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনই যাহার লক্ষ্য, তাহা রচনা করাই সবচেয়ে কঠিন। ধর, তোমায় 'নস্যি-ভরা নাকের' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে দেওয়া হইল। এক্ষেত্রে তুমি কি করিবে? এখানে তোমার মৌলিক অনুপ্রেরণা-দ্বারা এই প্রবন্ধসমুদ্র পার হইতে পারিবে কি? এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, মনোহর হিউমার-রসভূয়িষ্ঠ

প্রবন্ধ রচনা করিতে হইলে প্রবন্ধরচনা-শিল্পে প্রভূত ও গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। যাঁহারা এই বিষয়ে প্রকৃত শিল্পী, কেবলমাত্র তাঁহারাই চিত্তবিনোদনকারী এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনা করিতে সক্ষম। প্রথম শিক্ষার্থী কদাচিৎ এই জাতীয় দু' চারটি প্রবন্ধ নিজে হইতে চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ বড়ই কঠিন। তাই তোমায় এই কথাটিই জানাইয়া রাখি যে, পরীক্ষামণ্ডপে এই ধরণের প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়াস পাইবে না। তবে যদি এমন হয় যে, প্রবন্ধটি নিজে বাড়ি বসিয়া ইতিপূর্বেই ভাল করিয়া রচনা করিয়াছ, তাহা হইলে পরীক্ষার খাতায় লিখিতে বাধা নাই। আসল কথা এই যে, এই জাতীয় প্রবন্ধ লিখিতে হইলে যে স্বতঃপ্রবৃত্তি ও উদ্দীপনাময় কৌতুকপরতা থাকা চাই, তাহা কখনও পরীক্ষাগৃহে ছাত্রছাত্রীদের অন্তরে থাকে না। মানুষের মন যখন শ্রান্তি-ক্লান্তির অতীত এক নিরবচ্ছিন্ন অবসরের মাঝে ঘুরিতে থাকে, তখনই এই জাতীয় প্রবন্ধ-রচনার একটি স্তর হইতে অপর স্তরে প্রাবন্ধিক মনটি দোল খাইতে খাইতে চলে। এই ধরণের প্রবন্ধ যদি পড়িতে চাও তো G. K. Chesterton, Hiliare Belloc, Robert Lynd, E. V. Lucas, বীরবল, মোহিতলাল প্রভৃতির লেখা কিছু কিছু সরস রচনা পড়িতে পার। তবে সাধারণতঃ এই জাতীয় প্রবন্ধ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দেওয়া হয় না—তাই রক্ষে।

চিত্তবিনোদনকারী সরস প্রবন্ধের খসড়া রচনা করিবার কথা

খসড়া তৈয়ার করিবার পরে প্রবন্ধটি কি করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীরা হয়তো-বা লেখনীর পুচ্ছদেশ চিবাইয়া চিবাইয়া শেষ করিয়া ফেলে। হ্যাঁ,—কথাটি ঠিক যে, সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যে প্রথম বাক্যটি রচনা করা খুবই কঠিন। অবশ্য প্রারম্ভসূচক বাক্যটি ছাড়াও সমাপ্তিবোধক বাক্য সময়ে সময়ে লেখা কঠিন হইয়া পড়ে। এই সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। শুধু এইটুকুই বলিয়া রাখি, প্রারম্ভ-বাক্যটি হইবে মনোমদ, চিত্তাকর্ষক এবং চমৎকারিত্ব-সঞ্চারী। প্রথম বাক্যটি যদি হয় একেবারেই শিথিল এবং দুর্বোধ্য, তাহা হইলে পরীক্ষক বা পরীক্ষিকার বিক্ষিপ্ত মনকে কি করিয়া তুমি আকর্ষণ করিবে? মনে রাখিও, তোমার প্রবন্ধের প্রথম বাক্যটি যদি পরীক্ষক বা পরীক্ষিকার মনকে সম্মোহিত করিতে না পারে, তাহা হইলে তোমার অনেক বক্তব্যই এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ও মাঠে মারা যাইবে; আবার সমাপ্তিবোধক বাক্যটিও যদি ধারালো ছুরির ন্যায় পরীক্ষক বা পরীক্ষিকার মনের মাঝে দাগ না কাটিয়া দিতে পারে তো প্রবন্ধ-রচনার সকল প্রয়াসই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

প্রবন্ধ-রচনার প্রারম্ভ-বাক্য ও সমাপ্তি-বাক্য গঠনে নৈপুণ্য

ধর, তুমি 'পর্বতারোহণ' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া লিখিলে "পর্বতারোহণ একটি চমৎকার ব্যায়াম"—এই প্রারম্ভ-বাক্যটি। হ্যাঁ,—ইহা যে একটি উত্তম ব্যায়াম, তাহা বালকেও বোঝে। ইহাই বুঝাইবার জন্য একটি বাক্যরচনার কসরৎ দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না। তাই তোমার মনোভাবটিকে প্রকাশ করিবার জন্য একটা নূতন কোন পথ ধর। ধর, তুমি লিখিলে—"পর্বতারোহণ ক্রিয়াটি ঠিক যেন অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিবারই মত; যতই আমরা উচ্চ হইতে উচ্চতরের দিকে আগাইয়া যাই, ততই ইহা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া পড়ে; কিন্তু লক্ষ্যস্থলে যখন পৌছানো যায়, তখন যে-পুরস্কারটি মানুষের অদৃষ্টে মিলে, তাহা কি অতুলনীয় আনন্দই-না দেয়!" কিংবা ধর,—'বিশ্বশান্তি ও বিশ্বযুদ্ধ' সম্পর্কে বিতর্কমূলক প্রবন্ধ তোমাকে রচনা করিতে দেওয়া হইয়াছে। হয়তো-বা তুমি গোড়াতেই লিখিয়া বসিলে—"আজিকার দিনে এই যুদ্ধপরবর্তী জগতে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সমস্যা একটি অন্যতম জরুরী সমস্যা।" প্রবন্ধের এই প্রারম্ভবাক্যটি তোমার বেশ মনোমত হইয়াছে, তাই না? মুস্কিল হইতেছে কি জান? আজিকার দিনে শুধু এই একটিমাত্র সমস্যাই নয়, বহু জরুরী সমস্যাই জগদ্দল পাথরের মত বিশ্ববাসীর বুকে চাপিয়া বসিয়াছে। সুতরাং ঐ ধরণের বক্তব্য এই সমস্যাটিকে কোন-স্বাতন্ত্র্যই দেয় না। তাই তো বলি,—উহা অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক বাক্য রচনা কর। ধর, তুমি লিখিলে—"সংগ্রামমুখী মনোভাব মানুষ যতকাল অবধি সংযত করিতে না শিখিবে, ততকাল পর্যন্ত মানুষ যুদ্ধসজ্জা কখনও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে না।" কেমন?—প্রারম্ভবাক্যটি কি অধিকতর মনোমদ হইল না? মোট কথা, প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে তোমার আগ্রহ ও মনের সজীবতা ফুটাইয়া প্রারম্ভ-বাক্যটি রচনা করিবে। কখনও-বা বিষয়বস্তুর সংজ্ঞা আলোচনা অথবা উহার মূলগত অর্থ নির্দেশ করিয়া, কখনও বা বিষয়বস্তু-সম্পর্কিত কোন মহাজন বাক্য বা কবিবাণী উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া, কখনও বা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোন প্রচলিত ধারণার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া, কখনও-বা প্রবন্ধের উপসংহারে যে-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হইবে তাহারই সম্বন্ধে প্রারম্ভে আভাস দিয়া, কখনও-বা আপাতদৃষ্টিতে বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত কোন বাক্য লিখিয়া—অবান্তর কথা সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া প্রারম্ভবাক্যটি রচনা করিতে হয়।

প্রবন্ধাদির আদর্শ প্রারম্ভ-বাক্য রচনা-সম্পর্কে নির্দেশ

প্রবন্ধের সমাপ্তি সম্বন্ধেও যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া রাখি। পরীক্ষার খাতা পড়িয়া ইহাই দেখিতে পাই যে, পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীরা যখন মনে করে যে বেশ কয়েক পৃষ্ঠা প্রবন্ধ তাহারা লিখিয়া ফেলিয়াছে এবং হয়তো-বা অনেক-কিছুই বলিয়াছে, তখনই তাহারা প্রবন্ধের উপসংহার করিয়া বসে। কিন্তু আমি বলি অনেক-কিছু লিখিবার

ফাঁকে ইতিমধ্যেই প্রবন্ধটির সংহার-কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, তবে এই উপসংহারের মধ্য দিয়া সেই পূর্ববর্তী সংহার-কার্যেরই একটা আনুষ্ঠানিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদিত হইল এই মাত্র। তাই এইভাবে প্রবন্ধ শেষ করা আদৌ উচিত নয়। প্রবন্ধমাত্রকেই যুক্তিধারার পরিবেষ্টনে বেষ্টিত করিয়া এমন ভাবে সমাপ্তিকে টানিয়া আনিতে হইবে যে, সেই সমাপ্তিটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর শেষ কথাটিই বলিয়া দিবে। এমন হওয়া চাই যে, সমাপ্তিবোধক বাক্যের পরে আর একটিমাত্র বাক্যও জুড়িয়া দেওয় চলে না। কেন না,—উহার মধ্য দিয়াই চূড়ান্ত বোধ সঞ্চারিত হইবে। এমন কি প্রধান যুক্তির পরিবেশ যতই দুর্বল হোক না কেন, যত কথাই অকথিত হইয়া থাকুক না কেন, পরবর্তী কল্পনা বা কৈফিয়ৎজাত কোনও বাক্য বা বাক্যাদি জুড়িয়া দিবার অবকাশ যদি না থাকে, তবেই তো বুঝা যাইবে যে, প্রবন্ধটি সত্যই চূড়ান্ত নিষ্পত্তির কোঠায় উপনীত হইয়াছে। যেমন ধরা যাক, 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি' প্রবন্ধের একটি সমাপ্তি বোধক বাক্যের কথা—"মানব-প্রয়াসের যেমন অন্ত নেই ইতিহাসেরও সেইরূপ চলার বিরতি নেই। সংসারে যেদিন সুন্দর ও শিবের সত্যকার প্রতিষ্ঠা হবে সেদিন হয়তো-বা মিল্‌বে তার বিশ্রামের অবকাশ।" এইভাবেই প্রবন্ধের শেষে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ইঙ্গিত ফুটাইয়া তুলিতে হয়। বর্ণনামূলক প্রবন্ধের সমাপ্তিতে একটা সাধারণ অথচ সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিতমুখর প্রতিপত্তি থাকাই বিধেয়। তবে এমন যদি হয় যে, বর্ণিতব্য বিষয়ের অংশবিশেষের সৌন্দর্য-মাধুর্য এরূপ একটি পরিবেশ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহার স্মৃতি তোমার বর্ণনামুখর মনটির ভিতরে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, তাহা হইলে তুমি সেই বিশেষ অংশটিকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণনামূলক প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পার। অবশ্য বিতর্কমূলক প্রবন্ধের সমাপ্তিবোধক বাক্য রচনা করা খুবই সহজ। কারণ, নিছক যুক্তিপ্রবাহের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ দৃঢ়মূল বিবৃতি লইয়া উপসংহার গঠিত হইয়া থাকে। আসল কথা হইতেছে এই যে, তোমার প্রবন্ধের শেষ কথাটিই যেন হয় শেষ কথা। কথার পরে কথা সাজাইয়া, শব্দের পর শব্দ জুড়িয়া যে বাক্য রচনা করা হয়, প্রবন্ধশেষের বাক্যটি সেরূপ বাক্য নয়। কেন না,—এই শেষ বাক্যটি সমগ্র প্রবন্ধের একটি পূর্ণ রসরূপ লইয়া পরীক্ষক-পরীক্ষিকার অন্তরে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাই যদি করিতে পার, তবেই-না তুমি আশানুরূপ নম্বর পাইবার অধিকারী হইবে।

প্রবন্ধাদির আদর্শ সমাপ্তি-বাক্য রচনা সম্পর্কে নির্দেশ

## ॥ পাঁচ ॥

বক্তব্য বিষয় কেমন করিয়া বলিতে হয়, এ সম্পর্কে তো অনেক কিছুই বলিয়াছি। কিন্তু আসল কথাটি এখনও বলা হয় নাই। ভাব ও ভাবনা লইয়াই

বক্তব্য বিষয় আর ইহা ব্যক্ত হয় ভাষারই দ্বারা। তথ্যতত্ত্ব, যুক্তিতর্ক সংবলিত এই যে ভাব ও ভাবনা, ইহাদের আহরণ নির্বাচন ও সংযোজন একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া সত্য, কিন্তু ইহাদিগকে পাঠক-পাঠিকাজনের বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিতে হইলে ভাষাই তো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী। প্রবন্ধ-রচনা নিছক আত্মগত চিন্তা নয়। বক্তব্য বিষয় অপরের মনে সঞ্চারিত করাই প্রবন্ধ-লিখনের উদ্দেশ্য। অতএব, পাঠক-পাঠিকা যেখানে পাঠকালে লেখক-লেখিকাকে প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় বুঝিয়া লইবার সুযোগ পাইতেছেন না, সেখানে লেখক-লেখিকাকে এমন সতর্কতার সহিত শব্দবিন্যাস ও বাক্য রচনা করিতে হইবে, যাহাতে পাঠক পাঠিকা তাঁহাদের লেখা অনায়াসেই বুঝিতে পারে। তাই তুমি নিজের মন দিয়া লিখিবে সত্য, কিন্তু পরীক্ষক-পরীক্ষিকার মন যাহাতে তোমার বক্তব্য বিষয় বুঝিবার সুযোগ পায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। একজন অন্যজনের সঙ্গে কথোপকথনকালে যেমন অতি সহজেই তাহার ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিয়া থাকে, তেমনি সহজ সাবলীল ভাষাতেই প্রবন্ধ লিখিতে হয়। তবে একথা সর্বদা মনে রাখিও যে, তোমার চিন্তারাশিকে তোমার মস্তিষ্ক হইতে যত সহজেই পরীক্ষার খাতায় নামাইয়া দাও না কেন, উহাকে পরীক্ষার খাতা হইতে পরীক্ষক বা পরীক্ষিকার মস্তিষ্কে উঠাইয়া দেওয়া আবার ততটাই কঠিন। আপন অন্তরের ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষার স্বচ্ছতা সুপরিচ্ছন্নতা এবং বিশুদ্ধতাও যেমন চাই, তেমনি চাই ভাষার ঔজ্জ্বল্যও। শুধু জ্ঞানবিজ্ঞানের সংবাদ বহন করিয়াই নয়, তথ্য ও তত্ত্বের প্রাচুর্য সন্নিবেশিত করিয়াও নয়, প্রাঞ্জল ও সরল বাণীভঙ্গীর গুণেই রচনা হয় মুল্যবান। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সরসতা থাকিলে শুধু সাহিত্যের পুস্তক কেন, বিজ্ঞান-দর্শনের গ্রন্থও সহজবোধ্য এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে।

**প্রবন্ধ-রচনায় ভাষার গুরুত্ব**

বাংলা প্রবন্ধ লিখিবার ব্যাপারে আজকাল ভাষা সমস্যা দেখা দিয়াছে। যে-ভাষায় লেখা হয়, তাহার দুইটি রূপ—একটি, সাধু ভাষা; অপরটি, চলিত ভাষা। পরীক্ষায় উভয়ের কোনটিই অপাংক্তেয় নয়। তবে বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভাষাবিন্যাস সমীচীন। সাহিত্যিক পত্ররচনায়, আত্মকথার বিবৃতিতে, গল্পরচনায়, মজলিসী আলাপ আলোচনা ইত্যাদিতে চলিত ভাষার যোগ্যতা অবশ্য স্বীকার্য। আবার এই ভাষা ব্যবহারে বিষয়বস্তুর বর্ণনার একটি উচ্ছল গতিও সংক্রামিত করা যায়। পক্ষান্তরে, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও গভীরতা, গাম্ভীর্য ও নিবিড়তা, মর্যাদা ও সংযম রক্ষা করিবার ব্যাপারে সাধু ভাষার শক্তি

**সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার যোগ্যতা বিচার**

অনন্যসাধারণ। বর্তমানে অবশ্য সাধু ভাষা ব্যবহার না করাই একটি 'ফ্যাশান' হইয়াছে। কারণ, সাধু ভাষা নাকি কৃত্রিম। কিন্তু কথাটি এই যে, আজিকার সাধু ভাষা সেকালের সাধু ভাষা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি যুগন্ধর সাহিত্যস্রষ্টাগণ চলিত বা মৌখিক ভাষার সকল বুলিকে লইয়াই এক নবতর সাধু ভাষা, সুসংস্কৃত সাধু ভাষা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই নবতর সাধু ভাষা প্রাত্যহিক জীবনে প্রচলিত চলিত ভাষার সহিত ব্যবধান রক্ষা করিয়া যে আভিজাত্য লাভ করিয়াছে তাহা বক্তব্য বিষয়কে দীর্ঘস্থায়িত্ব দান করিতে সক্ষম। সত্যই সাধুভাষার বিরুদ্ধে কৃত্রিমতার অভিযোগ উপস্থাপিত করা যায় না। তাই বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া কোন প্রবন্ধ চলিত ভাষায়, আবার কোনটি-বা সাধু ভাষায় রচনা করা হইয়াছে। তবে পরীক্ষামূলক ভাবে দেখিবার জন্য বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও গভীরতা থাকা সত্ত্বেও গুটিকয়েক প্রবন্ধ চলিত ভাষায় রচিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি পাঠ কালেই ইহা নজরে পড়িবে।

প্রবন্ধের ভাব ও ভাবনার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, শব্দবিন্যাস ও বাক্যরচনার ব্যাপারেও লেখকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠা দরকার। নিজস্ব এই বাণীভঙ্গীতেই প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। ভাষায় প্রাবন্ধিকের এই যে নিজস্ব ভাব ও ভাবনার সম্যক্ প্রকাশ, ইহাকেই ইংরাজিতে বলা হয় 'স্টাইল'। ভাব ও ভাবনা নিজের সামগ্রী হইলে, তাহার প্রকাশ আপনার স্বতঃস্ফূর্ত ভাষাতেই ঘটে। যেখানে অপরের ভাব ও ভাবনাকে অনুকরণ করিতে হয়, সেখানে যতই মনোহর ও চটকদার শব্দ প্রয়োগ করা যা'ক্ না কেন, ভাষার প্রাণহীনতা কৃত্রিমতা একঘেয়েমি দেখা দিবেই। পরের ভাব ও ভাবনার মুখোস পরিয়া, পরস্বাপহরণ করিয়া, কখনো সজীবতা রক্ষা করা যায় না। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে কেহ কেহ ভাষাকে বিনা কারণে তির্যক ভঙ্গীতে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ-বা নিজস্ব ভাব ও ভাবনার বদলে নব নব শব্দ ও বাক্যাংশ সৃষ্টি করিয়া, ব্যবহার করিয়া পাঠক-পাঠিকাকে তাক লাগাইবার চেষ্টা করেন। সাহিত্যের বাজারে সস্তায় কিস্তিমাৎ করিবার এই যে অপপ্রয়াস চলিতেছে, ইহাকেই আবার ছাত্র-ছাত্রীরা স্টাইল' মনে করিয়া অনুসরণ অনুকরণ করিয়া থাকে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের ইহা বুঝা উচিত যে, ভাব ও ভাবনায় যাহা নাই, তাহাই পাঠক-পাঠিকাদের মনের কাছে প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্য ঐ জাতীয় লেখকেরা ভাষাকে ইচ্ছা করিয়াই তির্যক করিয়া থাকেন। পাঠক-পাঠিকাকে ধোঁকা দিয়া তাহাদের নিকট হইতে মর্যাদা লাভ করিবার ইচ্ছা এক প্রকার দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়া আর কি! তাই তোমরা এই কথাটি সব সময়ে

ভাষায় 'স্টাইল' সৃষ্টির উপায়

মনে রাখিও যে, ঋজুতাই সৌষ্ঠব আর বক্রতাই অসৌষ্ঠব, ঋজুতাই সৌন্দর্য আর বক্রতাই অসৌন্দর্য। গভীর জটিল সামগ্রীকে সহজ সরল করিয়া বলিতে পারিলেই তো যথার্থ শক্তির পরিস্ফুরণ। নিজের মত করিয়া সামান্য বক্তব্যকেও যদি সরল ভাবে বলা যায়, তবে সেই ছোট উক্তিটুকুই সৌন্দর্যে সৌষ্ঠবে ও সংযমে ভরিয়া উঠিবে। যেটুকু বলিবার, মাত্র সেইটুকুই বলিবে, তদতিরিক্ত নয়। এমন কি, বক্তব্যের পুরাপুরি না বলিয়া কিছু কম বলিলেও ক্ষতি নাই। ইহাতে একদিকে যেমন ব্যঞ্জনাশক্তি প্রকাশ পাইবে, অপর দিকে তেমনি তোমার না-বলা বাণী হৃদয়ে অনুভব করিয়া পরীক্ষক-পরীক্ষিকা অন্তরে তৃপ্তি লাভ করিবেন। 'স্টাইল' বলিতে এই জিনিসটিই বুঝায়। আর ইহাতেই থাকে প্রবন্ধ লিখনের মোট নম্বরের অর্ধেকের কিছু কম।

আজকাল একটা বিষয় প্রায়ই আমাদের নজরে পড়ে—ভাষায় না আছে বিশুদ্ধতা, আছে সৌষ্ঠব। বানান সম্বন্ধে তো একেবারে অবাধ স্বাধীনতা। সংস্কৃত সাহিত্যেরই ছায়াতলে আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভাষা যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, একথা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া গিয়াছি। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান না থাকায় এই অপকাণ্ডটি দেখা দিয়াছে। অথচ সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার অতীব আপনার জন। তাহা ছাড়া, ঐ ভাষার শব্দসম্পদ যেমন অপরিমেয়, শব্দগঠনশক্তিও তেমনি অতুলনীয়। নব নব শব্দগঠন করিবার পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। এই জ্ঞানলাভ করিবার একটি সহজ উপায় আছে। প্রাচীন ও খ্যাতনামা লেখকদিগের বাংলা গ্রন্থ পাঠ করিলে ভাষার বিশুদ্ধতা ও সৌষ্ঠব রক্ষা করিবার আদর্শবোধটি স্বতঃই পাঠক-পাঠিকার মনে সঞ্চারিত হইবে। প্রসঙ্গতঃ, আর একটি কথাও বলিয়া রাখি। বাংলা ভাষার শব্দসম্পদ বাড়াইবার জন্য কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষার উপরই নির্ভর করিতে হইবে, এমন কথা বলি না। বিদেশী শব্দ যে বর্তমান বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে, ইহা তো আমরা নিত্যই দেখিতে পাইতেছি। তবে এক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন আছে খুবই। আমাদের ভাষায় যে শব্দটি নাই, সংস্কৃত ভাষা হইতে যাহা গঠন করিতে হইলে দুর্বোধ্য অথবা দুর্বোধ্য হইয়া পড়িবে, কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই বিদেশী শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। আর গ্রহণ-কালেও ঐ বিদেশী শব্দকে বাংলা ভাষার ধ্বনি ও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যে জারিয়া তুলিয়া আপনার করিয়া লইতে হইবে। বিদেশী শব্দকে অপ্রয়োজনে, বিনা বিচারে আমাদের ভাষায় প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য পারিভাষিক শব্দের কথা আলাদা। কেন না, প্রয়োজনের খাতিরেই বিদেশী পারিভাষিক শব্দ আমাদের ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে এবং করিবেও।

ভাষায় সৌষ্ঠব ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার উপায়

ভাষাই ভাব ও ভাবনার বাহন। সুতরাং ভাষা-ব্যবহার সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীগণকে অবশ্যই অবহিত হইতে হইবে। ভাষার প্রয়োগ-ব্যাপারে কি করা উচিত, প্রথমে তাহাই তোমাদিগকে বলি :—(ক) বিষয়বস্তুর গুরুত্ব-লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া, হয় চলিত ভাষা নয় সাধুভাষা ব্যবহার করিবে। (খ) বক্তব্য বিষয়ের প্রতি একনিষ্ঠ থাকিয়া শিক্ষিত জনগণের সাধু অথবা চলিত ভাষারীতি প্রয়োগ করিবে। (গ) নিত্য-ব্যবহৃত নিত্য-পরিচিত ভাষা যথাসম্ভব ব্যবহার করিবে (ঘ) পরিমিত বাক্যব্যবহারই বাঞ্ছনীয়; কেননা—তাহাতে অর্থের নিবিড়তা ও সুস্পষ্টতা প্রকাশ পাইবে। (ঙ) প্রসাদ-গুণসম্পন্ন ভাষা, স্বচ্ছ সাবলীল বাক্যসংযোজনা করিবে। ইহাতে বক্তব্য বিষয়ের মর্যাদা থাকিবে। যেখানে বক্তব্য বিষয় নিতান্তই তুচ্ছ, ভাব ও ভাবনা একেবারেই নিঃস্ব, সেখানেই দেখা দেয় বাক্যাড়ম্বর, সেখানেই প্রকাশ পায় পাণ্ডিত্যাভিমান। (চ) রচনায় অন্তর্লীন ভাবগভীরতা পাঠক-পাটিকামনে সঞ্চারিত করিবার জন্য ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা প্রয়োগ করিবে।

ভাষা-ব্যবহার সম্পর্কিত ইতিবাচক চারটি নির্দেশ

পরিশেষে ভাষার প্রয়োগক্ষেত্রে কি করা উচিত নয়, এবার তাহাই বলিতেছি :—(ক) ভাষার নবীকরণকে প্রশ্রয় দিবে না। ভাষার নবত্ব বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট তো করেই না, বরং দুর্বোধ্য, এমন কি অবোধ্যও, করিয়া তুলে। (খ) সামান্য বক্তব্য বলিতে গিয়া শব্দের ঢক্কানিনাদ ও অসামান্য বাক্যের গঠন করিবে না। (গ) একই ভাব ও ভাবনা বার বার বিভিন্ন উক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিবে না। (ঘ) সমার্থবাচক শব্দাদি উপর্যুপরি ব্যবহার করিবে না। (ঙ) উপমা-অলংকার-বহুল ভাষা প্রয়োগ করিবে না। কল্পনা-সমৃদ্ধ অথবা কবিত্বময় রচনায় এই ভাষার খানিকটা মূল্য আছে সত্য, কিন্তু প্রবন্ধ-রচনায় উহার কোন মূল্য নাই। অবশ্য প্রবন্ধ-লিখনের বিষয়বস্তু যেখানে হয় কাব্যধর্মী, সেখানে এহেন ভাষার প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য। (চ) অপ্রচলিত, দুরূহার্থক শব্দ আদৌ-প্রয়োগ করিবে না। (ছ) তৎসম বা তদ্ভব নূতন নূতন শব্দ ও অপ্রয়োজনীয় বিদেশী শব্দ কখনও ব্যবহার করিবে না। (জ) সাধু ও চলিত ভাষা মিশাইয়া—ভাষায় গুরুচণ্ডালীদোষ সংক্রামিত করিয়া—কখনও প্রবন্ধ রচনা করিবে না। এই দোষগুলি সম্বন্ধে সতর্ক থাকিলে তোমরা তোমাদের বক্তব্য বিষয়টিকে পরীক্ষক-পরীক্ষিকাদের মনে যথোচিত রূপে এবং ভাল ভাবেই তুলিয়া ধরিতে পারিবে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

ভাষা-ব্যবহার সম্পর্কিত নেতিবাচক সাতটি নির্দেশ

# প্রথম কলেজীয় ছাত্রজীবনের স্মৃতিকথা

ভূমিকা

প্রবেশিকা পরীক্ষা 'পাশ' করে কলেজে প্রবেশের পর যে স্মৃতি আমাদের মনে থাকে, তাতে আছে বেদনা এবং আনন্দ দুইই। অবিমিশ্র আনন্দ মাটির পৃথিবীতে পাওয়া যায় না—তিক্ততার স্বাদ আছে বলেই-না আনন্দ এত মধুর—ফেলে-আসা অতীতের স্মৃতি-রোমন্থনে মানব-মনের এই তো জাগ্রত প্রবণতা। প্রতিটি ছাত্রের প্রথম কলেজ-জীবনের স্মৃতির মালা এই একই সূত্রে পড়ে গাঁথা।

ইস্কুল-জীবন থেকে কলেজ-জীবনে উত্তরণ

ইস্কুলে যখন পড়তাম, তখন কলেজে পড়া সম্পর্কে কি সব অদ্ভুত ধারণাই-না ছিল! কতই-না স্বপ্নের জাল বুনে যেতাম কল্পনায় কলেজের পড়ুয়া হবার ভাবনা ভেবে! শহরের গর্জনমুখর যান্ত্রিক জীবন থেকে অনেক দূরে—নাগরিক সভ্যতার চাঞ্চল্যস্পর্শহীন নগণ্য এক পল্লীগ্রামের ইস্কুলের ছাত্র ছিলাম আমি। শহরের মতো সারা বিশ্বের নাড়ীর সঙ্গে যোগ ছিল না তার—রাজ্য-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, শিল্প-সাহিত্য-সমাজের নিত্যনূতন বিবর্তনের সংবাদ মিল্‌ত না খবরের কাগজের পাতায়। চারপাশের যে মানুষগুলির সঙ্গে চ'ল্‌ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দেনা-পাওয়া, তাদের জীবনধারা ছিল স্রোতমন্থর বদ্ধ জলাশয়ের মতো। চেনা-পরিচিত মানুষের মধ্যে গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ছিল নিতন্তই নগণ্য। ওঁদের মতো একজন হওয়াকে তখন মনে ক'রতাম জীবনের শ্রেষ্ঠতম স্বপ্ন, মহত্তম পরিচয়ের গৌরব-তিলক। ......প্রবেশিকা পরীক্ষায় 'পাশ' করার পর কলেজে প'ড়তে এলাম এই ভাবনার সম্বলকে পাথেয় করে। বিত্তহীন মধ্যবিত্ত-সন্তানের এই বিদ্যালাভের বাসনা সেদিন উপহসিত হয়েছিল শক্তির অযথা অপব্যয় বলে', মানসিক বিলাসের বড়লোকী চরিতার্থতা-রূপে। অভিভাবকেরা চেয়েছিলেন ছেলে চাকরি করুক, ঘূর্ণায়মান সংসার-রথের চাকায় যোগাক আরও দু'চার বিন্দু তেল। নিজের অতীব নিকট জনের বিরুদ্ধতার কাঁটার মুকুট মাথায় পরে' চলে এলাম আজন্ম স্বপ্নের কল্পরাজ্যে—বড় হবার দুর্মর বাসনাকে সফল করবার জন্যে দুর্জয় সাহসে ভর করে'প্রবেশ ক'রলাম সরস্বতীর বাণীকুঞ্জে। সেদিন আমার সাথী ছিল তিনটি জিনিস—ভালো ছেলের সুনাম, বন্ধুদের উৎসাহ-বাণী আর সহজাত আত্মশক্তিতে দুর্জয় বিশ্বাস।

কলেজে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় মনে হ'ল দরিদ্রের পাতার কুটির থেকে এসেছি যেন এক রাজ-রাজ্যেশ্বরের সোনার প্রাসাদে। সুন্দর সুন্দর দালান, মস্ত বড় খেলার মাঠ, বেড়াবার জন্যে চমৎকার গাছে-ঘেরা উদ্যান—কলেজের পাশ দিয়ে

বয়ে যাচ্ছে কলনাদী স্রোতস্বিনী—তারই পাশে দোতলায় আমাদের ক্লাসঘর—জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় নদীতীরবর্তী ঝাউ-গাছের সারি, পাতায় পাতায় তার বাতাসের মর্মরসংগীত। নদীতে ছোটো-বড়ো কত নৌকো ভেসে চলেছে দেশে-দেশান্তরে—সাদাকালো ছোটো-বড়ো কত নৌকোয় কত রঙ-বেরঙের পাল তুলে দেওয়া। আশ্চর্য নয়নাভিরাম সে-দৃশ্য! জীবনে কত সুন্দর দৃশ্যই তো দেখেছি—কিন্তু 'লজিকে'র অধ্যাপকের নীরস বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে বার বার তাকিয়ে দেখ্‌তাম সেই অপরূপ ছবি। চিত্রার্পিতের ন্যায় বসে' থাকতাম ভাবে বিভোর হয়ে—শান্তির কল্যাণস্পর্শে মুছে যেত দেহমনের সমস্ত গ্লানি আর অবসাদ। মনে প'ড়ত, আজ যে কলেজের ছাত্র আমি, এর প্রতিষ্ঠার পিছনে আছে কী গভীর আত্মত্যাগ আর দুঃখবরণের ইতিহাস! যে মফঃস্বল কলেজের নাম আজও দ্বিখণ্ডিত বাংলায় পরিচিত, সেখানে একদিন ছিল বিরাট্ শ্মশান আর ঘন জঙ্গল—দিনের বেলায় অতিবড়ো সাহসী পুরুষেরও পর্যন্ত কাঁপুনি জাগ্‌ত বুকে; আর আজ সেখানেই এক মহাপ্রাণ স্থাপয়িতার অক্লান্ত চেষ্টায় ও অতুলনীয় সাধনায় গড়ে উঠেছে কলালক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠতম পাদপীঠ। মনে মনে গৌরবান্বিত বলে' ভাবতাম নিজেকে—কলেজের অতীত গৌরবে ফুলে উঠ্‌ত বুক।·· শাসনে আর ধমকে শিক্ষা লওয়ার পালা হ'ল শেষ—অধ্যাপকদের সাথে ভিন্নতর পরিচয়ে জ্ঞানার্জনের নূতন অধ্যায় হ'ল শুরু। পরিচয় হ'ল এমন একজন মানুষের সঙ্গে যিনি আজন্ম-তপস্বী। তাঁরই চেষ্টায় বিনা বেতনে কলেজে পড়্‌বার সুযোগ পেলাম—পেলাম আরও নানা সুযোগ-সুবিধা।

নূতন পরিবেশ

জীবনের ক্ষুদ্রতার গণ্ডি গেল ভেঙ্গে—পরিচয় হ'ল নানা মেজাজের অজস্র ছেলের সাথে—কেউ ক'রল সমাদর, কেউ-বা: ক'রল শত্রুতা। পাঠ্য-তালিকার বহির্ভূত জীবনের বিবিধ কাজে চ'ল্‌তে সুতীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পাল্লা দিতে গিয়ে আমি টের পেতাম নিজের শক্তির দীনতা। প্রাণপণ চেষ্টায় তাকে বাড়িয়ে যেতাম—সাহায্য পেতাম অকৃত্রিম ভাবে প্রকৃত শুভার্থী বন্ধুদের কাছ থেকে।

কলেজের বিবিধ কর্ম

তখন আমি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সারা কলেজের ছাত্রদের নিয়ে বিতর্ক-প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। বিষয়বস্তু ছিল—'গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে: বোঝা যায়, মানবসভ্যতার উন্নতি তো হয়ই-নি, বরং প্রতি ক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে।' বন্ধুদের আগ্রহাতিশয্যে নাম তো দিলাম প্রতিযোগীদের তালিকায়, কিন্তু ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে হয়ে গেল কাঠ। উপরের ক্লাসের কত সব নাম-করা ছাত্র-বক্তা ছিল—তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কি জিত্‌তে পারব আমি! সাহস করে দাঁড়ালাম বক্তৃতা দিতে—ইংরেজি ভাষায় ব'লতে গিয়ে বার বার ভুল

'তে লাগল প্রথম প্রথম। দেখলাম, ছেলেদের মধ্যে অনেকে হাস্‌ছে আমার শোচনীয় অবস্থা দেখে। হাজার গুণ সাহস ফিরে এল মনে। গভীর আত্মপ্রত্যয়ের ধ্বনি মন্দ্রিত হ'ল কণ্ঠে। বজ্রদীপ্ত ভাষার গাম্ভীর্য সকল কোলাহলকে দিল স্তব্ধ ক'রে। ভুল ইংরেজি বলার ত্রুটি ডুবে গেল সতেজ বক্তৃতা ভঙ্গীতে ও তেজস্বী বক্তব্যের তীব্রতায়। বিচারক ভুলে গেলেন সময়-নির্দেশক ঘণ্টা বাজাতে। ঘড়ি দেখে নিজেই নির্দিষ্ট সময়ে বক্তৃতা শেষ ক'রলাম। বন্ধুরা ছুটে এসে জড়িয়ে ধ'রল আমাকে। করতালিতে ভরে' গেল সারা ঘর। মনে হ'ল যেন বিশ্বজয় করে এলাম। বিচারে দেখা গেল, অনেক পয়েণ্ট' বেশী পেয়ে আমিই হয়েছি প্রথম—প্রকাণ্ড একটা 'কাপ' পেলাম উপহার —আর পেলাম অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। এই একটিমাত্র ঘটনায় শহরের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীমহলে হয়ে পড়লাম অত্যন্ত সুপরিচিত, যার প্রভাব আজও আমার জীবনে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।.......কলেজের বিবিধ কাজে কত জগদ্বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিশ্‌বার সুযোগ হয়েছিল। দেখেছিলাম বিজ্ঞানী সতেন্দ্রনাথ বসুকে, অর্থনীতিক বিনয় সরকারকে, কবি নজরুল ইস্‌লামকে, কবি-সমালোচক সজনীকান্ত দাসকে, আরও অনেক অনেক মানুষকে।

স্মরণীয় ঘটনা

বাড়ি থেকে প'ড়তে এসেছিলাম বিদ্রোহ করে'। মানুষ হ'বার সাধনায় ব্রতী হ'তে গিয়ে বঞ্চিত হয়েছিলাম নিতান্ত আপন জনদের স্নেহমমতা থেকে। তাঁরা ভেবেছিলেন গোকুলের ষাঁড়ের মতো বাজে সময় কাটানোর এ এক নিছক বাবুগিরি বিলাসিতা। একক শক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রতে গিয়ে বুঝেছিলাম আমার কর্মশক্তির জোর। একটির পর একটি বাধার বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে' আমার সাফল্যের জয়রথ যখন এগিয়ে চ'ল্‌ল পথে পথে, তখন তাঁরা বুঝলেন গোলামির শিকলে ধরা না দিয়ে এমন কিছু অন্যায় করিনি আমি। তাদের মনোভাব বদলাতে লাগল।......

ভবিষ্যতের স্বপ্ন

বড় হ'বার নূতন শিক্ষা পেলাম এই বিদ্যানিকেতনে। বি. এ., এম. এ. পাশ করাই যে বড়োত্বের মাপকাঠি নয়, জীবনের পরিপূর্ণতা যে আরও অনেক জিনিসের উপর নির্ভরশীল, সেই সুমহান্ জীবনমন্ত্রই আমি খুঁজে পেলাম এই কলেজের দু'টি বছরের স্বল্প-পরিধিতে। বাহির-বিশ্বের প্রাণচাঞ্চল্য অনুভব ক'রলাম ছত্রিশ নাড়ীতে। বুঝলাম বড়ো হ'তে হ'লে আমায় হ'তে হবে সত্যকার মানুষ, হ'তে হবে আত্মিক ভাবে মহৎ ও উদার মানুষ। আর সেই মানুষ হবার পথই সব চেয়ে বিঘ্নসংকুল। সেই পথেই জীবনের জয়যাত্রা চালানোর দৃঢ় সংকল্প নিলাম আমি মনে মনে।

শেষের কথা

# বর্ষার ক'লকাতা

**সকাল** থেকেই মেঘ করে আছে·· ছেঁড়া ছেঁড়া নয়, কালো বার্নিশ-করা থমথমে আকাশ ভেঙ্গে-পড়ার আগের মুহূর্তের স্তব্ধতা নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ধ্যান ক'রছে কোন্ নটরাজের! গুম্ গুম্ গুড়্ গুড়্ আওয়াজ থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে। যেন তারই প্রত্যাশিত পদধ্বনি,—সে যে আসে আসে আসে! বেলা দশটা নাগাদ সে সত্যি এসে গেল। টিপ্ টিপ্ ফোঁটা ফোঁটা নয়, জলের তোড়ে পার্বত্য নদীর চাঞ্চল্য এল পথে-ঘাটে-আকাশে।—ভেসে গেল শালপাতার ছেঁড়া টুক্‌রো, একটা কোণা-ভাঙ্গা দইয়ের খুরি হেলে-দুলে চ'লতে লাগল। রাস্তার নালা ছাপিয়ে ফুট্‌পাথের কিনারা স্পর্শ ক'রল ময়লা জলের ধারা।

বৃষ্টি আসে

রিক্সার টুং-টাং শোনা যায় না আর। একটা কাক কিন্তু ভিজে ভিজে কেবলই ডেকে চলে। বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্। রাস্তায় বাড়ে জল। হাইড্রেনের খোলা মুখ দিয়ে হুড়্ হুড়্ করে রাস্তার জল নীচে নর্দমায় গ'লে পড়ে। কিন্তু আকাশের কান্নার সঙ্গে কে দেবে পাল্লা! ধূসর চুলে উঁচু উঁচু বাড়ির ছাদগুলোকে ঢেকে দিয়ে চোখের জলে ক'লকাতাকে ডুবিয়ে দেবে আজ নিখিল বিশ্বের কোন্ সে বিরহিণী!

ক'লকাতার ছবি

ইট-কাঠের মোটা মলাটে বাঁধাই শহর আমাদের এই ক'লকাতা। মোটা, কিন্তু পরীক্ষার্থী ছাত্রের মত 'ইম্পর্টেণ্ট' বেছে পড়া যায় সহজেই। হাজারো নোংরা গলিঘুজি আর বস্তীর সার ঘেঁটে কে আর হাত নোংরা করে? মনুমেণ্ট থেকে চিড়িয়াখানা, হাওড়ার ব্রীজ থেকে খিদিরপুরের ডক্, বালিগঞ্জের লেক আর চৌরঙ্গীর মিউজিয়াম! ব্যস, এক নজরে এই তো ক'লকাতা,—প্রাসাদনগরী ক'লকাতা, রাজধানী ক'লকাতা! এর মোটা মলাট ভেদ করে ঋতুর উৎসবানন্দ প্রবেশ করে না এখানে। সভ্যতার কড়া প্রহরী বিনিদ্র—বসে আছে দোর-গোড়ায়।

ইট-কাঠের কলকাতা

কেবল গ্রীষ্মে এর রাস্তাগুলোয় ধূলোর হাহাকার জাগে। ব্যস্, ঐ পর্যন্ত! শরৎ এলে আকাশের সাদা মেঘের হাল্‌কা টুক্‌রোয় তার পরিচয় লেখা পড়ে, কিন্তু ক'লকাতার প্রাসাদপুরীতে সে খবর পৌছোয় না। পুজোর আনন্দে মাইকগুলো যতই প্রাণ-ফাটা চীৎকারে আপনাকে প্রচার করে, শরতের মৃদু হাসির ছুটির আমেজ ততই যায় হারিয়ে। শীতের দিনে অবশ্য রঙ্-বেরঙের চাদরে রাস্তা আর মুলো-কপিতে বাজার যায় ভরে, কিন্তু "পোষালী বাতাসের হিমে বাসে ভেসে আসা" পাকা ধানের সোঁদা গন্ধ কই! খেজুর রসের হাঁকাহাঁকিতে ক'লকাতার শীত আপনাকে জানায় না একটি বারও।

কলকাতার ঋতুর প্রাণস্পন্দন নেই

এমন কি, বসন্তের যৌবনের অহংকারে পলাশের বনে বনে যে-আগুন পড়ে ছড়িয়ে, মনে মনে যে গান জাগে নোতুন প্রাণের রাগে, ক'লকাতা তার পায় না খবর! হায়রে, প্রাসাদপুরী ক'লকাতা!

ক'লকাতার সারা দেহে আর মনে যদি কোন ঋতু থাকে তো সে আজকের এই বর্ষা। সব সরিয়ে, সব ভরিয়ে সব ভাসিয়ে নেবার ঋতু এই বর্ষা। বর্ষা তার আসার খবর পাঠায় না, দুষ্টু মেয়ের মতো দূর থেকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় না পালিয়ে, একটা ভীষণ বুড়ো সন্ন্যাসীর মতো বৈশাখের তাতানো মাটির ফুঁয়ে ফুঁয়ে ছড়ায় না আগুন। বর্ষা প্রচণ্ড নাড়া দেয় সারা শহরের অস্তিত্ব ধরে', মন্থর মনের ভিতও বুঝি যায় টলে'—

বর্ষার ক'লকাতার ছবি

"ঝাম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া" —বিদ্যাপতি।

আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের সিটি কলেজ একটা দ্বীপের মতো ভাসতে থাকে। ঠন্‌ঠনের সামনে কোমর-জলে সাঁতার কেটে কেটে বেরিয়ে যায় দোতলা বাসগুলো। কালিঘাটে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোডের মোড়ে ছোট্ট বেবী গাড়ীগুলো ছলছল চোখে জল থামার অপেক্ষা করে, একটা ফিঙে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে ইলেক্‌ট্রিক তারের উপর দোল উড়ে পালায়। কালীধন ইস্কুলের ছেলের দল 'রেনি ডে'তে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফেরে। এক-হাঁটু, কোথাও-বা কোমর-জলে তাদের হুল্লোড় নিম্ন বাংলার গ্রাম থেকে খানিকটা সজল শ্যামলিমা ক'লকাতার ইট-কাঠের উপর নিয়ে আসে যেন!

এমনি ঘন বর্ষায়, এমনি মেঘের গর্জনে, এমনি বিদ্যুতের চকিত চমকে, ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের মতো এমনি একঘেয়ে একটানা ছন্দস্পন্দই তো ঐ মোটা মলাটের কারাগার থেকে শহর ক'লকাতাকে মুক্তি দেয় প্রাণের রাজ্যে। সব ইট-কাঠ-পাথরের শান-বাঁধাই রাজপথের, প্রকৃতির সংস্পর্শহীন রিক্ত মরু-জীবনের মধ্যে থেকে এই বর্ষার আকুল সজল বেণী জড়িয়ে জড়িয়ে অনেক কামনার দীর্ঘশ্বাস, অনেক বেদনার ব্যাকুলতা, অনেক ট্র্যাজেডির ব্যর্থতা আপনার বাণীকে ছন্দে-সুরে পাঠায় সৌন্দর্যের মোক্ষধাম অলকাপুরীতে—যেখানে প্রেমে নেই বিরহ, কামনায় নেই বিফলতা, আশার লতা যেখানে নিষ্ঠুর হিমে ছিঁড়ে যায় না বারংবার, যেখানে সমগ্র জীবনব্যাপী সৌন্দর্যসাধনার সিদ্ধিরূপা প্রিয়তমা আছে দাঁড়িয়ে—

বর্ষার দিনে ক'লকাতার প্রাণ-কামনা

'হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননেশ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমান্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্।' —মেঘদূত।

# একখানি গ্রাম

ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় হরিদাসপুর গ্রাম। গ্রামখানি এই বাংলা দেশেরই। কবে কোন্ অতীত কালে বৈষ্ণব সাধক হরিদাসের ছিল আখড়া। তাঁরই পূত স্মৃতি বহন করে' কালের স্রোতে অবগাহন করে' বর্তমানের তীরে পৌঁছেছে শুধু নামটিই, আর কোন চিহ্ন নেই।····গ্রামের জীর্ণ দেবালয় কাজলদীঘির শান-বাঁধানো জীর্ণ ঘাট—জমিদারবাবুর বাগান-বাড়ীর পড়ে-যাওয়া প্রাচীর—আরও ইতস্ততঃ-ছড়ানো কত-কিছু প্রাচীন জৌলুসের কত কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।·· এমন একদিন ছিল যখন হয়ত গ্রামটি ছিল হাসিতে ভরা, সম্পদে ভরপুর। কিন্তু আজ? আজ সে দিন নেই—সে জৌলুসও নেই! চতুর্দিকে বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যের ধ্বস্ত অবশেষ! কালের ঘণ্টানিনাদে তারা শঙ্কিত!

**নাম ও প্রাচীন কথা**

গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান, তাদের পরই সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বর্ণ-হিন্দু। এছাড়া তাঁতি-জোলা-ছুতার-কামার-কুমার-হাড়ি ডোম-মুচি প্রভৃতি নানা হরিজনও আছে। অধিকাংশই চাষী। অন্যান্য পেশাও আছে নিজ নিজ পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যধারাকে বজায় রাখার জন্যে। দারিদ্র্যের চিহ্ন অনেকের অঙ্গে নামাবলী পরিয়েছে সত্য, কিন্তু তাদের সারল্যসুন্দর মুখে সরল আন্তর বিশ্বাসটি সুপরিস্ফুট।

**অধিবাসী**

কাঁচামাটির 'রাজপথ' গ্রামের মাঝখান দিয়ে সরকারী পথের সঙ্গে মিলেছে। এই রাজপথের সঙ্গে এসে মিলেছে ভিন্ন পাড়ার কত ছোট ছোট রাস্তা। মাটির কাঁচা পথ—গ্রীষ্মে জমে হাঁটুভর ধূলা—বর্ষায় হয় কর্দমে পিচ্ছিল—শরতে দু'ধারের ঘাস ও লুটিয়ে-পড়া ধানের শিশির পথচারীর চরণকে দেয় ভিজিয়ে। গোরুর গাড়ী ছাড়া অন্য কোন যান যায় না সে পথ দিয়ে। তবু ঐ পথই গ্রামবাসীর 'রাজপথ'! সেখান দিয়ে গ্রামের সবাই যায় ঘর ছেড়ে দূরে—দূর থেকে আসে ঘরে।

**পরিবহন**

গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কাঁসাই নদী। বর্ষার উদ্দামতায় ছলছল কলকল নদীটি গ্রামের হৃদয়ে জাগায় শিহরণ। আবার শরতের পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ শান্তি যখন আনে অপরিসীম আনন্দ, তখন গ্রীষ্মের শীর্ণ ধারা দামাল ছেলেদের জানায় আমন্ত্রণ। নদীপথে চলে নৌকো গ্রামের যাত্রী নিয়ে বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে। যুবকদের চলে নৌকোবাইচ। জেলেরা ধরে মাছ, জেলেনীরা ছুটে আনন্দে মাছের ঝাঁপি মাথায় নিয়ে বাজারের পথে। নদী বয়ে আনে উর্বর কোমল পলিমাটি, হেমন্তের শেষে চাষীরা তীরে লাগায় পটোল, তরমুজ, বেগুন, আরও কত

ফসল। বসন্তের পাগল মন অর্থাভাব থেকে পায় মুক্তি। চাষীগিন্নীর রূপার পৈঁচা—নাকের নোলক—পিছে-পেড়ে কাপড় মিলে অনায়াসে। স্নেহময়ী কাঁসাই সারা বছর গ্রামকে করে' তোলে পুষ্ট তার নিঃসীম স্নেহরসে। নদীর পাড়েই গ্রামের বিস্তৃত মাঠ। সে-মাঠকে করে তুলে শ্যামল এর জলধারা।

গ্রামের মাঝে কাজলদীঘি, কাজল-কালো জলে ফুটে থাকে কুমুদ-কমল। কানায় কানায় ভরা বর্ষার দিনে রবি-শশীকে নিয়ে কুমুদ-কমলের চলে আড়াআড়ি। শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় কাজলদীঘিতে বসে সৌন্দর্যের হাট। প্রাতঃসূর্যের তরুণ আলো কমলিনীর লজ্জানত মুখটি তুলে ধরে শারদ-প্রাতের মধুর ক্ষণে। মধুলোভীর দল ছুটে আসে বিনা নিমন্ত্রণে।

দীঘি ও পুকুর

গ্রামের মধ্যে আছে আরও অনেক পুকুর। তারা বর্ষার উচ্ছল আনন্দে ভরপুর, শরতে প্রশান্ত গম্ভীর, শীতে সৌন্দর্যহীন, বসন্তে বার্ধক্যজরাগ্রস্ত, গ্রীষ্মে রুগ্নশীর্ণ মৃতপ্রায়। কাজলদীঘির জল গ্রীষ্মে গ্রামবাসীর অবলম্বন হয়ে উঠে, পুকুরগুলো তখন জ্বালায় লালবাতি। আশ্রিত মৎস্যকুল হয় নির্বংশ।

প্রকৃতি দেবী হরিদাসপুরকে বছরের ছ'টি ঋতুতেই সাজান বিশেষ বিশেষ সাজে। গ্রীষ্মের শুষ্ক রুক্ষতা গ্রামে আনে শ্রান্তি—আনে ঔদাসীন্য। ধরিত্রীর তপ্তনিঃশ্বাস আনে চোখে-মুখে জ্বালা, জিহ্বায় অরুচি আর তৃষ্ণা। নদী হয় শীর্ণ। পুকুর হয় মৃতপ্রায়, মাঠ করে ধূ ধূ। কালবোশেখীর ধূলা অন্ধকার করে তুলে বৈকালী আকাশ। মাঝে মাঝে পড়ে বাজ—হয় শিলাবৃষ্টি। পাকা আম জাম কাঁঠালের গন্ধে গ্রামখানি হয় ভরপুর। বেলফুলের গন্ধে হয় সান্ধ্য বায়ু সুরভিত; আরও কত ফুল ফুটে ওঠে গ্রীষ্ম সন্ধ্যার ক্লান্ত অবসরে। বর্ষা আসে দিগন্ত ঘনায়িত করে'। সে আনে শ্যামলতা—আনে স্নিগ্ধতা। ধরিত্রী ছাড়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস—পেকে ওঠে নানা ফল, ঘোমটা খোলে কত লজ্জানত কুসুম। চাষীর মুখে ফুটে ওঠে হাসি—দীঘি-পুকুর মাঠ-ঘাট নদী-নালায় জাগে প্রমত্ত যৌবন। আনারসের গন্ধে বিভোল বাতাস চতুর্দিক্ করে আমোদিত। শরৎ আসে মাতৃত্বের পূর্ণ গৌরবে। সে আনে চতুর্দিকে স্নিগ্ধ প্রশান্তি—আনে তৃপ্ত পূর্ণতা। নদীতীরের কাশবনে জ্যোৎস্নারাতে কাজলদীঘির কুমুদিনী ও প্রভাতের কমলিনীর শুভ্রতা এক দিকে আর অন্য দিকে ভরা মাঠের কচিধানের সবুজনৃত্য গ্রামখানিকে করে সৌন্দর্যমণ্ডিত। হেমন্তের সোনার ধান, শীতের নীরস শুষ্কতা আর বসন্তের মত্ত আনন্দ গ্রামখানিকে ভুলেনি। বসন্তের কোকিল-কূজন ভুলে-যাওয়া কত ব্যথাকে জাগায়—আমের বোলের রসপানে ছোটে মধুকর—কচিপাতায় ভরে ওঠে বুড়ো নিমগাছটাও। সারা গ্রামখানিকে লতায়-পাতায়-ফুলে-গন্ধে তখন নববধূর বাসরসজ্জা মনে হয়।

ঋতুর আবর্তনলীলা

গ্রামের মাঝখানটিতে একটি পাঠশালা। এক দিকে মৌলবী সাহেবের আসন, আর এক পাশে পণ্ডিতমহাশয়ের বসবার স্থান। ছাত্রসংখ্যা অবশ্য মন্দ নয়। বেশির ভাগই মুসলমান। কিন্তু এখন আর কেবল আরবী-উর্দু শিখলে চলে না। সেজন্য বাংলা ক খ গ ও ইংরাজি A B C শিখ্‌তে হয়। ছাত্রদের ভালবাসা খুবই প্রগাঢ়। কিন্তু মারামারিও হয় খেলার মাঠে—শীর্ণ নদীতে সাঁতারের সময়। সকাল বেলাতেই পাঠশালা বসে। বেঞ্চে বসে বড়ো পড়ুয়ার দল। আর চাটাইয়ে বসে ছোটোরা। সুর করে' পড়া হয় নামতা—দু'একটি কবিতাও। বিংশ শতাব্দীর ইস্কুলীয় রীতি এখনও যেন আস্‌তে সাহস করছে না এই প্রাচীন বিদ্যামঠটিতে। কাজেই এখানকার শাসনব্যবস্থা যেমন কিছুটা বর্বর, তেমনি অতিরিক্তও। ছেলেরা সেই ভয়েই আসে; নইলে অন্য কোন প্রলোভন কোথায়? পাঠশালার পড়া শেষ করে' বেশির ভাগই লাগে চাষে, ফলায় কত রত্নশস্য, অন্তরের সরল বিশ্বাসকে কর্মে দেয় রূপ। আর খাদ্যের অবস্থা যাদের সচ্ছল, তারা যায় শহরে কেতাবী বিদ্যার প্রাণহীনতায় হৃদয় বলি দিতে। তারা হয় উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, অফিসের বড় বাবু, থানার দারোগা। তাদের বেশির ভাগই আর মায়ের শ্যামল অঙ্কে আসে না ফিরে!

**বিদ্যামন্দির ও শিক্ষাব্যবস্থা**

গ্রামের উত্তর প্রান্তে জমিদারবাবুর বিরাট্ অট্টালিকা আর তার সংলগ্ন বিরাট্ পূজামণ্ডপ এবং কাছারি-বাড়ি। বিপুল অট্টালিকার সে জৌলুস নেই, সে অভিজাত্য-গর্বী অবস্থাও নেই। নির্বাসিতের বেদনা, পরিত্যক্তের গ্লানি নিয়ে সে দাঁড়িয়ে কালের ঘণ্টা শুন্‌ছে যেন স্তব্ধ হয়ে। বছরে মাত্র দু'টিবার যখন জমিদারবাবু শহর থেকে সপরিবারে আসেন গ্রামের এই বাড়িটিতে, তখন প্রোষিতভর্তৃকার পতিমিলনের স্বল্পস্থায়ী আনন্দের মাঝে দীর্ঘ বিচ্ছেদের করুণবিষণ্ন পাণ্ডুরতা ফুটে ওঠে এই প্রাসাদপুরীতে।

**জমিদারের কাছারি ও পরিত্যক্ত প্রাসাদপুরী**

গ্রামের মাঝে মন্দির ও মসজিদ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে যেন বিজয়ার কিংবা ঈদের আলিঙ্গনাবদ্ধ দুই বন্ধুর মতো। সন্ধ্যায় বেজে ওঠে শঙ্খঘণ্টার রোল আর প্রত্যূষে শোনা যায় আজানের মধুর কণ্ঠস্বর। সারা বছরে পূজা-পার্বণের অন্ত নেই। দুর্গাপূজো ও লক্ষ্মীপূজো ঘটা করেই হয় হিন্দু-পাড়ায়, দোলের ফাগোৎসব সবাইকে দেয় রাঙিয়ে। শ্রীরামনবমীর মেলা বসে বসন্তকালে। কত দূর দূর গ্রাম থেকে আসে কত লোক—আবালবৃদ্ধবনিতা। চৈত্রমাসে শিবের গাজন হয়—ঢাকের শব্দে চতুর্দিক হয় চমকিত। আর মুসলমানের মহরম হয় বড় ঘটা করে'। জোয়ান মুসলমান ভাইদের লাঠিখেলা দেখার মতো জিনিস হয়ে ওঠে। রণবাদ্যের শব্দ দূরান্তের গ্রাম থেকে যায় শোনা। ঈদের

**ধর্মচর্চা, পূজাপার্বণ, প্রীতি-বিনিময়**

দিনটিতে কি সাজসজ্জারই-না পারিপাট্য! সকলের নোতুন পোশাক পরার ধুম পড়ে যায়। বিজয়ার আলিঙ্গন আর ঈদের আলিঙ্গন সরল বিশ্বাসী প্রেমিক গ্রামবাসীর আন্তর ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করে দেয়। কি অপূর্ব প্রীতি, কি অকুণ্ঠ ভালোবাসা সবার মাঝে! সারা বছরেই সারা দিনের কর্মশ্রান্তির পর হিন্দু যায় চণ্ডীমণ্ডপে গীতাপাঠ রামায়ন-গান কিংবা দাশুরায়ের পাঁচালী শুনতে আর মুসলমান যায় মসজিতে বিশ্বপিতার কাছে প্রার্থনা জানাতে। গ্রামটিতে শহরের মতো বাতিকগ্রস্ত সার্বজনীন পূজার উন্মত্তত নেই—আছে হাড়ি মুচি মেথর ব্রাহ্মণ মুসলমান সকলের সার্বজনীন প্রীতি। সেজন্য সকল পূজাপার্বণে উৎসবে-আমোদে পরস্পর পরস্পরকে জানায় আমন্ত্রণ, গ্রহণ করে আপন জনের মতো পরম ঔদার্য নিয়ে। সবাই যেন একই পরিবারের লোক। কেউ গর্বভরে জাত্যভিমানের পরিচয় দেয় না অথবা কেউ গণতান্ত্রিক প্রগলভতা দেখিয়ে অন্যায় অধিকারের অসম্ভব দাবিও জানায় না।

আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা সংগীতচর্চা

গ্রামে আমোদ-প্রমোদের অভাব নেই। উৎসব-আনন্দ ছাড়াও শরতে নদীতে চলে নৌকাবাইচ্, কাজলদীঘিতে সন্তরণ, দীঘির বিস্তৃত পাড়ে হা-ডু-ডু, কিৎকিৎ। অবসরক্ষণে ডোমের বাঁশি ওঠে বেজে—রহমৎ মিয়ার একতারায় বাউল-গানের সুর হয় ঝংকৃত। রামদাসের বাড়িতে সন্ধ্যায় কীর্তনের সমবেত কণ্ঠে 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না বঁধু, ঐখানে থাক' সংগীত মনের রোম্যান্টিকতার খোরাক যোগায় এবং 'মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরই ডালে' সরল চাষীদের দাম্পত্য-জীবনকে মধুরতর করে। নদীর কূলে দামাল ছেলেদের ঝাঁপিয়ে-পড়া—আম-কুড়ানোর ধুম—খেজুরগাছের রস পাড়ার ব্যস্ততা যে-কোন লোকেরই মনে দেয় আনন্দ।

গ্রাম্যপঞ্চায়েৎ ও বিচার-ব্যবস্থা; জনসেবায় অসাম্প্রদায়িকতা

গ্রামে আছে গ্রাম্যপঞ্চায়েৎ। তা গঠিত হয়েছে গণতান্ত্রিক পন্থায়—নবীন ও প্রবীনকে নিয়ে। তারা বিচার করে—দণ্ড দেয়। তারা গ্রামের বিচারক—গ্রামের সংগঠক ও রক্ষক। চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাদের সাপ্তাহিক অধিবেশন—সেখানে সকলের আবেদন-নিবেদন দরদ দিয়ে শোনা হয়—সকলকে মিলিয়ে দেওয়া হয় প্রীতির পরিবেশে। সেখানে সবাই সমান বিচার পায়—ধনী-নির্ধন পণ্ডিত-মূর্খ হিন্দু-মুসলমান আর হরিজন। গ্রামে আছেন বদান্য হাজি সাহেব। তিনি শরণঠাঁই, দীনের মাতাপিতা। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা পায় অর্থ—দরিদ্র ব্রাহ্মণ পায় পুত্রের পৈতে দেওয়ার খরচ। আর আছেন মথুরা বাবু। তিনি সংগতিপন্ন দরদী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোজ সকালে ভিড় জমে। কত বিষণ্ণা জননীর মুখে হাসি ফুটে শিশুর আরোগ্যলাভে। কত পতিপুত্রহীনা বিধবা পায় আশ্রয়—পায় কত

সাহায্য। কোথাও সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি নেই—কোথাও দ্বিজাতিতত্ত্বের কিংবা জাত্যভিমানের লেশমাত্র নেই।

গ্রামটি স্বয়ংপূর্ণ। তাঁতের কাপড়, লোহার কাস্তে-কোদাল, কাঠের খেলনা, রূপার পৈঁচা, নাকের নোলক, মাটির হাঁড়ি-পাতিল যেমন পাওয়া যায় কারুশিল্পীদে কাছে, তেমনি চাষী জন্মায় পাট, ধান, ডা'ল, তামাক, স'রষে, আলু, পটোল প্রভৃতি শস্য ও খাদ্যবস্তু। দুধের প্রাচুর্যের জন্যে গ্রামটি অন্যান্য গ্রামের ঈর্ষাস্থল। ডিম

অর্থনৈতিক জীবন

মাংস মাছও মিলে প্রচুর। গ্রামে চাষীরা পয়সার লো অধিকাংশ বেচে ফেলে গোমস্তা সরকার মাষ্টার দোকা ব্যবসায়ীর কাছে। গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন খুব সচ্ছল নয় বটে, তবুও উদ্বৃত্ত পাট ধান প্রভৃতি ফসল বিক্রী করে' চাষীরা মাসে মাসে গয়না গড়ায়—বলদ কেনে—কখনও বা ২।১ কাঠা জমিও কেনে। গ্রামের প্রান্তে নদীর পাড়ে বসে হাট হপ্তায় দু'বার—প্রতি সোমবারে ও শুক্রবারে। পাশের কত গ্রাম থেকে আসে কত পণ্যসম্ভার, কত ক্রেতা। নদীপথে আসে বর্ষায় শরতে হেমন্তে কত দূরের কত নৌকো। গ্রামের উদ্বৃত্ত সব চলে যায় দূর গ্রামে। এই মেলামেশায় বাড়ে কত অভিজ্ঞতা, কত জ্ঞানের হয় প্রসার

গ্রামের আর এক দিকে—হাট থেকে দক্ষিণে একটু দূরে আছে এক শ্মশান, তারই পাশে আবার মুসলমানের কবরস্থান। এক দিকে শ্মশানের শূন্য নির্জন ভয়াবহ শুদ্ধতা এবং অপর দিকে কবরস্থানের পুষ্পরাশি ও সারিবদ্ধ বৃক্ষরাজির শোভা। কিন্তু এত সম্পদেও গ্রামটি ক্ষয়িষ্ণু। অভাবের জ্বালাময় জিহ্বা বিস্তার করেছে গ্রামের সচ্ছলতায়

উপসংহার

শিক্ষার অভাব, চিকিৎসার অভাব—আরও নানা অভাব —নানা রোগ—নানা ভাবনা গ্রামের সুখের নীড়ে এনেছে অশান্তি। এ দূর করতে আজকের যুবকসমাজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেই সঙ্গে সরকার নিয়েছেন পরিকল্পনা। জানি না, কত দিনে আবার ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় হরিদাসপুরের পুরনো দিন আসবে ফিরে!....

## রাত্রি

ভাবিতে অবাক লাগে যে, যে-মানুষ পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়াছিল, তাহার জীবনে প্রায় পঁচিশ বৎসরই তাহার নিজের অধিকারে ছিল না। অর্থাৎ ঐ সময়ে সে ঘুমাইয়া

মানবজীবনে রাত্রির গুরুত্ব

কাটাইয়াছে। রাত্রি তাহার রহস্যময় কৃষ্ণ যবনিকা দিয়া ঐ সময়কে তাহার দিনের কর্মময় ও ব্যক্তিত্বোজ্জ্বল অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়াছে। অর্ধাংশ রাত্রিকে বাদ দিয়া তাই মানুষের পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। দিবসের শত সহস্র কর্মে যে স্বৈরাচারী ডিক্টেটর জাতি জীবনে বিভীষিকার মতো প্রতীয়মান, রাত্রে তাঁহাকে যখন নিদ্রিত অবস্থায় দেখা যা

"With his eyes shut, mouth open is left hand under his right ear, his other twisted and hanging helplessly before him like an idiot's".. (—Leigh Hunt), তখন সমগ্র ব্যক্তিটির পরিপূর্ণ ছবি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠে।

দিন ও রাত্রি যে একটি সত্যেরই দুইটি দিক মাত্র, তাহা ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতেও নিহিত রহিয়াছে। গ্রহমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহগুলির ন্যায় পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর পাক খাইতে খাইতে সূর্যকে বৎসরে একবার ঘুরিয়া আসিতেছে। বিধির এমনই বিধান যে, জন্মলগ্ন হইতে আজকাল এবং আগামী শত কোটি বৎসর ধরিয়া এই পাক-খাওয়ার আর বিরাম নাই, বিরামের সম্ভাবনাও নাই। ইহারই ফলে পৃথিবী ঋতুর নব নব সজ্জায় সজ্জিত হইতেছে এবং অপর দিকে দিনের অবসানে রাত্রি এবং রাত্রির অবসানে দিনের আবির্ভাব ঘটিতেছে।

**বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে রাত্রি**

কবিরা একথা বুদ্ধিতে মানিলেও অনুভূতিতে মানিবেন না। ঋতু-পরিবর্তন যে কেবল বৈজ্ঞানিক তথ্যমাত্র, দিবারাত্রের পশ্চাতে পৃথিবীর পাক-খাওয়াই যে একমাত্র সত্য, ইহা তাঁহারা তর্কে না পড়িলে স্বীকার করিবেন না, এবং একবার স্বীকার করিলেও পরমুহূর্তে ছন্দে-ভাষায় এমন ঝংকায় তুলিবেন, এমন ছবি আঁকিবেন, এমন অচিন্ত্যপূর্ব তাৎপর্য আবিষ্কার করিবেন, যাহা বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতদের যুক্তিতর্ককে নিরস্ত করিয়া দিবে। রাত্রির অন্ধকার কবি-চিত্তে এক রহস্যময় অজনার দ্যোতনা আনে। যাহাকে পরিষ্কার জানি না, যে রাজ্যে বুদ্ধির প্রত্যক্ষতা নাই, সেখানেই তো কল্পনার খেলা—সেই তো রোমান্সের রাজ্য। শরৎচন্দ্র তাই অন্ধকারেরও রূপ দেখিতে পান। তাঁহার মনে হয়, "....অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে।" রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রাত্রি দেখা দিয়াছে এক রূপবতীর সৌন্দর্য লইয়া। মানুষের ইন্দ্রিয় যাহার নাগাল পায় না সে-ই তো রূপাতীত। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে বার বার আঁধার রাতেই দুঃখরাতের রাজা দেন দেখা। শক্তিসাধকের নিকটে রাত্রির রহস্যময়ী বিভীষিকামূর্তি ধরিত্রীর রুদ্রমূর্তির রূপক-রূপেই দেখা দেয়। শক্তিরূপা রাত্রির নিকট হইতে তাঁহারা শক্তি যাচ্ঞা করেন তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন প্রণালীতে।

**কবির দৃষ্টিতে রাত্রি —শক্তিরূপা রাত্রি**

কিন্তু কবিকল্পনা, দর্শন বা বিজ্ঞানের দৃষ্টি ব্যতীতই রাত্রির স্বাভাবিক রূপ কতই-না চিত্ত-চমৎকারা! পাখীরা ফেরে নীড়ে। নারিকেল পাতাগুলি মৃদু

হাওয়ার দোলে। নৌকায় জ্বলে আলো, নদীর জলে তাহার ছায়া খান্ খান্ হইয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায় ছড়াইয়া। বাঁশের পাতার ফাঁক হইতে আধখানা চাঁদ মারে উঁকি। রাত্রিও বাড়ে। কর্মক্লান্ত মানুষ শয্যায় আরামের আশায় উৎফুল্ল হয়। দিবসের সকল গ্লানি হরণ করিয়া লইয়া যায় নিদ্রা। চিন্তার হাত হইতে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পায় মানুষ। ঝিঁ ঝিঁ পোকা একটানা সুরে ডাকিয়া চলে। রাত্রির নীরব কণ্ঠে যেন রব উঠে—'শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!'

রাত্রির আবির্ভাব
নিদ্রিতের আরাম

কিন্তু চোখে নিদ্রা নাই অনেকের। পরীক্ষার ছাত্র 'পাশে'র পড়া করে। সন্ত-সন্তানহারা জননী একটা অসহ্য বেদনায় ভূমি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় ভিখারী বালকটি কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না। আর ফাঁসীর আসামী দেওয়ালের দিকে পলকহীন নেত্রে তাকাইয়া টিকটিকির মাছি-ধরা দেখিতে থাকে, কিছুই ভাবে না আর—কোন কিছু চিন্তা করিবার ক্ষমতাও বুঝি-বা লোপ পাইয়া গিয়াছে তাহার!…কোথা হইতে নবজাত একটি শিশুর প্রথম কান্না শোনা যায়। রাত্রির নীরব কণ্ঠে কেবলই রব ওঠে,—'শান্তি, শান্তি!! শান্তি!!!'

বিনিদ্রের অশান্তি

## গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার জ্ঞানপিপাসু চিত্তের তৃপ্তি-সরোবর—শতকোটি মানুষের শব্দহীন আলাপনের পবিত্র তীর্থ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে?,

সূচনা

গ্রন্থাগারের ইতিহাস সুপ্রাচীন। কাগজ, মুদ্রাযন্ত্র এবং অক্ষর আবিষ্কারের পূর্বে যে শুভপ্রভাতে মনুষ্যের অনুভূতিরাজ্যের আগল মুক্ত হইয়াছিল, সেইদিনই মানব আপনার চিন্তাকে, আপনার কল্পনাকে রেখার মাধ্যমে কাঁচা মৃৎপাত্রের গায়ে প্রকাশ করিয়া, তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিয়া গেল বংশধরের জন্যে। তারপর চামড়া, বৃক্ষপত্র, প্রস্তরগাত্র, তাম্রফলক প্রভৃতিতেও চলিল সেই প্রচেষ্টা। প্রকৃতির নির্মম ধ্বংসশীলতা হইতে মানুষ বরাবরই চাহিয়াছে বাঁচিতে।

মানবসভ্যতা ও গ্রন্থাগার

সেই বাঁচার প্রচেষ্টাই চিন্তাকে শাশ্বত করিয়া রাখিবার প্রয়াসে ব্যক্ত হইয়াছে। ক্রমে আবিষ্কৃত হইয়াছে অক্ষর, মুদ্রাযন্ত্র, কাগজ। মানুষের সেই চেষ্টা আজও চলিয়াছে সমভাবে। শত সহস্র মনস্বীর চিন্তা ও মননশীলতা গ্রন্থের মধ্যে থাকিয়া গ্রন্থাগারে স্থান পাইয়াছে এবং আজও পাইতেছে। গ্রন্থাগার সত্যসত্যই যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার, মানবসভ্যতার পবিত্র ও বিশুদ্ধ রূপের সঞ্চয়ন।

প্রাচীন কালে গ্রন্থাগার ছিল দেবমন্দিরে। দেবমন্দিরের পুরোহিত ছিলেন পাঠক। 'গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ'—ইহা প্রাচীন কালেরই প্রবচন। তখন সাধারণ লোকের মধ্যে বিদ্যার চর্চা বড় একটা ছিল না। তবে ধনী ব্যক্তিগণের গৃহে তালপত্রেও ভূর্জপত্রে লিখিত পুস্তকগুলি রক্ষিত থাকিত। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও পণ্ডিত আপনার জ্ঞানভাণ্ডারকে পূর্ণ করিয়া জনশিক্ষায় আত্মোৎসর্গ করিতেন। ভারতবর্ষে, তিব্বতে, চীনে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এইরূপ প্রাচীন গ্রন্থাগারের নিদর্শন ও নজীর পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে বহুসংখ্যক পুস্তক-প্রকাশ অসম্ভব ছিল বলিয়াই গুরুমুখী বিদ্যা ও শিষ্যপরম্পরায় জ্ঞান প্রসার লাভ করিত। গুরুগৃহ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। বৌদ্ধমঠ, মিশনারীর গীর্জা, হিন্দু-দেবমন্দির ইত্যাদিই ছিল জ্ঞানের পীঠস্থান। পরবর্তী যুগে পৃথিবীতে গ্রন্থাগারের নজীর পাওয়া যায়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান গ্রন্থশালার কথা সুবিদিত। শ্রীহর্ষের বিপুলায়তন গ্রন্থাগার ছিল। সোমনাথ মন্দিরের গ্রন্থাগারের ধ্বংসসাধন সুলতান মামুদের অপকীর্তি এবং আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত হস্তলিখিত পুঁথির গ্রন্থাগার মুসলমান কর্তৃক পোড়ানোর কলঙ্ক-কালিমা আজও ইতিহাস হইতে অপসৃত হয় নাই। খলিফা অল্ মামুনের সময়ে বাগদাদের গ্রন্থশালা ও সেকেন্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থশালা পৃথিবীবিখ্যাত ছিল। এই সকল গ্রন্থশালায় মূল্যবান পুস্তকরাজি স্থান পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না।

গ্রন্থাগারের উদ্ভব ও প্রাচীনতা

পাঠাগারের কয়েকটি সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ পরিদৃষ্ট হয়: (১) ব্যক্তিগত; (২) শাসন-দপ্তরের প্রয়োজনগত; (৩) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যগত; (৪) সাধারণ। ব্যক্তির রুচি ও পেশা অনুসারে ব্যক্তিগত গ্রন্থশালার সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীর প্রয়োজন বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থে, আইনজীবীর প্রয়োজন আইনসংক্রান্ত পুস্তকে, সাহিত্যরসপিপাসুরা ভালোবাসেন কাব্যগ্রন্থ সমালোচনা-গ্রন্থ ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থশালার উদ্ভব ও পরিপুষ্টি হয় দপ্তরেরই প্রয়োজনে—ভূতত্ত্ব-সমীক্ষার প্রয়োজনে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা গ্রন্থাগারের উৎপত্তি, কৃষিদপ্তরের দ্বারা সংগৃহীত হয় কৃষিসংক্রান্ত পুস্তকরাজি। এইরূপে বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে জাতীয় গ্রন্থশালা। তৃতীয় পর্যায়ের গ্রন্থশালার পরিপুষ্টি হয় অধ্যাপক,

শ্রেণীবিভাগ

শিক্ষক ও ছাত্রগণের প্রয়োজনে। প্রতিটি শিক্ষায়তনেই আছে গ্রন্থাগার। ইস্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষায়তনে শিক্ষানৈতিক কল্যাণমূলক গ্রন্থাগার আছে। সর্বশেষ পর্যায়ের গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের জন্যে। ইহার পুষ্টি জনগণের প্রয়োজনে ও রুচিতে। প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারের মালিক ও উপভোক্তা নির্দিষ্ট ব্যক্তি; দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থাগারের মালিক সরকার কিন্তু উপভোক্তা জনগণ; তৃতীয় শ্রেণীর মালিক ও উপভোক্তা শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী-সমাজ আর সর্বশেষ শ্রেণীর মালিক অংশতঃ সরকার ও অংশতঃ জনসাধারণ, কিন্তু উপভোক্তা জনসাধারণই।

বর্তমানে বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে গ্রন্থাগার ব্যবহারে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতিতে অসংখ্য পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। সেইজন্য জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পৃথিবীর সর্বত্র বড় বড় গ্রন্থশালার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিও পাঠাগারের নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছে। এখন পাঠাগারে বালক, যুবক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ—সকলেই রুচি ও প্রয়োজনের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের অগণিত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। এখন গ্রন্থাগারগুলি কেবল বৃহৎ নয়—তাহাদের পরিচালনাও সুশৃঙ্খলিত এবং বিদ্যাবিস্তারের উপযোগী। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রন্থনব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় পুস্তকের তালিকা নির্মাণ এবং শ্রেণীবিভাগেরও বিশেষ সুবিধা পাইয়াছে। পূর্বে অধ্যয়ন বিষয়ক পুস্তক নির্বাচনের সমস্যা ছিল গুরুতর। বর্তমানে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের পরামর্শে ও নির্দেশে পরিচালিত গ্রন্থশালা তাহা দূর করিতে পারে। সরকার-পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি জনসেবায় যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। অনেক দেশে কেন্দ্রীয় একটি পাঠাগারের নির্দেশে অনেক পাঠাগার পরিচালিত হয়। আধুনিক কালে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার বিজ্ঞানেরই দান। মোটরগাড়ী প্রভৃতি যোগে পুস্তক পাঠাইয়া গ্রামবাসী জ্ঞানপিপাসুরও তৃপ্তি সাধন করা হয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আধুনিক গ্রন্থশালার সম্প্রসারণ

সাধারণ পাঠাগার কেবলমাত্র গ্রন্থাগার নয়—একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, একটি সামাজিক মিলনক্ষেত্রও বটে। সকলের সঙ্গে মিলন এইখানে সহজ ও স্বাভাবিক। তাই দেশের সংস্কৃতির আদানপ্রদান গ্রন্থাগারে সংঘটিত মিলনেই সম্ভব। ইহা জ্ঞানপিপাসুকে করে তৃপ্ত, দরিদ্র ব্যক্তির জ্ঞানভাণ্ডার করে পূর্ণ। সাংসারিক ব্যক্তির কঠোর পরিশ্রমের পর লঘু সাহিত্য সত্যই চিত্তবিনোদন করে। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি দেশবিদেশের সংবাদ সরবরাহ করে। সাধারণ পাঠাগারে বিশেষ

গ্রন্থাগারের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক দিক

ৎসবের আয়োজন করা হয়: যেমন,—আবৃত্তি, সংগীত, জ্ঞানী ব্যক্তির বক্তৃতা, নানাপ্রকার অভিনয়, নানা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি শিক্ষাবিস্তারে সংস্কৃতিবিস্তারে প্রভূত সাহায্য করে। বস্তুতঃ, সুপরিচালিত গ্রন্থাগার জাতির পরম সম্পদ্। পল্লীবাসী অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষের কূপমণ্ডূকতা দূরীকরণে ও চিত্তসংযম দৃঢ়ীকরণে গ্রন্থাগারের দান সত্যই অপরিসীম।

আধুনিক বিশ্বে ও ভারতে গ্রন্থাগারের স্থান

বর্তমান পৃথিবীতে বহু বিখ্যাত গ্রন্থাগার আছে। ফ্রান্সের প্যারী নগরীর 'ব্রিওথিক্ ন্যাশান্যাল' নামক গ্রন্থাগারটি পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার। লণ্ডনের 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম,' আমেরিকার বোষ্টন ও ওয়াশিংটন নগরের গ্রন্থশালা, রোমের লাইব্রেরী প্রভৃতি সুবিখ্যাত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রন্থনকর্ম ও গ্রন্থাগারস্থাপনে এবং ধিকসংখ্যক লোকের চাহিদা মিটাইতে রাশিয়ার সমকক্ষ আর কেহ নাই। ভারত-র্ষেও কয়েকটি সুবৃহৎ গ্রন্থাগার আছে। কলিকাতার 'জাতীয় গ্রন্থাগার,' পাটনার 'খুদাবক্স লাইব্রেরী' এবং দিল্লীর পার্লামেণ্ট-কক্ষের পাঠাগার সুবিখ্যাত। বরোদায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সার্থক হইয়াছে। সেখানে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে গ্রন্থাগার তিষ্ঠিত হইয়াছে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সূচনা কেবল বরোদাতেই হইয়াছে। দ্বিখণ্ডিত বাংলা দেশেও কয়েকটি বেশ বড় বড় গ্রন্থাগার আছে—রামমোহন ইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, রাজসাহী শহরের বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পাঠাগার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত উভয় বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বিভিন্ন কলেজ, বিশ্বভারতী, ভূতত্ত্ব সমীক্ষা (Geological Survey of India) প্রভৃতিরও নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে। আবার বিভিন্ন সওদাগর অফিসেও ভাল ভাল গ্রন্থশালা আছে। ভারতের চাহিদা ও লোকসংখ্যার তুলনায় এই সকল ব্যবস্থা নিতান্তই নগণ্য। গ্রন্থাগারের সহিত বর্তমান মানুষের যোগ অবিচ্ছেদ্য। এই গণতান্ত্রিক যুগে তাই জ্ঞানপিপাসা নিবারণের জন্য ভাল গ্রন্থাগার একান্তই অপরিহার্য। বর্তমানে বিশ্বের প্রতীচ্য দেশসমূহে সরকারই জনগণের জ্ঞানপ্রসারে সহায়তা করিতেছেন; মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, জেলাবোর্ড প্রভৃতি জনগণের এই প্রয়োজন দূরীকরণে ব্রতী; পল্লী-অঞ্চলের মানুষ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সুবিধা ভোগ করিতেছে। কিন্তু প্রাচ্য ভারত অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতের সুদীর্ঘ পরাধীনতা জনগণের মাঝে নিরক্ষরতার অভিশাপ আনিয়াছে। আজিকার এই স্বাধীন ভারতে তাই গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সম্প্রসারণের প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য।

নিরক্ষরতাই শুধু নয়, দারিদ্র্যও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক। সরকারের

আনুকূল্য ও আর্থিক সাহায্য ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত গ্রন্থাগারের সত্যই উন্নতি অসম্ভব। ভারতের বর্তমান গ্রন্থাগারগুলি অধিকাংশই আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন

উপসংহার

দেশপ্রেমিক ধনবানের সাহায্যও বিশেষ কাজে লাগিতে পারে, তবে ভোগসর্বস্ব পৃথিবীতে তাহার আশা বড়ই কম। স্বাধীন ভারতে গ্রন্থাগার উন্নয়ন করিতে হইলে সর্বাগ্রে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা উচিত। উহার ফলে আর্থিক অনটন কিছুটা ঘুচিতে পারে। 'গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার কথাও অবশ্য অনেকে বলেন। গ্রন্থাগার পরিচালনা বিষয়ে গ্রন্থপ্রণয়ন এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ-ব্যবস্থা প্রচলনেও উন্নতি হইতে পারে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার স্থাপন ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহিত শাখা-গ্রন্থাগারের যোগসাধন করিলেও যথেষ্ট উপকার হইতে পারে।

## সমাজকল্যাণ ও জনসেবা

মানুষ সামাজিক জীব। পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে মানবসমাজের অগ্রগতি ও কল্যাণ, সমাজস্থিত দুর্বলকে রক্ষা, অসহায়কে সাহায্য,সর্বহারা আশাহতকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলাই জনসেবা। একদা কোন্ সেই অতীত কালে অরণ্যচারী মানব থাকিত গুহায় ও জঙ্গলে, সঙ্গে থাকিত আপন পুত্র কন্যা ও স্ত্রী। কিন্তু যেদিন মানুষ দলবদ্ধ হইয়া সমাজ সৃষ্টি করিল, মানবসভ্যতার ইতিহাসে উহাই তো

সূচনা

কল্যাণময় শুভ প্রভাত। বর্তমানের এত উন্নতির মূলে মানবেরই সমাজবদ্ধতা। পারস্পরিক সাহায্যের জন্য চুক্তিবদ্ধ ঐ মিলন, মানবের সুকুমার বৃত্তিস্ফুরণের ঐ প্রথম প্রেরণা—উন্নতির শিখরারোহণের প্রথম সোপান। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থানগুলিতে ঐরূপ সমাজব্যবস্থা যে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। সমাজজীবনের প্রাথমিক স্তরের সমাজচেতনা জনগণের অন্তরে যে কর্তব্যবোধ জাগ্রত করিয়াছিল, তাহা মূলতঃ সামাজিকগণের মধ্যে পারস্পরিক সেবা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যুগবিবর্তনে ও সভ্যতার অগ্রগতিতে সমাজচেতনা ও সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বিশ্বপ্রেম বিশ্বপ্রীতি বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রভৃতিতে ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে।

রূপে-রসে-ভরা বিপুল বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ামক জগদীশ্বর। স্থাবর জঙ্গম—সকলই তাঁহার সৃষ্টি। মানুষ, পশুপক্ষী—সকলেরই মাঝে তিনি বিরাজমান। তিনি নিরাকার

সমাজকল্যাণ ও জনসেবার পারত্রিক দিক

হইলেও বিশ্বের রূপের মাঝে তাঁহার মহিমময় প্রকাশ উপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' গীতার 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র, সর্বঞ্চময়ী পশ্যতি', কবির 'হীন পতিতের ভগবান আর ধর্মবেত্তার 'জীবসেবাই শিবসেবা' প্রভৃতি সকল উক্তির মূলাদর্শ জীবসেবাই

ঈশ্বরসেবা। আর্ত ব্যথিত দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের কল্যাণ ও সেবাই মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম। সমাজের কল্যাণ ও মানবসেবা প্রত্যক্ষ সাধনা হইলেও, তাহা পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের সাধনা—লক্ষ্য সেই পরব্রহ্ম সত্য। স্বামী বিবেকানন্দ প্রেমধর্মের আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য দরিদ্রসেবাকে শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সেবাধর্মের মন্ত্র ছিল—"দরিদ্র দেবো ভব"। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা দিয়াছেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?' 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' কবি চণ্ডীদাস প্রেমসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' যুগে যুগে সমাজকল্যাণব্রতী ঋষি, সত্যদ্রষ্টা কবি ধর্মসাধক জনসেবা ও জীবসেবাকেই ঈশ্বর সেবা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বযুগের সর্বদেশের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে ধর্মকে ভিত্তি করিয়া। আর জনসেবা ও জীবসেবা মানবের ধর্মের অঙ্গরূপে হইয়াছে প্রশংসিত।

ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ। ব্যক্তির স্বার্থ ও উন্নতির প্রচেষ্টায় ও উদ্যমে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ আসিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাতে অহেতুক প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়। বিবর্তনবাদের নীতিতে দুর্বল ও অসহায়ের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য সমাজ-জীবনের প্রাথমিক কর্তব্য ও দায়িত্ব হইতেছে সমাজস্থ পরস্পরের সহিত একটা বাধ্যতামূলক স্বার্থের যোগাযোগ। মানুষ একা অসম্পূর্ণ। অপরের সাহায্য তাহার চাইই। জীবনধারণের বেলায় যেমন স্থূল সামগ্রীর প্রয়োজন, তেমনি মানস ক্ষেত্রেও অর্থাৎ হতাশায় প্রেরণা, শোকে সান্ত্বনা, বিপদে উৎসাহ, বিজয়ে প্রশংসা মানুষ মানুষেরই নিকট আশা করে। কাজেই বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অপরকে চাইই। আর অপরকে পাওয়া যায় প্রীতির বিনিময়ে, হৃদয়মাধুর্যের আকর্ষণে। সেবার মাধ্যমেই হয় শ্রেষ্ঠ প্রেমসাধনা। সামাজিক জীবের সেবাবৃত্তির উন্মেষে তাহার পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব ও প্রয়োজন কম নয়। এই সমাজ জাতিভেদহীন মানবসমাজ। সমাজকে অনেকে পূর্ণবিকশিত শতদলপদ্ম রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রতিটি মানুষ ইহার দল—সমগ্রের মিলনেই তো পূর্ণতা।

সমাজকল্যাণ ও জনসেবার ঐহিক দিক

সভ্যতার আদিম প্রভাতে সমাজভিত্তিতে রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ঐ আদর্শ স্বার্থময় বুদ্ধিবাদী রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। তবে সুশাসক প্রজাহিতৈষী রাজন্যবর্গ প্রজার জন্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্তও অপর্যাপ্ত নয়। অনেক ক্ষেত্রে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ পদদলিত হইয়াছে এমন সাক্ষ্যও ইতিহাসে বিরল নয়। প্রবঞ্চিত পদদলিত দারিদ্র্যপীড়িত মানব যেদিন

রাষ্ট্রের সমাজকল্যাণ ও জনসেবার আদর্শ

স্বাধিকার ফিরিয়া পাইতে চাহিল, সেদিন হইল সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। বর্তমান যুগে সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। সমাজকল্যাণ ও জনসেবার ধার্মিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ না হইলেও, রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষের কল্যাণ ও সেবা রাষ্ট্রের প্রধানতম কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, দীনতম নিকৃষ্টতম ব্যক্তিরও উন্নতি-সাধন ও সেবা রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। প্রাচীনকালের রাজানুগ্রহ কিংবা মহাপুরুষ মহাজনের দয়া-দাক্ষিণ্য আজ রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য সমাজকল্যাণ ও সেবাধর্মের নীতি আজ কর্তব্যে পর্যবসিত। মানবসমাজ পূর্ণাবয়ব শক্তিশালী সংহতিতে পরিণত হইয়াছে। অদূরভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বব্যাপী অখণ্ড সমাজ গড়িয়া উঠিবে, অনেকে এমন আশাও পোষণ করেন। আজ পৃথিবীতে সমষ্টিগত জীবনের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আইনকানুন প্রভৃতি সৃষ্টি হইতেছে।

**সমাজকল্যাণ ও জনসেবার আদর্শ ও ক্ষেত্র**

সমাজে বাস করিয়া সমাজস্থ অপর ব্যক্তিবর্গের কল্যাণ সাধন করা এবং অপরের নিকট হইতে আত্মকল্যাণমূলক কিছু পাওয়া—এই পারস্পরিক আদান-প্রদানই জনসেবার মূল আদর্শ। আপন সংসার, আপন পুত্রকন্যা প্রভৃতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান কিংবা আপন স্বার্থসিদ্ধির মূলে সমাজকল্যাণ ও জনসেবার মনোভঙ্গী নাই। অতএব, সমাজস্থ অপর সকলের জন্য আত্মস্বার্থ ত্যাগ করিয়া আয়াস বিসর্জন দিয়া নিজে দুঃখ বরণ করা এবং অপরের কল্যাণে স্বার্থবিসর্জনই প্রকৃত সমাজ-কল্যাণ ও জনসেবা। পীড়িতের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান, ভগ্নোদ্যমের বুকে আশা-সঞ্চার—সমাজকল্যাণ ও জনসেবার অঙ্গ। আর্থিক সাহায্যই কেবলমাত্র জনসেবার মানদণ্ড নয়, অপরের মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশে সাহায্য করাও সমাজকল্যাণ ও জনসেবা। রোগকবলিত, দুর্ভিক্ষপীড়িত, বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের আর্ত মানবের কল্যাণ ও সেবাই সমাজকল্যাণ ও জনসেবা।

**সমাজকল্যাণ ও জনসেবার পরিচয়**

প্রাচীন ভারতে সেবাধর্ম পরম ধর্মরূপে বিবেচিত হইত। বর্ণাশ্রমধর্মের মধ্যেও জনসেবার ব্যবস্থা ছিল। গৃহস্থের নিত্যকরণীয় পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে অতিথিসেবা ও জীবজন্তুদিগের সেবা ছিল অন্যতম। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে সমাগত অতিথিবৃন্দের পরিচর্যার ভার লইয়াছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ জনসেবার মধ্য দিয়া স্বধর্ম আচরণ করিয়া জীবন সার্থক করেন, ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টানমাত্রই প্রতিটি মানুষকে ঈশ্বরের জীব মনে করেন। বলিতে কি, মহাত্মা যীশু জনসেবার জন্যই মৃত্যু বরণ করেন। মহাত্মা বুদ্ধ জনসেবাকে পরম আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। সম্রাট্ অশোকের জনসেবা ও জীবপ্রেম ইতিহাসবিশ্রুত। বৌদ্ধদের সংঘগুলি জনসেবার

কেন্দ্র ছিল। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের মানবপ্রেম, যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বীরসাধক বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির জনসেবার তুলনা নাই। প্রাচীন ভারতের পল্লীসমাজের স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ প্রভৃতিও সমাজকল্যাণ ও জনসেবার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অন্নহীনে অন্নদান, অতিথির পূজা, আর্তের সেবা, শোকে সান্ত্বনা-প্রদান প্রভৃতি কার্য ছিল প্রাচীন সমাজসেবার অঙ্গ। রাজা, জমিদার, দেশের ধনীরা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জনসেবা করিতেন। বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, পুকুরপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঐ সমাজকল্যাণ ও জনসেবা। বর্তমানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান —যেমন, রামকৃষ্ণ মিশন এই কার্যেই ব্রতী। কল্যাণকামী ভারতরাষ্ট্র বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে নিযুক্ত। তন্মধ্যে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা অন্যতম।

সমাজকল্যাণে ও জনসেবায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের বৈপরীত্য—উপসংহার

আধুনিক যুগের পূর্বে জনসেবা ছিল ধর্মের অঙ্গ ; জনসেবাকেই ঈশ্বরের আরাধনা বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রভৃতির আবির্ভাবে পাশ্চাত্ত্য সভ্য মানুষের মনোবৃত্তিতে বিরাট্ পরিবর্তন আসিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীরা সেবাকে নীতিরূপে গণ্য করে। জনসেবা ও সমাজ-কল্যাণ সামাজিক নীতি ও আইন হিসাবে সেই সমস্ত দেশে গৃহীত। কিন্তু প্রাচ্য ভূখণ্ডে মনোবৃত্তির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইলেও আজও ইহা পুণ্যকর্ম রূপে স্বীকৃত। জনসেবা এখনও ধর্মাচরণের অঙ্গবিশেষ। এখানে সেব্য সেবা গ্রহণ করিয়া সেবককে ধন্য করে এবং সেব্যমানের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। পাশ্চাত্ত্যে দান সেবা ও দয়া অপরের শ্রমবিমুখতা ও আলস্যের পরিপোষক রূপে বিবেচিত, আর প্রাচ্যে সেবা দয়া প্রভৃতি ধর্মপালনের অবশ্য করণীয় অঙ্গরূপে মর্যাদা-প্রাপ্ত। মোট কথা, জনসেবার আদর্শ লইয়া যতই বাগবিতণ্ডা হোক না কেন, মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মানবের সুকুমার বৃত্তিনিচয়ের উন্মেষক বলিয়া সমাজকল্যাণ ও জনসেবা চিরকালই শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হইবে।

## ধর্মঘটের রূপ ও রূপান্তর

ধর্মঘটের ইতিহাস খুব অতীত হইতে আরম্ভ করা যায় না। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে ইহার জন্মলগ্ন ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধবদ্ধ। কেহ কেহ বলেন যে, প্রাচীন-

'ধর্মঘটে'র সংজ্ঞা

কালে ব্যবসায়ীরা নাকি জলপূর্ণ মঙ্গলঘট স্পর্শ করিয়া কোন সদুদ্দেশ্যে কখনও কখনও কর্ম হইতে বিরত হইত। এই ব্যাপারের সঙ্গে আধুনিক কালের 'ধর্মঘটে'র যে কোনই সাদৃশ্য নাই, ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই কি করিয়া শ্রমিক-আন্দোলনের একটি বিশেষ রূপের সহিত এই নামটি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হইয়া গেল, তাহা বলা সহজ নয়।

ধর্মঘটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম যোগ রহিয়াছে শিল্পায়নের বা Industrialisation-এর শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম, শ্রমিক-আন্দোলন ও ট্রেড্-ইউনিয়ন বা শ্রমিক-সংঘের বিকাশে মধ্যেই রহিয়াছে ইহার উৎস। কৃষকসমাজও কখনই যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ধর্মঘটে পথ গ্রহণ করে নাই, একথা সত্য নয়। কিন্তু 'ধর্মঘট কৃষক-আন্দোলনের স্বাভাবিক ফল নয়। কৃষক-আন্দোল অতীতে প্রায়ই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ ধরিত। বর্তমানেও শান্তিপূর্ণ কৃষক-আন্দোল 'ধর্মঘট' অপেক্ষা অধিকতর বৈপ্লবিক রূপ গ্রহণ করে। জমিদার, জোতদার, জমি ফসলের সঙ্গে কৃষকশ্রেণীর যে বিশেষ সম্বন্ধ তাহাতে ধর্মঘটের পথ তাহাদের দাবি আদায়ের প্রশস্ত পথ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ধর্মঘট তাই প্রধানতঃ শ্রমিক শ্রেণীরই সংগ্রামের অস্ত্র হইয়া রহিয়াছে।

শ্রমিকশ্রেণী ও ধর্মঘট

শ্রমিকগণ একটি কেন্দ্রে এক সঙ্গে কাজ করে। ফলে এক দিকে যেমন তাহাদে মধ্যে সংঘশক্তি সহজেই বিকশিত হয়, অপর দিকে তেমনি মিল মালিকদের শোষণে একটি সুবিধা রহিয়াছে—They have nothing to lose except the chain of their hands." তাহাদের মধ্যে পিছুটান থাকে না ফলে মালিকের শোষণও অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচিবা মত মজুরী কিংবা মালিকের অন্যান্য অত্যাচার নিরসনের দাবিতে সময় সময় তাহার ধর্মঘটের পথ বাছিয়া লয়। অবশ্য ধর্মঘটের অস্ত্র তূণের শেষ অস্ত্র—ইহাকে 'ব্রহ্মাস্ত্র বলা যাইতে পারে। এই ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়িবার পূর্বে ছোটোখাটো বায়ুবাণ বরুণবা নিক্ষেপের প্রথাও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে স্বীকৃতি পাইয়াছে। এইগুলি হইল— দাবির জন্য গণসহি-সংগ্রহ, সভা-সমিতির মারফৎ জনমত গঠন ও মালিকের উপরে চাপ দেওয়া, গণ-ডেপুটেশন, ম্যানেজার বা মালিককে ঘেরাও করিয়া দাবি আদায়ে চেষ্টা প্রভৃতি।

ট্রেড-ইউনিয়ন ধর্মঘট

ইহাতেও যদি তাহাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি মালিকপক্ষ কর্ণপাত না করেন, তখন তাহারা হয়ত একদিনের বা কয়েক ঘণ্টার জন্য 'প্রতীক ধর্মঘট' করে। প্রতীক ধর্ম ঘটের মধ্য হইতে এক দিকে তাহারা যেমন আপন সংঘশক্তিকে শেষবারের মত পরীক্ষা করিয়া লয়, তেমনই মালিক পক্ষকে আপন ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রচণ্ডতা দেখাইয়া অবনত করিবার শেষ চেষ্টা করে। ইহার পরের স্তর হইল 'লাগোয়া ধর্মঘটে'র স্তর। মজুরের দাবিগুলি মালিকপক্ষের নিকট পেশ করে ও কার্য হইতে বিরত হয়। তখন তাহারা সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া আপনাদের দাবিকে জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করে। স্বেচ্ছা সেবকদল অর্থসংগ্রহে লাগিয়া যায়। সংগৃহীত ও ট্রেড-ইউনিয়নের সঞ্চিত অর্থে

প্রতীক ও লাগোয়া ধর্মঘট

ধর্মঘটীদের পরিবারবর্গ কোনক্রমে বাঁচিয়া থাকে। শেষ পর্যন্ত যদি মজুরদের সংঘশক্তি অটুট থাকে, যদি তাহারা মালিকপক্ষের প্ররোচনা ও ভাড়া-করা গুণ্ডাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয়, যদি পুলিশের জুলুমে ভাঙ্গিয়া না পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের জয়লাভ ঘটে। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের প্রধান প্রধান দাবি মানিয়া লয়। আর তাহা না হইলে শ্রমিকদের পরাজয় ঘটে—দুর্দশার আর অন্ত থাকে না।

বর্তমানে ধর্মঘট কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীরই নয়, নিরস্ত্র ও অত্যাচারিত জনসাধারণের প্রতিবাদের সাধারণ অস্ত্র হিসাবে সকল শ্রেণীরই মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

**অন্যান্য শ্রেণীর ধর্মঘট**

কেরাণীরা বেতনবৃদ্ধির দাবিতে 'লেখনী অবনমন ধর্মঘট' (Pen-down strike) করিতেছেন, কখনও-বা 'লাগোয়া ধর্মঘটে'র পথও লইতেছেন। ছাত্রগণ ইস্কুল-কলেজের মাসিক মাহিনা কমাইবার দাবিতে 'অবস্থান ধর্মঘট' করিতেছে। কোথাও কোথাও শিক্ষকগণও এই পথে নামিতেছেন। কোথাও কোথাও 'অনশন ধর্মঘট' করিয়া দাবি আদায়ের চেষ্টাও চলিতেছে। এই যে 'অনশন ধর্মঘট', এই যে 'সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ'—ইহা গণবিপ্লবের এক অতুলনীয় অব্যর্থ অস্ত্র। কিন্তু নৈষ্ঠিক সহযোগ ও নিয়মানুবর্তিতা হইতেই এই অস্ত্রের প্রয়োগে অধিকার জন্মিয়া থাকে। সত্যাগ্রহের ব্যাপারে ক্ষুধাতুর অবস্থা নয়, উপবাসই সত্যাগ্রহীর কাম্য। কারণ,—উপবাসে মনোবল বাড়ায়, আর ক্ষুধাতুর অবস্থায় উহা ক্ষীণ হইয়া যায়।

কেবলমাত্র অর্থ নৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে 'সাধারণ ধর্মঘট' ঘটিতে দেখা যায়। ইহার উদ্দেশ্য কোন বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ দাবি পূরণ করা নয়, ইহা কোন সাধারণ

**সাধারণ ধর্মঘট—হরতাল—শেষ কথা**

রাজনৈতিক দাবি পূরণের জন্য সকলের মিলিত প্রতিরোধ। সাধারণ ধর্মঘট সফল হইলে দেখা যায়, সমস্ত কলকারখানা বন্ধ, গাড়ী-ঘোড়া অচল, দোকান-বাজার ইস্কুল-কলেজ আপিস-কাছারী সবই জনশূন্য। ইহাই 'হরতাল'। আলাউদ্দিন খিলজীর সময়েই ইহা উদ্ভূত হয়। তৎকালে শস্যের বাজারগুলিকে বলা হইত 'মণ্ডী'। বাংলার বাহিরে বড় বড় শহরে আজও অনেক 'মণ্ডী' আছে। ঐ সময়ে 'শাহান্-ই-মণ্ডী' অভিধেয় জনৈক রাজকর্মচারী সৈন্যদের জন্য নির্দিষ্ট শস্যক্রয়ের জন্য বহাল থাকিতেন। সৈন্যদের ও জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ-অনুযায়ী শস্যবিক্রয় তিনি লক্ষ্য করিতেন। নির্দিষ্ট এক দিনে যুগপৎ বাজারের সব দোকান বন্ধ করিবার নিয়মটি তখনই প্রচলিত হয়। ঐ দোকান-বন্ধের দিন রাজকর্মচারীদের গৃহগুলি চিনিবার সুবিধার নিমিত্ত 'হরিতাল' দিয়া হলুদরঙের চিহ্ন ঐ গৃহগুলিতে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইল। ঐ 'হরিতাল' শব্দ হইতেই আজিকার এই 'হরতালের'র জন্ম। হরতালের দিনে

দোকানপাট বন্ধ করিবার রেওয়াজ আজও প্রচলিত। খুব উঁচু প্রতিরোধের স্তরে উঠিয়া গেলে 'লাগোয়া' সাধারণ ধর্মঘট কিরূপে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেও পিছু হটিতে বাধ্য করে, ১৯৪৬ সালের বোম্বাইতে ও কলিকাতায় আমরা তাহা দেখিয়াছি। এমন কি, এই আন্দোলনই প্রত্যক্ষতঃ আমাদের স্বাধীনতা-লাভের জন্য দায়ী।

## বন্যা

সূচনা

কোন্ সুদূর অতীতে অনন্ত অসীম জলের বিস্তার হইতে খেয়ালী বিধাতার এক কটাক্ষ-ইঙ্গিতে এই সামান্য একখণ্ড ভূমির জন্ম হইয়াছিল। তাহার পর হইতে এই সামান্য ভূমিখণ্ডের উপর সমগ্র প্রকৃতি-নিয়মের আক্রমণের যেন আর শেষ নাই। 'জল, শুধু জল'—এর বিপুল সর্বব্যাপকতায়ও তাহার তৃপ্তি নাই। তাহার বক্ষ হইতে ছিনাইয়া-লওয়া এই মাটিটুকুকে আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহার কতই-না চেষ্টা! ভূকম্পনে কাঁপাইয়া, অগ্ন্যুৎপাতে পুড়াইয়া নদী-ধারায় ও বৃষ্টিজলে ধোয়াইয়া এবং বন্যায় ডুবাইয়া আমাদের এই সামান্য আশ্রয়টুকুকে লইয়া প্রকৃতিমাতার কী নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র! বিশেষতঃ বন্যার তাণ্ডবে যখন মাঠ-ঘাট-উঠান ডুবাইয়া, বাড়িঘর ভাসাইয়া, একাকার একটি নবতর সমুদ্র কৌতুকহাস্যে মুখর হইয়া উঠে, তখন চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, এত জলেও কি তোমার তৃষ্ণা মেটে না। যে সামান্য মাটিটুকু আমাদের দিয়াছ, তোমার বিশ্বতৃষ্ণা কি তাহাকে গ্রাস করিলেই মিটিয়া যাইবে?

বন্যার বর্ণনা ও মানুষের দুর্দশা

বন্যাপ্লাবিত এই বাংলা দেশের করুণ দৃশ্য কে না দেখিয়াছে! আর বন্যা-ত্রাসিত মানবের শত দুঃখলাঞ্ছনার কে না শরিক হইয়াছে? কারণ,—বন্যার সঙ্গে এ দুর্ভাগা দেশের এক দুর্নিবার আত্মীয়তা আছে—দুর্ভাগ্যের আত্মীয়তাই বলা যাইতে পারে—বলা যাইতে পারে রাহুর প্রেম! আমরা তাহাতে তাড়াইতে চাই, তাহার এ মৃত্যু-আলিঙ্গন হইতে বাঁচিতে চাই, কিন্তু সে বৎসরে বৎসরে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে, জলে একাকার শ্মশানপ্রান্তরে তালগাছটিকে রহস্যভরে নাড়া দিয়া সরব হাস্যোচ্ছলতায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে! পাশ দিয়া ভাঙ্গিয়া-পড়া ইস্কুলঘরের চালা যায় ভাসিয়া—একটি অজগরশিশু ছাগল-ছানাটির পাশে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে! উভয়ের চোখের ভাষায় একই আতঙ্ক শিহরিয়া ওঠে! দুই চারিটি গলিত শব স্রোতের মুখে ভাসিয়া যায়! দূরে দূরে দুই একটি বাড়ির ছাদ মানুষে-মানুষে কালো হইয়া ওঠে! শিবের মন্দিরে ত্রিশূলটায় আটকাইয়া ঝুলিতে থাকে একটি শিশুর মৃতদেহ! অশ্রান্ত বৃষ্টিতে পাশের জলাভাবাগ্রস্ত ওলাউঠা-জর্জর গ্রামটি ডুবিয়া ডুবিয়া ডুকরাইয়া কাঁদে! কাছারি বাড়ির দোতলায় আর ঘোষেদের বাড়ির অলিন্দে আশ্রিত মানুষের কৃন্দনমিশ্রিত প্রার্থনাকল্প অভিশাপ কি দেবতাকেও স্পর্শ করে? ধানগাছের শিষগুলো যায় পচিয়া! বাড়িঘর ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া ভাসিয়া

যায়! যাহা-কিছু সঞ্চয় খাদ্যবস্ত্র অর্থ কোথায় চলিয়া যায়! অকালমৃত্যু গ্রাস করে মানুষকে! তার পরে ধীরে ধীরে জল কমে, লঞ্চ করিয়া আসে 'রিলিফ', কলিকাতার যুবকেরা গান বাঁধে ও অর্থ সংগ্রহ করে—

'বিপুল বন্যা গিয়াছে ভাসিয়া…'

ইত্যাদি! ভিজা কাদামাটিতে মানুষ আবার ঘর বাঁধে, আবার সংগ্রাম করে, আবার কোনক্রমে বাঁচিতে চেষ্টা করে!

কিন্তু বারংবার মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষিয়া, পরাজিত হইয়াও মানুষ দমে না, আবার সংগ্রাম করে। মৃত্যুকে জয় করিবার সাধনাই তো জীবনের সাধনা। মরিতে মরিতেও মানুষ তাই মৃত্যুকেই মারে। মানুষ প্রকৃতিকে জানিতে চেষ্টা করে, তাহার চরিত্র বুঝিয়া স্বভাবের পথেই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার সাধনা করে। বিজ্ঞানায়ুধ মানুষ প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়াই প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং জয়ী হয়।

বন্যার কারণ

কেন এই ভূকম্পন, এই অগ্ন্যুৎপাত, এই বন্যা—মানুষ ইহাদের কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করে। এই আবিষ্ক্রিয়ার পথেই ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, অন্য কোন পন্থা নাই। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এই কারণ আবিষ্কারে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। প্রধানতঃ, অতিবর্ষণ।

—(১) অতিবর্ষণ

অতিবর্ষণের ফলে খাল পুকুর বিল ডুবিয়া যায়, নদীর গভীরতা অল্প হইলে তীর ছাপাইয়া কিংবা বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল লোকালয়ে প্রকাশ করে এবং গ্রাম শহর ভাসাইয়া দেয়। ১৯৫৫ সালের আসামের বন্যার কারণ খুঁজিতে গিয়া পুণা আবহাওয়া আপিসের বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছিলেন যে, প্রবল বৃষ্টিপাতই উহার কারণ। ১৯৫৬ ও ১৯৫৮ সালের মেদিনীপুরের ও ১৯৫৯ সালের বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্লাবনের কারণও ঐ অতিবর্ষণই। বন্যার দ্বিতীয় কারণটি একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। নদীর কাজ দুইটি: প্রথমতঃ, অববাহিকায় যে বৃষ্টিপাত হয় তাহার জলরাশিকে বহন করিয়া সমুদ্রে বা হ্রদে লইয়া যাওয়া; দ্বিতীয়তঃ, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়ীভূত পাথর বা মাটিও বহন করা। এই দ্বিতীয় কাজটি নির্ভর করে নদীর ঢাল ও প্রবাহিত জলের পরিমাণের উপরে। যদি কোন কারণে ঢাল বা জলের পরিমাণ কমিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ পলি বা বালি নদী-গর্ভে জমিতে থাকিবে। পরবর্তী বর্ষার যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হইবে তাহার পক্ষে নদীগর্ভের ধারণ-ক্ষমতা যে অনেকখানি কম হইবে ইহাই স্বাভাবিক। কারণ ইতিমধ্যে পলি জমিয়া নদীগর্ভ উঁচু হইয়া গিয়াছে। ফলে এই অতিরিক্ত পরিমাণ জলের চাপে নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে, নদী প্রশস্ততর হইবে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নদী যতই প্রশস্ত হইবে, তাহার স্রোত ততই কমিবে। স্রোত যত কমিবে, ততই পলি বেশি

—(২) নদীগর্ভের উন্নতি

করিয়া জমা হইবে, নদী আরও প্রশস্ত হইবে। আবার ইহার ফলে নদী সরল-সহজ পথে না গিয়া, বাঁকা পথে প্রবাহিত হয়। এই কারণে নদীগর্ভ ক্রমশঃ উঁচু হইতে থাকে এবং বন্যার জল বাঁকা পথে যাইবার সময়ে বাধা পাওয়ায় পাড় ভাঙিয়া নদী উপত্যকায় বন্যা লইয়া আসে। এই কারণেই নদী দিক পরিবর্তন করে অনেক সময়ে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে কুশী, তিস্তা প্রভৃতি উত্তর-ভারতের নদীগুলিতে বন্যার ইহাই প্রধান কারণ। ব্রহ্মপুত্রের বন্যার কারণ কিন্তু পৃথক্। ১৯৫০ সালে আসামে যে ভূমিকম্প হয়, তাহার পর হইতেই ব্রহ্মপুত্রে বন্যার প্রকোপ বাড়িয়াছে। ভূপ্রকৃতিতে ঐ ভূ-কম্পনের ফলে এমন কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, যাহার দরুণ এই বন্যার প্রকোপ বাড়িয়াছে।

—(৩) ভূগর্ভস্থ জলের উন্নতি

অনেক ভূতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, এই কম্পনের ফলে ভূগর্ভস্থ জলের উচ্চতা বাড়িয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে এই জল ভূপৃষ্ঠের মাত্র দুই ফুট নীচে থাকে। ফলে বর্ষার জল মাটিতে শুষে না, সমস্তই নদীপথে প্রবাহিত হয় ও বন্যা ঘটায়।

মানুষ বন্যার নানা কারণ আবিষ্কার করিয়াছে এবং ইহা নিবারণের নানা চেষ্টাও করিতেছে। মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। চীনদেশের যে হুয়াই নদী বৎসরের পর বৎসর তাহার অববাহিকার জনসাধারণকে চরম দুর্দশার মধ্যে ফেলিত, সে-দেশের জনসাধারণ ও সরকারের চেষ্টা তাহার প্রকোপ অনেকটা শান্ত করিয়া আনিয়াছে। গত ১৯৫৪-৫৫ সালে এই নদীর জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা

নিবারণের উপায়

এর পাড়ের মাটির বাঁধ আরও উঁচু করিয়াছে। তাই কোন অঞ্চলেই বন্যার তোড় তেমন কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই। সাময়িকভাবে বাঁধ বাঁধিয়া বন্যার প্রকোপ নিবারণ করা সম্ভব এবং সম্প্রতি বিপদের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য এই পন্থা অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু স্থায়িভাবে এই সমস্যার সমাধানের দিকে আমাদের অবশ্যই অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমতঃ যে সমস্ত নদীর ঢাল কম, এবং নদীগুলি বেশি চওড়া, সেই সব নদীতে বাঁধের সাহায্যে বহু জলাধার প্রস্তুত করিতে হইবে। বর্ষাকালের অতিরিক্ত জল

(১) জলাধার-নির্মাণ

এই জলাধারগুলিকে পূর্ণ করিবে। ফলে কুশী বা তিস্তার মত নদী কতকগুলি জলাধারে পর্যবসিত হইবে এবং নদীগর্ভের ক্ষয় প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবে। জলধারের জল গ্রীষ্ম-কালে বহু খালপথে ধীরে ধীরে ছাড়া হইবে আর বন্যার জল একটিমাত্র অঞ্চলে ২৪ ফুট উঁচু না হইয়া এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া ১½ ফুট উঁচু হইবে। এই জল সহজেই সেচকার্যে ব্যবহৃত হইবে। অতঃপর বন্যা তো রুদ্ধ হইবেই, কৃষিরও ঘটিবে উন্নতি। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বর্ষার সব জল জলাধারে সঞ্চয় করা যাইবে না। কিছু পরিমাণ জল নদী-

লের বর্তমান খাতে প্রবাহিত হইবে। এই কারণে নদীর চওড়া খাতটি সংকীর্ণ করিতে হইবে নদীর দুই তীরে মাঝে মাঝে পরিকল্পিত উপায়ে 'গাইড্ ব্যাঙ্ক নির্মাণ করিয়া। ইহার ফলে নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া নদীর খাত চওড়া হইতে পারিবে না।) তাই নদীখাতে স্রোত বেশি থাকিবে, পলিমাটিও হইয়া ভাসিয়া যাইবে। ব্রহ্মপুত্রের জন্য কিন্তু অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এত বড় নদীতে বাঁধ বাঁধিবার উপযুক্ত নদী আসামে নাই। তাই ইহার ছোটো ছোটো উপনদীতে এমনভাবে বাঁধ দিতে হইবে যাহাতে তাহাদের জল ব্রহ্মপুত্রের গর্ভ ভর্তি করিতে না পারে। ব্রহ্মপুত্রের জল নামিয়া গেলে উপনদীগুলিতে সঞ্চিত জল ধীরে ধীরে ছাড়িতে হইবে।

—(২) 'গাইড্ ব্যাঙ্ক'

—(৩) উপনদীতে ছোটো ছোটো বাঁধ

আমাদের জাতীয় সরকার যদি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে নদী-সংস্কারের এই ব্যবস্থাগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে অনেক দুঃখধন্ধার শেষে আমাদের মুখে আবার ফুটিবে হাসি। বিপুল জলরাশির মৃত্যুর আলিঙ্গন সেচকার্যের স্বর্ণপ্রসূতায় রূপান্তরিত ঘটিবে। মানুষের জয় ঘটিবেই।)

উপসংহার

## সংগ্রামই জীবন

'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে'—কবিগুরুর এই উক্তি নিছক ভাববিলাস বা একটা চটকদারী ঢঙ্ নয়। এই সত্যেরই প্রেরণা রয়েছে প্রতিটি জীবের জীবনের মর্মমূলে। অবিরত অগ্রাভিযানই তো জীবনের সাধনা। 'চঞ্চলা' নদীর মতোই প্রাণপ্রবাহ শুধু উদ্দামবেগে ধাবমান। স্থিরতা, স্থাণুত্ব জড়েরই ধর্ম। জীবের এই অগ্রাভিযানের পথে আসে বাধা, আসে সংঘাত। সংস্কারের অচলায়তন রোধ ক'রে দাঁড়ায় তার পথে। শুরু হয় সংগ্রাম। মানুষের জীবন এই সংগ্রাম ও শান্তি, গতি ও স্থিতির আবর্তমান ইতিহাস। সভ্যতার ইতিহাস এই সংগ্রামময় অগ্রগতিরই নিদর্শন।

ভূমিকা

বিজ্ঞানের মতে, প্রাণতত্ত্বটি একটি আকস্মিক আবির্ভাব। ব্রহ্মাণ্ডের সতত সঞ্চরমান নীহারিকাপুঞ্জের বিভিন্ন বিবর্তনের ভিতরে প্রাণের উৎপত্তির কোন সুদূর সম্ভাবনাও ছিল না। ব্রহ্মাণ্ডের শৈত্য এবং উত্তাপের প্রতিকূল পরিমণ্ডলে প্রাণ একটি বিস্ময়ের মতোই উদ্ভূত হয়েছে। চতুর্দিকে এই প্রাণকে ধ্বংস করার জন্যে শক্তিপুঞ্জের খেলা চলছে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা বলা যায়, যে কোন সময়েই প্রাণের 'Heat death' বা 'Cold death' হতে পারে। কাজেই এই প্রাণতত্ত্বটিকে রক্ষা করবার জন্যে প্রতি পাদক্ষেপে সংগ্রাম শুরু হয়েছে। যেখানে জীবনের বিকাশ, সেইখানেই তো সংগ্রামের প্রচণ্ডতা।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জীবন

মাটির নীচে যে বীজ থাকে সংগোপনে সকলের দৃষ্টির আড়ালে, তাকে প্রতি মুহূর্তে ক'র্‌তে হয় দুর্বার সগ্রাম; মৃত্তিকা ভেদ ক'রে তাকে লাভ ক'রতে হয় আলোর ঘুমভাঙ্গানো পরশ। কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা, কত রৌদ্র-বৃষ্টিই যে তাকে আঘাত হানে। কিন্তু সকল আক্রমণ ব্যর্থ ক'রে ফলসম্পদে ভরে' উঠে' বীজটি তার নিজের জীবনের সার্থকতাই প্রতিপন্ন করে।

সৃষ্টির আদিমতম এককোষী জীব থেকে শুরু ক'রে মানুষ অবধি এই সংগ্রামের অন্ত নেই। এককোষী জীবের সংগ্রাম শুরু হয় পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনার প্রচেষ্টায় ও খাদ্যান্বেষণে। প্রাণ রাখার প্রচেষ্টায় এই প্রাণপণ সংগ্রামেরই ফলে জাগে বংশরক্ষার প্রচেষ্টা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে দ্বন্দ্বময় পরিবেশের নিদর্শন। প্রাণ-প্রবাহ এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই করে অগ্রগমন। এই সংগ্রামই জীব-বিবর্তনের ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন নিয়ামক। যারা সংগ্রামে হয়েছে পরাঙ্মুখ বা পরাস্ত, তাদের জরদ্গব অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে। বহু অতিকায় জীব জীবনের সার্থক সঞ্চয়ে স্থিতিমান হয়েছে বলেই, সংগ্রাম ত্যাগ ক'রে শান্তিকে অভ্যর্থনা করেছে বলেই তো আজ শুধু ইতিহাসের পাতায়ই তা রয়েছে বেঁচে। কত মানবজাতি, কত পশুজাতি সংগ্রামবিমুখ হয়ে এমনি করে জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তারও তো ইয়ত্তা নেই। মানুষের তো কথাই নেই। মানুষের সংগ্রাম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনার সংগ্রাম নয়— মানুষের সংগ্রাম প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করার সংগ্রাম, প্রকৃতিকে আজ্ঞাবহ কামধেনু করার সাধনা। শুধু প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামেই মানুষ ব্যাপৃত নয়, মানুষের সংগ্রাম নিজের পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে। অর্থনৈতিক জীবন তো সর্বাত্মক সংগ্রামের একটা বিরাট্ পরিমণ্ডল। মানুষের জীবনদর্শনে 'পেন্‌সন' কথাটির স্থান নেই। তাই সংগ্রামে যেদিন আসে ক্লান্তি, সেদিন জীবন লাভ করে নিষ্প্রাণ শবের অবিচল স্থিতি। শুধু বহির্জগতেই নয়, অন্তর্জগতেও মানুষের সংগ্রামের অন্ত নেই। মনের শুভ ও অশুভ প্রবৃত্তির সংগ্রাম, নীতিবোধ ও জান্তব জিঘাংসার সংগ্রাম, মানুষকে প্রতিনিয়ত 'আদিম নিষাদে' করে পরিণত। মানস ভাবনিচয় ও প্রবণতাসমূহের ভিতরে দিবারাত্র যে সংগ্রাম চ'ল্‌ছে, তাতে জয়ী হ'তে পার্‌লে মানুষ উন্মাদ হয়ে জড়ত্ব লাভ ক'রত, অথবা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে সংগ্রাম

জীবনের অস্তিত্ব যেমন সংগ্রাম-নির্ভর, জীবনের সফল রূপায়ণও তেমনি সংগ্রামের উপরেই করে নির্ভর। জীবন যদি শান্তি ও সমৃদ্ধির পঙ্গুতা বরণ করে

নেয় তো সে জীবনেরও হয় ভাবমৃত্যু। যে-সকল অতিকায় জীব ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, তাদের বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়নি বা সে সংগ্রামে তারা জয়ীও হয়নি—একথা যথার্থ নয়। স্থূল সংগ্রাম তারা করেছে এবং জয়ীও হয়েছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাদের পরিবেশের অন্তহীন প্রাচুর্য তাদের জীবনে এনেছে নিশ্চিন্ত অলস রোমন্থন; তাই তাদের জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল নব নব অভিবিকাশের প্রেরণা। কালধর্মে সবাইকেই ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হ'তে হয় কিন্তু তাদের অস্তিত্ব বেঁচে থাকে বংশধরদের কর্মপ্রচেষ্টার ভিতরে। অবশ্য শান্তির নিঃস্বতায় কত জাতিই তো এমনি করে চলে গেল জীবনের যবনিকার অন্তরালে।

**ক্রম-অভ্যুদয়ের অধ্যাত্ম-সংগ্রামেই জীবনের সার্থকতা**

মানুষ যদি নিজের সৃষ্টিকে না করে অতিক্রম, যা-কিছু সঞ্চয় তাই দু'হাতে ফেলে ফেলে সে যদি এগিয়ে না যায়, পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় ক্ষয় করার সাহসই যদি তার না থাকে—তবে তার জীবন পশুজীবনেরই সমান। মানুষের জীবনে প্রতিক্ষেত্রে রয়েছে কর্তব্যের আহ্বান। কর্তব্যপালনের সময়ে পরাঙ্মুখ হয়ে নিশ্চিন্ত ঐশ্বর্যের মাদকতায় জীবনকে সুরভি-মন্থর ক'রে তুললে উপভোগ হয় বটে, কিন্তু জীবনের ভাবাদর্শ তাতে হয় বিপর্যস্ত, জীবনের অগ্রাভিযানও হয় ব্যাহত। প্রকৃতির দানে কোল উঠ্‌ল ভরে, আর সেই ঐশ্বর্যের পসরা নিয়ে নিজের ভোগলালসা ক'রলাম চরিতার্থ—জীবনের অর্থ এত ক্ষুদ্র নয়। জীবনের দায়িত্ব অনেক—সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি, এমন কি সমগ্র জাতির প্রতি, প্রত্যেক মানুষের রয়েছে সুনির্দিষ্ট কর্তব্য। সেই সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হলে মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব সংশয়াকুল হয়ে উঠ্‌বে একথা নিঃসন্দেহ।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যুগের ব্রহ্মাস্ত্র আণবিক বোমাকে যদি মানুষ অহিংস সংগ্রামে পর্যুদস্ত না ক'রতে পারে, তবে সমগ্র মনুষ্যজাতিই একদিন নিশ্চিহ্ন হবে। নিজের

**উপসংহার**

পরিপূর্ণ সম্ভাবনাকে সমগ্রভাবে বিকশিত করাই তো মানুষের সার্থকতম সংগ্রাম। সর্বপ্রাণিসাধারণ জৈব সংগ্রামে হয় প্রাণের প্রতিষ্ঠা, মানুষের এই আত্মবিকাশমুখী অধ্যাত্মসংগ্রামে হয় জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা। এই অধ্যাত্মসংগ্রাম থেকে মানুষ—শুধু মানুষ কেন, যে কোন প্রাণী—যেদিন বিরত হবে, সেদিন তার অস্তিত্ব ধীরে ধীরে যাবে মুছে। এই অধ্যাত্মসংগ্রামেই মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা, এতেই অমরাবতীর পথে মানুষের অগ্রগতি। অতএব—

'মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা,
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?'

# শ্রেষ্ঠ মানব

প্রকৃতির অন্তহীন অনবচ্ছিন্ন বিবর্তনের ফলে যেদিন মানুষ প্রথম-সূর্যের বিপুল আলোকের অভিনন্দন পেল, সেদিন ধরিত্রী প্রাণের পুলকিত উল্লাসে গেয়ে উঠেছিল—'ন মানুষাৎ পরতরং হি কিঞ্চিৎ'—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। সত্যই মানুষ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার এক বিস্ময়কর অভিব্যক্তি। জীবনপ্রবাহের (Elan vital) যে-ধারা এককোষী জীব থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত তরঙ্গায়িত, সমগ্র প্রাণিজগৎ সেই উদ্দাম স্রোতের অন্ধবেগে আবর্তনশীল।

ভূমিকা

কিন্তু মানুষ? সেই উচ্ছ্বসিত প্রাণপ্রবাহের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে মানুষ অকস্মাৎ চম্‌কে থেমে গেছে, প্রচেষ্টা করেছে তার গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় ক'রতে—জহ্নুমুনির মতোই তার উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাসকে গ্রাস করে' তাকে নিজের কাজে, বিশ্বের কল্যাণে, শতধা উৎসারিত করেছে জাহ্নবীধারার মত। মানুষের এখানেই বৈশিষ্ট্য। আত্মসচেতনতা ও জ্ঞানকর্ষণাই মানুষের মনুষ্যত্ব। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বের যেখানে পরিপূর্ণতম বিকাশ, তার লক্ষণ কি?—তার বৈশিষ্ট্যই-বা কোথায়? যুগ যুগ ধরে' কত মহামানব, কত অবতার, কত পয়গম্বর ধরিত্রীর ধূসর ধূলিকে দিয়েছেন অমৃত-পরশ; কত মহাবীর জগৎকে স্তম্ভিত করেছেন শৌর্যমহিমায়; কত ত্যাগী ও জ্ঞানী ত্যাগের ঐশ্বর্য জ্ঞানের দীপ্তির উজ্জ্বল নিদর্শন গেলেন রেখে; কত বুদ্ধ ও চৈতন্য অহিংসা ও প্রেমের পীযূষধারায় হিংসায় উষরবক্ষ ধরিত্রীকে করলেন প্রীতিশ্যামল। কিন্তু প্রশ্ন জাগে,—মানুষ কোন্ আদর্শটিকে বরণ করবে? আর মানুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব হবে কোন্ কোন্ গুণের সমন্বয়ে?

এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে পড়ে এক পাশ্চাত্ত্য মনীষীর বাণী, যাঁর মতে ভবিষ্য মহামানব হবে শক্তি ও প্রেমের সংহত সমন্বয়। কথাটি ভেবে দেখবার মত। দেহ ও মন নিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ। তাই একটিকে অবহেলা করে' অপরটির পরিপূর্ণ বিকাশ হলেও তা মানুষের আদর্শ বলে স্বীকৃত না হওয়াই সম্ভব। প্রকৃতির বিবর্তনের ইতিহাসের ভিতরে কিন্তু পাই আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ইঙ্গিত। বিবর্তনধারার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন ক'রলে দেখা যাবে, এখানে শুধু অগ্রগতি—পরাবৃত্তির বা পশ্চাদ্‌গতির কোন নিদর্শনই নেই। বিবর্তনের এক স্তরে যে প্রাণবৃত্তির বিকাশ হয়েছে, পরবর্তী স্তরে সেই বৃত্তিই উত্তরোত্তর পরিপুষ্টির দিকে এগিয়ে চলে এবং সেই বৃত্তি যখন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়, তখন

বিবর্তনবাদী মত

বিবর্তনের গতি অন্যদিকে হয় আবৃত্ত—তখন প্রাণীর অন্য-বৃত্তির উৎকর্ষের দিকেই বিবর্তনের ধারা হয় চালিত, পূর্বেকার বৃত্তিটি উপযোগিতার অভাবে ধীরে ধীরে হয়ে পড়ে সংকুচিত। বিবর্তনের স্তরে স্তরে জেগে ওঠে বৈচিত্র্য-ময় বৈশিষ্ট্য। বিবর্তনের ফলে যখন একটি নূতন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে, তখন পূর্বের

ত্ত্বটির বিবর্তন থেমে গিয়ে নবলব্ধ তত্ত্বের পথেই বিবর্তন চলে এগিয়ে। তা না মানুষের ভিতরে আমরা হস্তী বা প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় প্রাণীর দৈহিক বিশালতার উৎকর্ষ দেখ্‌তে পেতাম। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেরই সংকেত পাই যে, আত্মচেতনা ও জ্ঞানশক্তি যে-মানুষটির ভিতরে হবে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত, সেই মানুষটিই বরণীয় শ্রেষ্ঠ মানব।

মনোবিজ্ঞানীর দল বিবর্তনবাদীর সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে' আর একটু অগ্রসর হয়ে বলেন,—মনের তিনটি স্বাভাবিক বৃত্তি রয়েছে: তা হচ্ছে—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া অর্থাৎ হ্লাদিনী, সন্ধানী ও সংবিৎ। এই তিনটির সুসমঞ্জস পরিপূর্ণ বিকাশেই মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। বুদ্ধিবৃত্তি যেদিন হবে পূর্ণ বিকশিত, আনন্দ আহরণের শক্তি যেদিন হবে পরিপূর্ণ এবং মানসশক্তি যেদিন হবে সম্পূর্ণ অপ্রতিহত—সেদিনই মানুষ বিবর্তনের সর্বসমুচ্চ শিখরে হবে সমাসীন। বাংলার ঋষি শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু বিবর্তনবাদীর পথেই অগ্রসর হয়ে ব'লেছেন যে, প্রাণতত্ত্বের বিবর্তন হতে হতে যেমন হয়েছে মনের উদ্ভব, তেমনি মনের বিবর্তনের শেষ সীমায় মানুষের দেহে উদ্বুদ্ধ হবে অতিমানস সত্তা। সেই অতিমানস সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশেই মানুষ লাভ করবে পূর্ণতার স্বাদ। উহাই তো তাহার দিব্য জীবন।

মনোবিজ্ঞানী ও শ্রীঅরবিন্দের মত

ভারতীয় শাস্ত্র আলোচনা ক'রলে দেখা যায়, মানুষ তার আদর্শের শেষপ্রান্তে পাদপীঠ রচনা করেছে ঈশ্বরের। সেই আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় রামায়ণে ও পুরাণাদিতে, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের গুণনিচয়ের বর্ণনায়। সেখানে আমরা দেখ্‌তে পাই, দেহ মন ও আত্মশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশই ভারতীয় জনগণের নিকট মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে' পূজিত। উপনিষদে পাওয়া যায়, মানুষ পঞ্চকোষসমন্বিত। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চকোষের পরিপূর্ণ সুসমঞ্জস বিকাশেই মানুষ পূর্ণতা লাভ করে। এখানে একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, অন্নময় ও প্রাণময় কোষের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারা আসুরিক শক্তি আহরণের নির্দেশ নেই। সমস্ত কোষেরই চাই পরিপুষ্টি এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতা। কোন কোষই অবজ্ঞেয় নয়।

ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত

# জ্ঞান করে আগমন, প্রজ্ঞা লভে স্থিতি

মহাশূন্যে বিশাল নীহারিকাপুঞ্জের ভিতরে যেদিন জাগ্‌ল সৃষ্টির আলোড়ন, সেদিন বিভিন্ন অন্ধ শক্তিপুঞ্জ সংহত হতে লাগ্‌ল। সেই সংহত শক্তিপুঞ্জ ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল,—তরল হল কঠিন, কঠিন পরিণত হল তরলে। ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে শুরু হয় ভাঙ্গাগড়ার খেলা। এম্‌নি করে প্রকৃতির অন্তহীন আবর্তনে অজৈব সৃষ্টির ধারা বয়ে চ'ল্‌ল যুগ হতে

ভূমিকা

যুগান্তরে। প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের লহরী হল উল্লসিত। প্রকৃতির খেয়াল হল নিজেকে দেখবার, নিজেরই সৌন্দর্য উপভোগ করবার। জাগ্‌ল প্রাণ—জৈব সৃষ্টির পালা হল শুরু। জ্ঞানের হল উদ্ভব—প্রকৃতি নি[illegible] মাধুরী আস্বাদ করে হল পুলকিত কিন্তু চঞ্চলা প্রকৃতি তো শান্তির স্থিরতা বরণ ক'র্‌তে পারে না। দেহের লাবণ্যের উৎসমূলে রয়েছে যে অন্তরের মাধুরী, অঙ্গের সৌন্দর্যের এই মর্মবাণীটুকু কান পেতে শুন্‌তে হয়। তাই শুরু হল আলোড়ন, বিবর্তনের তরঙ্গও উঠ্‌ল। জাগ্‌ল মানুষ। বিকশিত হল প্রজ্ঞা। প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা হল চরিতার্থ।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞা—চেতনার আদি ও অন্ত। জ্ঞান আনে বিষয়ের অববোধ, প্রজ্ঞা দেয় বিষয়েরই আন্তর রহস্য-চেতনা। বিষয় আহরণেই জ্ঞানের সমাপ্তি, আর সেই আহৃত বিষয় নিয়েই প্রজ্ঞার অভিযান। জ্ঞানের যাহা সাধ্য, প্রজ্ঞার তাহাই সাধনার উপকরণ। ইন্দ্রিয়ের দ্বারে মনের কাছে বাইরের যে বিষয় উপহৃত হয়, সেই বিষয়টিকে ঠিক তারই উপস্থাপিত স্বরূপে জানার নামই জ্ঞান। জ্ঞান তাই ইন্দ্রিয়-সংযোগ-জনিত বিষয়ের উপস্থিতি। এ জ্ঞান শুধু মানুষের নয়, সর্বপ্রাণিসাধারণেরও। এই যে জ্ঞান, এতে বিষয়ের উপস্থাপিত বাহ্যিক রূপকে অতিক্রম করে' তার আন্তর স্বরূপকে ধ'রবার কোন প্রচেষ্টাই নেই। এখানে পূর্বানুভূত বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের বোধ আছে বটে, কিন্তু সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের হেতুপ্রত্যয় বা অন্তর্নিহিত কার্যকারণ আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা এতে নেই। জ্ঞান তাই সম্পূর্ণরূপে বিষয়াবগাহী, বিষয়পর্যাপ্ত। বৃক্ষের জ্ঞান বাইরের ঐ বৃক্ষটির কাণ্ড-শাখা-প্রশাখার দৈর্ঘ্য বিস্তার এবং পত্র-পুষ্প-ফলের কথাটুকুই শুধু জানাতে পারে। এর বাইরে যেতে সে যে নারাজ। বৃক্ষের চারপাশের বিষয়সজ্জার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ-পরম্পরার বন্ধন আছে কিনা, এর নিজের সত্তারই-বা অন্তর্নিহিত কারণ কি—এসব গবেষণা করতে জ্ঞান অক্ষম। জ্ঞানের এই অক্ষমতার ক্ষেত্রেই প্রজ্ঞার সার্থক অভিযান। প্রজ্ঞা বৃক্ষটিকে শুধু বিচ্ছিন্ন একটি বৃক্ষরূপেই দেখে না, তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর সঙ্গে যে সম্বন্ধ-শৃঙ্খলা রচনা করে' সে অবস্থান ক'র্‌ছে তারই বাহ্যিক আকৃতির পিছনে রয়েছে যে কার্যকারণের ইতিহাস—প্রজ্ঞা করে তাকেই আবিষ্কার। প্রজ্ঞা জ্ঞানাহৃত বিষয়ের করে বিশ্লেষণ করে শ্রেণীবিভাগ এবং সেই বিষয়ের অস্তিত্বের মূলসূত্রটিকে খুঁজে বের করাই যে তার উদ্দেশ্য।

সংজ্ঞানির্দেশ ও পার্থক্য বর্ণনা

প্রজ্ঞা মানুষের দৈব সম্পদ। প্রজ্ঞার আলোকেই মানুষ নব নব অভ্যুদয়ের পথে নব নব কল্যাণের পথে, নিজেকে পরিচালনা করে। প্রজ্ঞার ঐশ্বর্য থেকে যদি

মানুষ বঞ্চিত হত, তা'হলে মানুষ পশুস্তরকে কোন দিনই অতিক্রম করতে পার্ত না। শুধু জ্ঞানের পাথেয় নিয়ে এই রহস্যময়ী স্বৈরিণী প্রকৃতির ক্রীড়নক মানুষ কখনই অভিব্যক্তির এই আত্ম-প্রতিষ্ঠ অবস্থা লাভ করতে পার্ত না। জ্ঞান চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী। তাই প্রতি মুহূর্তেই আমাদের হয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান। বিষয়টি যদি ইন্দ্রিয়ের সম্মুখ থেকে হয় অপসারিত, অথবা ইন্দ্রিয় যদি বিষয় থেকে হয় প্রত্যাহৃত, তা'হলে জ্ঞান জন্মাতে পারে না। তাই জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে, এক জ্ঞান হয় উদিত, আরেক জ্ঞান হয় বদূরিত। এমনি করে ঠিক তরঙ্গেরই মত একটির পর আরেকটি জ্ঞান চিত্ততে অধিকার করে। অনেক দার্শনিক জ্ঞানের এই ক্ষণিকতা ও বিষয়নিষ্ঠা পর্যালোচনা করে' শেষ অবধি মনের অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, বহির্জগৎই সত্য, মন বলে' কোন পদার্থই নেই। সে যাই হোক্, এই চঞ্চলতার জন্যেই জ্ঞান কখনও সংস্কারে পরিণত হতে পারে না; আর সংস্কারে পরিণত হলেও সংস্কার জগতের উপরে কোন আলোকপাত ক'রতে পারে না। সংসারে এমন বহু লোক দেখা যায়, যারা জীবনে বহু ঘটনা, ঘাতপ্রতিঘাতের সংগ্রাম করেও কোন অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রতে পারে না—জাগতিক ঘটনাপরম্পরার কার্যকারণশৃঙ্খলা সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান শিশুদের স্তরেই থাকে সীমাবদ্ধ।

জ্ঞানের চঞ্চল গতাগতি

কিন্তু জীবনের পথে চ'লতে চ'লতে যদি কোন অভিজ্ঞতাই অর্জিত না হয়, শুধু স্মৃতিপথে বিরাট্ ঘটনার পাহাড়ই ভিড় করে দাঁড়ায়, তা'হলে জীবনের অগ্রগতি হয় ব্যাহত। জীবনের প্রতি, জগতের প্রতি প্রজ্ঞার দার্শনিক দৃষ্টি না থাক্‌লে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা ব্যর্থতায় হয় পর্যবসিত, সভ্যতার অভিযানও হয় দুঃস্বপ্নে পরিণত। প্রজ্ঞা মানুষের মনে দৃঢ় সংস্কাররূপে অধিষ্ঠিত হয়। বিষয় অপসারিত হলেও প্রজ্ঞার অস্তিত্ব লোপ পায় না। ধ্রুবতারকার মত স্থির অচঞ্চল দ্যুতি বিকিরণ করে' প্রজ্ঞা জগৎকে উদ্ভাসিত করে, ঘটনাপরম্পরায় অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে উদ্‌ঘাটিত করে, মানুষকে দেয় অগ্রগতির সার্থক পথনির্দেশ। শুধু জ্ঞানের পর জ্ঞান আহরণ করে' মনে বিষয়ের বিরাট্ পাহাড় রচনা করা যেতে পারে; তাতে ক'রে মনকে পরিণত করা হয় একটি বিরাট্ বিষয়পঞ্জিকারূপে। বিশ্বকল্যাণ তো দূরের কথা, এই জ্ঞানের দ্বারা আত্মকল্যাণের পথও বেছে নেওয়া যায় না।

প্রজ্ঞার স্থিরতা—মানবসভ্যতায় প্রজ্ঞার অবদান

প্রজ্ঞাই মানুষের মনুষ্যত্বের প্রধান অবলম্বন। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে যদি প্রজ্ঞার স্থির জ্যোতি বিকীর্ণ না হত, তা'হলে জগৎ হত মানুষ্যবাসের অযোগ্য। সমাজও উঠ্‌ত না গড়ে', রচিত হত না পারিবারিক সম্পর্কের মাধুর্যময় আবেষ্টনী,

জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শনে মহিমময় এই বিচিত্র সভ্যতা তা'হলে কি গড়ে উঠ্‌তে পারত?

উপসংহার

মানুষ যদি কোন দিন প্রজ্ঞাকে পরিত্যাগ করে' জ্ঞানকে বরণ করার মূর্খতা প্রকাশ করে, তবে সেদিন বিজ্ঞানে ও দর্শনে মহিমামণ্ডিত এই যুগযুগান্তরজয়ী মানবসভ্যতা তাসের প্রাসাদের মত ভেঙ্গে প'ড়্‌বে, স্বৈরিণী প্রকৃতির অন্ধ শক্তিপুঞ্জের নিরঙ্কুশ ধ্বংসলীলায় সেদিন মানুষের অস্তিত্ব জগৎ থেকে হবে বিলুপ্ত।

## বাংলা ও বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্ব

বেশি দিন আগেকার কথা নয়, বাংলার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রঘুনাথ 'পক্ষধরের পক্ষশাতন' করে' তাঁর পাণ্ডিত্য খর্ব করে' বিপুল আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করেন,—

"কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে।
শাস্ত্রেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।
কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে
তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে।"

---রঘুনাথের এই দম্ভোক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য একদিন ছিল যখন বাঙ্গালী

ভূমিকা

চরিত্রের এই চতুরস্রতা, তাহার বহু মুখী প্রতিভার অচঞ্চল দীপ্তি ভারতের ইতিহাসকে করে' তুলেছিল ঐশ্বর্যমণ্ডিত। সেদিন বাঙ্গালী শৌর্যে-বীর্যে, জ্ঞানে-সাধনায়, সাহিত্যেসংগীতে, শিল্পসৃষ্টিতে সমগ্র ভারতেরই ছিল আদর্শস্থানীয়। আজ্‌কের আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর প্রতিভার অমোঘ যাদুদণ্ডস্পর্শে সেদিন ভারতের সকল রিক্ততা ও দৈন্য হয়েছিল বিদূরিত। বাঙ্গালী সেদিন ছিল ভারতের ভাগ্যবিধাতা। বাংলার সে গৌরব-রবি আজ অস্তায়মান।

বাঙ্গালীর ঐ গৌরবময় বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে বাঙ্গালীর জাতিগত নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য আর বাংলার বহিঃপ্রকৃতির সবুজ প্রাণের অফুরন্ত সমারোহ। জাতিতত্ত্বের দিক থেকে বাঙ্গালী সর্বভারতীয় জাতিগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাঙ্গালীর ধমনীতে

বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের কারণ —(১) নৃতাত্ত্বিক বিশিষ্টতা

শুধু আর্যের নয়, আর্যেতর দ্রাবিড় কোল ভীল মুণ্ড প্রভৃতি বহু জাতির শোণিত প্রবাহিত। এই শোণিত সাংকর্য বাঙ্গালী চরিত্রের পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবপ্রবণতার কারণ। এই আর্যেতর সংস্কারের প্রেরণাতেই বাঙ্গালী জীবন সর্বভারতীয় জীবন-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনার স্বতন্ত্র পথ রচনা করেছে। ভারতীয় সমাজের অনুশাসনকে বাঙ্গালী তাই করেছে অবজ্ঞা। ব্রাহ্মণ্যধর্ম কোনদিন বাঙ্গালীর বিদ্রোহী চিত্তকে সমগ্রভাবে অধিকার ক'রতে পারে নি। এই নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যই বাঙ্গালীকে ভাবপ্রবণ করেছে, করেছে স্বপ্নবিলাসী ও বাস্তবতাবিমুখ। বাঙ্গালীর তাইতো মজ্জায়-মজ্জায় সঞ্চারিত হয়েছে বিদ্রোহ ও অতীন্দ্রিয় রহস্যপ্রিয়তা।

বাংলার বহিঃপ্রকৃতিও তার স্বকীয় বিশিষ্টতা নিয়ে বাঙ্গালী চরিত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, অরণ্যকুন্তলা বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভারতের অন্য প্রদেশের সৌন্দর্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'র শতধারে প্রবাহিত পুণ্যস্নেহধারা বাঙ্গালীর জীবনকে করেছে শ্যামশ্রীমণ্ডিত। পলিমাটির দেশ বঙ্গভূমি কোমল এবং উর্বর। প্রাণের বলিষ্ঠ প্রকাশ এখানে তারুণ্যের সার্থক সাধনার জানাচ্ছে ইঙ্গিত। পুরাতনের পাষাণভার বাংলার মাটি বহন করতে অক্ষম। বাংলার উর্বরভূমির অযাচিত অকৃপণ দাক্ষিণ্য বাঙ্গালীকে কিছুটা শারীরিক শ্রমবিমুখ করে তাকে ভাবরাজ্যে জ্ঞানের জগতে সঞ্চরণের জন্যে জুগিয়েছে অনন্যসুলভ সামর্থ্য। বাংলার প্রকৃতির নয়নাভিরাম লাবণ্য—সুনীল আকাশতলে সবুজ শস্যের তরঙ্গভঙ্গ, নদীর কুলকুলধ্বনি, জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী, বেল-বকুল-মল্লিকা-মালতী-যূথীর সুরভিত সমারোহ, কোয়েল-দোয়েল-পাপিয়া-শ্যামা-ডাহুকের কলকূজন, ঋতুর নব-নবায়মান বৈচিত্র্য—বাঙ্গালীকে করেছে কবি ও ভাবুক, তাকে করে তুলেছে নবীন ও সুন্দরের পূজারী। নদীমাতৃক বঙ্গভূমির নদনদী ভাঙ্গাগড়ার স্বচ্ছন্দ আবর্তনের ভিতর বাঙ্গালীকে গতানুগতিকতার রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হবার জন্যে জানিয়েছে উদাত্ত আহ্বান। বাঙ্গালী জীবনে এই আর্যেতর সংস্কৃতি ও বাংলার বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে—এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই—সঞ্চারিত হয়ে বাঙ্গালীকে দিয়েছে এক মহীয়ান্ স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা। 'বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুকমালা' সেই জননী বঙ্গভূমির অতীত ইতিহাস জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর অপরাজেয় প্রতিভার নিদর্শন বহন করছে।

—(২) বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব

প্রথমে ধর্ম ও জ্ঞানের কথাই ধরা যাক্। আদিবিদ্বান্ সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবক্তা কপিল এই বাংলারই গঙ্গাসাগরসংগমে জন্মগ্রহণ করে সমগ্র ভারতে জ্ঞানের অম্লান আলোকচ্ছটা দিয়েছিলেন ছড়িয়ে। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম এই বঙ্গদেশেই সমৃদ্ধির সমুচ্চ শিখরে উঠেছিল। বাংলার স্নিগ্ধ সরস প্রকৃতির পরশলালিত বাঙ্গালী ঔদার্য ও মানবতার প্রেরণায় অনার্য বৌদ্ধ ও জৈনধর্মকে জানিয়েছিল অভ্যর্থনা। তাইতো কত জৈন তীর্থংকর এই বাংলাতেই তাঁদের সাধনায় লাভ করলেন সিদ্ধি। অনার্য ও আর্য সভ্যতার মিলনক্ষেত্র বাংলা যথার্থই হয়ে দাঁড়িয়েছিল মহামানবের মিলনক্ষেত্র। বাংলার অতীশ দীপংকর প্রায় এক হাজার বছর আগে তিব্বতে তাঁর জ্ঞানের জ্যোতি বিকিরণ করে' সমগ্র তিব্বতকে করেছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। বাঙ্গালী শীলভদ্র ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ এবং সে-যুগে তিনিই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তখনকার দিনে বাঙ্গালী সমগ্র ভারতে যে শুধু আপন শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিষ্ঠা করেছিল তা নয়,

বাঙ্গালী তার স্বকীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্যও প্রমাণ করেছিল। তাই বৌদ্ধ হীনযা ধর্ম বাংলার উদার জলবায়ুর পরিবেশে বিনষ্ট হল। প্রচারিত হল মানবতাবাদী

ধর্ম ও জ্ঞানচর্চায় বাঙ্গালী

উদার মহাযান ধর্ম। মানবতা তো বাঙ্গালীরই বৈশিষ্ট্য নাথধর্মের জন্মভূমিও এই বাংলাই। পরবর্তী যু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম সমগ্র ভারতে তুলেছিল যে-আলোড়ন, ব্রাহ্মধর্ম সংস্কারে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে দিয়েছিল যে-নাড়া, তা অবিস্মরণীয়। শাক্ত ও শৈবসাধনার লীলাস্থান এই বাংলাই। তন্ত্রসাধনার তো কথাই নেই। বাংলার প্রতিভা তন্ত্রকে যে কত শাখা প্রশাখায় বিভাগ করেছিল, তার ইয়ত্তাই নেই। তন্ত্র রয়েছে যে বাংলার মর্মমূলে। তা বাংলার ধর্মচর্যা তন্ত্রের অনুশাসনকেই অনুসরণ করে। এই সর্বসংস্কারমুক্ত বাংলা আহরণ করেছিল অথর্ববেদের প্রাণরস। নবদ্বীপের নব্যন্যায়চর্চা একদিন সমগ্র ভারতকে করেছিল বাংলারই পদানত। রঘুনাথ, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি নৈয়ায়ি ছিলেন সমগ্র ভারতের শিক্ষাগুরু। বাংলার মধুসূদন সরস্বতী তো একাই একশ এক কথায়, জ্ঞানের প্রতিটি বিভাগেই বাঙ্গালী সেদিন ছিল সমগ্র ভারতের অগ্রদূত।

কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বঙ্গপ্রতিভা ছিল অকুণ্ঠ ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল কি সংস্কৃত সাহিত্যক্ষেত্রে, কি বাংলা সাহিত্যসাধনায়, সবেতেই বাঙ্গালী দিয়ে তার প্রতিভার অম্লান স্বাক্ষর। সাহিত্যে ও চারুশিল্পে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য প্রকা

কাব্য-সাহিত্যে বাঙ্গালী

পেয়েছে তার প্রাণধর্মের অভিব্যঞ্জনায়। উপকরণবাহুল্যে বাঙ্গালী কোনদিনই সহ্য করে নি। চর্যাপদ ও জয়দেবে মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী থেকে শুরু করে চণ্ডীদাসের সুললিত পদাবলী, কাশীরাম কৃত্তিবাসের মহাকাব্য প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যকে অনন্ত মাধুর্যে ও ঐশ্বর্যে করেছে বিমণ্ডিত পূর্ববঙ্গগীতিকা, বাউল গান, পাঁচালী গান, কবির গান প্রভৃতি তো বাঙ্গালীরই বি অবদান। বাঙ্গালী সত্যই 'গানের রাজা' বলে সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য।

চারুশিল্পে ও কারুকলায় বাংলার অবদান অপরিমেয়। বাংলার স্থপতির মন্দি ও গৃহনির্মাণ-প্রণালী আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। মাটি ও খড়ের ঘর বাঙ্গালী অতী সুন্দরভাবে নির্মাণ ক'রত, আর তা সমগ্র ভারতের ছিল প্রশংসনীয়। নৌকা-নির্মা

স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রে, সংগীতে ও অন্যান্য শিল্প-কলায় বাঙ্গালী

বাঙ্গালী যে প্রাণময় কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা সত বিস্ময়কর। বাংলার ভাস্কর হিন্দু ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি রচনায় যে প্রাণস্পন্দন রূপায়িত করেছেন, যে ভাবাভিব্যঞ্জনার পরিচয় দিয়েছেন, তা অন্যত্র সুদু বাংলার ধীমান্ ও বীতপালের শিল্পরীতি একদিন ভারতের বাইরেও পেয়েছিল সমাদ বাংলার ভাস্কর 'ছত্রমুখ' মূর্তির ভিতরে স্বকীয় সাধনার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছে

কীর্তিমুখ মূর্তির ভিতরে সে শুধু সারা ভারতের শিল্পসাধনারই সহযোগিতা করেছে। বাংলার চিত্রে এবং সংগীতেও বাঙ্গালী প্রাণের সহজ আবেদন ও সুকুমার সূক্ষ্মতাবোধ প্রকাশ পেয়েছে। অজন্তার গিরিগুহাগাত্র এখনও বাঙ্গালীর চিত্রশিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় বহন ক'রছে। সংগীতে বাংলা নূতন নূতন পথও প্রবর্তনও করেছে। কীর্তন, ভাটিয়ালী প্রভৃতি শাস্ত্রানুশাসনবর্জিত প্রাণাবেগময় সংগীতই বাংলার নিজস্ব সম্পদ্। বাংলার রেশম-শিল্প জগতে এক সময় ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রাচীন বাংলার পৌণ্ড্র ও সুবর্ণকুড্য রেশমের সূক্ষ্ম বস্ত্রনির্মাণের জন্য ছিল প্রসিদ্ধ। এই বস্ত্রের নাম 'পত্রোর্ণ'। বাকলের কাপড়ও ছিল বাংলার গৌরবের অন্যতম নিদর্শন। বাকল থেকে যে কাপড় হ'ত, তার নাম 'ক্ষৌম', উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম ছিল 'দুকূল'। শত শত বৎসরের সাধনায় বাঙালী যে স্বকীয় প্রতিভায় সমুজ্জ্বল শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিল, তার সার্থক নিদর্শন আজও ভারতে এবং ভারতের বাইরে যবদ্বীপ, সিংহল, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের অন্তর্ভুক্ত স্থানে বিদ্যমান।

শৌর্যে- বীর্যে, এমন কি বাণিজ্যেও বাঙালীর ঐতিহ্য গৌরবে সমুজ্জ্বল। কাহারও কাহারও মতে, অতিপ্রাচীন কালেই বাঙ্গালী বিজয়সিংহ সিংহলদ্বীপ জয় করে' সেখানেও বাঙ্গালীর কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। শশাঙ্ক, গণেশ, ধর্মপাল প্রভৃতির শৌর্যমণ্ডিত কীর্তিকাহিনী আজও ভারত বিস্মৃত হয়নি। মোগলযুগে বাংলার প্রসিদ্ধ বারভূঁঞা যে শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে দিল্লীর সিংহাসনও উঠেছিল কেঁপে। নৌযুদ্ধে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব একদিন দিগ্বিজয়ী রঘুকেও বিপন্ন করে তুলেছিল। বাণিজ্যে বাংলা তো বহু প্রাচীন যুগ থেকেই ছিল ভারতের অগ্রণী। বাংলার তাম্রলিপ্ত ছিল তখন ভারতের বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। বাংলার বহির্বাণিজ্যের আয়তন ছিল খুবই বেশী। বাঙ্গালীর শঙ্খশিল্প, তাঁতশিল্প, হাতীর দাঁতের শিল্প ও সূচিশিল্প সমগ্র পৃথিবীর ছিল বিস্ময়ের সামগ্রী।

শৌর্যে, বীর্যে ও বাণিজ্যে বাঙ্গালী

বর্তমান যুগেও বাঙ্গালী সমগ্র ভারতে সংস্কৃতির সাধনায় অগ্রণী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে নবজাগৃতির আলোড়ন দেখা দিয়েছিল, তার পুরোভাগে ছিল বাঙ্গালীই। চিরবিপ্লবী বাঙ্গালীই নব্য ভারতের স্রষ্টা। ধর্মজগতে রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম-সাধনা শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বে করেছে বিরাট্ আলোড়নের সৃষ্টি। বাঙ্গালীর চিরতরুণ প্রাণই সর্বপ্রথমে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার ব্রত নিয়েছিল। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র এই বাংলারই ঋষিকণ্ঠে একদা হয়েছিল উদ্গীত। এই তো সেদিন নেতাজীর বিপ্লবী স্বরাজসাধনা সমগ্র জগৎকে করে দিয়েছিল বিস্ময়ে স্তম্ভিত। 'বাঙ্গালী যাহা চিন্তা করে আজ, সমগ্র ভারতবাসী

নব্য ভারতের স্রষ্টা বাঙ্গালী

তাহা চিন্তা করে কাল।' সত্যই বাঙ্গালী ভারতের সর্বক্ষেত্রেই নায়ক। বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য শুধু ভারতকে নয়, সমগ্র বিশ্বেরই মনোরঞ্জন করেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা না হয় বাদই দিলাম। বাঙ্গালী বঙ্কিম, শরৎ, মাইকেল, গিরীশ, ক্ষীরোদ, দ্বিজেন্দ্র, নজরুল বিশ্বের যে কোন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের পাশে পেতে পারে স্থান। অভিনয়শিল্পে বাঙ্গালী শিশির অহীন্দ্রের প্রতিভাদ্যুতি নিখিল ভারতে দেদীপ্যমান। প্রাচ্য নৃত্যশিল্পে বাঙ্গালী উদয়শংকর যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা ভারতের অন্যত্র দুর্লভ। চিত্রশিল্পেও বাংলার অবনীন্দ্রনাথ ও যামিনী রায় যে নবরীতির উদ্ভাবন করেছেন, তা বিশ্বে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা করেছে অর্জন। যুগ যুগ ধরে জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে বাঙ্গালী তার প্রতিভার যে ভাস্বর স্বাক্ষর দিয়েছে, তার জ্যোতি চিরদিন অম্লান, অক্ষয় হয়েই থাকবে।

কিন্তু সাম্প্রতিক বাঙ্গালীর সে গৌরব আজ কোথায়! রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বাঙ্গালী আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরাজয়ের কলঙ্ক ক'রছে বহন, বাঙ্গালী প্রতিভা আজ সৃষ্টির নব নব উদয়াচলের পথে এগোয় না। উদার বাঙ্গালী আজ সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে আলস্যে জীবন অতিবাহিত করছে। বাঙ্গালীর এই দুর্গতি সত্যই শোচনীয়। বাঙ্গালী যদি আবার ভারতের নেতৃত্ব পেতে চায়, আবার যদি

উপসংহার

সে তার প্রতিভার বহুবিচিত্র আবদানে জগৎকে বিস্মিত করতে চায়, তাহলে তাকে ত্যাগ করতে হবে বিলাস-ব্যসন ও আলস্যের জড়তা, তাকে বিস্মৃত হতে হবে স্বার্থান্ধ আত্মকলহ। গৌরবময় অতীতের নিশ্চিন্ত রোমন্থন ত্যাগ করে সংহত বাঙ্গালী যদি আবার আত্মসংবিৎ ফিরে পায়, তবেই-না বাঙ্গালার অতীত গৌরবের অবিচ্ছিন্ন ধারা হবে অব্যাহত, তবেই-না বাঙ্গালী উদাত্তকণ্ঠে কবির স্বরে স্বর মিলিয়ে আবার ব'লতে পারবে,—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি!"

সেদিনটি কি সত্যই দূরে—বহুদূরে?······

# বাঙ্গালীর শিল্পে ও জীবনে বাংলার প্রকৃতির প্রভাব

সত্যই বাংলা একদিন ভারতের সভ্যতার ইতিহাসে, শিল্পে-সাহিত্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শৌর্যে-সাধনায় গৌরবপ্রভামণ্ডিত রাণীর আসন অধিকার করেছিল। বাংলার

ভূমিকা

এই সর্বজয়ী সাধনায় বাংলার প্রকৃতির প্রভাব অবিসংবাদিত। বাংলার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই বাঙ্গালীর চরিত্রে অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা সঞ্চার করেছে। বাংলার স্নেহমেদুর প্রকৃতিই বাঙ্গালীর প্রাণরসের স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিণী গোমুখী।

নদীমাতৃক দেশ এই বাংলা। বাংলার নদ-নদী যেমন করে' যুগ যুগ ধরে' বাংলাকে সঞ্জীবনী-ধারায় অভিষিক্ত করে' এসেছে, তার তুলনা ভারতের অন্যত্র বিরল।

বঙ্গপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য

বাংলার ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, অজয় দামোদর, রূপনারায়ণ, কর্ণফুলি নদী বাংলার প্রতিটি দেশকে করেছে সরস ও শস্যশ্যামল। হিমালয় থেকে প্রবাহিত এই সব নদনদীর আগমনে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ উঠেছে জেগে। বাংলা তাই হৈমবতী উমা অন্নপূর্ণা। এক দিকে নদনদীর প্রাচুর্য, অন্য দিকে বঙ্গোপসাগর ও হিমালয়ের দাক্ষিণ্যে দেবতার অজস্র ধারাবর্ষণ—এই দু'টি মিলে বাংলার মাটিকে করেছে উর্বর। বাংলার ঋতুর যে বর্ণবহুল বৈচিত্র্য, তাও বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য। বাংলার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—প্রতিটি ঋতুর এমনই আছে একটি স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র আবেদন, যা ভারতের অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলার প্রকৃতির এই দাক্ষিণ্যমূর্তিই এর সবটুকু নয়। এখানে সব কিছুরই ভিতরে আছে একটা বৈচিত্র্য, একটা পরস্পর-বিরুদ্ধ দ্বান্দ্বিক পরিবেশ। দাক্ষিণ্যমূর্তির পাশেই রয়েছে আবার প্রকৃতির নির্মম শ্মশানকালী মূর্তি। নদনদীর প্রকোপে বাংলার কত জনপদ, কত সভ্যতা যে সলিল-সমাধি বরণ করেছে, তার ইয়ত্তাই নেই। নদী শুধু কূলই ভেঙ্গে চলেছে; আবার কোথাও-বা বন্যার জলপ্লাবনে দেশের পর দেশকে একেবারে গ্রাসও করে' বসেছে; কোথাও-বা আবার নদী বয়ে গিয়ে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা সংক্রামক রোগের জীবাণুকে করেছে লালন, করেছে পালন। তা সত্ত্বেও বাংলার জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী, কোয়েল-দোয়েল-পাপিয়া-শ্যামা, অজস্র সুরভি ও বর্ণাঢ্য পুষ্পের সমারোহ, সুনীল আকাশ ও মৃদুমন্দ সমীরণ—বাংলার প্রকৃতিকে সুরে, ছন্দে, গন্ধে, গানে করে' তুলেছে মাধুর্যমণ্ডিত।

বাংলার এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনে গড়ে উঠেছে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য। ভূমি উর্বর বলে' বাঙ্গালীকে কখনও পরিশ্রম করে' শস্য জন্মাতে হয়নি। তাই বাঙ্গালী হয়েছে শ্রমকুণ্ঠ, অলস, লক্ষ্যহীন, কল্পনাপ্রবণ। প্রকৃতির সরসতা ও প্রাণের সবুজ

প্রকৃতির প্রভাবে বাঙ্গালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

সমারোহ বাঙ্গালীকে করেছে ভাবুক ও কবি, করেছে সংস্কারমুক্ত ও উদার। নদীর ধ্বংসলীলা বাঙ্গালীকে আবার চিরবৈরাগীও করে তুলেছে। তাই তার জীবনে এসেছে নব নব অভিলাষ আর তাদেরই অভিব্যক্তি। পুরাতনের জীর্ণ নির্মোক তাকে নূতনের অভিসার থেকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য বাঙ্গালীকে বৈচিত্র্যের অনুরাগী করে তুলেছে। সাধারণভাবে বলা যায়, বাংলার প্রকৃতি বাঙালীকে শান্ত, নিরীহ, অলস, আনন্দময় জীবনযাপনের উৎসাহ যুগিয়েছে। কিন্তু এরই পাশে আবার দুর্জয়

সাহস, উদার সংস্কারমুক্তি, ভাবপ্রবণতা, দর্শনিকতা, ভক্তি ও গীতিমুখরতা প্রভৃতি সকল গুণই বাঙ্গালী পেয়েছে প্রকৃতিরই কাছ থেকে। উপযুক্ত অমুকূল পারিপার্শ্বিকে বাঙ্গালীর চরিত্রে এই দ্বৈধীভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার প্রকৃতি যেমন ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ, তেমনি বাঙ্গালী চরিত্রও ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন ধারার বিচিত্র প্রভাবে প্রভাবান্বিত—একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে।

বাংলার শিল্পে ও জীবনে বাংলার প্রকৃতির এই প্রভাব সর্বত্র পরিস্ফুট। ভূমি উর্বর বলে বাঙ্গালী মুখ্যতঃ হয়েছে কৃষিজীবী। নদীর দাক্ষিণ্য পেয়েছে বলেই বাঙ্গালী নাবিক এককালে বহির্বাণিজ্যে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। বাংলার সামাজিক জীবনে দেখা যায়, উৎসবের অন্ত নেই। এখানে 'বারোমাসে তেরো পার্বণ' লেগেই আছে। কৃষির জন্যে পরিশ্রম করতে হয় না বলে' বাঙ্গালী হয়েছে আড্ডা-রসিক—বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে ললিতকলার অনুশীলনে। বাঙ্গালীর সাহিত্যে, সংগীতে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় সর্বত্রই এমন একটা শাস্ত্রশাসনবর্জিত গীতিমুখরতা রয়েছে, যা ভারতের অন্য কোথাও নেই। এই গীতিপ্রবণতাই বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য। তাই বাংলার কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রবীন্দ্রনাথ। তাই বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক হলেও তাদের উপন্যাস মোটামুটিভাবে গীতিকাব্যাত্মক। তাই বাঙ্গালী মধুসূদন কেবলমাত্র 'মেঘনাদবধ-কাব্য' রচনা করেই তৃপ্তি পেলেন না, 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য'ও তাঁকে পরম পরিতৃপ্তির পুলকে অভিষিক্ত ক'রল। তাই এই বাংলাতেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম হল বিস্তৃত। বাংলা কখনও অনুশাসনের বেড়ী ও পুরাতন সংস্কার সহ্য করতে পারে না। তাই তো বাংলায় বৌদ্ধ-মহাযানধর্ম ও তন্ত্রধর্মেরই প্রতিষ্ঠা। বাংলার ভাস্কর্যের তাই বৈশিষ্ট্য হল 'ছত্রমুখ' মূর্তি। বাংলার শিল্পকলায় সংস্কারহীনতা সূক্ষ্ম রচনানৈপুণ্য ও অলংকারহীনতা সর্বত্রই পরিস্ফুট। বাংলার লোকচরিত্রের বিরুদ্ধ-গুণগত সমন্বয় আবার প্রকাশ পেয়েছে তারই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও স্মৃতিনিবন্ধে। বাঙ্গালী জীবনের এই চতুরস্রতা তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—সাহিত্যে চিত্রে, সংগীতে, ভাস্কর্যে, দর্শনে ও বিজ্ঞানে—পেয়েছে সার্থক প্রকাশ।

**শিল্পে ও জীবনে প্রকৃতির প্রভাব**

আজ বাঙ্গালী অখণ্ড জীবনের প্রতিটি খণ্ডিত ক্ষেত্রে রয়েছে পশ্চাতে পড়ে তার সমগ্র জীবন আজ আলস্যে ও পরচর্চায় ক্ষীয়মাণ। রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে বাঙ্গালী আজ বহুবিচিত্র প্রকৃতির প্রভাবকে জীবনে সমন্বিত করতে পারে নি। প্রাকৃতিক প্রভাবকে বাঙ্গালী যদি কোনদিন নিজের জীবনে সুসমঞ্জস আকৃতি দিতে পারে, তবেই সেদিন সে আবার ফিরে পাবে নিজের পূর্বগৌরবের সিংহাসন।

**উপসংহার**

# বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ

'কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা।
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে সমুদ্রে হ'ল হারা
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়-চীন,
শক-হূণ-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।' —রবীন্দ্রনাথ

ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তি অগণিত জীবন ও সংস্কৃতিস্রোতের পুণ্য-মিলন-ভূমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেমন সত্য, বাংলা ও বাঙ্গালীর জীবন ও সংস্কৃতির সম্বন্ধেও তেমনি অভ্রান্ত। বাংলার জনতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখিতে পাই: বিচিত্র জাতিবর্ণের রক্তপ্রবাহ এমন করিয়া বাঙ্গালীর ধমনীতে সঞ্চারিত হইয়াছে যে, তাহার একটিমাত্র বিশিষ্ট পরিচয় আর নাই। "বাংলার বিভিন্ন জেলার বিচিত্র বর্ণসমূহের ভিতর আপেক্ষিক স্থূল ও সূক্ষ্ম পার্থক্য, একই বর্ণের মধ্যে দেহপরিমিতির ভেদবৈচিত্র্য ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিচার করিলে বলিতেই হয়, এ সমস্তই বিচিত্র নর-সাংকর্যের দ্যোতক। জন-সাংকর্যের নরতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের জৈব মিশ্রণের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে! বস্তুতঃ স্মরণাতিত কাল হইতে এই ধরণের জন-সাংকর্যের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের অন্যত্র খুব সুলভ নয়। এই মিশ্রণ এত গভীর ব্যপক যে নরতত্ত্বের দিক হইতে কোন বিশিষ্ট বর্ণ যত উচ্চ বা নিম্নই হউক না কেন, কোন বিশিষ্ট স্থানের অধিবাসীদের একান্তভাবে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার উপায় নাই।" এই অবিচ্ছিন্ন, অবিশিষ্ট বাঙ্গালীত্বের ধারাই বর্তমান বাঙ্গালীর জীবনসংস্কার ধারক। বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, ধ্যান-ধারণাও এই সাংকর্যের ফল। মনোধর্মী আর্যজাতি বাঙ্গালীর চিন্তা বাঙ্গালীর দার্শনিক ধ্যানাদর্শের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আবার দেহধর্মী অনার্যজাতি বাঙ্গালীকে দিয়াছে ধর্ম ও দর্শনে অতি-সাধারণ জৈব প্রেরণার লৌকিকতা। এই মনোধর্ম ও জৈব প্রেরণার লৌকিকতা উত্তুঙ্গ ভাবাদর্শ ও লৌকিক জীবনের সুখদুঃখের একত্র মিলন ঘটাইয়া বাঙ্গালীর সাহিত্যকে ভাবাদর্শ ও অশ্রুর প্লাবনে ডুবাইয়া দিয়াছে। আর্য, অনার্য, দ্রাবিড় ও বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে পরিপুষ্ট বর্তমান বাঙ্গালীর বাহ্য ও অন্তর্জীবন তাই বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ এক নবীনা তিলোত্তমা।

বাঙ্গালীর ইতিহাসের গোড়ার কথা

বর্তমান বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি নির্দেশ করা সত্যই দুরূহ। কারণ,—বাঙ্গালীর জীবন-তিলোত্তমা যে তিল তিল উপাদান গ্রহণ করিয়া তাঁহার বর্তমান রূপ পাইয়াছে, তাহা এমন ভাবে ছড়াইয়া আছে—কোথাও লোকচক্ষুর অন্তরালে, কোথাও সংস্কৃতি-সভ্যতার আস্তরণের তলায়—যে তাহাকে বর্তমান জীবনের আলোকে

বিচার করা দুরূহ। প্রথমতঃ, বাঙ্গালীর ধর্মকর্মের মধ্যে তাহার জীবনের প্রাচীনতম রূপটি ফুটিয়া উঠে। "বস্তুতঃ, বাঙ্গালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে রাঢ়, পুণ্ড্র, বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোলের, এক কথায় বাংলার আদিবাসীদেরই পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস। এ-তথ্য সর্বজনস্বীকৃত যে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেব-দেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার-বিহারের ছোঁয়া ছুঁয়ি অনেক-কিছুই আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়াছি।" এই সব ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান আমাদের লৌকিক সাহিত্যে রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই আদি ধ্যানধারণা মনোধর্মী আর্যদর্শন ও ভাববাদী মনোভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাঙ্গালীর নূতন ধ্যানাদর্শকে রূপ দিয়াছে প্রকৃতপক্ষে, বাঙ্গালীর দেহমন, চিন্তা-ধ্যান ধারণা সকল ক্ষেত্রেই সমন্বয়ের চিহ্ন বর্তমান এই সমন্বিত ধ্যানাদর্শেরই উত্তরাধিকারী উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত নূতন বাঙ্গালী।

বর্তমান বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি

এইবার ইতিহাস-পাঠকের দৃষ্টি লইয়া বাঙ্গালীর অতীত রাজনৈতিক সংস্থার দিকে লক্ষ্য করা যাক্। খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাক্-ইংরাজযুগ পর্যন্ত বাংলাদেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। সামন্ত, মহাসামন্ত তাহার উপর রাজা এবং রাজারও উপরে রাজাধিরাজ বা সম্রাট্ থাকিতেন। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক সকল শক্তিই ইঁহাদের দ্বারা বিধৃত হইত। কিন্তু রাজতন্ত্র থাকিলেও জনজীবনের শক্তিও যে কার্যকরী ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় পালরাজাদের আগমনের পূর্বে। বাংলাদেশের অরাজক মাৎস্য-ন্যায় দেশের জনসাধারণের মনে যে বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়াছিল, তাহাতেই নূতন পালরাজাদের আগমন সূচিত হইয়াছিল। মুসলমানযুগে রাজতন্ত্র আরও দৃঢ় হইল। ইংরাজ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার ঠিক পূর্ববর্তী মুহূর্তে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবার একটি অরাজকতার যুগ দেখা গেল। দিল্লীর দুর্বল সম্রাটের শক্তি তখন ছিন্নবিচ্ছিন্ন, প্রাদেশিক শাসকেরা ও উচ্চতর রাজকর্মচারীরা তাঁহাদের শাসনশক্তিকে নিজেদের স্বার্থের জন্য তখন ব্যবহারে অভ্যস্ত। সেই ভয়ংকর অরাজকতার মুহূর্তই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের পূর্ব মুহূর্ত—বাংলার অন্ধকার সেই রাত্রির তপস্যার মধ্য দিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর নবজীবনের আলো-বিচ্ছুরণ।

বাঙ্গালীর অতীত রাজনৈতিক সংস্থা

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ আধুনিক ভারতবর্ষের জননী, যে বাংলাদেশের নবজাগ্রত চেতনা সমগ্র ভারতবর্ষের ধ্যানধারণাকে

ভাবিত করিয়াছিল, সেই বাংলার দিকে চাহিয়াই মহামতি গোখলে একদা বলিয়াছিলেন,—"What Bengal thinks to-day, India will think to-morrow." ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষা, পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শ আর অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার নৈরাশ্য বাঙ্গালীর জীবনে আনিয়া দিয়াছিল এক বিপ্লবচেতনা। এই নবচেতনাই সকল পুরাতন জীর্ণতাকে চূর্ণ করিয়া নূতন জীবনের আলোক বহিয়া আনিতে চাহিল। মানবিকতাবোধ ( Humanism ) জীবনকে ভালবাসিতে শিখাইল। ব্যক্তিজীবনের সুখদুঃখেরও যে স্বয়ংস্বতন্ত্র মূল্য আছে, এই বোধটিই আধুনিক বাংলার জীবনচেতনার কেন্দ্রবস্তু। বাংলার সংস্কৃতি সাহিত্য রাজনীতি—সকল ক্ষেত্রেই দেখা গেল এই শিকল-ভাঙ্গার নূতন গান। জীবনের যেন এক নূতন মূল্যবিচারের পালা পড়িয়া গেল। বাংলার আকাশ-বাতাসও যেন নূতন চেতনায় নাচিয়া উঠিল। সত্যই সে এক স্মরণীয় দিন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী

এই নবজাগ্রত বাংলার জীবনচেতনা হইতেই আধুনিক রাজনীতিবোধের উদ্ভব ঘটিল, জাতীয় কংগ্রেসেরও প্রতিষ্ঠা হইল। সমগ্র ভারতীয় চেতনার তলায় যেন বাঙ্গালীর জীবনচেতনা লুপ্ত হইতে চলিল। বাঙ্গালীও সর্বভারতীয় আদর্শের তলায় তাহার খাঁটি বাঙ্গালীত্ব বিসর্জন দিয়া বসিল। এই সময় বাঙ্গালী যেভাবে তাহার নিজের সমাজ ও জাতিধর্ম ত্যাগ করিয়া বসিয়াছিল—এমন আর ভারতের অন্য কোন জাতিই করে নাই। "সে বঙ্গমাতার পরিবর্তে ভারতপিতার সন্তান হইয়াছে, জাতির পরিবর্তে মহাজাতির এবং মানুষের পরিবর্তে মহামানুষ হইয়াছে।" বাঙ্গালী তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া সর্বভারতীয় হইতে গিয়া ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে। জাতীয় কংগ্রেসের সহিত ইংরাজের এক গোপন বৈঠকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। রাজনীতি হতভাগ্য বাঙ্গালীর ললাটে চরম অভিশাপলিপি আঁকিয়া দিয়াছে। বিপন্ন সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা আজ খণ্ডিত বাংলায় হাহাকার তুলিয়াছে।

আধুনিক বাঙ্গালীর স্বরূপ

রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলার জাতীয়তা ও সংস্কৃতির প্রাণধারার যে গতি আমরা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহা আজ শুষ্ক অথবা ভিন্ন মুখে প্রবাহিত। বাংলা সাহিত্য ও ভাষা আজ চরম বিপদের সম্মুখীন। একদিকে হিন্দী আর একদিকে উর্দুর প্রভাবে বঙ্গবাণীর শ্বাস রুদ্ধপ্রায়। বাংলা সাহিত্যের একান্ত প্রাণধর্মও ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে। চারিদিকে একটি নিশ্ছিদ্র ঘন কুয়াসা বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে যেন রুদ্ধ করিয়া দিতে চায়। যে জীবনের চিত্র

আধুনিক বাঙ্গালীর জাতীয়তা ও সংস্কৃতির পরিচয়

সাহিত্যের অবলম্বন, যে জীবনের রসবোধই কবির সৃষ্টির উৎস, তাহাই আজ হৃতবল, তাহাই আজ পঙ্গু।

বাঙ্গালীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জীবন আজ এক বন্ধ্যা বালুচরে ঠেকিয়া গিয়াছে। খাদ্যসমস্যা ও বেকারসমস্যা রাজনৈতিক দলীয় মনোভাবের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থনীতি-রাজনীতির আকাশে-বাতাসে এক রুক্ষ ভয়াবহ আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে আগত পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী উদ্বাস্তু হইয়া পথে পথে জীবন হারাইতেছে; তাহাদের আর্ত হাহাকার পশ্চিমবঙ্গের পথে-প্রান্তরে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। এহেন আর্ত জীবনের এই ভয়াবহ নৈরাশ্যের নিশ্ছিদ্র কুয়াসা বাঙ্গালীর জীবনকে ধ্বংসের অভিমুখীন করিয়া দিয়াছে।

**আধুনিক বাঙ্গালীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিচয়**

এই ভয়ংকর বেদনাকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালীকে পথ চালিতে হইবে। কারণ,—সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চক্রান্তে বাঙ্গালীর ভাগ্যলিপি যে ঐ ভাবেই আজ লিখিত। বাঙ্গালী উনবিংশ শতাব্দীতে ধনে-মানে, চিন্তায়-ধ্যানে একটি পূর্ণাঙ্গীণ জাতি হইয়া উঠিতে চাহিয়াছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ রূপটিও তাহার চক্ষুকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু আজ সে-সংস্কৃতির, সে-ধ্যানধারণার বিলুপ্তি বাঙ্গালী কেমন করিয়া সহ্য করিবে! বাঙ্গালীর আজ জীবনমরণ প্রশ্ন! তাহার ভবিষ্যৎ কোথায়? ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার চিত্র মুদ্রিত থাকিবে, না বিলুপ্ত হইয়া যাইবে?

**বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন**

তাই আজ সারা বাংলা জুড়িয়া এই মহাজিজ্ঞাসা উঠিয়াছে—'বাঙ্গালী' কোথায়?' বাংলার অনেক চিন্তাশীল মনীষী এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকাই এই মহাজিজ্ঞাসার উত্তর দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ডক্টর জে. পি নিয়োগী বলিয়াছেন, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মসংশোধনের জন্য বাঙ্গালীকে অবশ্যই উদ্যোগী হইতে হইবে। তাঁহার মতে, ভবিষ্যতের বাঙ্গালীকে যথার্থভাবে কর্মানুরক্তির আদর্শে তৈরি করিয়া তোলাই এখন প্রধান সমস্যা। শ্রী টি. ঘোষ মন্তব্য করিয়াছেন, বাঙ্গালী সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই মনোভাব লইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা আত্মঘাতী। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের স্বার্থের প্রয়োজনেই প্রদেশনিবিশেষে সকলের সহিত কাঁধ মিলিইয়া চলিতে হইবে। 'বেঙ্গল ট্রেড্‌স্ এসোসিয়েশনে'র সভাপতি শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী বলিয়াছেন,—আজ বাংলার সমস্যা, সারা ভারতের সমস্যা হয়ে ওঠা উচিত ছিল। দুঃখের দিনে যে বাংলা সব দিল, আজ সুখের দিনে তাকে একটু বেঁচে থাকার অধিকার দেওয়ার জন্য অবশিষ্ট ভারতবর্ষ কেন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এগিয়ে আসবে না? ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

**বাঙ্গালী কোথায়?**

বুদ্ধিবৃত্তিক কার্য-কলাপের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ এবং অত্যধিক রাজনীতি-চর্চাই
বাঙালী শিল্প-বাণিজ্যের প্রধান ক্ষতি করিয়াছে। অতঃপর সার কথা লিখিয়াছেন 'শনি-
চিঠিতে খবর বাহির হইয়াছে,—'কায়িক পরিশ্রমবিমুখ বাঙ্গালী আজ
কোথাও নাই এবং ঠিকমতো গতর খাটাইতে না শিখিলে ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হইবে।'

প্রচুর তিতিক্ষা আর ধৈর্যের সহিত আজ বাঙ্গালীকে তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে। তাহার সংস্কৃতি ও সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যধারা হইতে বহুদূরে থাকিলেও উহারই মধ্য দিয়া নূতন পথের সন্ধান করিতে হইবে। ছিন্নমূল বাঙালী জীবনের মধ্যেও যে চিরন্তন রসসত্য আজ বিষাদকরুণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাকে বাংলা সাহিত্যে রূপ দিতে হইবে। তাহার এমন রূপ হইবে, যাহা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভবিষ্যৎ পথকে উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারে। রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত দুইশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী যে-রসস্বপ্ন দেখিয়াছে, যে-জীবনবেগ সাহিত্যশিল্পীর কর্মকে সুদূরপ্রসারিত করিয়া দিয়াছে, তাহাকে আজ আরও বস্তুধর্মী, আরও করুণ, আরও মর্মন্তুদ করিয়া তুলিতে হইবে। বাঙ্গালী জীবনের সেই বেদনাময় আলেখ্য যেন বুকভাঙ্গা সুরে সুদূরের ইঙ্গিত দিতে পারে, যেন তাহাতে দুঃখশেষের পথের নির্দেশ ফুটিয়া উঠে। বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক চেতনাতেও সংহতি এবং সমস্যা-সমাধানের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা ফুটিয়া উঠুক। মৈত্রী ও ত্যাগ আজিকার রাজনৈতিক দলীয় মনোভাবের হীনচক্রকে প্রতিরোধ করুক। বাঙ্গালীর অভিশপ্ত জীবনের এই স্বপ্ন তাহাকে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে উন্মুখ করিয়া তুলুক।—ইহাই তো বাঙ্গালী জাতির অন্তর্গূঢ় কামনা।

বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

# ছাত্রসংসদ

ছাত্রসংসদ তথা ছাত্রসংঘ-প্রতিষ্ঠান কথাটি অধুনা অধিক-প্রচলিত। প্রাচীন গ্রীক নীতিজ্ঞ ও পণ্ডিত অ্যারিষ্টট্‌ল্ রাজনৈতিক দর্শনেই সংঘের (union) ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছিলেন। 'মানুষ সামাজিক জীব অর্থাৎ সংঘ ছাড়া মানুষ বাঁচে না'—এ-মন্তব্য তাঁরই। সংসদের ভিতর দিয়ে আমরা মনোগত ঐক্য না থাকা সত্ত্বেও, যে একতার সন্ধান পাই তার প্রয়োজনীয়তা সমাজ-জীবনে কতখানি, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে আজ প্রত্যেকটি জাতি, প্রত্যেকটি দেশ এবং সর্বশেষে প্রতিটি মানুষ। আর এ-সত্যের প্রভাব ছাত্রদের উপরই পড়েছে গভীরভাবে। তাই আজ জাতি, ধর্ম, রাজনৈতিক আদর্শবাদ নির্বিশেষে তাদের স্বকীয় আদর্শে মণ্ডিত একটি নির্দিষ্ট জীবনে ছাত্রেরা একটি সংসদ বা ইউনিয়নের উদ্দেশ্যকে সুমহান্ মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছে। ছাত্র-ইউনিয়ন কথাটি বাংলাদেশের মধ্যে

সূচনা

আর কোন দেশে এতোটা চালু নয়। এদেশের প্রতিটি কলেজে, এমন কি স্কুলে পর্যন্ত আজ এ-ধরণের এক সংগঠনের সন্ধান মেলে।

ছাত্রজীবনের মূল আদর্শ হচ্ছে সরলতার সঙ্গে অধ্যয়ন। মানবজীবনের সবচেয়ে পবিত্র অধ্যায় এই ছাত্রজীবন। ছাত্রেরা এ-জীবনে, ভাবী জীবনের ভূমিকায়, কর্মক্ষেত্রের সমস্ত বিপত্তির জন্যে সশস্ত্র করে নেয় নিজেদের। তারা দীক্ষা নেয় মানবতাপূর্ণ সুষ্ঠু সমাজ-জীবন গড়ে তোলার মন্ত্রে। অতএব, এ জীবনে ছাত্রদের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি অভাব-অভিযোগের সম্ভবনা থাকে, যা এই ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে প্রশমিত করা হয়। আর সুষ্ঠু মানব-জীবন গড়ে তোলার পক্ষে শৃঙ্খলার মর্যাদা কতটুকু, তা যে কোন স্বাধীন মানুষের অজ্ঞাত নয়। সংঘের অভাবে মানবজীবনে এ শৃঙ্খলাবোধ জন্মে না বা মানুষ শৃঙ্খলার শিক্ষা পেতে পারে না। ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা শিক্ষার জন্যেই এই ছাত্র-সংগঠন। ছাত্রসংসদের মূলমন্ত্র—শৃঙ্খলা শিক্ষার অবকাশ ও সুযোগ দেওয়া। সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে যদি ছাত্রদের কোন বক্তব্য থাকে, ছাত্রসংসদ তা উপস্থাপিত করে অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছে। অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক মহাশয় যথাসম্ভব তাদের অভিযোগে কান দেন, এবং তা মোচন করারও চেষ্টা করেন। এতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ছাত্রের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। "অধ্যয়নই তপস্যা'—এই মূলমন্ত্রকে মনে রেখে আপন চিন্তা বুদ্ধি বা জ্ঞানবিকাশে ছাত্রেরা যদি কোন বিঘ্নের সম্মুখীন হয়, বা কোন অভাববোধ করে, তারা অনায়াসে তার সংশোধনে সক্ষম হয়। অতএব, ছাত্রদের জীবনাদর্শের সঙ্গে এর যোগাযোগ অগ্রাহ্য করা চলে না। সর্বোপরি, ছাত্রেরা এ-ধরণের সংসদের মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করার, আপন আদর্শের যৌক্তিকতা স্থাপন করার, নিজেদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করার, ঐক্যবদ্ধভাবে ছাত্রজীবন তথা বৃহৎ জীবন যাপন করার এবং সর্বশেষে স্বাবলম্বন-শক্তির স্ফুরণের প্রথম ক্ষেত্র পায়।

ছাত্রসংসদের প্রয়োজনীয়তা ও নীতিগত আদর্শ

ছাত্রসংসদের প্রতিটি কাজ সংগঠনমূলক। ছাত্র-স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিভিন্নমুখী কর্মপন্থা অবলম্বনে সক্রিয়তার পরিচয় দেয় এই প্রতিষ্ঠান। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে ছাত্রসংগঠন আয়োজিত ক্রীড়া-আমোদ, বাৎসরিক বিচিত্রানুষ্ঠান, বার্ষিক পত্রিকা ও দেয়াল পত্রিকা সম্পাদনা, সুকুমার-শিল্প আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্মেলন ও অধিবেশন ইত্যাদি ছাত্রসংসদের একতা আর সম-মতবাদিতার ফলেই সম্ভব হয়ে ওঠে। 'কলেজ ইউনিয়নে'র নিজস্ব সংবিধান আছে। তাতে এই সংসদের কর্মসূচীর কথা স্পষ্টই বর্ণিত থাকে। বিভিন্ন বর্ষ বা শ্রেণী থেকে ছাত্র-নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একজোট হয়ে একটা কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করে। এই মূল সমিতির

-প্রতিনিধিরা বিভিন্ন উপ-সমিতি গঠন করে' ক্ষমতা বণ্টন করে নেয়। তারপর উপসমিতিগুলির বিভিন্ন সম্পাদকের অধিনায়কত্বে হয় খেলাধূলার ব্যবস্থা, হয় কলেজ পত্রিকার সম্পাদনা, হয় সাহিত্য সম্বন্ধীয় কার্য ইত্যাদি। সর্বোপরি, এই ছাত্রসংসদের নিপুণ কার্যের জন্যে চাই একজন উৎসাহী ও শক্তিমান সাধারণ সম্পাদক। কার্যনির্বাহক সমিতিই তাকে নির্বাচন করে। এ ছাড়া কার্যনির্বাহক সমিতি কোথাও-বা সহকারী সভাপতি, আবার কোথাও-বা ছাত্র সভাপতি নির্বাচন করে' থাকে। আর অধ্যক্ষ বা কোনও অধ্যাপক সভাপতির পদে কাজ করে থাকেন। তবে তিনি মুখ্যতঃ কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ব্যতীত সংসদের দৈনন্দিন কর্মসূচীতে শুধু পরামর্শ দেন এবং নেতৃত্ব করেন।

**কলেজ ইউনিয়নে'র গঠনপদ্ধতি ও কর্মসূচী**

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি সীমিতরেখা টেনে দেওয়া হত। প্রাচীন মতে, ছাত্রদের একান্তমনে বই-এ ডুবে থাকা ব্যতীত বহির্বিশ্বের উত্তেজক কোন খবর নিয়ে মাথা ঘামানো অনুচিত অযাচিত। কিন্তু ক্রমে শিক্ষা তথা প্রকৃত জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষ এক ব্যাপক বিশ্লেষণের সন্ধান পেল—হৃদয়ংগম ক'রল যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও ব্যাপক প্রসারই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটাও স্বীকৃত হল যে, পুঁথির সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করে' অবসর সময় ছাত্রদের মহৎ সামাজিক প্রয়োজনমূলক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। তাদের এসব কাজ বৃহত্তর মানবপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দেবে। প্রকৃতপক্ষে মানব-জীবনই পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে অধিক শিক্ষা দেয়। সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে তাই ছাত্রদের দায়িত্ব কোন অংশে কম নয়। ছুটিতে তাদের কর্তব্য—গাঁয়ে এসে পাড়া-পড়শীদের সরল অজ্ঞ জীবনে জ্ঞানের আলোকপাত করা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাদের অবহিত করা এবং লোকেদের স্বাস্থ্যকর স্থানে গৃহাবাস প্রস্তুত করার পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি। সর্বোপরি, বন্যা ভূকম্পন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ছাত্রেরা আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা করে' নিরন্নের ক্ষুধায় অন্নপানীয় দিয়ে সমাজের অশেষ কল্যাণসাধনে সমর্থ হয়। মহামারী আকাল ও দুর্ভিক্ষের দিনে ছাত্রেরা ওষুধ-পথ্যি দিয়ে, সরকারী গুদাম থেকে চাল এনে বিলিয়ে জনগণকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে। এসব কাজের মধ্যে দিয়ে, দরিদ্রের দুঃখমোচন করে' প্রতিটি ছাত্র প্রেরণা পায় নিজের চরিত্রকে গঠন করার এবং সুদৃঢ় করার। ছাত্রসংসদের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে ঐ সব কাজ করার পর ভাবী মানুষরূপী ছাত্রেরা জীবনের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণাকে ধৈর্যসহকারে সহ্য করার শিক্ষা পায়। ছাত্রেরা আরও প্রয়াস পায় তাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্যের একটি খসড়া পরিকল্পনা করার। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হয় এতে।

**ছাত্রসমাজ ও সামাজিক কর্তব্য**

সাধারণতঃ কলেজে ছাত্রদের আপন বৃত্তিনির্বাচনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাদের এ-স্বেচ্ছায় চলার বাঁকে-বাঁকে অশান্তির বিক্ষেপ আসে, যদি না প্রতিটি ছা সংযমী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়। আর এই শৃঙ্খলা-শিক্ষার প্রথমোন্মেষ হয় ছাত্রসংসদেই

**কলেজ-জীবন ও 'কলেজ ইউনিয়ন'**

আপন আদর্শ ও স্বীয় মতবাদকে জীবনে মূল্য দেবার পূর্বমুহূ ছাত্রেরা এখানে নিজেকে যাচাই করে অপরকে দিয়ে। প্রতি ছাত্রের সঙ্গে মেলামেশায় তাদের মনের আকাশ সীমাহীনত্ব বিমণ্ডিত হয়। সমন্বয়ের এক অদ্ভুত কৌশল খুঁজে পায় পরস্পরে। তাছাড়া, ছাত্রসংসদে মধ্যে দিয়ে শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে ছাত্রদের অন্তরঙ্গতার রাখীবন্ধন হওয়ায় ছাত্রের নিজেদের প্রকৃত ত্রুটি ও গলদ আবিষ্কারে সমর্থ হয়। সর্বোপরি, পত্রিকা বিতর্কসভ আলোচনী ইত্যাদির ভিতরেও ছাত্রেরা আপন আপন ক্ষমতা ও প্রতিভার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। মোটের উপর, সংসদের দৌলতে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ-জীবনে প্রতিটি ছাত্রের জীবন অতীব সৌষ্ঠবময় হবার সুযোগ পায়।···তবে বাংলাদেশের বড় বড় কলেজের প্রত্যেকটিতে অসংখ্য ছাত্রের কলরবে ও সময়ে সময়ে অসৎসঙ্গে পড়ে' কোন কোন ছাত্র এই জীবনের আদর্শ থেকে হয় বিচ্যুত। কারণ,—বৃহত্তর কলেজগুলিতে প্রতিটি ছাত্রের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়ন বা শৃঙ্খলা শিক্ষার দিকে নজর রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সুতরাং ছাত্রদের নিজেদের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের সুযোগ সুবিধাগুলিকে অপব্যবহার করা সমীচীন নয়।

ছাত্রসংসদেরই কোন সদস্যের সম্পাদনায় প্রতি বছর বিভাগীয় পত্রিকা প্রকাশিত হয় যা ছাত্রদের সাহিত্য-মানসের অগ্রগতির সূচনা করে। এতে ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে

**ছাত্রসংসদ ও পত্রিকা**

নিজেদের প্রতিভা বিকাশের ক্ষমতা পায়। তাছাড় এই প্রকাশনীর মধ্যে দিয়ে ছাত্রেরা কায়মনোবাক্যে তাদে সমর্থন ও সহযোগিতা জানায় সম্প্রদায়গত কাজে। এই সহযোগিতা করার মনোবৃ জীবনের প্রতিটি পাদক্ষেপে অতি প্রয়োজনীয়।

যদি কলেজ পাঠাগারে অতি-প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির অভাব ঘটে বা বই বিলি করা

**কলেজ পাঠাগার ও ছাত্রসংসদ**

সময় মূল্যবান পুস্তক নিয়ে যদি কোন পক্ষপাত সূচিত হয় তা'হলে ছাত্রসংসদ সদলে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগপত্র পেশ করে, তাদের দাবি মেনে নেবার ও ইচ্ছাপূরণের অধিকার পাবার জন্যে কর্তৃপক্ষে কাছে অনুরোধ জানাতে পারে।

এছাড়া ছাত্রসংসদ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সংসদ ছাত্রদের একথা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় যে, দেশের সমৃদ্ধি ছাত্রদের দায়িত্ববোধ-অনুস্যূত লেখাপড়ার উপর নির্ভরশীল। কর্তৃপক্ষের কাছে ছাত্রদের কষ্টের কথা জানিয়ে এবং

এই সব কষ্ট লাঘব করে' ছাত্রসংসদ কলেজের সত্যিকার সুচারু কর্মসম্পাদনার কাজে সহায়তা করে। কিন্তু এ ধরণের মীমাংসা করার ঈপ্সা এবং কলেজ-জীবনকে শান্তিপূর্ণ করার বাসনা ইদানীং খুব অল্পই চোখে পড়ে। ছাত্রেরা যে কোন বিষয়ে হুজুগে মেতে, কোন বিচারবুদ্ধির আশ্রয় না নিয়েই যে কোন তুচ্ছ কারণে ধর্মঘট করে' কলেজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে বিঘ্নিত করে। একজন বিদেশী পর্যটক তাই বলেছিলেন, 'এদেশের ছাত্রসংসদ শুধু ধর্মঘটকেই একমাত্র মীমাংসার পথ ভাবে। কিন্তু আইন অমান্য করা, বা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করাকে পাশ্চাত্ত্য-দেশের ছাত্রেরা অতি অবজ্ঞার চোখে দেখে।' ছাত্রসংসদের অপর এক কর্মতালিকার উল্লেখযোগ্য অংশ হওয়া উচিত শিক্ষামূলক ভ্রমণ-যাত্রার ব্যবস্থা করা এবং একজনের পক্ষে যে-দেশ ঘোরা ক্ষমতার বাইরে, দশজন মিলে সেটাকে সম্ভব করে তোলা। ছাত্রসংসদের অপর একটি কাজ—কলেজে সস্তা দোকান বা 'চীপ ষ্টোরে'র ব্যবস্থা করা। অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে 'চীপ ষ্টোর' বই, খাতা পেন্সিল ইত্যাদি যাবতীয় লেখাপড়ার সরঞ্জাম বিক্রয় করার ব্যবস্থা করে। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বিভিন্ন কলেজের ছাত্রসংসদ এসব কাজ ছাড়া দুঃস্থ ছাত্রদের মাইনে দিয়েও সাহায্য করে। সর্বশেষে রুগ্ন ছাত্রদের স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্যে ছাত্রসংসদ হাসপাতাল বা স্যানিটোরিয়ামে পাঠাবার ব্যবস্থা করে সংসদেরই খরচে। ছাত্রসংসদের সংগঠনমূলক ও কল্যাণমূলক এসব কাজ সর্বজনপ্রশংসনীয়।

**ছাত্রসংসদের অন্যান্য হিতকর কাজ**

কিন্তু এ-ধরণের মৌলিক আদর্শে কিঞ্চিৎ বিকৃতি আজকাল সকলের চোখে পড়ে। সংসদগঠনের নামে ছাত্রেরা কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়। রাজনৈতিক আদর্শগত বৈষম্যের যুগে ছাত্রদের মধ্যে বিরোধী মতবাদ ও বিভেদ-পরায়ণতার প্রবণতা ও পরিপুষ্টি লক্ষিত হয়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ইউনিয়নের নির্বাচনে। মাঝে মাঝে 'ইলেক্‌শন্ প্রোপ্যাগাণ্ডা' নিয়ে সাম্প্রদায়িকতারও সৃষ্টি হয় কলেজে কলেজে। ছাত্রদের রাজনীতিবিমুখ হবার উপদেশ দেওয়ায় কয়েকজন অধ্যাপকের উপর তাদের নীচ আক্রমণের নজীরও পাওয়া গেছে অনেক বার। কিন্তু আজকাল কোন কোন রাজনৈতিক নেতার প্ররোচনায় ছাত্রেরা বহুসংখ্যায় রাজনীতিতে যোগ না দিয়ে পারে না। এ-সব নেতৃবর্গের স্বার্থ যখন হাসিল হয়ে যায়, তখন ঐসব অভাগা ছাত্রের কোন খবরই নেতারা রাখেন না! তাতে ছাত্রজীবনের অমূল্য সময়টি তো নষ্ট হয়ে যায়ই, তাছাড়া কর্মজীবনেও তারা পঙ্গু ও পদে পদে লাঞ্ছিত হয়। রাষ্ট্রের যে কোন ব্যাপারে মাথা ঘামানোকেই সাধারণতঃ রাজনীতি বলে। বর্তমান অস্বাভাবিক ঘোরালো সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে যদিও ছাত্রদের রাজনীতি-ঘেঁষা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, তবু একথা

**ছাত্রসংসদ ও রাজনীতি**

ব'লতেই হবে যে, স্বার্থান্বেষী পৃথিবী সম্বন্ধে সরল পবিত্র ছাত্রদল অনভিজ্ঞ। অতএব, তাদের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া তো অবিমৃষ্যকারিতারই নামান্তর। তবে একথাও সত্য যে, আফ্রিকা ও এশিয়ার জনজাগরণ ও স্বাধীনতার সংগ্রামে ছাত্রদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। ঘানার বর্তমান প্রধান মন্ত্রী একজন ছাত্রই ছিলেন যখন তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেন। বাংলাদেশে কথায় কথায় ধর্মঘট! বেতনবৃদ্ধি? ধর্মঘট। ট্রাম কর্মচারীর অব্যবস্থা? ধর্মঘট। খাদ্যসমস্যা? ধর্মঘট। বিভিন্ন রাজনীতিক দল ছাত্রদের দিয়ে কাজ সমাধা করে' তাদের শোষণ করে, এর দৃষ্টান্ত পশ্চিম বাংলার মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়গুলিতে বিরল নয়। ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতির শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে তাদের বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা দেশসেবা করা। অতএব, এ-হেন বিচ্যুতি ছাত্র-জীবনে মোটেই সমর্থনীয় নয়।

ছাত্রসংসদের দায়িত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আগেকার ইতিহাস দিয়ে স্বাধীনোত্তর প্রগতিবাদী ভারতের এ-যুগকে বিচার করা যুগোচিত প্রজ্ঞাবাদিতার লক্ষণ নয়। ছাত্রদের রাজনীতি কি, এ-শিক্ষাই জীবনের একমাত্র কামনা হওয়া উচিত নয়। স্বাধীন ভারতে তাদের জীবনের আদর্শ তথা ছাত্রসংসদের আদর্শ হওয়া উচিত শুধু অধ্যয়ন করা, মানবতার শিক্ষা নেওয়া, ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত করা, চিত্ত-সংযমকে বাড়িয়ে তোলা, রাজনৈতিক নেতার শোষণমূলক ভেদনীতির আশ্রয়ে তাঁর চিত্তবিনোদনে বিরত থাকা, চরিত্রকে গড়ে তোলা এবং দেশসেবায় প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করা। একথা মনে রাখা উচিত, ছাত্রেরাই জাতির জনক। তাদের মধ্যে নিহিত আছে ভাবী রাষ্ট্রনেতার বীজ। তাই তাদের পক্ষে জীবনগঠন-কার্যের এ পর্যায়ে শুধু আত্মানুসন্ধান ও আত্মানুশীলনকে ব্রতরূপে গ্রহণ করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইদানীং ছাত্রসংসদের সদস্যদের মধ্যে স্বার্থপরায়ণতার যথেষ্ট পরিচয় মেলে। ব্যক্তিগত হিত চরিতার্থতায় যে-সব ছাত্র এ-সংসদে যোগ দেয়, তাদের দ্বারা ছাত্রসংসদের কত অনিষ্ট হতে পারে তা বলা অবান্তর। এ-ধরণের কার্য থেকে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডবলীলার দর্শন মেলে তার পরিণাম অতীব মারাত্মক। 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ'—এ-মন্ত্রকে জীবনের অপরিবর্তনীয় নীতি হিসেবে মেনে নিয়ে অপরাপর কাজগুলোকে আনুষঙ্গিক হিসেবে রেখে প্রতিটি ছাত্রসংসদের কর্তব্য শুধু তাদের শিক্ষা-বিষয়ক সুযোগ-সুবিধাগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা।

**স্বাধীন দেশে এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আদর্শ**

## প্রাণদণ্ডাজ্ঞা

পরাভূত অহংবুদ্ধির দৌরাত্ম্যে মানুষ যেমন তার মানসিকতাকে বাঁকাচোরা পথে চালিত করে' নানাবিধ অপচারের আশ্রয় নেয়, তেমনি মানুষের চেতনা যখন

আত্মবঞ্চনাকে সমধিক গুরুত্ব দেয়, তখন সে পাপাচারী হতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। মানুষের এ-অন্যায় পথাশ্রয়ের মনস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞাই হচ্ছে এই রকম। তাই মানবজীবনের অপূর্ণতার নিরিখে পাপের বিচার ন্যায়সংগত। পৃথিবীর একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক মানবসমাজ রক্ষার্থে একথা গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছেন যে, 'মানুষকে ঘৃণা করা অমানবোচিত। তার পাপই একমাত্র ঘৃণ্য।' অতএব, অপরাধের মূল উৎস মনের উপর শাস্তির গুরুভার না চাপিয়ে, শরীরের উপর লাঞ্ছনা আনার ব্যবস্থা বুদ্ধিসম্মত নয়। তাই বিচারকেরা আজকাল প্রায়ই বলে থাকেন যে, মনস্তাত্ত্বিকের সহায় নিয়ে মানুষের মনোগত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও তার প্রতিক্রিয়া'র এক আমূল রূপান্তর আনার মধ্যেই নিহিত আছে শাস্তির মূলতত্ত্ব।

সূচনা

দণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য যে কোন উপায়ে মানুষের চরিত্র সংশোধন করা। ক'লকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বন্দিশালার অপরাধীদের জন্যে আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করে' এই কথা বলেছেন যে, আজকাল কারাগারে পাঠানো বা প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় শুধু অপরাপর জনসাধারণের পাপানুশীলনে বিরত থাকার জন্যে। শাস্তির কঠোরতা একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে, জনসাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার করা—পাপীদের পাপকার্য থেকে বিরত করা! দ্বিতীয়তঃ, যারা ইতিমধ্যে কারারুদ্ধ হয়ে গেছে, তাদের নানারকমের গঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা ও ন্যায়-শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র সংশোধন করা শাস্তিবিধানের আর একটি অঙ্গ।

দণ্ডের উদ্দেশ্য ও নীতি

দোষবিচারে আদালত সর্বদা সচেষ্ট থাকেন অপক্ষপাত দৃষ্টিদানে। অপরাধের সঙ্গে শাস্তির অনুপাতকে অক্ষুন্ন রাখা ন্যায়দণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ দিক। যখনই সামান্য অপরাধে একটা জীবনের উপর ন্যস্ত করা হয় দণ্ডের গুরুভার, তখনই পাপী বা অপরাধীর মনে এক অসাধারণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, অতঃপর সে মুক্তি পেয়েই পর পর হিংসাত্মক অনুষ্ঠান করে চলে। এধরণের নজীর বাংলা দেশে বা ভারতবর্ষে অল্পসংখ্যক নয়। জরাসন্ধ তাঁর 'লৌহকপাটে' একরকমের অনেক দৃষ্টান্ত পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কথায় বলে 'Your sincere repentance washes away your crime,' বদন মুন্সী তাই এ অনুতাপের আগুনে অহরহ জ্বলে' শেষ পর্যন্ত আত্মাহুতি দেয় শেষ বিচারের আগেই। তাই দণ্ডনীতির সঙ্গে অনুতপ্ত করার অভীপ্সার সামঞ্জস্যসাধনের কথা আজকাল বিচারকমণ্ডলী মেনে নিয়েছেন।

দণ্ডের সুফল ও কুফল

একথা সর্বাগ্রে বিবেচ্য যে, কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত একটি লোককে কতটা

শাস্তি দেওয়া চলে। বিচারে যখন ভ্রান্তির অপরোক্ষ বর্জন বিচারকদের দৃষ্টিগোচরে আসে না, তখন নির্দোষকে দেওয়া হয় শাস্তির কঠোরতা। তখন এ পৃথিবীকে সে শুধু অন্যায়ের দৃষ্টিতেই দেখে এবং পাপের নেশায় সহসা হয়ে ওঠে মাতোয়ারা। তাই পাপীকে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে ঘটনার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণের যাথার্থ্যকে অবজ্ঞা করেন না কোন বিচারক। যে কোন অপরাধী যখন খুনের দায়ে বা যে কোন মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত হয়' তখন জুরীরা গভীরভাবে চিন্তা করেন, উক্ত ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া যায় কিনা, যদিও ভারতবর্ষে ফাঁসীর কোন অবকাশ নেই সম্প্রতি। মৃত্যুদণ্ডের প্রাক্-মুহূর্তে বিচারকেরা এই সিদ্ধান্তই করেন যে, এ ধরণের সামাজিক অপদার্থের মৃত্যু-বিনা আর কোন শিক্ষার পথ উন্মুক্ত নেই।···কিন্তু এ বিষয়ে সকলে একমত যে ফাঁসী বা মৃত্যুদণ্ডের মতো নৃশংসতা, পাশবিক বর্বরতা মানব-জীবনে আর নেই। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। যে মানুষের পক্ষে একটি প্রাণী সৃষ্টি করা অসম্ভব, সে-মানুষ যদি একটি প্রাণীকে আত্মঘাতী হতে বাধ্য করে, তাকে মানব-সমাজ কি করে সহ্য করতে পারে! রোজেনবার্গ-দম্পতিকে রাজদ্রোহিতার ভিত্তিহীন অভিযোগে মার্কিন সরকার যে ভাবে নিষ্ঠুরতার আশ্রয় করে' মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে-ছিলেন তার বিরুদ্ধে পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী একমত হয়ে ঘোষণা করেছিল যে ঐ সরকার অতি-প্রতিক্রিয়াশীল। সমাজকে গড়ে তোলার প্রবঞ্চনায় এভাবে সমাজকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণ পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকতে পারেনি। রোজেনবার্গদের জীবনরক্ষার জন্যে যে আইনগত লড়াই চলেছিল তারই পটভূমিকা হিসেবে পৃথিবীব্যাপী এক ব্যাপক আন্দোলনও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু নির্দয় সরকার একথায় মোটেই কর্ণপাত করেননি। এরপর থেকে মৃত্যুদণ্ডের বীভৎসতায় প্রতি এক দিকে যেমন পাপলিপ্সুদের ভীতির ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়, অপর দিকে তেমনি এ-দণ্ডাজ্ঞার প্রতি পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর তীব্র প্রতিবাদ এবং অবজ্ঞার মাত্রাও কোন অংশে স্বল্প নয়। একটা জ্যান্ত মানুষকে যদি মৃত্যুবিবরে ঠেলেই দেওয়া হল, তাকে কে কতটা শাস্তি বা সমুচিত শিক্ষা দিতে পারল? সেই জন্যে বলা হয়, "Any nature of punishment should be viewed in the very idea of reformation. 'Thou shalt be hanged is an old-aged epic."

সমাজের উপর মৃত্যুদণ্ডের প্রতিক্রিয়া—রোজেনবার্গ দম্পতির কথা

যারা জীবনে অপরাধটাকেই মূল-মন্ত্র করে নিয়েছে, তাদের জীবনদর্শনে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ও বিরূপ মনস্তাত্ত্বিক গতিশীলতা এসে পড়েছে। অসদাচার অতি ঘৃণিত। কিন্তু একবার মানুষ যখন এ-বৃত্তিকে নেশাড়ে করে তোলে, তখন সে উক্ত সংজ্ঞাটি বিস্মৃত হয়ে পড়ে বা এ কথাকে আমল দিতে অনিচ্ছাও প্রকাশ করে। অর্থাৎ মনের

ক থেকে সে তখন নিরুপায়। অপরাধ আচরণের ক্ষেত্রেও উক্ত সত্যটি খাপ খেয়ে যায়। যে একবার খুন-খারাপি করে ফেলেছে, তার মোহই হবে পুনরায় ঐ অনুষ্ঠানে নিজেকে নিয়োজিত করা। অতএব, গুরুতর অপরাধে মৃত্যুদণ্ডই প্রায় ক্ষেত্রে সমীচীন লিয়া অভিহিত হয়। এতে অপরাধ নিবারিত হয় যথেষ্ট পরিমাণে।

অপরাধ নিবারণে মৃত্যুদণ্ডের কার্যকারিতা

প্রাণ-নেওয়ার পরিবর্তে প্রাণ-দেওয়ার মধ্যে দিয়ে যে-সব মানুষ অপরাধীদের চরিত্র ংশোধনের পক্ষপাতী, তাঁরা একথা বলেন যে, একটি নিরীহ জীবকে হত্যা করা (আইন-সংগত উপায়ে) প্রতিহিংসা চরিতার্থতারই নামান্তর। তবে বিনা বিসংবাদে একথাও বলা চলে যে, একই কাজ সাবধানতা-সত্ত্বেও যে বেপরোয়াভাবে বারবার করে' চলে, তাকে গুরুতর শাস্তি দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। নের অভিযোগে ফাঁসী দেওয়া বা অন্য কোন উপায়ে প্রাণপাত করার সংহতি ও ঔচিত্য নেকে খুঁজে পান সত্যি, কিন্তু রোজেনবার্গ-দম্পতি বা বেরিয়া প্রমুখ ব্যক্তিবিশেষের শদ্রোহিতার ক্ষীণ যুক্তিতে প্রাণদণ্ড দেওয়ার ঔচিত্যবোধ পৃথিবীর সভ্যজাতি মেনে নবে না। শেষোক্ত মৃত্যুদণ্ডকে প্রতিহিংসামূলক কার্যকলাপ বলে' অভিহিত ক'রতে ম্ভবতঃ পৃথিবীর কোন মানুষই কুণ্ঠা বা সংকোচ বোধ করবে না।

প্রাণদণ্ড ও প্রতিহিংসা

পাপ এবং অপরাধ-বিজ্ঞান পর্যালোচনা-শেষে একটা সুনিশ্চিত মন্তব্য করা অনায়াসে সম্ভবপর হয়ে ওঠে। প্রাণদণ্ড যেমন গুরুতর, অপরাধও তেমনি গুরুতর হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেখানে মাধানের পথ বন্ধ, সংস্কারের পথ চিররুদ্ধ, সেখানে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া গত্যন্তরও থাকে না।

প্রাণদণ্ডের যৌক্তিকতা

কিন্তু এ-ধরণের প্রাচীনপন্থী মতবাদের সুঙ্গে, ভারতীয় জনগণের মতে, প্রগতিশীল ান্তিবাদী দুনিয়ার মতামতের সমন্বয় খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। ভারত প্রাণদণ্ডে আস্থাশীল নয়। অপরাধীর চরিত্র উন্নয়ন, মন থেকে পাপমোচন এবং পাপে ঘৃণা জন্মানো, আর সর্বতোভাবে একটি নূতন মানুষ ড়ে তোলার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ সে আজ। রোজেনবার্গ-দম্পতির মর্মভেদী মৃত্যু-বরণকে নসপটে চিরঞ্জীব রেখে ভবিষ্যতে পৃথিবীর সব দেশই মৃত্যুদণ্ডের বিলুপ্তি ঘটিয়ে ংস্কারের পথকে প্রকৃষ্ট পথ ব'লে মেনে নেবে। প্রকৃতপক্ষে অপরাধীর অন্তরে ানবতাবোধের উন্মেষ করা, তার মনের দিগন্তকে সীমাহীন করার মধ্যে দিয়ে চরিত্রের ংস্কারসাধনই শাস্তিব্যবস্থার আদর্শ হওয়া উচিত।

উপসংহার

## স্বাধীন ভারতে দেশভ্রমণ ব্যাপারে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

মানুষের মনের দিগন্ত ও জানার ব্যাপকতাকে প্রসারিত করার জন্যে চাই শভ্রমণ। আর এ-দেশভ্রমণে শুধু প্রাকৃতিক রমণীয়তা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থানের

বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি রেখে তৃপ্ত হ'লে চ'লবে না—মন ও চোখকে সর্বতোভাবে উন্মীলিত রেখে প্রত্নতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যগত এবং শিল্পগত রুচিশীলতা বা অনন্যতার কি পরিচয় পাওয়া যায়, তারই দিকে গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

**সূচনা**

যুগ-যুগান্তর ধরে কত পর্যটক ভারতভূমিতে এসে এই ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞানলাভ করে' দেশে ফিরে গিয়ে এসব প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। তাতে অজ্ঞাত মানুষের জীবনযাত্রা, আচারব্যবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা সমস্ত-কিছুই একটি ভিন্-সম্প্রদায়ের মনোগত হতে পেরেছে। হিউয়েনৎসাঙ্গ-এর ভারত-বিবরণ পড়ে ভারতবাসীদের সম্বন্ধে প্রকৃতই অবহিত হতে পেরেছে বহির্বিশ্ব। সুতরাং এখানে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, দেশভ্রমণের ফলে মানুষ প্রথমতঃ তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয় দিতে পারে অচিন্ দেশে; অপরপক্ষে সেদেশ থেকে অনেক অজানাকে জেনে নিজেদের ত্রুটি কোথায়, তা ধ'রতে পেরে শুধ্‌রে একটা সংগতিপূর্ণ গোটা-মানুষ হবারও সুযোগ পায়। এ-থেকে সূত্রপাত হয় জ্ঞান-বিনিময়ের লোকে পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ কর' যতটা না শিখ্‌তে পারে, তার অধিক শেখে একটা জিনিস দেখে এবং অনুভূতিতে সে-বোধের সঞ্চার করে'। সর্বোপরি, বহু পর্যটকের সন্দর্শনে এসে তারা জানে অনেক-কিছু, যা একটি কৃতী ছাত্রও বলতে অপারগ হয়।

**জ্ঞানের বিনিময়**

বাইরের কালো-লাল-সাদা হরেকরকমের চামড়ার আবরণে ঢাকা আছে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি বা সম্প্রদায়। কিন্তু বাহ্য এ কাঠামোর অন্তরালে যে-রক্ত মানুষের শিরায় শিরায় রাত্রিদিন সঞ্চারিত হয়ে মানুষকে জীবনীশক্তি দিয়েছে, সে-রক্ত সকলের এক। অর্থাৎ গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে একটু চিন্তা ক'রলে সহজে বোঝা যায় যে, দুনিয়ার সব মানুষই সমান। বৈষম্যটা বহির্মুখীন, কিন্তু সাদৃশ্যটা অভ্যন্তরীণ। এ তত্ত্বটা শুধু দেশভ্রমণই আমাদের দার্শনিক বুদ্ধিতে সর্বপ্রথম আনে। দেশপর্যটন হৃদয়ের বিভেদ, আপাত-অসাদৃশ্য সব কিছু ঘুচিয়ে সব মানুষকে সমদৃষ্টি দানের ক্ষমতা দেয়।

**দেশভ্রমণ ও জাতিগত বৈষম্য**

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে পুঁথি-কীটের অপার বিদ্যারাশি শুষ্ক। কর্মজীবনে শেষোক্ত বই-এর বিদ্যার দাম অতি অল্প। একজন ঘরকুণো অধ্যাপকের চেয়ে বিশ্বপরিক্রমারত একজন ব্যবসায়ী পৃথিবীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে অধিক জানেন যেহেতু তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। জীবনে এ-ধরণের বাস্তব অভিজ্ঞতার দাম বই-এর বিদ্যার চেয়ে ঢের বেশি। অর্থাৎ পরিভ্রমণশীল মানুষ আপন কাজের জন্যে যে-সব বিদ্যার দরকার, তা অভিজ্ঞতা দ্বারা সঞ্চয় করে; অথচ একটি মানুষ এ পৃথিবীতে সমৃদ্ধ জীবনযাপনের জন্যে শুধু অধ্যয়ন করেই চলে!......

**দেশভ্রমণের সুফল**

পাশ্চাত্ত্য দেশে দেশভ্রমণকে শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত করা হয়। রাষ্ট্রীয় সরকার সে-সব দেশে ছাত্রদের লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশভ্রমণের জন্যে উৎসাহিত ও সাহায্য করেন। কিন্তু এ-ধরণের দেশপর্যটনের উপর গুরুত্ব ভারত সরকার কর্তৃক কদাচিৎ স্বীকৃত হয়। এদেশের ছাত্রদের কাছে দেশভ্রমণকে আকর্ষণীয় করে তোলার দিকে সরকারের অধিক যত্নশীল হওয়া উচিত। যারা অক্ষম তাদের ছেলেমেয়েরাও যাতে বিদেশভ্রমণে বেরোতে পারে, এজন্যে সরকারী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। এ-বিষয়ে সরকারী দায়িত্বের কথা সকলে বলেও থাকে।

ছাত্রসম্প্রদায় ও পর্যটন

ঘরে বসে' যে মেধাবী ছাত্র বই-এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে, তার মন সাধারণতঃ সংকুচিত। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্যকে সে পরিব্যাপ্ত করার কোন সাহসই পায় না। কিন্তু একজন দেশভ্রমণরত ছাত্রের মতামত সাধারণতঃ উদার হওয়া স্বাভাবিক। তার লক্ষ্য সবদা নির্ভুল থাকে—আর বিচারও হয় অভ্রান্ত; যেহেতু সমন্বয় করার সামর্থ্য দেশভ্রমণই তাকে দিয়েছে। আপন দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরে মানুষ শেখে তার দেশকে ভালোবাসতে। কিন্তু বিদেশে গিয়ে মানুষ এই কথাই উপলব্ধি করে যে, সে সমগ্র পৃথিবীর একটি নাগরিক। সুতরাং তার মনের ব্যাপ্তি নিশ্চয়ই অসাধারণ হয়ই। তবে চিন্তাধারা সব সময় হয় সহানুভূতিশীল ও ঘটনাত্মক। সে শুধু জাতীয়তাবাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমিত থাকবে না, অথচ শুধু ভাব্‌বে না আন্তর্জাতিকতার কথা। সে ভাব্‌বে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কথা। সে সমস্ত পৃথিবীটাকেই ভাব্‌বে তার আপনার। মানবপরিবারের প্রতি সে যে শ্রদ্ধাশীল হবে, তাতে আর অবাক্ হবার কি আছে।

দেশভ্রমণে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী

ইউনেস্কোর উদ্গাতা ভারত একদিন একথা গভীরভাবে অনুভব করেছিল যে, আজকের ঘাত-প্রতিঘাতময় এই পৃথিবীর বুকে শান্তিপূর্ণভাবে বাস্ করার একমাত্র পথ হচ্ছে সহনশীলতা ও সহানুভূতিপূর্ণ মানসিকতার উন্নয়ন। এই সহ-অবস্থানের মন তখনই গড়ে ওঠা সম্ভব, যখন মানুষ পৃথিবীর অপরাপর মানুষের সংস্পর্শে আসবে। তাই বিভিন্ন দেশের মধ্যে কৃষ্টি-সভ্যতার বোঝাপড়া বা আদানপ্রদানের ভিত্তিতেই সমৃদ্ধিশালী একক পৃথিবী রচনার পরিকল্পনাকে মুলমন্ত্র করা হয়েছে এখানে। আর এই পরিকল্পনার সার্থক পরিণতির জন্যে চাই দেশভ্রমণ। দেশভ্রমণ পরস্পরের ভিতরে সৌভ্রাত্র-ভাবের উন্মেষ করে। একে অপরের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করে' মানুষ গড়ে' তোলে প্রাণে-প্রাণে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, হৃদয়ে-হৃদয়ে অভিন্নতা এবং অন্তরে-অন্তরে পারস্পরিক মিল। প্রগতিবাদী এ-বিশ্ব আজ মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির অটুট বাঁধন-নির্মাণে প্রয়াসী।

দেশভ্রমণ ও কৃষ্টিগত যোগাযোগ

পর্যটকেরা অনায়াসে বিদেশী ভাষা আপন আয়ত্তে আনয়নে সক্ষম হয়। ঘরে পড়ে' শেখার চেয়ে বিদেশীদের কথাবার্তা ও বাদানুবাদের মধ্যে দিয়ে একটি বিদেশী ভাষা-শিক্ষা অনায়াসে সম্পন্ন করা চলে এবং এই শেখাই প্রকৃত শেখা। ভারতের অচল ও অকেজো কাঠামো-সন্নিবিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন-মানসে শিক্ষা-কমিশন যে-সব মন্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, তার মধ্যে অপরিহার্যরূপে একটি বিদেশী ভাষা-শিক্ষার পরিকল্পনাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অতএব, এই ভাষাবোধকে আরো গভীরতর করে তুলতে হলে চাই দেশ-ভ্রমণের উপর সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ।

দেশভ্রমণ ও বিদেশী ভাষাশিক্ষা

দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তার কথা অনেকদিন আগে থেকে মানুষ অনুভব করে' আসছে। যে-যুগে একমাত্র পদব্রজেই দেশভ্রমণস্পৃহা চরিতার্থ করা যেত, সে-যুগেও বিভিন্ন দেশ থেকে এদেশে দলে দলে ছাত্রদের আগমন আবার এ-দেশের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদেশে গমন ইত্যাদি থেকে এই সিদ্ধান্তই করা চলে যে দেশভ্রমণ, শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনেরই একটি অঙ্গ। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিভ্রমণ করে' মানুষ সে-অঞ্চলের ইতিহাস জানার সুযোগ পায় ভালোভাবে। এ-অধ্যয়ন চিত্তাকর্ষক হয়, যেহেতু সেস্থানের প্রত্যেকটি জিনিস স্বচক্ষে দেখে যে কোন ছাত্র সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ ধারণা পেতে পারে। দেশভ্রমণের ফলে কূপমণ্ডূক মানুষের চিন্তাবৃত্তি প্রতিটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থানকে জানার জন্যে প্রবল আগ্রহে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। মানুষ তার বন্ধুত্বের বাহু প্রসারিত করে দূরদিগন্তে অচেনা মানুষের কাছে, যখন সে দেশপর্যটনে বহির্গত হয়। বিদ্যালাভের প্রত্যেকটি দিকেই কিছু-না-কিছু সুযোগ দেশভ্রমণের ফলেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

জ্ঞানার্জন

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর কাব্যদৃষ্টিতে প্রকৃতিকে মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপকরূপে পেয়ে আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠেছেন অনেক বার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং রসোপলব্ধির ফলে সত্যই মানুষ এই প্রকৃতিরই কাছ থেকে মহাজ্ঞান লাভে সক্ষম হয়। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করে' সে দেশ সম্বন্ধে এবং পৃথিবীর অপরাপর জাতি সম্পর্কে যে-তত্ত্ব জেনে পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে অসভ্য বর্বর রেড্ ইণ্ডিয়ানদের ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়ে দিয়ে ঐ রেড্ ইণ্ডিয়ানদের সভ্যতার আলোক দেখাবার প্রথম পর্বে যে অসীম সাধনা করে গেছেন, আশা করি সভ্য সমাজ সে কথা আজও বিস্মৃত হতে পারেনি। দেশভ্রমণ-ছাড়া আফ্রিকার নিগ্রো জাতি চিরদিনই অসংস্কৃত থেকে যেত, তাদের জীবনে রাজনৈতিক সামাজিক বা অর্থনৈতিক কোন চেতনাই আসত না। সুতরাং দেশভ্রমণের উল্লেখযোগ্য উপকারিতা হচ্ছে, অজ্ঞাত দেশকে সভ্য জগতের

উপসংহার

কোন কপটাচারী ফেন দিয়া ভাত খাইয়া গন্ধে দই মারিয়াছিল বলিয়া কাহার অন্তরে কৌতুকরস সঞ্চারিত হইয়াছিল, কবে কোন্ নীচাশয় ব্যক্তি ছুঁচো মারিয়া হাত গন্ধ করায় কাহার হৃদয় বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল—প্রাত্যহিক জীবনের ঐ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ঐ সাক্ষাৎ অনুভূতিই সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিকে আন্দোলিত করিয়া ক্ষিপ্র টিপ্পনীর আকারে স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছিল। কিন্তু একের ঐ বুদ্ধির টুকরাই কালক্রমে অনেকের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গিয়াছে—অভ্যস্ত বাক্যে, লোকশ্রুতিতে অথবা প্রবাদে তাহা পরিণত হইয়া গিয়াছে। একদা যাহা প্রত্যক্ষদর্শীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে ব্যক্তি বস্তু বা ঘটনাবিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রবাদের অন্যতর বিশিষ্ট লক্ষণ পরিস্ফুট করিয়াছে। প্রবাদ-রচয়িতার নাম অবলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার চটকদার বাণী সাধারণের সাক্ষাৎ অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিষ্কর্ষরূপে জনপ্রিয়তার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়া লোকপরম্পরায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। তাই কালবিশেষে ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা কথিত হইলেও প্রবাদবাক্য সমগ্র জাতির নির্বিশেষ সম্পত্তি। বুঝিবা সমগ্র জাতির আত্মা আজ ব্যক্তিবিশেষের দান অস্বীকারে 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'ত।

বাংলা প্রবাদের উদ্ভব

গ্রন্থরচনার বহু পূর্বেই প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ সাধারণ লোকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল। তাই প্রবাদকে বলা যায় লোকোক্তি। মহাত্মা ডিজ্‌রেলীর ভাষায় "Proverbs were anterior to books, and formed the wisdom of the vulgar, and in the earliest ages were the unwritted laws of morality." কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক, যাঁহারা জ্ঞানের ধারক ও চিন্তার পরিপোষক, তাঁহাদিগের সুচিন্তিত সুবিবেচিত সুব্যক্ত বাণীও লোক জীবনের বিধি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। 'গতস্য শোচনা নাস্তি', 'শুভস্য শীঘ্রম্', 'মধুরেণ সমাপয়েৎ', 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকারী' প্রভৃতি প্রাজ্ঞোক্তিও সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক জীবনে ও ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। পক্ষান্তরে, লোকোক্তিও প্রাজ্ঞের চিন্তায় এবং কর্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। ফলে লোকোক্তি এবং প্রাজ্ঞোক্তির উদ্ভবের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র হইলেও ব্যবহারিক জগতে উভয়েই সমভাবে কার্যকরী হইয়া প্রবাদের এলাকা বিস্তৃত করিয়াছে।

বাংলা প্রবাদের দুই ধারা—(১) লোকোক্তি; (২) প্রাজ্ঞোক্তি

বাংলা প্রবাদ চিরন্তন সামগ্রী বলিয়া ইহার মূল্য অপরিমেয়। তবে এই চিরন্তনত্বের মূলে কোন শাশ্বত নীতি বা তত্ত্বকথার প্রতিপত্তি নাই। 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে—এই প্রবাদটিতে নৈতিক জগতের সত্যের ইঙ্গিত থাকিলেও বাস্তব জগতের অবিসংবাদিত

তথ্য নাই। 'আবার পুরুষের ভালবাসা, মোল্লার মুরগী পোষা'—এই প্রবাদটিতে বাস্তব জগতের তথ্যের আভাস মোটামুটি থাকিলেও নৈতিক জগতের নিরঙ্কুশ সত্য নাই। অতএব, প্রবাদের সত্য মোটামুটি আপেক্ষিক সত্য—ইহা বড় জোর তথ্যের সত্য, তত্ত্বের সত্য তো কোন ক্রমেই নয়। মোট কথা বাস্তবকেন্দ্রিক এই প্রবাদে আছে পথ-চলার বিজ্ঞতা, আছে প্রত্যহের অভিজ্ঞতা। এই দিক দিয়াই প্রবাদের মূল্য চিরন্তন। তবে কাহারও মতে, প্রবাদের ঐ সত্য বা তথ্য নিতান্তই সাধারণ ও সামান্য বলিয়া ঝাঁঝালো রসিকতা, ছড়ার ছন্দ মিলবিন্যাস ও শব্দালংকারের বহুল প্রয়োগ ঘটিয়াছে আর দেখা দিয়াছে মস্করা, ভাঁড়ামি ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা হইতে যাহার উদ্ভব, সেই প্রবাদ কি কখনও লোকসমাজের শক্তিশালী কথ্য ভাষাকে অস্বীকার করিতে পারে? সত্য কথা বলিতে কি, বিষয়বস্তুর উপর নয়, সহজ সাবলীল বাণীবিন্যাসের উপরে, সাধারণ বুদ্ধির চমৎকারিত্বের উপরে, সংক্ষিপ্ত ও উদ্দেশ্যমূলক প্রয়োগেরই উপরে প্রবাদের যত-কিছু সাফল্য নির্ভর করে।

বাংলা প্রবাদের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ পরিচয়

বাংলা প্রবাদের রূপবৈশিষ্ট্যই শুধু নয়, ইহার রসবৈচিত্র্যও বাঙ্গালী চিত্তকে গভীর-ভাবে স্পর্শ করে। প্রথমতঃ, বঙ্গনারীর চিরন্তন মনস্তত্ত্বের আভাস বাংলা প্রবাদে পরিলক্ষিত হয়। পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে লব্ধ মেয়েলী অভিজ্ঞতা বাংলা প্রবাদের প্রাণরস যোগাইয়াছে। রূঢ় বাস্তবতার আঘাতে প্রাত্যহিক জীবন নিষ্পেষিত হওয়ায় যে সাংসারিক জ্ঞান বঙ্গমহিলাদের মনে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাই সুতীব্র রসিকতায় ফাটিয়া পড়িয়াছে। ফলে বাংলা প্রবাদের বিরাট্ প্রাঙ্গণে বেশ খানিকটা cynical মনোভঙ্গী পরিব্যপ্ত। তবে মনুষ্যের প্রতি বিদ্বেষ নয়, বিদ্রূপই হইতেছে অধিকাংশ বাংলা প্রবাদের বৈশিষ্ট্য। তাই শোনা যায়,—'মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ী'; 'অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলতা পরি'; 'ভাই রাজা তো বোনের কি?'; 'বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট, পান্তাভাতে ঘি নষ্ট'; 'হলুদ জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে, পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে' প্রভৃতি দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালীর ঘর-গৃহস্থালীর সব কিছু সামগ্রীই, তাহার সামাজিক জীবনের সব-কয়টি দিকই বাংলা প্রবাদের উপকরণ যোগাইয়াছে। ভাঙ্গা কুলো, ছুঁচ-চালুনি, আম-কাঁঠাল, ঢেঁকি-চরকা, বাটনা-বাটা, তামা-তুলসী, ছুঁচো-ইঁদুর, সাপ-ব্যাঙ প্রভৃতির কোনটিই বাংলা প্রবাদের সীমানার বহির্ভূত নয়। আবার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন শ্রেণীসংস্থান ও সম্পদের খুঁটিনাটি অথচ

বাংলা প্রবাদের উপকরণাদি

খণ্ড চিত্রও পাওয়া যায় বাংলা প্রবাদে। তাই শুনিতে পাই—'ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে বেড়ার ঘর'; 'বৈদ্যের বড়ি ছুঁলেই কড়ি'; 'কায়েতের ঘরের বেরালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে'; 'পাঁঠা মারে বোষ্টম' ইত্যাদি। সমাজের নানাবিধ কৌতুকাবহ বিষয় লইয়াও বহু বাংলা প্রবাদ প্রচলিত আছেঃ যেমন,—'ঘোমটার ভেতর খেমটার নাচ'; 'বিষ নেই কুলোপানা চক্কর'; 'পরের ছিদ্র বেল, নিজের ছিদ্র সরষে'; 'আপন বোন ভাত পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা' ইত্যাদি। সর্ব সময়ে যাহা উত্তম তাহারই তালিকা মিলে বাংলা প্রবাদেঃ যেমন,—'কচি পাঁঠা, পাকা মেষ, দইয়ের আগা, ঘোলের শেষ'; 'উচ্ছের কচি, পটলের বীচি, শাকের ছা, মাছের মা' ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, পরিচিত পৌরাণিক ঘটনা, বস্তু বা ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়াও বহু বাংলা প্রবাদের প্রচলন আছেঃ যেমন,—'রাজ্য পেল রামচন্দর, কলা খেল যত বান্দর'; 'তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে' ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, পুরাণমূলক প্রবাদ-বাক্যাংশের তো ইয়ত্তাই নাইঃ যেমন—'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ'; 'অগস্ত্যযাত্রা'; 'গজকচ্ছপের যুদ্ধ' ইত্যাদি। চতুর্থতঃ, বহু বাংলা প্রবাদে জাতীয় ইতিহাস ও সামাজিক ইতিহাসের টুক্‌রা, স্থানীয় ঘটনা প্রথা বা ব্যক্তিবিশেষের কথাও স্থান পাইয়াছেঃ যেমন,—'ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত'; 'আমড়া, কুমড়া, ধান, এই তিন নিয়ে বর্ধমান'; 'হরি ঘোষের গোয়াল' ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহার চর্যাপদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি যেন প্রবাদ-ব্যবহারকে ততটা সুযোগ দেয় নাই। কারণ,—প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মূলতঃ গম্ভীর প্রকৃতির রচনায় সমৃদ্ধ, দেবদেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনায় নিয়োজিত, ধর্মসম্প্রদায়ের প্রাধান্য ঘোষণায় ব্যাপৃত, বাৎসল্য ভক্তি ও প্রেমের বন্যায় পরিপ্লাবিত। তবু দেখিতে পাই,—চর্যাপদে আছে—'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে—'মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমতী'; কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—'আপ্ত ছিদ্র না জানিস, পরকে দিস্ খোঁটা'; কাশীদাসী মহাভারতে আছে—'চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী'; কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে আছে—'ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা দেয় খোঁটা'; ভারতচন্দ্রে আছে—'এ সংসার ধোঁকার টাটি'। তবে ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ ও রামেশ্বরের রসরচনায় প্রবাদ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় আর উহারই প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ পাদ অবধি সমধিক প্রাচুর্যে ভরিয়া উঠে। ভবানীচরণ, হুতোম, টেকচাঁদ হইতে শুরু করিয়া দাশুরায়, দীনবন্ধু ও অমৃতলাল অবধি বাংলা সাহিত্যে খাঁটি বাংলা বুলি সমাদৃত হওয়ায় বাংলা প্রবাদের বহুল প্রয়োগ ঘটে। এমন কি, 'আলালের ঘরের

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ

জঞ্জাল', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'যেমন রোগ তেমনি রোঝা' প্রভৃতি গ্রন্থের নামকরণ হইতেই তৎকালীন গ্রন্থকারদিগের প্রবাদ-প্রীতি অনুভূত হয়। উহাই বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের যুগ। প্রবাদ-প্রয়োগের ঐ সাফল্যের কারণ দুইটি—একটি, প্রবাদের লোকপ্রিয়তা এবং অপরটি, ইহার গতানুগতিকতা। গত শতাব্দীর প্রাত্যহিক জীবনে এবং সাহিত্যে প্রমাণ রূপক ও দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রবাদের গুরুত্ব অনতিক্রম্য।

কিন্তু 'Wise men make proverbs and fools repeat them'—ইহাও তো একটি ইংরাজি প্রবাদ-বাক্য। তাই গত শতাব্দীতে নূতন যুগের নূতন শিক্ষার আবির্ভাবে সাহিত্যিক আদর্শ ও শিক্ষিত জীবনের রীতি ও রুচি পরিবর্তিত হইল। ব্যক্তিগত ভাবুকতা ও কল্পনাসমৃদ্ধির ফলে প্রতিভাশালী লেখকগণ পুরাতন জীর্ণ বাক্যাদির ব্যবহার বর্জন করিয়া নিজস্ব বাক্যরীতির উদ্ভাবনে তৎপর হইলেন। সাহিত্য-সৃষ্টিতেও এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রশ্রয় থাকায় প্রবাদ-বাক্যগুলি অচল হইল, তবে প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলি ভাষাদেহের ভূষণরূপে কিছুটা থাকিয়া গেল। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের লেখকগণ বুঝিবা লর্ড চেষ্টারফিল্ডের শিষ্ট আদর্শের উপদেশ শুনিয়াছিলেন—'A man of fashion never has recourse to proverb and vulgar sayings.' তাই আমাদের এই ভাববিলাসী সাহিত্যে, এমন কি রস-রচনাতেও প্রবাদের প্রয়োগ এত বিরল। শুধু জাতির চিন্তায় ও সাহিত্যে মৌলিকতা-বৃদ্ধির প্রচেষ্টার ফলেই যে এইরূপ ঘটিয়াছে তাহা নয়, শিক্ষায় ভাবে ও চিন্তায় আমরা আজ বাঙ্গালী হইয়াও অবাঙ্গালী। বিলাতী সভ্যতা-ভব্যতা, মার্জিত রুচি-রীতি আমাদিগকে গণজীবনের এলাকা হইতে দূরে সরাইয়া লইয়াছে দেশকালনিরপেক্ষ 'কালচার'-বিলাসী এক সূক্ষ্ম অথচ কৃত্রিম জীবনলোকে। প্রবাদসমৃদ্ধ সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনের সাবলীল গ্রাম্যতার আবিষ্কারে আমরা এক্ষণে ভীত হই, লজ্জিত হই। তাহার কারণ, অতীতের বাঙ্গালীর দেহমনের অটুট স্বাস্থ্য, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের নাই। তাই বাংলার নিজস্ব সম্পদ এই প্রবাদগুলি আজ লুপ্তপ্রায়। অবশ্য প্রবাদ-বিস্মরণের আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। যে সজীব বাংলা ভাষায় প্রবাদগুলি বিরচিত, তাহাও আজ আমরা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি, ঐ ভাষায় রস ও রহস্য আস্বাদ করিবার শক্তিও বুঝিবা আমাদের নাই।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ

আধুনিক আভিজাত্য আমাদের জীবন ও সাহিত্যকে এমনি ভাবেই গ্রাস করিয়া বসিয়াছে যে, আজিকার প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালীর বাংলা নয়। বাংলা ভাষার ভাব-প্রকৃতি, যাহা বাঙ্গালী জাতির রসচেতনা হইতে স্বতঃ-উৎসারিত, তাহা আজিকার বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু বাংলা প্রবাদের ভাষা বাঙ্গালী

র জীবনস্পন্দনে স্পন্দিত, বাঙ্গালীর লৌকিক জীবনের সম্পদ। অথচ, আমাদের নই দুর্ভাগ্য যে আধুনিক ভদ্রসমাজে ও ভদ্রসাহিত্যে বাংলা প্রবাদগুলি প্রত্যক্ষভাবে নিন্দিত নয় সত্য, কিন্তু পরোক্ষভাবে অবহেলিত। তবু একটু সৌভাগ্যের বিষয় যে, প্রবাদগুলির বর্জন ঘটিলেও মূলক বাক্যাংশগুলি বাংলা ভাষার চিরন্তন 'ঈডিয়ম' তথা সরস বাক্যরীতি হিসাবে হইয়াছে। অবশ্য তাহা না ঘটিলে সরাসরি ভাবেই বঙ্গভাষাপ্রতিমার ঢাকাগুদ্ধ ন হইত। তাই মনে হয়, এহেন গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়া যে প্রবাদমূলক শগুলি টিকিয়া রহিয়াছে, ব্যঞ্জনে মশলাপ্রয়োগের ন্যায়, তাহা বাক্যালংকার অতীতে যেমন স্থান পাইত, ভবিষ্যতেও তেমনি পাইবে। সাম্প্রতিক বাংলা ত্যে অবশ্য পল্লীভূমি ও পল্লীজীবনের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপন করাইবার দেখা যাইতেছে। ফলে বাংলা প্রবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার হয়তো-বা যৎকিঞ্চিৎ গ মিলিতে পারে। তবে আধুনিক গ্রাম্যজীবনেও তো কৃত্রিম নাগরিক মনোবৃত্তি ক্রামিক। তাই ভরসাও বিশেষ নাই।

বাংলা প্রবাদের ভবিষ্যৎ

## বাংলা লোকসাহিত্য

একদা বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের সহজাত কল্পনাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, বাঙ্গালী রণীদের মনপ্রাণকে অতীব কোমল ভাবে গৃহধর্মে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য, উচ্চনীচ-নির্বিশেষে বাঙ্গালী জনসাধারণের মনকে আমোদে-আনন্দে বিহ্বল করিয়া, শিক্ষায় ও সৌন্দর্যে ভাসাইয়া দিবার জন্য, বাঙ্গালীচিত্তের অন্দরমহলে বহিরাগত জ্ঞান ও নীতিসমূহকে তরলোচ্ছল হাসির ভিতর দিয়া সঞ্চারিত করিবার জন্য, বাঙ্গালীর চিরাগত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যাহার মধ্যে রক্ষিত ছিল, তাহা এই লোকসাহিত্যই। লোকের মুখে মুখে ইহা কখনও-বা সঙ্গীতরূপে, কখনও-বা আবৃত্তিরূপে, কখনও-বা গল্পরূপে, বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার তথা বাঙ্গালী লোকসাধারণের চিত্তলোকের উপর রচনা করিয়াছিল সাহিত্যের এক বিরাট্ মন্দির। এই বিরাট্ মন্দিরটিই লোকসাহিত্যের মন্দির। ইহার ভাষা 'নিরক্ষরা', কিন্তু লেখ্য ভাষার মতই ইহার বনিয়াদ সুদৃঢ়। এমনই সুদৃঢ় যে যুগ হইতে যুগান্তরে, মন হইতে মনান্তরে, জীবন হইতে জীবনান্তরে চলিয়াছে ইহার অভিযান। শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য—মানবজীবনের এই ত্রিলোক তথা তিনটি দশা ব্যাপিয়াই থাকে লোক-সাহিত্যের প্রভাব। লোকসাহিত্য ইহলোকভোগ্য আমোদ-আহ্লাদ, আনন্দ-কৌতুক, আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষণদীপ্তি যেমন ফুটাইয়া তোলে, তেমনি পরলোকের জ্ঞান আহরণ করিবার উপযোগী শাশ্বত দীপ্তিও বিকিরিত করে। লোকসাহিত্যের উদ্ভব ও উপভোগের ব্যাপারে আছে একটা 'ডিমোক্র্যাটিক' তথা গণতান্ত্রিক সুর। ইহার

লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা

স্রষ্টা লোকসাধারণ, ইহার রসভোক্তাও লোকসাধারণ—তাই ইহার নামও লোক সাহিত্য। লোকসাধারণের বিপুল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য শুধু যে লোকসংগীত, লোকশিক্ষা লোকনৃত্য, লোকাচার, লোকভাষা প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নয় লোকসাহিত্যেরও মাধ্যমে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

লোকসাহিত্যকে মোটামুটিভাবে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ প্রথমতঃ শিশুসাহিত্য; দ্বিতীয়তঃ, মেয়েলী সাহিত্য; তৃতীয়তঃ, ধর্মসাহিত্য; চতুর্থতঃ, পল্লী সাহিত্য; পঞ্চমতঃ, সভাসাহিত্য; ষষ্ঠতঃ, ইতিবৃত্তমূলক সাহিত্য; সপ্তমতঃ, প্রবচন সাহিত্য। • 'শিশুসাহিত্য' বলিতে মোটামুটিভাবে 'রূপকথ 'উপকথা'ই বুঝায়। রূপকথা সাধারণতঃ গ্রাম্য চলিত ভাষা রচিত মৌখিক গল্প। ইহার মাঝে মাঝে থাকে ছড়া ও গান কোন কোন ক্ষেত্রে গল্প একেবারেই নাই অথবা অবলু সূত্রাকারে ক্ষুদ্র ছড়াই শুধু বিদ্যমান। লোকসাহিত্যের এই রূপকথাকে আধুনি সাহিত্যের 'উপন্যাসের বাস্তপুরুষ' বলা যায়। "এই যে আমাদের দেশের রূপকথা— বহুযুগের বাঙ্গালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব ক রাজ্যপরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে; ইহার উৎস সমস্ত বাং দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে; যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষক পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে; সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাই ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে। নিখিল বঙ্গদেশের সে চির-পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।" 'মধুমালা', 'মালঞ্চমালা 'কাঞ্চনমালা', 'শঙ্খমালা' প্রভৃতির গান, 'ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প', 'সোনার কাঠি রূপার কাঠির গল্প'—এমনি আরও কত কত গানগল্প যে রূপকথার অন্তর্ভুক্ত, তা বলিয়া শেষ করা যায় না।। 'মেয়েলী সাহিত্য' বলিতে মোটামুটিভাবে ব্রতকথা বুঝায়। এই 'ব্রতকথা'র উৎপত্তি যে কতদিনের, তাহা কেই-বা বলিতে পারে হয়তো-বা 'মুকুন্দরামের চণ্ডী' প্রভৃতি লৌকিক ধর্মোপাখ্যানের মূল এই ব্রতকথাই কোন সমালোচক বলিয়াছেন—'কবির নিকট ব্রতকথা বাঙ্গালার আদিম কাব্য ঐতিহাসিকের নিকট ইহা বঙ্গের গৃহ ও সমাজের, ধর্ম ও কর্মের, পুরা ইতিহাস; আর মাতৃভক্ত বাঙ্গালীর নিকট ব্রতকথা বঙ্গজননীর স্তননিঃসৃ প্রথম ক্ষীরধারা।' মেয়েলী ব্রতকথায় আত্মীয়স্বজনের সুখকামনালিপ্সু, ধর্মপরায় চিরসহিষ্ণুতার সাক্ষাৎ প্রতীক হিন্দু-রমণীর ঐহিক এবং পারত্রিক আশা-আকাঙ্ ভরসা-বিশ্বাসের কত কথাই-না ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'দশপুতুল ব্রত', 'সাবিত্রী ব্র সেঁজুতি ব্রত', 'গোকুল ব্রত', 'তোষালা ব্রত', 'পুণ্যপুকুর ব্রত', 'যমপুকুর ব্রত'—এম

লোকসাহিত্যের সাতটি শ্রেণী—
(১) শিশুসাহিত্য;
(২) মেয়েলী সাহিত্য;

আরও কত রকমের নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের নিয়মপালনের ক্ষুদ্র গাথা আমাদের দেশের পুণ্যবতী ব্রতচারিণী ধর্মপ্রাণা বিধবা দেবীগণকে, অথবা শাঁখা সিন্দুর-পরিহিতা কল্যাণী সধবাদিগকে, কিংবা সরলা পবিত্রমনা কুমারীসমূহকে মিলিত করিয়া বাংলার এক অনির্বচনীয় পরিবেশ অতীতে রচনা করিত এবং আজিও করিয়া থাকে।

'ধর্মসাহিত্য' বলিতে 'ধর্মমঙ্গল', 'মনসামঙ্গল', 'শীতলামঙ্গল', 'শিবায়ন', 'সত্যনারায়ণ কথা', 'গঙ্গামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'হরিলীলা', 'নীলার বারমাস' প্রভৃতিকেই বুঝাইয়া থাকে। সংক্ষিপ্ত পাঁচালী, ব্রতকথাই ধর্মসাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়া এক বিপুল স্রোতোধারা প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে বহাইয়া দেয়। 'শ্যামা-সংগীত', 'উমা-সংগীত', 'হরি-সংকীর্তন', 'বাউলের গান', কর্তাভজা সম্প্রদায়ের 'ভাবের গীত', 'গুরুসত্য দলের গীত,' 'দেহতত্ত্বের গান' প্রভৃতিকে লোকসাহিত্যের ধর্মশাখাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। 'পল্লীসাহিত্য' বলিতে 'মাণিকচাঁদের গান', 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত', 'ময়নামতীর গান', 'মাণিকপীরের গান', 'সত্যপীরের গান', 'জারীর গান', 'মুর্শীদ্যাগান', 'রাখাল্যা', 'গাজীর গীত', 'হাবু গীত', 'নলে গীত', 'ঘেটু গান', 'সারি গান', 'তরজা গান', 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' প্রভৃতিই বুঝায়। বাঙ্গালী বহুদিন হইতেই হিন্দুমুসলমানরচিত এই সমস্ত খাঁটি দেশীয় গীতগানে আনন্দলাভ করিতে অভ্যস্ত। আগেকার দিনে শুভকার্যে, দোল-দুর্গোৎসবে বাড়িতে আসর বসাইয়া 'কবির লড়াই', 'হাফ-আখড়াই,' 'পাঁচালী গান' প্রভৃতির গাহনা বসাইবার নিমিত্ত বর্ধিষ্ণু লোকে মাতিয়া উঠিতেন, গানের আসর বা সভা লোকে লোকারণ্য হইত। তাই এই জাতীয় লোকসাহিত্যকে 'সভাসাহিত্য' বলা যায়। আসর বা সভা জাঁকাইয়া লোকসাহিত্যের অন্তর্গত সভাসাহিত্যের এই যে রূপদান, ইহা 'নিধুবাবুর টপ্পাগানে', 'রূপচাঁদ পক্ষীর গানে', 'শ্রীধর কবিরত্ন প্রভৃতির কথকতায়', 'মধু কানের ঢপসংগীতে', 'দাশুর পাঁচালীতে', 'রামায়ণ গানে', 'চণ্ডীর গানে', 'মনসার ভাসানে', 'গোষ্ঠযাত্রা দোলযাত্রা রথযাত্রা শ্রীকৃষ্ণযাত্রা' প্রভৃতি নানা নামে প্রচলিত 'কালীয়দমন যাত্রা'তেও ঘটিত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত ইতিহাসগ্রন্থ নাই। কিন্তু পদ্যে রচিত বহু 'কুলপঞ্জী বা কারিকা', 'ঢাকুর', 'ভাটগাথা' ইত্যাদির সন্ধান মিলে। লোকসাহিত্যের এই বিশেষ দিকটি 'ইতিবৃত্তমূলক সাহিত্য'-শ্রেণীর অন্তর্গত। 'প্রবচনসাহিত্য' নামের আর এক জাতের লোকসাহিত্য আছে, যাহার ভিতরে মিলে অনন্ত জ্ঞান ও বহুদর্শিতার নিদর্শন। প্রবাদবাক্যে 'ডাকের বোল', কৃষিতত্ত্বে ও জ্যোতিষ-কথায় 'খনার বচন', গণিতবিদ্যায় 'শুভংকরের আর্যা' লোকের মুখে মুখে চলিতে থাকায় উহারা প্রবচনের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। লোকসাহিত্যের এক দিকটিকেই বলা হয় 'প্রবচনসাহিত্য'।

(৩) ধর্মসাহিত্য ; (৮) পল্লী-সাহিত্য ; (৫) সভাসাহিত্য ; (৬) ইতিবৃত্তমূলক সাহিত্য ; (৭) প্রবচনসাহিত্য

লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য অপরিমেয়। ইহা এমনই বিপুল আয়তনের যে মানব-জীবনের পক্ষে যাহা-কিছু উপভোগ্য ও পালনীয়, যাহা-কিছু হাল্‌কা ও গভীর, যাহা-কিছু ভালো ও মন্দ—সবেরই সম্পর্কে রহিয়াছে কিছু-না-কিছু নির্দেশ। লোকসাহিত্যের রস কোথাও-বা গানের আকারে, আবার কোথাও বা ছড়া কিংবা অগেয় কবিতারূপে পরিবেশিত হইত। প্রথমে গেয় লোকসাহিত্যের কথাই আলোচনা করা যা'ক্।

গেয় লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

সূক্ষ্ম কারুকার্যহীন ভাষায়, অলংকারহীন রচনাশৈলীতে, একঘেয়ে সুরে, রামপ্রসাদী গানগুলি ভক্তির নির্ঝরধারা ছুটাইয়াছে। এক দিকে দেখি,—তাপিত সন্তান রামপ্রসাদের প্রাণের উচ্ছ্বাস—

'ভাবে আমার আশা, কেবল আশা, আসা মাত্র সার হইল।
চিত্রের পদ্মেতে পড়ি ভ্রমর ভুলি রইল॥
নিম খাওয়ালি মা চিনি বলে কেবল কথায় করি ছল।
মিঠার আশে তেতো মুখে সারা দিনটা গেল॥'

আবার অন্যদিকে রাম বসুর গানে কুলবধূর মর্মকাতরতা, ব্রীড়া-সংকুচিত মাধুরী দেখি—

'মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে ব'ল বলি বলা হল না।
মরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।'

কিন্তু ভাষার ঝংকারে, সুরের মাধুর্যে, ভাবের গভীরতায় কবিওয়ালা হরুঠাকুরের গানই সবচেয়ে কলাশ্রীসম্পন্ন : যেমন—

'ঘন গরজে ঘন শুনি—
ঐ ময়ূর ময়ূরী হরষিত, হেরি চাতক চাতকিনী
ঐ কদম্ব কেতকী চম্পক জাতি সেঁউতি শেফালিকে
ঘ্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জনমায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে,
বিদ্যুৎ খদ্যোত দিব জ্যোতি মতো প্রকাশে দিনমণি,
প্রিয়-মুখে মুখ দিয়ে শারি শুক থাকে দিবস-রজনী।'

দাশুর পাঁচালীর কোন কোন গানে শব্দসংঘাতের সৌন্দর্যও ফুটিতে দেখি : যেমন—

'লম্বিত গলে মুণ্ডমাল দন্তিতা ধনী মুখ করাল
স্তম্ভিত পদে মহাকাল কম্পিতা ভয়ে মেদিনী।'

আবার টপ্পা-খেউড়-স্ফূর্তি পরিপ্লাবিত লোকসাহিত্যের মাঝে 'কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদে'র বাউল-গীত প্রাণের কথা শুনাইয়া যেন একটু আরাম, যেন একটু স্বস্তিও দিয়াছিল—

'কাঙ্গাল যদি ছেলের মত তোমার ছেলে হত তবে পারতে জানতে।
কাঙ্গাল জোর করে কোল কেড়ে নিত, না'হ সরতো বললে সরতে॥'

বিবাহিতা কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের দুঃসহ অন্তর্বেদনা আছে। 'আমাদের এই ঘরের স্নেহ ঘরের দুঃখ, বাঙ্গালীর গৃহের এই চিরন্তন

বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে-ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙলার অম্বিকাপূজা এবং বাঙ্গালীর কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাঙলার মাতৃহৃদয়ের গান। অতএব সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের ছড়ার মধ্যেও বঙ্গজননীর মর্মব্যথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।' তাই দেখি,—

'গিরি গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য-রূপিণী
অচৈতন্য করে কোথায় লুকালো!'

—মা মেনকার এই উক্তির মধ্য দিয়া মর্মপীড়িতা বঙ্গজননীরই ছবি ফুটিয়াছে।

অগেয় লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

লোকসাহিত্যের অন্তর্গত অগেয় কবিতাবলীতে কবিত্বগুণ থাকুক আর নাই থাকুক, জ্যোতিষ ও কৃষিবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সেই দূরবর্তী বঙ্গীয় সমাজ ও সংস্কারের আচার-ব্যবহারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্বকথাই জানা যায়। ধর্মোপদেশের নমুনা পাই ডাকের বচনে—'যে দেয় ভাতশালা পানিশালা। সে না যায় যমের বাড়ি।' কৃষিতত্ত্ব ও অর্থনীতির সূত্রকথা পাই খনার বচনে—

'তিন শ' ষাট ঝাড় কলা রুইয়া। থাক্ গিয়া তুই বাড়িতে বইয়া॥
দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ। কমে না বাড়ে না বার মাস॥'

শুভংকরের 'আর্যা'য় কবিত্ব না থাকিলেও বেশ কাব্যিক ভঙ্গীতেই গণিতবিদ্যাকে নামতার ন্যায় মুখস্থ করিবার সুযোগ আছে—

কুড়্‌বা কুড়্‌বা কুড়্‌বা লিজ্যে। কাঠায় কুড়্‌বা কাঠায় লিজ্যে॥
কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ। বিশ গণ্ডা হয় কাঠার প্রমাণ॥'

কথকদিগের কথার গৎ অবশ্য সমাসবহুল, যমক-অনুপ্রাসময়, সংস্কৃত বাক্যাড়ম্বর-সমৃদ্ধ সত্য, কিন্তু সুর করিয়া আবৃত্তি করায় ইহা শ্রুতিমাধুর্যে ভরিয়া উঠিয়া সাক্ষর-নিরক্ষর-নির্বিশেষে সকলেরই মনে একটা চিত্রসৌষম্য সঞ্চারিত করিত; মেঘময় দিনের স্বরলয়সমৃদ্ধ বর্ণনায় কথকঠাকুর যে সাহিত্যকৃতির পরিচয় দিতেন, তাহা বাণভট্টের রচনাশিল্পের কথাই দেয় স্মরণ করাইয়া:

'পূর্ব দিগন্তর দেদীপ্যমান, শক্রধনুঃশোভিত নভোমণ্ডল, কাদম্বিনী সৌদামিনী-চঞ্চল, তদ্দর্শনোদ্বেজিতান্তঃকরণ মত্তকরীবরারোহণ কৃত দেবেন্দ্র নিজায়ুধ-বজ্র-নিক্ষেপ-শব্দিত ইরম্মদ-স্খলিত পতিত-কণা সমুদ্র-গর্জিত বজ্রপতন-ভয়ানক-ধ্বনি প্রতিধ্বনি শ্রবণ-সভয়-চকিত নয়নোদ্বেজিত পান্থজন, পক্ষিগণ গণিত-প্রমাদ সংকট-ত্রাসিত এককালীন কুহু কুহু রব করিতেছে।'

—গুরু গুরু শব্দধ্বনিতে বেশ এক ঘোরালো ছবি ফুটিয়া উঠে নাই কি? রূপকথা উপকথার ছড়াগুলি স্পষ্টতঃ অর্থহীন ভাবহীন পরস্পরসংগতিহীন, কিন্তু উহারা যে-স্মৃতি, যে-ছবি চিত্তপটে ফুটাইয়া তুলে তাহা কবিত্বময়ই বটে। 'কিন্তু এ কবিত্ব ভিন্ন জাতীয়; অভিধানে এ কবিত্বের অর্থ মিলে না; পণ্ডিতে এ কবিত্বের ব্যাখ্যা করিতে

পারেন না। শাস্ত্র-ইতিহাসে এ কবিত্বের মূল পাওয়া যায় না। ভাষার দৈন্য, ভাবের অপ্রগাঢ়তা সত্ত্বেও এই সকল সামান্য ছড়ার সহিত আমাদের সুখদুঃখের কত প্রাণের কালিমা গ্রথিত।' এইজন্যই রূপকথা উপকথার মাঝে ফুটিয়া উঠে চিরন্তনের দাবি, ঝংকৃত হয় আশা-আকাঙ্ক্ষার গাথা। তাই দেখি,—

'বঁধুর পান খেয়োনাক ভাব্ লেগেছে.
ভাব্ ভাব্ ভাব্ কদমের ফুল ফুটে রয়েছে।'

—চরণ দুইটির মাঝে স্পষ্ট অর্থহীনতা থাকিলেও একটা ভাবনিষিক্ত পরিবেশ যে শাশ্বতমুখী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ইহা তো আর অস্বীকার করা চলে না। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান' এই ছড়াটি শুধু শৈশবদশাতেই মোহমন্ত্রের ন্যায় কাজ করিয়া থাকে তাহা নয়, পরিণত বয়সেও ইহার মোহ কাটে না। ছড়ার মধ্যে সত্যই একটা 'চিরত্ব' প্রবাহিত। যুগে যুগে মানুষের নব নব পরিবর্তন হইয়া থাকে, অথচ শিশু হাজার বছর আগেও যেমন ছিল, তেমনি আছে এখনও। 'সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশুসাহিত্য;—তাহারা মানবমনে আপনি জন্মাইয়াছে।'

বাংলা সাহিত্যে লোকসাহিত্যের আবির্ভাব যে কতখানি বিষয়বৈচিত্র্য সংক্রামিত করিয়াছে, তাহা সত্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়। তবে ইহাও অনুমান করা যায়, লোক সাহিত্যে দেব-দেবী লইয়া প্রচুর গান রচিত হইবার পর দেশের চিত্তবৃত্তি যে-মানবসংগীত খুঁজিয়াছিল, তাহাই ধীরে ধীরে প্রেমসংগীতে, নয় দেশাত্মবোধক গানে হয় রূপায়িত। এই কথাটি তো সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয় সেই গানটির কথা স্মরণে, যেখানে টপ্পাকার নিধুবাবুই লিখিয়াছেন—

শেষ কথা

'নানান্ দেশের নানান্ ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?'

# বাংলা মহাকাব্য

বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয় মৌলিক মহাকাব্য রচনা। অবশ্য ইহারও বেশ কিছুদিন আগে একবার আমাদের সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার খুব সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ। কত কত কবিই-না সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। মৌলিক রচনা নাই-বা হইল, কিন্তু

অনুবাদ-রচনা হইলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারতই যে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ধারক ও পরিপোষক, ইহা তো আর অস্বীকার করা যায় না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-মহাকাব্যের যে পরিমাণ সাড়া পড়িয়াছিল, ঠিক ততখানি সাড়া আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে মৌলিক মহাকাব্য রচনায় দেখা দেয় না। কোন কোন সমালোচক ইহাকে নিতান্তই দুর্ভাগ্য ও অক্ষমতার বিষয় বলিয়া ভাবিয়াছেন। কথাও উঠিয়াছে, গীতিকাব্যে খণ্ডকাব্যে কবিত্বময় বাঙ্গালী বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আপনার বৈশিষ্ট্য লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে তো কাব্যকে অতিক্রম করিয়া মহাকাব্যের বিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইতে পারে নাই। পশ্চিমের হাওয়া আমাদের গীতিকাব্যে, আমাদের নাট্যসাহিত্যের গায়ে লাগিয়া বেশ খানিকটা সমুজ্জ্বল স্বাস্থ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে সত্য, কিন্তু এমনও তো মনে হয় যে, ঐগুলি লঘু সাহিত্য, কতকটা চাপল্য হইতেই উহারা সমুদ্ভূত—মহাকাব্যের মহাভাব সেখানে কোথায়! বিগত শতাব্দীর বাঙ্গালী কবিগণের ইহাই ধারণা ছিল যে মহাকাব্যই শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার বাহন। আখ্যানমূলক রচনার উপযোগী গদ্যরীতি তখনও বাংলা সাহিত্যে পরিপুষ্ট রূপ লইয়া দেখা দেয় নাই বলিয়াই হয়তো-বা মহাকাব্যের আয়তনের মাধ্যমে বড় কাহিনীকে মূর্ত করিয়া তুলিবার জন্য সেদিনের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবিমাত্রেরই অন্তরে ঝোঁক দেখা দিয়াছিল। কিন্তু সে ঝোঁকটি ক্ষণিকের ঝোঁক—দানা বাঁধিতে পারে নাই। যাঁহারা মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই শুধু মহাকাব্য রচনা করেন নাই, গীতিকাব্য খণ্ডকাব্য রচনার মধ্য দিয়াই ঘটিয়াছিল তাঁহাদের কবিপ্রাণের পরিপ্রকাশ। কাব্য ছাড়াইয়া মহাকাব্যে নয়, মহাকাব্য ছাড়াইয়া কাব্যেতেই ঘটিয়াছে বাঙ্গালী কবির জয়যাত্রা।

ভূমিকা

সংস্কৃত আলংকারিকেরা সাহিত্যে যে বিশেষ প্রকাশটিকে 'মহাকাব্য' নামে আখ্যাত করিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য অলংকারশাস্ত্রে তাহারই নাম 'এপিক্'। রূপশিল্পের দিক দিয়া, গঠন-কারুকার্যের দিক দিয়া, মহাকাব্য এবং এপিকের মধ্যে কমবেশি ভাবে যে পার্থক্যই দেখা যা'ক্ না কেন, প্রকৃতির ক্ষেত্রে, অন্তর্জীবনের ক্ষেত্রে, মহাকাব্য এবং এপিকের মধ্যে কোন গুরুতর ব্যবধান নাই। আমাদের প্রাচীন আলংকারিকেরা মহাকাব্যের গঠনশৈলী সম্পর্কে যে ধরাবাঁধা নিয়মটির কথা জানাইয়াছেন, তাহা মোটামুটি এই রকম: খুব বড়ও নয় আবার খুব ছোটও নয় এমনি ভাবের আটটি সর্গ থাকে মহাকাব্যে; মহাকাব্যের নায়ক দেবতাস্বভাব, সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় ও ধীরোদাত্ত গুণযুক্ত; শৃঙ্গার বীর ও শান্ত এই তিনটি রসের মধ্যে যে কোন একটি হয় অঙ্গী বা প্রধান রস এবং অন্যান্য রস তাহারই অঙ্গ; ইহাতে থাকে নাটকের পঞ্চসন্ধি। ইতিহাস অথবা

প্রাচ্য অলংকারশাস্ত্রমতে মহাকাব্য

সজ্জনাশ্রিত কোন ব্যাপার বা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই ঘটে মহাকাব্যের রচনা; মহাকাব্যের গোড়াতেই থাকে হয় নমস্কার, নয় আশীর্বচন বা মঙ্গলাচরণ; সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, দিন, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, মুনি, স্বর্গ, নগর, অধ্বর, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রের জন্ম—এই সকলের বিস্তারিত বর্ণনা থাকা চাই মহাকাব্যে; এমনি রকমের আরও কত নির্দেশ যে-সাহিত্যশিল্প মানিয়া চলে, তাহারই নাম প্রাচ্য অলংকারশাস্ত্রমতে 'মহাকাব্য'।

পাশ্চাত্ত্য 'এপিক্' কথাটির সৃষ্টিমূলে আছে প্রাচ্যেরই ন্যায় 'বৃত্ত' বা 'ব্যাপার' জিনিসটি। 'ইপস্' শব্দটির অর্থ 'গল্প'; অতএব, 'এপিক' বলিতে গল্প-সম্পর্কিত কোন-কিছুকেই যে নির্দেশিত করা হয়—একথা বলাই বাহুল্য। যে উপাখ্যানটিকে গাম্ভীর্যময় পরিবেশে সুবিন্যস্ত করিয়া গল্প করা হয়, তাহারই নাম 'এপিক্'। বীররস ছাড়া নীতি এবং ধর্মের আদর্শও ইহাতে মিলে প্রচুর। অনন্ত আকাশ, দিগন্তবিস্তৃত শূন্য আর অপরিমেয় ব্যোম—ইহাই এপিক-কল্পনার রঙ্গক্ষেত্র। প্রথম নজরেই পাশ্চাত্ত্য এপিকের মধ্যে তিনটি উপাদান লক্ষ্য করা যায়। ইহার যেমনি ভাবধারা, তেমনি শব্দসম্পদ, তেমনি শব্দের বাঁধুনী। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটিই এপিকের পক্ষে অপরিহার্য। বৈচিত্র্যই এপিকের প্রাণ আর ঘটনাকেন্দ্রিক নাটকত্বই বৈচিত্র্যবিধায়ক। তাই আরিস্ততলের মতে, নাটকত্ব ওতপ্রোতভাবে না থাকিলে এপিকের উৎকর্ষ দেখা দেয় না। এপিকে কথার বাঁধুনি একটা মস্তবড় জিনিস—এমন করিয়াই শব্দনির্বাচন করিতে হয় যে, উহা ধ্বনিত হইবামাত্র পাঠকমনে একটা গম্ভীর উদাত্ত ভাব সঞ্চারিত হয়। কীট্‌সের ন্যায় এপিক কবিও শব্দবন্ধনকে প্রেমিকের দৃষ্টি লইয়া দেখিয়াছেন। আসল কথা, কাব্য নিছক ভাবেরই সমষ্টিমাত্র নয়। ভাব সে তো কাব্যের প্রাণ; তাই প্রাণের সুষমা, শক্তি ও মাধুর্য—এসবই যাহাতে ফুটিয়া উঠিতে পারে, এমন দেহই তো চাই। ভাবধারা, শব্দসম্পদ ও শব্দবিন্যাস—এই তিনটিরই দিকে নজর রাখিয়া পাশ্চাত্ত্য এপিক যেমন রচিত হয়, তেমনি প্রাচ্য মহাকাব্যেরও সৃষ্টি হয়। এই তিনটির দিকে যদি নজর থাকে, তাহা হইলে চরিত্রচিত্রণ, প্রকৃতিবর্ণন, যুদ্ধবর্ণন প্রভৃতি তো আপনা হইতেই সুরে-বাধা হইয়া সমুন্নত রূপে প্রকাশ পায়। আদি মধ্য অন্ত লইয়া একটি সমগ্র কাহিনীর যে ছন্দরূপ এপিকে থাকে, তাহার সম্পর্কে আরিস্ততল বলিয়াছেন,—'Concerning the poetry, however, which is narrative and imitative in meter, it is evident that it ought to have dramatic fables, in the same manner as tragedy, and should be conversant with one whole and perfect action, which has a beginning, middle and end......Again, it is reqisite that the epic

পাশ্চাত্ত্য অলংকারশাস্ত্র-মতে মহাকাব্য

should have the same species as tragedy. [For it is necessary that it should be either simple, or complex, or ethical, or pathetic.] The parts are also the same, except the music and the scenery. For it requires revolutions, discoveries, and disasters, and besides these, the sentiments and the diction should be well-formed; all of which were first used by Homer, and were used by him fitly.'

অবশ্য যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই 'এপিক্' বা 'মহাকাব্যের' আকৃতি-প্রকৃতিরও রূপান্তর হইয়াছে। এক শ্রেণীর মহাকাব্যে কবিবিশেষের কোন প্রাণস্পন্দনই শোনা যায় না, যেন মনে হয় ইহা স্রষ্টা-নিরপেক্ষ একটি সৃষ্টি, যেন মনে হয় কত অজ্ঞাতনামা প্রতিভাধর কবির একটি মিলিত প্রয়াস হইয়াছে রূপায়িত, যেন মনে হয় কত শাখা প্রশাখায় বিক্ষিপ্ত ও বিচিত্র কাহিনীকে অলোকসামান্য এক কবিপ্রতিভা করিয়াছে গ্রথিত। এই ধরণের মহাকাব্যকেই ইংরাজিতে বলা হয় Epic of Growth, Authentic Epic বা Primitive Epic আর বাংলায় বলি 'জাত মহাকাব্য'। ইহাতে চিন্তা ও ভাবানুভূতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া সমগ্র জাতির একটা অখণ্ড প্রাণসত্তা বস্তুধর্মিতা ও সমুন্নতির পরিবেশে উঠে ফুটিয়া। বাল্মীকির 'রামায়ণ', ব্যাসের 'মহাভারত', হোমারের 'অডিসি' 'ইলিয়াড'—তাই 'জাত মহাকাব্য'। আবার আর এক শ্রেণীর মহাকাব্যও আছে, যাহার আয়তন পূর্ববর্তী মহাকাব্যের ন্যায় বিরাট না হইলেও সুসংবদ্ধ ঘটনাপারম্পর্যে ও মাধুর্যে মহীয়ান। অ-লোকসম্ভব 'জাত মহাকাব্য' হইতেই বিষয়বস্তু আহরণ করিয়া এই ধরণের মহাকাব্যে একটা লৌকিক স্বাতন্ত্র্য, সমসাময়িক যুগপ্রভাবিত একটা কবিমানসের ভাব ও ভাবনা, রুচি ও আদর্শ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়। ভাষা ও উপমার কারুকার্যে, মননশীলতা ও কল্পনার প্রাখর্যে রেখায়িত এই যে মহাকাব্য, ইহাকে ইংরাজিতে বলা হয় Epic of Art, Literary Epic অথবা Imitative Epic আর বাংলাতে বলি 'অনুকৃত মহাকাব্য'। ইহাই A work of deliberate art'। কালিদাসের 'রঘুবংশম্', মিলটনের '*Paradise Lost*,' ভার্জিলের '*Æneit*,' ট্যাসোর '*Jerusalem Delivered*', হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ', নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র প্রভাস' নামধেয় কৃষ্ণমহাকাব্য—তাই 'অনুকৃত মহাকাব্য'। পূর্বোক্ত জাতের মহাকাব্য আবৃত্তির জন্য রচিত, কিন্তু শেষোক্ত জাতের মহাকাব্য নিছক পড়িবারই জন্য লিখিত। এই উভয় শ্রেণীর মহাকাব্যের মধ্যে যে পার্থক্যটি রহিয়াছে, তাহা এই—'It is the difference between the contracted, precise, but vigorous tradition of a heroic age, and the diffused, eclectic, complicated culture of a civilization'.

মহাকাব্য বা এপিক দুই শ্রেণীর—
(১) জাত মহাকাব্য;
(২) অনুকৃত মহাকাব্য

বাংলা সাহিত্যে যে কয়েকজন কবি 'অনুকৃত মহাকাব্য' তথা নব্য আদর্শের অনুসরণ-সঞ্জাত মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের নামই উল্লেখযোগ্য। অবশ্য রঙ্গলাল মহাকাব্য না লিখিলেও, তাঁহার 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' পাশ্চাত্ত্য আদর্শানুযায়ী হইয়া মহাকাব্যেরই পথে অগ্রসর হইয়াছে। ইতিহাসপ্রোক্ত ঘটনা ও সজ্জনের জীবনকথাকে কেন্দ্র করিয়া যথাযোগ্য শব্দবিন্যাসের সাহায্যে তিনি যে-কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রকৃতি এবং পাশ্চাত্ত্য এপিকের প্রকৃতি কিছুটা একই ধরণের। রঙ্গলালের রচনাই যদি একটু বিস্তৃত আয়তন লইয়া আত্মপ্রকাশ করিত, তাহা হইলে তাঁহার কাব্যকেও 'মহাকাব্যের শ্রেণীতে ফেলিতে আপত্তি হইত না। সংক্ষিপ্ত হওয়াতেই রঙ্গলাল-কাব্যকে ইংরাজি সাহিত্যের Metrical Romance. Verse Tale-এর পর্যায়ভুক্ত করিয়া থাকি।

রঙ্গলাল-কাব্যে মহাকাব্যের ধর্ম

মধুরচিত 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য'ই বাংলা অমিত্রাক্ষরছন্দে লিখিত প্রথম 'খণ্ড এপিক'। ইহারই পরে আসে 'মেঘনাদবধকাব্য'—রাম রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ, এই চরিত্রত্রয়ই 'মেঘনাদবধকাব্যে'র মুখ্য উপজীব্য। মধুসূদন নিজেই তাঁহার এই শেষোক্ত গ্রন্থখানিকে বলিয়াছেন Epicling বা খণ্ড এপিক। আমাদের পুরাণ-কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া পাশ্চাত্ত্য এপিকের আদর্শে মধুকবি ইহাতে চরিত্রচিত্রণ করিয়াছেন। মুখ্যতঃ মিল্‌টনই ছিলেন তাঁহার আদর্শ, তবে স্থানে স্থানে তিনি হোমার, ট্যাসো, ভার্জিল প্রভৃতি মহাকবিকেও অনুসরণ করিয়াছেন। যে দেশে 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্ ন তু রাবণাদিবৎ' বলিয়া সাহিত্য-রচনার নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল. সেই দেশে জন্মিয়াই মাইকেল লিখিয়াছেন,—'I despise Ram and his rabble ; but the idea of Ravana inspires me with enthusiasm ; he is a grand fellow,' ঐশ্বর্যের কবি মধুসূদন বনবাসী রামের প্রতি সহজাত বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করিয়া এবং লঙ্কেশ্বর রাবণের প্রতি তাঁহার তীব্র আনুগত্য দেখাইয়া বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য মানবধর্মেরই বিজয়পতাকা উড়াইয়াছেন।

মহাকাব্যরচনায় মধুসূদন

হেমচন্দ্র মধুকবিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়া 'বৃত্রসংহারকাব্যে'র যে রূপসজ্জা দিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্ত্য-ঘেঁষা সন্দেহ নাই। গ্রীক্ 'ফেটে'র অনুসরণে 'নিয়তি দেবী', ট্যাসোর কাব্যের সফ্রোনিয়া-হরণে'র অনুকরণে 'শচীহরণ', মিল্‌টনীয় 'অসুরসভা'র অনুবর্তনে 'অসুরমন্ত্রণা-সভা'কে হেমচন্দ্র তাঁহার মহাকাব্যে প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন। দধীচির তনুত্যাগ ও বজ্রগঠনের মধ্য দিয়া বিষয়বস্তুর গৌরব প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু মহাকাব্যসুলভ কাব্যকৃতির

মহাকাব্যরচনায় হেমচন্দ্র

ান ইহাতে মিলে না। চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়া বীররসকে প্রধান রূপে প্রকট করিয়া অবিরাম যুদ্ধবর্ণনার মাধ্যমে 'বৃত্রসংহারকাব্য'কে বীররসপ্রধান করিতে গিয়া হেমচন্দ্র মহাকাব্যের সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব ব্যাহত করিয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' মহাকাব্যের আকারে বিরচিত হইলেও Byron-এর *Childe Harold*', কালিদাসের 'মেঘদূতম্'-এর ন্যায় কতকগুলি খণ্ডকাব্যের সমষ্টিমাত্র। Milton-এর '*Paradise Lost*' ও Dante-এর '*Divina Comedia*'-র ন্যায় ইহাতে কোন অমানুষী কল্পনা ও অলৌকিক সৃষ্টি নাই। কয়েকটি চিন্তা এবং ঘটনা এলোমেলো ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে এইমাত্র। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও প্রভাস'—এই তিন ভাগে রচিত কৃষ্ণমহাকাব্যে নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের আদ্য মধ্য ও অন্ত্য লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। কবি এই কাব্যত্রিতয়ে আর্য-অনার্য সংঘর্ষের এক গৌরবময় ইতিহাসের মধ্য দিয়া, ব্রাহ্মণ-দ্রাবিড় সভ্যতার বিরোধের মধ্য দিয়া, য়ুরোপীয় মহাকাব্যের বিশালতা সঞ্চারিত করিয়াছেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক আনন্দ-সংকট-দুঃখকে কবি মনশ্চক্ষে দেখিয়াছেন এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পটভূমিকায় সেই সন্ধিযুগের এক দার্শনিক চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন। তত্ত্বকথা, ধর্মনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি এত থাকিতেও সংযত রচনাশৈলী ও সমুন্নত শিল্পকৃতির অভাবে নবীনচন্দ্র সার্থক মহাকাব্য রচনা করিতে পারেন নাই।

মহাকাব্যরচনায় নবীনচন্দ্র

'মেঘনাদবধকাব্যে'র আদর্শে আরও কয়েকখানি মহাকাব্য রচিত হয়। ইহার পরিশিষ্টরূপে যে দুইখানি মহাকাব্য রচিত হয়, তাহাদের মধ্যে একখানির নাম 'দশাননবধ-মহাকাব্য'। সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষণানুসারে পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি 'নিবাতকবচবধ' নামে সপ্তদশ সর্গে সমাপ্ত এক মহাকাব্য রচনা করেন। ইহা ছাড়া, আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'হেলেনাকাব্য', কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান-কাব্য' প্রভৃতি গ্রন্থের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। এমন কি, এই বিংশ শতাব্দীতেও যোগীন্দ্রনাথ বসু 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী' নামে দুইখানি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। বিষয়নির্বাচনে, ঐতিহাসিকতায়, জাতীয়তাবোধে, ভাষায়, ভাবে, ঝংকারে—সর্ব দিক দিয়াই মহাকাব্যের মহাভাব এই দুইখানি গ্রন্থে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের আরও কয়েকখানি অপরিচিত মহাকাব্য

কিন্তু তবু যোগীন্দ্রনাথের মহাকাব্য দুইখানি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে অপরিচিত হইয়াই রহিয়াছে। এই অপরিচয়ের কারণ হিসাবে রামেন্দ্রসুন্দরের কথাই আমাদের মনে পড়ে। ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছিলেন,— মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী

একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন একেবারে চলিয়া গিয়াছে।' মন্তব্যটি অবশ্য করা হইয়াছিল 'অডিসি', 'রামায়ণ' প্রভৃতি 'জাত মহাকাব্য'কে করিয়াই, কিন্তু 'অলঙ্কৃত মহাকাব্য' সম্পর্কেও রামেন্দ্রসুন্দরের ঐ মন্তব্যটি সমভাবে প্রযোজ্য। মানবের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে বিবিধ ও বিচিত্ররূপে রূপায়িত করা এবং সমগ্র সমাজের প্রতিভূ হইয়া সেই সমাজেরই আদর্শকে বলিষ্ঠ এবং সার্বজনীন করিয়া তোলা—চূড়ান্তরূপে বিপরীতমুখী এই দ্বিধার আছে বলিয়াই আজিকার দিনে মহাকাব্যকে প্রাণ ভরিয়া সমাদর করি না সত্য, কিন্তু হয়তো-বা খানিকটা প্রশংসাই করি। মহাকাব্য সম্পর্কে মানবমনের মাঝে এই যে সদাজাগ্রত অন্তর্বিরোধ ইহারই দরুণ মহাকাব্যের সৃষ্টি আর হয় না। বাংলার কাব্যমালিকাকে যিনি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন সেই রবীন্দ্রনাথও এই অন্তর্বিরোধবশতঃই যে মহাকাব্য রচনা করেন নাই বা করিতে পারেন নাই, তাহা জানিতে পাই 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থে, যেখানে তিনি বলিয়াছেন—

শেষ কথা

'ঠেক্‌ল কখন তোমার কাঁকন কিঙ্কিণীতে
কল্পনটি গেল কাটি হাজার গীতে
মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়
আমি নাব্‌ব মহাকাব্য-সংরচনে
ছিল মনে।'

# বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য

কাল হইতে কালান্তর ব্যাপিয়া, স্থান হইতে স্থানান্তর জুড়িয়া, আপন ও পরের মধ্যে—নিকট ও দূরের মধ্যে—ভাব-বিনিময়ের পরিবহন-কর্ম সাধন করিয়া থাকে এই অনুবাদই। কৃষ্টিগত মিলনের সোপানই যে শুধু ইহা রচনা করে তাহা নয়, আত্মবিস্তারের উপায় এবং উপকরণও মিলাইয়া দেয়। ধরা যা'ক্ ইংরাজি সাহিত্যের কথা। ইহার অর্ধেক মর্যাদাই আজ অনুবাদ-সাহিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরাজ সাহিত্যিকেরা—এমন কি অনেক সক্ষম শিল্পীও মৌলিক শিল্পসাধনায় আত্মনিয়োগ না করিয়া—অনুবাদকে সাহিত্যকর্ম হিসাবে মানিয়া লইয়া বহু সাধনা, বহু আত্মত্যাগ, বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই তো আজ ফরাসী, জার্মান, রুশীয়, ইতালীয়ান, জাপানী, নরওয়েজীয়ান, স্কাণ্ডিনেভিয়ান, ডাচ্, চীনা, ভারতীয়, আরবা, পারস্য প্রভৃতি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মাতৃভাষা মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষিত ইংরাজের আয়ত্তে আসিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি বিশ্বসাহিত্যের যথার্থ নিরিখ করিতে হইলে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্যের অধ্যয়ন ছাড়া গত্যন্তর নাই। অনুবাদ অন্যান্য দেশেও হয়, বাংলাতেও ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের দ্রুত সমুন্নতি ও বিশ্বসাহিত্যের দরবারে ইহার গৌরবময় আসনলাভ
ই বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস প্রায় সহস্র বৎসরের
রাতন হইলেও, গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস কিন্তু এখনও দেড়শত বৎসরের পুরাতন নয়।
অনুবাদ না হইলেও, অন্ততঃ অনুসরণের মধ্য দিয়া বাংলা কাব্যসাহিত্যের পত্তন
য়াছে। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', মালাধর বসুর
কৃষ্ণবিজয়', আলাওলের 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি বাংলা কাব্যসাহিত্যের এই শ্রেণীর অনুসরণ-
়। পক্ষান্তরে, প্রায় অনুবাদেরই মধ্য দিয়া যাহার জন্ম, সেই গদ্যসাহিত্যে এই
অনুবাদকর্মটি আজিও শিল্পসাধনার রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ
করে নাই বলিলেই চলে। কাব্যের অনুবাদ অথবা
অনুসরণের ক্ষেত্রে মধ্যযুগে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন,

সাহিত্যক্ষেত্রে অনুবাদ বা অনুসরণের স্থান

ম্ভবতঃ তাঁহারা প্রত্যেকেই উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন বলিয়াই বাংলা কাব্যসাহিত্যে এই
ক দিয়া সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে। কিন্তু গত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পদ্যে অথবা গদ্যে যাঁহারা
বাদ অথবা অনুসরণ-কর্ম করিয়াছিলেন অথবা করিয়াছেন তাঁহারা কেহই, বোধ
রি, উচ্চশ্রেণীর শিল্পী নহেন! হয়তো-বা সেইজন্য অনুবাদ বা অনুসরণ সাহিত্য-
গৌরব লাভ করিতে অক্ষম। অবশ্য একথা ঠিক যে, অনুসরণ করিয়া কৃত্তিবাসের
রামায়ণ', কাশীদাসের 'মহাভারত', ফিট্‌জেরাল্‌ডের 'ওমরখৈয়ামের' মত অল্প
কয়েকখানি ভাষান্তরিত কাব্য বিশ্বসাহিত্যে মর্যাদা লাভ করিলেও, সাধারণতঃ
কাব্যানুসরণ বা কাব্যানুবাদ বিপুল অক্ষমতারই ইতিহাস।

অনুবাদেরই মধ্য দিয়া বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে
পাদরী মানোএল-দ্য-আস্‌সুম্প্‌সাম বিরচিত এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগালের লিসবন
শহরে রোম্যান হরফে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র কথা বাদ দিলেও
দেখা যায় যে, পলাশীর যুদ্ধ-পরবর্তী কালে বিজয়ী ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আইনকানুন
দেশে প্রচারার্থে অনুবাদ শুরু হইয়াছিল। জোনাথন ডান্‌ক্যান্ অনূদিত তিনখানি
নের বই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল—ঐগুলিই ভারতে মুদ্রিত
প্রথম বাংলা পুস্তক। তৎকালে শ্রীরামপুরে স্থাপিত ব্যাপটিষ্ট মিশন বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম
রের উদ্দেশ্যে বাংলায় বাইবেল অনুবাদ প্রকাশে তৎপর হইয়াছিল। '*New*
*Testament*' এবং '*Old Testament*' লইয়া সমগ্র 'ধর্মপুস্তক' বাইবেলের অনুবাদ
১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামরাম বসুর
সাহায্য লইয়া জন টমাস ও উইলিয়ম কেরী এই অনুবাদ
করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ, একটি কথা বলা চলে যে, ইংরাজি

বাংলা ভাষায় অনুবাদের শৈশব-পর্ব

ষায় অনূদিত বাইবেল পৃথিবীর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইলেও

বঙ্গভাষায় অনূদিত বাইবেল সাহিত্য নয়—নিছক অনুবাদই। অতঃপর ফোর্ট উইলি
কলেজের শিক্ষকগণ কর্তৃক পাঠ্যগ্রন্থ রচনার অবসরে বেশ-কিছু অনুবাদ প্রকাশি
হইয়াছিল। তবে ঐ অনুবাদগ্রন্থগুলির মূলের অর্ধেকই ইংরাজি; বাকিটা সংস্কৃত, ন
ফার্সী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকগণের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ছিলেন প্রধ
অনুবাদক। মৃত্যুঞ্জয়ের অনূদিত 'হিতোপদেশ' গ্রন্থখানি একরূপ আক্ষরিক অনুবাদ—
তাই ভাষাও সংস্কৃতানুগ—ফলে স্থানবিশেষ উৎকট। মৃত্যুঞ্জয়কৃত অন্যান্য অনুবাদও দোষ
ত্রুটি-বিবর্জিত নয়। পক্ষান্তরে, গোলোকনাথ শর্মা অনূদিত 'হিতোপদেশ' পুস্তকখানিতে
স্বাধীন অনুবাদ-রীতি থাকায় রচনা শ্রুতিকটু হয় নাই। অবশ্য মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত তুলনায়
গোলোকনাথের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত জ্ঞান ছিল নিতান্তই অগভীর
ফার্সী উর্দু ও ইংরাজিতে তারিণীচরণ মিত্রের ব্যুৎপত্তি থাকিলেও, তিনি বাংলা ভাষার
বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। ফলে তাঁহার রচনা অনুবাদ হইলেও বাংলা হয় নাই
চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' হিন্দী 'তোতা-কহানী'র অনুবাদ। এই হিন্দী
বইয়ের মূল হইল ফার্সী 'তুতিনামা' এবং উহারও মূল হইল সংস্কৃত 'শুকসপ্ততি'
চণ্ডীচরণের অনুবাদ-ভাষা নিন্দনীয় নয়। হরপ্রসাদ রায় অনূদিত 'পুরুষ-পরীক্ষা
মূল সংস্কৃতের অনুগত হইলেও প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণসমন্বিত। ফোর্ট উইলিয়
কলেজের উদ্যোগের বাহিরেও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি
অনূদিত পাঠ্যগ্রন্থাদি উল্লেখযোগ্য। তবে সাধারণ বিদ্যালয়ে ফোর্ট উইলিয়
কলেজের বইয়েরই প্রচলন ছিল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী শিক্ষাবিভাগের উদ্যোগে
ও তত্ত্বাবধানে 'ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি' বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ সংস্থাপি
হইল। শ্রীযুক্ত মেকলে-রচিত *Life of Lord Clive*' গ্রন্থখানির অনুবাদ করিলে
হরচন্দ্র দত্ত এবং উহাই সমিতি-প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়
অনূদিত বাইবেল এবং ঐ সমস্ত পাঠ্যপুস্তকের বাহিরেও বাংলা গদ্যরীতির একজন প্রধা
নিয়ন্তা হিসাবে রামমোহন রায়ের নাম স্মরণীয়। রামমোহন বিরচিত 'বেদান্তগ্রন্থ'
'বেদান্তসার' গ্রন্থদ্বয় অনুবাদাত্মক। তিনি উপনিষদাদির যে গদ্যানুবাদ করেন, ত
ভাষা বেশ সহজ ও সরল। অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতি
সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থের খণ্ডদ্বয় জর্জ কুম্ব-রচিত *Constitution of Man*' নামক গ্র
অবলম্বনে রচিত হইলেও যথার্থ অনুবাদ নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা 'বেতাল
পঞ্চবিংশতি' হিন্দীপুস্তক 'বৈতাল পচ্চিসী'র যথাযথ অনুবাদ নয়। বিদ্যাসাগর মহাশ
মূল সংস্কৃত মহাভারতের যথাযথ অনুবাদ কিছুটা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কালীপ্রস
সিংহ ঐ সব কার্যে ব্রতী হওয়ায় তিনি আর সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন নাই। তারাশং
তর্করত্নের 'কাদম্বরী' বাণভট্ট রচিত মূল কাব্যগ্রন্থের যথার্থ অনুবাদ নয়, ত

মাত্র। বঙ্গসাহিত্যে অনুবাদের এই শৈশব-পর্বে ইহাই সবিশেষ লক্ষণীয় যে, পাদ্রীসমাজ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ মোটামুটিভাবে যথার্থ অনুবাদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কেহ কেহ আবার যথাযথ অনুবাদ করেন নাই।

অতঃপর বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের কৈশোর-পর্বে নাটক এবং কাব্যেরই অনুবাদ সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লিখিত না হইলেও সংস্কৃত নাটকের নাট্যানুবাদ লইয়াই বাংলা নাট্যরচনার সূত্রপাত। বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকই সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর প্রথম রচনা। হরচন্দ্র ঘোষ শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন। তবে অনুবাদ যথার্থ অনুবাদ নয়—মর্মানুবাদ। ফলে '*Merchant of Venice*'-এর মর্মানুবাদ 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস নাটক' নাটক হয় নাই—হইয়াছে পাঠ্যপুস্তক। আবার '*Romeo and Juliet*'-এর বঙ্গানুবাদ 'চারু-মুখচিত্তহরা নাটক' প্রধানতঃ অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লিখিত হইলেও, রচনায় লালিত্য বা রসের একান্তই অভাব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সেক্‌স্‌পীয়রের জনপ্রিয় নাটকগুলির একাধিক অনুবাদ বঙ্গভাষায় হইয়াছিল। তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ-অনূদিত 'ম্যাকবেথ' নাটকখানি সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইংরাজি সাহিত্যের শেক্‌স্‌পীয়রের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যের কালিদাসও বাংলা নাট্যানুবাদের উপকরণ সরবরাহ করিয়াছেন। কালিদাসের নাটক অবলম্বনে নন্দকুমার রায় 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' নামে অভিনয়যোগ্য প্রথম বাংলা নাটক লিখিয়াছিলেন। অতঃপর কালীপ্রসন্ন সিংহের তত্ত্বাবধানে (?) 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের আক্ষরিক অনুবাদ হইয়াছিল। কেবলমাত্র কালিদাসেরই নয়, ভবভূতি শ্রীহর্ষ বিশাখদত্ত শূদ্রক ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি সংস্কৃত নাট্যকারদের বিভিন্ন নাটকগুলির বঙ্গানুবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অতুলনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্য-কবিতার সার্থক অনুবাদ করা বড়ই কঠিন। কিন্তু এই অনুবাদকর্মে বঙ্গকবিদের দান সমধিক উল্লেখযোগ্য। রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় পার্নেল ও গোল্‌ড্‌স্মিথের 'হার্মিট্' কাব্য দুইটি এবং কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' অনুবাদ করিয়াছিলেন। পার্নেলের 'হার্মিট্' বহুদিনব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়পাঠ্য ছিল বলিয়া রঙ্গলালের পর অনেকেই বাংলা পদ্যে উহার ভাষান্তর করিয়াছিলেন। কবি রঙ্গলাল কয়েকটি ইংরাজি কবিতারও অনুবাদক। বঙ্গদর্শনের বিশিষ্ট লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কালিদাসের 'মেঘদূতে'র অনুবাদ করিয়াছিলেন। একথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, 'বিদেশী ভাষার কবিতা বাংলায় রূপান্তরীকরণে সত্যেন্দ্রনাথ যে পরিমাণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহা যে-কোন সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের কথায়, সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-কবিতাগুলি

বাংলা ভাষায় অনুবাদের কৈশোর-পর্ব

ফুলের মত বৃন্তরূপ মূলকে আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রস-সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।' ইহা ছাড়া, বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের কৈশোর-পর্বে ইংরাজি দর্শন, ইতিহাস, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতির কিছু কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উহাদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যকই সাহিত্যপদবাচ্য। অল্পসংখ্যক অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর অনূদিত 'ইংরাজ-বর্জিত ভারতবর্ষ' পুস্তকখানি সমধিক উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের সমৃদ্ধি দেখা যায় এই বিংশ শতাব্দীতে—বিশেষ করিয়া এই সাম্প্রতিক কালে। আমাদের সাহিত্যে অনুবাদের ইহাই যৌবন-পর্ব। বর্তমানে অনুবাদের নানা ধারা ঃ যেমন,—ভাবানুবাদ, ছায়ানুবাদ, সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ও যথার্থ বা বিশ্বস্ত অনুবাদ। প্রথম তিন শ্রেণীর অনুবাদে অনুবাদকের নিষ্ঠার একান্তই অভাব—কেবলমাত্র ব্যবসায়সুলভ রীতি ও মনোভাবই উহাতে বিদ্যমান। ঐ বাজার-চলতি অনুবাদ-রীতি দেখিয়া মনে হয় যে, অনুবাদক বিদেশী ভাষায় অনভিজ্ঞ জনকে যেন কৃপার দান দিবার জন্য সমুৎসুক। অনুবাদ যে একটি শিল্পকর্ম—তাই ইহা সাহিত্যের সৃষ্টিকর্মেরই গোত্রভুক্ত—ইহা যেন ঐ তথাকথিত অনুবাদকেরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। বাণীভঙ্গী, আঙ্গিক, ভাব ও ভাষার যথাযথ পরিবেশনই নিষ্ঠাবান অনুবাদকের কর্তব্য। বিদেশী সাহিত্যকে সার্থক বাংলা রীতিতে প্রকাশ, স্বদেশীয় ও বিদেশীর ভাবানুভূতির সংযোগ সাধন, মূল ভাষার উপরে বিশেষ অধিকার প্রদর্শন, বাক্যার্থ ও বাচ্যার্থ-বোধের সৌষ্ঠবরক্ষা—এ সবেরই প্রতি নিষ্ঠাবান অনুবাদকের লক্ষ্য থাকা সমীচীন। সাম্প্রতিক কালে উপন্যাস ছোট-গল্প নাটক কবিতার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, ইতিহাস রাজনীতি অর্থনীতি প্রবন্ধ প্রভৃতির বেলাতেও অনুবাদক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। অবশ্য একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে অনুবাদ-পরিবেশকদের সকলেই এবং সর্বত্র যথার্থ অনুবাদ-প্রয়াসী নহেন। আধুনিক অনুবাদকারীদের মধ্যে যাঁহারা সমধিক উল্লেখযোগ্য, তাঁহাদের অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচিত হইল।

বাংলা ভাষায় অনুবাদের যৌবন-পর্ব

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গর্কির 'মা' উপন্যাসখানি যথার্থ অনুবাদ করেন নাই—তবে গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ-বর্গীয়। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ অনূদিত গ্রন্থগুলি মোটামুটি এই জাতেরই তবে মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দের লেখা গ্রন্থের অনুবাদ 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' বেশ নিষ্ঠাযুক্ত ও প্রশংসাযোগ্য। বিমল সেন অনূদিত ঐ 'মা' উপন্যাস যথার্থ অনুবাদধর্মী নয়—সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ মাত্র। সুধীন সরকারের 'ধীরে বহে ডন' শ্রেণীর বইগুলিও প্রকৃত অনুবাদধর্মী নয়—সংক্ষিপ্ত ও সরল রূপায়ণ। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত 'রামধনু' সংক্ষিপ্ত বা সম্পাদিত আকারের

…পাঠ্য গ্রন্থ। প্রবোধেন্দু ঠাকুর বর্তমান যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ-পরিবেশকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। অনুবাদ-সাহিত্যে ইনিই বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। কালাতীত সমৃদ্ধ সাহিত্যকে খাঁটি বাংলায় পরিবেশনের আশ্চর্য প্রতিভা ইহার অনুবাদগ্রন্থ দাবি করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রবোধেন্দু অনূদিত 'কাদম্বরী' স্মরণীয়। এক কথায় বলা যায়, ইনি আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উত্তরসাধক। মোহিতলাল মজুমদার অনূদিত 'বিদেশী ছোট গল্প-সঞ্চয়ন' ও 'বিদেশী প্রবন্ধ-সঞ্চয়ন' গ্রন্থ দুইখানি সার্থক অনুবাদ-প্রচেষ্টার ভূমিকা হিসাবে স্মরণীয়। অশোক গুহের অনুবাদগ্রন্থগুলির মধ্যে ভাষার সারল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি মূলের ভাবাভঙ্গীর অনুসারক নহেন—পক্ষান্তরে রূপান্তরনীতিরই পরিপোষক। তবে তাঁহার 'ফাঁসীর মঞ্চ থেকে' পুস্তকখানি অনুবাদের বৈশিষ্ট্য বহন করে। প্রধানতঃ, মূল ভাষাজ্ঞানের পটভূমিকার দিক হইতে আধুনিক বাংলা অনুবাদকক্ষেত্রে মূল রুশ ভাষা হইতে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত 'রুশ-কবিতা' নামক গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনিলেন্দু চক্রবর্তী-অনূদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অধিকাংশই ছোট-গল্পের সংকলন। অনুবাদকের নিষ্ঠা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন—কেই মূলের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন-পদ্ধতির প্রতি তাঁহার পক্ষপাত নাই। তাঁহার প্রথম দিকের লেখা 'গভর্ণমেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর' নামক বিখ্যাত রুশ নাটকটির অনুবাদ চমৎকার। তাঁহার 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প' পর্যায়ের ১ম হইতে ৪র্থ খণ্ডের গল্প-ভাণ্ডার, 'দোদের গল্প' বিশ্বস্ততারক্ষার উজ্জ্বল উদাহরণ। মূল লেখকের বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক যথাসম্ভব তাঁহার অনুবাদে ধরা পড়িয়াছে। তুলনামূলক বিচারে একথা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। অনিলেন্দুর সর্বশেষ অনূদিত গ্রন্থ 'প্রেম ও কামনা' ( বিদেশী লেখকদের প্রেমমূলক শ্রেষ্ঠ গল্প-সংকলন ) বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে শিল্পকর্ম ও বিশ্বস্ততার অনন্য দৃষ্টান্ত। একটি কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, মহৎ শিল্পীদের রচনার যথাযথ অনুবাদ বাজারের সাধারণ চাহিদামত নাও হইতে পারে। কারণ,—মূল লেখকের রচনা-ভঙ্গী ও ভাষা-ঐশ্বর্য যো-খুশি পাঠের ন্যায় হওয়া বড়ই দুরূহ। অনিল সিংহ অনূদিত 'সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থা' বইখানিও অনুবাদ-প্রচেষ্টা ও রূপায়ণের দিক দিয়া প্রশংসাযোগ্য। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু প্রয়োজনের দিক দিয়া অবশ্য জ্ঞাতব্য। ভবানী মুখোপাধ্যায় অনূদিত 'মাদার রাশিয়া' একখানি বৃহৎ ও বিশিষ্ট অনুবাদগ্রন্থ। বিষয়বস্তু ও অনুবাদ—উভয় দিক হইতেই বর্তমান অনুবাদ-সাহিত্যে এই গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের আর একটি অনুবাদ-গ্রন্থ 'অখণ্ড জগৎ' সম্পর্কেও পূর্বোক্ত অভিমত সমভাবে প্রযোজ্য। ইনি বাংলা

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের যৌবন-পর্বের উল্লেখযোগ্য অনুবাদকগণের অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য

অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্যই বিশেষ স্থান পাইবার অধিকারী। রজনী পাম দত্ত লিখিত এবং পরিমল চট্টোপাধ্যায় ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য অনূদিত 'আজিকার ভারত' (১ম ও ২য় ভাগ) বঙ্গানুবাদে নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে এই জাতীয় প্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। এ. কাহন্ ও এন সোয়ার্সে লিখিত '*Conspiracy against Russia*' নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বিনয় ঘোষ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে অনুবাদকর্ম একটু বিস্তৃত সত্য, তবে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিক হইতে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা সন্দেহ নাই। সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত 'রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ' সরসতা প্রাঞ্জলতা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়া একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকৃতি। অতঃপর একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড্' নামক পুস্তক-ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দলবিশেষের ভূমিকা গ্রহণ করিলেও বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে মননশীলতা ও প্রান্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যাপারে যে দুঃসাহসিকতা দেখাইতেছেন তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। পূর্ব পাকিস্তানেও বাংলা অনুবাদকর্ম ক্রমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে। '*Virgin Soil*'-এর অনুবাদ 'পোড়োজমি' রচনা করিয়া 'আজাদ'-সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁহার সার্থক অনুবাদ-নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। মহাকবি ইকবালের কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে সৈয়দ আবদুল মান্নান, ফররুখ আহ্‌মদ, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদকর্ম, বিশেষতঃ ইহার সাহিত্যশিল্পসম্মত রূপায়ণ, খুবই আয়াসসাধ্য বলিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য 'অনুবাদ-চর্চা' নামে একখানি গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। সাম্প্রতিক কালে বাংলা

**শেষ কথা**

সাহিত্যে অনুবাদ-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা খুবই প্রশংসনীয় সত্য, তবু ইংরাজি সাহিত্য হইতে অনুবাদ-ব্যাপারে আরও অনেক-কিছু করিবার অবকাশ আছে। সজনীকান্তের ভাষায় বলা যায়, 'মৌলিক রচনায় এখন বাংলা দেশে ভাঁটার টান ধরেছে, এই সুযোগে বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরা যদি অনুবাদের কাজ এগিয়ে রাখ্‌তে পারেন, তা'হলে বাংলা সাহিত্যের কল্যাণই হবে।'

## বাংলা সাময়িক সাহিত্য

বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস খুব দীর্ঘ দিনের নয়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ আট শত বৎসরের ইতিহাসে কবিতার একাধিপত্য। উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলা সাহিত্যিক-গদ্য শৈশবে পদার্পণ মাত্র করিয়াছে। গদ্যসাহিত্যের ভাব-

বহনোপযোগী কিছুটা ক্ষমতা না জন্মিলে সমসাময়িকপত্রের উদ্ভব যে সম্ভব নয়, ইহা সহজেই অনুমান করা চলে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করিবার দিকে পণ্ডিত ও শিক্ষিত মহলে একটা চেষ্টার সূত্রপাত হইল। এবং অল্প কিছুকালের মধ্যে বেশ কয়েকখানি পুস্তক রচিত হইয়া বাংলা গদ্য ভাষা ও সাহিত্যের নানা সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিল। বাংলা গদ্যের প্রথম সৃষ্টিসমূহ স্বভাবতঃই ইস্কুল-কলেজের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সাময়িক পত্রই সর্বপ্রথম শিক্ষায়তনের একান্ত প্রয়োজনের গণ্ডি হইতে জ্ঞান ও বিদ্যাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিবার কার্যে ব্রতী হইল।

গদ্য-সাহিত্য ও সমসাময়িক পত্র

অবশ্য প্রথম প্রথম সাময়িক পত্রগুলিও ছাত্রছাত্রীদের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করিত বলিয়া মনে হয়। কারণ ইস্কুল-কলেজের প্রয়োজনের বাহিরে একটি সাধারণ পাঠক-গোষ্ঠী ( Reading public ) গড়িয়া উঠিতে বেশ কিছুটা সময় লাগিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে 'দিগ্‌দর্শন' এবং 'পশ্বাবলী' পত্রিকার নামোল্লেখ করা চলে। উভয় পত্রিকাই যে 'স্কুল বুক সোসাইটি' দ্বারা পোষিত হইত, এ তথ্য পাওয়া যায়। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন'ই প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা। ইহা প্রতি মাসে প্রকাশিত হইত। 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' এই পত্রিকায় থাকিত। ক্লার্ক মার্শম্যান ছিলেন ইহার সম্পাদক।

ইস্কুলপাঠ্য রচনা ও সাময়িক পত্র

বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসকে আমরা মোটামুটিভাবে তিনটি পর্বে ভাগ করিবার পক্ষপাতী। এই পর্ববিভাগ বাঙ্গালীর জীবন-ইতিহাসের বিবর্তন এবং বাংলা-সাহিত্যের ঐতিহাসিক অগ্রগতির সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত নয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত—প্রথম যুগ ; ইহার নামকরণ করা যাইতে পারে প্রস্তুতি-প্রতিষ্ঠার যুগ। দ্বিতীয় যুগ—উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের প্রায় দুই দশককে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা চলে—ইহা ঐশ্বর্যযুগ। অতঃপর ইহার পরবর্তী তৃতীয় যুগ বা আধুনিক যুগ—এই যুগ সাম্প্রতিক কাল অবধি প্রসারিত।

সাময়িক সাহিত্যের তিন যুগ

'দিগ্‌দর্শন' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'-এর পূর্ব পর্যন্ত প্রস্তুতি-প্রতিষ্ঠা পর্বের বিস্তৃতি বলা যাইতে পারে। এই পর্বে বাংলা সাময়িক পত্র জন্মলাভ করিয়াছে এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ক্রমেই সমুন্নত হইয়াছে। ইতিহাসের ভাষায় এই পর্বকে বলা যাইতে পারে বাংলার নবজাগৃতির প্রস্তুতি এবং বৌদ্ধিক পশ্চাৎভূমি ( Intellectual background ) আর রসসৃষ্টির দিক দিয়া এই পর্ব তো কেবল প্রস্তুতিরই। বৈদেশিক সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে সংশয় ও

প্রথম যুগ—প্রস্তুতি-প্রতিষ্ঠা পর্ব

দ্বন্দ্ব জাগিয়াছে মানুষের মনে। আত্মস্থ ও নির্দ্বন্দ্ব হইয়া সৃষ্টিকর্মে তাঁহারা এখনও ব্রতী হইতে পারেন নাই। এই পর্বের সাময়িক পত্রগুলিতে এই সব মনোবৃত্তির ও অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, সমসাময়িক কালে নানা বিষয় লইয়া যে সামাজিক সংস্কার-আন্দোলন গড়িয়া উঠে, এই পর্বের পত্র-পত্রিকা তাহার বাহন হিসাবে কাজ করিয়াছে। সহমরণপ্রথা, বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহ-নিরোধ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে নানা বিতর্ক এবং কলহ এই সময়কার পত্রগুলিতে প্রকাশিত হইত। দ্বিতীয়তঃ, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনী-সংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনা প্রকাশিত করিয়া জ্ঞানানুশীলনের একটি ভিত্তি এই কালে রচিত হইতেছিল। তৃতীয়তঃ, প্রাচীন হিন্দুধর্ম, নবপ্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম এবং খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের কার্যাবলী সম্বন্ধে নানা বিতর্ক ও আলোচনা অনেক পত্রিকার প্রাণস্বরূপ ছিল। নানা দিক হইতে যে যুক্তিবাদের ঢেউ উঠিতেছিল, ধর্মীয় আলোচনাতেও তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল। এই সব তর্ক-বিতর্কের ফলে শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত লোকের মন কিছুটা পরিমাণে পত্রিকাকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছিল। চতুর্থতঃ, এই পর্বের সাময়িকপত্রে রস-সাহিত্যের আয়োজন একান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তাহার কারণ আমরা আগেই আলোচনা করিয়াছি। ঈশ্বর গুপ্তের খণ্ড কবিতাকে কোনক্রমে বিশুদ্ধ রস-সাহিত্য হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। ইহা ছাড়া এই পর্বের সাময়িক পত্রগুলি কিছু পরিমাণে সংবাদ সরবরাহকারীও বটে।

এক্ষণে এই প্রস্তুতি-প্রতিষ্ঠা পর্বের কয়েকটি প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের পরিচয় লওয়া যা'ক্। ১৮১৮ সালে 'সমাচার-দর্পণ' 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামক সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। শেষোক্তটি বাঙ্গালী পরিচালিত সর্বপ্রথম বাংলা পত্র। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহাতে রামমোহনের সহমরণ-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে একাধিক সাময়িকপত্র খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। ১৮২১ সালে 'সংবাদ-কৌমুদী'র সাহায্যে হিন্দুরা "দেশবাসীর অভাব-অনুযোগের কথাও" ভদ্রভাবে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। রামমোহন রায় ইহার প্রধান লেখক ছিলেন। সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে তাঁহার প্রবন্ধাদি ইহাতে নিয়মিত প্রকাশিত হইত। রক্ষণশীল হিন্দুরা তখন 'সমাচার-চন্দ্রিকা'র মাধ্যমে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। এই পর্বের পত্রিকাগুলির মধ্যে 'সংবাদ-প্রভাকরে'র স্থান সবিশেষ উচ্চে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক ও মাসিক এবং এক সময়ে দৈনিক হিসাবেও প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলা ভাষায় ইহাই প্রথম দৈনিক পত্রিকা। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা, প্রাচীন কবিদের জীবনী ও কাব্যসংকলন ইহার প্রধান

সমাচার-দর্পণ, বাঙ্গাল গেজেটি, সংবাদ-কৌমুদী, সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ-প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

আকর্ষণ ছিল। ইহা ছাড়াও দেশবিদেশের সংবাদ, ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা আলোচনা ইহাতে স্থান পাইত। কিন্তু অক্ষয়কুমার সম্পাদিত মাসিক 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) যে এই পর্বের প্রধানতম সাময়িক পত্র তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য হইলেও অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় ইহা নানাবিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন-ইতিহাস সম্বন্ধীয় একটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 'তত্ত্ববোধিনী' বাংলা ভাষাকে উচ্চভাবের উপযুক্ত বাহন হিসাবে প্রস্তুত হইতেও যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল, অক্ষয়কুমারের রচনাবলীই তাহার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

ঐশ্বর্যপর্ব

ঐশ্বর্যপর্বের পত্রিকাগুলিতেই সর্বপ্রথম বাংলা সাময়িক পত্রের এমন একটি আদর্শের স্থাপনা হয়, যাহা দ্বারা অধুনাতন পত্রিকাগুলিও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত। প্রথমতঃ, কাব্য-উপন্যাসাদির প্রকাশ এধং প্রচার এই পর্বের প্রধান প্রধান পত্র-পত্রিকার অন্যতম মুখ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ, এই পর্বেই বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য তত্ত্বহিসাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে এবং সদ্য-প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার মূল্যবিচার শুরু হয়। তৃতীয়তঃ, বাঙ্গালী জাতির প্রাণে স্বাধীনতার যে কামনা নানাবিধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এবং অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হইতেছিল, পত্রিকাগুলির মধ্যেও তাহা আত্মপ্রকাশ করে। নানা-ভাবে অতীতে-বর্তমানে-ভবিষ্যতে জাতির জীবনের নানা দিককে অনুধাবন করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ইহার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-সাহিত্যে আলোচনায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রাণাবেগ সঞ্চারিত হয়। এই ধারা অবশ্য 'তত্ত্ববোধিনী' হইতেই কিছুটা আরম্ভ হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, এই পর্বের পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া যে বিভিন্ন সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে, তাঁহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যের দিক্‌পাল ব্যক্তি। সাময়িককে তাঁহারা চিরন্তনের রাজ্যে পৌছাইয়া দেন।

বিবিধার্থ-সংগ্রহ, এডুকেশন গেজেট, বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা, সোমপ্রকাশ

প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৫১ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়! "পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য দ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচনা প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনায়" এই পত্রের কলেবর পূর্ণ হইত। মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র অনেকাংশ এই পত্রে প্রকাশিত হয় এবং মধুসূদনেরই কাব্য-নাটকাদি অবলম্বন করিয়া প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনারও ইহাতেই সূত্রপাত হয়। রাজেন্দ্রলাল, মধুসূদন, কালীপ্রসন্ন, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মনীষী এই পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ইহার সমসাময়িক 'এডুকেশন গেজেট,' 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলে। প্যারীচাঁদের 'মাসিক পত্রিকা' ভাষার সারল্যের জন্য উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগরের পরামর্শে ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। ভাষার দিক হইতে ইহার সংস্কৃতানুকারিতা প্রবল ছিল, কিন্তু ইহার প্রগতিশীল ভাবনাও প্রশংসনীয়।

বঙ্গদর্শন

১৮৭২ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সর্বকালের বিচারের একটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। ঐতিহাসিক-প্রবর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলিতে গেলে "...বঙ্গ-দর্শনে'র আবির্ভাব একটা সামান্য সাময়িক ঘটনা মাত্র নয়, বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী সমস্ত ইতিহাসই এই একটি ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে।...বস্তুতঃ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সর্বশুভকরী', 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', 'সোমপ্রকাশ' ও 'রহস্যসন্দর্ভ' প্রভৃতিতে যে সম্ভাবনার আংশিক আভাসমাত্র পাওয়া গিয়াছিল, 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ণ বিকশিত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রবন্ধ সমালোচনা যে কতকগুলি সংবাদ (news) ও তথ্যের সমষ্টিমাত্র নয়, সেগুলিও যে নানা বিচিত্র রস-সংযোগে সাহিত্য-পদবাচ্য হইয়া উঠিতে পারে, পাঠকের শিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও খোরাক যোগাইতে পারে, 'বঙ্গদর্শনে'ই সেই সত্য সর্বপ্রথম প্রচারিত হইল।" 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমের অমর উপন্যাসগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া কি বিপুল উৎসাহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি করিত, আমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। 'বঙ্গদর্শন'কে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিমের আদর্শে উদ্দীপনায় ও উপদেশে জগদীশনাথ রায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা নানা বিষয়ে গবেষণাদির সাহায্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও সাময়িক পত্র : ভারতী, বিচিত্রা, সবুজপত্র ইত্যাদি

উনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকের পত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল : 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'ভারতী', 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়), 'প্রবাসী', 'বসুমতী', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি। ইহার অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার গদ্যপদ্য নানা রচনায় এই পত্রিকাগুলি সমৃদ্ধ তো ছিলই, উপরন্তু কবির আদর্শে ও উৎসাহে তরুণদের মধ্যে একটি বিরাট্ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছিল। এই পত্রিকাগুলিতে ভাষার সৌন্দর্য ও নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়তই চলিত। রচনা-সৌকর্যের উন্নতির চেষ্টা এবং বিদেশী নানা কাব্যকল্পনা ও চিন্তাসূত্রের সঙ্গে আপনাদের যুক্ত করিবার প্রয়াসও লক্ষণীয়। 'ভারতী'কে কেন্দ্র করিয়া শেষ দিকে রবীন্দ্রানুসারী কবি ও সাহিত্যিকদের একটি গোষ্ঠীর উদ্ভব

হইল। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা প্রকাশিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-রীতিকে অনুসরণ করিয়া বহু সুধী ব্যক্তির প্রবন্ধাদিও এই পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে। 'কল্লোল'-কেন্দ্রিক রবীন্দ্রোত্তর অতি-নিক কবিদলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক হাইফেন হিসাবে ইহাদের গ্রহণ করা চলে। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'কে কেন্দ্র করিয়া একটি নূতন চলিত গদ্য রীতি এবং রম্যদীপ্ত বক্র ও মননশীল মেজাজ বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে। অপর পক্ষে 'নমুনা' ও 'ভারতবর্ষ'কে অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্প-গুলি প্রকাশিত হয়। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে ইহাদের মূল্যও তাই সামান্য নয়।

বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে মহিলা-পত্রিকাদির অবদানও বড় কম নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত মহিলা-পত্রিকাগুলির মধ্যে 'বঙ্গমহিলা', 'অনাথিনী', 'ইন্দুললনা', 'ভারতী', 'পরিচারিকা', 'সোহাগিনা', 'বঙ্গবাসিনী', 'বিরহিণী', 'পুণ্য', 'অন্তঃপুর', 'খ্রীষ্টীয় মহিলা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর অধুনালুপ্ত মহিলা-পত্রিকাগুলির ভিতরে 'ভারত-ললনা', 'জাহ্নবী', 'গৃহলক্ষ্মী', 'সুপ্রভাত', 'ভারতলক্ষ্মী', 'প্রেম ও জীবন', 'মাহিষ্যমহিলা', 'আনন্দসংগীত-পত্রিকা', 'আন্নেসা', 'মাতৃমন্দির', 'বঙ্গনারী', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'জয়শ্রী', 'পরিচারিকা' (নব পর্যায়), 'মহিলাবান্ধব', 'মেয়েদের কথা', 'জাগরণ', 'বিজয়িনী' প্রভৃতির দানও উপেক্ষণীয় নয়। সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত পশ্চিম-বাংলার 'ঘরে-বাইরে', 'মহিলা-মহল', 'মহিলা', 'ঘরোয়া', 'অঙ্গনা', 'কল্যাণী' প্রভৃতি এবং পূর্ব-পাকিস্তানের 'অনন্যা', 'বেগম', 'শতদল' প্রভৃতি মহিলা-পত্রিকাগুলির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। মহিলা-পত্রিকাগুলি তিন শ্রেণীর: প্রথমতঃ, মহিলারাই পরিচালিকা, সম্পাদিকা এবং রচয়িত্রী; দ্বিতীয়তঃ মহিলাগণ পরিচালিকা সম্পাদিকা হইলেও নর ও নারী উভয়েই লিখেন; তৃতীয়তঃ, মহিলাদের নাম দিয়া পুরুষেরাই চালাইয়া যান। সাহিত্য, প্রচার, সংগঠন প্রভৃতির দিকে মহিলা-পত্রিকাগুলির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য, আদর্শ ও ব্যবসায়গত দিকও উপেক্ষিত হয় না। তবে ঘরকন্না, শিশুপালন, হাতের কাজ, নারীশিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে নারী, নারী-প্রগতি প্রভৃতি বিষয়গুলিই মহিলা-পত্রিকায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। পত্রিকা আবার 'মহিলা' কেন?—এই প্রশ্নও ইতিমধ্যে উঠিয়াছে। তাহার উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, সমাজ-উন্নয়ন ব্যাপারে মহিলাদের বিশেষ সমস্যা ও ভিন্ন সংঘ-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেইজন্যই মাহিলা-সমাজের মুখপত্র-রূপে 'মহিলা-পত্রিকা'র প্রচার অবশ্যই প্রয়োজনীয়। মহিলা-সমাজের উন্নয়নে নরনারী-

মহিলা-পত্রিকা—শ্রেণীবিভাগ ও প্রয়োজন-বিচার

নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই লেখা মহিলা-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া সমীচীন। তবে পরিচালনায় ও সম্পাদনায় মহিলা-প্রাধান্য থাকাই উচিত। নতুবা মহিলা-পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ও নাম উভয়ই ব্যর্থ হইবে।

ইতিমধ্যে আমরা বাংলা সাময়িক সাহিত্যের তৃতীয় যুগে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি। প্রথম মহাযুদ্ধের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির নানা দ্বন্দ্ব ও সংকট এই যুগের বাঙ্গালীর মনে বাসা বাঁধিয়াছে এবং তাঁহাদের সৃষ্টিকর্মকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এই পর্বের সাময়িক পত্রেও তাহারই প্রতিফলন। একদিকে 'রূপবাদী'গণ বুদ্ধদেব বসু, ৺জীবনানন্দ, সুধীন দত্ত প্রভৃতির নেতৃত্বে 'কবিতা', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি পত্রিকার মধ্য দিয়া একটি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অপর দিকে সমাজবাদিগণ 'পরিচয়', 'ক্রান্তি', 'নূতন সাহিত্য', 'অগ্রণী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া নূতন সমাজবাদী চিন্তা ও প্রগতি-সাহিত্য প্রকাশ করিতেছেন। উপরন্তু ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আদর্শহীন ভাবে পাচমিশালী নানা রচনার সমন্বয়ে 'শনিবারের চিঠি', 'বসুমতী', 'দেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। ইহাদের অনেকের কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য আছে, আবার কেহ কেহ একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রচারে ব্যস্ত। এখনও ইহাদের বিচারের সময় আসে নাই। তবে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' একটি অমূল্য ব্যতিক্রম। আশার কথা এই যে, প্রধান প্রধান সাময়িক পত্র প্রায়ই সাময়িকতার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া চিরন্তনের আসন পাইয়াছে।

তৃতীয় যুগ—আধুনিকতা
উপসংহার

# আধুনিকপূর্ব বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতি

আধুনিকপূর্ব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দীর্ঘ আট শত বৎসরের। হাজার বছর আগে চর্যাপদের গানগুলি রচিত হইবার সময় হইতে উনিশ শতকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বিস্তৃত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে নানা বিকাশ তাহাই আধুনিকপূর্ব যুগ হিসাবে স্বীকৃত হইবে। উনিশ শতক হইতে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা। আধুনিকপূর্ব বাংলা সাহিত্যের একটিমাত্র আয়োজন—তাহা কবিতার, গদ্যসাহিত্যের নয়। তাই আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে গতিপ্রকৃতি, তাহার আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। এই আট শত বৎসরের বাংলা কবিতাকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে : প্রাচীন যুগের সাহিত্য—ইহার আয়ুষ্কাল মুসলিম-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত, এবং মধ্যযুগের সাহিত্য—এই যুগ মুসলিম শাসন-কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু তবু মূলতঃ ইহারা একই যুগের সাহিত্য। কারণ,—মুসলিম-বিজয়ের ফলে রাষ্ট্রনৈতিক শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিলেও দেশের মূল অর্থনীতিতে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নাই। এই আট শত বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক ভিত্তি একই প্রকার ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক গবেষকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই অর্থনৈতিক-

আধুনিকপূর্ব বাংলা কবিতা
—প্রাচীন ও মধ্য যুগ

সামাজিক ব্যবস্থাকে গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিভিত্তিক সামন্ততন্ত্র নামে অভিহিত করা চলে। এই আট শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর জীবন আত্মকেন্দ্রিক কতকগুলি গ্রামকে অবলম্বন করিয়া আপন আপন খাতেই আবর্তিত হইয়াছে, কোন রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তনের তরঙ্গ তাহার জীবনধারাকে আঘাত করিতে পারে নাই। তাই এই গোটা যুগের কবিতার এমন কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে, যাহা পটভূমিকার এই আত্মকেন্দ্রিক আত্মসন্তুষ্ট গ্রামীণ জীবনবোধের উৎস হইতেই উদ্বর্তিত।

আধুনিকপূর্ব বাংলা কবিতার সর্বপ্রধান যে লক্ষণটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইল ধর্মের একাধিপত্য। সেকালে বাংলা কবিতায় এমন কিছুই রচিত হয় নাই, যাহার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীর সাধনা যুক্ত নয়। সে-যুগের বাংলা কবিতার যে প্রধানতম তিনটি ধারা—মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ ও পদাবলীর ধারা—তাহারা সকলেই ধর্মকেন্দ্রিক। মঙ্গলকাব্যের কবিরা লৌকিক ভয়-ভীতি ও কামনা-বাসনাকে কতকগুলি দেবদেবীর মূর্তিতে কল্পনা করিয়াছেন এবং প্রচীন পুরাণের সঙ্গে যুক্ত করিয়া মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, শীতলা প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই দেবতাদের ক্ষমতার শেষ নাই, ইহারা ভক্তের ধনজনের সকল অভাব অনায়াসে মোচন ত করেনই, সাপ-বাঘের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করেন, এমন কি মুসলমান রাজশক্তির ক্রোধের অগ্নিকেও হেলায় নিবারিত করেন। পদাবলীতে আমাদের কবিরা প্রেমের গান গাহিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁহারা স্পষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, ‘শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!’ স্বয়ং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির মূর্ত বিগ্রহ রাধার রসসম্ভোগই তাঁহাদের অভিপ্রেত। অনুবাদ-বাক্যগুলিতেও এই ধর্মভাব জাগ্রত। সংস্কৃত রামায়ণ কিংবা মহাভারতের নায়ক-নায়িকারা বিরাট্‌ চরিত্রের মানুষ রূপেই অঙ্কিত, বাঙ্গালী অনুবাদকদের হাতে রাম কিংবা শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ ই দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। এমন কি, চর্যাপদ হইতে রামপ্রসাদের শাক্তসংগীত পর্যন্ত যে সাধন-গীতির ধারা বাংলা প্রাচীন কবিতার রাজ্যে প্রসারিত, তাহাও প্রত্যক্ষভাবেই বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্মীয় সাধনভঙ্গী প্রকাশেই সার্থক। এমনি আঠারো শতকে ভারতচন্দ্রের দেহাধিষ্ঠিত প্রেমকাব্যের চারিপার্শ্বেও কালীনামের নামাবলী জড়িত।

ধর্মের একাধিপত্য

কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন ও মধ্য যুগ ধরিয়া বাংলায় যে কাব্যসাধনা চলিয়াছে, তাহা মানবজীবন হইতে বহু দূরে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। ধর্মীয় পরিমণ্ডলের মধ্যেও মানবজীবনের নানা দৈনন্দিনতা সে-যুগের কাব্য-কবিতায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক যুগের মানবতার সঙ্গে সে-যুগের এই মানব-স্বীকৃতির পার্থক্য অবশ্যই লক্ষণীয়। এই মানবতা দেব-নির্ভর। সে যাহাই হউক মানবজীবনের নানা বাস্তব সত্য এই যুগের কাব্যসাহিত্যে সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়। চর্যাপদের জীবনকে অস্বীকার করিবার

সে-যুগের মানবতা

যে দর্শন তাহা প্রকাশ করিবার জন্যও তাঁহাদের এই জীবন হইতেই চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁতী, জোলা, শিকারী, জেলে, মাঝি—তথাকথিত নিম্নস্তরের মানুষের জীবনের নানা বাস্তব কর্মময় ছবি চর্যাপদে ছড়াইয়া রহিয়াছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবতার প্রতাপ যতই প্রবল হউক না কেন, বাঙ্গালীর গ্রাম-জীবনের পরিবারকেন্দ্রিক চিত্রের বাস্তবতায় ইহা ধন্য। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন লইয়া সুখীসুন্দর জীবনের কামনাই মঙ্গলকাব্যগুলির পত্রে পত্রে ধ্বনিত। এইজন্যই তাহাদের দেবার্চনা, তাহাদের স্বর্গকামনাও। মঙ্গলকাব্যেও কল্পিত স্বর্গও জীবনবিরোধী কোন কল্পরাজ্য নয়, জীবনে যে বাস্তব সুখসমৃদ্ধি সম্ভব নয়, দেবার্চনার মধ্য দিয়া সেই সুখৈশ্বর্যের রাজ্যপ্রাপ্তির কামনাই তাহাদের স্বর্গকামনা। আর বৈষ্ণব কবিতার তত্ত্ব আমাদের 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ'-এর দিকে আকর্ষণের যতই চেষ্টা করুক না কেন, রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভূতির বাস্তব চিত্র মানুষের জীবন হইতেই প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন—

'সত্য করি কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি দেখেছিলে এই প্রেমচ্ছবি
কোথা তুমি শুনেছিলে এই প্রেমগান?'

রামপ্রসাদাদির আগমনী-বিজয়ার গানে বাঙ্গালী জননীর করুণ আর্তিই ফুটিয়া উঠিয়াছে. ইহার ধর্মীয় ব্যাখ্যা যে একান্তই বহিরঙ্গগত, এ কবিতা-পাঠে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এমন কি, এই সর্বব্যাপক মানবদৃষ্টিতে আমাদের সাহিত্যে দেবচরিত্রেও ঘটিয়াছে আমুল পরিবর্তন। শ্রীকৃষ্ণ একটি গ্রাম্য রাখাল-বালক হইয়া বাংলার পথে-ঘাটে রাধার প্রেমকামনা করিয়া ধামার গান জুড়িয়া দিয়াছেন, দেবাদিদেব মহাদেব চাষা সাজিয়া মাঠে-ঘাটে জমি তৈয়ার করিতেছেন ও ফসল ফলাইতেছেন, মনসা হিংস্র ও ক্রূরমূর্তিতে গ্রাম্য জমিদার ও নবাবের পাইক-পেয়াদাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন, আর কালী তো আসিয়া বিদ্যাসুন্দরের দেহসর্বস্ব ভালবাসার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন।

তৎসত্ত্বেও একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, ব্যক্তিমানুষের কোনরূপ আত্ম-প্রতিষ্ঠা সে-যুগের সমাজ অথবা সাহিত্যও সহ্য করে নাই। সে-যুগে লাউসেন হইয়া ধর্মঠাকুরের পাদুকা মস্তকে বহন করিলে সাফল্যের সম্ভাবনা সুপ্রচুর, কালকেতু হইলেও সে-যুগের কোন আপত্তি নাই, কারণ তাঁহার ব্যবহারে দেব-দেবীকে অস্বীকার করিবার চেষ্টামাত্র নাই। কিন্তু সে-যুগে চাঁদ-সদাগর হইলে আর রক্ষা নাই, তাঁহার সপ্ত-ডিঙা-মধুকর গঙ্গায় ডুবিবে, সপ্তপুত্র বিষক্রিয়ায় অকালে প্রাণ হারাইবে, সমস্ত জীবনব্যাপী অনেক লাঞ্ছনা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে এবং এত ঘটনার পরেও যদি তাঁহার মস্তক দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উচ্চ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কবির অঙ্গুলিসংকেতে তাঁহার চির-উন্নত শির জোর করিয়াই মনসাদেবীর পায়ের তলায় লুটাইয়া দেওয়া হইবে।

ব্যক্তি-স্বীকৃতির অভাব

সে-যুগের কাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে পৌনঃপুনিকতা ও অনুকরণ-পূর্বোক্ত তিন চারিটি ধারার মধ্যেই তাই তাহাদের আবর্তন-বিবর্তন ঘটিয়াছে।

পৌনঃপুনিকতা ও অনুকরণ-ধর্ম

শতাধিক কবি মনসামঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছেন, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল রচয়িতার সংখ্যাও খুব বেশি কম নয়। অথচ একই কাহিনী, একই রূপ চরিত্র-চিত্রণ, একই পয়ার ও ত্রিপদীর ছন্দস্পন্দে শিথিল গতিতে বিবৃতি। রামায়ণ এবং মহাভারতেরও অনুবাদ ঘটিয়াছে প্রচুর। মহাভারতের খণ্ডে খণ্ডে অনুবাদ যে কত হইয়াছে তাহা সংখ্যাতীত। আর পদাবলী তো হাজারে হাজারে রচিত হইয়াছে। রাধার কোন একটি বিশেষ মনোভঙ্গীকে একই রূপে একই উপমায় একই চিত্রকল্পে বর্ণনা করা হইয়াছে শত শত কবিতায়। কবির ব্যক্তি-অংশের প্রভাব ইহার মধ্যে এত কম যে বিস্মিত হইতে হয়।

আধুনিকপূর্ব বাংলা কবিতার চিত্রধর্মও একটি বিশিষ্ট রূপ হিসাবে আলোচনার যোগ্য। এখানেও উপমা-উৎপ্রেক্ষায় অনুকরণধর্ম প্রবল। কেবল তাহাই নয়, সে-

ভাববাদ ও চিত্রকল্প

যুগের কাব্যে অধিকাংশ স্থলেই বর্ণনা দীর্ঘ তালিকায় পর্যবসিত, কোন বিশিষ্ট চিত্রসৌন্দর্যে বিধৃত নয়। বিশেষতঃ নারীরূপের বর্ণনায় এক অদ্ভুত বস্তুবোধহীন অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। হস্তীর ন্যায় গতি, সিংহের ন্যায় কটিদেশ প্রভৃতি উপমার বস্তু-অংশকে সম্পূর্ণতঃ বাদ দিয়া তাহার 'রস-অংশ' ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথও এক আলোচনায় আপত্তি জানাইয়াছেন: এই বিশিষ্টতার জন্ম যে সে-যুগের ভাববাদী জীবনদর্শনের মধ্যে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সে যুগের বাংলা কবিতা নানাভাবে ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য প্রভাবের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। অভিজাতের রাজসভায়, বৌদ্ধ মঠে কিংবা হিন্দু দেবতার

সে-যুগের কবিতা ও জনসাধারণ

মন্দিরে, অথবা কর্মশীল মানুষের পরিশ্রমের ফাঁকে ফাঁকে মাঠে-ঘাটে এবং মেয়েমহলে নানাবিধ ব্রতকথা প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের জন্ম। আধুনিক সাহিত্যের ন্যায় মুষ্টিমেয় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পঠনপাঠনের মধ্যে তাহারা সীমাবদ্ধ নয়। সে-যুগে অক্ষরজ্ঞানশূন্য সাধারণ মানুষের কাছে সাহিত্যকে পৌছাইয়া দিবার নানারূপ প্রথা ছিল, সুযোগ ছিল এবং তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারও ঘটিত। কীর্তনের আসরে, শারদীয়া পূজার দিনে বাড়িবাড়ি ঘুরিয়া যে আগমনী-বিজয়ার গান গাওয়া হইত তাহার সুরে সুরে, রামায়ণ-মহাভারতের কথকতায়, মনসার ভাসানে, গাজনের উৎসবে, ব্রতের অনুষ্ঠানে, যাত্রার পালায় পুরানো সাহিত্য ছিল গ্রাম-বাংলার সর্বসাধারণের প্রাণের সম্পত্তি। এইখানেই তাহার সব চাইতে বড় সার্থকতা।

# বাংলা উপন্যাস

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস-নামক গদ্যকাব্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রোত্তর যুগে আমাদের সাহিত্যে গল্প-উপন্যাসের প্রাচুর্যও যেমন, রূপ-বৈচিত্র্যও তেমনই অতিশয় বিলক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের প্রকৃতিতে আত্মপরিচয়-লাভের যে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহারই বশে প্রত্যহের হাসি-কান্নায়, ব্যাথায়-আনন্দে সে আপনাকে নিয়ত প্রকাশ করিতে চাহিতেছে। কিন্তু দর্পণে প্রতিবিম্বিত না হইলে আপনার মূর্তি যেমন কাহারও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে না, তেমনই বিধাতার এই সৃষ্টির মতই মানুষ ভাষা ও সাহিত্যের রূপ-দর্পণে আপনার আন্তর মূর্তির নিত্য দর্শন লাভ করিতেছে। এই উপন্যাস নামক গদ্যকাব্যে মানুষ আপনাকে যেরূপ অভ্রান্ত রূপে প্রত্যক্ষ করে, এমন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এই উপন্যাসই মানুষের জীবনালেখ্য,—মানুষের জীবনই উপন্যাসের প্রাণবস্তু। এই কাহিনী দেবমানব বা রূপকথার অবাস্তব কাহিনী নয়। তথাপি ব্যাপ্তিও যেমন সীমাহীন, গভীরতাও তেমনই অতলস্পর্শী। এই জীবনের যত কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কলহ-সংশয় অমৃত-গরল—

উপন্যাসের সাধারণ পরিচয়

এ সবকে কোন তত্ত্বরূপে আস্বাদান করা নয়, বুদ্ধি বা মস্তিষ্কের দ্বারা আয়ত্ত করাও নয়, নিত্যপরিচিত নর-নারীর জীবন্ত কাহিনী রচনার দ্বারাই একেবারে সাক্ষাৎ হৃদয়গোচর ও অনুভূতির বস্তু করিয়া তুলিতে হইবে। কালের গতি-স্রোতে, ঘটনা-ধারার বিবর্তনের ঘূর্ণাবর্তে জীবনকে দেখিতে পাইবে। ঔপন্যাসিক-কবি জীবনকে এইরূপেই দেখিয়া থাকেন। তারপর কার্য-কারণের অমোঘ নিয়ম, অদৃশ্য শক্তির লীলা ও নর-নারীর চরিত্রনিহিত নানাশক্তির দ্বন্দ্ব—সকলই সেই ধারার গতি ও আদি-অন্তের নিয়ামক হইয়া জীবনরহস্যের এক সুগভীর রসরূপ আমাদের হৃদয়গোচর করে—এই দুর্লভ মানবজীবনের অন্তহীন বিচিত্র রূপদর্শনে আমাদের আত্মা তৃপ্ত ও আশস্ত হয়। মহাভারতকার পরম তত্ত্বকে এই তথ্যপূর্ণ জীবনের জবানীতে পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহাতে একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নয়, সমগ্র জাতিরই অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা চরিতার্থ হইয়াছিল। ঐতিহাসিক এক মহাসংকটে ভারতীয় হিন্দুজাতি তৎকালে রক্ষা পাইয়াছিল। আধুনিক যুগে বস্তু-জিজ্ঞাসার উৎকট কোলাহলের নেপথ্য-গৃহে বুঝিবা মানবাত্মা সেই আদিম পিপাসায় এখনও তেমনই পিপাসার্ত এবং সেই পিপাসা-নিবারণের বারিধারার বাহক কোন ধর্ম বা পুরাণশাস্ত্র নয়—একালের উপন্যাস-কাব্যই।

আমাদের সাহিত্যে উপন্যাসের জন্মকাল আদৌ প্রাচীন নয়, মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতেই হইয়াছে উহার আবির্ভাব। গল্প বলা ও শোনার আকর্ষণটা মানুষের যতই সহজ ও স্বাভাবিক হোক্ না কেন, জীবনের যে-বাস্তব রসিকতা আধুনিক

উপন্যাসের জন্মের কারণ, তাহা ইংরাজি শিক্ষা ও সাহিত্যের সহিত সাক্ষাৎ ও নিবিড় সংস্পর্শের ফলেই সম্ভব হইয়াছে—এই ঐতিহাসিক সত্যকে কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। ঐ বিজাতীয় সংস্কৃতি আমাদের প্রাণমূলে যে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতেই আমরা নবজন্ম লাভ করিয়াছি। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদের বহুকালাগত সুদৃঢ় ধারণা বিচলিত হইয়াছিল, অর্থাৎ যে জীবনের অধিকাংশই আমরা পরকাল ও ভগবানে বাঁটিয়া দিয়া এবং সকল দ্বিধা-সংশয়পূর্ণ বাস্তব জীবনকে একরূপ পাশ কাটাইয়া অধ্যাত্মজীবনের নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় আশস্ত হইয়াছিলাম, অতঃপর ঐ জীবনই অতিশয় কঠিন বাস্তব-জিজ্ঞাসার অধীন হইল। শুধু গল্প-উপন্যাসেই নয়, মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে-সাহিত্যকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছি, উহার সেই রোম্যান্টিক প্রবৃত্তি বা আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদ ইংরাজি কাব্যের সাক্ষাৎ রসপ্রেরণারই যে ফল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বৌদ্ধগান হইতে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা কাব্যের ধারা এতকাল এক সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ তটবন্ধনকে স্বীকার করিয়াই প্রবাহিত হইতেছিল; সেই সাহিত্যে মানবহৃদয়ের গভীরতর উৎকণ্ঠা ও প্রশ্নকাতরতা শাস্ত্রশাসন অগ্রাহ্য করিয়া স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। সেই সাহিত্য মানুষের হৃদয়-রহস্যে সংবেদনশীল হইয়া উঠে নাই, দেবতা ও দৈবের অনুগ্রহ-নিগ্রহের কাহিনীতেই পর্যবসিত হইয়াছে। অতএব, উপন্যাস-গল্পের জন্মপত্রিকা রচনাকালে সংস্কৃত কাদম্বরী অথবা পঞ্চতন্ত্র-কথাসরিৎসাগর কিংবা বৌদ্ধজাতকের শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজন নাই। ঐরূপ গল্পের পরিচয় সকল জাতিরই প্রাচীন সাহিত্যে অল্পাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের উপন্যাস-গল্প গঠনভঙ্গীতে ও অন্তর্নিহিত রসপ্রেরণায় এমনই অনন্যসদৃশ যে ঐরূপ কাহিনী-গল্পের সঙ্গে তাহাদের দূরতম সগোত্রতাও নাই—থাকিতেও পারে না। অন্য সাহিত্যে উপন্যাসের ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রাচীন উপকথা-গাথা প্রভৃতির স্থাননির্দেশের অবকাশ থাকিলেও আমাদের সাহিত্যে যে ঐরূপ গবেষণা কেন আদৌ ভ্রান্তিমূলক, তাহা আমরা বলিয়াছি। জীবনের প্রতি যে গভীর মমতাবোধ এবং সহানুভূতি হইতে উপন্যাসের জন্ম, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় কোথাও মিলে না।

বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে উপন্যাসের ধারা অনুসরণ করিবার কালে বাস্তব-অবাস্তবের মাপকাঠি দ্বারা দিক্ নির্ণয় করা সংগত হইবে না। কেন না,—উপন্যাস-বিশেষের রসপরিণাম যদি যথার্থ ও অনবদ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাস্তবানুগামী নয় বলিয়াই উহাকে বরখাস্ত করিলে বিদগ্ধ জন তাহা গ্রাহ্য করিবেন কেন? মনে রাখিতে হইবে কল্পনার প্রকৃতি-অনুযায়ী ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতার কারণে উপন্যাসের বৈচিত্র্যের

বাংলা উপন্যাসের ধারা নির্দেশের প্রণালী

অন্ত নাই। আসল কথা, সেই দৃষ্টিশক্তি চাই, যাহাকে আমরা বলি কবিত্ব। উপন্যাসের রূপ-বিবর্তনের মূলে কালধারার প্রভাব থাকিলেও প্রত্যেকটি সৃষ্টিই স্বতন্ত্র।

এইবার আমাদের উপন্যাস-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। সুডৌল সর্বাঙ্গ-সুন্দর উপন্যাস আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রেরই সর্বপ্রথম কীর্তি। তবে যথার্থ উপন্যাস না হইলেও উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া এতদিন অবধি টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) বিরচিত ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলাল'কেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা প্রদত্ত হইয়াছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নববাবুবিলাসে' উপন্যাসের লক্ষণ প্রায় না থাকায় প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা ইহাকে দেওয় হয় না, তবে বাংলা উপন্যাসের পটভূমিকা আলোচনায় ইহার নাম উল্লিখিত হয় এই মাত্র। কিন্তু সম্প্রতি চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স বিরচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থখানি পুনঃ-প্রকাশিত হওয়ায় 'আলালের ঘরের দুলালে'র ঐ প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা আর থাকিল না। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'ই বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে পথিকৃতের দাবি উপস্থাপিত করিয়াছে এবং তাহা অবশ্য স্বীকার্য। 'আলালের ঘরের দুলালে'র দুইটি প্রধান গুণ :—একটি, সহজবোধ্য বাংলা ভাষা এবং অপরটি, বিষয়বস্তুর মৌলিকতা। কিন্তু 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' তুলনায় আরও সহজবোধ্য ; কারণ,—প্যারীচাঁদের ন্যায় ফার্সী শব্দের বহুল প্রয়োগ ও ভাষার গুরুচণ্ডালী দোষ ইহাতে নাই। এতদ্ব্যতীত, বিষয়বস্তুর মৌলিকতাও আছে। প্যারীচাঁদের ন্যায় শহরবাসী লম্পট ধনীদুলালকে না লইয়া অপরিচিত পল্লীর অত্যন্ত দরিদ্র অশিক্ষিত কুসংস্কারান্ধ নরনারীদের লইয়া শ্রীমতী ম্যলেন্স বঙ্গসাহিত্যের 'প্রথম বাস্তব কাহিনী' রচনা করিয়াছেন। কাহিনীর পরিবেশসৃষ্টি, বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব রচনা, ঘটনা-বিন্যাস, প্রেমের স্নিগ্ধ চিত্রাঙ্কন, অনায়াসবোধ্য ভাষা ব্যবহার প্রভৃতি মৌলিক গুণাবলীর জন্য 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থখানির প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা-প্রাপ্তির দাবি অবশ্যই অগ্রগণ্য। তবু ম্যলেন্সের "কাহিনী একালের আদর্শে যথার্থ উপন্যাস হয়ে উঠ্‌তে পারেনি দুটি কারণে। ফুলমণি, করুণা, রাণী ও সুন্দরীর কাহিনীগুলি অনেকটা বিচ্ছিন্ন ; এমন একটি মূল কাহিনী নেই যা উপকাহিনীগুলি কেন্দ্রাভিমুখী করতে পারে। দ্বিতীয় কারণ তাঁর গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যের মধ্যে পাওয়া যাবে। নীচুতলার বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদের ধর্ম ও নীতির পথে আকৃষ্ট করবার জন্যই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তার ফলে বাইবেলের কথা মাঝে মাঝে রচনার ধারাকে ব্যাহত করেছে। তথাপি লেখিকা প্রায়ই তাঁর উদ্দেশ্য ভুলে নিছক শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন। 'আলালের ঘরের

বাংলা উপন্যাসের গোড়ার কথা

লাল'ও উদ্দেশ্যমূলক কাহিনী; এবং এই কাহিনীর মধ্যেও একমুখীনতার অভাব রয়েছে।" সে যাই হোক্,—'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র নিরঙ্কুশ সাহিত্যিক মূল্য না থাকিলেও ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই আছে। তবে একথাও সত্য যে, বঙ্কিমের পূর্বে ইংরাজি গল্প-উপন্যাসপাঠে পাঠকচিত্তে যে ধরণের ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা 'ফুলমণি ও করুণা' বা 'আলাল'—কেহই মিটাইতে পারে নাই। 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'কাদম্বরী', টেলিমেকাস', 'রাসেলাস', 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ' প্রভৃতি অনুবাদ-গ্রন্থরাজিই বাঙ্গালীর সেই রোমান্স-পিপাসা মিটাইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কঠিন নিকষে ভারতের যুগযুগবাহী সত্যটিকে উত্তমরূপে যাচাই করিয়া নব যুগের উপযোগী নব মানবসংহিতা প্রণয়ন করিলেন। স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমের মন্ত্র যেমন তাঁহার কাব্যপ্রেরণায় সাক্ষাৎ সহায় হইয়াছিল, তেমনই সেই আধ্যাত্মিক সংকটে, ঐ একই মন্ত্র জাতির বুকে ও বাহুতে নব বলাধান করিয়া বিজাতীয় সভ্যতার আক্রমণজনিত নিশ্চিত মৃত্যু হইতে জাতিকে রক্ষা করিয়াছিল। তাই বঙ্কিমের উপন্যাসে গণজীবনের বাস্তবতার স্বাক্ষর না থাকিলেও বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের গভীরতর বাস্তবের আছে স্বীকৃতি, মানবাত্মার চিরন্তন উৎকণ্ঠার আছে পরিচয়। এই জন্য তাঁহার উপন্যাসকে কোন শ্রেণীভুক্ত করা সংগত হইবে না। ঐ উপন্যাস—মহাকাব্য, নাটক, গীতিকাব্য প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই এক রাসায়নিক সৃষ্টি। তাহা বাস্তব-অবাস্তবের ভেদ মানে না, অর্থাৎ তাহা উৎকৃষ্ট কাব্য ও উৎকৃষ্ট সৃষ্টি—মানবজীবনের কাহিনীর উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য। বঙ্কিমের পরে রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসে আদর্শবাদেরই প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। 'পঞ্চভূতে'র 'মনুষ্য'-প্রবন্ধে dignity of man as a man-এর মাহাত্ম্য ঘোষণা করিলেও তিনি একজন অতি উচ্চ আদশবাদী। রবীন্দ্রনাথ 'ব্যক্তিমানুষে'র পরিবর্তে মনুষ্যত্বেরই জয়গান করিয়াছেন। 'তাঁহার কল্পনাশক্তির মূলে আছে—অন্তর ও বাহির, ভাব ও বস্তু, চিন্তা ও অনুভূতির সংগতিমূলক এক অপূর্ব গীতি-প্রবণতা'। এই গীতিপ্রবণতা জীবনের অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ প্রকাশগুলিকে, অতিসাধারণ মানবচরিত্রকেও অসাধারণ মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। 'মানুষ যত ক্ষুদ্র হউক, সে যতই দরিদ্র বা অশিক্ষিত হউক তাহার মধ্যেও মানবাত্মা আছে, তিনি তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়াছেন।' তাই গল্পে-উপন্যাসে কোথাও

বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্যায়

তিনি মানুষের গ্লানি বা চরিত্রহীনতাকে বড় করিয়া দেখেন নাই, বরং অতিশয় তুচ্ছকেও সত্য ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। অতএব, রবীন্দ্রনাথও আদর্শবাদী। যুগের অধর্ম ও অন্যায়, অশক্তি ও অপ্রেমের বাস্তব দৌরাত্ম্য, সকল অনাচার-অবিচারের ঊর্ধ্বে তিনি সত্য ও সুন্দরের আদর্শকে সখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। "আমাদের দেশের নারী-পুরুষে, বালক-বালিকা

ও শিশুর মুখে যে এত সৌন্দর্য আছে, আমাদেরই নিভৃত পল্লীকুটিরে গৃহপরিবারের তুচ্ছ জীবনযাত্রায় যে এত গভীর হৃদয়োৎকণ্ঠা 'মনের মোহের এমন মাধুরী' লুক্কায়িত আছে তাহা আমরা ইতিপূর্বে জানিতাম না।" রবীন্দ্রনাথই বাঙ্গালী জীবনের অখ্যাত ও অপরিচিত কোণগুলিকে অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। বঙ্কিমের কবিকল্পনা বাস্তবের পাশ কাটাইয়া রসের সন্ধান করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ ঐ বাস্তবকেই অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। অতঃপর শরৎচন্দ্রে এই বাস্তবের সমস্যাই অতিশয় জটিল হইয়া উঠিয়াছে—গভীর হৃদয়ানুভূতির প্রবল আবেগে কোন-কিছুকে তিনি যেন ঠিক তাহার মত করিয়া দেখিতে পারেন নাই, অনেক বড় করিয়া দেখিয়াছেন। মানুষের দুঃখকে যতটুকু দেখিয়াছেন, তাহার চেয়ে তিনি বেশি উপলব্ধি করিয়াছেন। অতএব, অতিসাধারণ জীবনযাত্রা, দুঃখের অতিশয় বাস্তব চিত্র, এমন কি, নীতি-বহির্ভূত জীবনকেও তাঁহার উপন্যাস-গল্পে স্থান দিয়াছেন বলিয়াও তিনি 'রিয়ালিষ্ট' নহেন। উপন্যাসের এই পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে Idealism-এরই ত্রিমূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। রবীন্দ্রনাথের সময়ে প্রভাতকুমারের গল্প-উপন্যাসে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্নিগ্ধ বাস্তবতার সন্ধান পাই। তিনি জীবনকে কোন নূতন দিক হইতে দেখেন নাই—একটি সহজ সরল আনন্দে ও সহৃদয় কৌতুকহাস্যে উহাকে বিমণ্ডিত করিয়াছেন।

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ভিন্ন খাতে বহিতে শুরু করিয়াছে। সাদা চোখে বাস্তবের সঙ্গে বোঝাপড়া আরম্ভ হইয়াছে। ইহা বাংলা উপন্যাসের দ্বিতীয় যুগ। এই যুগে লিখিয়াছেন অনেকেই। ইহাদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ শক্তির সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি প্রাতিভ দৃষ্টি—এই দৃষ্টির বলে যে-সমাজের জীবন তাঁহার গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য হইয়াছে, তাহার তলদেশের নিগূঢ় রসধারাকে তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। সেই জীবনে মেধ্য-অমেধ্য, শুচি-অশুচি, সুন্দর-অসুন্দর, উচ্চ-নীচে ভেদ নাই; জীবন একটা নূতন রূপে রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার যে বাস্তব, তাহা বাস্তবভেদী গভীরতর বাস্তব। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের গভীরে প্রবেশ না করিয়া, মনুষ্যহৃদয়ের অতলস্পর্শ রহস্য সন্ধান না করিয়া, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যে অদৃষ্টপূর্ব পটদৃশ্যের ছবিতে তাঁহার কাব্যধর্মী মনকে খেলাইয়াছেন। জটিল মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, ভাব-বিপ্লবের জয়গান তাঁহার উপন্যা[সে] নাই। মোটের উপর, পরিবেশ-পটভূমির শান্ত স্নিগ্ধ মধুর রূপই তাঁহার উপন্যাসের আকর্ষণীয় সামগ্রী। উদারনৈতিক সমাজতন্ত্রবাদী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে বামমার্গীয় চিন্তাধারার স্বচ্ছ সাবলীল রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতের দিকে তাঁহার

বাংলা উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্যায়

লক্ষ্য নাই, নিছক বর্তমানই তাঁহার লক্ষ্য। বহির্মুখী তন্ময়মূলক মন লইয়া মানুষের সুখদুঃখ, হাসিকান্না দেখিয়া বেড়ানোই তাঁহার কাজ। কেবলমাত্র বুদ্ধিনিষ্ঠ কৌশলে স্বাতন্ত্র্যবাদকে ফুটাইয়া তোলার ব্যাপারটিও তাঁহার লেখায় অত্যন্ত স্পষ্টীভূত। আবেগের অবদমন ও স্বতঃবৃত্তির সাহায্যে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা--ইহাই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য। মনোজ বসুর লেখাতেও আধুনিক সমানাধিকারবাদ সমস্যা, সামাজিক সমস্যার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যলেশহীন রাজনৈতিক রচনা করিয়া সন্ত্রাসবাদী যুগের এক আলোকজ্জ্বল চিত্র রচনার ব্যাপারে মনোজ বসু উপন্যাস-সাহিত্যের একটা নূতন দিক খুলিয়াছেন বটে! উপন্যাস ইতিহাস —এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে অবশ্য তাঁহার লেখা রাজনৈতিক উপন্যাসের সার্থকতা স্বীকার্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রগতিশীল ঐতিহ্যমুখী মনের ছাপ পাওয়া যায়। অসহায় মানবতা, শোষিত ও নিষ্পেষিত জীবনের ছবি, বিচিত্র মনোবৃত্তির চরিত্রবিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি—এসব ব্যাপারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিভার পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। মণীন্দ্রলাল বসু, রমেশচন্দ্র সেন, 'বনফুল' নামে পরিচিত ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, জগদীশ গুপ্ত, সুবোধ ঘোষ, প্রবোধকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, অচিন্ত্যকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, অন্নদাশংকর রায়, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, সুশীল জানা প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ-বা প্রচুর ও সুবৃহৎ উপন্যাসই রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের প্রতিভা মূলতঃ ছোট-গল্প লিখিয়েরই। প্রত্যেকেই দু' একখানা ভাল উপন্যাস লিখিলেও, অধিকাংশ উপন্যাসই স্ফীতোদর ছোট-গল্প মাত্র।

বাংলা উপন্যাসের এই দ্বিতীয় যুগে হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানির ন্যায় কোন কোন ঔপন্যাসিকের এক-আধখানি উপন্যাস পাঠকের নজরে বেশি করিয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতায় পর্যায়ের কতিপয় বিশিষ্ট উপন্যাস

যাযাবর রচিত 'দৃষ্টিপাত' বইখানি রিপোর্টের ভঙ্গীতে দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটের পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রা লইয়া লিখিত। সাহিত্যের শাশ্বত মূল্যবোধের কোন উপকরণই তাহাতে নাই। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসখানিতে রাজনৈতিক পরিবেশে ...ত পারিবারিক কয়েকটি চরিত্রের জীবনাদর্শ বিশ্লেষিত হইয়াছে। আঙ্গিকের নূতনত্ব ও বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ সবিশেষ লক্ষণীয়। অতীন্দ্রনাথ বসুর 'বি কেলাসে'র আদর্শগত আবেদন আমাদের মনকে টানিয়া লইয়া যায় গভীর সহজিয়া মানবধর্মের দিকে। অমরেন্দ্র ঘোষ রচিত 'চর কাশেম' বইখানির পটভূমি-সংরচন, চরিত্রবিশ্লেষণ বিষয়বস্তুর বাস্তবতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত জনপ্রিয় 'পদ্মা নদীর মাঝি'

উপন্যাস হইতেও অধিকতর মনোজ্ঞ। এই উপন্যাস দুইখানিতে পূর্ববঙ্গের নিসর্গপ্রকৃতি ও মানবজীবনের এক খণ্ডাংশের ভাষাচিত্র চমৎকার ফুটিয়াছে। বিমল মিত্রের 'সাহেব-বিবি-গোলামে'র মধ্যে সেকালের ও একালের কলিকাতা-জীবনের যে মনোমদ কৌতূহলোদ্দীপক জীবন্ত আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে, তাহা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। দীপক চৌধুরীর 'পাতালে এক ঋতু' ও রাজনৈতিক শতরঞ্চের খেলায় যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতি রচনা করিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব-পাকিস্তানে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এখনও অবধি কোনও লেখক পরিপূর্ণ সার্থকতা দাবি করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু অদূর-ভবিষ্যতে কোন কোন রচয়িতা যে সাফল্যমণ্ডিত হইবেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। 'আনওয়ারা'-রচয়িতা নজিবর রহমান ও 'আবদুল্লাহ্'-রচয়িতা কাজি ইমদাদুল হকের মধ্যে উপন্যাস-প্রতিভা পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া, 'মোমেনের জবানবন্দী'-লেখক মাহবুবউল আলম, 'সত্যাসত্য'-লেখক আবুল মনসুর, 'বনী আদম'-রচয়িতা শওকত ওসমান, 'লাল শালু'-রচয়িতা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা উপন্যাস

অতঃপর অতি আধুনিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্য অর্থাৎ বাংলা উপন্যাসের তৃতীয় যুগে জীবন ও জগতের অতি রূঢ় ও নির্মম বাস্তবকে রসসৃষ্টির অধীন করিবার জন্য একটা কঠিন পরীক্ষা চলিতেছে। এই পরীক্ষার ভাব অপেক্ষা অভাব, সুন্দর অপেক্ষা কুৎসিত, আত্মা অপেক্ষা অনাত্মারই জয়ঘোষণা দেখা যায়। তথাপি আত্মভাবমুক্ত হইয়া, স্বকীয় অভিপ্রায় বা ভাবের উচ্ছ্বাসকে সবলে দমন করিয়া যদি প্রত্যক্ষ বাস্তবকে তদ্‌ভাবে দেখা ও দেখানো যায় এবং তাহাতে সার্থক রসসৃষ্টি সম্ভব হয়, তাহা হইলে বাংলা কথাসাহিত্যে যে এক অভিনব সম্পদের গৌরব অর্জন করিবে এবং রসিকচিত্তও নিশ্চয় নূতনতর রসের আস্বাদনে তৃপ্ত ও আশ্বস্ত হইবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য।

বাংলা উপন্যাসের তৃতীয় পর্যায়—শেষ কথা

## বাংলা ছোট-গল্প

গল্প বলা ও গল্প শোনা—ইহা তো প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে চলিয়া আসা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। মানুষের মাঝে রহিয়াছে গল্পশ্রবণপিপাসু এক চিরকিশোর মন। ভাষাও যখন পুরোপুরি সৃষ্টি হয়নি, তখনই মানুষের মুখে প্রথম ধ্বনিত হয় গীতিকবিতা, তারপরেই শুরু হয় গল্প বলা। শোনা যায়, চতুর্দশ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশর দেশে গল্প প্রচলিত ছিল। চৈনিক সভ্যতাও খুব প্রাচীন—সেখানেও কোন্ সেই অতীত কাল হইতে গল্প করিবার রীতি চলিয়া আসিতেছে। *'Old Testament,' 'The Apocrypha'* *'The New Testament'* ও *'The Talmud'*-এতে বাইবেলী যুগের গল্পকথার সন্ধান

পাওয়া যায়। হোমারীয় যুগে গ্রীকেরা ও সীজারীয় যুগে রোমকেরা অত্যন্ত গল্পপ্রিয় ছিল। আবার আমাদের মহাভারত ও পুরাণের উপাখ্যানসমূহ, বৃহৎকথার উপকথাবলী, জাতকের ও পঞ্চতন্ত্রের কথাসমূহ—এসবই লোককথার সাহিত্যিক রূপ মাত্র। পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ সারা য়ুরোপে একদা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু পুনরভ্যুত্থান-যুগে ইতালীতে বকাচিওর নেতৃত্বে নব উপকথা-সাহিত্য রচিত হয়। আদর্শ ধর্ম ও প্রীতির বালাই না থাকিলেও, রক্তমাংসের মানুষের কথা লিখিয়াও যে আর্ট সৃষ্টি করা যায়—এই সত্যের প্রথম আবিষ্কর্তা বকাচিওই। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-নিরানন্দের উৎস যে মানুষেরই মধ্যে নিহিত এবং তাহা দৈবশক্তির অনুরাগ-বিরাগ-নিরপেক্ষ—ইহাই বকাচিওর ফিলজফি। বকাচিওর এই প্রভাব য়ুরোপীয় সাহিত্যে বেশ কিছু দিন চলিবার পরে উপন্যাসের প্রভাবে পড়িয়া হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর আধুনিক ছোট-গল্পের আদর্শ রূপের জন্মদাতা হইলেন ফরাসী সাহিত্যিক প্রস্পের মেরিমে ও রুশ্-কবি পুশ্‌কিন। মেরিমের পরই নাম করা যায় আলফঁস্ দোদে ও গী দ্য মোপাসাঁর। মোপাসাঁর ছোট-গল্পে বিষয়বস্তুর যে অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য এবং ভাষার যে শক্তিমত্তা ও সৌন্দর্য দেখা দিয়াছিল তাহার প্রভাব শুধু যে য়ুরোপীয় সাহিত্যেও দেখা দিয়াছিল তাহা নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা ছোট-গল্পের রূপরেখাতেও রঙ ফলাইয়াছিল। আপন অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতির সাহায্যেও যে ছোট-গল্প নামে এই নবকথা রচনা করিতে পারা যায় এবং ইহাও যে এক উচ্চ শ্রেণীর আর্ট-কৃতিত্ব—এই ইঙ্গিতটিই মোপাসাঁর সৃষ্টিতে মেলে।

গোড়ার কথা

ছোট-গল্পের বিষয় বা Content-এর মূল্য যতটা, তাহার চেয়ে Form বা রসরূপের মূল্য অনেক বেশি। ছোট-গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্যও যেমন আছে তেমনি আছে আর্টেরও রকমফের। ইহা চিত্রও হইতে পারে, আবার সংগীতও হইতে পারে। কাহারও কাহারও ধারণা, নাম যখন 'ছোট-গল্প' তখন একাধারে গল্প এবং আকারে ছোট হওয়া তো চাইই। বলা বাহুল্য, কতখানি ছোট হওয়া উচিত—তাহা লইয়াও সাহিত্যিক-মহলে গবেষণার অন্ত নাই। এই চুলচেরা হাস্যকর তর্কের মধ্যে যাইবার প্রয়োজন নাই। আসল কথা, ছোট-গল্পের পরিসর ঠিক করিয়া দিলেই কি আর লেখার Form বা রসরূপ শেখানো যায়! শ্রীযুক্ত সমরসেট্ মম্ বলিয়াছেন—'I wanted to write stories that proceeded tightly knit, in an unbroken line from the exposition to the conclusion. I saw the short story as a narrative of a single event, meterial or spiritual, to which by the elimination of everything that was not essential

to its elucidation a dramatic unity could be given, In short, I preferred to end my short stories with a full stop rather than with a straggle of dots. From the familiarity with Maupassant that I gained at an early age, from my training as a dramatist and perhaps from personal idiosyncrasy, I have, it may be, acquired a *sense of form* that is pleasing to the French'.

ছোট-গল্পের মর্ম-পরিচিতি

এই Form বা রসরূপ সৃষ্টিমূলক রচনামাত্রেই, সে এখন বড়ই হোক্‌ কি ছোটই হোক্‌, প্রতিটি ক্ষেত্রেই থাকে। ছোট-গল্পের বেলাতেও এই রসরূপ রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা দেয় আর ইহারই প্রয়োজনে, ইহারই ফলে, একটা গাঁথুনির অনিবার্যতা দেখা দেয়ই। এই রসরূপই ছোট-গল্পের আত্মা আর 'টেক্‌নিক্‌' জিনিসটি তো বাইরেকার কলকৌশল। আগে রসরূপ আর তাহাকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজনেই তো পরে 'টেক্‌নিক্‌' বা কলকৌশলের প্রয়োজন। ছোট-গল্পও এক জাতের কথাশিল্প, তবে ইহাতে উপন্যাস নাটক বা মহাকাব্যের ন্যায় পটভূমি এবং কালের বিস্তার নাই, চরিত্র এবং ঘটনারও বাহুল্য নাই। পক্ষান্তরে, উহারই একটা খণ্ড রূপকে এমন একটি বিশেষ সংস্থানের, বিশেষ ঘটনার, বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে ব্যঞ্জনামধুর রসঘন করিয়া তোলা হয় যে, আমাদের এই জীবনের বিরাট্‌ চত্বরে যে সমস্ত অবহেলিত, অনাদৃত, অনাবিষ্কৃত, স্বল্পদীপ্ত দিক রহিয়াছে, তাহারা তীব্র-চকিত আলোকে আলোকিত হয়। ছোট-গল্পের ইহাই রসরূপ। আর ইহারই ফলে কখনও কৌতুক, কখনও বিস্ময়, কখনও-বা একটা ক্ষণিকের ভাববিহ্বলতা আমাদের হৃদয়বীণার সুপ্ত তন্ত্রীতে ঝংকৃত হইয়া উঠে। এমনি ভাবেই ছোট-গল্পের রসপরিমাণ সঞ্চারিত হয় আমাদের মনে। ছোট-গল্পের এই মুখ্য দিক অর্থাৎ রসরূপের প্রয়োজনেই গৌণ দিক অর্থাৎ Mechanism তথা বহিরঙ্গ কলকৌশল বা গাঁথুনির যত-কিছু বৈশিষ্ট্য। অতএব মোট কথাটি দাঁড়ায় এই যে, একটি ছোট পটভূমি, একটি চরিত্র (অবশ্য অপরাপর চরিত্রও থাকিবে, তবে তাহা ঐ ক্ষুদ্র পরিসরেরই অন্তর্ভূত), একটি নাটকীয় পরিণামে গল্পের পরিসমাপ্তি—ইহারই জন্য যত-কিছু আয়োজন, যত-কিছু উপাদান-বিন্যাস। এমন কোন কথা, এমন কোন বর্ণনা থাকে না, যাহা চূড়ান্ত ফলশ্রুতির পক্ষে অনাবশ্যক।—ইহাই ছোট-গল্পের আদর্শ। যে ছোট-গল্প এই আদর্শের যতটা নিকটবর্তী, তাহা ঠিক ততটাই সার্থক। টুর্গেনিভের উক্তিকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, বনপথ দিয়া যাইবার কালে কোন লোককে বাঘে তাড়া করিলে তাঁহার যেমন বনের ফুল আর লতাপাতার সৌন্দর্য-মাধুর্য উপভোগ করিবার সময় থাকে না,

কেমন করিয়া আশ্রয়স্থলে গিয়া পৌঁছাইবে ইহাই থাকে যেমন তাহার প্রাণপণ প্রয়াস, ছোট-গল্পের রচয়িতাও ঠিক তেমনি একটিমাত্র ঘটনার পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লেখনী চালনা করেন।

বাংলা ছোট-গল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই আদি রচয়িতা। 'লিরিকে'র মত ছোট-গল্পের রসরূপের সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভার একটা স্বাভাবিক সংগতি বিদ্যমান।

ছোট-গল্পে রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু তাই বলিয়া কবিকল্পনার প্রবলতা লইয়া তিনি ছোট-গল্প রচনা করেন নাই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়া নিজস্ব রচনাকৌশলে তিনি ছোট-গল্প লিখিয়াছেন। ইহার প্রেরণামূলে আছে—

'ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ-কথা
নিতান্তই সহজ ও সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি,
তাহারই দু'চারিটি অশ্রুজল;
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ,
অন্তরে অতৃপ্তি র'বে সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।'

তবে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোট-গল্পই অতিপ্রবল ভাবদৃষ্টিহেতু গল্পায়িত লিরিকই। তাঁহার লেখা 'কাবুলিওয়ালা', 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পে ব্যক্তিমানুষের চরিত্র মুখ্য নয়—মানবহৃদয়ই মুখ্য, বহির্বিশ্বের ঘটনা প্রধান নয়—চিত্তাকাশের বিদ্যুৎ-বিলাসই প্রধান। প্রকৃতি ও মানবমনের নিবিড় সম্বন্ধ লইয়া যতগুলি গল্প তিনি লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 'অতিথি'ই সর্বশ্রেষ্ঠ। 'নষ্টনীড়' গল্পটি তাঁহার লেখা প্রেমের গল্পগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত। 'একরাত্রি', 'শুভা', 'দুরাশা', 'সমাপ্তি', 'কঙ্কাল' প্রভৃতি গল্পে ঘটনা-চরিত্র-পরিবেশ-সমাপ্তির গাঁথুনি ততটা নিখুঁত না হইলেও, ইহাদের অন্যবিধ স্বরূপ থাকায় যে নাটকীয় পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে তাহাতেই উহারা হইয়াছে রসঘন।

রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্প লিখিবার সময়ে যাহারা বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগে প্রথম প্রয়াসী হন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারীর গল্পের নাটকোচিত Climax ও নগেন্দ্রনাথের গল্পের সুখপাঠ্যতা ও চমৎকারিত্ব সবিশেষ লক্ষণীয়। শরৎচন্দ্র ছোট-গল্প বেশি লিখেন নাই। কেন না—বড় উপন্যাসই তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত বাহন। শরৎচন্দ্রের এমন কয়েকটি ছোট-গল্প আছে, যাহাদিগকে 'সংক্ষেপিত উপন্যাস' বলা যায়। 'আঁধারের আলো', 'পথ-নির্দেশ', 'কাশীনাথ', 'আলো ও ছায়া,' 'অনুপমার প্রেম' প্রভৃতি ছোট-গল্পের আখ্যানভাগ তো উপন্যাসোচিত। অবশ্য 'সতী' গল্পটির মাঝে সার্বজনিক আবেদন থাকায়, উহা বিশ্বসাহিত্যের

শ্রেষ্ঠ গল্পের সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটির মত খুব কম গল্পই বিশ্বসাহিত্যে আছে, যাহার মাঝে অনুরূপ বিস্তৃতি ও নিবিড়তার সাক্ষাৎ মেলে। 'মহেশ' গল্পটিকে আধুনিক কালের গণসাহিত্যের ভিত্তিস্থানীয় বলিয়াও মনে করা হইয়া থাকে। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পেও ছোট-গল্পের রসরূপ ও বহিরঙ্গ কলকৌশল পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান;

রবীন্দ্রযুগের ছোট-গল্প —একটি ধারা

অবনীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পে অদ্ভুত কল্পনার ছোঁয়াচ্ পাওয়া যায়। বাণীভঙ্গীর দরুণ রূপকথা বলিয়া মনে হইলেও রূপকথা নয়—ঘটনাটি বাস্তবই, এমন গল্প অবনীন্দ্রনাথ অনেকই লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখা 'হীরা-কুনি' গল্পটির কথা এই প্রসঙ্গে মনে করা যাইতে পারে। চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'মরমের কথা' গল্পটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার লেখা ছোট-গল্পগুলি আকারে বড় হইলেও বিষয়বস্তু ও চরিত্রগঠনের বৈচিত্র্যহেতু পাঠকমন আকর্ষণ করিয়া থাকে। অতি নগণ্যতম ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াও যে সার্থক গল্প রচনা করা যায়, তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় মেলে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর গল্পাদিতে। প্রেমাঙ্কুরের রচনায় প্রচ্ছন্ন হাস্যরসাবেগ থাকিলেও করুণরস আছে। তাঁহার গল্পগুলিতে ছোট ছোট লোভ, মনস্তাপ প্রভৃতি মানস ভাবতরঙ্গ কেমন সুন্দর ভাবেই না ফুটিয়াছে। মণীন্দ্রলাল বসুর ছোট-গল্পের প্রাণ-সম্পদ হইতেছে ভাষার মনোহারিত্ব, পরিবেশ-সৃষ্টির অভিনবত্ব ও বর্ণনাভঙ্গীর লঘুগতি।

রবীন্দ্রযুগের ছোট-গল্প আর একটি ধারাও লক্ষ্য করা যায়। একদা Barret H. Clark বলিয়াছিলেন,—'Short story is a tale which holdeth children from play and old men from chimney corner.' ছোট-গল্পের এই সংজ্ঞাটি যদি মানিয়া লওয়া যায় তো প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গল্পই এই দিক দিয়া সার্থক। প্রভাতকুমারের গল্প হাস্যরসের উচ্ছল ধারায় ঝলমল। সাদাসিধে

রবীন্দ্রযুগের ছোট-গল্প —অপর ধারা

নিরাড়ম্বর ভাষায় তিনি মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। জীবনের যে খণ্ডাংশের যে চিত্রটুকু তিনি আঁকিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার পরিচয় সুনিবিড়—সবটুকুই সুসমঞ্জস রসে টলটল। আবার প্রভাতকুমারের এমন অনেক গল্পও আছে, যাহাদের মধ্যে করুণরসের সন্ধান মিলে। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প যে হাস্যরস আছে, তাহা একান্তভাবেই ঘরোয়া। রাজনীতি দর্শন মননশীলতা অথবা যুক্তির জটিলতায় তিনি গল্পের সাবলীল ভঙ্গীকে বা পরিবেশকে ভারগ্রস্ত করিয়া তোলেন নাই। ঘটনার রস কম হইলে কথায় রস ঢালিয়া অথবা রস না দিতে পারিলে ঘটনার মধ্যে অসংগত 'টাইপ' সৃষ্টি করিয়া প্রহসনের পরিস্থিতি রচনা করাই তাঁহার লক্ষ্য। পরশুরামের লেখা 'গড্ডালিকা' ও 'কজ্জলী' বই দুইখানি বঙ্গসাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ। ভাষার ঔজ্জ্বল্যে,

শব্দের গমকে, দরদী পর্যবেক্ষণশক্তিতে, সহজ ঘটনা-বিন্যাসে তাঁহার প্রতিটি গল্পের হাস্যরস স্বতঃস্ফূর্ত। বস্তুতন্ত্রবাদী সমাজসচেতন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিজ্ঞানী মন, উদ্দেশ্যমূলক প্রয়াস পরশুরামের গল্পে পাওয়া যায়; কিন্তু সর্বত্র তিনি তাঁহার বক্তব্যকে প্রচ্ছন্নরূপে রসাত্মক প্রতিক্রিয়ায় ফেলিয়া রসাল স্বভাবোক্তি রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বীরবলের গল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'গল্প-সাহিত্যে তিনি ঐশ্বর্য দান করিয়াছেন। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে মিলেছে তাঁর অভিজাত মনের অনন্যথা, গাঁথা হয়েছে ভাষার শিল্পে।" গল্প বলিবার একটি নিজস্ব ভঙ্গিমায়, বলিষ্ঠ ও সূক্ষ্ম রেখাপাতে, হিউমার ও উইটের স্পর্শে বীরবলের গল্পগুলি যেমন প্রাঞ্জল তেমনি রসঘন। অতি তুচ্ছ ঘটনা অথবা মিথ্যা কাহিনীর উপরে স্থাপিত হইয়াও যখন কোন গল্প সত্যের মত খাঁটি বলিয়া প্রতীয়মান হয়, মানবমনকে রসায়িত করে, তখনই তো সত্যকার আর্টিষ্টের পরিচয় এবং বীরবল এই ধরণেরই আর্টিষ্ট। সমাজ এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখক্লেশের মধ্যে ব্যথাবেদনার ভিতরেও যে হাস্যরসের পরিবেশ আছে, এই সামগ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নজর এড়াইয়া যায় নাই। অবশ্য গল্পবিশেষে হাস্য-রসের সঙ্গে শ্লেষাত্মক ইঙ্গিতেরও রাখীবন্ধন হইয়াছে। অতি নগণ্য সামান্য ঘটনাও নিরাড়ম্বর অল্প কথায় রসায়িত হইয়াছে তাঁহার গল্প-গ্রন্থাদিতে।

**কল্লোল-গোষ্ঠীর ছোট-গল্প**

পর-রবীন্দ্রযুগে যাঁহাদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন অধুনালুপ্ত 'কল্লোল' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। এই বিদ্রোহী সাহিত্যিক-দল য়ুরোপীয় আদর্শে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে নূতন ভাবধারা সঞ্চারিত করেন, তাহারই প্রভাবে শুরু হয় পরবর্তী কালের সাহিত্যের জয়যাত্রা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্পাদির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক সংগ্রাম ও সমাজ-জীবনের প্রতি একটা দরদী দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। তবে অন্তর্মুখী একটা বলিষ্ঠ অহংসর্বস্ব ভাবও তাঁহার গল্পাদিতে আছে। সাম্প্রতিক কালে অচিন্ত্যকুমারের গল্পে সৌন্দর্যবিলাসের চেয়ে বুদ্ধিবিলাসেরই আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। জনপ্রিয় লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল জীবনের খণ্ডাংশ লইয়া অনেক গল্প লিখিলেও, তাহাকে সমগ্র রূপে দেখিবারও একটা প্রয়াস তাঁহার মধ্যে আছে; রুচিজ্ঞানে তিনি উদারপন্থী। শৈলজানন্দ তাঁহার গল্পের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এমন একটি স্তর হইতে, যে স্তরটি সামাজিক আর্থিক মানসিক সর্বদিক হইতেই নিষ্পেষিত। কোল, ভীল, সাঁওতাল, কুলি, মুটে, মজুর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে হইতেই তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহার গল্পের মালমসলা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, গঠনকারুকলার বৈশিষ্ট্য, উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্ম আছে। মুন্সীয়ানা ও অদ্ভুত রঙের লেখা—এই দুইটি সামগ্রীতে প্রেমেন্দ্র প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেই হয়। ব্যক্তিগত জীবনের Frustra-

**tion**কে **Universalised** করিয়া প্রকাশ করাতেই প্রেমেন্দ্রের সার্থকতা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে যেমন পাওয়া যায় বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক মনের বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্য, জগদীশ গুপ্তের গল্পেও তেমনি পাওয়া যায় মানুষের বিকৃত মনস্তত্ত্বের প্রকাশ। বুদ্ধদেব বসু মূলতঃ প্রগতির সমর্থক। সচেতন মন ও সরল দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যানুসারী সমাজধারার সদসৎ দিক, তাহার পরিবেশগত আবহাওয়া জটিলতা এবং আদর্শকে তাঁহার গল্পের মধ্যে সরাসরি ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

সমাজ-সচেতন জাতীয়তাবাদী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট-গল্পগুলির মধ্যে প্রগতিমুখী দৃষ্টিভঙ্গী, যুগধর্মী মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রগতিশীল হইলেও দুর্গতিলেশহীন—তাঁহার গল্পরচনায় একটা বলিষ্ঠ প্রাণের সাড়া, একটা আশ্চর্যসুন্দর দূরদৃষ্টি আমাদের নজরে পড়ে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে দেশকালপাত্রকে গৌণ করিয়া পরিবেশ-রচনা ও চরিত্রাঙ্কন এমনভাবে হইয়াছে যে, পাঠকের মনের অবসাদ ঘুচাইয়া তাহাকে সীমার গণ্ডি হইতে টানিয়া লইয়া যায় সীমাতীতের দিকে। বনফুলের প্রায় প্রতিটি গল্পই আঙ্গিক, আবেদন ও পরিসমাপ্তির দিক হইতে সার্থক। পোষ্ট কার্ডের ভিতরেও ধরানো যায় এমন বহু সার্থক ছোট-গল্প তিনি লিখিয়াছেন। বনফুলের প্রতিভা মূলতঃ ছোট-গল্প রচনার পক্ষে অনুকূল—উপন্যাস-রচনার বেলায় তাঁহার লেখনী সংহতি-শূন্যতা, শিথিলতা, পুনরাবৃত্তি, অস্বাভাবিকতা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট। সুবোধ ঘোষের 'ফসিলে'র গল্পগুলিতে পরিবেশ-রচনার অভিনবত্ব, ভাববস্তু ও বিষয়বস্তুর নূতনত্ব, ভাষায় সরলতার সুসমন্বয় ছোট-গল্পের রসরূপ চমৎকার ফুটাইয়াছে। তীব্র দ্রুত প্রবহমানতা সুবোধ ঘোষের গল্পে আছে। সাধারণ আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রীতিই মনোজ বসুর গল্পের উপজীব্য। তাঁহার গল্পাদির বিষয়বস্তু এবং বাণীভঙ্গীর মধ্যে যেমন আছে বৈচিত্র্য, তেমনি আছে সংযম। অন্নদাশংকর রায়ের গল্প বুদ্ধিদীপ্ত, চিন্তাপূর্ণ—কিন্তু মানসতা ও বিশ্লেষণের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গল্পের কথাবস্তু ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোট-গল্পগুলি পটভূমিপরিবেশ রচনার বৈচিত্র্যে, বাণীভঙ্গীর নৈপুণ্যে, ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতায়, আধুনিক মনঃসমীক্ষণসম্মত রসপরিবেশনে, যুগচেতনার বৈশিষ্ট্যে অথচ যুগোত্তীর্ণতার আবেদন-মাধুর্যে সমুজ্জ্বল; ছোট-গল্পের রসরূপ বহিরঙ্গ ও কৌশলের দিক দিয়া তাঁহার বহু গল্পই সার্থক। আর একজন উদীয়মান শক্তিশালী ছোট-গল্প লেখকেরও নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ইনি নরেন্দ্রকুমার মিত্র গল্পের কথাবস্তু সংগঠনে, নাটকীয় পরিসমাপ্তিতে, আদ্যন্ত কৌতূহল রক্ষায় ইঁহার মুন্সীয়ানা সত্যই প্রশংসনীয়। ইঁহার ভবিষ্যৎ প্রকৃতই সমুজ্জ্বল।

**সাম্প্রতিক ছোট গল্প**

বাংলা ছোট-গল্প সাহিত্যে পূর্ব-পাকিস্তানের দানও অবিস্মরণীয়। বঙ্গবিভাগের

ফলে উত্তর বঙ্গের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন আসিয়াছে। নয়া রাষ্ট্রের নয়া চেতনায় উদ্বুদ্ধ জীবনে নয়া জমানার কথা ভাবিবার দিন আসায় পূর্ব-পাকিস্তানের কথাশিল্পীরা পূর্ববঙ্গের সমাজ-জীবনের চিত্র অঙ্কনে তৎপর হইয়াছেন। প্রবীণ কথাশিল্পী আবুলফজল 'জন্মান্তর' গল্পে মওলানাকে আঘাত হানিয়া মেহনতী মানুষে রূপান্তরিত করিয়াছেন। মাহবুব্ আলম কমল ঘরামি ও নবীনকে ব্যথার সায়রে অভিস্নাত করিয়াছেন। শওকত ওসমান ফরাজ আলীর জীবনকে বেগবতী গোমতী নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছেন। বুলবুল চৌধুরী চোরাবাজারীদের বস্ত্রহরণ করিয়াছেন 'আগুন' গল্পে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সামান্য তুলসীগাছকে ও আবুলকালাম সামসুদ্দীন একটি সড়ককে কেন্দ্র করিয়া নীচতলার মানুষের ব্যর্থ জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। মুনীর চৌধুরীও প্রাত্যহিক জীবনের বেদনাবিহ্বল কাহিনী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আবদুল হাইয়ের 'স্মাগ্লিং' গল্পটি মাতৃত্ব-মিশ্রিত এক মর্মবেদনার চিত্র। আতোয়ার রহমান পল্লী-পাঠশালার 'পন সাবে'র চরিত্রে এক দরদী শিক্ষাব্রতীর রূপটি চমৎকার ফুটাইয়াছেন। শক্তিধর কথাশিল্পী সুচরিত চৌধুরী যে গ্রাম্য কবিয়ালের জীবনটিকে কেন্দ্র করিয়া গল্প রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের রসধারা উৎসারিত হইয়াছে—বীরভূমের রুক্ষ লাল মাটির কবিয়াল এ নয়। এমনি ভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রবীণ ও নবীন কথাসাহিত্যিকগণ পূর্ববঙ্গকেই কলমের আঁচড়ে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই বাংলার কথাসাহিত্যে এক বিপুল সম্ভাবনাময় নূতনের ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ ইঙ্গিত বুঝিবা গণসাহিত্যেরই।

পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা ছোট-গল্প

বঙ্গসাহিত্যে ছোট-গল্পের অভাব নাই এবং এমন অনেক গল্প-সাহিত্যিকই আছেন যাঁহারা কিছু কিছু সার্থক গল্পও লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, সুশীল জানা, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, পৃথীশ ভট্টাচার্য, বিমল মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র ঘোষ, বাণী রায়, অমলা দেবী, আশালতা সিংহ, আশাপূর্ণা দেবী, রমাপদ চৌধুরী, বিভা মজুমদার, প্রতিভা বসু প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যায়। বাংলার সাহিত্যরসিক প্রতিভার মূল্য দিতে জানে, কিন্তু এখনও অনেকেরই প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ নজরে না পড়ায় শেষ কথা কিছু বলা চলে না।

শেষ কথা

# আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের প্রবণতা

গদ্যের আদর্শ সভ্যতার চরমাদর্শ। গদ্য সভ্যমনের পরম কীর্তি। অসংস্কৃত সমাজ বা অমার্জিত অজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারাও কাব্যসৃষ্টি সম্ভব। কারণ কাব্য ভাবনির্ভর। আর এ-ভাব বা আবেগের গভীরতা ও শক্তি সহজাত প্রবৃত্তি। বৃত্তির সংযমে ও চিন্তার

অনুশীলনেই গন্ত সৃষ্টি হয়। এ-দুটিতেই সভ্য মনের বিকাশ। আর এ মনের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে গন্তের বৈশিষ্ট্য। তাই গন্ত-রচয়িতা, বিশেষতঃ উপন্যাস ও গল্প-লেখক, যাঁদের সৃজনী-শক্তির কেরামতি দেখাতে হয় অহর্নিশ, তাঁরাই দায়িত্বশীল নিপুণ এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পী। 'Literature educates people, helps to live better .....।' সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি তাই হয়, তাহলে এহেন সাহিত্য আমাদের সাম্প্রতিক জীবনে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে তা নিয়ে ভাববার অবকাশ আছে বৈকি।

ভূমিকা

বাংলার গন্তসাহিত্য অনিবার গতি নিয়ে বৈচিত্র্যের দিকে প্রতিনিয়তই ছুটে চলেছিল চ'লতি শতাব্দীর চারের দশক পর্যন্ত। যুদ্ধোত্তর যুগেও সে-যুগের প্রতিচ্ছবিকে কেন্দ্র করে' কল্পনা ও ভাব-বিলাসের লীলাচাতুর্য বাংলার প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকদের কমবেশি প্রত্যেকেই দেখাবার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ ননী ভৌমিকের 'ধানকানার' নাম উল্লেখযোগ্য। নোতুন দৃষ্টিকোণ থেকে শুষ্ক আন্তরিকতার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করে' ওঁরা 'ভুক্তভোগীদের' বাহবা পেয়েছেন বটে। চিরন্তনী জীবনধারা থেকে বঞ্চিত এ-সাহিত্য যুগোত্তীর্ণ হতে পারে নি কিন্তু। সেকালের ঘটনাশ্রিত অনেক গল্প ও উপন্যাস আজকাল আমাদের হাতে আসে। এ-সব শুধু হতাশাবোধই জাগায় মনে।

যুদ্ধযুগের কাহিনী-আশ্রিত সাহিত্য

ফেলে-আসা দিনে ফিরে যাবার সাধ ইদানীং কেমন যেন বেড়েই চলেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসাশ্রিত এ-সব রচনা 'বৃহৎ জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠেনি'। ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্রের ভাষায় বলতে গেলে, 'এঁদের ইতিহাস-বীক্ষ্য যুগোচিত প্রগতিবোধের পরিচায়ক বলে' প্রত্যয় হয় না। প্রাণতোষ ঘটকের 'আকাশ-পাতাল' ও বিমল মিত্রের 'সাহেব-বিবি-গোলাম' পড়ে' বারবার এই কথাটিই মনে জাগে। বৃহৎকলেবর এই উপন্যাসদ্বয়ের আঙ্গিক, লিখনশৈলী, বর্ণনার ব্যঞ্জনা আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। মনে হয় দুটোই সার্থকভাবে বর্ণিত ঘটনা। কিন্তু এতে আমাদের কি লাভ হ'ল? দূর দিগন্তের পাঠকরা কি আমাদের সমসাময়িক জীবনের কোন চিত্র পেল এতে? 'ভারত-প্রেম-কথা'ই ধরা যাক্ না কেন—পবিত্র অমর প্রেমগাথা, ভাষা কত গুরুগম্ভীর ও দ্যোতনাময়, বলার ভঙ্গীও কি নোতুন নয়? তবু একটা সংশয়—পুরনো সবকিছু নোতুন করে জানলাম বা পেলাম সত্যি; কিন্তু নোতুন সংযোজনা কি পেলাম?......এদেশে ইতিহাস অণুবীক্ষণ যে তোড়ে বেড়ে চলেছে তাতে মনে হয় না যে লেখকরা অতি-সহজে নিরুৎসাহিত হবেন। তাই 'লালবাই' স্বকীয় বৈচিত্র্যে প্রশংসার দাবি রাখে। জীবনের অপরিবর্তনীয় কতকগুলো সমস্যাকে দক্ষ-হাতে লেখক রমাপদ চৌধুরী আবার আমাদের

ঐতিহাসিক উপন্যাস

চোখের সামনে তুলে ধরলেন। 'লালবাই'কে তো বিদগ্ধমণ্ডলী বা রসিক পাঠক কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারেন না।

স্বাধীনতা পাবার আগে শুধু স্বাধীন হবার মন্ত্র নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলেছি কালে। তখনও যে সাহিত্যে রাজনৈতিক দলাদলি বা পক্ষপাতিত্ব ছিল না তা বলা সত্যই বিভ্রান্তিকর। তবু বিগত গৌরবকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় দায়ে ঠেকে ঐক্যের রাখীতে জাতি চেয়েছে একে বাঁধতে। কত শিল্প ও সাহিত্য-চর্চা হয়েছে এ স্বাধীনতা-সংগ্রাম নিয়ে। প্রচারপত্র বা বিজ্ঞাপনের মতো শ্বেতাঙ্গবিরোধী কত গল্পও তো পেয়েছি আমরা। স্বাধীনতা পাবার সাথে সাথে কেন আমরা এগুলোকে বিস্মরণের খাদে তলিয়ে যেতে দেখেও নিশ্চুপ! এ সাহিত্যস্রষ্টার অনেকে তৎকালীন প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী ছিলেন। কিন্তু যুগাবসানের সাথে সাথেই বস্তুর-প্রতি-অতি-আস্থা এঁদের নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। গুণীজনের নিন্দা হয় পাছে তাই নামোল্লেখে সম্প্রতি বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে ভাবে দুঃখ হয় এমন লেখক আজও বেঁচে আছেন যাঁরা অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারতেন সাহিত্য-ভাণ্ডারে, কিন্তু সাহিত্যের ভিতরে রাজনৈতিক মতবাদকে অতিপ্রশ্রয় দিয়ে এতো একপেশে হয়ে পড়লেন যে, শেষে বৈচিত্র্যের দিকে এগোতেই পারলেন না। টলস্টয়ের মতে, সাহিত্য-জীবন এর চাইতে বড় বিড়ম্বনা আর বিকৃতি নেই। সাহিত্যিকেরাও আজ রাজনীতিতে দ্বিধা বিভক্ত। তাতে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে জীবনের দিকে তাকানো একপ্রকার দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক আদর্শবাদ

অথচ সমসাময়িক জীবনের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি না থাকলে সাহিত্য মাধুর্যমণ্ডিত হয় না। অপর পক্ষে নিরপেক্ষ শিল্পীর স্থান নেই আজকের বাংলা সাহিত্যে। যে কোন এক পন্থী বা মতাবলম্বী না হয়ে উপায় নেই। অন্যথা প্রতিভা যাবে শুধু ধারা-হারানো নদীর মতো শুকিয়েই। মর্যাদা বা প্রতিষ্ঠা কোনটাই পাবেন না তিনি। কিন্তু যে কোন একটা দলের আশ্রয়ে এলে আপনা-আপনি এসে ভিড় জমাবে প্রচারকের দল। প্রতিভা থাকুক আর নাই থাকুক, খ্যাতি তাঁকে সাকরেদরা পাইয়ে দেবেই দেবে। কিন্তু প্রতিভা ও খ্যাতি কি এক কথা? সাময়িক পত্রিকাগুলো অবশ্য একথা মানে না।

নিরপেক্ষশিল্পী

অবশ্য বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে, বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বাংলার আধুনিকতম সাহিত্যিকরা ইংরাজ সাহিত্যিক মমের ভক্ত। কিন্তু এঁরাও কি করে' শুধু যশোলিপ্সু হয়ে পাঠকের মনোরঞ্জন ও মনোহরণের দিকেই যত্নশীলতা দেখিয়ে ... বিরোধী কাজ করে যেতে পারছেন! তাতে সস্তায় কিস্তিমাৎ হ'ল বটে, কিন্তু

সজাগ পাঠক

স্বকীয়তাকে তো ঠকানো হ'ল! আজকাল তাই ক্ষোভ দেখা দিয়েছে পাঠকমহলে বিদেশী-সাহিত্য অধ্যয়নের দৌলতে তারাও একটু সজাগ, সমালোচক ও বিবেচক হয়ে উঠেছে। অতি সহজে আর ভোলে না। যাচাই করে' বই-পড়ার যুগে তাই লেখকদের আত্মানুসন্ধানে সচেষ্ট হওয়া উচিত। তখনই টের পাওয়া যাবে বই পড়ে' যাঁরা লিখতে শিখেছেন তাঁদের পক্ষে সত্যিকারের প্রতিভা-পরিচয়ের ক্ষেত্রে টিকে থাকা কত দুরূহ।

বাংলাকে সাহিত্যমাতৃক দেশ বলে' অভিহিত করা চলে। এ সাহিত্যমাতৃক দেশে হাল আমলে কয়েকজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁরা প্রত্যেকে খ্যাতি আর যশের দাবি রাখেন। তাঁরা যে একেবারে ত্রুটিহীন একথা কিছুতেই বলা চলে না। তবু সমরেশ বসু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের সম্ভাবনা বিপুল। সমরেশ বসুর বিষয়-নির্বাচনে অসাধারণ কৃতিত্ব আছে। আমাদের জীবনে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে আশ্রয় করে' কথার মারপ্যাঁচে কি সুন্দর জোরালো সিদ্ধান্ত তিনি উপস্থাপিত করেন! জটিলতর সমস্যা কথোপকথনের কারুকার্যে রূপকের আকার লয় তবে ভাষা সম্বন্ধে তিনি একটু অসাবধান। আর তাঁর রুচি ও যুগচেতনা তীক্ষ্ণ হলেও প্রতিশ্রুতি বহন করে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে বিনা দ্বিধায় ব'লতে হয় সার্থক শিল্পী। সমসাময়িক জীবনের স্বাদ তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর নায়ক-নায়িকারা অতি স্বচ্ছ ও শুভ্র। মধ্যবিত্ত সমাজকে অণুবীক্ষণ করার প্রতি তাঁর বেশি ঝোঁক। তাঁর 'বারো ঘর এক উঠোন' পড়ে' একথাই শুধু মনে হয় কিভাবে আজকের মধ্যবিত্ত সমাজ সামাজিক সংস্কারের চাপে আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু ভেঙ্গেচুরে যাচ্ছে! মানবহৃদয়ে তিনি ঢুকেছেন মনস্তত্ত্ববিদের মতো। অতল ডুব দিয়ে যা আহরণ করেছেন তাকে নোতুন সাজে পাঠক-অন্তরে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করেছেন। তবে একটু ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বলার পক্ষপাতী বলে তিনি পাঠ অতি পীড়াদায়ক। মোপাঁসার মতে, "লেখকদের তাঁদের জগৎকে যেভাবে খুশি অতিসুন্দর করার অধিকার আছে।" যুগরসিক হিসেবে গৌরীশংকর অধিক সার্থক 'এ্যানলার্ট হলে'র পর তাঁর 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' সত্যিকারের বলিষ্ঠ নির্বাচন ও লেখনী এবং নতুনত্ববোধের স্বাক্ষর রেখেছে। রাজশেখর বসু মহাশয় বলেন, "ইস্পাতের স্বাক্ষর' পড়ে মনে হয় আবার একটা উপন্যাস পেয়েছি হাতে।..." লেখকের গভীর অনুভূতি ও জীবনবোধকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। একটি কারখানার ? জীবন এছাড়া সার্থক হ'ত না—এই তাঁর অভিমত। তাঁর কাছ থেকে পরিবর্তনশী এ-পৃথিবীর আরো অনেক নিত্যনোতুন খবর পাবার প্রত্যাশা করি।

সাহিত্যমাতৃক বাংলা

এ ছাড়াও বাংলাদেশে আজ অনেক লেখক-যশোপ্রার্থীর ভিড় জমেছে। তাঁ

এ-প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। উপন্যাসশিল্প সাধারণতঃ পর্যবেক্ষণ-নির্ভর। তবে উপন্যাসের অগভীরতার কারণ ব্যঞ্জনাগুণের অপ্রতুলতা। আর এ-সত্য তরুণদের লেখায় যথেষ্ট বিদ্যমান। প্রসঙ্গক্রমে 'পূর্বপার্বতী'র কথা উল্লেখযোগ্য। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতে, "পাহাড়ী'দের জীবনেও যে ঘাত-প্রতিঘাত, বিচ্ছেদ-আনন্দ, প্রেম-ভালোবাসা আছে, প্রগতিবাদী স্বাধীন ভাবতে এর কথা নোতুন করে লেখক আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা অভিনন্দন-যোগ্য।" কিন্তু আমাদের মনে হয়, লেখক এ-পাহাড়ীজাতের সাথে অতি ঘনিষ্ঠ হতে পারেন নি, যার জন্যে তাঁর এ-সৃষ্টি একটা সস্তা-চমক ও নিছক চোখ-টাটানো যাদু। আজকালকার লেখকদের মধ্যে পরিবেশের প্রতি গভীর আস্থা খুব অল্পসংখ্যকেরই দেখা যায়। প্রেম মৃত্যুহীন, কিন্তু পরিবেশ নিত্য-পরিবর্তনশীল। তাই বাংলা সাহিত্যের সেবায় বহুল পরিমাণে আবেষ্টনীর দিকে নিবিষ্ট হওয়া উচিত।

তরুণ সাহিত্যিক

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ গল্প ও উপন্যাস পেলাম, তা অনুধাবন করে' এই মনে হল সাহিত্যিকরা দিন দিন মনস্তত্ত্ব-নির্ভরশীল হয়ে উঠ্‌ছেন। তবে ভাষার দিক থেকে তাঁরা ক্রমেই মার্জিত ও সরল হয়ে ওঠার চেষ্টা ক'রছেন। এটা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু মনস্তত্ত্ব ও আবহের সমন্বয়ে কি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মর্গ' সার্থক ও সুন্দর হয়নি? এটা কি একটা অপূর্ব শিল্প-সৃষ্টি নয়? ভাষার কথা ব'লতে গেলে সুবোধ ঘোষ, প্রেমেন মিত্র বা অন্নদাশংকর রায়ের ভাষা যাঁরা অনুকরণে ব্যাপৃত তাঁরা কৃতকার্য হলে সত্যিই প্রশংসিত হবার কথা।

স্বাধীনোত্তর বাংলা কথাসাহিত্য

প্রবীণদের মধ্যে যাঁরা লিখে চলেছেন, তাঁরা মাঝে মাঝে আমাদের গর্বান্বিত করেন। আবার এমন গল্পও দেখি যেগুলো হয়তো অবসর সময়ে অতীত-রোমন্থন। 'জলপায়রা'র লেখক কি 'পঞ্চশরে'র কোন প্রতিভার পরিচয় দিয়ে যেতে পেরেছেন এতে? মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষজীবনের 'শুভাশুভ' বা 'সার্বজনীন'-এ স্বাধীনতার পর আমাদের জীবনদর্শনে যে রূপ দেখা দিয়েছে তারই একটি সমস্যামুখর চিত্রায়ণ রয়েছে। তবে শেষজীবনের লেখা ক'টিতে ভাষা চারুত্বলেশহীন ও অপ্রসন্ন হওয়ায় পাঠে রসহানি ঘটেছে সকলের। বনফুল বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে' নিত্য-নোতুন ছন্দে মানব-হৃদয়ের সুখ ও দুঃখ, নৈরাশ্য ও ব্যথা ব্যক্ত করে চলেছেন। নোতুনের পূজারী তিনি। তাই তাঁর সাহিত্যে এ-যুগের ছাপ থেকে যাবে। তবে তাঁর বিজ্ঞান-চোখে যদি কিছুটা অধ্যাত্মবোধ মিশ্‌ত তাহলে বনফুল এ-যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হতে

প্রবীণ সাহিত্যিক

পারতেন। কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত তাঁর 'মহারাণী' উপন্যাস ও 'দুই-ভবন' গল্প পড়ে পাঠকরা অতি-আনন্দিত। তারাশংকর চিরকাল পরিবেশের প্রভাব কাটাতে পারেন নি। তাই গেঁয়ো ক'বরেজকে আঁকতে গিয়ে 'আরোগ্য-নিকেতনে' নিপুণ হাতে এঁকেছেন একটি গ্রামের ছবি এবং শিল্পবিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদের যুগে গ্রামে নোতুন সমস্যা ও সংকট। তাঁর 'সপ্তপদী'র মতো গল্প ও 'বিচারকের' মতো উপন্যাস আমাদের পুনরায় উৎসাহিত করে।...সন্তোষকুমার ঘোষ ইদানীং যখনই কল্পনাবিলাস-মুক্ত থাকেন, তখনই তাঁর গল্প অনবদ্য হয়ে ওঠে। 'কিনু গোয়ালার গলি' জনাতে গিয়ে কিন্তু তিনি পাঠকদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারেন নি। তাঁর কাছ থেকে যেন আমাদের আরও অনেক পাওনা ছিল। তথাপি এটুকু স্পষ্ট করে বলা চলে তাঁর প্রত্যেকটি গল্পে সুসংযত ও অল্পকথায় যুগচিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা রয়েছে। বারীন্দ্রনাথ দাশ 'বেগমবাহার লেনে' স্বাধীনতা পাবার পর ফিরিঙ্গিদের জীবনযাত্রা ও মানসিকতার স্বরূপপ্রকৃতির ব্যাখ্যা করে' তাকে পরিস্ফুট করার একটা আকাঙ্ক্ষা দেখিয়ে সর্বজনের প্রীতিভাজন হয়ে পড়েছেন। তাঁর বর্ণনা ও ভাষা যদি শিথিল না হ'ত তা'হলে আমরা আরও সন্তুষ্ট হতে পারতাম। আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের যাদুকর নরেন মিত্র। 'চেনামহলে'র লেখককে না চেনে এমন লোক বাংলাদেশে বিরল। তাঁর 'অঙ্গীকার' গল্প ও সদ্যপ্রকাশিত প্রায় সবক'টা উপন্যাসেই নারীজীবনের প্রগতির দাবিকে স্বীকার করবার প্রয়াস রয়েছে। 'মাধবীর জন্য'তেও প্রতিভা বসু একই চেষ্টা করেছেন। এদিক থেকে শান্তিরঞ্জন এবং সুধীরঞ্জনও ক্ষমতার কম কসরৎ করে যাচ্ছেন না। শেষোক্ত লেখকের বৎসরাধিক পূর্বে প্রকাশিত 'প্রদক্ষিণ' গল্পসংগ্রহ তাঁর ক্ষমতারই নিদর্শন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শিল্পী অতি-পরিচিত সুবোধ ঘোষ। 'চোখ-গেল' গল্পের লেখক কত সজাগ ও চিন্তাশীল আর ভাষার রাজা তো আছেনই। তাঁর লেখা 'পলাশের-নেশা' 'রূপসাগর' ইত্যাদি গ্রন্থপাঠে মানবহৃদয়ের খুঁটিনাটির নিখুঁত অনুশীলনের অনন্যসাধারণ ক্ষমতা দেখে পাঠক ও রসিক-মহল মুগ্ধ না হয়ে পারে না। এ-যুগের ছাপ আছে তাঁর প্রতিটি গ্রন্থে। তাছাড়া বুদ্ধদেব বসুর 'শেষ পাণ্ডুলিপি' যদিও অনেকটা রোম্যান্টিক তথাপি প্রতিশ্রুতিশীল। মদাচারী হয় মনের ক্ষোভে বা ক্ষত ভোলার জন্যে অনেকে—কিন্তু ভালোবাসার পটভূমিতে তার এক অত্যাধুনিক বাচনভঙ্গী ইঙ্গিতময়।

**অবধূত ও জরাসন্ধ-প্রসঙ্গ**

সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন হলেও বয়স হয়েছে অবধূতের। কালিকানন্দ অবধূত বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এক অপরিসীম বিস্ময়। জীবনভর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে' শেষে নেহাৎ পেটের দায়ে তাঁর 'মরুতীর্থ হিংলাজে' ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রতে শুরু করেন। এ-লেখা হঠাৎ তারাশংকরের চোখে পড়ে এবং ক'লকাতার 'তরুণের স্বপ্ন' মাসিকে ধারাবাহিকভাবে ছাপানো হয় এই উপন্যাস-ভ্রমণবৃত্তান্ত। নিতান্ত আকস্মিকভাবে বাংলা সাহিত্যে এসে

আকস্মিকভাবেই পাঠকের মন দখল করে বসেছেন সহসা। গঙ্গাতীরের এ সাহিত্যিকের 'বশীকরণ' ও 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' ভাষা এবং বর্ণনার দিক থেকে আরও মসৃণ ও সফল। সজনীকান্ত দাশ লেখক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'উদ্ধারণপুরের ঘাটে'র মুখবন্ধ বলেছেন, 'শ্মশান যে বাঙ্গালী জীবনে এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, একথা অবহিত হয়ে পূর্বে আর কোন শ্মশান-উপন্যাস লেখার চেষ্টা হয়নি বাংলা সাহিত্যে।' কেহ কেহ বলেন, এ-লেখাগুলো অতি-বাস্তব, কিন্তু সাংবাদিক ও সমালোচক-মহলের মতে, তিনি অতি কল্পনাবিলাসী। তথাপি এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, লেখক প্রতিভাবান। তাঁর সৃজনীশক্তির অসাধারণ স্বাক্ষর এই 'কলিতীর্থ কালীঘাট' ও 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'। 'বহুব্রীহি' গল্পগ্রন্থ হিসেবে অনেকখানি যুগোচিত চিন্তাধারাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছে। লেখকের জনপ্রিয়তা সাহিত্যিক অবধূতের ক্ষমতারই এক পরিচয়।...তবে জরাসন্ধের বিপক্ষে সমালোচক-সংখ্যা অতি অল্প। বহু-অভিজ্ঞ ও কারাগারে চাকরির প্রত্যক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন 'লৌহকপাট' সত্যই অমর-সৃষ্টি। কত জলন্ত ও বাস্তব আমাদের 'ফকির'! কতই বিশ্বাস্য পাপ-জীবনের প্রতিটি ঘটনা। সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ এর সংবেদনা ও মানবিক আবেদন। ফকিরের ফাঁসী আর দারোগার অশ্রুজল—এ দুইই রক্তমাংসের মায়াময় মানুষের সম্বল। তবে 'বশীকরণে'ও যে অধ্যাপক-স্ত্রী ও অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন লেখকের প্রাণের-টানের কথা (!) অবধূত সহানুভূতি ও সমবেদনার সাথে কম প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন তা নয়! তথাপি জরাসন্ধ যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যিক; যেহেতু তাঁর সৃষ্টি অপূর্ব।

এ-ছাড়াও বাংলার প্রবীণতম ও নবীনতম সাহিত্যিকদের অনেকের নাম করা যেতে পারে, যাঁরা প্রত্যেকে কমবেশি প্রতিভার অধিকারী। তবে এঁরা অনেকে পুরাতন-পন্থী ও নূতনত্ব প্রকাশে অসমর্থ বলে' আমাদের জাতীয় জীবনে এঁদের দাম খুবই অল্প।

উপসংহার

যেহেতু, 'Art is meant for life not for art itself.' একথা প্রত্যেক সাহিত্যিকের মনে রাখা কর্তব্য যে,—'the dream of writer in all ages is to defend man and society'। তাই সাহিত্যিকদের দায়িত্ব অধিকতর। জাতির জীবনের উন্নতি ও অবনতি এঁদের হাতেই পুরোপুরি। সাহিত্য যুগ ও জীবনের দর্পণ—একথা ভেবে প্রত্যেকের আপন শক্তি বিকাশের পথে উদ্দীপিত থাকা, এ সকলের প্রত্যাশা। তাই সাম্প্রতিক কালের লেখকদের মতো শুধু পশ্চিমী সাহিত্য অনুকরণ (যে অভিযোগ 'কল্লোলে'র বিরুদ্ধে এসেছিল) না করে' আমাদের জীবনধারার উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি করা কর্তব্য। কারণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনধারার মধ্যে মিল অতি অল্প। ওদের জীবনে 'মনুষ্যসৃষ্ট বাধা-প্রতিরোধক সংগ্রাম' অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। তাই পদে পদে আকস্মিকতা ও

অপ্রত্যাশিতের চমক। তাই নাটকীয়তার পরিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে ওখানে। এইজন্য 'য়্যাকশন' বা সংঘাত ওদের সাহিত্যের প্রাণ। কিন্তু শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনের লালস আমাদের। তাই শান্ত ও সুন্দরের উপাসক আমরা। কাব্যিক-দৃষ্টিই আমাদের জীবনের দৃষ্টি। সাহিত্যের দৃষ্টি তো বটেই। একথা ভুলে তরুণরা যদি তাঁদের নায়ক-নায়িকাবে পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন করেন, তা'হলে প্রকৃত রসঘন সাহিত্যের ঠিকানা মিলবে না ...স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর আমাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কি বিপ্লব বা বিপর্যয় এল, আমাদের বর্তমান জীবন কোন্ পথে মোড় নিচ্ছে, এসবের অল্পবিস্তর প্রতিফলন পাওয়া যায় প্রখ্যাতদের কলমে। জীবন কিভাবে এগুলে সুন্দর হবে তারই ইশারা দেয় যুগ-যুগান্তরের সাহিত্য। 'Art lies in the transference of beauty', বা 'reality is apart from entire art.' (—E. Ehrenburge) বা গোঁড়া বস্তুবাদিতা ইত্যাদি হরেক রকম মতের মধ্যে আমাদের সাহিত্যিকরা পথ বেছে নিতে সংশয়গ্রস্ত হন। কিন্তু শুধু বাস্তবকে মেনে নেওয়া তো সমাধানের প্রশস্ত পথ নয়। বাস্তবকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করাতেই আছে আর্টের শ্রেষ্ঠত্ব। তাই প্রত্যাশা করা যায়, সব-পরিবর্তনের সাথে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি করে যাবেন স্বাধীন দেশের সাহিত্যিকরা। "শুধু কাঠামোর খড়বালিতে তৃপ্ত না থেকে বক্তব্যে প্রাচুর্য ও গভীরতা এবং প্রাঞ্জলতার প্রতি যত্নবান হবেন। কারণ সাহিত্য মৃন্ময়ের সাধনা নয়, চিন্ময়ের সাধনা।"

# বাংলা নাট্যসাহিত্য

বাংলা দেশে নাটক এবং নাট্যালয়—দুয়েরই উৎপত্তি হয় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে সংস্কৃত নাটক বা নাট্যকাব্যের প্রভাবে বাংলা নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে, এমন মনে করিবার কোন সংগত কারণ নাই। অবশ্য অভিনয়ের ব্যবস্থা পূর্বেও এদেশে ছিল কিন্তু সেই অভিনয়ের আসর বসিত মঙ্গলগান, পাঁচালী কীর্তন, কথকতা ইত্যাদি লইয়া। বস্তুতঃ বৈষ্ণবকবিতা

ভূমিকা

কবির গান এবং পূর্বোক্ত যাহা-কিছু আমাদের সাহিত্যিক পুঁজি, তাহাদের সৃষ্টি সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে নয়—আসরে গাহিবার জন্য। মানুষের মনোধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতে যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব তরঙ্গিত হইয়া উঠে, তাহাদের অভিব্যক্তি এই সমস্ত রচনায় নাই 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র মধ্যে এই জীবনসংঘাত থাকিলেও তাহা নাটকীয় গুণাশ্রিত নয়। অব 'বিদ্যাসুন্দর', 'কমলে কামিনী' ইত্যাদি যাত্রার পালা এদেশে পূর্বেও প্রচলিত ছিল; ত সেগুলি পুস্তকাকারে লিখিত হইত না—অধিকারীদের খাতার পাতায় সীমাবদ্ধ থাকি পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হইত। তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' সম্ভবতঃ বাংলা হরে প্রকাশিত প্রথম মুদ্রিত নাটক; তবে প্রকৃতিধর্মের দিক দিয়া ইহা যাত্রারই সগোত্র

অতঃপর কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম অভিনীত হয় সমসাময়িক জীবনকে অবলম্বন করিয়া রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক।

মাইকেল মধুসূদনই বাংলা নাটক রচনার একটি নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন, আর পরবর্তী নাট্যকারগণ মধু-নির্দেশিত সেই নূতন স্বল্পপরিসর পথটিকে আজ দীর্ঘায়তন রাজপথে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাই আধুনিক বাংলা নাটকের জন্মদাতা হিসাবে নাট্যকার মধুসূদনের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁহার প্রথম বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র কথাবস্তু যযাতি উপাখ্যান হইতে সংগৃহীত। এই নাটকে অনাবশ্যক বিষয়, চরিত্র, সংলাপ, দৃশ্যাদির অবতারণা না করিয়া তিনি যে শিল্পগত মিতাচার তথা Artistic economy দেখাইয়াছেন, তাহা কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। শর্মিষ্ঠা-চরিত্রটি নাট্যকারপত্নী হেন্‌রিয়েটার আত্মিক প্রভাবেই যেন গড়িয়া উঠিয়াছিল; বলিতে কি, নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যে নবযুগ সূচিত করিয়াছিল। সংস্কৃত নাটকের চিরাচরিত শিল্পমূর্তি বর্জন করিবার ব্যাপারে তিনি বিপ্লবী মনোভাব পোষণ করিলেও একেবারেই প্রাচীন পদ্ধতি ও রীতিকে পরিহার করিতে পারেন নাই। কেন না,—প্রস্তাবনা-রচনায় কঞ্চুকী, বিদূষক প্রভৃতি চরিত্রের অবতারণায় তিনি সংস্কৃত নাটকেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। অভিনেতাদের দ্বারা Sublime নাটকের পাশাপাশি Ridiculous নাটকের অভিনয় করিবার জন্য 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া' এই দুইখানি প্রহসন মধুসূদন ফরাসী নাট্যকার মলিএয়ারের অনুসরণে রচনা করেন। প্রথমোক্ত বইখানিতে নব্য বঙ্গসম্প্রদায়ের ও শেষোক্ত বইখানিতে তথাকথিত সাধুসজ্জন দেশবাসীর অন্যায় আচরণের প্রতি তিনি তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়াছিলেন। বাস্তবতায়, চরিত্রসৃষ্টিতে, ঘটনাবিন্যাসে, ভাষাভঙ্গিমায় প্রহসন দুইখানির চমৎকারিত্ব অবিসংবাদিত। গ্রীসীয় বিয়োগান্ত উপাখ্যান Apple of discord বা চলত কথায় 'সোনার আপেলে'র কাহিনীকেই ভারতীয় পরিবেশে ফেলিয়া নাট্যকার মধুসূদন ক্লাসিক আদর্শে 'পদ্মাবতীনাটক' নামে একখানি মিলনান্ত নাটক রচনা করেন। এই নাটকে তিনি সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করিয়া ভাবিলেন—'Our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees. If I should live to write other dramas, you may rest assured I shall not allow myself to be bound by the diction of Mr. Viswanath of the Sahitya-darpana. I shall look to the great dramatists of Europe for models.' গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুসরণে প্রথমে বিয়োগান্ত-ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারীনাটক' তিনি রচনা করেন।

বাংলা নাটকের গোড়াপত্তনে নাট্যকার মধুসূদন

ইহাতে ইতিহাসের বস্তু রক্ষিত হওয়ায়, তদানীন্তন কালের চিত্র বেশ ফুটিয়াছে নাটকখানির সংলাপ চরিত্রানুগ, কিন্তু ঘাত-প্রতিঘাত না থাকায় অনেক চরিত্রই দুর্বল মদনিকা-চরিত্রের সরসতা উপভোগ্য হইলেও ধনদাস-চরিত্রের মাত্রাতিরিক্ত ... পীড়াদায়ক। নাটকের শেষ দৃশ্যের করুণরস মর্মস্পর্শী। 'কৃষ্ণকুমারীনাটকে'র ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিলেও প্রথম বিয়োগান্ত নাটক হিসাবে অভিনয়শিল্পের দিক দিয়া ইহার জনপ্রিয়... ছিল। অতঃপর তিনি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন। লক্ষ্য করিলেই দেখা যা... তাঁহার কবিমনের ভিতর দিয়া নাট্যকারমনটি উঁকিঝুঁকি মারিয়াছিল। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' নাটকায় স্বগতোক্তি অথবা এককোক্তি, 'বীরাঙ্গনা-কাব্যে'র বিভিন্ন নায়িকা... চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য-রক্ষণ ব্যাপারে নাট্যকারসুলভ শিল্পকৃতিকে অব্যাহত থাকিতে দেখা যায়। অতঃপর রোগশয্যাশায়ী মধুসূদন 'মায়াকানন' নামে একখানি সম্পূর্ণ নাটক ও 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে একখানি নাটকের কিয়দংশ রচনা করিয়া ওপারের যাত্রী হইলেন। 'মায়াকানন' নাটকখানি নাট্যকার মধুসূদনের জীবনবেদ। মধুজীবনের প্রতিধ্বনিই হইতেছে এই নাটকের মূল সুর। স্রষ্টা ও সৃষ্টি—নাট্যকার মধুসূদন ও 'মায়াকানন' নাটক—একটি অপরটিকে যেন অর্থান্তরিত করিয়া থাকে। 'আত্মচরিত কল্প' এই নাটকখানি হইতে মধুর জীবনেতিহাসের বহু অমূল্য তথ্য আহরণ ক... যাইতে পারে। মধুর নির্জলা সাহিত্যজীবন নাটকরচনাকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং ঝরিয়াও পড়িয়াছিল নিজেরই জীবনবৃত্তান্তকে নাট্যসাধনার মাধ্যমে আভাসিত করিয়া। তাই কবিরূপে নয়, নাট্যকার-হিসাবেই মধুসূদনের সত্যকার পরিচয়।

দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দেশের নানা স্তরের মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীর সহিত তাঁহার ছিল নিবিড় পরিচয়, আর সেই পরিচিত আশ্র... সৃষ্টিকুশলতায় প্রতিফলিত হইয়াছে তাঁহার নাটকে। নির... চাষীর মর্মান্তিক বেদনা এবং নীলকর কুঠিয়ালদের অমানুষিক অত্যাচার নাট্যকারের সহানুভূতিতে মিলিত হইয়া 'নীলদর্পণ' নাটকের সৃষ্টি।

**বাংলা নাটকে বাস্তবতা পরিবেশনে দীনবন্ধু**

মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর ভালবাসা এবং উদার স্বচ্ছদৃষ্টি নাট্যকার দীনবন্ধুর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সূক্ষ্ম নাট্যরীতির বিচারে 'নীলদর্পণে' অনেক অসংগতি চোখে পড়িবে সত্য, কিন্তু ইহার অপরিসীম সামাজিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য। নিপীড়িত মানবতার আর্ত চীৎকারে দীনবন্ধুর আন্তরিক সাড়াদানে কোন প্রবঞ্চনার অবকাশ ছিল না বলিয়াই তাঁহাকে 'প্রথম গণনাট্যকার' হিসাবে সম্মানিত করা যায়। নাটকে বস্তুতান্ত্রিকতা তাঁহার দান। 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পর হইতে বাংলার রঙ্গমঞ্চে বৈত... প্রথা প্রবর্তিত হইল। তাই গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুকে বলিয়াছিলেন—'বাংলার রঙ্গালয়-স্রষ্টা'। প্রহসন রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রুচিগত

নগ্নতা দীনতা থাকিলেও 'সধবার একাদশী', 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো', 'জামাইবারিক' প্রভৃতি নাটকে তাঁহার নাটকীয় প্রতিভার অসামান্যতাও পরিদৃশ্যমান।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন বসু কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া ষ্টেজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী', 'অলীক বাবু' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দেখিয়া সাধারণে তৃপ্তি পাইয়াছিল। কিন্তু মনোমোহনের 'প্রণয়পরীক্ষা', 'রামাভিষেক', 'সতী', 'হরিশ্চন্দ্র' ইত্যাদি নাটক তেমন উচ্চাঙ্গের হয় নাই। 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী'র নাট্যকার উপেন্দ্র দাস নাট্যসাহিত্যের আসর সেরূপ জমাইতে পারেন নাই।

দীনবন্ধু-গিরিশ-মধ্যবর্তী নাট্যকার

বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক পর্যায়ে গিরিশচন্দ্রের প্রাধান্য অপ্রতিহত। তিনি নাকি নটহিসাবে বাংলার 'গ্যারিক' ও নাট্যকার হিসাবে বাংলার 'সেক্স্পীয়র'। গ্যারিক ও গিরিশচন্দ্র—উভয়ের মধ্যে কাহারও অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই; তাই এ সম্পর্কে কিছু বলা বাতুলতা। তবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সেক্স্পীয়র, মিলার বা গ্যয়টে—ইঁহাদের নাটকে যে প্রাণবন্ত ভাব বা উদ্দীপনা আছে, তাহা গিরিশসাহিত্যে কদাচিৎ পরিদৃশ্যমান। গিরিশচন্দ্র মূলতঃ পৌরাণিক নাট্যকার হইলেও ঐতিহাসিক, সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মমূলক জাতীয় নাটক ও কয়েকটি প্রহসনের রচয়িতা। তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক নাটকের নাম 'আনন্দ রহো' এবং প্রথম পৌরাণিক নাটকের নাম 'রাবণবধ', প্রথম পারিবারিক নাটকের নাম 'প্রফুল্ল'। তাঁহার রচিত নাট্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় শতাবধি। তিনি এমনই ছিলেন 'Voluminous writer'! সাহিত্যশিল্পের দিক দিয়া খর্বতা থাকিলেও মঞ্চশিল্প তথা দৃশ্যশিল্পের দিক দিয়া গৌরব আছে বলিয়াই আজও অবধি তাঁহার লেখা যে কয়েকখানি নাটক দর্শকবৃন্দকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, তন্মধ্যে 'জনা', প্রফুল্ল', বিল্বমঙ্গল', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'পাণ্ডবগৌরব' প্রভৃতি নাটক ও 'আবুহোসেন' গীতিনাট্যখানি উল্লেখযোগ্য। ধর্মপ্রবণতা, প্রেমাকুলতা ও ভক্তিরসের বন্যায় গিরিশ-নাট্যসাহিত্য প্লাবিত। ধর্মপ্রাণ ভক্তিবিহ্বল বাঙ্গালী জাতির মনের কথাটিকে তিনি নাটকের মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছিলেন বলিয়াই দেশজোড়া এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তির তিনি অধিকারী। 'ম্যাকবেথে'র অনুবাদেও গিরিশপ্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। তবে মোটের উপর, গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের চরিত্রগুলি যেন রক্তমাংসের নয়—কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত। তাঁহার লেখা 'সিরাজদ্দৌলা,' 'মীরকাশিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী'—এই তিনখানি নাটক নাটকীয় গুণ অপেক্ষা দেশাত্মবোধ-উদ্দীপক ঘটনায় সংলাপে অধিকতর

আধুনিক বাংলা নাটক ও গিরিশচন্দ্র

ভরপুর ছিল বলিয়া তখনকার দিনে খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ নৈপুণ্য দেখা যায়। যে পাশ্চাত্য কলাকৌশলের প্রয়োগ ঘটনাপ্রধান নাটক-রচনার নিয়ম, তাহাকেই গিরিশচন্দ্র আমাদের দেশের রসপ্রধান নাটক-রচনায় প্রয়োগ করিয়া যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন নাটকে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দেখাইবার এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবার ব্যাপারেও তিনি কিছুটা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সূক্ষ্ম শ্রেণীর হাস্যরসসৃষ্টিতে সম্যক পারদর্শিতা না থাকিলেও ভাঁড়ামি-জাতীয় হাস্যরস পরিবেশনে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব বেশ খানিকটা ছিল। গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের ভাষা বেশ চরিত্রানুগ ও অলংকারবর্জিত সহজ সরল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ—যাহা 'গৈরিশী ছন্দ' নামে সুপরিচিত—তাহাকে বঙ্গরঙ্গালয়ে বহুল প্রচলিত করিয়া গিরিশচন্দ্র মধুসূদনেরই আকাঙ্ক্ষাকে এতদিন বাদে সার্থক করিয়া তুলিলেন। গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের প্রায় প্রতিটি গানই নাটকবিশেষের অঙ্গস্বরূপ—গান বাদ দিতে গেলে নাটকেরই হয় অঙ্গহানি। দৃশ্য ও চরিত্র, স্থান কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়াই তিনি নাটকে গান সংযোজিত করিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন নাটকে দার্শনিক মতেরও ছায়া বিদ্যমান : যেমন,—'শংকরাচার্য' নাটক। কিন্তু গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের প্রচুর গুণ থাকিলেও একথা স্বীকার না করিয়াই উপায় নাই যে, গুরুবাদীদের ডঙ্কানিনাদে তাঁহাকে প্রাপ্যের তুলনায় অনেক বেশী সম্মানই আমরা আজ অবধি দিয়া আসিতেছি।

ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রায় পঞ্চাশখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'প্রতাপাদিত্য', 'নন্দকুমার', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'চাঁদ-বিবি', 'রঘুবীর', 'আলমগীর' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক; 'সাবিত্রী', 'ভীষ্ম', 'নর-নারায়ণ' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক ; 'আলিবাবা', 'কুমারী', 'কিন্নরী' প্রভৃতি গীতিনাট্য ; 'মিডিয়া', 'রঞ্জাবতী', 'বাদ্‌সাজাদী' প্রভৃতি নানা জাতীয় নাটক সমধিক প্রসিদ্ধ। ক্ষীরোদপ্রসাদই বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারা এক নবতর পথে পরিচালিত করেন। 'ধর্মমঙ্গল' প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেও যে প্রচুর নাটকীয় উপাদান আছে, তাহা তিনিই 'রঞ্জাবতী' রচনা করিয়া প্রমাণ করেন। জাতীয় ভাবে প্রবুদ্ধ বাংলা দেশের নাট্যকারেরা যখন মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা, বিশেষ করিয়া চিতোর হইতে জাতীয় বীর আমদানী করিয়া নাটকে রূপ দিতেছিলেন, তখনই তিনি যশোরের প্রতাপাদিত্যকে, বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্যকে লইয়া নাটক লিখিলেন। বিজয়া প্রতাপকে 'ত্রিধাবিভক্ত বিহঙ্গম'কে 'বিজয়পাতাকা-চিহ্ন' হিসাবে গ্রহণ করিতে বলিয়া প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিবল, বাহুবল ও ধর্মবল এই ত্রিবিধ শক্তির সাহায্য লইতে বলিয়াছিলেন। ধর্মপ্রাণ পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া প্রতাপাদিত্য ধর্মবল হারাইলেন; আর তাহা হইতেই তাঁহার অবনতি ঘটিল। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মাত্রই প্রতীক-চিহ্ন

বাংলা নাট্যসাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ

ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ ত্রিধাবিভক্ত বিহঙ্গমও প্রতীক হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যকুশলতার পরিচায়ক। ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক শক্তিতে এই যে বিশ্বাস, ইহা ক্ষীরোদপ্রসাদের বরাবরই ছিল। স্বার্থপর সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া গণশক্তিকে যখন দাবাইয়া রাখিয়াছিল, রঙ্গালয়ের সাধারণ দর্শকবৃন্দ যখন সাম্যবাদমূলক বিপ্লবের বিরোধী, তখন হীনবীর্য সমাজের শক্তিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্রাহ্মণসন্তান সমাজসংস্কারক ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখিলেন 'কুমারী' নাটক। অস্পৃশ্যতাবাদ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অস্পৃশ্যতাবর্জন যে জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান, একথা তিনিই প্রথম জানাইলেন। 'হিংসা' ও 'অহিংসার' মধ্যে কোন্ নীতি শ্রেয়স্কর, তাহা ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক সপ্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু অর্ধশতাব্দী পূর্বে ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রথমে 'রঘুবীরে' ও পরে 'প্রতাপাদিত্যে' এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। জনকল্যাণে নিষ্কাম হিংসাও যে ধর্মানুমোদিত, ইহা তিনি 'প্রতাপাদিত্য', 'রঘুবীর' ছাড়াও 'রঞ্জাবতী'তে 'নর-নারায়ণে' ব্যক্ত করিয়াছেন। ধ্বংসের বীজাণু অধর্মেরই মধ্যে নিহিত, ধর্মবিরুদ্ধ কার্য অধর্মাচারীর বিনাশের হেতু—ইহাই তো তাঁহার 'নর-নারায়ণ' নাটকের শিক্ষা। আলমগীরের মানবসত্তা ও সম্রাট্সত্তার দ্বন্দ্ব, উদিপুরী বেগমের অন্তরের মাঝে উদয়পুরী ভাবপ্রবাহের সঞ্চরণ, 'আলমগীর' নাটকখানিকে কি মঞ্চশিল্পের দিক দিয়া, কি সাহিত্যশিল্পের দিক দিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দিয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাষা সরস ও সরল সত্য, কিন্তু লিরিকতার প্রাচুর্য থাকায় কৃত্রিমতাদোষদুষ্ট। শ্লেষ বাক্যের প্রয়োগে ও Serio-comic শব্দযোজনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁহার ভাষার নীতিকাব্যোচিত রসঘনতা থাকায়, উহা গাম্ভীর্যময় নাটকের চেয়ে Melodrama বা অতিনাটকের বেলায় অধিকতর কার্যকর। তাই তাঁহার Melodramaগুলি বেশ সুখপাঠ্য ও অভিনয়যোগ্য। তাঁহার ভাষায় যে Force আছে, তাহাতে Statical force বেশ ভালোই আছে কিন্তু Dynamical force বড়ই অল্প। ক্ষীরোদের হাস্যরস মার্জিত ও পরিপাটি, কিন্তু স্বাভাবিক স্বচ্ছতার চেয়ে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যই স্পষ্টতর।

দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা অধ্যাত্মসৌন্দর্য ও তাহারই স্বর্গীয় ছটায় জাতীয় জীবনকে উদ্ভাসিত করিতে চাহিয়াছিল। তাই 'প্রতাপসিংহ' নাটকে যোশীর মুখে শুনিতে পাই—'এমন কবিতা লেখো, যা পড়ে' ভাই ভায়ের জন্য কাঁদে। মানুষ মনুষ্যত্বের জন্য কাঁদে।' এই ভাবাদর্শটিই দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। অতি-আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে যেমন ভাইয়ের অভাব, তেমনি মানুষেরও অভাব—এখানে আছে শুধু 'আমি' আর 'তুমি' অর্থাৎ শুধু 'কবি' ও তাঁহার 'সাথী প্রিয়া'ই আছেন। তাই ভাইয়ের জন্য,

মানুষের জন্য ভাবিবার অবকাশ কোথায়! দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাট্যসাহিত্যে মানুষের মহনীয়তা দেখাইয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া মানবকে করিতে চাহিয়াছেন মানব-সেবক। সমগ্র দ্বিজেন্দ্র-নাট্য সাহিত্যে 'আমি' তত্ত্বের ক্ষীণ স্পন্দনটুকু ধ্বনিত হয় নাই তাঁহার সাহিত্য ভাবে, আদর্শে, ত্যাগে, সংযমে ও পরার্থপরতায় সমুজ্জ্বল। তাঁহার নাটকের চরিত্রগুলি মহত্ত্বে, ত্যাগে ও সত্যনিষ্ঠায় দীপ্তিময়। সৎ ও অসৎ—উভয় জাতের চিত্রই তাঁহার সাহিত্যে আছে। কিন্তু তাঁহার রচনাভঙ্গীর গুণে অসৎ চিত্রগুলি মলিন ও আদর্শগুলি লোভনীয় হইয়া পড়িয়াছে। চিত্রবৃত্তির বিবিধ ও বিচিত্র লীলাভঙ্গিমার ব্যঞ্জনায় যে মাধুর্যবোধের অভিব্যক্তি, তাহাই তো সাহিত্যশ্রী বা Art। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে কতকগুলি কুৎসিত ভাব ও কুরুচি দুষ্টব্রণের মত মাথা তুলিতেছিল। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা সেই অন্যায়, সেই ব্যভিচারের বিরুদ্ধে দৃপ্ত অভিযান চালাইয়াছিল। 'সাজাহানে' ঔরঙ্গজীবের সিংহাসনলাভের চেয়ে দারার দুর্ভাগ্যই অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। গুলনেয়ারের রূপযৌবন পিশাচীর কদর্যতায় নিমজ্জিত। ইহাই তো সত্য ও শালীনতাময় আর্ট। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে পুষ্পমাধুর্যের চেয়ে অভ্রমহিমারই প্রাধান্য বেশি। ইহাতে জাতির প্রাণশক্তিই হইয়াছে প্রবুদ্ধ। দুর্গাদাসের কর্মসন্ন্যাস, দারার নিস্পৃহতা, দাদামহাশয়ের দুলালী সরযুর স্বামিগৃহে দারিদ্র্যবরণ, মহম্মদের সাম্রাজ্য-উপেক্ষা—এই সমস্ত মহিমা প্রভাত-আলোক-স্পর্শের ন্যায় জীবনের সুপ্ত মহনীয়তাকে জাগাইয়া দেয়। তাই দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যসাধনা বাংলার নব প্রবোধনা। দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যে নারী ভোগোপকরণ নয়, সে 'নির্মেঘ ঊষার চেয়েও নির্মল, বীণার ঝংকারের চেয়েও পবিত্র'। তাহার ত্যাগপরায়ণ রূপটিই দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যে প্রকট। মানুষী ভাবের সঙ্গে দৈবী ভাবের সংমিশ্রণে যে সমুচ্চ মানবতার সৃষ্টি, তাহার পরিচয় মিলে স্নেহপাগল সাজাহান, কর্তব্যনিষ্ঠ দুর্গাদাস, দেশপ্রেমিক প্রতাপ, মহীয়সী সরযূ মানসী মহামায়া সত্যবতী প্রভৃতির চরিত্রে। চরিত্রগুলি যেন দেবতা ও মানুষের এক অনবদ্য সংমিশ্রণ। স্বাজাত্যবোধ নব্যবঙ্গের নবধর্ম। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিকতা সংকীর্ণ নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল যে সুস্থ স্বাদেশিকতার আদর্শের পূজারী ছিলেন, তাহার পরিচয় মানসীর উক্তিতে মিলে। মানসী বলিয়াছে—'স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয়তা বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের অপেক্ষা মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়, মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক্।' বলিতে কি, সমগ্র দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের গভীরতা হইতে মেঘমন্দ্রধ্বনিতে মন্দ্রিত হয়—'আবার তোরা মানুষ হ'। দ্বিজেন্দ্ররচিত নাটকগুলির মধ্যে 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' মঞ্চশিল্পের দিক দিয়া যতই সমুন্নত হোক্ না কেন, জটিল চরিত্রচিত্রণে

বাংলা নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল

ও নাট্যকলাসম্মত রস-পরিবেশনে 'নুরজাহান'ই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। পরিমার্জিত সরস সতেজ হাস্যরসে—হিউমারে—তাঁহার নৈপুণ্য খুবই ছিল। বিচিত্র ধরণের বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ প্রয়োগে, উপমা উৎপ্রেক্ষা এবং যমকের ব্যবহারে তাঁহার তুলনা মেলা ভার। দৃষ্টি তাঁহার অন্তর্মুখী—জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে তাঁহার নাটক জীবন্ত। তবে তাঁহার আত্মকেন্দ্রিক মনোধর্ম নাট্যরসের মস্তবড় অন্তরায়। নাটকীয় রীতি-অনুসারে তিনি নিজেকে নাটকের ঘটনাবলীর নেপথ্যে না রাখিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীদের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছেন; ফলে, বিবর্তনের পথে নাটকের স্বাভাবিক পরিণতিকে তিনি কৃত্রিমতা-দুষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার কবিধর্মী মন আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার শিক্ষা স্বীয় স্বভাবের জন্যই পায় নাই; যে-রচনাশৈলী তাঁহার গৌরব, তাহাও নাট্যরসকে কম ক্ষুণ্ণ করে নাই। পাত্র-পাত্রীদের সকলের মুখে প্রায় একই প্রকারের সংলাপ যোজনা করিয়া তিনি নাটকের একটি মহৎ ধর্মকেও লঙ্ঘন করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র-নাট্যসাহিত্যে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া সংগীত সংযোজিত হয় নাই। শিল্পগত মিতাচারের দিক দিয়া অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ।

গিরিশ-সমসাময়িক নাট্যকারগণের মধ্যে রসরাজ অমৃতলাল বসুর নামই সর্বাগ্রগণ্য। 'তরুবালা', 'বিজয়বসন্ত', 'আদর্শ বন্ধু', 'নবযৌবন', 'যাজ্ঞসেনী'—এই পাঁচখানি নাটক লেখা ছাড়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত 'চন্দ্রশেখর', 'বিষবৃক্ষ' ও 'রাজসিংহ' নাট্যায়িত করেন। আবার 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'খাসদখল' প্রভৃতি ষোলো সতেরোখানি প্রহসনও তিনি রচনা করেন। তবে প্রহসনের চরিত্রগুলি কমবেশি ভাবে বাস্তবের বিকৃত ও অতিরঞ্জিত আলেখ্য।

কতিপয় নাট্যকার

নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় 'হরধনু-ভঙ্গ' নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ সংযোজনা করিয়াছিলেন—তাহাই হয়তো-বা গিরিশের হাতে 'গৈরিশী ছন্দ' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। রাজকৃষ্ণের লেখা 'লয়লা মজনু', অতুলকৃষ্ণ মিত্রের লেখা 'নন্দবিদায়', 'শিরীফরহাদ'', 'হিন্দাহাফেজ', 'তুফানী' প্রভৃতি গীতিনাট্য একদা প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। ইহাদের পরই নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন', 'চণ্ডীদাস', 'বাংলার মেয়ে', নাট্যায়িত 'মন্ত্রশক্তি', 'মা', 'পোষ্যপুত্র' প্রভৃতি নাটক, যোগেশচন্দ্রের 'সীতা', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'দিগ্বিজয়ী' প্রভৃতি নাটক আজও দর্শকজনের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। পৌরাণিক কাহিনীসমূহ হইতে উপকরণ আহরণ করিয়াও যে আধুনিক কালোপযোগী নাটক লেখা যায়, তাহার প্রমাণ যোগেশচন্দ্রের 'সীতা', তাহার প্রমাণ মন্মথ রায়ের 'কারাগার'। অতঃপর এই যুগেরই 'রিজিয়া'-প্রণেতা মনোমোহন রায়, 'হরিরাজ', 'ভ্রমর'-প্রণেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'রণভেরী'-প্রণেতা দাশরথি মুখোপাধ্যায়, 'মিশর-

কুমারী'-প্রণেতা বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, দেবলাদেবী'-প্রণেতা নিশিকান্ত বসু রায়, 'বাঙ্গালী'-প্রণেতা ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী নাট্যকারগণের সগোত্র নহেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁহার নাটক বিশেষ অভিনীত হয় নাই। কারণ, তাঁহার বেশির ভাগ নাটকই Closet drama অর্থাৎ বৈঠকী ধরণের। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার নাটকের রসাস্বাদন সম্ভব নয়। তাই ডক্টর টমসন বলিয়াছেন,—'His dramatic work is the vehicle of ideas rather than expression of action'। সাধারণতঃ ক্রিয়াই নাটকের প্রাণ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় নাটক ভাবের বাহন ছাড়া আর কিছুই নয়। একবার তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন,—'নাট্যকারের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে, আমার নাটকের অভিনয় হয় ত হইতে পারে, না হয় অভিনয়ের পোড়া-কপাল, আমার কোন ক্ষতি নাই।' ফলে, 'শেষরক্ষা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার-সভা', 'তপতী', বিসর্জন' প্রভৃতি নাটক ছাড়া রবীন্দ্র-নাটক অভিনয়ের দিক দিয়া, মঞ্চসাফল্যের দিক দিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করে নাই। রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্য ঘটনা বা ঘাত-প্রতিঘাতপ্রধান নয়—দৃশ্যমানতার চেয়ে ভাবগভীরতার দিকেই তাঁহার নজর বেশি। তাঁহার কবিমানস নাটককে লিরিকধর্মী করিয়াছে; ফলে দৃশ্যকাব্য হিসাবে তাঁহার নাটক সর্বগুণসম্পন্ন হয় নাই, তবে সাহিত্যসম্পদ যে অনেকখানিই আছে—একথা বলাই বাহুল্য। তাঁহার কথাই ছিল এই, 'চিত্রপটে আমার দরকার নেই. আমি চাই চিত্তপট—তার উপরে রঙের তুলি বুলিয়ে ছবি আঁকব।' তাহার নাটকের পটভূমি কোন বিশেষ স্থান বা কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়—বিশ্বজনীনতার ভিত্তিতেই উহার স্থাপনা। কাব্যনাট্য, রূপকনাট্য, দ্বন্দ্বনাট্য, সাংকেতিক নাট্য, প্রহসন প্রভৃতি রচনা করিয়া তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি শূন্য দিক যে পূরণ করিয়াছেন একথ নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁহার প্রহসনগুলিতে একটি বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের অবতারণ আছে, হাস্যরসের আবরণে জীবনের অনেক নিগূঢ় রহস্যের বেদনামধুর অভিব্যঞ্জনাও ফুটিয়াছে। 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', 'রাজা', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি সাংকেতিব নাটক সমুচ্চ ভাবগভীরতার বাহনরূপে বাংলা নাট্যসাহিত্যে অতুলনীয়।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

রঙ্গালয়কে কেন্দ্র করিয়াই হয় নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব ও বিস্তৃতি। বর্তমানে সবাব চিত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রঙ্গমঞ্চ যে আর আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। একথ অবশ্য খুবই ঠিক যে, থিয়েটার-ব্যবসায়ের সহিত তুলনায় সিনেমা-ব্যবসায়ের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি। নানারূপ বিস্ময়কর মনোরম ও জ্ঞানপ্রদ দৃশ্য-প্রদর্শনে, অল্প সময়ে পূর্ণ তৃপ্তিদানে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী-সম্মেলনে অভিনয়-প্রদর্শনে সিনেমার জনপ্রিয়তা যতই স্বীকার করা যা'ক্ না কেন, থিয়েটারের লোপ সিনেমার দ্বারা কখনই হইতে পারে না। কেন না,—সিনেমা নাটক নয়, নাটকের কঙ্কালমাত্র; আর ছবি

ছবিই, আসল মানুষ নয়। নাটকের মধ্যে যাহা বিশেষরূপে উপভোগ্য, নাট্যরস যাহার মধ্যে থাকে নিহিত, সেই সংলাপবস্তুটিকে সিনেমায় বেশ কঠোর হস্তে ছাঁটিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং প্রকৃত নাট্যরসিক কখনও সিনেমা দেখিয়া তৃপ্তি পাইতে পারেন না। তবে একথাও ঠিক যে, চেষ্টা করিলে সিনেমার অনেক-কিছু জিনিস রঙ্গমঞ্চেও দেখানো যাইতে পারে। বিংশ শতাব্দীর এই কর্মব্যস্ত জীবনে চাল-চিড়া বাঁধিয়া সারা রাত ধরিয়া থিয়েটার দেখা সম্ভব নয়। ইহা বুঝিয়াই রঙ্গালয়ে আজকাল আড়াই ঘণ্টার বই অভিনয় করা হয়। সিনেমার সহিত প্রতিযোগিতায় ইহা তো করা চাইই। তাহা ছাড়া যতটা পারা যায় চিত্রনাট্যের শিল্পরীতিতে এবং সত্যকার নাট্যরসকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া মঞ্চনাট্য রচনার প্রয়োজন। এদিক দিয়া শচীন সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে', শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক' প্রভৃতি দু'চারখানি নাটক মাত্র অগ্রসর হইয়াছে। ইব্‌সেন ও শ-কে আদর্শ করিয়া সাম্প্রতিক কালে মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শচীন সেনগুপ্ত প্রভৃতি নাট্যকারগণ বাংলা নাটকে পাশ্চাত্ত্য নাটকের ভাবধারা সংক্রামিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু ইহাই তো আর যথেষ্ট নয়। অতি-আধুনিকতার দাবি লইয়া যে নাটকগুলি মঞ্চে অভিনীত হয়, তাহা আদৌ মৌলিক চিন্তাপ্রসূত নয়, বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ মাত্র। মনে রাখা দরকার—'A nation is known by its stage'. শরৎচন্দ্র, তারাশংকর প্রভৃতির নাটকে বঙ্গসমাজের কথা, তাহার প্রাণস্পন্দন অবশ্য শুনিতে পাই। আবার মহেন্দ্র গুপ্তের নাটকাদিতে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের ও দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের ধারা অনুকৃত ও অনুসৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' হাস্যরসপ্রধান নাটক হইলেও বেশ শিক্ষাপ্রদ এবং হৃদয়গ্রাহী। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', তুলসী চক্রবর্তীর 'দুঃখীর ইমান', 'পথিক' গণজীবনের রূপায়ণে, গণশিক্ষাদানে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে।

**সাম্প্রতিক বাংলা নাট্যসাহিত্য**

পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ রঙ্গালয় ও পেশাদার নটনটির একান্ত অভাব থাকায় নাট্যসাহিত্য এই অঞ্চলে পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিতেছে না। সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় অল্প কয়েকটিই আছে। এই অসুবিধার মধ্যেও যে কয়েকজন নাট্যকার নাটক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 'আনোয়ার পাশা', 'কামাল পাশা' ও 'কাফেলা'-রচয়িতা ইব্রাহিম খাঁ, 'সরফরাজ খাঁ', 'মসনদের মোহ', 'আনারকলি' রচয়িতা শাহাদাৎ হোসেন, 'শহীদ সেরাজ'-রচয়িতা মুহম্মদ নেজামৎউল্লাহ্, 'নাদিরশাহ্'-রচয়িতা আকবর উদ্দিন, 'বাগদাদের কবি'-রচয়িতা শওকত ওসমান প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

**পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা নাট্যসাহিত্য**

সত্যকার ভালো সাম্প্রতিক নাট্যকার হিসাবে মাত্র জনকয়েকই আছেন আর সব নাট্যকার কেবল শিক্ষানবিশীই করিতেছেন। ভল্‌তেয়ারের ভাষায় তাঁহাদিগকে বলিতে

চাই—'Compact a lofty and interesting event in the space of two or three hours; bring forward the several characters only when each ought to appear. Develop a plot probable as it is attractive; say nothing unnecessary; instruct the mind and move the heart; be eloquent always with the eloqunce proper to every character represented'.

শেষ কথা

## বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য

শত বর্ষ পূর্বে প্রকৃত বাংলা সমালোচনার কোন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য লোকসাহিত্য ও বৈষ্ণবসাহিত্যের সম্ভারে সমৃদ্ধ সত্য, কিন্তু উহাদের প্রকৃত সমালোচনা খুব বেশি দিনের নয়। তাহা ছাড়া, বাংলা উপন্যাস, ছোট-গল্প, নাটক প্রভৃতি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ না ঘটিলে তো আর সাহিত্য-সমালোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না। তাই মৌলিক সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের সহিত তুলনায় বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য সত্যই অনেকখানি অনগ্রসর এবং অপরিণত। তবু তুলনার পরিপেক্ষিতে ইংরাজি সাহিত্যের অপেক্ষা বাংলা সাহিত্যেরই কৃতিত্ব অধিকতর। ইংরাজি সাহিত্যে চসার স্পেন্সার শেক্স্‌পীয়রের অতুলনীয় সাহিত্যকৃতির বহুকাল পরে তাঁহাদের গুণগ্রাহী সমালোচকদিগেব আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। পক্ষান্তরে, বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টিধর্মী মৌলিক সাহিত্য ও উহার সুনিপুণ রসগ্রাহিতা—এই উভয়ের মধ্যে কালব্যবধান বড়ই কম। বঙ্গভাষার আকাশে নূতন সাহিত্যারুণের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উহার কনকরশ্মির প্রতিবিম্বনটি রসগ্রাহী পাঠকের অন্তরে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ফলে বাঙ্গালী সমালোচক আজ পরিণত ও রসগ্রাহী মনোবৃত্তি হইয়া সাহিত্য-রসাস্বাদনে তৎপর।

ভূমিকা

সমালোচনার সংজ্ঞা লইয়া সমালোচকদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব ও মতভেদ রহিয়াছে। যাঁহারা আরোহমূলক সমালোচনার (Deductive Criticism) পক্ষপাতী, তাঁহারা সাহিত্যে গতিশীলতাকে অস্বীকার করিয়া কতিপয় বাঁধাধরা মূলসূত্রের মাপকাঠিতে সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ নিরীক্ষণ করেন। অবশ্য অবরোহমূলক সমালোচনার ( Inductive Criticism ) সমর্থকেরা নির্দিষ্ট আইনকানুনের গণ্ডির মধ্যে সাহিত্যকে বাঁধিয়া রাখিয়া উহার গতিশীলতাকে স্তম্ভিত করিবার ঐ দুষ্ট প্রচেষ্টাকে প্রশ্রয় দেন না। আবার যাঁহারা ছায়ালোচনার ( Impressionistic Criticism ) অভিলাষী তাঁহারা

সাহিত্য-সমালোচনার বিভিন্ন রীতি

ব্যক্তির উপরে সাহিত্যের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া সাহিত্যবিচার করিতে চাহেন। ফলে ধার্মিক, রাজনীতিক, অর্থনৈতিক, 'বিশুদ্ধ' রসিক প্রভৃতি বিভিন্ন মনোভঙ্গীসম্পন্ন জনগণের মধ্যে সাহিত্যের মূল্য-যাচাই লইয়া বাদবিতণ্ডা দেখা যায়। ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগার মানদণ্ডে কাব্য-সমালোচকেরা কাব্যবিচার করিতে বসেন বলিয়াই সমভাবে বিচক্ষণ সমালোচকদের মধ্যেও সুতীব্র মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীঅরবিন্দ দিলীপকুমার রায়ের কাছে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"All criticism of poetry is bound to have a strong subjective element and that is the source of the violent differences in the appreciation of any given author by equally 'eminent' critics" যাঁহারা রসালোচনার (Appreciative Criticism) প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাঁহারা অবরোহমূলক সমালোচনা ও ছায়ালোচনাকে মিশাইয়া রসানুভূতির স্তরে আনিয়া ঐ অনুভূতি পাঠকমনে সঞ্চারিত করিবার প্রয়াসী। এই শ্রেণীর সমালোচকদিগের মতে, সমালোচনার উদ্দেশ্য—ব্যাখ্যা-বিচার নয়, রসগ্রহণ ও রসপরিবেশন। আবার যাঁহারা নন্দনতত্ত্বসম্মত লোচনায় (Aesthetic Criticism) সমর্থক, তাঁহারা পাঠকমনের উপরে সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া দেখিয়া এবং ঐ প্রতিক্রিয়াকে নন্দনতত্ত্বের নিয়মানুসারে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। সমালোচ্য বিষয়ের সৌন্দর্য-নিষ্কর্ষ আহরণ করিয়া উহার সহিত 'আপন মনের মাধুরী' মিশাইয়া নবতর অথচ অনুরূপ এক সৌন্দর্য সংশ্লেষণবৃত্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করাই এই জাতীয় সমালোচনার লক্ষ্য। সাহিত্য-সমালোচনার উল্লিখিত রীতিগুলির মধ্যে একটিতেও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচনার আবশ্যকতা স্বীকৃত হয় নাই। অথচ ইতিহাস যখন গতিশীল এবং সেই ইতিহাস যখন সামাজিক ইতিহাস আর সাহিত্যও যখন যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া উহারই পরিপ্রকাশ, তখন ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সাহিত্য-সমালোচনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যুক্তিকে অস্বীকার করা চলে না—ইহাই মার্কসীয় সমালোচনার মূলীভূত নীতি। "এ সমালোচনার মধ্যে 'আত্মা' নেই, 'নটরাজ' নেই, 'বিশুদ্ধ' অমৃতরস সেই—এর মধ্যে মানুষের দেহ ও মন, পৃথিবী ও সমাজ, মানুষের শিল্প ও সাহিত্য। অবশিষ্ট যা তা মানুষের নয়, সমাজের নয় সুতরাং মার্কসীয় সমালোচনারও অন্তর্ভুক্ত নয়।"

সাহিত্য-সমালোচনার ঐ বিভিন্ন রীতি যে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের যথাযথ স্তরপরম্পরায় প্রতিফলিত হইয়াছে, এমন কথা বলা চলে না। বরং ইহাই লক্ষ্য করা যায় যে, বিভিন্ন সমালোচককে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন রীতির সমালোচনার যুগপৎ পরিপ্রকাশ ঘটিয়াছে। প্রাচীন যুগের টীকাকারেরা ছিলেন আরোহমূলক সমালোচনার পক্ষপাতী—প্রাক্-নিরূপিত মানদণ্ডের নিরঙ্কুশ প্রয়োগেই ছিলেন তাঁহারা সিদ্ধহস্ত।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য মূলতঃ পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে উদ্ভূত ও বিকশিত হওয়ায়, এই জাতীয় সমালোচনা-রীতি বড় একটা অনুসৃত হয় নাই। তবে ইহাই লক্ষণীয় যে, "সাহিত্যে খুন'-শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ণচন্দ্র বসু আরোহমূলক সমালোচনা-রীতির প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। পক্ষান্তরে, 'নাটক' প্রবন্ধ-রচয়িতা কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 'নভেলের শিল্প বা কবিত্ব' প্রবন্ধ-রচয়িতা দেবেন্দ্রবিজয় বসু প্রভৃতি অবরোহমূলক সমালোচনা-রীতির প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'মৃন্ময়ী' প্রবন্ধরচনায় ছায়ালোচনা-রীতি পরিলক্ষিত হয়। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র, 'সমালোচনা-সাহিত্য' প্রবন্ধ-লেখক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বিষবৃক্ষ' প্রবন্ধলেখক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাম, 'মনোরমা' প্রবন্ধ লেখক গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ' প্রবন্ধ-লেখক বীরেশ্বর পাঁড়ে, দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র'-রচয়িতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি রসালোচনা-রীতির সমর্থক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই নন্দনতত্ত্বসম্মত সমালোচনা-রীতির প্রবর্তক। অতঃপর এই রীতিরই মোটামুটি অনুবর্তন করিয়াছেন শশাঙ্কমোহন সেন, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রমথ চৌধুরী, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী' ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, বিশ্বপতি চৌধুরী, ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রাচীনের মোহঘোর কাটাইয়া বাংলা সমালোচনা-রীতিকে এক নবতর রূপে রূপায়িত করিবার প্রয়াসী। ইহাই মার্কসীয় সমালোচনা রীতি। তবে এই রীতির সার্থকতা ও পূর্ণ অভিব্যক্তি তাঁহাতে হয় নাই। বিনয় ঘোষ, গোপাল হালদার, ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার প্রভৃতি এই নবতর সমালোচনা-রীতির পরিপোষক।

বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন সমালোচনা-রীতি

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, সাময়িক পত্রিকাদিকে অবলম্বন করিয়া, উহাদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছে। তাই দেখি,— ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৩-এ মে তারিখে প্রথম প্রকাশিত ও পাদ্রীজন ক্লার্ক মার্শম্যান কর্তৃক সম্পাদিত 'সমাচার-দর্পণে' তৎকালীন নূতন পুস্তকের সমালোচনা বিদ্যমান। কিন্তু সে-তো সমালোচনা-সাহিত্যের নিতান্তই শৈশবাবস্থা—অস্ফুট এক কলকাকলী ব্যতীত আর কিছুই নয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর' (১৮৩০ খ্রীঃ অঃ), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮ খ্রীঃ অঃ) প্রভৃতিতে যে সকল আলোচনা প্রকাশিত হইত, তাহা নিছক 'ভালো-লাগা মন্দ-লাগা'র কথাতেই মুখর হইয়া উঠিত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ও ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে প্রাক্-বঙ্কিম যুগ

প্রকাশিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামক মাসিক পত্রিকাতেও বাংলা সমালোচনার সন্ধান মিলে। ১২৮০ বঙ্গাব্দের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রকাশিত 'মধ্যস্থ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখিত নাট্যকার মনোমোহন বসুর উক্তি হইতে জানা যায় যে, কালীপ্রসন্ন সিংহই 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' বাংলা সমালোচনার প্রথম পথপ্রদর্শক। এই মাসিক পত্রিকাখানিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, টেকচাঁদ ঠাকুর, রামনারায়ণ তর্করত্ন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি স্বনামধন্য সাহিত্যকারদের বহু গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিম-প্রভাবের পূর্ববর্তী সমালোচক-গণের মধ্যে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা'-রচয়িতা রাজনারায়ণ বসু ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ'-লেখক ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজনারায়ণের লেখায় চিন্তাশীলতা এবং অন্তরের দরদ উভয়ই চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে, 'ভূদেবের শুভ্র পরিচ্ছন্ন চিন্তা, পরিমিত সংযত অথচ প্রাঞ্জল ভাষণের ভিতর দিয়া যে রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার উপরেও এক নৈষ্ঠিক সদাচারী হিন্দুত্বের স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে।' সত্য কথা বলিতে কি, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাংলা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ'-শীর্ষক পুস্তিকায় আধুনিক বাংলা সমালোচনার বীজ উপ্ত রহিয়াছে।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে *Calcutta Review*-তে বঙ্কিমচন্দ্র "*Bengali Literature*' নামে ইংরাজি ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের যে রূপ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ও তৎসম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন। রসানুভূতি, সৌন্দর্যবোধ, নীতিজ্ঞান, শাস্ত্রানুরাগ, সাহিত্যপ্রীতি—এ সবই বঙ্কিম-প্রবর্তিত, সমালোচনা-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল। সামাজিক অবস্থার সহিত সাহিত্যের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তিনি স্বীকার করেন নাই। বহুমুখী পাণ্ডিত্যে, সূক্ষ্ম চিন্তাশীলতায়, জীবন্ত জাতীয়তাবোধে, সুগভীর সমবেদনাযোগে, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ-শক্তিতে 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক সমালোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র মহিমায় খুব উজ্জ্বল না হইলেও

**বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র**

গতানুগতিক নয়।......কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনা বঙ্কিমের হাতে কোথাও স্বতন্ত্র সাহিত্য-সৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে নাই।' 'বঙ্গদর্শন' কেবলমাত্র বঙ্কিম-প্রতিভারই বাহন নয়, ঐ যুগ-প্রতিভারই বাহন। বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ব্যতীত আরও বহু লেখক ঐ পত্রিকায় লিখিতেন। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রসিদ্ধ লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনায় পাণ্ডিত্য ও চিন্তার প্রাখর্য পরিদৃষ্ট হয়। চন্দ্রনাথ বসুর সমালোচনায় ভাব এবং ভাবনার অনেকখানি সমন্বয় ঘটিয়াছে। সেই যুগের যশস্বী সাহিত্য-

সমালোচক হিসাবে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রামদাস সেন, পূর্ণচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক নহেন, এমন অনেক সাহিত্য-সমালোচকও বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথেই পরিক্রমণ করিয়াছেন। 'প্রচার', 'সাহিত্য' ও 'নারায়ণ'—এই তিনটি পত্রিকাও সমালোচনা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা দু'টি একটি সমালোচনা খানিকটা রচনাধর্মী। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনাগুলির মধ্যে কয়েকটি বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও চিন্তাশীল, আবার গুটিকয়েক সুকুমার সাহিত্যিক রচনাধর্মী। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা যেমন শাস্ত্রজ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে ভরপুর, তেমনি স্বকীয় অনুভূতিতে ও কল্পনায় স্নিগ্ধমধুর। বিপিনচন্দ্র পালের সমালোচনায় চিন্তাশীলতার সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের হৃৎস্পন্দনের সংযোগ বিদ্যমান

অতঃপর রবীন্দ্রযুগ। 'ভারতী', সাধনা', 'বঙ্গদর্শন' ( নব পর্যায় ) ও 'সবুজ পত্র' —এই চারিটি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন রসশাস্ত্র হইতে রসদ আহরণ করিয়া বাংলা সমালোচনাকে নবীন সজ্জায় সজ্জিত করিলেন। রবীন্দ্রপ্রতিভার যাদুস্পর্শে পুরাতন যেন নূতন হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ আজন্মস্রষ্টা বলিয়াই 'লোকসাহিত্য' ও 'প্রাচীন সাহিত্যে'র সমালোচনায় তাঁহার সমালোচক-রূপের চেয়ে স্রষ্টা-রূপই স্থানে স্থানে প্রকট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আসলে তো রোম্যান্টিক কবি— তাই এইরূপ হইয়াছে। তবে কবি-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্যক্তিগত রুচির দ্বারা সমালোচনার আদর্শকে সামান্যই প্রভাবিত করিয়াছেন। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিসাক্ষিক কল্পনাসমৃদ্ধির উপরে খুবই নির্ভরশীল ছিলেন সত্য, কিন্তু সমালোচক হিসাবে তিনি নৈর্ব্যক্তিক। তিনি জানিতেন,—'কিন্তু মহাকাল বসিয়া আছেন। তিনি ত সমস্তই ছাঁকিয়া লইবেন। তাঁহার চালুনির মধ্য দিয়া যাহা ছোট যাহা জীর্ণ, তাহা চালিয়া ধূলায় পড়িয়া ধূলা হইয়া যায়। নানা কাল ও নানা লোকের হাতে সেই সকল জিনিসই টেঁকে, যাহার মধ্যে সকল মানুষই আপনাকে দেখিতে পায়। এমনি করিয়া বাছাই হইয়া যাহা থাকিয়া যায়, তাহা মানুষের সর্বদেশের সর্বকালের ধন। এমনি করিয়া ভাঙিয়া গড়িয়া সাহিত্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃতির মানুষের প্রকাশের একটি নিত্যকালীন আদর্শ আপনি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে সেই আদর্শই নূতন যুগের সাহিত্যেরও হাল ধরিয়া থাকে। সেই আদর্শ মতই যদি আমরা সাহিত্যের বিচার করি তবে সমগ্র মানুষের বিচারবুদ্ধির সাহায্য লওয়া হয়।...সাহিত্যকে দেশকালপাত্রে ছোট করিয়া দেখিলে প্রকৃত দেখাই হয় না অবশ্য ইহাও সবিশেষ লক্ষণীয় যে, বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যকে তিনি উপনিষদে বেদান্তে বসাইয়া, 'কাদম্বরী' হইতে শুরু করিয়া 'সাহিত্যতত্ত্ব' 'সৌন্দর্যতত্ত্ব'

প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া 'আধুনিক সাহিত্য' সমালোচনায় সেই উপনিষদ ও সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা এমন সুদৃঢ়ভাবে করিয়া গিয়াছেন যে, রবীন্দ্রপরবর্তী সাহিত্য-সমালোচকেরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উহারই অনুসরণ অনুকরণ করিয়াছেন।

**বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে রবীন্দ্র-যুগ**

সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনায় নীরব অর্ঘ্য দান করিয়াছেন, সৌন্দর্যতত্ত্বের স্তব গাহিয়াছেন। সমালোচক-দার্শনিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'রবি-দীপিতা'য় নীরস বাণীভঙ্গীতে উপনিষদের তত্ত্বকথা এবং সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের রসকথা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'কাব্যজিজ্ঞাসা'য় সমালোচক অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন আলংকারিকদের শূন্যগর্ভ অমৃতরসের আস্বাদে বিভোর হইয়া তাঁহাদেরই আওতায় ধরা দিয়াছেন। সমালোচক প্রমথ চৌধুরী ও মোহিতলাল মজুমদার—উভয়ের মধ্যে কেহই সেই বাস্তববহির্ভূত 'রস', যাহা 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ', তাহার কথা বিস্মৃত হয় নাই। প্রমথ চৌধুরী লিখিত 'ভারতচন্দ্রে'র সমালোচনায় ব্যক্তিসাক্ষিক রীতি পরিলক্ষিত হয়। চৌধুরী মহাশয় শব্দসচেতন বাক্যকুশল সুরসিক পুরুষ ছিলেন বলিয়া প্রকাশ্যতঃই আপনাকে ভারতচন্দ্রের উত্তরসাধকরূপে পরিচয় দিতে পছন্দ করিতেন। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে মোহিতলালের দান অপরিমেয় অতুলনীয়। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় একদা মোহিতলালের সমালোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দান হিসাবে পরিগণিত হইত। 'Style is the man himself'—তাই সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে তিনি কবি-সাহিত্যিকের ব্যক্তিমানসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন। মোহিতলালের মতে, জাতিগত বিশিষ্ট চেতনাই সাহিত্যকৃতির মূলে বিদ্যমান। সাম্প্রতিক সমালোচকের চোখে নলিনীকান্ত গুপ্তের 'সাহিত্য-সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী পণ্ডিচেরীর আশ্রম উদ্ভূত, এবং তাহাকে নির্বিঘ্নে বলা যেতে পারে Supra conscious Super-soul-এর Super-neurotic অভিব্যক্তি —অতএব সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।' প্রাচীন পুঁথি-সাহিত্যের সমালোচনায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী, ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতির দান অবিস্মরণীয়। শশাঙ্কমোহন সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, ত্রিপুরাশংকর সেন, প্রিয়রঞ্জন সেন, ডক্টর সুকুমার সেন, বিভাস রায়চৌধুরী, ডক্টর মনোমোহন ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র দাশ, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর মাখনলাল রায় চৌধুরী, বিনায়ক সান্যাল, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র, অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, ডক্টর মদনমোহন গোস্বামী, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য, অজিতকুমার ঘোষ, শুদ্ধসত্ত্ব বসু,

ধীরানন্দ ঠাকুর, ক্ষুদিরাম দাস, জগদীশ ভট্টাচার্য, জীবনকৃষ্ণ শেঠ, ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ডক্টর গুরুদাস ভট্টাচার্য, ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শীতাংশু মৈত্র, ডক্টর বিমলকান্তি সমাদ্দার, ডক্টর জীবেন্দ্র সিংহ রায়, ডক্টর অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, জীবন চৌধুরী, নীলরতন সেন, কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, রথীন রায়, ভূদেব চৌধুরী, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, সোমেন বসু, ভোলানাথ ঘোষ, মদনমোহন কুমার, শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, ক্ষেত্র গুপ্ত, বিষ্ণু দে, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগিলাল হালদার, কালীপদ সেন, ভবতোষ দত্ত, শংকরীপ্রসাদ বসু, ডক্টর আশুতোষ দাশ, শিশির দাস, ডক্টর কাজি মোতাহার হোসেন, সৈয়দ আলি আহ্‌সান, আশ্‌রাফ সিদ্দিকী প্রভৃতি অধ্যাপকবৃন্দের সমালোচনা-সাহিত্য বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণে ও ইংরাজি সমালোচনা-পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ। সাহিত্যের রসবিচারে উঁহাদের সকল যুক্তি ও সিদ্ধান্ত নিয়োজিত। বঙ্গসাহিত্যের পঠন-পাঠনে এই অধ্যাপক-সমালোচকগণের রচনাগুলি সর্বজনসমাদৃত।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে সাম্প্রতিক যুগ

'পরিচয়' পত্রিকা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিকে এক নূতনতর পথে চালনা করিয়াছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সমাজ ও সভ্যতার সহিত শিল্পের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তো স্বীকার করিয়াছেনই, অধিকন্তু সাহিত্যকে দৈবী প্রতিভার গণ্ডি হইতে সরাইয়া লইয়া পার্থিব আসনে বসাইয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি আর এই মনোভঙ্গীর পরিপোষক নহেন। 'চতুরঙ্গ' ও 'কবিতা' পত্রিকাদ্বয়ের সমালোচক-গোষ্ঠী দৈবীশক্তিতে আস্থাশীল নহেন বলিয়াই তাঁহাদের সমালোচনাও সমাজ-সভ্যতার মুখাপেক্ষী। বুদ্ধদেব বসুই এই সমালোচক-গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি তথা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের হাতছানিতে ও রুশিয়ার-সাম্যবাদী আদর্শের আকর্ষণে ইহারা 'কেবল অনর্গল বিকৃত মনের অনুপ্রেরণা' যোগাইয়া চলিয়াছেন। তবে সাম্যবাদী সমালোচনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়া যাঁহারা সাহিত্যানুশীলন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার, নীরেন রায় প্রভৃতির নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের এই নূতন পথটি যে কুসুমাস্তৃত নয়—কণ্টকাকীর্ণ, একথা তাঁহারা ভালোভাবেই অবগত আছেন।

## ছোটদের বাংলা সাহিত্য

ভূমিকা

সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার সেই প্রবীণদল ও বাহক সেই যুবসম্প্রদায়, ইহাদের কল্যাণ ইহাদের স্বার্থ সমাজকে অবশ্যই দেখিতে হইবে। নচেৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু আজিকার সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিলেও, আগামী কালের সমাজ ও রাষ্ট্রের রঙ্গমঞ্চে যাহারা যুবসম্প্রদায় ও প্রবীণদলের ভূমিকা অভিনয় করিবে

স্ফুটনোন্মুখ সেই কিশোর, বালক, শিশুদলের ভবিষ্যৎ গড়িবার উপযোগী ছোটদের সাহিত্য রচনা করা দরকার। কলমের লাঙ্গলে মনের মাটি চষিয়া ভাব ও ভাবনার ফসল উৎপাদন করাই যাঁহাদের কাজ, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিশোর-মনের নূতন মাটিকে লইয়াও নিড়ানি দিয়া থাকেন আর তাঁহারাই শিশু সাহিত্যিক।

সাহিত্যরচনার লক্ষ্য লইয়া বাদবিতণ্ডার অন্ত নাই, কিন্তু সকল বাদবিতণ্ডাকে অতিক্রম করিয়া একটি কথা অন্ততঃ স্থায়ী স্বীকৃতি পাইয়াছে যে, সমাজ ও ব্যক্তির বিকাশ করাই সাহিত্যের কাজ। তাই কচি মনের মাটি কাঁচা বলিয়া ইহাকে লইয়া অনায়াসে একটা পেটেণ্ট ছাঁচের ভিতরে ফেলিয়া রূপ দেওয়া চলে না। ছোটদের সাহিত্যরচনায় কোন বিশিষ্ট আদর্শের সন্ধান, কোন ধরাবাঁধা পথ দেখাইয়া দেওয়ার বিরোধী তাই অনেকেই। এক দিকে যেমন একদল শিশু-সাহিত্যিক মনে করেন, ছোটদের সাহিত্য বলিতে অবাধগতি কল্পনার আকাশ-পরিক্রমা ছাড়া আর কিছুই নয়, অপর দিকে তেমনি আজিকার দিনের রূঢ় বাস্তবের আঘাতে জর্জরিত আর একদল সাহিত্যসেবী জানাইয়াছেন, দুঃখ জিনিসটি জীবনের মর্মমূলে এমন করিয়াই আঘাত হানিয়া থাকে যে, দুঃখের স্বরূপ চিনিয়া প্রকৃত কল্যাণের পথ বাছিয়া লইবার ব্যাপারটি ছেলেবেলা হইতেই প্রয়োজন। কিন্তু কথাটি এই যে, পরিণতবয়স্কের চলার-পথে যে ঘাত-প্রতিঘাতের ঢেউ প্রতি মুহূর্তে উপছাইয়া পড়ে, তাহার ভিতরে ছোটদের টানিয়া আনা শুধু যে অর্থহীনই তাহা নয়, অনর্থকরও বটে। পক্ষান্তরে ছোটদের মনই তো কল্পনাশক্তি প্রসারের উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং এই শিশু অবস্থা হইতেই কল্পনাশক্তির স্ফূর্তি ও পূর্তি না ঘটিলে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিরাট্ চত্বরে তাহাদিগের দ্বারা পরবর্তী জীবনে কোন বড় সৃষ্টিই গড়িয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং কল্পনার বিস্তৃত ও ঘনতাই যে ছোটদের সাহিত্যরচনার লক্ষ্য, একথা বলাই বাহুল্য।

ছোটদের সাহিত্যরচনার লক্ষ্য

বৈচিত্র্য লইয়াই জীবন। এক দিকে যেমন প্রাণখোলা নির্মল হাসির মূল্য আছে, অপর দিকে তেমনি মূল্য আছে মর্মস্পর্শী কান্নারও। কান্না-হাসি, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদের দোলায় না চড়িতে পারিলে মনের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কোনটিরই স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা দেয় না। অপরের বেদনাকে নিজের অন্তরের মাঝে উপলব্ধি করিবার সুযোগ দেওয়াই তো সাহিত্যকারের কাজ। এমনই তো জীবন স্বার্থপরতার বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ, ইহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া যদি পরার্থপরতার সমুচ্চ শিখরের দিকে মানুষের লক্ষ্য নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে জীবনের মূল্যবোধও তো ঘটে না। তাই ছোটদের সাহিত্যের উপাদান হিসাবে হাসি ও কান্নার প্রবাহকে অস্বীকার করা চলে না। রাজপুরী হইতে বিতাড়িত ন-রাণী ও ছোটরাণী তাহাদের সন্তান বুদ্ধু ভুতুমকে লইয়া কাঠ কুড়াইয়া দুঃখের দিনগুলি চোখের জলে ভাসাইয়া দিলেও, তাহারা জীবনের সার্থকতার সন্ধানে

ছুটিতে কসুর করে নাই। একদিন দেখা যায়, ঐ অবহেলিত বুদ্ধু ভুতুমই বীরত্বের সাধন করিয়া লাভ করে অতুলনীয় ঐশ্বর্য, ফিরিয়া পায় পিতার স্নেহ, আনে মায়ের সুখ জগতে এমনি করিয়াই তো ঘটে অন্যায়ের অবসান, অবিচারের অবলুপ্তি। কল্পনা প্রসার এমনি রকমের বিষয়বস্তুর মধ্যেই তো সব চেয়ে বেশি করিয়া খেলে। এ পথেই চলিয়াছে 'গালিভার', চলিয়াছে 'এলিস', চলিয়াছে 'ডন কুইক্সোট'। আবা 'রাজপুত্তুর' 'কোটালপুত্তুর', 'তিল তিল মিতিল' সবাই চলিয়াছে এই পথ দিয়াই সমাজের ক্লেদ, মালিন্য, নীচতার পঙ্কসমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃতের সন্ধান পাওয়া—

ছোটদের সাহিত্যের উপাদান

এই কাজটি বড়দের সাহিত্যে থাকিবে সত্য, কিন্তু ভয়ে প্রতিকূলে নির্ভীকতা, হিংসার প্রতিকূলে প্রতিকূলে প্রেম যেখানে প্রাধান্য লাভ করে, সেখানে ছোটদের মনকে পুষ্ট করিবা উপকরণ যে উহাতে আছে, একথা বলাই বাহুল্য। তাই বিশ্বের কল্যাণমুখী সাহিত্য মাত্রকেই—হোক্ না কেন তাহা বড়দের জন্য লেখা—ছোটদের উপযোগী করিয় পরিবেশন করা চলে। ইহার প্রমাণ 'ছোটদের মহাভারত', 'ছোটদের লে মিজারেব্‌ল্' 'ছোটদের বিষাদসিন্ধু', 'ছোটদের আনন্দমঠ' ইত্যাদি। কিন্তু বস্তিজীবনের জঘন্য পরিবেশ, বাস্তবজীবনের কঠিন সংঘাত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের ঐতিহাসিক অভাব অনটনের মধ্য দিয়া যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছোটরা শুধু তাচ্ছিল্য, শুধু অবহেলা, শুধু ব্যথাই লাভ করে, তাহাদের জীবনে 'নীলপাখী'র স্বপ্ন দেখা পরিহাসেরই নামান্তর। তাই ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে, কল্যাণের পথে ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছোটদের উদ্বুদ্ধ করার সাহিত্যিক আদর্শ, তাহাকে একান্তভাবে মানিয়া লইবার দিন আজ আসিয়াছে মুনাফাখোর কালোবাজারী ধ্বজাধারী কোন ধনীর ছেলে প্রতিবেশী গরীব ছেলেমেয়েদের ব্যথার সমব্যথী হইয়া যদি মজুত চা'লের খবর সর্বজনসমক্ষে প্রকাশই করিয়া দেয়, তাহাতে ক্ষুদ্রতর পরিবেশে পিতৃদ্রোহিতা প্রকাশ পাইলেও বৃহত্তর পরিবেশে অর্থা সমষ্টির কল্যাণে ছোটর এই যে বীরত্ব—ইহার স্বীকৃতি আজিকার ছোটদের সাহিত্যে ফুটিয়া ওঠা দরকার। এমনি করিয়াই বাস্তব জীবনের সঙ্গে ছোটদের সাহিত্যের একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়া যাইতে পারে। পৌরাণিক যুগেও তো পুত্র প্রহ্লাদ পিত হিরণ্যকশিপুর বিরোধী হইয়াছে। আজই-বা সাহিত্যের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধকল্পে আমাদের ঘরে ঘরে নব নব প্রহ্লাদের আবির্ভাব ঘোষিত হইবে না কেন?

মনে হইতে পারে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। 'চয়ন' 'সংগ্রহ' ধরণের যে সকল পুস্তক বিদ্যালয়ে পড়ানো হইয়া থাকে, তাহাদের পদ্যাংশে যদিও-বা কিছুটা সাহিত্যোপভোগের আনন্দ মিলে, গদ্যাংশে তো ইহার আশা দুরাশারই নামান্তর। পাঠ্যপুস্তকগুলির ভাব ও বিষয় এতই সীমাবদ্ধ এবং পাঠনপদ্ধতিও

এতই প্রাচীন যে সুপরিসর সাহিত্যের বিরাট্ প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীরা আদৌ উপনীত হইতে পারে না। আবার এমনও দেখা যায়, শিশুকে পূর্ণবয়স্ক মানুষের অপরিণত সংস্করণ হিসাবে ধরিয়া নিম্নশ্রেণীর গল্প পরিবেশিত হইয়া থাকে। অধম জাতের সস্তা লোমহর্ষক কাহিনীগুলির বাজে ও সুলভ সংস্করণের প্লাবনে ছোটদের সাহিত্য আজ প্লাবিত। এই কি ছোটদের সাহিত্যের সত্যকার পরিচয়?

আমাদের মাতৃভাষায় ছোটদের সাহিত্যের আবির্ভাব ও অভিব্যক্তি

কিন্তু শিশুমনেরও আছে পূর্ণতা, আছে ভাববৈচিত্র্য। পূর্ণবয়স্ক মানুষের একটি ছোট অপরিণত সংস্করণ হিসাবে শিশুকে দেখিলেই চলিবে না। শিশু—সে তো পূর্ণ-পরিণত শিশুই। শৈশব, বাল্য ও কৈশোর—জীবনের এই প্রতিটি স্তরেরই আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব বৈচিত্র্য, নিজস্ব পরিপূর্ণতা। ছোটদের সাহিত্যক্ষেত্রেও শিশু, বালক ও কিশোরের মানসিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আলাদা আলাদা তিনটি পূর্ণপরিণত স্তর থাকা প্রয়োজন। আমাদের ছোটদের সাহিত্যে এই বিভাগত্রয় নাই বলিলেই চলে। শিশু ও বাল-সাহিত্য কিছুটা থাকিলেও কিশোরসাহিত্যের অভাব খুবই বেশী। নিখিল বিশ্বের সকল স্থানেই ছোটদের সাহিত্য মোটামুটিভাবে বর্তমান যুগের সৃষ্টি। ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের গোড়ার দিকে ইংরাজিতে ছোটদের সাহিত্যকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়া আমাদের ছোটদের সাহিত্যের উদ্ভব। বিদ্যাসাগরের 'কথামালা', অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ', মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা', মনোমোহনের 'পদ্যমালা', প্রভৃতি ছোটদের পাঠ্য ও 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'কাদম্বরী', 'রামের রাজ্যাভিষেক', 'টেলিমেকস' প্রভৃতি আরও একটু বড়দের পাঠ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ পুস্তকগুলির অধিকাংশই উপদেশমূলক এবং ভাষাও বেশ নীরস এবং কঠিন। সে যাই হোক্—আমাদের মাতৃভাষায় ছোটদের সাহিত্যের উৎপত্তি ঘটিয়াছে শতবর্ষের কিছুটা পূর্বে। গদ্য এবং পদ্য—উভয় রীতিতেই খণ্ডিত বাংলায় ছোটদের সাহিত্য রচিত হইতেছে। ছোটদের মানসিক আহার যাঁহারা বর্তমানে সরবরাহ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো), ননীগোপাল চক্রবর্তী, বিমল ঘোষ (মৌমাছি) এবং পূর্ববঙ্গবাসী জসীম উদ্‌দীন, বন্দে আলী মিঞা, গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ মাদাব্বের, আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, তালিম হোসেন, হাবীবুর রহমন, শওকত ওসমান, আহ্‌সান হাবীব, শামছুন নাহার, হোস্‌নে আরা প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিশুমনের সত্যকার ছবিটি ছোটদের আধুনিক কবিতা অপেক্ষা ছড়াগুলিরই মধ্যে অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচীন কালের 'ছেলেভুলানো ছড়া'র পরেই আধুনিক কালে রচিত ছড়াজাতীয় ও অভিনয়াত্মক কবিতা-পুস্তকের নাম করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ', উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'ছোট্ট রামায়ণ', চারু

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাতের জন্মকথা', গুরুসদয় দত্তের 'ভজার বাঁশী', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হিজিবিজি' ও 'হাসিখুসি', সুখলতা রাওয়ের 'পড়াশুনা', সুনির্মল বসুর 'ছন্দের টুংটাং', নজরুল ইসলামের 'ঝিঙে ফুল', গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লাল-কালো' প্রভৃতি বইগুলির ছবি যেমন মজার মজার, তেমনি সুন্দর চকচকে। অতীতে শিশুপাঠ্য গ্রন্থহিসাবে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' প্রভৃতির খুব সমাদর ছিল, কিন্তু এক্ষণে প্রাচীন ছড়ারই ন্যায় ঐ প্রাচীন গল্পগুলিও প্রায় অবলুপ্ত। গল্পগুলির লিখনরীতি আধুনিক রুচিসম্মত না হইলেও, শিশুমনের নিকটে ইহার বিষয়বস্তুর আবেদন খুবই বেশি। পক্ষান্তরে, বাংলার পল্লীকাহিনীর সংগ্রহ হিসাবে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'টুনটুনীর বই', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল', ইংরাজি পরীকথার অনুসরণে লিখিত অথবা অনুবাদিত পুস্তক হিসাবে সুখলতা রাওয়ের 'গল্পের বই' 'আরও গল্প' ও পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের 'হাসু' ও 'এক পয়সার বাঁশী', বন্দে আলী মিঞার 'চোর জামাই', 'গল্পের আসর' ও 'মেঘকুমারী', আশরাফ সিদ্দিকীর 'কাগজের নৌকা', কাদের নওয়াজের 'দাদুর বৈটক', শেখ হাবীবুর রহমানের 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' প্রভৃতি বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

**শিশুসাহিত্য**

রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' প্রকৃতপক্ষে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ নয় সত্য, কিন্তু 'শিশু'র বহু কবিতায় এবং 'শিশু ভোলানাথে'র কয়েকটিতে শিশুমনের ছবি অবিকৃত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শিশুর ছেলেখেলার কথাটি এমনই সস্নেহ কৌতুকের সঙ্গে কবিতাগুলিতে বিবৃত হইয়াছে যে, ইহারা বালকদের খুবই উপভোগ্য। সুকুমার রায় চৌধুরীর 'আবোল-তাবোল' আজও অবধি বালকপাঠ্য হাসির কবিতার বই হিসাবে স্বনামধন্য। সুনির্মল বসুর কয়েকটি কবিতাতেও এই সুর লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' সম্ভবতঃ বঙ্গসাহিত্যের একমাত্র সচিত্র লিমারিকের বই। শেখ হাবীবুর রহমানের লেখা 'হাসির গল্প' ও 'সুন্দরবন-ভ্রমণ' বই দুইখানি বালকদের অতি প্রিয়। বালকদের জন্য দেশবিদেশের নানা কাহিনী ছাড়াও নানা দেশের পুরাণ ও উপদেশের গল্পও রচিত হইয়াছে। 'জাতকের গল্প', 'গ্রীকপুরাণেরকাহিনী', ঈশপের গল্প', 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'পুরাণের গল্প', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'মহাভারতের গল্প', 'টুকটুকে রামায়ণ' প্রভৃতির নাম এতৎপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। আবার সাঁওতাল, হো প্রভৃতি ভারতীয় আদিবাসীদের কাহিনীও আমাদের ছোটদের সাহিত্যের উপকরণ যোগাইয়াছে : যেমন,—'সাঁওতালী উপকথা', 'হোদের গল্প', হিন্দুস্থানী গল্পের সংকলনগ্রন্থ 'হিন্দুস্থানী উপকথা' এবং 'আরব্যোপন্যাস', 'আলাদিনের প্রদীপ', 'নাবিক সিন্দবাদ' প্রভৃতি আরবী ফার্সী পুস্তকাদির বাংলা সংস্করণ বালকদি

**বালসাহিত্য**

টে বেশ উপভোগ্য। প্রিয়ংবদা দেবীর 'পঞ্চুলাল', সীতা-শান্তা দেবীর 'আজব ও 'হুক্কাহুয়া' ইংরাজী গল্প-অবলম্বনে রচিত হইলেও শিশুর মনে, এমন কি কদেরও মনে, অফুরন্ত আনন্দের উৎস খুলিয়া দেয়।

শিশুমনে অপূর্ব ভাববৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় এমন ধরণের কল্পনাপ্রধান াহিত্য-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'সে' গ্রন্থটির তুলনা বিশ্বসাহিত্যেও পাওয়া দুষ্কর। ইহার সূক্ষ্ম রস পুরোপুরি উপভোগ করিবার ক্ষমতা একমাত্র কিশোরদেরই আছে, শিশুদের নাই। সুকুমার রায় চৌধুরীর

ারসাহিত্য

-য-র-ল-ব' ও লীলা মজুমদারের 'বদ্যিনাথের বড়ি' এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। বাংলার কিশোর-সাহিত্যের অভাব খুব বেশি করিয়া অনুভূত হয়। ছোটদের উপযোগী উপন্যাসসাহিত্য বিশেষ নাই। পক্ষান্তরে, ইংরাজিতে এই শ্রেণীর উপন্যাসের খুবই অতীতের লেখা 'অনাথ', 'উত্তরাধিকারী'র মত ছোটদের উপন্যাস আজকাল ার দেখা যায় না। শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনে লেখা 'ছেলেবেলার গল্প' কিশোরদের উপযোগী। সুকুমার রায় চৌধুরীর 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ও 'ঝালাপালা', রবীন্দ্রনাথের মুকুট' ও 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ধূপের ধোঁয়া', আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর বয়' প্রভৃতি নাটক ছোটদের অভিনয়োপযোগী ভাল নাটক। ছোটদের মনে ঐতিহাসিক চেতনা জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে 'রাজকাহিনী', 'রণডঙ্কা', 'তান্তিয়ার াহাদুরী', 'বিশে ডাকাত', রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি', আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর 'ইতিহাসের ানার পাতা' গ্রন্থগুলি খুবই মূল্যবান। বালসাহিত্যে ও কিশোরসাহিত্যে য়্যাড্‌ভেঞ্চার-শ্রেণীর উপন্যাসেরই প্রচলন সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহার দুইটি শ্রেণী—প্রথম, বিদেশী রোমাঞ্চকর কাহিনীর অনুবাদ অথবা অনুকরণ এবং দ্বিতীয়, মৌলিক রচনা। অসম্ভব াল্পনিক ভৌতিক ধরণের এই গল্পগুলি কল্পনাবিলাসী বাঙ্গালী জাতির পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নয়। এই জাতের সস্তা খেলো বই—যাহাকে ইংরাজিতে বলা হয় 'পেনী ড্রড্‌ফুল'—তাহা সাহিত্যের দিক দিয়া সত্যই 'ড্রেড ফুল'। বাংলা ও অপরাপর াষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করাইবার জন্য 'ছোটদের দেবী চৌধুরাণী', বিভূতিভূষণের 'আম আঁটির ভেঁপু', 'টলষ্টয়ের কাহিনী', 'সেক্‌স্‌পীয়রের গল্প' প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও 'পোকামাকড়', 'গাছপালা', ', 'গ্রহ-নক্ষত্র', 'বিশ্বপরিচয়', 'জ্ঞানবিজ্ঞানের কি ও কেন', 'বলতো?' প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পর্কিত পুস্তক ও 'পৃথিবীর ইতিহাস', 'সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ', 'পৃথিবীর সেরা সাহিত্য' প্রভৃতি ইতিহাস সম্পর্কিত পুস্তকাদিও ছোটদের সাহিত্যে স্বল্প দেখা দিয়াছে। নিছক ছোটদের উপযোগী ভ্রমণকাহিনী অতি অল্পই আমাদের াছে। এখনও দেশবিদেশের ছোটদের খবর আমরা বড় একটা পাই নাই।

ছোটদের জন্য সাময়িক পত্রিকারও প্রয়োজন। বিভাগপূর্ব বাংলায় প্রথম ছোটদের মাসিকপত্র ছিল প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' এবং ভুবনমোহন রায়ের 'সাথী'—পরে উভয়ের মিলিত নাম হয় 'সখা ও সাথী'। 'মুকুল', 'সন্দেশ'-এর পরেই 'মৌচাক', 'শিশুসাথী' 'রামধনু', 'রংমশাল', 'শিশু সওগাত' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য। সুখের বিষয় পূর্ব-পাকিস্তানে 'ঝংকার', 'মিনার', 'হুল্লোড়' প্রভৃতি শিশু মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু মাসিক পত্রিকা কয়েকখানি থাকিলেও ছোটদের দৈনিক সংবাদপত্র খণ্ডিত বাংলার কোন অঞ্চলেই একখানিও নাই। অথচ, সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিশ্বজগতের সঙ্গে বালক ও কিশোরদের পরিচয় হওয়া দরকার। বড়দের খবরের কাগজের অংশবিশেষে যেটুকু আলোচনা থাকে, তাহা আদৌ যথেষ্ট নয়। তবে, একেবারে যেখানে ছোটদের অন্য কোন বিশেষ দৈনিক পত্রিকা নাই, সেখানে এই ব্যবস্থাটিও মন্দের ভালো। কোন কোন বিদ্যালয়ে মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা আছে, কিন্তু তাহা পরিচালনার অভাবে ঠিক ছোটদের সাহিত্যের উপকরণে সমৃদ্ধ নয়। আবার এমন বিদ্যালয়ও দেখা যায়, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করিবার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে বাধাই সৃষ্টি করা হইয়া থাকে।

**ছোটদের সাময়িক পত্রিকা**

আজিকার এই স্বাধীন পাক্-ভারতে ছোটদের মনকে যদি শিশু হইতে বালক, বালক হইতে কিশোর অবধি সুপথে পরিচালিত ও গঠিত না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের দেশের মানবসম্পদই হইবে ক্ষতিগ্রস্ত। এই কথাটি স্মরণ করিয়া যদি আমরা ছোটদের সাহিত্য-রচনায় অগ্রসর হইতে পারি, তবেই হইবে দেশের কল্যাণ। অবশ্য একথাও ঠিক যে, ছোটদের মনের খাদ্য পরিবেশনকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে মানসিক অজীর্ণরোগেরও রহিয়াছে সম্ভবনা।

**শেষ কথা**

# বঙ্গসাহিত্যে মহিলা-শিল্পীর দান

মানবজীবনে আছে বহুবিচিত্র সমস্যা, আছে জটিল মনস্তত্ত্ব, আছে সীমাহীন প্রশ্ন ও মীমাংসা। এইগুলি লইয়াই তো সাহিত্যের ব্যাপক আয়োজন। এক দিকে বাস্তবানুভূতি এবং অপর দিকে ভাবকল্পনাকে অবলম্বন করিয়াই তো কবি-সাহিত্যিক মানবজীবনের কান্নাহাসি বিরহমিলন, সুখদুঃখের মালাখানি গাঁথিয়া যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের জীবনসমস্যার উপরে আলোকপাত করেন। কবি যে কাব্য রচনা করেন, ঔপন্যাসিক যে উপন্যাস রচনা করেন, নাট্যকার যে নাটক রচনা করেন—সে-সবেরই কেন্দ্রমূলে রহিয়াছে ঐ জীবনই। অন্তহীন কালতরঙ্গের বিচিত্রবিপুল গতিভঙ্গীর সঙ্গেই তো ঐ বিকশিত সাহিত্য

**ভূমিকা**

শতদল ভাসিয়া চলিয়াছে বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া অনাগত ভবিষ্যতের পানে। কিন্তু ঐ যে সাহিত্যশতদল—উহার মর্মমূলে রসের যোগান দিয়া আসিতেছে নর ও নারী উভয়েই। সাহিত্যের উপজীব্য এই যে মানবজীবন—ইহাকে নর যে ভাবে দেখে, ঠিক সেই ভাবেই দেখে না নারী। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পরিমাণগত না হোক, মাত্রাগত তো বটেই—একটা ব্যবধান বিদ্যমান। সুতরাং নারীসমাজের প্রতি কৃপানাঙ্ক্ষিত মনোভাব বা মহিলাদের শিল্পচেতনার প্রতি বিস্ময়-উপেক্ষা-মিশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাদের দানের সম্যক্ মূল্যবিচার করিবার অবকাশ নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বাংলা সাহিত্যের বিরাট্ আয়োজন পুরুষের সহিত তুলনায় নারীর দান নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু নারীহৃদয়ের যে বিশেষ অনুরণনটুকু মহিলা-শিল্পীদের শিল্পচেতনায় ধরা পড়িয়াছে, তাহার মূল্যও তো কম নয়। তাই বাংলা সাহিত্যে মহিলা-শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির মূল্য বিচার করিবার যুক্তি অস্বীকার করা চলে না।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কাব্য ও গল্প-উপন্যাসেই মহিলা-শিল্পীর দান সর্বধিক। অগণিত কাব্য-কবিতায় বাংলার মহিলা-শিল্পী আপনার প্রাণের কথা উজাড় করিয়া দিয়াছেন। নারীর কথা, নারীর হৃদয়, নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, নারীর বেদনা কাব্য-কবিতায় যেমন করিয়া স্ফূর্ত হইয়াছে এমনটি কোন বিভাগেই পরিদৃষ্ট হয় না। প্রসঙ্গতঃ, ইহাও সবিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মহিলা-কবিদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যকই দীর্ঘকাল পতিসঙ্গসুখ পাইয়াছেন। অধিকাংশ মহিলা-কবিই পতিহীনা। এমনও দেখা যায় যে, সধবা অবস্থায় অনেক মহিলা-কবির কাব্যপ্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটে নাই। পতিবিরহকাতরা রমণীর মর্মবেদনাই কবিত্বের রূপে-রসে ভরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই বাংলার মহিলা-শিল্পীর অন্তরদেশ মথিত করিয়া উঠিয়াছে—গভীর নৈরাশ্যের হলাহল, অন্তহীন বিষাদের অবিরাম তরঙ্গ। আবার ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ-বা পুত্র-কন্যাকে হারাইয়া ব্যক্তিগত শোকবেদনার প্রবল বন্যায় বঙ্গসাহিত্যভূমিকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছেন। গল্পে-উপন্যাসে নারী-শিল্পীর স্বকীয়ত্বের ছাপ তেমন ফুটিয়া ওঠে নাই। প্রবন্ধ ও নাটক রচনার ক্ষেত্রে মহিলা-শিল্পীর দান নিতান্তই নগণ্য—বিশেষ করিয়া শেষোক্তের বেলায় তো বটেই। বঙ্গসাহিত্যের এই দুইটি বিভাগে বঙ্গনারীর কণ্ঠ ও সুরের পরিচয় একরূপ নাই বলিলেই চলে। তাই 'মেয়েরা যদি তাদের বিশেষতর আনন্দ-বেদনার অনুভূতিগুলিকে নিজস্ব ঢঙে সাহিত্যে রূপ দিতে পারতো, তা'হলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হতো এবং লেখিকাও যথার্থ সিদ্ধিলাভ ক'রত।'

বঙ্গসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে মহিলা-শিল্পীর অবদান

বঙ্গের মহিলা-কবিদের কাব্যপ্রবাহের দুইটি ধারা—একটি, প্রাচীন এবং অপরটি, নবীন। এক দিকে যেমন সেকালের বাংলা কবিতার পয়ার ছন্দ, সেকালের সামাজিক সংস্কার, সেকালের আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব বিদ্যমান, অপর দিকে তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর কৃষ্টি, সমাজ-সংস্কার, দেশপ্রেম প্রভৃতির পরিচয়ও বর্তমান। বঙ্গের মহিলা-কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান দিতে হইবে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূতা রামীকে। তাঁহার পদাবলীতে চণ্ডীদাসের ন্যায় মর্মবিদারী গভীরতা ও অন্তর্গূঢ় তন্ময়তা না থাকিলেও একটা সরল অকৃত্রিম প্রেমের আর্তি তাঁহাকে আন্তরিকতার সুরে ভরিয়া তুলিয়াছে। ইহার পরেই সম্ভবতঃ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে আবির্ভূতা কবি চন্দ্রাবতীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রাবতীর গান পূর্ব-ময়মনসিংহে বহুলপ্রচারিত। মনসা দেবীর কথা এবং অসমাপ্ত রামায়ণ-কাব্য ছাড়াও কবি চন্দ্রাবতী 'মহুয়া', 'কেনারাম' প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মহিলা-কবি আনন্দময়ীর লেখা বিবাহ অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সম্পর্কিত গানগুলি সহজ আন্তরিকতার সুরে ভরপুর। আনন্দময়ীর সমসাময়িক গঙ্গাদেবীও বিবাহকালে গেয় বহু মঙ্গলগানের রচয়িত্রী। বঙ্গের মহিলা-কবিদের কাব্যপ্রবাহের ইহাই প্রাচীন ধারা।

**বঙ্গের মহিলা-কবিদের কাব্য-প্রবাহের দুইটি ধারা—(১) প্রাচীন ধারার পরিচয়**

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে শুরু করিয়া বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তক এই প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া বঙ্গসাহিত্যের এক গৌরবময় কাল। যুরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রভাব আমাদের সাহিত্যে বিশেষভাবে পড়িয়াছে। আবার রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যসভায় বঙ্গসাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের মহিলা-কবিদের কাব্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও বড় কম নয়। গদ্যসাহিত্যের দিক দিয়াই স্বর্ণকুমারী দেবীর সমধিক প্রসিদ্ধি সত্য, কিন্তু তাঁহার সংগীত এবং কবিতাপুস্তকের সংখ্যাও বড় কম নয়। তাঁহার লেখা 'গাথা' তে 'কথা-কবিতা'—ইহার বিষাদ-করুণ গল্পগুলি বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য রত্ন। তাঁহার প্রণয়-কবিতাগুলি রসমধুর। মানবজীবন যে কাব্য-কবিতার অবলম্বন, এই কথাটি প্রসন্নময়ী দেবীর প্রত্যেকটি কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছে। শতবর্ষ-পূর্ববর্তী সমাজচিত্র, নারীজাতির পক্ষে অকল্যাণকর কৌলীন্য ও দেশাচারের ছবি তাঁহার কবিতায় মিলে। অবিবাহিতা নারীজীবনের ভাব ও ভাষা তাঁহার 'কুমারী-চিন্তা' কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত। 'শিশুর হাসি' যে এ জগতে অতুলনীয় সামগ্রী, ইহা কবি প্রসন্নময়ী তাঁহার কবিতায় ফুটাইয়াছেন। আবার তাঁহার কবিতায় স্বদেশপ্রীতিরও আভাস পাওয়া যায়। পতিবিরহিণী বেদনাবিহ্বলা কবি গিরিন্দ্রমোহিনী দাসীর লেখা

'অশ্রুকণা' সম্পর্কে ৺চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—This is poetry in life and as expression of that poetry Asrukana is the history of the soul of a noble Hindu woman.' তাঁহার লেখা 'চোর' কবিতায় মাতৃহৃদয়ের অনবদ্য ছাপ পড়িয়াছে। কবি কামিনী রায়ের কবিতাগুলি লিরিকতাময়—স্বদেশপ্রীতি, সমাজসেবা ও প্রণয়বিহ্বল নারীহৃদয়ের রহস্যময় বর্ণালীতে ইহারা সমৃদ্ধ। সমাজের নিপীড়িতা পতিতা নারীদের বেদনায় তিনি বিমথিতা। ইংরাজ-কবি বার্ন্স্‌-এর ন্যায় তাঁহার কবিতায় বেদনাকরুণ উচ্ছ্বাস উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহার প্রণয়-কবিতাগুলি অতীব বিষাদময়। আবার কবি কামিনী রায়ের মাতৃহৃদয়ের আলেখ্য 'গুঞ্জন' নামক কবিতাপুস্তকের মধ্য দিয়া সুমধুর ছড়ার সুরে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার কবিতার মূল সুর—আশা, বিশ্বাস এবং আশ্বাস। মানকুমারী বসুর কবিতায় অবগুণ্ঠিতা লজ্জাবনতা সংকুচিতা বঙ্গমহিলার হৃদয়ের কথা ফাটিয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমসৃষ্ট ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া কবি মানকুমারীর লিখিত কবিতায় নারীজীবনের অনবদ্য মর্মকথা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ছাড়া, তাঁহার কবিতাবলী সমাজ ও প্রকৃতির চিত্রে, জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার সুরে, শিশুপ্রকৃতির গুঞ্জনে, ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠায় সমৃদ্ধ। তৎকালীন কুলীন কুমারীগণের মর্মবেদনা কবি মানকুমারীর আর্তকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'বাঙ্গালীর মেয়ে' শীর্ষক কবিতার প্রতিবাদে কবি মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় 'বাঙ্গালীর বাবু' শীর্ষক যে ব্যঙ্গ-কবিতাটি তৎকালে রচনা করেন, তাহা সে-যুগের বাঙ্গালী বাবুদের জীবন্ত চরিত্রালেখ্য হিসাবে যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছিল। কবি পঙ্কজিনী বসুর অধিকাংশ কবিতাই জীবনমৃত্যু-সমস্যা লইয়া বিরচিত। 'A thing of beauty is a joy for ever'—কথাটি কবি পঙ্কজিনীর 'সৌন্দর্য মহান্' কবিতায় সার্থক রূপ পাইয়াছে। এক দিকে লাঞ্ছিতা নারীসমাজকে লক্ষ্য করিয়া বিরচিত 'তাই দলে পাই' এবং অপর দিকে মেরুদণ্ডবিহীন বিলাসী অকর্মণ্য পুরুষসমাজকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত 'বাঙ্গালীর ছেলে'—এই দুইটি কবিতা কবি পঙ্কজিনীর দরদী দেশাত্মবোধময় হৃদয়ের অপূর্ব পরিচয় বহন করে। শোককাব্য 'প্রবাহ'-রচয়িত্রী কবি সরলাবালা সরকারের 'পাষাণী', 'ভিক্ষা', 'মনে রেখো' ইত্যাদি কবিতাগুলি পড়িবার কালে Cowper-এর 'On the receipt of my Mother's Picture' কবিতাটির কথা মনে জাগে। বিধবা রমণীর মর্মবেদনা তাঁহার 'চিতায় চিতায়' কবিতাটিতে সুপরিস্ফুট। সুগভীর নৈরাশ্য, নশ্বরতা ও হাহাকারই কবি প্রিয়ংবদা দেবীর কবিতার প্রাণ। তাঁহার কবিতাগুলি লিরিক—বেশির ভাগই ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথায় সমৃদ্ধ। সত্যই 'The poet is principally occupied

(২) নবীন ধারার পরিচয়

with herself'. রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী 'স্বামীর স্মৃতি'তে রচিত 'শোক-গাথা'র প্রতিটি কবিতায় মর্মস্পর্শী বেদনা প্রকাশ করিলেও, 'প্রীতি' কাব্যখানিতে তিনি জাগতিক শোকদুঃখবেদনার ঊর্ধ্বে বিশ্বজনীন প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছেন। কবি সুরমাসুন্দরী ঘোষের কবিতায় ছন্দ, শব্দ, ভাব ও বাক্যবিন্যাসের দিক দিয়া রবীন্দ্র-প্রভাব সুপরিস্ফুট। তাঁহার লেখা 'বঙ্গজননী' কবিতাটি স্বদেশ-প্রীতির ভাববন্যায় উচ্ছ্বসিত। কবি কুসুমকুমারী দাশ ছোটদের সাহিত্যের একজন যশস্বিনী লেখিকা। বাঙ্গালীর ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য তিনি শুনাইয়াছেন উদ্যম ও উৎসাহের বাণী। তাঁহার লেখা 'খোকার বিড়ালছানা', 'দাদার চিঠি' প্রভৃতি কবিতাগুলি শিশুমনের সহ-অনুভূতি স্বতঃই আকর্ষণ করে। কবিত্বে ও আধ্যাত্মিকতায় মহিলা-কবি অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তার কাব্যগুলি সমৃদ্ধ। তাঁহার লেখা 'বঙ্গকুলনারী' কবিতায় সেকালের বঙ্গনারীদের একটি জীবন্ত চিত্র বিদ্যমান। মহিলা-কবি বেগম রোকেয়া শাখাওয়াৎ হোসায়নের কবিতায় দরদী প্রাণের সুস্পষ্ট পরিচয় মিলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়,—"কবি হেমলতার দৃষ্টিকোণ দূরবিস্তারী নয়, তাঁহার কবিতা অসীমের সন্ধানে উন্মুখ হইলেওএকটি কেন্দ্রের মধ্যে রহিয়াছে সীমাবদ্ধ। এক কথায় বলা চলে—তিনি আদর্শবাদী ও আধ্যাত্মিক কবি, তাঁহার বিশ্বাস—"God's in His Heaven, all's right with the world." কবি নিরুপমা দেবীর কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট সত্য, তবু ছন্দের ঝংকারে, শব্দচয়নের নৈপুণ্যে, ভাবের নূতনত্বে ও অন্তরের প্রেরণায় তাঁহার স্বকীয় প্রতিভা প্রকটিত। বেদনার মধ্য দিয়াও যে প্রেম জয়যুক্ত হইতে পারে, ইহা নিরুপমা দেবীর কবিতায় সুপ্রকাশিত। মহিলা-কবি লীলা দেবীর কবিতায় আছে সহজ স্বাভাবিকতা, আছে সংযত সৌষ্ঠব, আছে প্রসাদগুণ। পেলব ভাষা, মধুর ভাব, মৃদু গীতলহরী থাকায় তাঁহার কবিতাগুলি মনের মধ্যে আনন্দের রেশ সঞ্চারিত করে। মহিলা-কবিদের মধ্যে রাধারাণী দেবীই বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠা রূপে পরিগণিত। ইনিই আবার 'অপরাজিতা দেবী' ছদ্মনাম লইয়া সম্পূ পৃথক্ প্রকৃতির এক কবি-প্রতিভা দেখাইয়া আমাদিগকে বিস্ময়বিমূঢ় করিয়াছেন রাধারাণী দেবীর কবিতায় অন্তরবেদনার আনন্দরূপ প্রকাশটি বড়ই করুণ, অথচ যে কোন্ সুদূরের বাঁশীর প্রতিধ্বনিসদৃশ ; পক্ষান্তরে, অপরাজিতা দেবীর কবিতা নবপরিণীত তরুণীর জীবন-ছন্দে ছন্দিত, বঙ্গনারীর বহুবিচিত্র মূর্তির অনবদ্য রূপায়ণে সমুজ্জ্বল সর্বোপরি, অপরাজিতা দেবীর 'বিচিত্ররূপিণী' গ্রন্থখানিতে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রসম্মত নায়িকার আটটি অবস্থা আধুনিক কালের জীবনে যে ভঙ্গীতে আরোপিত হইয়াছে, তাহা সত্যই অভূতপূর্ব। বাংলা সাহিত্যের ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ। মুসলমান মহিলা কবি নূরুন্নাহারের 'অগ্নিফসল' কাব্যগ্রন্থখানি ভাবে ভাষায় ও ছন্দে সত্যই অনবদ্য

অবশ্য সুফিয়া কামাল, শাহেদা খানম্, জাহানারা আরজু হোসনে আরা, তহমিনা বানু প্রভৃতি মুসলমান মহিলা-কবিদের দানও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক মহিলা-কবি স্বর্গতা উমা দেবী ছোটখাট সুখদুঃখবিজড়িত এই ছোট্ট জীবনটুকুর প্রাত্যহিক রূপচিত্র সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির বলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ইহা এক নূতনতর দৃষ্টভঙ্গী সন্দেহ নাই। বর্তমান শতাব্দীতে অনেক মহিলা-কবিই কাব্য-কবিতা রচনা করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভা প্রকৃতই কোন্ পথে পরিণতি লাভ করিবে, সে বিষয়ে এখনও কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়।

বঙ্গসাহিত্যে মহিলা-ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের মূল বিচার করিবার কালে দেখিতে হইবে দুইটি দিক—একটি, সাহিত্যিক উৎকর্ষ এবং অপরটি, নারীর সুরবৈশিষ্ট্য। বর্তমান সমাজব্যবস্থার মূলগত পরিবর্তন নয়—ইহারই মধ্যে নারীর ন্যায়সংগত অধিকার-দাবি—ইহাই নারীর বাণী। পুরাতন যৌথ পরিবার-প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় নারী পাইয়াছে এক ব্যাপক মুক্তির আস্বাদন, সংকুচিত ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ—ইহাই নারীর জীবনাভিব্যক্তি। বঙ্গীয় সমাজে নিঃসম্পর্কীয়া নারীর সঙ্গে পুরুষ ঔপন্যাসিকের ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগ বড়ই কম, পক্ষান্তরে মহিলা-ঔপন্যাসিকের সুযোগ বড়ই বেশি। তাই মহিলা-রচিত উপন্যাসে নারীর সুরবৈশিষ্ট্য থাকিবারই কথা। স্বর্ণকুমারী দেবী মহিলা-ঔপন্যাসিকদের প্রথম পথপ্রদর্শিকা কিনা জানি না, তবে উপন্যাস-রচনার উৎকর্ষ ও পরিমাণের দিক দিয়া তাঁহাকেই মহিলা-ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে স্বর্ণকুমারীর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না—তবে সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসগুলিতে বাস্তব রসসমৃদ্ধি ও নিরপেক্ষ দৃষ্টভঙ্গী ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য লেখিকার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস 'কাহাকে'র ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, বইখানির প্রথম হইতে শেষ অবধি নারীহস্তের কোমলপেলব লঘুমধুর স্পর্শ বিস্তৃত।

মহিলা-ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের মূল্যবিচারের সূত্র—স্বর্ণকুমারী দেবী

অতঃপর মহিলা-রচিত উপন্যাস দুইটি বিপরীতমুখী প্রবাহের সম্মুখীন হইয়াছে। এক শ্রেণীর মহিলা-ঔপন্যাসিক হিন্দু সমাজের প্রতি আক্রমণ ও সমালোচনা সহিতে না পারিয়া ইহার সনাতন বিধি-নিষেধ ও চিরাগত আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছেন। অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী এই শ্রেণীরই প্রতিনিধিস্থানীয়া। অপর শ্রেণীর মহিলা-ঔপন্যাসিক নারীহৃদয়ে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘাত এবং ইহার মাঝে পরিবর্তনের তরঙ্গ-চাঞ্চল্য তথা নারীসমাজে আধুনিক মনোবৃত্তির প্রতিবিম্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সীতা দেবী ও শান্তা দেবী এই শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয়া।

মহিলা-রচিত উপন্যাসের দুইটি বিপরীতমুখী ধারা :

নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবীর আদর্শ, মনোভঙ্গী, জীবনরসরসিকতা ও বিশ্লেষণপদ্ধতি প্রায় একই রূপ। তবে সৃষ্টিশক্তিতে অনুরূপা দেবীর শ্রেষ্ঠত্ব থাকিলেও কলাকৌশলে চিত্তবিশ্লেষণে নিরুপমা দেবীরই শ্রেষ্ঠত্ব। নিরুপমা দেবীর "সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, সুকুমার চিন্তাশীলতা ও জীবন-সমালোচনায় অন্তর্নিহিত একটি কোমল করুণ ভাব তাঁহার নারীহস্তের লঘু স্পর্শটি চিনাইয়া দেয়।......'দিদি' নিরুপমা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।......সুরমার মত এমন সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে পরিকল্পিত, প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে জীবন্ত, প্রাণের নিগূঢ় স্পন্দনে লীলায়িত চরিত্র বোধ হয় বঙ্গ-উপন্যাসে নারী-জগতে দুর্লভ।" ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনায় অনুরূপা দেবীর স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায় না—সামাজিক উপন্যাসেই তাঁহার শক্তিপ্রাচুর্য সুপরিস্ফুট। তাঁহার 'মা' উপন্যাস সর্বপেক্ষা জনপ্রিয়। তবে 'মহানিশা' ও 'গরীবের মেয়ে'তে ভাবগভীরতা না থাকিলেও কতিপয় অনন্যসাধারণ গুণের জন্য 'মন্ত্রশক্তি'ই অনুরূপা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। শেষোক্ত "উপন্যাসে লেখিকা জীবনের উপর বেদমন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বাস্তব জীবনের সহিত রোমান্সের এক অভিনব সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। ইহাই 'মন্ত্রশক্তি'তে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব।" তাঁহার 'পথহারা' উপন্যাসের ভিত্তিমূলে রহিয়াছে বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে অতীব পরিচিত বিপ্লববাদ। রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশালতার পরিবেশেও এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট। অনুরূপা দেবীর উপন্যাসাবলীতে পুরুষশিল্পীসুলভ মন্তব্যের প্রাচুর্য ও বিশ্লেষণ-পাণ্ডিত্য থাকিলেও, ব্রজরাণী নীলিমা রাণী উৎপলা প্রভৃতি নারীচরিত্রের বিকাশ-ব্যাপারে নারীহস্তের সুকোমল স্পর্শ স্বতঃই অনুভূত হয়। এই নিরুপমা-অনুরূপা ধারারই অনুবর্তনের মধ্যে পড়েন ৺ইন্দিরা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শৈলবালা ঘোষজায়া, মাজেদা খাতুন, তহমিনা বানু প্রভৃতি।

—একটি ধারার পরিচয়

বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতা, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ, সভ্যতা-ভব্যতা ইত্যাদির সংঘাতে আমাদের সমাজে যে জটিলতার আবির্ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাকেই প্রেম ভালোবাসা প্রভৃতি মানুষের সুকুমার অনুভূতিগুলির ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া যাঁহারা বাংলা সাহিত্যে রূপায়িত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সীতা দেবী ও শান্তা দেবীই অগ্রণী। সীতা দেবী বেশ কয়েকটি ছোট-গল্প ও অল্প কয়েকটি উপন্যাস লিখিয়াছেন। 'রজনীগন্ধা'ই এই লেখিকার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। "স্ত্রীজাতির পক্ষ হইতে, তাহাদের অন্তর্দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করিবার জন্য উপন্যাস লিখিলে কিরূপ নূতন আর্টের সৃষ্টি হইতে পারে, 'রজনীগন্ধা' তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।........নারীর হাতে চিত্রতুলিকা থাকিলে পুরুষের ভাগ্যে এইরূপ বিরল বর্ণবিন্যাস খুব স্বাভাবিক।....নারীর দিক হইতে প্রেমের

—অপর ধারার পরিচয়

অপ্রতিরোধনীয় প্রভাবের এরূপ বিবরণ বাংলা উপন্যাসে বিরল এবং ইহাই উপন্যাসটির গৌরবময় বিশেষত্ব।" শান্তা দেবী লিখিত ছোট-গল্পাদির মধ্যে মনোবিশ্লেষণ ও হৃদয়বৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতের দিক দিয়া 'পরাজয়' গল্পটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। শান্তা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চিরন্তনী'র সঙ্গে সীতা দেবীর ঐ 'রজনীগন্ধা'র এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যে মহিলা ঔপন্যাসিকের অবদানের বৈশিষ্ট্য 'চিরন্তনী'তে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে। সীতা ও শান্তা দেবীর যুগ্ম রচনা 'উদ্যানলতা' উপন্যাসখানিতে লিখনভঙ্গীর ঐক্য থাকায় যে সুখপাঠ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাবগভীরতার দিক দিয়া আদৌ সমৃদ্ধ নয়। আশালতা সিংহ, আশাপূর্ণা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, অমলা দেবী, বাণী রায়, প্রতিভা বসু প্রভৃতি এই সীতা-শান্তা কর্তৃক সূচিত ধারারই মধ্যে পড়েন।

বাংলা প্রবন্ধ, নাটক, প্রহসন, জীবনবৃত্তান্ত, ভ্রমণবৃত্তান্ত ইত্যাদির ক্ষেত্রে মহিলা-শিল্পীর দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। নারীর কথা, নারীর জীবনবাণী, নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগগুলিতে সেরূপ স্বতঃস্ফূর্ত হয় নাই। প্রথম মহিলা-নাট্যকার কামিনীসুন্দরী দেবীর লেখা 'উর্ব্বশী' নাটক, শ্রীমতী রাসসুন্দরীর লেখা 'আমার জীবন' আত্মজীবনী, স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা 'কনে-বদল' ও 'পাকচক্র' প্রহসন, 'নিবেদিতা' ও 'দিব্যকমল' নাটক, 'কৌতুকনাট্য ও বিবিধকথা', প্রসন্নময়ী দেবীর লেখা 'উত্তর-ভারত ভ্রমণকাহিনী', সামাজিক ও পারিবারিক চিত্র' ও 'তারা-চরিত' জীবনবৃত্তান্ত, কামিনী রায়ের লেখা 'সিতিমা' গদ্য-নাটিকা ও 'শ্রাদ্ধিকী' জীবনবৃত্তান্ত, মানকুমারী বসুর লেখা 'বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা' প্রবন্ধ, বীরবল-পত্নী ইন্দিরা দেবীর লেখা 'নারীর উক্তি' প্রবন্ধপুস্তক, অনুরূপা দেবীর লেখা 'সাহিত্য ও সমাজ' প্রবন্ধ, শরৎকুমারী চৌধুরাণীর লেখা স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী, সরলা দেবী চৌধুরাণীর লেখা 'কালীপূজায় বলিদান ও বর্তমানে ইহার উপযোগিতা' প্রবন্ধ, নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী (সরস্বতী) রচিত 'নারীধর্ম' ও গার্হস্থ্যধর্ম' সন্দর্ভ, প্রফুল্লময়ী দেবীর লেখা 'ধাত্রী পান্না' নাটক, সরযূবালা সেনের লেখা 'অন্নপূর্ণা' একাঙ্কিকা, মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা 'চিত্তছায়া', 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' ও 'কবি-সার্বভৌম' নামে রবীন্দ্র-সাহিত্য সমলোচনা প্রভৃতি রচনা বাংলা সাহিত্যের ঐ বিভাগগুলিতে মহিলা-শিল্পীর দানের স্বরূপনির্ণয়ে খানিকটা সাহায্য করে এইমাত্র। বর্তমানে এই দিকগুলিতে যে কয়েকজন মহিলা-শিল্পী তাঁহাদের রচনাশক্তিকে কিছুটা নিয়োজিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ডক্টর সতী ঘোষ, ডক্টর উমা দেবী, ডক্টর দীপ্তি ত্রিপাঠি, বাণী রায়, কমলা কাঞ্জিলাল, সুচরিতা রায়,

বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য বিভাগে মহিলা-শিল্পীর দান—উপসংহার

অমিতা মিত্র, রেণু মিত্র, ডক্টর প্রভাময়ী দেবী প্রভৃতি। ইহারা প্রায় সকলেই অধ্যাপিকা। শিক্ষা-দীক্ষায়, বিদ্যাবুদ্ধিতে আধুনিক বঙ্গমহিলারা যখন পুরুষের সমকক্ষতা দাবি করিতেছেন এবং সে দাবি যখন অতীব স্বাভাবিক বলিয়া আজ সর্বজনস্বীকৃতও বটে, তখন বঙ্গসাহিত্যে মহিলা-শিল্পীদের আবির্ভাব হোক্ সুন্দরতর, তাঁহাদের কৃতিত্ব হোক্ মহীয়ান, তাঁহাদের জীবনদৃষ্টি হোক্ গভীর ও ব্যাপক।

## একখানি উপন্যাসের আলোচনা ঃ দেনাপাওনা

উপন্যাসে কোন-না-কোন রকমের একটা গল্প থাকিবেই। এই গল্পের আছে মোটামুটি ভাবে পাঁচটি উপকরণ। প্রথমতঃ, একটা কিছু অবশ্যই ঘটিবে এবং এই সংঘটনেরই নাম কথাবস্তু (plot)। দ্বিতীয়তঃ, কেহ-না-কেহ থাকে ঘটনার লক্ষ্য এবং এক বা ততোধিক ব্যক্তির দ্বারা ঘটে ঐ ঘটনাটি। যাহারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়ে, তাহারাই গল্পের চরিত্র। তৃতীয়তঃ, যাহা কিছু ঘটে, তাহা কোন সময়ে কোন স্থানে নিশ্চয়ই ঘটে। এই স্থান ও কালই গল্পের পটভূমি-পরিবেশের যোগান দেয়। চতুর্থতঃ, গল্পমাত্রই কোন-না-কোন উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হয়। গল্পের এই উদ্দেশ্যটি কোথাও-বা কোন ভাবতত্ত্বকে ফুটাইয়া তোলে, কোথাও-বা কোন নীতিগত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে, কোথাও-বা মনুষ্যসম্পর্কিত কোন সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হয়। তাই সাধারণতঃ গল্পমাত্রেরই থাকে একটা মূল তত্ত্ব বা ভাব। ইহাই গল্পের অন্তর্নিহিত ভাবকথা। পঞ্চমতঃ, গল্পকথার মাঝে আছে যে জীবনসত্য তাহা দুই জাতের—একটির নাম তথ্যানুগত্য এবং অপরটির নাম জীবনতত্ত্বানুগত্য। কোন গল্পে তথ্যকে হুবহু অনুকরণ করিয়া যে বাস্তবতা দেখা দেয়, তাহা একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্ভূত ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে, জীবনতত্ত্বানুগত্যের রচয়িতা সব সময়ে স্থূল জীবনতথ্যের ফটো না তুলিলেও, তথ্যের অন্তরালে জীবনসত্যের যে সূক্ষ্ম রূপ বিরাজিত, তাহার সম্পর্কে তিনি যে অতিমাত্রায় সচেতন ও অনুসন্ধিৎসু—এ বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নাই। কোন উপন্যাসের আলোচনা করিতে গেলে গল্পের এই পাঁচটি উপকরণের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। শরৎচন্দ্রের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দেনাপাওনা' গ্রন্থখানির এই পাঁচটি উপকরণ সজ্জাই বা কিরূপ?

**উপন্যাস আলোচনার পাঁচটি উপকরণ**

'দেনাপাওনা' উপন্যাসের কথাবস্তুতে দুইটি কাহিনী বা গল্প গ্রথিত হইয়াছে—ষোড়শী-জীবানন্দের কাহিনীই মূল কথাবস্তু (main-plot) এবং হৈমবতী-নির্মলের কাহিনী উপ-কথাবস্তু (sub-plot)। কিন্তু কাহিনী দুইটি ঘনসন্নিবদ্ধ হওয়ায় শিল্পগত ঐক্যনীতি বজায় রহিয়াছে। কেননা,—চণ্ডীগড়ের মন্দিরের ভৈরবীর মানসজগতে অলকা-সত্তার পরিপুষ্টি-সাধনের জন্যই এই হৈমবতী-নির্মলের আখ্যানের অবতারণা। নিছক কাহিনীর জন্য

কাহিনী ইহা নয়। নায়িকা ভৈরবীর সংস্কারগত ষোড়শীসত্তা যাহা জীবানন্দের সঙ্গে মিলন-ব্যাপারে দারুণ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে এই উপ-কথাবস্তুটির ঐ হৈমবতী-চরিত্রটি এবং অলকার কাছে আত্মসমর্পণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ জীবানন্দকে আরও সচেতন, আরও সক্রিয়, আরও প্রেমবিহ্বল করিয়াছে ঐ নির্মল চরিত্রটি। নির্মলের প্রতি ঈর্ষাই অলকা-জীবানন্দের পুনর্মিলনকে ত্বরিতান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। যে হৈমবতী ভৈরবীর অন্তরে অলকাসত্তাকে জীয়াইয়া তুলিয়াছে, তাহারই উপকারার্থে ঘটিয়াছে জীবানন্দ-অলকার পুনর্মিলন। এমনিভাবে মূল কথাবস্তু ও উপ-কথাবস্তুর মধ্যে একটা আন্তর যোগাযোগ রচিত হইয়াছে। হৈমবতী-নির্মলের কাহিনীটি তাই আদৌ অবান্তর নয়। দেনাপাওনার কথাবস্তু ঐ গ্রন্থের বিভিন্ন মানবপ্রকৃতির ক্রীড়া হইতেই উদ্ভূত।

মূল ও উপ-কথাবস্তু

আকস্মিকতা ও যোগসৌষ্ঠব ( chance and coincidence ), যাহা রোমান্টিক উপন্যাসের উত্তেজনার অংশবিশেষ, তাহা জীবনতত্ত্ব-সংবলিত এই উপন্যাসে বড় একটা দেখা না দিলেও, কথাবস্তুর গোড়াপত্তন করিয়াছে ঐ আকস্মিকতা ও যোগসৌষ্ঠবই। জীবানন্দ চাহিয়াছে ভৈরবী ষোড়শীকে, পাইয়াছে পরিত্যক্তা পত্নী অলকাকে। এহেন আকস্মিকতা ও যোগসৌষ্ঠব বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তবে একথা ঠিক যে, উত্থানই হোক, কি পতনই হোক, উহা সর্বতোভাবে নির্ভর করে জীবনানুশীলনেরই উপরে। তাই প্রবৃত্তির অদম্য ঘোড়া চালাইতে অভ্যস্ত জীবানন্দ অলকাকে পায় নাই, অলকাকে যে-জীবানন্দ পাইয়াছে সে আর একজন, সে তখন নিবৃত্তির স্নিগ্ধ জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্। অলকার কাছে তাহার দেনা জীবানন্দকে পুরোপুরি শুধিতে হইয়াছে এবং অলকা তাহার পাওনা গণ্ডা পুরোপুরিই আদায় করিয়াছে। তাই গ্রন্থের এই 'দেনাপাওনা' নামকরণটি কৌতূহলোদ্দীপক ও দ্যোতনাত্মক।

আকস্মিকতা ও যোগসৌষ্ঠব; নামকরণ

উপন্যাসের গল্পারম্ভের নানাবিধ পদ্ধতি আছে—তবে মোটের উপরে তাৎক্ষণিক কৌতূহল জাগানোই আসল কথা এবং তাহাতেই পদ্ধতিবিশেষের সার্থকতা। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে শরৎচন্দ্র নিজেই কিছুটা বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরে জীবানন্দ ও এককড়ির কথাবার্তার মধ্য দিয়া চণ্ডীগড় গ্রাম ও চণ্ডীদেবীর মন্দির, বীজগাঁয়ের জমিদারবংশ, গড়চণ্ডীর সেবায়েৎ, ভৈরবী-প্রসঙ্গ ইত্যাদি বণিত হইয়াছে। মূল গল্প বুঝিতে হইলে পূর্বাহ্নেই যেটুকু জানা দরকার, সেইটুকুই এখানে পরিবেশিত হইয়াছে—ইহাকেই বলা হয় পূর্ববর্তী ক্রিয়া (antecedent)। বলা বাহুল্য, জীবানন্দ ও এককড়ির ঐ প্রথম সংলাপটি (dialogue) এত স্পষ্ট ও কৌতূহলোদ্দীপক যে উহাদিগের মনের স্বরূপ বুঝিতে আমাদের একটুও কষ্ট হয় না।

উপন্যাসের প্রারম্ভ

ঘটনাদি ( incidents ) ও ঘটনাধারাদিকে (episodes) লইয়া উপন্যাসের কথাবস্তু গড়িয়া ওঠে। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের ঘটনাদি কোথাও-বা কথাবস্তুকে আগাইয়া দিয়াছে, কোথাও-বা চরিত্রবিকাশ করিয়াছে, কোথাও-বা পটভূমি-পরিবেশকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সাধারণতঃ, উপন্যাসের মধ্যভাগের পূর্বে চরম সংকটক্ষণ ( climax ) আসে না। কিন্তু 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে উহা আসিয়াছে প্রথম দিকেই, যেখানে জীবানন্দের শয্যাস্পর্শহেতু ভৈরবী-ষোড়শীর মাঝে জাগিয়াছে অলকা সত্তা। একটু অন্তর্ভেদী ও দূরপ্রসারী দৃষ্টি থাকিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, ভৈরবীর ষোড়শী-সত্তা গোড়াতেই অলকা-সত্তার কাছে হার মানিয়াছে এবং কোনদিনই আর ষোড়শী-সত্তার জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা নাঃ—গল্পের এই পরিণতির বীজটি লেখক গল্পের সূচনাতেই বুনিয়া রাখিয়াছেন। গল্পের মাঝে কৌতূহল পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিবার জন্য শরৎচন্দ্র কোথাও বা পরিচ্ছেদের ফলপ্রসূ সমাপ্তি টানিয়াছেন, কোথাও-বা তিনি পাঠক পাঠিকার কাছে সংবাদ গোপন রাখিয়া তাহাদের কৌতূহল বাড়াইয়া দিয়াছেন, কোথাও বা তিনি বর্ণনায় সংশয় ( suspense ) সংক্রামিত করিয়াছেন, আবার কোথাও-বা তিনি অপ্রত্যাশিতপূর্ব আকস্মিক ঘটনা, নাটকীয় মুহূর্তাদি (dramatic moments) তথা গর্ভিকাশ্রেণী এবং গর্ভের মারফতে বিস্ময় সঞ্চারিত করিয়াছেন।

ঘটনা, ঘটনার চরম সংকটক্ষণ, নাটকীয় মুহূর্তাদি

'দেনাপাওনা' উপন্যাসের গল্প-পরিধি অপ্রয়োজনে বিস্তৃত করা হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহার উপসংহার নাটকোচিত হয় নাই—বড়ই দুর্বল। পাঠক-পাঠিকাকে খুশি করিবার জন্য যেন নিতান্তই আকস্মিকভাবে অলকাসত্তা-প্রধান ষোড়শী আসিয়া 'হেঁট হইয়া মাথাটা তাহার জীবানন্দের বুকের উপরে রাখিয়া স্থির হইয়া রহিল। বহুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না, কেবল একজনের প্রবল বক্ষস্পন্দন আর একজন নিঃশব্দে অনুভব করিতে লাগিল।' শুধু ইহাই নয়। ষোড়শী নিজেদের ভিতরকার দেনাপাওনা মিটাইয়া প্রজাদের কাছে পুরুষানুক্রমে জমা-করা ঋণ যে বংশপরম্পরায় জীবানন্দ-ষোড়শীকে শুধিতে হইবে তাহাও, ঐ বৃহত্তর দেনাপাওনার কথাও, জানাইয়া জীবানন্দের হাত ধরিয়া নূতন করিয়া সংসার পাতিতে চলিল। কিন্তু কাব্যগত ঔচিত্যের (poetic justice) দিক দিয়া, চমৎকারিত্বের দিক দিয়া, কথাবস্তুর সকল পরিণতির দিক দিয়া, ইহা সমর্থনীয় নয় বলিয়াই 'দেনাপাওনার' নাটকীকরণের বেলায় অর্থাৎ ষোড়শী নাটকে শরৎচন্দ্র জীবানন্দের মৃত্যুবিধান দিয়াছেন এবং সে মৃত্যু মহান মৃত্যুই বটে। কারণ—মরণ যেদিন আসিয়াছে, সেদিন সে নির্ভীক চিত্তেই তাহাকে বরণ করিয়াছে; অসমাপ্ত কাজের জন্য কোন ক্ষোভই তাহার অন্তরে জাগে নাই, অলকার সহিত পুনর্মিলনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষাও তখন কাটিয়া গিয়াছে—তাই সে অস্তগামী সূর্যের সোনালী আভার মাঝে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছে তাহার অন্তোন্মুখ জীবনের নিষ্কামতার স্নিগ্ধ প্রশান্ত জ্যোতি।

উপন্যাসের উপসংহার

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে যে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের সক্রিয়তাই গল্পের কথাবস্তু রচনা করিয়াছে। কথাবস্তুর প্রয়োজনে চরিত্রগুলি গঠিত হয় নাই, চরিত্রগুলি আপন আপন বৈশিষ্ট্যানুযায়ী খেলিয়া কথাবস্তু গঠন করিয়াছে। জীবানন্দ ও ষোড়শী এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা ( hero and heroine) তথা প্রধান চরিত্র—তাহাদেরই অদৃষ্টের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র কথাবস্তুটি বিজড়িত। এককড়ি, রায়মহাশয়, হৈমবতী, নির্মল, ফকিরসাহেব, শিরোমণিমহাশয়, তারাদাস চক্রবর্তী প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্র—গল্পটিকে জমজমাট করিবার জন্যই ইহাদের প্রয়োজন। উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রগুলির সৃষ্টি হয় নানা উদ্দেশ্যে। 'খাসা হাত-যশে' যশস্বী বল্লভ ডাক্তারকে হিউমাররস পরিবেশনের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। ফকিরসাহেব-চরিত্রটি অপ্রধান হইলেও অবান্তর নয়; কারণ, অন্যতম প্রধান চরিত্র ষোড়শীর কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনিই করিয়াছেন অর্থপ্রকাশী সমালোচনা। মন্দিরের পটভূমি-পরিবেশ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য রাণীর মা, বৃদ্ধ পুরোহিত—এই অপ্রধান চরিত্র দুইটির সৃষ্টি হইয়াছে। যে বর্ষীয়সী রমণী ষোড়শীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে—'হতভাগীকে ঝাঁটা মেরে দূর কর, শিরোমণিমশাই, বড় অহংকার! বড় অহংকার! জমিদারের বাগানবাড়ীতে এক রাত এক দিন কাটিয়ে এসে বলে কিনা বাবুর অসুখ হয়েছিল! হয়েই যদি থাকে—তো তোর কি!—সেও অপ্রধান চরিত্র। দৃশ্যকে বাস্তবরসে রসায়িত করিবার জন্যও তো এ রকমের অপ্রধান চরিত্র দরকার। জীবানন্দ ও ষোড়শীকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নির্মল এবং হৈমবতীরও প্রয়োজন তো অনিবার্য। শিল্পী শরৎচন্দ্র এমন কোন অপ্রধান চরিত্র এই গ্রন্থে আঁকেন নাই, যাহা প্রধান চরিত্রের উপর হইতে আমাদের কৌতূহল অপনোদন করিতে সক্ষম। ধূর্তশিরোমণি এককড়ি, অর্থপিশাচ জনার্দন, বাচাল শিরোমণিমহাশয়, নির্ভীক সাগর সর্দার, ন্যায়পরায়ণ ফকিরসাহেব, লক্ষ্মীসমা হৈমবতী, সাহেবিয়ানা কেতা-দুরস্ত নির্মল ব্যারিষ্টার প্রভৃতি চরিত্রগুলির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, শরৎচন্দ্রের সহ-অনুভূতি কত ব্যাপক, বিপরীতমুখী চরিত্রের সাহায্যে কল্পনার জগৎ গড়িতে তিনি কত নিপুণ!

**প্রধান অপ্রধান চরিত্র-সৃষ্টির রহস্যকথা**

অবশ্য গল্পের গতির সঙ্গে সঙ্গে অপ্রধান চরিত্রগুলির কোন পরিবর্তন, কোন বিকাশ ঘটে নাই—উহারা স্থির চরিত্র ( static character )। কিন্তু জীবানন্দ ও ষোড়শী-চরিত্রের পরিবর্তন ও বিকাশ হওয়ায় ইহারা গতিশীল চরিত্র ( kinetic character )। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রমাত্রই সাধারণতঃ গতিশীল ধাঁচের, কেবলমাত্র অপ্রধান চরিত্রগুলিই স্থির প্রকৃতির। জীবানন্দ ও ষোড়শী-চরিত্র দুইটির মনে ও অন্তরে সময় ও অবস্থাবিশেষে যে পরিবর্তন ও অভিব্যক্তি সূচিত করিয়াছে, তাহাতে 'দেনাপাওনা'কে 'মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস' হিসাবে ধরিতে বাধা নাই। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই একের প্রভাব অপরের

**স্থির ও গতিশীল চরিত্র; চরিত্রায়ণ পদ্ধতি**

উপরে পড়িতে বাধ্য এবং গল্পের কোন চরিত্রই স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করিতে পারে না। জীবানন্দের উপরে ষোড়শীর প্রভাব যদি না পড়িত, ষোড়শীর উপরে হৈমবতীর প্রভা যদি না দেখা দিত, তাহা হইলে জীবানন্দ ষোড়শীর জীবন হইত অন্যবিধ। 'দেনাপাও' উপন্যাসের চরিত্রাভিব্যক্তি ঘটিয়াছে নানাভাবে। জীবানন্দ ও ষোড়শীর মনের ক বহু স্থানেই শরৎচন্দ্র খুব সতর্কতার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন—চরিত্র দুইটির বৃত্তিসমূ (motives) ও কার্যকলাপের (reactions) কারণ তিনি স্পষ্ট করিয়াই দেখাইয়াছেন ইহাদের মনের চিত্র লেখক নিপুণ বিশ্লেষণ-শক্তির সাহায্যে দিনের আলোর মত করিয়া তুলিয়াছেন। মনোবিশ্লেষণ ছাড়াও জীবানন্দ এবং ষোড়শীর আকৃতির শব্দচি আঁকিয়া অর্থাৎ বর্ণনা করিয়াও লেখক ইহাদের বাহিরের চেহারাকে অতিক্রম করি ইহাদের মনোধর্ম সম্পর্কেও অনেকখানি আলোকপাত করিয়াছেন। সাগরসর্দার শিরোমণিমশায় প্রভৃতির মুখে এমন সংলাপ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের চরিত্র বুঝিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। বিদায় লইবার আগে ষোড়শী যখন জীবানন্দকে ভাত মাছের ঝোল খাওয়াইয়া আবার মুখ ধুইবার পরে গামছার পরিবর্তে আঁচলটাই তাহা হাতে তুলিয়া দিল, তখন ঐ তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে ষোড়শী-চরিত্রের মাধুর্য, একি প্রেম এমন স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, উহার কাছে কোথায় লাগে বিশ্লেষণ, বর্ণনা অথব সংলাপ! অন্ধকারে নির্জন নিস্তব্ধ মন্দিরের একটি কোণে প্রবল পরাক্রান্ত জমিদা ও দীনদরিদ্র ভিক্ষুকের মাঝে সুখ-দুঃখ সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ আলোচনার ব্যবস্থা করি শরৎচন্দ্র তাঁহার লেখনীর ছোট্ট একটি আঁচড়ে জীবানন্দ-চরিত্রের অপরিসীম বেদন অতলান্ত দুঃখ ও অপরিমেয় পরহিতৈষিতার ব্যঞ্জনা ফুটাইয়াছেন।

এই উপন্যাসের পটভূমি-পরিবেশের (setting) মূল্যও বড় কম নয়। পল্লী গ্রামের একটি মন্দির—এই পটভূমি-পরিবেশেরই উপরে গল্পটির কথাবস্তু ও চরিত্রা নির্ভরশীল। সত্য কথা বলিতে কি, জীবানন্দের পরিত্যক্ত পত্নীর অলকাসত্তার পরিপুষ্টি-সাধনের ব্যাপারে হৈমচরি যেমন সক্রিয়, তেমনি ষোড়শীসত্তা বজায় রাখিবার ব্যাপারে চণ্ডীমন্দিরের পটভূমি পরিবেশের অলক্ষ্য প্রভাবও বড় কম নয়। জীবানন্দ-পত্নীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটাইবার ব্যাপারে তাহার চরিত্রাভিব্যক্তির ক্ষেত্রে, পরিবেশ-পটভূমির এহেন প্রাধান্য থাকাতেই কথাব নিয়ন্ত্রণে ইহার অনিবার্যতা, ইহার সারগর্ভত্ব অবশ্য স্বীকার্য। তাই উপন্যাসের প্রথ পরিচ্ছেদেই চণ্ডীগড়ের প্রাচীন দেবতা ৺ চণ্ডীর কথাই শরৎচন্দ্র নিজে বর্ণ করিয়াছেন ও চণ্ডীদেবীর ভৈরবী-প্রসঙ্গ এককড়ি ও জীবানন্দের কথোপকথনে মধ্য দিয়া তিনি পরিবেশন করিয়াছেন। এই পটভূমি-পরিবেশই পরে দৃশ্য সংরচন করিয়াছে, চরিত্রাভিব্যক্তির সুযোগ ঘটাইয়াছে, সংশয় আনিয়াছে সমগ্র গল্পের আবেষ্টন জোগাইয়াছে।

পটভূমি-পরিবেশ

'দেনাপাওনা' উপন্যাসে নিছক গল্প-বলাই হয় নাই। ইহার মাঝে এক গভীরতর উদ্দেশ্যও নিহিত। কথাবস্তু, চরিত্র এবং পটভূমি-পরিবেশের অন্তরালে যে মূল তত্ত্ব বা ভাবটি লুকাইয়া আছে, তাহা হইতেছে এইরূপ। নারীর যে দেহটা মানুষের স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তাহারই প্রতি মানুষের আসক্তি; কিন্তু চোখ মেলিয়া যে জিনিসটিকে দেখা যায় না, নারীদেহের অতিরিক্ত যে নারীত্ব—যাহা কেবলমাত্র সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুভবনীয়—তাহার এমনই অপ্রতিহত প্রভাব যে মদ্যপায়ী স্বেচ্ছাচারী দুশ্চরিত্র ব্যক্তির মনে যখন ইহা সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে, তখন তাহার মনে জাগে সংসারে বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা, মানুষের মাঝে মানুষের ন্যায় বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা, বাড়ী-ঘর স্ত্রী-ছেলেপুলে লইয়া ঘোর সংসারী হইবার আকাঙ্ক্ষা। অন্তর্নিহিত এই ভাবকথাটি 'দেনাপাওনা'র উপজীব্য।

অন্তর্নিহিত ভাবকথা

এক্ষণে এই গ্রন্থের জীবনসত্যটির স্বরূপ কেমন, তাহাই আমাদের বিচার্য বিষয়। মনে রাখা দরকার, জীবনের তথ্যাদি ও মূল তত্ত্বাদি এক নয়, ভিন্ন—যেমন ভিন্নতা, যেমন ব্যবধান দেখা যায় আইনের ভাষা ও তাহার প্রকৃত মর্মের মধ্যে। গল্প-উপন্যাসের এক জাতের রচয়িতা আছেন যাঁহারা হিংসুক ক্রোধী লোভী অহংকারী প্রেমিক মানুষের কথা ও কাজের একটা যথাযথ ফোটো, একটা খাঁটি বিবরণ তথা নথিপত্র পাঠক-পাঠিকার সামনে দাখিল করেন এবং তাহার অতিরিক্ত কিছু তাঁহারা করেন না অর্থাৎ মানুষের মর্মের মাঝে তাঁহারা প্রবেশ করেন না। কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্ট চরিত্রের কথা ও কাজের মৌলিক তত্ত্বকথা সম্পর্কে যদি আমাদের অনুভূতি সক্রিয় না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে রচনায় জীবনের তথ্যানুগত্য থাকিলেও তত্ত্বানুগত্য নাই। পক্ষান্তরে, এমন এক জাতের রচয়িতাও আছেন যাঁহারা জীবনের মর্মের মাঝে গভীরভাবে প্রবেশ করেন এবং এমনও হয় যে, বাস্তব জীবনে মানুষ যেমনটি করিয়া কথা বলে ও কাজ করে, ঠিক তেমনটি করিয়াই ইহাদের রচনায়-সৃষ্ট চরিত্রগুলি কথা বলে না বা কাজও করে না। এহেন লোকেরা সর্বদা জীবনের তথ্যানুগত্য দেখাইতে না পারেন, কিন্তু সেই তথ্যাদির অন্তরালে যে মৌলিক সূত্রগুলি তথা তত্ত্বাদি প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাদের সম্পর্কে তো ইহারা সচেতনই থাকেন। প্রথমোক্ত জাতের রচয়িতারা 'রিয়্যালিষ্ট' এবং শেষোক্ত জাতের রচয়িতাগণ 'আইডিয়ো-রিয়্যালিষ্ট'। শরৎচন্দ্র এই শেষোক্ত দলভুক্ত।

জীবনসত্যের স্বরূপ-পরিচয়

প্রাত্যহিক জীবনে নরনারীরা ঠিক যে ভাবে কথা বলিয়া থাকে, শরৎচন্দ্র জীবানন্দ ও ষোড়শীর সংলাপ সেরূপ রীতি অনুসরণ করেন নাই সত্য, কিন্তু ইহাদের অন্তরাত্মা যে অভিব্যক্ত হইয়াছে—ইহা তো একান্ত ভাবেই সত্য—একান্ত ভাবেই শাশ্বত সত্য। এককড়ি, তারাদাস চক্রবর্তী, শিরোমণিমশায়ের ভাষায় নাটকীয়তা আছে সত্য, কিন্তু যে মানসিক প্রকৃতি উঁহাদের মুখে ঐরূপ সংলাপ জুটাইয়া দিয়াছে তাহা

'দেনাপাওনা' উপন্যাসের জীবনসত্য

তো সত্য, এবং গুরুত্বপূর্ণ সত্যই বটে। শোষণক্লিষ্ট, অত্যাচারিত, নিরুদ্যম, ভরসাহীন বিপিনদের লক্ষ্য করিয়া ষোড়শী বলিয়াছে,—'তোরা এতগুলো পুরুষ-মানুষ মিলে নিজেদের বাঁচাতে পারবি নে, আর মেয়েমানুষ হয়ে আমি যাব তোদের বাঁচাতে? এ জমি না হয়ে, মাইতিগিন্নিকে যদি জমিদারবাবু এমন জবরদস্তি আর একজনকে বিক্রী করে দিতেন, আর সে আসতো তাই দখল করতে, কি করতে বাবা তুমি?' ষোড়শীর মনোবৃত্তি, যাহা তাহার বুকের ভিতরে আগুনের ন্যায় প্রোজ্জ্বল তাহারই একটি মর্মস্পর্শী সত্যের প্রতিরূপ এখানে ফুটিয়াছে। কথায় ও ক্রিয়াকলাপে সামান্য ভাষায় উহাকে বুঝিয়া প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই এই অদ্ভুত উপমার সৃষ্টি। সুতরাং 'দেনাপাওনা' গ্রন্থের সমগ্র জীবনসত্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে স্থানবিশেষে যথাযথ তথ্যানুসরণ যদি নাই পাওয়া যায়, ঘটনা-সংলাপ যদি বাস্তব জীবনের যথার্থ প্রতিরূপ নাই হয়, তাহাতে দুঃখিত হইবার কারণ নাই। কারণ, চরিত্রগুলির বৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপ বেশ বাস্তবানুগামীই বটে।

পরিশেষে ইহাই বলা যায় যে, জীবানন্দ তাহার উচ্ছৃংখলতা ব্যভিচারিতার জন্য যথেষ্ট ক্লেশভোগ করিয়া মর্মদাহে জ্বলিয়া জ্বলিয়া খাঁটি সোনায় পরিণত হইয়াছে—নীতিদর্শনের

শেষ কথা

এই চিরসত্যতা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের এই গ্রন্থে আছে বলিয়াই ইহার গল্পগত সত্যও অবশ্য স্বীকার্য। জীবনের ভাবানুভূতি যাহা এই গ্রন্থের চরিত্রগুলির মাধ্যমে প্রস্তাবিত হইয়াছে, জীবনসত্য যাহা গ্রন্থকার কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা একান্তভাবেই সত্য ও যথার্থ অবধারণা বলিয়াই 'দেনাপাওনা' গ্রন্থ বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের একটি অত্যুজ্জ্বল রত্নখণ্ড।

# বিশ্বসাহিত্য

চলিত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীর সাহিত্য-মানস এবং সাধারণ পাঠকের অন্তর বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে কমবেশি গবেষণার জন্যে আগ্রহ

সূচনা

ও ব্যাকুলতা প্রদর্শন করে আসছে। বিশ্বসাহিত্য সংজ্ঞাটি এবং বিশ্বসাহিত্যে জীবনবোধ কথাটির ব্যঞ্জনা কতটুকু, এটা উপলব্ধি করার মতো পাঠকমন বা সমালোচকমনের স্তর সমুন্নত হয়নি এতদিন। কিন্তু আজ গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেবার মতো মন পাঠকরা লাভ করেছে। তারা অনুসন্ধানী ও পর্যবেক্ষক বুদ্ধিবাদিতার নিরিখে একটি যে-কোন উপন্যাস ছোট-গল্প বা কবিতার বিশ্বজনীনতা বা বিশ্ববাসীর অন্তরে এর সংবেদনশীল আবেগ সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে যাচাই করতে শিখেছে।

বিশ্বসাহিত্য বলতে আমরা কি বুঝি বা কোন্ কোন্ মহৎ-সৃষ্টি বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে, তা নিয়ে সমালোচক ও বিদগ্ধমণ্ডলীর ভাবগত ও বুদ্ধিগত ব্যাখ্যায়

বিরোধের প্রচুর অবকাশ আছে। তথাপি সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না যে একটি বিষয়ে এঁরা সকলে একমত—বিশ্বসাহিত্য স্থানীয় বর্ণ (local colour)-বিবর্জিত।

বিশ্বসাহিত্য

১৯৫৫ সালের ৩০শে জুন ক'লকাতা অবস্থানকালে ফেডারেশন হলে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে 'ঝড়' কাহিনীর রচয়িতা রুশসাহিত্যের দিকপাল ইলিয়া ইহরেনবুর্গ শ্রোতৃবর্গের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'যতদিন একটি সম্প্রদায় অনুন্নত থাকে, ততদিন তার প্রাদেশিকতার প্রতি মোহ ও আঞ্চলিকতার প্রতি মমতা তাকে শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অপরাপর রাষ্ট্র বা প্রদেশের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগোবার প্রেরণা যোগায়। কিন্তু যখনই একটা জাতি সর্ববিষয়ে বিশ্বের আসরে সগর্বে মেরুদণ্ড উঁচিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে, তখনই তার আঞ্চলিকতাবোধ পরিত্যাগ করা উচিত। তখন বিশ্বজনীনতা হবে তার জীবনের মূলমন্ত্র যা বিশ্ব-সাহিত্যের অপরিহার্য উপাদান।' 'A literature is universal if it is free from the narrow limits of provincialism and nationalism.' অতএব, বৃহৎ জীবন ও তার ব্যাপকতার প্রতি আকর্ষণ এবং অপূর্ব রসোত্তীর্ণ সাহিত্যসৃষ্টির অভিলাষ যে কোন সাহিত্যিককে বিশ্বসাহিত্যের চর্চায় উন্নীত করতে পারে।

১৮২৭ সালের ২৭ শে জানুয়ারী গ্যয়টে একারমানকে বলেন যে, জাতীয় সাহিত্য ক্রমশঃ ক্ষীণপ্রাণ হয়ে যাচ্ছে—এখন শুরু হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের (Weltliteratur)

ঐতিহ্যমূলক তত্ত্ব

যুগ। বস্তুতঃ একশো বছর পরেও প্রাচ্যে এ-যুগ আসেনি যদিও অধুনা কথাটির প্রচলন খুব বেরেছে। তবু এ-যুগেও আমরা বিশ্বসাহিত্যের কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করতে পারি না। আমরা সাধারণতঃ বিশ্বসাহিত্য ব'লতে বুঝি পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যের সমষ্টি। —এটাই বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা। গুণবিচারের প্রশ্ন এখানে গৌণ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা মূলতঃ কোন আদর্শের সন্ধান দিতে পারে না। বিশ্বের সাহিত্য-সঞ্চয়নের যে সব পুঁথি আমাদের ভাবের আদান-প্রদানে যথেষ্ট সহায়ক হয়, তাদেরও কিন্তু আমরা বিশ্বসাহিত্য বলি।

সংকীর্ণ অর্থে বিশ্বসাহিত্য বিশেষ গুণবিশিষ্ট কয়েকটি পুস্তকের সমষ্টিকেই বোঝায়। 'শকুন্তলা', 'হ্যামলেট', 'ফাউষ্ট' বা 'আনা কারেনিনা' ইত্যাদিকে আমরা বিশ্বসাহিত্য

বিশ্বসাহিত্য বিশেষ গুণসম্পন্ন

বলি ; কিন্তু কালিদাস, সেক্স্পীয়র, গ্যয়টে বা টলষ্টয়ের সব সাহিত্যকে আমরা বিশ্বসাহিত্য বলি না। অতএব, বিচারের দ্বারা চয়ন ও বর্জন করতে হয়। জনপ্রিয়তা হচ্ছে বিশ্বসাহিত্যের প্রধান বিশেষ গুণ। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় সার্থক অনূদিত গ্রন্থখানি যেখানে উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা অর্জন করে' কালজয়ী বা যুগোত্তীর্ণ হবার সুযোগ পেয়েছে, সেখানে সে বইটি নিশ্চয় বিশ্বসাহিত্যরূপে আখ্যায়িত হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। সুতরাং বিশ্বসাহিত্য কাল আর দেশকে সর্বদাই অতিক্রম করে চলে।

জাতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি সঞ্চিত হয় বিশ্বসাহিত্যে। পাঠক সম্প্রদায় এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বসাহিত্যের ব্যাখ্যা করে। আবার সমালোচক এবং সাহিত্যের ইতিকথা রচয়িতারাও বিশ্বসাহিত্য থেকে জাতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলিকে বহির্ভূত করার ব্যাপারে বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন। তাঁদের মতে, কতকগুলি নির্দিষ্ট স্তরের ভিতর দিয়ে সাহিত্য ক্রমবিবর্তনের পথে এগিয়ে চলে। যেমন,—সকল সাহিত্যে রোম্যান্টিসিজ্‌মের বিস্তার কখনো-না-কখনো হবেই হবে....শুধু সময়ের ব্যবধানে ঘটতে পারে এইমাত্র। তদুপরি সমসাময়িক পরিবেশ ও রচনা-কৌশল ও চরিত্র-চিত্রণের দক্ষতাকে কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। তাই সাহিত্যের স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন গ্রন্থের বিচার যথার্থরূপে হতে পারে না। তবে বিচারটা তুলনামূলক হতে হবে। কোন লেখক বা বইএর প্রশ্ন সাহিত্যের অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাছে গৌণ। তাঁদের মূল আলোচ্য বিষয় বিবর্তনের ধারাটি। তুলনামূলক সাহিত্যবিচারে সাহিত্যের ব্যাপকত্তাই সর্বাগ্রে প্রশংসনীয়। তবে জাতীয় সাহিত্যকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে বিশ্বসাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটাবার প্রচেষ্টা বৃথাই পণ্ডশ্রম। গ্যয়টের মতে, দেশের সম্মান ও বাণিজ্যপ্রসারের জন্যে যেমন পণ্যদ্রব্যের উৎকর্ষ-সাধন ঘটে, তেমনি ক্রমাগত তপস্যার ফলে রচিত জাতীয় সাহিত্যের উৎকৃষ্ট সম্পদগুলি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে মর্যাদা লাভ করতে পারে।

জাতীয় সাহিত্য বনাম বিশ্বসাহিত্য

বাহ্যিক বৈষম্যের ও আদর্শগত পার্থক্যের অন্তরালে মনের কাঠামো কিন্তু সব মানুষের একই। ভাষাগত সম্প্রদায়গত বিভেদের উপর পারস্পরিক সাহিত্যের মাধ্যমে ভাব-বিনিময়ের ফলে বিশ্বসাহিত্য সর্বকালে সর্বজনের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা এই কথাকে বিভিন্ন আঙ্গিকে এবং প্রকাশভঙ্গীতে অনুপমভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাই মানুষের মূলগত ঐক্য যেখানে মানুষ-রচিত বিভেদের বেড়া ডিঙ্গিয়ে সাহিত্যে বৃহৎ মানবসমাজ গড়ে' তুলতে সাহায্য করেছে, সেখানেই সে-সাহিত্য বিশ্বসাহিত্য বলে পরিগণিত হবার সাফল্য অর্জন করেছে। বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেই মানুষের ভৌগোলিক ব্যবধান বিলীন হয়ে গেল, সেই থেকে শুরু হ'ল মানুষের মনের ব্যবধান ঘুচে যাবার অভিযান।

মনাবগোষ্ঠীর মন

তাই আজ্‌কের মানুষ শুধু জাতীয় সাহিত্যের কথা ভাব্‌তে কুণ্ঠা ও অশ্রদ্ধা বোধ করে—অসংকোচে শত ত্রুটিবিচ্যুতি-সত্ত্বেও তারা ভাবে বিশ্বসাহিত্যের কথাও পাশাপাশি। তবু আমাদের সাহিত্য বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সন্ধিক্ষণে কোণঠাসা। তার একমাত্র কারণ সাহিত্যের ছাত্ররা অন্য ভাষা বা সাহিত্যের নীতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়াটাকে খুব বেশি প্রাধান্য দেয় না। মুখ্যতঃ আপন ভাষার বিশিষ্ট প্রকাশরীতিই এই সংকীর্ণতার হেতু।

ভাষান্তরে অনুবাদ করা তাই অতি কষ্টকর। একমাত্র প্রতিভাবান অনুবাদক-লেখকেরা বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে পাঠকদের রসহানি ঘটান না। তাছাড়া বিশ্বসাহিত্য না হওয়ার আরও একটি কারণ হচ্ছে বিশেষ কোন সামাজিক পরিবেশের প্রভাব। তাই আবেদন এখানে সর্বজনীন হতে গিয়েও সামাজিক আবেষ্টনীর দ্বারা কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বিদেশের যে কোন পাঠকের রস-আস্বাদনে গভীরতার দাগ কাটে না এ-সাহিত্য।

বিশ্বসাহিত্যে বাতিল জাতীয় সাহিত্য

একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাহিত্যের উল্লিখিত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও একমাত্র সাহিত্যই 'দূরকে আপন করে, পরকে করে ভাই'। ভাবের এই আনাগোনার মধ্যে দিয়ে একটি জাতি বা সাহিত্যরসিক অপর জাতি বা সাহিত্যরসিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমিয়ে তোলে। সর্বোপরি, এই সাহিত্যই বৃহৎ মানবসমাজ গড়ে' তুলতে যথেষ্ট সহায়তা করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলি যেদিন প্রতিটি মানুষের পাঠে আসবে এবং অনুভূতিতে প্রেরণার এক দুর্দম জোয়ার আনবে, সেদিন সকলে পড়ে' আনন্দে চমকে উঠবে, 'একি! একই বাঁকে যে আমাদের নৌকো! একই ঝঞ্ঝা আমাদের দু'জনের—আর অদ্ভুত! আনন্দও তো এক! তবে হ্যাঁ, আমরা প্রত্যেকে এক এক পন্থায় এবং সম্পূর্ণ আলাদা উপায়ে এ-ভাবটুকু উপলব্ধি করতে পারি।' মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও সভ্যতার শীর্ষদেশে আরোহণ করার উদ্দেশ্যে রচিত ইউনেস্কোর প্রচেষ্টায় অনুবাদের দিকে যে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে তা অনুপ্রাণিত করবে বিশ্ববাসীকে। বিভিন্ন সাহিত্যের সংস্পর্শে না এলে কি করে' এক সম্প্রদায়ের বোধগম্য হবে যে, তারা অন্য সম্প্রদায়ের চাইতে বহুল পরিমাণে নিকৃষ্ট! কিন্তু এ নিকৃষ্টতা দূরীকরণ ও বৃহত্তর সমাজজীবনের উন্নয়নের দিকে আগ্রহ-শীলতা প্রতিটি জাতির অন্তরে তখনই জাগবে, যখন সাহিত্যের মাধ্যমে এরা জানবে পরস্পরকে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, নোবেল পুরস্কার পেয়ে যে-সব সাহিত্য প্রশংসার সর্বোচ্চ চূড়ায় আসীন হয়, তাদের প্রত্যেককে নোবেল-কমিটির কয়েকটি ধরাবাঁধা নিয়ম-মাফিক নির্দেশ মেনে চলতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথমতঃ, মানবতাবাদে বিশ্বাসী হতে হবে প্রতিযোগী সাহিত্যকে। মানবতার আদর্শকে প্রচার করাই শ্রেষ্ঠ বিশ্বসাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ—এই তাঁদের মত। দ্বিতীয়তঃ, নৈরাশ্যবাদী বা জীবন সম্বন্ধে যাঁদের বোধ হতাশাব্যঞ্জক বা যাঁরা Pessimist তাঁদের সাহিত্য নোবেল পুরস্কারের জন্যে অমনোনীত হয়। অর্থাৎ মানব-সভ্যতায় খুব বিশ্বাস থাকাই চাই। তৃতীয়তঃ, সভ্যতার বিদ্রোহ যে সব সাহিত্যিকরা করেন, তাঁদের মানসিকতাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে' ধরে' নেওয়া হয়। নৈরাশ্য থেকেই প্রতিক্রিয়াশীলতা আসে। কারো কারো মতে, নোবেল-কমিটির সদস্যদের নীতি—অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাস থাকা প্রত্যেক সাহিত্যিকের কর্তব্য।…এসব

সাহিত্যে বিশ্বমানবতাবোধ

কারণের জন্যে, সাহিত্যিক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের মতে, ইউরোপীয় সাহিত্যিকরা নোবেল প্রাইজের প্রতি, আমাদের ব্যাটরা কমিটির প্রাইজের মতো তুচ্ছ দৃষ্টি হানে। নোবেল প্রাইজ কমিটি সম্বন্ধে অনেকের মনে এই ভ্রান্তিকর ধারণা দৃঢ়মূল। তাঁরা উল্লিখিত নিয়মাবলী সম্বন্ধে অবহিত-চিত্ত নয় ব'লেই বলেন—১৯৫৭ সালে গ্রাৎসিয়া লোরকাকে নোবেল পুরস্কার না দিয়ে কেন দেওয়া হ'ল কোন অখ্যাত অপরিচিত চিলির কবিকে? বা সমরসেট মম কিংবা টলষ্টয় কি দোষ করেছেন যে, তাঁরা না পেয়ে নোবেল প্রাইজ পেলেন কিনা লাক্সনেস বা হ্যামিংওয়ে? সমারসেট মম আজ্‌কের পৃথিবীর প্রখ্যাত সাহিত্যিক একথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু যেহেতু তাঁর '*Razor's edge*' সভ্যতাকে লাঞ্ছিত করেছে, নোবেলকমিটির নিয়ম-অনুসারে উনি নোবেল প্রাইজ পেতে পারেন না। একই কারণে টলষ্টয়ও পান নি, যদিও তাঁর ক্ষেত্রে আরো একটি বিশেষ কারণের উল্লেখ করেন সমালোচকমহল। টলষ্টয় নিজেই বলতেন যে, রাজনীতির আদর্শকে সাহিত্যে অতি-প্রশ্রয় দেবার মতো সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় বিড়ম্বনা নেই। একই কারণে উনিও নোবেল প্রাইজ পেলেন না। তবে এও সত্য যে, ইবসেন-এর মতো প্রখ্যাত নাট্যকার নোবেল-লরিয়েট তো হবেনই। ১৯৫৬ সালের নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী সুইডেনের লাক্সনেসের সাহিত্য যে খুব জনপ্রিয় বা যুগোত্তীর্ণ, তা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হন অনেক পণ্ডিত। যে বইএর জন্যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তাও রাজনীতির দর্শনপুষ্ট—তবে মানবতাকে তিনি অতি-প্রশংসায় রাঙ্গিয়ে তোলার দরুণই বোধ হয় নোবেল-কমিটি অতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। আর অল্পবিস্তর অধ্যাত্মবোধও এতে রয়েছে। অবশ্য আগের বছরের '*The old man and the Sea*'র জন্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হ্যমিংওয়ে সত্যি অসাধারণ প্রতিভাবান এবং তাঁর প্রতিটি রচনা মানুষের অন্তরের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করেছে। তিনি মানুষের প্রতি মমত্বশীল। বিশ্বসাহিত্যে নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্ত আর একটি স্মরণীয় স্তম্ভ রোঁম্যা রোলাঁর 'জাঁক্রিস্তফ্'। একটা নারীকে কেন্দ্র করে' আশাবাদী এ-শিল্পী দক্ষহাতে ফুটিয়ে তুলেছেন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং শান্তিপ্রতিষ্ঠার বিঘ্নগুলিকে।...

শুধু তালিকাবৃদ্ধি করে' ও পুস্তকপরিচয় দিয়ে নোবেল পুরস্কার প্রদানের যাথার্থ্য বিচার করা চলে না। মোট কথা, যে কয়েকটি বিশেষ গুণে যে কোন সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে, তাদের একটি হচ্ছে বিশ্বজনীনতা, অপরটি হচ্ছে স্থানকালের সীমানা পেরিয়ে ব্যাপক ও বিশাল বিশ্ব-মানবগোষ্ঠীর জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ ও নিবিড় অনুভূতি। এ ছাড়া জাতীয় সাহিত্য যেমন যুগোত্তীর্ণ হয় না, তেমনি বিশ্বসাহিত্যও সর্বযুগের হয় না। এই গুণানুসারে বিচার করতে গেলে, টলষ্টয়ের 'আনা কারেনিনা',

সিদ্ধান্ত

ডষ্টয়ভ্স্কির 'ক্রাইম্ এণ্ড পানিশ্মেণ্ট', উইলিয়ম সমারসেট মম, স্তাঁদাল, মোঁপাসাঁ, হিউগো, জাঁপল সাঁর্ত্র-এর মত অল্পবয়স্ক সাহিত্যিকের এবং হাওয়ার্ড ফাস্টের সৃষ্টিই বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার মতো। অন্ততঃ এঁদের অনুবাদ ও জনপ্রিয়তার মাত্রা দেখে তো এই প্রতীতিই হয়। আধুনিক কবিদের অনেকের রচনা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে—তবে জনপ্রিয়তার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত বিধায় এঁদের সৃষ্টি বিশ্বসাহিত্যে পড়বার মতো কিনা তা বিবেচনাসাপেক্ষ। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের সেই সুন্দরের প্রতি অতি-পক্ষপাতমূলক ও মানবতা-আধ্যাত্মিকতাসমন্বিত কাব্যসৃষ্টি, এলিয়ট ও অডিসি, প্যারাডাইস লষ্ট, ফাউষ্ট ইত্যাদি ছাড়া অতি জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থের দৃষ্টান্ত বিরল।

পরিশেষ

আধুনিক সুইডিস, স্প্যানিস, ল্যাটিন, আমেরিকান এবং এশিয়া আফ্রিকার কয়েকটি সাহিত্য আলোচনা করে' দেখা যায় যে, পরিবেশের ছাপ থেকে কোনটিই মুক্ত নয়, যদিও প্রতিটিই মানব-সভ্যতায় আস্থা রাখে। 'অতীন্দ্রিয়ে'র প্রতি, আধ্যাত্মিকতার প্রতি অল্পসংখ্যক সাহিত্যিককেই সহানুভূতিশীল হতে দেখা যায়। "সাহিত্য বিশ্বসাহিত্য কিনা এ বিষয় বিচারে" শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্ত বলেন, "জিজ্ঞাসা করিবার আছে······বস্তুকে ভাবকে চিন্তাকে, দেশকে কালকে পাত্রকে কবি দেখিতে পাইতেছেন কিনা, সৃজন করিতে পারিয়াছেন কিনা—প্রাকৃতকে অপ্রাকৃতের মধ্যে তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন কিনা ?"···'The aim of all writers in different ages has been to defend society and mankind'. সুতরাং মানবতা ও সমাজ-সংস্কারের নৈতিক ব্যাখ্যাই যদি বিশ্বসাহিত্যের লক্ষণ বলে' ধরা হয়, তা'হলে নোবেল-কমিটি এমিল জোলার মতে অন্যায় করেন নি।

# সাহিত্য ও আদর্শবাদ

সাহিত্য-সৃষ্টি

পৃথিবীতে তার অভ্যুদয়ের পর থেকে মানুষ সভ্যতার পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তার জীবনের পরিধিকে সে সীমায়িত করেনি জৈবিক প্রয়োজনে—চরিতার্থতার সংকীর্ণ চৌহদ্দিতে। কেবলমাত্র বেঁচে-থাকা আর বংশবৃদ্ধি করার একমাত্র তাগিদে তার শ্রেয়োবোধ তৃপ্তি হয়নি বলেই জীবনকে সে করতে চেয়েছে সুন্দর, বিচিত্র ও মহিমামণ্ডিত। আর এই শ্রেয়োবোধের কল্যাণময় অনুপ্রেরণায় সে সৃষ্টি করেছে শিল্প সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে। সাহিত্য মানুষের সেই সুন্দরের সাধনার সুযোগ্য বাহন। ডক্টর ফ্রেজার বলেছেন—"To live and to cause to live, to eat food and to beget children, these were the primary wants of men in the past, and they will be the primary wants of men in future...other things may be added to enrich and beautify human life, but unless these wants

are first satisfied, humanity must cease to exist." মানুষ তাই ভদ্রভাবে মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্যে যেমন সংগ্রাম করছে, তেমনি সংগ্রাম করছে সেই অস্তিত্বকে সুন্দর ও সুখী করার জন্যে। মানুষের এই শ্রেয়োলাভের সাধনা আর অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস অবিচ্ছিন্ন। কারণ,—Man cannot live by bread alone'. জীবনকে সুন্দর ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করবার প্রয়াসে সাহিত্যের সাযুজ্য অত্যন্ত মূল্যবান।..............যুগান্তকারী সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, সাহিত্য সত্য সুন্দর ও শিব এই তিনেরই উপাসক। মঙ্গলের আদর্শ থেকে বিচ্যুত যে-সাহিত্য, তাকে তিনি অন্যায় ও পাপ মনে করতেন। সাহিত্যে আদর্শবাদ থাকবে কিনা, থাকলে পরিমাণে কতটা থাকবে, তার ইঙ্গিত এই উক্তিরই মধ্যে ব্যঞ্জিত।

সাহিত্যের লক্ষ্য

প্রথমে বিচার করা যা'ক,—সাহিত্যের মূল লক্ষ্য কি? অনেকে মনে করেন, রস-সাহিত্যের একমাত্র পরিণতি ফলশ্রুতিজাত আনন্দসৃষ্টিতে। সৌন্দর্যবোধের চরিতার্থতাই সাহিত্যের চরমতম সার্থকতা। আদিকবির কণ্ঠে ক্রৌঞ্চবিরহের যে শোকগাথা স্বতঃ-উৎসারিত প্রবাহে একদিন প্রকাশিত হয়েছিল শ্লোকরূপে, সেদিন আমরা জেনেছিলাম মহৎ বেদনাই সুমহান্ সাহিত্যের স্রষ্টা। রামগিরি-পর্বতে বিরহী যক্ষের মনোবেদনাকে কাব্যে রূপ দিলেন মহাকবি কালিদাস—মেঘদূতেরও মধ্যে নেই কোনো নীতি বা আদর্শবাদের নামগন্ধ। এটি মানবের শাশ্বত হৃদয়বৃত্তির এক বিস্ময়কর রূপায়ণ, রক্তপিপাসু মানুষকে এ বিতরণ করে চলেছে অনাস্বাদিত আনন্দ ও অপূর্ব পরিতৃপ্তি। বিখ্যাত সাহিত্যকার গ্যয়টের 'ফাউষ্ট'-এ আমরা যে অজানা জগতের সন্ধান পাই, সেটি আমাদের ধূলিমাটির চিত্র নয়, অথচ 'ফাউষ্ট' পরিতৃপ্ত করে মানুষের রসপিপাসু মনকে। অনেকে মনে করেন, এই সৌন্দর্যসাধনাই সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য।

বিরুদ্ধ মত

বিরুদ্ধবাদিরা বলেন, সৌন্দর্যের সাহিত্য আর শিল্পের জন্য শিল্প অর্থাৎ Art for art's sake—এ মতটি অত্যন্ত বাজে, যুক্তিবিচারের ধোপে এ টেকে না। নৈয়ায়িক বিচারে এর অর্থ যাই থাক্, মানুষের সৌন্দর্যবোধ কখনো অন্যান্য বোধনিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে এই বোধশক্তি দুর্লভ। অতএব, মানুষের সৌন্দর্যবোধ যে অন্যান্য বোধের উপর একান্ত নির্ভরশীল এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সে-সত্যটিকে অস্বীকার করা বাতুলতা। তাই তাদের একের চলার পথে অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতা অপরিহার্য।

মনোরাজ্যের বিবিধ বিপরীতমুখী বোধগুলি পরস্পরের মধ্যে সংগতি বজায় রেখে পাশাপাশি শান্তিতে বাস করে। অযথা কোন বোধ চঞ্চল হলে বা বিপথে গেলে মনোরাজ্যে বিদ্রোহের সুর জাগে—জীবনশান্তিতে ঘটে ছন্দপতন। আর্টের রাজ্যেও

বিভিন্ন মতবাদের এমনি সমন্বয় ও সংগতি থাকা দরকার। মানুষের মনে যদি এই নীতিবাদের ক্ষেত্র পূর্ব থেকে প্রস্তুত থাকে, তবে পতিতা নারীকে মহীয়সী রূপে চিত্রিত করলেও সে আপত্তি জানায় না। কিন্তু এই সমন্বয়বাদকে লঙ্ঘন করে' কেবলমাত্র কোন বিশেষ নীতিবাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সাহিত্যের সীমা অতিক্রম করা হয়—সাহিত্যের মর্যাদাহানিও ঘটে।

বিপরীতমুখী মতবাদের মধ্যে সমন্বয়

সাহিত্যে কোন-না-কোন মতবাদ অবশ্যই থাকবে। কারণ,—সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য যে মানবজীবন, তার দেহশ্রীতে তো অসংখ্য অসংগতি বিচ্যুতি আর অপূর্ণতার ছাপ। সমাজের যে বদ্ধ অচলায়তনে মানুষের জীবনবোধ প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত, সাহিত্যকার তো সেই সমাজেরই মানুষ—সেই সব মানুষেরই তিনি অগ্রণী সহযাত্রী। ভ্রান্ত মানুষকে নূতন পথের সন্ধান দেবার জন্যে, তার অপূর্ণতাকে পূরণ করে' সম্পূর্ণ করবার জন্যেই তো তাঁর লেখনী-ধারণ। বিশেষ কিছু বলবার জন্যেই তো তাঁর বাণীব্রত। তা ছাড়া সামাজিক জীব হিসেবে তাঁর আরও একটা বিরাট্ কর্তব্য আছে—সমাজের অগ্রগতির কাজে তাঁকে সাহায্য করতে হয় যথাসাধ্য। সুতরাং তাঁর রচনায় নিজের জ্ঞান-বিশ্বাসমতে একটা বিশিষ্ট মতবাদ প্রচার করতে যে তিনি চেষ্টিত হবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁর নিজের জীবনের আদর্শবাদের সঞ্জীবনী-রসেই যে তৎসৃষ্ট সাহিত্য জারিত হয়, একথা অবিসংবাদিত ভাবে সত্য। তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একটা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দরের যে রূপ সন্দর্শন করে, তাকেই তিনি প্রতিফলিত করতে চান সাহিত্যের মাধ্যমে। হৃদয়বৃত্তির রাজ্যে অবগাহন করে' বাস্তব-নিরপেক্ষ সাহিত্য রচনার দিন যে অতিক্রান্ত, একথা অস্বীকার করা যুগধর্মকে না মানারই সামিল।

সাহিত্যের মতবাদ

সাহিত্যে আদর্শবাদ প্রচারের স্থান থাকলেও তার একটা মাত্রা আছে, নিজস্ব একটা সীমা আছে। রচয়িতাকে সতর্ক থাকতে হয়, যাতে তাঁর নীতিজ্ঞান অযথা আত্মপ্রকাশ করে' সৌন্দর্যসৃষ্টিকে পণ্ড না করে, যাতে সাহিত্যসৃষ্টির মূলরসকে কোন মতে ক্ষুণ্ণ না করে। সুন্দরের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করে', রসসৃষ্টিকে অব্যাহত রেখে, যে-সাহিত্যকার অন্তরালে থেকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম-ভাবে নীতিজ্ঞান প্রচার করতে পারেন, তিনিই যথার্থ শিল্পস্রষ্টা। শিল্পীর যে গভীর অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণার স্পর্শে সাহিত্যের উজ্জীবন, তা আকাশ ফুঁড়ে বেরোয় না। তবে সেই মত বা আদর্শকে প্রচার করতে হয় অত্যন্ত সতর্কভাবে, পাঠকের সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে, শিল্পসৃষ্টির একান্ত নেপথ্যে। কারণ, এই আদর্শবাদের প্রকৃত মূল্য সাহিত্যের ফলশ্রুতিতে। নতুবা দেবদাসের জন্যে শরৎচন্দ্র যতই আমাদের দু'-ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন

আদর্শবাদের মাত্রা

করতে অনুরোধ করুন না কেন, আমাদের মনের সায় না থাকলে আমরা তা মানব কেন? সৌন্দর্য ও রসমাধুর্যের পথে পাঠকচিত্তকে পরিচালিত করে, যদি সেই কাম্য মনোভাবকে জাগ্রত করা যায়, কাঙ্ক্ষিত ভাবনার অংশীদার করা যায় পাঠককে, তবেই-না সাহিত্যে আদর্শবাদ প্রচারের সার্থকতা।

এই নীতির ব্যত্যয়ের নজীর বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনা করলে আমরা স্পষ্টই অনুধাবন করতে পারি। নিজেকে নেপথ্যে অদৃশ্য রেখে নীতিবাদ প্রচারের যে আদর্শ, সেই 'কান্তাসম্মিত' ভাবকে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা রক্ষা করেন নাই। তিনি স্থানে স্থানে 'প্রভুসম্মিত' কথাও বলেছেন। আর্টের বিচারে সেখানেই উপন্যাসকার বঙ্কিম যবনিকার অন্তরাল থেকে উপন্যাসের পাদপীঠে নীতিপ্রচারকের ভূমিকা নিয়ে দর্শন দিয়েছেন। এই অনধিকার প্রবেশের পর তিনি স্বমুখে যে সকল উপদেশ দিয়েছেন, আর্টের বিচারে তাকে অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করা ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করা চলে না। 'বিষবৃক্ষে'র উপসংহারে তিনি নিজমুখে বলেছেন—"আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।" এভাবে কথকের পুরাণ-মাহাত্ম্য প্রচারের ন্যায় নীতি-উপদেশ দানের কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। কারণ,—বিষবৃক্ষের ফলশ্রুতি তো রয়েছে তার আখ্যানভাগেই। তাই বিশেষভাবে এই উপদেশ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

বিপরীত নজীর

অতএব, পরিশেষে সংক্ষেপে বলা যায়, সাহিত্যে আদর্শবাদ থাকবে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে। সাহিত্যকার থাকবেন আখ্যানভাগের অন্তরালে এবং তাঁর আদর্শ-বাদের সার্থকতা বিচার হবে ফলশ্রুতির মানদণ্ডে। তাঁর আসল উদ্দেশ্য হবে সুন্দরের উপাসনা আর সেই উদ্দেশ্যের বাহন হবে তাঁরই সৃষ্ট সাহিত্য। এই অধিকারের সীমা অতিক্রম করলেই উঠবে আপত্তি—সাহিত্যের মূলরসও হবে ক্ষুণ্ণ।

শেষ কথা

## সাহিত্য ও বাস্তববাদ

সাহিত্যের নাড়ীর যোগ সমাজের সঙ্গে, সামাজিক মানুষের সঙ্গে। মানব-হৃদয়ের গভীর অনুভূতির স্পর্শমুক্ত কোন সাহিত্যসৃষ্টি এ যুগে অসম্ভব। বাস্তব জীবনের খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিক সত্য সাহিত্যের মাধ্যমে রূপান্তরিত রূপে এক অখণ্ড পরিপূর্ণতায় প্রতিভাত হয়। জীবনে যে অপূর্ণতার বেদনা, যে বিচ্যুতির বিস্বাদ, সাহিত্যের ভাব-রসায়নে সেই বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশগুলিই এক অপূর্ব সম্পূর্ণতায় সমন্বিত হয়, যখন ব্যক্তিক কাহিনী সামগ্রিক সত্যরূপে নিখিল মানবহৃদয়ের কোমল স্পর্শ কামনা করে। সাহিত্যের মধ্যে তাই আমরা পাই জীবনের অখণ্ডতার আভাস, অন্তঃসলিলা মনোবেদনার রসঘন

সাহিত্যের স্বরূপ

সমগ্র চিত্র। তাই বেদনা-বিধুরতায় ও সাহিত্য আনন্দের নির্যাস—দৈনন্দিনতার ক্ষুদ্র আবেষ্টনপিষ্ট জীবনে তাই বৃহত্তর মানবতার সুদূর আহ্বান—জীবনের সীমান্বিত সসীম পরিধিতে তাই অনন্ত অসীমের সুবিপুল অবকাশ। মানুষের প্রয়োজনবোধের তাগিদে সাহিত্যের রূপকল্পনা ঘট্‌লে এই সীমাবদ্ধতার সংকীর্ণতার বাইরেই হয় তার অবাধ বিহার।

সাহিত্যের এই যে সত্যস্বরূপ, ইহার মূল উপজীব্য, প্রধান অবলম্বন তা'হলে কি? নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুনিবিড় মানবহৃদয় আর মানুষের আবাসভূমি তার সুখদুঃখের নিকেতন এই সমাজ-সংসার। সাহিত্যিক সত্তা মানুষের মনের গভীর তলদেশে অবতরণ করে' হৃদয়বৃত্তির যে অমূল্য মণিমুক্তা আহরণ করে, তা পরিবেশন করার সুদক্ষ কারিগরিতেই প্রকৃত রসসৃষ্টির সার্থকতা। লক্ষ যুগের হাসি-অশ্রু আর দুঃখসুখের সংগীতে-গাঁথা এই ধরাতলে মানবজীবনের কত বৈচিত্র্য, কত বিভাগ, কত শ্রেণীবিন্যাস। সমগ্র মানুষের রূপ এখানে অভিন্ন নয়—সমাজব্যবস্থার অসম বিন্যাসের দরুণ মানুষের পদমর্যাদা আর তার অবমাননার কতই-না স্তর। সমাজের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ইতর-ভদ্র, ছোট-বড়, সাধারণ-অসাধারণ কত মানুষই-তো বাস করে! সাহিত্যকার যদি প্রকৃত মানবদরদী হন, অপরাজেয় মানবতার যদি তিনি হন সহযাত্রী, প্রকৃতভাবেই যদি তিনি পূজারী হন সত্য শিব ও সুন্দরের—তবে কাহাদের জীবন অবলম্বনে গড়ে উঠ্‌বে তাঁর সাহিত্যপ্রয়াস? এ প্রশ্নের সদুত্তরের উপর নির্ভর করে সাহিত্যে বাস্তবতার যাচাই।

সাহিত্যের সামগ্রী

উত্তরাধিকারসূত্রে যে-সাহিত্যের অধিকারী আমরা, তা বিচার ক'রলে দেখা যায়, সেখানে দেশের সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার অত্যন্ত কড়াভাবে নিয়ন্ত্রিত। দু'একজন আগন্তুক সেখানে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু তাদের তেমন সমাদর হয় নাই—সে:যেন ঘোর অন্ধকার কামরায় কোন গোপন ছিদ্রপথে প্রবেশ-করা এক ঝলক আলোরই মতো। তখন সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা ইত্যাদি ছিলেন উচ্চশ্রেণীর মানুষ—রাজা-মহারাজ-জমিদার শ্রেণীর লোক। চাকর-বাকর বা দাস-দাসী অথবা নেহাৎ ভাঁড় হবার সুযোগ পেলেও নায়কত্বের সম্মান তারা কোনদিনই পায়নি। বড়লোকের ছেলের বিয়েতে শোভাযাত্রার গৌরব বর্ধন ক'রতে গ্যাসের বাতি বইবার জন্যে যেমন কতকগুলা অন্ধকারের-যাত্রী ভারবাহী মানুষের দরকার হয়, সেদিনের সাহিত্যেও তেমনি সাধারণ মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল একান্ত প্রয়োজনেরই তাগিদে—ভীত ত্রস্ত সংকুচিত পদে। কারণ,—সে-যুগটাই ছিল Hero-worship বা বীরপূজার যুগ। সমাজ ও রাষ্ট্রের চাবিকাঠি ছিল

অতীতের ইতিহাস

ঐ সব মানুষের হাতে! আর দেশের বোবা মানুষ বিস্মৃতির ঘোরে, চৈতন্যের অভাবে খুঁজে পায় নি মুক্তিপথের সন্ধান।

কালপ্রবাহের বিরাট্ পরিবর্তনের ফলে সাহিত্যের পথ-চলারও ঘটল দিক-বদল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাগ্রত সংবিৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নাম্‌ল উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে। রাজনৈতিক চেতনার দ্রুত অগ্রগতি প্রভাব বিস্তার ক'রল আমাদের সাহিত্যের 'পরে। সবার উপরে যোগ দিল বিদেশী সাহিত্য, বিশেষতঃ ইংরাজি সাহিত্যের যুগান্তকারী প্রভাব তো প'ড়লই। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শে আমাদের দেশের সাহিত্যিকেরাও নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে পদচারণ শুরু করলেন। ফলে দেখা গেল, মধ্যবিত্ত-শ্রেণী সাহিত্যের আসর জাঁকিয়ে বসেছে আর 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ'র মত দেশের ইতরজনও মধ্যে মধ্যে পাত্ পাড়ছেন। এবারে সাহিত্যের মধ্যে যেমন নূতন মানুষের সন্ধান পাওয়া গেল, তেমনি দেখা গেল এদেশের জরাজীর্ণ মৃতকল্প সমাজের ছবি। সমাজ আর মানুষকে পৃথক্ না রেখে দেখানোর চেষ্টা হল—বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের স্থান কোথায়। সাহিত্যকে এতদিন যেভাবে ধূলিমালিন্যের ঊর্ধ্বে শুভ্রতার আবরণে আবৃত করে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল, তা আর টিক্‌ল না। মানুষের জীবন যে তার সকল ভালো-মন্দে-মেশানো—সাহিত্য-রচয়িতারা সেই সত্যটিকে স্বীকার করে নিলেন। তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন মানুষের নীচতা-দীনতা-ঘৃণ্যতার জন্য সমাজও সমভাবে দায়ী। তাই সাহিত্যের জয়যাত্রার পথে বাস্তববাদের তোরণদ্বার হল উন্মুক্ত।

*বাস্তববাদের আবির্ভাব*

সনাতন ধ্যানধারণায় পুষ্ট পুরাতনপন্থীরা রব তুল্‌লেন—সাহিত্য নিয়ে এ সব ছেলেখেলা চ'লবে না, সাহিত্যকে বাজারের জিনিস করে' তার বিশুদ্ধ শুভ্রতা কলঙ্ক-মলিন করা চলবে না, সাহিত্যকে কণ্ঠরোধ করে' এভাবে তার অপমৃত্যু ঘটানো চ'লবে না। প্রতিবাদীরা বললেন—সাহিত্য মানুষের নিভৃত আনন্দের সৃষ্টি, তার স্থান বাস্তব পৃথিবীর ধূলিমাটির মধ্যে নয়। ক্যামেরায় ছবি তোলার মতো বাস্তবের ফোটোগ্রাফী ক'রলেই সাহিত্যে রসসৃষ্টি হয় না, সার্থক মহৎ সাহিত্যের উদ্ভব হয় না। অর্থাৎ তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হল বাস্তবধর্মী সাহিত্যিকেরা কেবল বাস্তবের কুশ্রী ঘটনার বিন্যাস-সাধনই করতে পারেন—প্রকৃত রসসৃষ্টি করতে পারেন না।

*পুরাতনপন্থীদের সহিত বিরোধ*

প্রশ্নটি একদেশদর্শী। আমরা পূর্বেই বলেছি, সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য মানুষ ও সমাজ। মানুষ ব'লতে কোন বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষকে বুঝায় না। দেশের আপামরদুঃখী জনসাধারণই এ সমাজের মেরুদণ্ড—তাদেরই তিল তিল রক্তমোক্ষণে শিল্প-সংস্কৃতির স্বর্ণমিনার গগন ভেদ করে' উঠেছে। সাহিত্যে তাদের জীবনকে রূপায়িত করা এমন কিছু গুরুতর অপরাধ

*অভিযোগের উত্তর*

নয়, সাহিত্যের প্রাণধর্মের বিরোধীও নয়। বর্তমান যুগের মানুষের শ্রেয়োবোধমূলক কল্পনার জগতে বিরাট যুগান্তর ঘটেছে। সুতরাং সাহিত্য-রচনার পুরোনো রীতিনীতি-পদ্ধতি এ যুগের নবতর বিশ্বাসের নবজাতককে স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। লেনিন সত্যই বলেছেন,—'Art belongs to the people. It ought to extend with deep roots into the very thick of the broad toiling masses.' সাহিত্যে জনতার বা বাস্তব সমাজের উপস্থিতি তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু বস্তুতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে আসল আপত্তি অনেক দিক দিয়ে। সাহিত্যের রসসৃষ্টিই প্রধান কথা—সেই সৃষ্টিপ্রবাহকে যদি বাস্তববাদ ক্ষুণ্ণ না করে, তবে সেখানে আপত্তি উঠতে পারে না। কিন্তু বাস্তববাদের নামে সাহিত্যিক যদি মানবমনের গভীরতম রহস্যের সন্ধান দিতে না পারেন, সুন্দরের উপাসনাকে বিঘ্নিত করে' তোলেন, তবে তাঁর বস্তুতান্ত্রিকতা সাহিত্যের অধিকারমাত্রা অতিক্রম করে' যায়। সাহিত্যের সামগ্রী তাঁর যাই হোক, তাকে রসঘন ভাবে পরিবেশন ক'রতে পারারই মধ্যে রচনাকারের বাহাদুরি, নতুবা নিছক বাস্তববাদের নামে নোংরা জীবনের অশোভন চিত্রণ সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি নয়। সাহিত্যে আদর্শবাদের যেমন একটা সীমা আছে, তেমনি আছে বাস্তববাদেরও গণ্ডি। অবশ্য রূপান্তরের পথে সাহিত্যের জয়যাত্রার অনেক পুরোনো নীতির পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু জীবনকে সুন্দর ও সুখী করবার যে মূল আদর্শ তা ঠিকই আছে। এই উদ্দেশ্যের যা সহায়ক, তাকে অস্বীকার করা বাতুলতারই নামান্তর।

আপত্তি কোথায়—শেষ কথা

## সাহিত্য ও প্রচার

আজকাল সমালোচনা-সাহিত্যে একটা কথার বড় বেশি চল। আধুনিক সাহিত্যের সচেতন গণকেন্দ্রিক জয়যাত্রাকে যারা বিষদৃষ্টিতে দেখেন, তাঁরা এই উদ্যমকে নস্যাৎ করে' দিতে চান 'প্রোপাগ্যাণ্ডা' বা নিছক প্রচার বলে'। তাঁরা বলেন, সাহিত্যের মধ্যে কোন মতবাদ বা উদ্দেশ্যকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে জনবরেণ্য করে' তোলবার চেষ্টা বাতুলতা—সারদার বাণীকুঞ্জে রাজনৈতিক বিশ্বাসের মতো হস্তীর সদর্প পদচারণা কোনমতেই অভিনন্দনযোগ্য নয়। সাহিত্যের জগৎ পার্থিব ধূলিমালিন্যের অনেক উর্ধ্বে—তাকে দৈনন্দিনতার রুক্ষ ধূসরতার মধ্যে নামিয়ে আন্‌বার দুর্বিনীত চেষ্টা সাহিত্যিক ব্যভিচার মাত্র।

সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতি

অভিযোগের ভাষায় যে তীব্রতার প্রকাশ, বিরুদ্ধবাদীদের আক্রোশের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি। সাহিত্যকে একেবারে অপ্রয়োজনের আনন্দ বলে' আখ্যাত করতে পূর্বের মতো মনের বা সমর্থনের জোর এঁরা পান না সব সময়। কারণ,—উদ্দেশ্য-

হীন সাহিত্য যে আকাশকুসুম কল্পনা, সেকথা এঁরা মর্মে মর্মে বোঝেন—আর বোঝেন বলেই বলেন, সাহিত্যের শেষ লক্ষ্য হল আনন্দসৃষ্টি ও সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা।

অভিযোগের স্বরূপ বিচার

আধুনিক প্রগতিবাদী সাহিত্যের প্রবক্তারা বিনা বাক্যে স্বীকার করেন, সাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্য আনন্দসৃষ্টি। কিন্তু আনন্দসৃষ্টিকেই তাঁরা এক এবং অদ্বিতীয় লক্ষ্য বলে' মান্‌তে গররাজি। তাঁদের জিজ্ঞাস্য হল—আনন্দসৃষ্টি কিসের জন্যে? অলস অবসরের কর্মহীন বিরতিকে ভরবার জন্যে, না—মানুষের আশাহত চিত্তকে অনন্দমন্ত্রে প্রবুদ্ধ করে' মহত্তম সৃষ্টির পথে প্রবর্তনা দেবার জন্যে? সংগ্রামের পথে সাহিত্য কি নিরপেক্ষ দর্শকের মতো মানুষকে প্রবঞ্চিত করবে, না—অনুপ্রেরণা যুগিয়ে সফল করে' তুলবে?

সাহিত্যের যে উদ্দেশ্য আছে, সেকথা গোঁড়া সাহিত্যধ্বজীরাও জানেন ও মানেন। তাঁরা বলেন—সে উদ্দেশ্য হল আনন্দদান ও জীবনে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা স্থাপন। অর্থাৎ

আসল আপত্তি—রাজনীতি

সাহিত্যিক ও শিল্পীর ব্রত হচ্ছে মানুষকে আনন্দ দেওয়া এবং জীবনে সুন্দর ও সত্যের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা। একথা যদি সত্য হয়, তবে সাহিত্যের প্রচারবাদী মূল্যকে প্রমাণ করা অত্যন্ত সহজ। সাহিত্যিক বা শিল্পী নিজের জন্যে সাহিত্য বা শিল্প রচনা করেন না—করেন অন্যের রসোপলব্ধিকে চরিতার্থ করার জন্যে। অর্থাৎ স্বীয় প্রতিভায় যাদুস্পর্শে তিনি সৃষ্টি করেন আর তার যথার্থ মূল্যবিচার হয় অন্যের অনুভবে। কথাটা:একটু জোরালো ভাষায় বললে দাঁড়ায়, স্রষ্টার সীমায়িত গণ্ডিতে সাহিত্যের মূল্য কানাকড়ি—পাঠকসমাজের সমাদরই তার আসল মূলধন। যত বেশি লোক সাহিত্যের রসাস্বাদন করে, ততই তার সার্থকতা।

প্রকারান্তরে, এই কথাই প্রমাণিত হল যে, প্রচারেরই মধ্যে সাহিত্যের প্রাণ। কবি যেমন নিজে পড়বার জন্যে কবিতা লেখেন না—শিল্পীর চিত্রায়ণও তেমনি নিজের চোখের

প্রচারের মধ্যেই সাহিত্যের প্রাণ

তৃপ্তির জন্যে নয়। আসলে পাঠকহীন লেখক ও সমঝদারশূন্য শিল্পীর অস্তিত্ব অস্বাভাবিক। নীরব কবিত্ব যেমন অবাস্তব—এর ব্যতিক্রমও তেমনি অসম্ভব। যে-প্রশ্নকে কেন্দ্র করে' সমালোচনার ঘূর্ণিঝড় উঠেছে তার মোদ্দা কথা হল—সাহিত্যের মধ্যে রাজনীতিক চেতনার বাষ্পমাত্রেরও 'প্রবেশ নিষেধ'। কারণ,—এতে সাহিত্যের শুচিতা হয় নষ্ট, ঐতিহ্যও থাকে না, উদ্দেশ্য হয়ে যায় ব্যর্থ এবং সাহিত্যও শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় বাজারের সস্তা পণ্য।

এ-কালের সাহিত্যিক কখনও সমাজের নির্দেশকে, ইতিহাসের সাক্ষ্যকে অবহেলা করতে পারেন না। কারণ,—তাঁর প্রতি রক্তকণিকায় আছে বিদ্রোহের বীজ। যে-

এ অভিযোগ কি সত?

সমাজ তাঁর শিল্পীমানসকে পরিবর্ধিত করার উপযুক্ত রসদ দেয় নি, মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার তাঁকে দেয় নি—সাহিত্যসাধনায় মানুষের পুলকোচ্ছল সুখী জীবনযাত্রার সুন্দর চিত্র আঁকবার পথ

রোধ করে রেখেছে—নির্বিকার ঔদাসীন্যে তাকে স্বীকার করা কাপুরুষতা, আত্যন্তিক আগ্রহে তার জয়কীর্তন করা অমার্জনীয় অপরাধ। সাহিত্যিকের দরদ অবজ্ঞাত অবহেলিত নির্যাতিত মানবতার পথে—অন্যায় অসত্য অবিচারের রক্তচক্ষুর সামনে তার পলায়নপরতার নীতি আত্মহত্যারই নামান্তর।

যুগাগত সত্যকে মান্‌তে গিয়েই তাঁদের সাহিত্যে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে যুগের স্বাক্ষর। সর্বহারা মানুষের বেদনার কাহিনীকে রূপায়িত করতে গিয়ে সুন্দর ও সুখী জীবনের জন্যে সংগ্রামরত তার জীবনের উজ্জ্বল দিকে অন্ধ দৃষ্টি মেলে নির্বিকল্প ব্রহ্ম সাজা যায় না। তবে সেই সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে কেবল বাস্তবের কুশ্রী দিকের জঘন্য ফোটোগ্রাফী করা বা গরম গরম 'স্লোগান'-এর জোড়-বিজোড় মিলনে কাব্যরচনার উন্মাদনা প্রকাশ করা সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি নয়। 'স্লোগানে'র সাময়িক মূল্য থাকতে পারে। তাই বলে তাকে সাহিত্য হিসেবে চালু করতে যাওয়া জবরদস্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রচার হতে পারে, কিন্তু প্রচারমাত্রই সাহিত্য নয়। কারণ—সাহিত্যের কতকগুলো নিজস্ব ধর্ম, কতকগুলো বিশিষ্ট গুণ আছে। ব্যক্তির ভাবনা যদি সামগ্রিকতা লাভ না করে—ব্যষ্টির বেদনা যদি সমষ্টির বেদনায় প্রতিভাত না হয়, তবে ব্যর্থ হয় সাহিত্যিকের সাধনা। সাহিত্যের প্রথম কথা রসঘনতা—তারপর অন্যান্য বিচার। রসসৃষ্টি সার্থক হলে অন্য আপত্তি তিলমাত্র টিকৃতে পারে না।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রচার কিন্তু প্রচারমাত্রই সাহিত্য নয়

শ্রীযুক্ত ফ্যারেলের মতে, প্রচার বা 'প্রোপাগ্যাণ্ডা' জিনিসটি হচ্ছে 'a method of conventionalising and epitomising thought and policy'। সাহিত্য ও প্রচার—উভয়েরই মধ্যে ভাব বিদ্যমান। সাহিত্য প্রকাশিত হয় ভাষায়-রূপে-রঙে ভরে'; পক্ষান্তরে 'প্রোপাগ্যাণ্ডা'র ভাবটি প্রকাশিত হয় ভাষার দীনতার মধ্যে দিয়ে রূপ-রঙ-বিবর্জিত হয়ে। "ভাব তাই সাহিত্যের মধ্যে তরঙ্গায়িত হয়ে অন্তরকে স্পর্শ করে, সেই স্পর্শে পুনরায় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, কিন্তু প্রোপাগ্যাণ্ডার মধ্যে ভাব দানা বেঁধে দলা পাকিয়ে যায়, তাই তীরবেগে বাণের মতো যখন সে অন্তরে বিঁধে যায় তখন হয় প্রবল উত্তেজনায় সৃষ্টি, একরাশ বুদ্‌বুদের মতো ফুলে ফেঁপে সে অন্তর্ধান করে। মুগুর উঁচিয়ে কাজ করানোর মতো প্রোপাগ্যাণ্ডা মানুষকে কর্মে উৎসাহিত করে, কিন্তু তাতে চোখ-রাঙানির আর ধমকানির মাত্রাই থাকে বেশি······সাহিত্যের উদ্দেশ্যও ······মানুষের মর্মজীবনের প্রেরণা যোগানো, মানুষকে জীবন্ত করা, জীবনকে সুন্দর ও মহৎ করা—কিন্তু ধমক দিয়ে বা 'লগুড়েন' নয়, গায়ে হাত বুলিয়ে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে, বুঝিয়ে, যুক্তি দিয়ে, প্রলুব্ধ করে', মুগ্ধ করে'। সাহিত্য সেইজন্য

প্রচার ও সাহিত্যের স্বরূপ বিচার

দীর্ঘায়ু এবং প্রোপাগ্যাণ্ডা স্বল্পায়ু।……অন্তঃসারশূন্যতাই প্রোপাগ্যাণ্ডার বৈশিষ্ট্য; সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য গভীরতা। প্রোপাগ্যাণ্ডার মধ্যে 'উদ্দেশ্য' তাই মুখ্য, প্রকাশভঙ্গী গৌণ; সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশভঙ্গী, অর্থাৎ ভাষা, ঘটনা-গ্রন্থন ও চরিত্র-চিত্রণই মুখ্য, 'উদ্দেশ্য' গৌণ। সাহিত্য ও প্রোপাগ্যাণ্ডা দুই-ই উদ্দেশ্যমূলক হলেও, দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান আকাশ-মাটি।"

শেষের কথা

যে সত্য-সুন্দরের কথা বলা হয় ডঙ্কানিনাদ করে', তার পরিবর্তন হয় যুগে যুগে। 'Old order changeth, yielding place to new'—একথা কাব্যিক উচ্ছ্বাস নয়—ইতিহাসের পরীক্ষিত সত্য। সুন্দরের আদর্শও তাই চিরকাল অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। মানুষ আজ সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে তার যুক্তিরাজ্যে—আলেয়ার মায়ায় ভুলে অনিশ্চিতের পিছনে উধাও হবার দিন তার নেই। সে জানে, মানুষের জীবন সুন্দর ও সুখী হতে পারে, যদি বর্তমান সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর সংগ্রামে শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাজই হচ্ছে পথনির্দেশ করা। তাঁরা যে পথ দেখাবেন, সেই পথেই চলবে সর্বহারাদের জয়যাত্রা। এই মহাসত্যকে কি অস্বীকার করা চলে? এ কি যুগ-সত্য নয়? তবে সাহিত্যের বিচার হবে আজ কোন্ মানদণ্ডে?

# সাহিত্য ও রাজনীতি

মানব জীবনের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক

সাহিত্য জীবনের রসশিল্প। জগৎ ও জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মনের যে নিবিড় নিভৃত অনুভূতি রসঘন হইয়া বাণীতে ভরিয়া উঠে, তাহাই সাহিত্য। তাই জীবন সাহিত্যের আলম্বন আর জগৎ তাহার উদ্দীপন। বস্তুবিশ্বের গতি-প্রকৃতির যে নিজস্ব ধারাটি আছে, তাহার সহিত জীবন কখনও বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বেদনায় কাঁদিয়া উঠে, আবার জগৎ ও জীবনের প্রকৃতিতে যখন সমন্বয়ের সুর ফুটিয়া উঠে তখন জাগে আনন্দের হিল্লোল, জাগে বিহ্বলতার আবেশ। সাহিত্য এই সুখদুঃখের নিবিড় অনুভূতির রসপ্রকাশ।

মানবজীবনের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক

জীবনের নিজস্ব গতি-প্রকৃতির সহিত রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থার একটা সংগতিবিধানের প্রয়াস হইতে রাজনীতির জন্ম। মানুষের জীবনপ্রকৃতিকে কেমন করিয়া রাষ্ট্র-প্রণালীর সহিত খাপ্ খাওয়াইয়া লওয়া যায়, এই চিন্তা হইতেই আদিম মানবের মনে রাজনীতিবোধের জন্ম হইয়াছিল। জীবনের সহিত রাজনীতির এই সম্বন্ধ হইতেই জীবনশিল্প-সাহিত্যের সহিতও ইহার একটি সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজনীতিকে যদি জীবনের সহিত একান্তভাবে সংযুক্ত বলিয়া মনে করি, তবে তাহার প্রবেশ সাহিত্যেও

অপরিহার্য হইয়া উঠে। কারণ,—সাহিত্য মানবজীবনের বাস্তব পরিবেশের মধ্য হইতেই উন্নীত হইয়া এক রসলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে স্বপ্নানন্দী উচ্ছ্বাস কবি-কল্পনার ফলশ্রুতিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা জীবনের বাস্তব পরিবেশ হইতেই তাহার বস্তুরূপ গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হয়। এই বস্তুর সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। তাই সারদার বাণীকুঞ্জে রাজনীতিকে একান্ত মত্ত হস্তী বলিয়া মনে করা ভুল।

তবু একটি কথা মনে করিবার আছে। সাহিত্যে জীবনের রসশিল্প—শুধুমাত্র বস্তুবিশ্লেষণ নয়। জীবনের বস্তুগুলিকে অবলম্বন করিয়াও তাহাদের অন্তস্তল হইতে নিভৃত মানবহৃদয়ের অতলান্ত রহস্যকে রসরূপ দিতে হইবে সাহিত্যে। জীবনের বস্তুসত্তার নিবিড় গহনে আছে যে গভীরতম জীবনরস, সেই রসকে কবিশিল্পী তাহারই অনুরূপ নিপুণ কলকৌশলের মধ্য দিয়া প্রকাশ করেন। সাহিত্যের আত্মা সেই গম্ভীর জীবনরহস্য আর তাহার রূপ ( Form ) নিপুণ শিল্পকলা। এই ভাব ও রূপের সুসংগতির মধ্য দিয়া সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদনার ফলেই জীবন রসশিল্পে রূপান্তরিত হয়। সাহিত্যের এই মূল কথাটিকে মনে রাখিতে পারিলে আমাদের বিচার-বিভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সত্যের আলোকে পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, সাহিত্য জীবনের বস্তুরূপ হইতে উদ্ভূত হইলেও ঐ বস্তুই রসোত্তীর্ণ হইবার পথে প্রধান সম্বল নয়। কোন একটি শিল্পসৃষ্টি সার্থক হইয়াছে কিনা, তাহার বিচার করিতে বসিয়া তাহার কথাবস্তু বা সমস্যা প্রচারটিকে একান্ত প্রধান করিয়া দেখিলে আমরা ভুল করিয়া বসিব। বাস্তব সমস্যা বা কথাবস্তুটি প্রয়োজনীয় হইলেও সেই কথাবস্তু ও বাস্তব-সমস্যাটির মধ্য দিয়া যে জীবন চিত্রিত হয়, তাহার গভীর মর্মরহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে কিনা, বস্তুর মধ্য দিয়া সেই জীবন একান্ত গভীরতর অনুভূতি ও নিবিড় রসসংবেদনায় অভিস্নাত হইয়াছে কিনা, ইহাই আমাদের বিচার্য। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের শিল্পকৃতিত্বকেও আমাদের বিচারের সময় মনোযোগের সহিত চিন্তা করিতে হইবে। আসল কথা, কবি-সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য হইবে জীবনের রসমূর্তি অঙ্কন ও বস্তু পরিবেশের মধ্য দিয়া জীবনকে গ্রহণ করিয়াও তাহাকে এক অলৌকিক রসসংবেদনায় উন্নীত করা।

সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড

ইহাই যদি সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও তাহার বিচারের মানদণ্ড, তবে রাজনীতিকে অন্যান্য সমস্যারই মত জীবনের একটি সমস্যা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রেম, সমাজদ্বন্দ্ব প্রভৃতির মতই রাজনীতিও অন্য সকলের সহিত জড়িত জীবনের অন্যতম সমস্যা মাত্র। এই কথা মনে করিলে রাজনীতিকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করিতে আমাদের কুণ্ঠার প্রয়োজন নাই। আবার আর সকল সমস্যাকে বর্জন করিয়া রাজনীতি প্রচারের অতি-উৎসাহেরও প্রয়োজন

রাজনীতি একটি জীবন-সমস্যাবিশেষ বলিয়া ইহাও সাহিত্যের সামগ্রী

নাই। রাজনৈতিক সমস্যাকে অবলম্বন করিয়াও যদি জীবনরস সৃষ্টি করা যায়, তবে তাহা রসোত্তীর্ণ উচ্চাঙ্গ সাহিত্যই। রাজনৈতিক সমস্যাপীড়িত জীবন চিরন্তন মানবজীবনের রসসংবেদনা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে কিনা, শিল্পবিচারে আমাদের তাহাই মনে রাখিতে হইবে। শুধু সমস্যাটির গুরুত্ব-লঘুত্বের মাপকাঠিতে শিল্পের সার্থকতা বিচার করিতে গেলে বিভ্রান্তি হইবে।

রাজনৈতিক সমস্যামূলক সাহিত্যের চিরন্তনত্ব

পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, যে সকল রাজনৈতিক সমস্যামূলক শিল্পসৃষ্টি অমরত্বে উন্নীত হইয়াছে, তাহাদের সার্থকতার কারণ শুধুমাত্র ঐ সমস্যাগুলিই নয়। উহাদিগকে অবলম্বন করিয়া তাহারা চিরন্তন মানবজীবনের রসরহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে এবং সেইজন্যই তাহারা চিরকাল মানুষের জীবনশিল্প হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। রুশ্ সাহিত্যিক মাক্সিম্ গর্কির 'মা' তৎকালীন রাজনৈতিক বিদ্রোহের কথাচিত্র হইয়াও চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্যধারায় সঞ্জীবিত। শ্রীমতী পার্ল বাকের 'গুড্ আর্থ' কৃষকজীবনের একান্ত বস্তুচিত্র হইয়াও চিরকালের মানবজীবনরসসিঞ্চিত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সার্থক প্রগতিবাদী শিল্পী-দের লেখনীতে রাজনীতি ও সমাজনীতির একান্ত বস্তুরূপ থাকিলেও তাহা মানবজীবনের রসমূর্তি হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক রুশ্ সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে এই বাস্তব জীবনরস— যুদ্ধোত্তর বিশ্বসাহিত্যের প্রায় সর্বত্রই এই সংগ্রামী বাস্তব জীবনের বাণীরস।

রাজনৈতিক সাহিত্য-শিল্পীর গুরুদায়িত্ব—শেষ কথা

তাই রাজনীতি জীবনরসসৃষ্টির অবলম্বনমাত্র আর সাহিতে রাজনীতি-প্রচারের জন্য নয়, এই কথাটি আমাদের মনে রাখিতে হইবে। যে-লেখক শিল্পসৃষ্টি করিতে বসিয়া একান্ত সচেতনভাবে তাঁহার যুগের রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে বক্তৃতার ভঙ্গীতে প্রচার করিতে বসেন, তিনি রাজনীতি-প্রচারক হইলেও জীবনরসরসিক শিল্পী নহেন। কারণ,— তাঁহার রসসৃষ্টির প্রয়াস সমস্যা-প্রচারের উৎসাহে একান্তভাবে ব্যাপৃত। তাঁহার রচনা তাই সেই যুগকে অতিক্রম করিতেই স্বকীয় জীবন হারাইয়া বসিবে। কিন্তু যে-শিল্পী রাজনৈতিক সমস্যাপীড়িত জীবনকে অবলম্বন করিয়াও উহার গভীরে অবগাহন করিয়া উহাকে রসস্নিগ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন, তিনিই সফল সাহিত্যিক। রাজনৈতিক সমস্যামূলক বিষয়বস্তু লইয়া শিল্পসৃষ্টি করিতে বসিয়া শিল্পীকে তাঁহার রসসৃষ্টির প্রধান কর্তব্য ভুলিলে চলিবে না। রাজনীতি সাহিত্যের অবলম্বন হইয়া থাকিতে পারে, রাজনৈতিক সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতকে জীবনের রসসৃষ্টিতে সহায়ক হিসাবে গ্রহণও করা যাইতে পারে, কিন্তু সার্থক শিল্পীকে সেই রাজনীতির আবর্ত হইতে জীবনের গভীরতম রসসত্যে অবশ্যই উন্নীত হইতে হইবে।

# সাহিত্য, সমাজ ও জীবন

মানুষ পৃথিবীতে একাকী বাস করিতে পারে না—তাহারা বাস করে দলবদ্ধ ভাবে। সকল মানুষের মিলনেই সমাজব্যবস্থার উদ্ভব। সমাজই মানুষের সৃষ্টি—মানুষ সমাজের ক্রীতদাস নয়। আর সামাজিক জীব বলিয়াই মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ এই সমাজেরই মধ্যে। সমাজকে বাদ দিয়া মানুষের যে পরিচয়, তাহা অসম্পূর্ণ। সংসারত্যাগী মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনায় জগতের ক্ষতিবৃদ্ধি সামান্যই। সাহিত্যের কারবার মানুষের হৃদয়বৃত্তি লইয়া আর এই জটিল মানসিকতার বিবর্তনের মুখ্য কারণ তো এই সামাজিক পরিবেশই। মানুষ মিলিয়া মিশিয়া বাস করিয়া যেদিন সামগ্রিক কল্যাণের মধ্যে নিজের কল্যাণের মন্ত্র খুঁজিয়া পাইল, সেইদিন হইতেই তাহাদের সভ্যতার সূত্রপাত ও অগ্রগতি। সমাজবোধই তাহাদের সকল উন্নতির প্রাণশক্তি, সকল উৎকর্ষের মুল উৎস।

জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক

দেশে দেশে সামাজিক মানুষের মধ্যে বর্ণ-ধর্ম-স্বার্থ ইত্যাদিব বিচারে অসংখ্য ব্যবধান। কোন দেশের মানুষ সভ্যতার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছে—রাষ্ট্রীয় মদমত্ততায় কেহ-বা অন্যকে নির্মমভাবে শোষণ করিয়া অবনতির হীনতম অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছে। এই অসম ব্যবস্থায় কত স্তর, কত প্রভেদ। কিন্তু সাহিত্যের উপজীব্য যে মানুষের মন, সেখানে মানুষে-মানুষে এই বিসদৃশ পার্থক্য নাই—মানবিক বৃত্তিনিচয়ের পর্যালোচনায় সেখানে তাহাদের গোত্র এক ও অভিন্ন। মহৎ সাহিত্য দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবের রসপিপাসু চিত্তে আপনার চিরস্থায়ী আসন লাভ করে। হৃদয়ের ক্ষেত্রে এই যে মিলন, ইহা সাহিত্যের মস্ত বড় সম্পদ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যের আনন্দরসের উত্তরাধিকারী সকলেই—প্রেম-ভালবাসা-স্নেহ-প্রীতি ইত্যাদি সদ্‌গুণ সকল দেশের মানুষের মনে একই ভাবে বিদ্যমান। কালিদাসের 'মেঘদুতে'র রসাস্বাদনে য়ুরোপীয় মনীষী যেমন অপূর্ব আনন্দ অনুভব করেন, তেমনি জার্মান গ্যয়টের 'ফাউষ্ট' বা হোমারের 'ইলিয়াড্' 'অডিসি' পড়িয়া ভারতীয় রসিকচিত্তও পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

মানবসমাজ ও সাহিত্য-জগৎ

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয় পৃথক্ পৃথক্ পরিবেশে। নিজস্ব সমাজের প্রভাবেই তাঁহার ধ্যানধারণার গঠন; দূরপ্রসারী সামাজিক প্রভাবে তাঁহার সাহিত্যের প্রাণশক্তি প্রতিস্পন্দিত। আলাদা আলাদা পরিবেশ সৃষ্ট সাহিত্যের সর্বজনীন আবেদন তাহা হইলে কি প্রকারে সম্ভব? এক দেশের লোকের জীবনে যাহা সত্য, অন্য দেশের লোকের পক্ষে তাহা কি প্রকারে অভিন্ন হইতে পারে? প্রশ্নটির সদুত্তর লাভ করিতে হইলে আমাদের জানা দরকার—সাহিত্যের সত্য আর জীবনের সত্য, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

সাহিত্যের সর্বজনীনতা

সংসারী মানুষের জীবনে অপূর্ণতার সীমা নাই। মানুষ জীবনে যাহা পায়, তাহা তাহার আন্তর কামনাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। কারণ, সে যাহা চায় তাহা সে পায় না। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটিকে অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—

'আমি যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।'

—চাওয়া-পাওয়ার এই যে অসমতা, এই যে অসংগতি, এইখানেই জীবনের ট্র্যাজেডি। আর এই অপূর্ণতার বেদনাবোধই মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে জীবনকে সুন্দরতর ও মহত্তর ভাবে বিকশিত করিতে। কিন্তু সাহিত্য-সত্য জীবন-সত্যের মত প্রতি পদে বিঘ্নিত নয়। শিল্পীর ভাবজগতে সে এমনভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায় যে, তাহার প্রকাশিত রূপে একটা সম্ভাব্য সম্পূর্ণতার সুর অনুরণিত হইয়া উঠে। এই যে ভাবনাঘন সত্য, ইহার মধ্যে ইঙ্গিত থাকে জীবনে যাহা ঘটে নাই অথচ যাহা ঘটিলে জীবনটা শতদলের মত বিকশিত হইতে পারিত তাহারই। রচয়িতার গভীর অনুভূতিরসে জারিত হইয়া সমাজের খণ্ডিত ব্যক্তিজীবনের সত্য ভাবগভীর রূপে একটা সামগ্রিক সত্তা লাভ করে এবং সেই সম্পূর্ণতা-বিধানে দক্ষ শিল্পীর নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। যথার্থ শিল্পীর রচনায় এই সামগ্রিক আবেদন অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যঞ্জিত।

সাহিত্যের সত্য ও জীবনের সত্য

মানুষ চায় অপূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আভাস, সসীমের মধ্যে অসীমের সুর। জীবনে যে ধন পাওয়া গেল না, তাহাকেই সে খুঁজিয়া ফিরে। জীবনের সমস্ত বোধ, হৃদয়ের প্রত্যেকটি বৃত্তি সমভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ পায় না। এই অপূর্ণতা সাহিত্যের সোনার কাঠির যাদুস্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠে। আর সেই রসসৃষ্টিকে অনুভব করিয়া মানুষের মন ভরিয়া উঠে আনন্দে। সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য যে সুন্দরের সাধনা, এইরূপে তাহা সফলতার পথে অগ্রসর হয়—সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ নিবিড় ও গভীর হইয়া উঠে। বাস্তব জীবনের চিত্রায়ণে দেশে দেশে বিভেদ থাকিতে পারে। মানবীয় ধর্মে সে পার্থক্য কোথায়? তাহা হইলে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' বিশ্বজনীন সমাদর লাভ করিতে পারিত না; গর্কির 'মাদারে'র মা-এর জীবনের বিচিত্র কাহিনী ব্যথা-করুণা-রসে মাতৃস্নেহে-পাগল মানুষের মনকে উজ্জীবিত উন্মুখর করিয়া তুলিতে পারিত না।

সাহিত্য ও জীবনের মধুর সম্বন্ধ

মানুষ গঠন করিয়াছে সমাজ—আর সেই সমাজ আবার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে মানুষের মনে। সমাজ-সচেতন সাহিত্যিকের রচনায় যে সকল নরনারীর হৃদয়দ্বন্দ্বের পরিচয় আমরা পাই, সমাজের অমোঘ শক্তি কখনও প্রকাশ্যে, আবার কখনও নেপথ্যে

তাহার প্রেরণা যোগায়। সমাজকে বড় করিতে গিয়া অর্থাৎ অতিমাত্রায় বস্তুতান্ত্রিকতার মোহে জীবনধর্মকে অবহেলা করিয়া যখন বাস্তব ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিন্যাসই মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়, তখন আর তাহাকে সার্থক সাহিত্য বলা যায় না, তাহাকে আখ্যা দেওয়া যায় বাস্তবকেন্দ্রিক অথবা ভাববিলাস। সমাজই যে সব সময় সাহিত্যিককে প্রভাবান্বিত করিবে, এমন কোন কথা নাই। দূরদর্শী ঋষিদৃষ্টি সাহিত্যরথী অনেক সময় সমাজকে প্রভাবান্বিত করিয়া তাহাকে নূতন পথে চালিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র সারা বাংলায় তথা ভারতে একদিন যে বিপুল দেশপ্রেমের উদ্বোধন করিয়াছিল, তাহার দূরপ্রসারী ফল আমরা আজও ভোগ করিতেছি।

সমাজ-বিবর্তনে সাহিত্যের প্রভাব

একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনতা লেখাপড়া জানে না, সাহিত্যের সঙ্গে তাহাদের আবার সম্পর্ক কি? বড় বড় গ্রন্থ রচিত হইল, কি হইল না—'গীতাঞ্জলি'র জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইলেন, কি পাইলেন না, তাহাতে তাহাদের কি আসিয়া যায়? যুক্তিটা সারবান সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের জনজীবনে আমাদের 'রামায়ণ', 'মহাভারতে'র অতুলনীয় প্রভাবের সীমা-পরিসীমাও তো নাই। জনশিক্ষার যে সব বাহন এক সময়ে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, দেশের লোকের দৈনন্দিন জীবনে তাহার প্রভাব ছিল অপরিসীম। যাত্রাগান, কবিগান, কথকতা ইত্যাদির সাহায্যে সাহিত্যের প্রভাব দেশের নিম্নতর শ্রেণীর লোকগুলির মধ্যে পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্তমানেও দেশে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করিবার নানা পদ্ধতি প্রচলিত আছে: যথা—জারিগান সারিগান, যাত্রাগান, কথকতা, ঝুমুর, কবিগান ইত্যাদি। অবশ্য সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদি প্রবর্তনের ফলে ইহাদের প্রসার পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে খানিকটা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তবু মালদহের গম্ভীরাগানের সঙ্গে স্থানীয় নাড়ীর যোগের কথা ভুলিলে চলিবে না।

জনতা ও সাহিত্য

মানুষের জীবনে অবিনশ্বরতা জীয়াইয়া রাখে সাহিত্যই। সকল উচ্চ ভাবনা-কল্পনা গবেষণা সাহিত্যেরই মধ্যে থাকে বিধৃত ভাবীকালের বংশধরদের উপভোগের জন্য। পাঞ্চভৌতিক দেহের বিনাশ ঘটে অত্যন্ত স্বল্পকালেই—কিন্তু সাহিত্যের মানসলোকে তাহারই হয় অবিনশ্বর প্রাণযাত্রা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—মানুষ সাহিত্যসৃষ্টি করে আপনাকে চিরজীবী করিবার জন্য—যুগ ও কালের শত রূপান্তরের বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার ভাবনা যাহাতে ভবিষ্যতে বাঁচিয়া থাকে, ইহাই তাহার প্রধানতম আন্তর কামনা। সাহিত্য সেই কামনা প্রভূত পরিমাণে রূপায়িত করে এবং মরলোকে ক্ষণজন্মা পুরুষদের ললাটে অমরত্বের জয়তিলক অঙ্কিত করিয়া দেয়।

শেষ কথা

# সাহিত্যে ট্র্যাজেডির বিবর্তন

সংসারে মানুষের জীবন অবিমিশ্র সুখে ভরপুর নয়—তাহাতে দুঃখ আছে, বেদনা আছে, আছে নিপীড়িত আত্মার মর্মান্তিক হাহাকার। পরিমাণগত বিচারে মানবজীবনের আনন্দের তুলনায় বেদনাই বেশি। মনুষ্যত্বের অপমানে, জীবনের অপমানে, ব্যক্তিপুরুষের অপমানে যে সুগভীর বেদনার উদ্ভব হয়, তাহাই' ট্রাজেডির মূল রস। ট্রাজেডির মূল রহিয়াছে জীবনে, যেখানে অনেক কিছু থাকিলেও আছে একটা বিরাট অর্থহীনতা, নিয়তির ক্ষমতাহীন অভিশাপে মনুষ্যত্বের তীব্র লাঞ্ছনা, আর জীবন্ত পুরুষকারের অহেতুক অপমান। প্রাচীনকালের গ্রীক মনীষী আরিস্ততল ট্রাজেডির যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাকে এখনও অনেক সুধী সমালোচক প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন—"Tragedy is the representation of an action which is serious, complete in itself, and a creation of limited length ; it is expressed in a speech made beautiful in different ways in different parts of the play ; it is acted, not merely recited ; and by exciting pity and fear it gives a healthy outlet to such emotions". এখানে ট্রাজেডির অনিবার্য উপকরণগুলির নাম পরিষ্কারভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য সম্পর্কেও ইঙ্গিতে-আভাসে বলা হইয়াছে।

ট্রাজেডির সংজ্ঞা

মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি যে কোন্ পথে কোথা দিয়া দেখা দিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। পরিবার যাহা চায়, দেশ যাহা চায়, সমাজ যাহা চায়, প্রেম যাহা চায়, সেই পরম প্রার্থনীয়ের আগমনপথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় মানুষের মর্যাদাবোধ, তাহার দৃপ্ত আত্মসম্মান। মহামতি আরিস্ততল সেইজন্য বলিয়াছেন,—ট্র্যাজেডি জিনিসটি হোমিওপ্যাথী ওষুধের মত—সামান্য পরিমাণে দেহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অভ্যন্তরবর্তী গ্লানি অনেকখানি অপনোদিত করে। ট্র্যাজেডির ঘটনাবলীর সুনিপুণ বিন্যাসে নায়কের পতনে মানবমনে যে করুণা ও ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহাই জীবনের করুণা ও ভয়ের বেদনাকে অনেকখানি উপশম করে—ইহাই ট্র্যাজেডির আনন্দ। ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য কি, এ সম্পর্কে আরিস্ততল সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন,—"Tragedy's function is to purge away our excess emotions." ভাবমোক্ষণ বা Catharsis-এর সাহায্যে ভিতরের অতিরিক্ত emotion-গুলির প্রাবল্যকে প্রশমিত করিয়া সংযমের আনুকূল্যে সীমায়িত করিয়া জীবনের দুঃখবেদনার মধ্যে একটা আনন্দের আবেশ সৃষ্টি করাই তো ট্র্যাজেডির লক্ষ্য।

ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য

বস্তুতঃ ট্র্যাজেডির আনন্দ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর। প্রকৃতপক্ষে, ইহা সাহিত্যিক

রমণীয়তার মধ্য দিয়া আত্মোপলব্ধির আনন্দ—realisation of the self। স্রষ্টা যেমন নিজের আনন্দস্বরূপ অনুভব করিবার জন্য প্রকৃতি ও মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে নিজের আনন্দ ও সৌন্দর্যস্বরূপের রূপায়ণ দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন, মানুষও তেমন ট্র্যাজেডির নায়কের পতনে, তাহার দুঃখ-বেদনায় কারুণ্য-রসে নিজের সত্যস্বরূপের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া সুগভীর আনন্দলাভ করে। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই একটা মস্ত বড় ট্র্যাজেডি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে মানুষের জীবন হইতেছে—

ট্র্যাজেডি আনন্দদায়ক কেন ?

'আমি যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।'

—চাওয়া-পাওয়ার এই নিরন্তর মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব-দোলায় মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিদিনের কাহিনী এক শরশয্যার গাথাকাব্য। ট্র্যাজেডি কেবলমাত্র সাহিত্যিক রসঘনতার প্রসাদগুণে মানুষের মনকে অভিভূত করে না, ট্র্যাজিক নায়কের জীবন মানুষের জীবনের সহিত একাত্মতা পাইয়া ট্র্যাজেডির করুণরসকে ঘনীভূত করিয়া তোলে। সাহিত্য ও জীবনে এই সাধারণীকরণের সফলতাতেই ট্র্যাজেডির পরম সার্থকতা।

সংসারে বাস করিতে গেলে মানুষের ইচ্ছার সহিত সমাজের ঘটে পদে পদে বিরোধ। সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজালে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বার বার খর্ব হয়—ব্যক্তিমানস অপমানের দীপ্ত দাহনে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে বহিরঙ্গের দিকেই বেশি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। সেক্সপীয়রের নাটকগুলিতে নানা প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ট্র্যাজিক রস ঘনীভূত ও নিবিড় হইয়াছে—ট্র্যাজিক নায়কের পতনের মূল কারণ যে 'some great error of frailty', তাহাকে তিনি বিশ্বস্ত ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। ম্যাকবেথ, ব্রূটাস্ ইত্যাদির জীবনের ট্র্যাজেডি যেন অন্ধ নিয়তির নিষ্ঠুর খেয়াল—তাহারা যেন সেই অদৃশ্য শক্তির মায়াজালে বন্দী হইয়া অসহায়ভাবে অনিবার্য পতনের পথে অগ্রসর হইতেছে—ব্যক্তিজীবনের এই নিদারুণ অসহায়তা দেখিয়া সহানুভূতিতে আমাদের মন ভরিয়া উঠে—তাহাদের কার্যাবলীকে বিচার করিবার প্রবৃত্তি জাগে না। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যাহাদের নিজেদের এত বড় নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা তাহাদের কাছে মৃত্যু ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া মনে হয়।

প্রাচীন কালের ট্র্যাজেডি

ইব্‌সেন নাট্যসাহিত্যের এই চিরাচরিত ধারায় বিরাট্ পরিবর্তন আনিলেন। তাঁহার নাটকগুলিতে ট্র্যাজেডির যে রূপ প্রতিভাত হইল, সনাতন প্রণালীতে তাহার বিচার চলে না। এখানে দেখা গেল, নায়কের জীবনের পতনের কারণ তাহার 'great error of

frailty' নয়—সমাজ ও সংসারের বিরূপতাই সেই ট্র্যাজেডির আসল কারণ। *'An Enemy of the People'* নাটকের নায়ক ডাঃ ষ্টক্‌ম্যানের মহান্ চরিত্রের একমাত্র ত্রুটি ছিল দেশবাসীদের প্রতি তাঁহার অফুরন্ত ভালবাসা, তাহাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা। ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার জন্য কোন উচ্চাশার বশবর্তী হইয়া তিনি মানুষের ভালো করিতে চাহেন নাই। অথচ ক্ষমতাভোগীদের হীনতম চক্রান্তে তাঁহার সকল সদিচ্ছা, সকল সুপ্রচেষ্টা দেশদ্রোহিতা বলিয়া আখ্যা পাইলে তিনি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ভাবে 'বয়কট' হইলেন। আর তাঁহার বিরুদ্ধে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের নায়ক হইলেন তাঁহারই বড় ভাই—শহরের মেয়র। জন-কল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ 'লোকবন্ধু' ডাঃ ষ্টক্‌ম্যান 'লোকশত্রু' উপাধি পাইয়া মর্মান্তিক বেদনায় স্ত্রী ও কন্যাকে বলিয়াছেন—'It is this, let me tell you, that the strongest man is he who stands most alone.' সংসার ও সমাজের প্রতি কি বিরাট্ অভিযোগই-না আছে এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে! *'Doll's House'*-এর নায়িকা নোরাও দীর্ঘদিন সুখের দাম্পত্যজীবন যাপন করিবার পর একদিন আবিষ্কার করিয়াছে যে, স্বামী তাহাকে ভালবাসে না। যে-স্বামীর জন্য সে সব-কিছু করিতে বা ত্যাগ করিতে পারিত, তাহারই বিশ্বাসঘাতকতায় বিদ্রোহিনী নোরা সুখ-নীড়ের মোহ ত্যাগ করিয়া অনির্দেশ্যের পথে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার মানসিক দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া ইব্‌সেন দেখাইয়াছেন, নোরার জীবনেরই মধ্যে ট্র্যাজেডির কারণ যতখানি বিদ্যমান, তাহার অনেকগুণ বেশি বিদ্যমান বাইরেকার ঘটনাবলীর মধ্যে। প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার চাপে মানুষের জীবনের এই নিগূঢ় ট্র্যাজেডির ধারাকে পরবর্তী কালের নাট্যকারেরা আরও বেশি আগাইয়া দিয়াছেন।

পরবর্তী কালে রূপান্তর

মানুষের জীবনধর্ম ও সমাজব্যবস্থার সংঘাতে মানুষেরই জীবনে যে কত বড় ট্র্যাজেডি ঘনাইয়া আসে, শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রমা ও রমেশের জীবনে ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে? মনে মনে যে প্রেমকে তাহারা শতদলের মত বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার সুমধুর সৌরভ কি জন্য পৃথিবীকে আমোদিত করিতে পারে নাই? তাহাদের ব্যক্তিচরিত্রের কোন দুর্বলতা কি এইজন্য দায়ী? তাহাদের প্রেমে তো কোন অপরাধের স্পর্শ—কোন কৃত্রিমতাই ছিল না। অথচ তাহাদের প্রাণের আকুতি মিলনকে ত্বরান্বিত বা সার্থক করিতে পারে নাই কেন?—সমাজের বাধায়। ট্র্যাজেডির এই রূপান্তরটিই বাংলা সাহিত্যে দিনে দিনে আরও বাড়িয়া চলিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের নজীর

# সাহিত্যের স্বাধীনতা

**সাহিত্যের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য**

সাহিত্যের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক প্রাচীন কাল হইতে চলিতেছে এবং অদ্যাবধি তাহার কোন সমাধান হয় নাই, সর্বসম্মত কোন সমাধান ভবিষ্যৎকালেও যে হইবে এইরূপ মনে হয় না। এই বিতর্কে নানা জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে। বিচিত্র জটিল সূত্রগুলির মধ্যে প্রবেশ না করিয়া আমরা উহার মূল প্রশ্নগুলি তুলিয়া ধরিব। এক শ্রেণীর সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ সাহিত্যকে নীতিধর্ম প্রভৃতির বাহন বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। অপর শ্রেণীর তাত্ত্বিকরা সাহিত্যকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও আনন্দের বাহক রূপেই তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন। বর্তমানকালেও সংঘাত এই মূল সমস্যাকে অতিক্রম করে নাই। তবে সমাজের দাবির স্বরূপ কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রাচীন সমাজ নীতি ও ধর্মকে প্রাধান্য দিয়াছিল। জীবন ও চিন্তার সর্বক্ষেত্রেই ইহাদের প্রতিপত্তি ছিল বিস্তৃত। একালের সমাজে রাষ্ট্রীয় শক্তি সর্বনিয়ন্তা। কাজেই সাহিত্যের জগৎ পর্যন্ত তাহার অধিকার প্রসারিত। আপন প্রয়োজনে সে সাহিত্যকে ব্যবহার করিতে উদ্‌গ্রীব।

**শ্রম-ধর্ম-সাহিত্য**

সাহিত্যের জন্মলগ্নের অস্পষ্ট অতীত সম্বন্ধে খুব নিশ্চিন্তভাবে কিছু বলা সংগত নয়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌ টমসন সাহেব কবিতার উৎপত্তি দেখিয়াছেন আদিম মানুষের যৌথ শ্রম-সংগীতের মধ্যে। আবার এদেশের প্রাচীন সাহিত্য—শুধু এদেশের কেন. অধিকাংশ প্রাচীন সাহিত্যই—ধর্ম ও পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত আকারেই দেখা দিয়াছিল। কিন্তু জন্মসূত্রে মানুষের শ্রম অথবা ধর্ম যাহার সহিতই ইহার সম্পর্ক থাকুক না কেন, আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে দেখা গেল সাহিত্যের সহিত উহাদের কোন নিত্যসম্পর্ক নাই। মানবের জ্ঞান চিন্তা ও অনুভূতির ফসল আজ যত স্পষ্ট হইয়া বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া আপন বিশিষ্ট লক্ষণে সমৃদ্ধ ও একক হইয়া উঠিয়াছে, উহাদের আবির্ভাব-কালে তাহা সেইরূপ ছিল না। সাহিত্যও মানবচিন্তার সেই প্রথম যুগে অন্য ধরণের বোধ ও অনুভূতির অঙ্গীভূত থাকিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক।

**প্রাচীন ও মধ্যযুগ**

প্রাচীন ও মধ্যযুগ ধর্মপ্রাধান্যের ও রাজপ্রাধান্যের যুগ। মানুষের জীবনে ও চিত্তে স্বাধীনতা তখন স্বাভাবিক ছিল না। কাজেই সাহিত্যের স্বাধীনতার ধারণাটিও কোথাওই স্পষ্টাকারে দেখা দেয় নাই। রাজসভা বা ধর্মগোষ্ঠীর আনুকূল্য সেকালে সাহিত্যসৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করিত। মেয়েমহলে ছড়া ও ব্রতকথায় বা মাঠে-নদীতে নানা লোকসংগীতে যে-সাহিত্য সৃষ্টি হইত সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় তাহার ভূমিকা ছিল গুরুত্বহীন। যে প্রতিপালক নৃপতি বা অমাত্যের আনুকূল্যে কাব্য-সাহিত্য রচিত হইত তাঁহার ইচ্ছা ও অভিলাষ পূর্ণ করিবার

প্রতি কবির দৃষ্টি থাকা অস্বাভাবিক নয়। হয়ত-বা রাজসভায় দীর্ঘকাল বাস করার ফলে সাহিত্যিকের রুচি-প্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবেই প্রতিপালকের চিত্তের সামীপ্য লাভ করিত। আবার অন্য দিকে আপনার ধর্মসম্প্রদায়ের বাণী কিংবা সেই দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখা ও ভাষারূপ দিবার কাজও প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্যিকের নিজের মনেই শিল্পীর স্বাধীনতা সম্পর্কিত কোন স্পষ্ট চেতনা না থাকায় উল্লিখিত অবস্থায় তাঁহারা কখনোই অসন্তোষের সঙ্গে কাব্যাদি রচনা করিতেন না। আপনার অবস্থাকেই তাঁহারা স্বাভাবিকভাবে মানিয়া লইতেন এবং প্রথানুগত্য তাঁহাদের মধ্যে প্রচুরভাবে বিদ্যমান ছিল। ক্বচিৎ কদাচিৎ এই ধর্মনুগত্য ও রাজানুগত্যের বিরুদ্ধে তাঁহাদের কবিচেতনায় যে বিক্ষোভের সঞ্চার হইত না এমন কথাও অবশ্য জোর করিয়া বলা যায় না।

একদিক দিয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ-মানুষের নিকটতর ছিল। সে-যুগে সাহিত্যের উপভোগের রাজ্যে শ্রেণীভেদ খুব কঠোর ছিল না। মুকুন্দরাম বা বৈষ্ণব কবিতার আয়োজন উচ্চ ও নিম্ন—সর্বস্তরেরই তৃপ্তিসাধন করিত। সমাজজীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তব চিত্র সেকালের অনেক সাহিত্যেই প্রতিফলিত হইত। মানুষের বাস্তব জীবনের প্রয়োজন-কামনাকেও কাব্যরূপ দিবার চেষ্টার প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। যদিও এই কথা সর্বদা মনে রাখার মত যে, মানুষের সমাজজীবন ও প্রয়োজন-কামনার নিপুণ ভাষারূপই সাহিত্যকর্ম হিসাবে স্বীকার্য নয়। যদি ইহার মধ্যে ঐসব উপকরণের অতিরিক্ত কিছু থাকে তো সেখানেই সাহিত্য-মূল্যের অনুসন্ধান কর্তব্য।

সমাজ-নৈকট্য

মধ্যযুগের অবসানে মানবজীবনে নীতি-স্মৃতি-ধর্ম ও প্রথার বন্ধনমুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিল। জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার চেতনা জন্ম লইল। সঙ্গে সঙ্গে আসিল ব্যক্তি-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা এবং চিত্তমুক্তির বাণী। মানুষ যে দেবতার দয়ার দান নহে, বংশের গৌরবের ফল নহে, মানুষ হিসাবেই তাহার মূল্য অনন্ত, সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষিত হইল—সাহিত্য ধর্ম-নীতি-নৃপতি প্রভৃতি কাহারও আজ্ঞাবাহী নহে। তাহার নিজের রাজ্য আছে। সে-রাজ্যের নৃপতি সাহিত্য নিজে। সে-রাজ্যের ধর্ম ও নীতি তাহার নিজের নিয়ম মানিয়া চলে, অপরের নহে। ইহায় ফলে সাহিত্য সমাজবহির্ভূত আকাশচারী একটা পদার্থে পরিণত হইল, এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই। মানবসমাজ মানুষেরই সমাজ। মানুষের জীবন এবং মন, প্রয়োজন এবং আনন্দ সব-কিছুর উপকরণই সেখানে সমভাবে সঞ্চিত। মানুষের সমাজ বলিয়াই সেখানে জীববৃত্তির ঊর্ধ্বস্তরস্থ জ্ঞানবৃত্তি ও আনন্দবৃত্তি স্বীকৃত। মানুষ কেবল খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকে না। খাওয়া-পরার

সাহিত্যের স্বাধীনতা

সুপ্রচুর উন্নতিতেও তাহার পরিচয় শেষ হয় না। বাস্তব জীবনের প্রয়োজন যেমন নানা আবিষ্কার ও কর্মের মধ্য দিয়া সে সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুরূপে মিটাইতে পারে, সেইরূপ মনের যে-তৃষ্ণা জ্ঞানের জন্য, তাহার তৃপ্তিবিধানার্থে সমাজের সাধনার অন্ত নাই। বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনা বর্তমানকালে নানা দিক দিয়া মানুষের প্রয়োজনের সাম্রাজ্যকে বাড়াইতেছে এবং মিটাইতেছে, কিন্তু ইহার অন্তরালে জ্ঞানচর্চার একটা বিশুদ্ধ দিক আছে, যাহাকে সদাসর্বদা সাংসারিক-সামাজিক প্রয়োজনে লাগানো যায় না। আবার মানুষের আনন্দ ও সৌন্দর্যতৃষ্ণা এমন বস্তু যাহা প্রয়োজনের অতীত রাজ্যে বাস করে। জ্ঞানকাণ্ডের একপ্রান্তে যেমন প্রয়োজনের বন্ধন আছে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহাও নাই। সাহিত্যের দুই প্রান্তই মুক্ত। অথচ এই তৃষ্ণার অভাব থাকিলে মানববৃত্তি ক্ষুণ্ণ হয়—তাহার বিকাশ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। পৃথিবীর মত মানবসমাজেরও মধ্যে যেমন মাটি আছে তেমনি আকাশেরও প্রবেশ নিষেধ নয়। কাজেই সাহিত্য বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও অপ্রয়োজনের আনন্দ-সৃষ্টির ব্রত গ্রহণ করিয়া সমস্ত কর্ম হইতে যদি অবসর চাহিয়া বলে—

'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'

তাহা হইলে উহাকে সমাজবিরোধী এবং জীবনবিরোধী বলিয়া নিন্দা করা সংগত হবে কি ?

বর্তমান পৃথিবীতে রেঁনেসাঁ-পরবর্তী সাহিত্যের স্বাধীনতার এই বাণী দুইটি বিপরীত দিক হইতে আঘাতের সম্মুখীন হইয়াছে। অবশ্য কোন কালেই এই দাবি সমাজ এবং রাষ্ট্রশক্তি একান্ত নিশ্চিন্তচিত্তে গ্রহণ করে নাই। যেমন গণতন্ত্রের আদর্শকে বাস্তব ব্যবহারের দ্বারা শক্তিমান রাষ্ট্রশক্তি বারংবার খণ্ডিত করিয়াছে, তেমনি সাহিত্যের উপরেও সর্বকালে বিভিন্ন দিক হইতে চাপ পড়িয়াছে। তবে এখন তাহা প্রায় সংকটের আকার ধারণ করিয়াছে। ১৯১৭ সালে সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের জন্ম এবং সেখানে গর্কি প্রভৃতির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ নামক মতামতের সৃষ্টি এক দিক হইতে এমন একটি নূতন জীবনদৃষ্টি এবং সাহিত্যনীতি দাঁড় করাইয়াছে যাহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা তথা সাহিত্যের স্বাধীনতার আদর্শ ধূল্যবলুণ্ঠিতপ্রায় ; অন্য দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ধনবাদী রাষ্ট্রগুলি কোন প্রগতিশীল স্বাধীন চিন্তা ও অনুভূতি সম্পর্কে এমন মনোভাব দেখাইতেছে যাহাতে তাহাদের "স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র" সম্পর্কিত বাক্যগুলি বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

বর্তমানে সাহিত্যের স্বাধীনতায় সমাজের বাধা

সোভিয়েৎ সমাজতন্ত্র এবং মার্কসীয় দর্শনভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সাহিত্যিক-দের সম্মুখে এক নূতন কর্তব্যসূচী উপস্থিত করিয়াছে। লেখকের ব্যক্তিগত সৌন্দর্য ও জীবন-উপলব্ধির প্রকাশকে তাঁহারা আত্মকেন্দ্রিকতা আখ্যা দিতেছেন। ব্যক্তিমনের

উপরে সমাজমনের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সোভিয়েৎ রাষ্ট্রনেতৃত্বের ব্যাখ্যানুযায়ী জীবন ও জগৎকে অনুধাবন করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর হাতে অস্ত্র তুলিয়া দেওয়াই সাহিত্যিকদের সামাজিক দায়িত্ব বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। অবশ্য কোন সাহিত্যিক যদি ব্যক্তিগতভাবে এই কর্মে ব্রতী হন, শঙ্কিত হইবার কারণ ঘটে না। যদি তাঁহার রচনা ঐ সাময়িক রাজনৈতিক-সামাজিক উদ্দেশ্যকে ছাপাইয়া সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও আনন্দ সৃষ্টি করে তবে তাহাকে মর্যাদা দিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই মন্ত্র সোভিয়েৎ দেশের সাহিত্যিক মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কবি-সাহিত্যিক এবং পৃথিবীর এক বৃহৎসংখ্যক বামপন্থী লেখক এই মন্ত্রকে সত্য বলিয়া শিরোধার্য করিয়াছেন। ইহা বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই, কিন্তু মনের মধ্যে এক বিশেষ আদর্শবাদের আকারে সংক্রামিত হইয়াছে। সাহিত্যের স্বাধীনতার শত্রু সাহিত্যিকদেরই অন্তরে লালিতপালিত হইতেছে।

—একনায়কতন্ত্রের বাধা

অপর দিকে মার্কিন দেশ ও অনুগামী বহু রাষ্ট্রে লেখকের চিন্তার স্বাধীনতা, অনুভূতির স্বাধীনতা বিঘ্নিত হইতেছে সম্পূর্ণ অন্য উপায়ে—বাহির হইতে চাপ সৃষ্টি করিয়া। যে পর্যন্ত সাহিত্যিক অশ্লীল আবেদন, বীভৎস মনোবিকার, গোয়েন্দাচক্রের অসুস্থতা ও চটুল মোহ-বিস্তারের চেষ্টা করেন, তাঁহার স্বাধীনতা কেবল নিরাপদই থাকে না, প্রকাশনা-সংস্থা সিনেমা-প্রযোজক টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি পুরস্কৃতও হন। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে, যদি কিছু প্রগতিচিন্তাকে তাঁহারা আপন স্বার্থের বিরোধী মনে করেন, তাহা হইলে সাহিত্যিক প্রকাশক খুঁজিয়া হায়রান হন, সাময়িকপত্রগুলি সচেতনভাবেই ঔদাসীন্য প্রকাশ করে, পুস্তকবিক্রেতাদের বৃহৎ সংস্থা তাঁহার গ্রন্থাদি যাহাতে অবিক্রীত থাকে তাহারই সুব্যবস্থা করে। অবশ্য ফ্যাসিজ্‌ম্‌-এর উন্মুক্ত বর্বর আক্রমণে সাহিত্যিকদের গ্রন্থাদি ভস্মীভূত হইয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনাও বিদ্যমান। বর্তমানকালের সেন্সর-ব্যবস্থা, পুলিশী তৎপরতা প্রভৃতিও সাহিত্যের পরিপন্থী।

—ধনতন্ত্রের বাধা

সাহিত্যের স্বাধীনতা যখন প্রচণ্ড সংকটের সম্মুখীন তখনও যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক তাঁহাদের আদর্শে অবিচলিত আছেন তাঁহারাই মানবজাতির ভরসাস্থল। সাময়িক কালের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ব তাঁহারা ব্যক্তি হিসাবে পালন করুন। দেশের দুর্দিনে, বিশ্বের বিপদে, মানবতার আহ্বানে তাঁহারা দৃঢ় ওজস্বী ভাষায় প্রচারপত্রজাতীয় রচনা লিখিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ করুন, কিন্তু ঐ সমস্তকে যেন সাহিত্য বলিয়া না চালান। সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিত তাঁহাদের রচনায় আসুক ক্ষতি নাই, কিন্তু সমসাময়িকের আধারে তাঁহারা চিরন্তন সৌন্দর্যরস পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত থাকুন! কারণ, সমাজবদ্ধ মানুষের প্রাণ কেবল প্রয়োজনের বদ্ধ ঘরে বাঁচে না, আকাশের মুক্তিও চায়।…

উপসংহার

# নজরুল প্রতিভা

'প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মান-সম্রাট্ কাইজার যে আগুন জ্বালিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র য়ুরোপ জ্বলিয়া ছাই হইয়াছিল, আর সে অগ্নিকুণ্ড হইতে এক মহত্তর ও বিস্ময়কর স্বপ্ন বক্ষে লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বিংশ শতকের ইতিহাসের প্রথম বিস্ময় রুশ-বিপ্লব। যে-আগুন দাবানলরূপে বন দগ্ধ করে, সেই আগুনই কাষ্ঠবাহী হইয়া গৃহে অবস্থান করে, শীত নাশ করে, অন্ন-ব্যঞ্জন তৈরি করে। ধ্বংস ও সৃষ্টি একই অগ্নির ভিন্নমুখী ক্রিয়া। এই সত্যটি রুশ-বিপ্লবের মধ্যে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া বিশ্বের যৌবনচেতনাকে, ভাবকল্পনাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। পৃথিবীর যুবশক্তি যেন নিজের শক্তির উগ্র মদ্যপান করিয়া সেদিন হুংকার দিয়া বলিয়াছিল—"ইন্‌কিলাব - জিন্দাবাদ, বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক।"

রুশবিপ্লবের অগ্নিশিখায় বিশ্বের নূতন পরিচয়

যুদ্ধ-ফেরত বিংশতিবর্ষীয় তরুণ কাজী নজরুল এই যৌবনের জ্বলন্ত মশাল হাতে লইয়া বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাংলার সাহিত্যগগন তখনও অতিক্রান্ত-মধ্যাহ্ন রবির উজ্জ্বল দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হইয়াছিল, তাই তারার ক্ষীণ প্রভা লইয়া রবিচক্রের অন্তরালে ক্ষুদ্র কবিগোষ্ঠী তখন প্রায় দৃষ্টির অগোচরে পড়িয়াছিলেন। সেই সময় মশাল লইয়া নজরুল বাংলা-কাব্যমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন—হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম। ইহাতে আলোক বিস্তৃত না হইলেও ঘনীভূত হইল, উত্তাপ তীব্রতর হইল, দহন-দাহনের উগ্রতায় বাংলা সাহিত্যসমাজ যেন সচকিত হইয়া উঠিল। যৌবনের উদ্ধত স্পর্ধা আকাশচুম্বী হইয়া ঘোষণা করিল—

যৌবনের জলন্ত মশাল হাতে নজরুলের বাংলা কাব্যে প্রবেশ

"বল বীর—
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির! —বিদ্রোহী।

'চির উন্নত মম শির'—কথাটি নজরুলের মুখ দিয়া বাহির হইলেও নজরুলের একার কথা নয়। ইহা চিরন্তন যৌবনের কথা, বিশেষ স্থানকালের প্রভাবে নূতন তীব্রতা লইয়া প্রকাশ হইয়াছিল এই মাত্র। 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করিয়া নজরুল যে 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যা পাইলেন, তাহার মধ্যেই যুগপ্রভাবটি চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলার, বিশেষতঃ বাংলার যুবশক্তির, সর্বপ্রধান পরিচয় ছিল বিদ্রোহী। আপাতদৃষ্টিতে ইহা ইংরাজ-বিদ্রোহ বা রাজবিদ্রোহ হইলেও মূলতঃ ইহার নাড়ীর যোগ ছিল বিশ্বমুক্তির, সর্ববন্ধনমুক্তির প্রয়াসের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে। এই কারণে, অন্যান্য কবির মত নজরুলের কবিপ্রতিভার যথার্থ বিচার

বিদ্রোহের সুরই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলার মর্মবাণী

করিতে গেলে. নজরুলের কবিমানস, তাঁহার চিত্তশক্তি ও কল্পনাশক্তির বিশেষ বিকাশ-ধারাটি অনুসন্ধানযোগ্য।

নজরুলের কবিমানস

নজরুলের পিতা ছিলেন ধর্মপ্রাণ দরিদ্র লোক। পিতৃবিয়োগের পর কিশোর কবি ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েন এবং অভিভাবক না থাকায় চরম উচ্ছৃঙ্খলার মধ্যে বাল্য-কৈশোর অতিবাহিত হয়। এই সময়ে লেটো গানের দলে গীতরচনা ও সুর সংযোজনা করার চেষ্টার মধ্যে নজরুলের কবিপ্রতিভার প্রথম বিকাশ দেখা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিক জীবনে থাকিয়াও তিনি সাহিত্য চর্চা, মুখ্যতঃ গদ্য রচনা করিয়াছেন। হিন্দু-পুরাণ ইস্‌লামী-পুরাণ, কোরান-হাদিস গীতা-মহাভারত প্রচুর পড়িয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে আরবী ফার্সী ও সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের চাবিটিও পাইয়াছিলেন। কাজেই যে কোন প্রাণময় আবেগকে ক্ষিপ্রভাবে উপযুক্ত শব্দের বন্ধনে শ্রুতিসুখকর করিয়া সৃষ্টি করিবার একটা বিস্ময়কর ক্ষমতা নজরুলের বাল্যজীবনের কাব্যচর্চার মধ্যে খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ইহার প্রভাব অর্থাৎ দোষ এবং গুণ হইতে নজরুল সারা জীবনেও অব্যাহতি পান নাই।

নজরুল-কাব্য "মাটির গন্ধে মধুর"

এইজন্য নজরুল গভীর ভাববিশিষ্ট কবি হইতে পারেন নাই, হালকা ভাবের সাধারণ কবি হইয়াছেন। উত্তুঙ্গ কোন বিশ্বাতিগ কাব্যমহিমা, অলৌকিক চমৎকারিত্ব নজরুল-কাব্যে যে একান্ত বিরল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিপিন পাল মহাশয়ের ভাষায় নজরুলের কাব্য "মাটির গন্ধে" ভরপুর। নজরুল মাটির কবি—মাটির সঙ্গে যে-মানুষের প্রাণের যোগ যত বেশি, নজরুলের কাব্যে তাহার আঘ্রাণ ও পরিচয় তত সুস্পষ্ট। হাওয়ার মত ভাবের বিপুল ঔদার্য, আলোর মত বুদ্ধির উজ্জ্বল ঐশ্বর্য নজরুলের কাব্যে হয়ত কেহ কেহ অধিক পরিমাণে না পাইতে পারেন, কিন্তু মৃত্তিকার অফুরন্ত প্রাণসম্পদে নজরুলের কবিতা ও গান প্রকৃতই নিজ গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

যৌবনের কবি নজরুল

এই প্রাণপ্রাচুর্যই তো যৌবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য—তাই নজরুল যৌবনের কবি। ঐতিহাসিক কারণেই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা যৌবন-বিদ্রোহধর্মী, সর্ব শোষণ-শাসন-শৃংখল সবলে ভাঙ্গিবার দুশ্চর সাধনায় ধৃতব্রত। নজরুলের মধ্যে ধূমকেতুর মত এই ভাঙ্গিবার শক্তি এত আকস্মিকভাবে প্রকট হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্মিত স্নেহে তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন যে, যৌবনের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

বাংলার বিদ্রোহাত্মক কাব্যরচনায় নজরুলের স্থান সর্বাগ্রে। স্বদেশী সাহিত্য রচনার মধ্যে যুগে যুগে আদর্শের পার্থক্যে ভাব ও রূপ বিচিত্র হইয়াছে, বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ হইতে এই স্বাদেশিকতা ও স্বদেশপ্রেম বাংলার ভাবজগতে প্রত্যক্ষতঃ

বিদ্রোহধর্মী বলিয়া নজরুল এই কাব্যে ও কালে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙ্গার গান', 'সর্বহারা', ফণিমনসা' প্রভৃতি কাব্যগুলির মধ্যে নজরুলের যে প্রকাশ, তাহা মুখ্যতঃ বিপ্লবধর্মী, বিদ্রোহাত্মক। ইহার মধ্যে সকল কবিতাই যে রসোত্তীর্ণ বা প্রথম শ্রেণীর কবিতা তাহা নয়, পরন্তু তেমন কবিতার সংখ্যা নজরুলের এই জাতীয় রচনায় খুবই নগণ্য, তবু অকপটতা, সারল্য ও প্রাণ-প্রাচুর্যে ইহা অনবদ্য,আস্বাদ্য ও অগ্নিস্রাবী হইয়া সেদিন রক্তে উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল।

**নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতার গৌরব**

"কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙ্গে ফেল কর্‌রে লোপাট,
রক্তজমাট শিকলপূজার পাষাণবেদী। —ভাঙ্গার গান।

কিংবা— "শিকলপরা ছল মোদের এই শিকলপরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।" —শিকলপরা ছল।

কিংবা— "মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি!
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার মনে বাঁচি॥" —সব্যসাচী।

—এই জাতীয় কবিতা ও গান সেদিন তরুণ বাংলাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, সভয়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁহার কাব্যগুলিকে বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন।

প্রারম্ভে আমরা রুশবিপ্লবের আগুনের কথা বলিয়াছি। কিন্তু নজরুলের সাম্যবাদ ও রাশিয়ার কম্যুনিজম একেবারেই এক বস্তু নয়। নজরুল ভারতীয় সংস্কৃতির মন লইয়া, সমস্ত প্রাণ দিয়া অসাম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, রাশিয়ার কম্যুনিষ্টদের মত ঈশ্বরের অস্বীকৃতি-দ্বারা তিনি বিশ্ববিধানকে জড়বাদের সাথে বিচার করেন নাই। সাম্য ও সমানাধিকারই জগতের নীতি—নজরুলের মতে, ইহাই ঈশ্বরের শাশ্বত বিধান।

**রাশিয়ার সাম্যবাদ ও নজরুলের সাম্যবাদের আদর্শের পার্থক্য**

"রবি শশী তারা প্রভাত সন্ধ্যা তোমার আদেশ কহে—
এই দিবা রাতি আকাশ বাতাস নহে একা কারো নহে।
এই ধরণীর যাহা সম্বল,—
বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল,
সুস্নিগ্ধ মাটি, সুধাসম জল, পাখীর কণ্ঠে গান,
সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর 'ফারমান'।" —ফরিয়াদ।

সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে, 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে নজরুলের কবি-ধর্মের পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। 'বিদ্রোহী' কবিতার মুখ্য বাণী—প্রচলিত অত্যাচারের অবসানকল্পে ঐ বিদ্রোহ—ঘোষিত হইলেও তাহার মধ্যে যৌবনের অপর দিক তথা সৃষ্টি ও প্রেমের দিকের ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট রহিয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

**'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল-প্রতিভার বীজ**

"মম এক হাতে বাকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তুর্য !" —বিদ্রোহী।

অর্থাৎ কেবল ধ্বংসেরই নয়—সৃষ্টির স্বপ্নও কবি দেখেন। ধ্বংসের মধ্যে থাকে বিদ্বেষ ও ঘৃণা আর সৃষ্টির মধ্যে থাকে প্রীতি ও প্রেম। এই কারণেই নজরুলের প্রতিভা প্রেমকাব্যে সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

নজরুলের প্রেমের কবিতার মূল সুর ও বৈশিষ্ট্য

নজরুলের প্রেমের কবিতা আবেগপ্রবণ ও লিরিকধর্মী। কাব্যহিসাবে বিদ্রোহাত্মক কবিতা হইতে উহার স্থান ঊর্ধ্বে। গানের মধ্যেই নজরুলের প্রেমকাব্যের স্ফুরণ সুন্দরতর হইয়াছে। 'দোলনচাপা', 'ছায়ানট', 'সিন্ধুহিল্লোল', 'চক্রবাক' প্রমুখ কবিতাগ্রন্থ, এবং 'বুলবুল', 'চোখের চাতক' প্রমুখ সংগীতগ্রন্থের মধ্যে প্রেমকাব্যের চমৎকার প্রকাশ দেখা যায়। নজরুলের প্রেমের আদর্শের মধ্যে সহজিয়া ধর্মের বিশেষ প্রভাব আছে। প্রেম ও প্রেমের পাত্রকে এক মনে হইলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

প্রেম সত্য, প্রেমপাত্র বহু—অগণন,
তাই—চাই, বুকে পাই ; তবু কেন কেঁদে ওঠে মন।
মদ সত্য, পাত্র সত্য নয়
যে পাত্রে ঢালিয়া খাও সেই নেশা হয়।" —অনামিকা।

কিন্তু প্রেমিকাও কবির চক্ষে ছোট নয়। জীবনে প্রেমিকা আসেন বিজয়িনী-রূপে, এবং কবি বিদ্রোহের তরবারি চরণে রাখিয়া তাঁহাকে বরণ করেন :

"হে মোর রাণি, তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয়কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।
আমার সমরজয়ী অমর তরবারি
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হ'য়ে উঠে ভারী,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে ॥" —বিজয়িনী।

বাংলা গজলে নজরুলের শ্রেষ্ঠত্ব
শিশুসাহিত্যে নজরুল শ্রেষ্ঠত্ব :
শ্লেষাত্মক কাব্যে নজরুল

বাংলা গজল গান একদিক দিয়া বিচার করিলে নজরুলেরই সৃষ্টি এবং মহাকাব্যে মধুসূদনের মত বা টপ্পাগানে নিধুবাবুর মত স্রষ্টার হাতেই উহার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। বস্তুত নজরুল গীতিকার ও সুরকার হিসাবে কেবল অজস্রতা ও বৈচিত্র্যের জন্যই নয়—উত্তম কাব্যকলার জন্যও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। নজরুল সংগীতরচনা ও সুর সংযোজনা সহজাত প্রতিভা লইয়া জন্মলাভ করিয়াছিলেন। শিশুসাহিত্যেও নজরুল চমৎকার শক্তি দেখাইয়াছিলেন। 'ঝিঙে ফুল' কাব্যগ্রন্থে উহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এইরূপ :

"ভোর হোলো দোর খোলো খুকুমণি ওঠ রে।
ঐ ডাকে যুঁই শাখে ফুল-খুকী ছোট রে। —প্রভাতী।

কিংবা— "কাঠবেরালি! কাঠবেরালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবিলেবু? লাউ?
বেরালবাচ্ছা? কুকুর-ছানা? তাও?" —খুকী ও কাঠবেরালী।

এই সমস্ত কবিতা বাংলার শিশুসাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ হইয়া আছে। ইহার সরসতা সরলতা ও কৌতুক অতুলনীয়।...শ্লেষাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা-রচনাতেও নজরুল সিদ্ধহস্ত। ইহার অধিকাংশই গান, হুল-ফোটার জ্বালাও বড়ো তীব্র!

"বদ্না-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্টের আসনাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই॥" —প্যাক্ট্।

"উল্টে গেল বিধির বিধি আচার বিচার ধর্ম জাতি,
মেয়েরা সব লড়ুই করে, মদ্দ করেন চড়ুই ভাতি॥" —দে গরুর গা ধুইয়ে।

নজরুলের 'চন্দ্রবিন্দু' বইখানায় এই ধরণের বহু কবিতা সংকলিত হইয়াছে।

নজরুলের শব্দসম্পদ ও পুরাণ-জ্ঞান

নজরুল-প্রতিভা বিকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায় হইয়াছে কবির অফুরন্ত শব্দ-সম্পদের ভাণ্ডার। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ফার্সী, আরবী, ইংরাজি প্রমুখ ভাষাগোষ্ঠী হইতে তিনি যথেচ্ছ শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হিন্দু পুরাণ ও মুসলমান-পুরাণ একত্র সমমর্যাদায় তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। শব্দ ও ভাবের এই অপরূপ মিশ্রণ নজরুল-কাব্যকে একটি চমৎকার বিশিষ্টতা দান করিয়াছে: যেমন,—

"দাউ দাউ জ্বলে আজি স্ফূর্তির জাহান্নাম,
শয়তানে আজ ভেস্তে বিলায় শরাব জাম,
দুশ্‌মন দোস্ত্ একজামাত্,
আজি আরফাত্—ময়দান পাতা গায়ে গায়ে,
কোলাকুলি করে বাদশা ফকিরে ভায়ে ভায়ে,
কা'বা ধরে নাচে লাত্ মানাত্॥" —ঈদ মোবারক।

অথবা— "আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুংকার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড॥" —বিদ্রোহী।

মানুষের কবি নজরুল

এই কথায় নজরুলের পরিচয় দিতে গেলে, তাঁহাকে বিদ্রোহী কবি বা প্রেমিক কবি না বলিয়া বলা উচিত মানুষের কবি। সুদৃঢ় ঈশ্বরবিশ্বাসের স্বাস্থ্যবান বায়ুমণ্ডলের মধ্যে, মাটির বুকে দাঁড়াইয়া, মানুষের গলা ধরিয়া কবি তাঁহার কাব্যতীর্থে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এই মানুষ হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, তাহার একমাত্র পরিচয় সে মানুষ।

"হিন্দু, না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার॥" —কাণ্ডারী হুঁসিয়ার।

অথবা— "গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্!

নাই দেশ-কাল, পাত্রের ভেদ-অভেদ ধর্ম জাতি ।
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি ।" —সাম্যবাদী ।

সহজ-সরল, খোলা-চোখে মানুষের হৃদয় লইয়া মানুষের পক্ষে চড়া গলায় কথা কহিয়াছেন কাজী নজরুল ইসলাম—ইহাই তাঁহার কাব্যের চরম গৌরব। ভাষা, ধর্ম, আচার, আচরণ কোন-কিছুর বৈষম্যই কবির আন্তর-সাম্যকে বিভক্ত বা দ্বিধাযুক্ত করিতে পারে নাই। নজরুল যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন, অকপটে গভীর আবেগের উজ্জ্বলতায় তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। এই উচ্ছলতা ফেনার মত ক্ষণিকের, বর্তমানের আলোকে অতি উজ্জ্বল হইলেও কোন স্থায়ী ভাবগাম্ভীর্যের রসোত্তীর্ণ কালজয়ী কাব্যকৌস্তুভের শাশ্বত জ্যোতি ইহার মধ্যে নাই। সমলোচকের প্রত্যাশার ব্যর্থতায় কবি নজরুল নিজেই যাহা বলিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। আত্মবিকাশের তথা আত্মসমালোচনার এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত বিরল না হইলেও অতিসুলভ নহে।

নজরুল-প্রতিভার শেষ পরিচিতি

"বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষজ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে
রক্ত ঝরাতে পারিনা তো একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসেনাক মাথায়, বন্ধু. বড় দুঃখে !
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে !" —আমার কৈফিয়ৎ

নজরুল এই 'রক্ত লেখা'র কবি······

## শিক্ষাবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ

বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা যিনি পান নি, বিদ্যালয়কে যিনি বাল্যকালে ভীতিবিহ্বল নয়নে দেখেছেন, শুধু কবিতাতে নয়—সুচিন্তিত প্রবন্ধেও যিনি ইস্কুল-পালানোকে আভাসে-ইঙ্গিতে সমর্থন জানিয়েছেন, তাঁকেই—সেই রবীন্দ্রনাথকেই—শিক্ষাবিজ্ঞানী রূপে মেনে নিতে মনটা স্বভাবতঃই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বিদ্রোহ জানাবার আর অবকাশ থাকে না। শিক্ষার বিরুদ্ধে আমাদের একটা সহজাত বিদ্বেষ আছে বলেই আমরা ইস্কুলে যেতে ভয় পাই অথবা গেলেও ইস্কুল থেকে পালিয়ে সিনেমা দেখবার সুযোগ খুঁজি। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই আলাদা। দেবী বীণাপাণির তিনি ছিলেন অকৃত্রিম পূজারী—তাই বিদ্যাশিক্ষার প্রবল আগ্রহের জন্যেই তিনি ইস্কুল ছেড়েছিলেন। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি যে জ্ঞানার্জনের পক্ষে আদৌ সহায়ক নয়, এটা তিনি ছেলেবেলাতেই অন্তরের অন্তরতম

ভূমিকা

কোণে অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি উত্তরকালে সাহিত্য-সাধনাকে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করেও পাঠশালায় গুরুমহাশয়গিরি করেছিলেন, নিজের যথাসর্বস্ব পণ করেও শান্তিনিকেতন 'শিক্ষাসত্র' গড়বার প্রয়াস পেয়েছিলেন, কাব্যানুভূতিকে চেপে রেখেও নিজের চিন্তাধারাকে শিক্ষাবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল মহাকবিই নন, মহাশিক্ষকও।

অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষাবিদেরা 'শিক্ষা' বলতে অর্থকরী বিদ্যাই বোঝেন। অর্থকরী বিদ্যার্জন যে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন নি সত্য, কিন্তু ঐ অর্থকরী বিদ্যার্জন-প্রচেষ্টাকে শিক্ষার সূচনা হিসেবে নয়—উপসংহার হিসেবেই তিনি কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে, কারবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা 'সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধনে'র পন্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য 'মানুষ হওয়া' আর গৌণ উদ্দেশ্য বিষয়ী হওয়া, ব্যবসায়ী হওয়া, চাকুরে হওয়া। 'চলন্ত পুঁথি হওয়া, অধ্যাপকের সজীব নোটবুক' হওয়া নয়—'শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়াই শিক্ষার লক্ষ্য।' শিক্ষার মধ্যে জ্ঞানের আলো ফুটিয়ে তোলাই সবচেয়ে বড় কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'শিক্ষা সম্বন্ধে একটিমাত্র কথা আমার বলবার আছে। যা আর কেউ শেখায়, তা শেখা যায় না। যা নিজে শিখি তাই আসল শিক্ষা।' নিজের চেষ্টায় মানুষ হওয়া, এই যে আত্মনির্ভরতার অনুশীলন, ইহাই তো শিক্ষা। চেষ্টার প্রবৃত্তি জাগানো, শিক্ষার্থীর চিত্তকে জাগানো, শেখা জিনিসকে প্রকাশ করে' জ্ঞানকে পাকা করবার সুযোগ দেওয়া, শিক্ষার্থীকে নিজে চিন্তা করতে ও কাজ করতে উৎসাহিত করা—এই সবই তো শিক্ষার উদ্দেশ্য। কারণ, 'বাস্তবিকতা-বর্জিত হইলে মনই বল, হৃদয়ই বল, কল্পনাই বল, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া যায়।' রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বলতে যৌলিক শিক্ষাকেই বুঝতেন। তাঁর মতে, চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির সহিত মানসিক শক্তিসমূহ তথা আত্মা এবং দেহের কাঠামোটির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ যাকে অবলম্বন করে' ঘটে, তারই নাম শিক্ষা। যে শিক্ষা বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের ভিতরে একটা আন্তরিক যোগসূত্র রচনা করে, প্রতিদিন নব নব প্রসঙ্গের অবতারণার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর মনে চিন্তা কল্পনা অনুভূতি ও বিচারশক্তি সঞ্চার করে, তাই প্রকৃত শিক্ষা। সমগ্র মননশীলতার চালক তো এই শিক্ষাই।

রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষা কর্মপ্রতিষ্ঠ না হলে সর্বাঙ্গীণ পরিণতি কখনও ফুটে ওঠে না। 'মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার শক্তির মধ্যে একটি অখণ্ড' যোগ আছে এবং 'পরস্পরের সহযোগিতায় তারা বল লাভ করে'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তা'হলে মনের শিক্ষারও প্রবাহ বেগ

পায় না।...দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা—বলছিনে। দেহের দ্বারা আমরা যে সব কাজ করতে পারি, সেই সব কাজের চর্চা—সেই চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়।...আমার মত এই যে আমাদের আশ্রমের প্রত্যেক ছাত্রকে বিশেষ ভাবে কোন-না-কোন হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল কথা এই রকম দৈহিক কৃতিত্ব-চর্চায় মনও সজীব, সতেজ হয়ে উঠে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ করে নেয়।... উভয়ের মধ্যে ভালো রকম মিল করতে না পারলে আমাদের জীবনের ছন্দ ভাঙ্গা হয়ে যায়।' গান্ধীজীও বলেছেন,—'The principal means of stimulating the intellect should be the manual training' রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে সংগীতের স্থান খুবই উচ্চে। Walter Pater প্রকৃতই বলেছেন,—'Art struggles after the law of music.' জীবনে পূর্ণপ্রজ্ঞ শিক্ষা পেতে হলে সংগীত একান্ত প্রয়োজনীয়, এটা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের এটাই পরম বৈশিষ্ট্য যে, তিনি সংযম সামগ্রীটিকে যেমন স্বাধীনতার মধ্যে, তেমনি আনন্দের মধ্যে, তেমনি জীবনের প্রতিটি কর্মভাবনারই মধ্যে দেখেছেন। কোন বিষয়ে মাত্রাজ্ঞান হারালেই হয় জীবনের ছন্দপতন। সৌষম্য বা সুষমাকেই রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য তথা অখণ্ড জীবনবেদ বলে মেনে নিয়েছিলেন। এই স্বাধীনতা এবং সংযমই শান্তিনিকেতনের শিক্ষাবিধির ভিতরে ছিল বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার আদর্শ

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ হয়; কিন্তু উহার অনেক পূর্বে ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের এক প্রান্তে গ্রামের দরিদ্র জনগণের শিক্ষাদানার্থে একটি 'শিক্ষাসত্র' স্থাপন করেন। ধরতে গেলে গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম হাতে-নাতে পরীক্ষার সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথের দ্বারা। প্রসঙ্গতঃ এটাও স্মরণীয় যে, ১৯২৫ সালের মে মাসে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাসত্র' দেখেছিলেন ও সেখানকার কর্মকেন্দ্রিক ভাবধারা লক্ষ্য করেছিলেন। অবশ্য একথা না বললে ভুল হবে যে, ১৯২২ সালে এলমহার্স্ট বিশ্বভারতীতে যোগদান করায় গুরুদেবের বহুকাল-ঈপ্সিত জনসাধারণের উপযোগী শিক্ষাদর্শকে প্রকাশ করার সুযোগ মিলেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছিলেন যে, এলমহার্স্ট "belives, as I do, in an education which takes count of the organic wholeness of human individuality that needs for its health a general stimulation to all faculties, bodily and mental."

রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাসত্র' ও গান্ধীজীর 'বুনিয়াদী শিক্ষা'

রবীন্দ্রনাথের মতো idealist ও practical লোকের অনুপ্রেরণায় এবং এলমহার্স্টের মতো practical idealist ব্যক্তির সাহচর্যে শান্তিনিকেতনের 'শিক্ষাসত্রে'র খসড়া তৈয়ের হয়েছিল। "Siksa-Satra, a Home for orphans" নামক প্রবন্ধে এলমহার্স্ট লিখেছেন,—"The aim of the Siksa-Satra is···to provide the utmost liberty within surroundings that are filled with creative possibilities, with opportunities for the joy of play that is work,—the work of exploration, and of work that is play,—the reaching of a succession of novel experiences ; to give the child that freedom of growth which young tree demands for its tender shoot, that filled for self-expression in which all young life finds both training and happiness." এলমহার্স্টের এই উক্তি তো শিক্ষাবিজ্ঞানী জন্ ডিউইয়েরই বাণী, মহাশিক্ষক রবীন্দ্রনাথেরই বাণী। কবির আদর্শই ছিল এই যে, 'শিক্ষাসত্রে' সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা পেয়ে পড়ুয়ারা যে শুধু স্ব স্ব জীবিকা উপার্জন করবে তাই নয়, তারা পল্লীতে ফিরে গিয়ে পল্লীর করবে উন্নতি, তারা হবে Village Leaders। ১৯২৭ সালে জুলাই মাসে 'শিক্ষাসত্র'টি শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে সরিয়ে নেওয়া হ'ল। নব পরিবেশে 'শিক্ষাসত্রে'র যে নবজীবন দেখা দিয়েছিল, তাকে লক্ষ্য করেই ১৯২৭ সালের বিশ্বভারতীয় বার্ষিক প্রতিবেদনে লিখিত রয়েছে,—"While great stress is laid upon manual labour by which they learn to earn an honest livelihood ; in fact, the children take as much interest in reading, writing etc. as in order activities. Great care is taken to present everything before them in the form of concrete projects." রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাসত্রে'র শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"It is not only through the fullest development of all his capacities that man is likely to achieve his real freedom." রবীন্দ্রনাথ মানুষ সম্পর্কে চেয়েছিলেন, "He must be so equipped as no longer to be anxious about his own self-preservation," ওদিকে গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শে পাওয়া যায়, "Insurance against unemployment" গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা তথা ওয়ার্ধা শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে কোন সমালোচক বলেছেন—"এই প্রণালীটির দুটি দিক আছে। একটি শিক্ষাতত্ত্বের, অন্যটি অর্থনীতির দিক। শিক্ষাতত্ত্বের সহিত যে দিকটির সম্বন্ধ, তাহা মূলতঃ ও সারতঃ ষোলো বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত ( এক্ষণে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত ) 'শিক্ষাসত্র' নামক বিদ্যালয়ের অনুসৃত প্রণালীর মত।···যাঁহারা ওয়ার্ধা প্রণালীর আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের শিক্ষাসত্রের প্রাণালীটিও দেখা উচিত।"

মানুষের জীবিকা নয়, তার জীবনকেই রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অবশ্য জীবিকার সমস্যাকে শিক্ষাদর্শ থেকে একেবারে বাদ দিয়ে তিনি কোন তুরীয় আদর্শবাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন নাই। জীবনের আনন্দ, সৃষ্টিবিলাস, ক্রীড়া-কৌতুক, অপব্যয় প্রভৃতির কোনটিকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার সীমানা থেকে বহিষ্কৃত করেন নি। জীবনে আদর্শপ্রাপ্তির যদি কিছু সম্ভবনা থেকেই থাকে তো নীতি ছাড়া একপাও এগোবার উপায় নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নীতির চেয়েও বড়ো ঐ ধর্ম অর্থাৎ 'মানুষের ধর্ম'কে মেনে নিয়ে জানিয়েছেন যে, বহুবিচিত্র মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নানা ভাবে রূপ দেবার সুযোগ দেওয়াও তো শিক্ষার লক্ষ্য; কোন বিশেষ মতকে কেন্দ্র করে সফলতা লাভের আদর্শটি শিক্ষক বা শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যে কারও পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। গান্ধীজীও জীবনকে পবিত্র বলে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু এই দরিদ্র জটিল পরিস্থিতিতে জীবনের চেয়ে জীবিকারই উপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন বেশি করে'। এদেশের কোটি কোটি নিরক্ষর শিশুর শিক্ষা-সমস্যা অচিরকাল মধ্যেই পূর্ণ বয়স্কের জীবিকা-সমস্যারূপে দেখা দেবে এবং এরই আশু সমাধান কিভাবে করা যায়, তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল মহাত্মাজীর শিক্ষা-জিজ্ঞাসায়। গান্ধীজীর শিক্ষা-দর্শনে জীবনের চেয়ে জীবিকা এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শনে জীবিকার চেয়ে জীবন প্রাধান্য লাভ করেছিল। উভয় শিক্ষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যতটুকু পার্থক্যই থাকুক না কেন, মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে পার্থক্য বড় বেশি নেই। মনে হয়, আগামী কালের শিক্ষাবিধি শিক্ষাদর্শনের এই উভয় ধারার মেলবন্ধনেই নবরূপে দেখা দেবে।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা

'শিক্ষার হেরফের' এবং আরও অনেক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করতে চেয়েছেন। ইংরাজি ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার বিপক্ষে এবং শিক্ষার শুরু থেকে ইংরাজি ভাষাকে অবশ্য পাঠ্যহিসাবে প্রবর্তন করার প্রতিকূলে তিনি সুস্পষ্ট অভিমত জানিয়েছেন। কারণ, "এক তো, ইংরাজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস ও পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোন প্রকার মিল নাই। তাহার পর আচার, ভাববিন্যাস এবং বিষয়প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাকে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়।" 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আধুনিক শিক্ষা ইংরেজি ভাষা-বাহিনী ব'লেই আমাদের মনের প্রবেশপথে তার অনেকখানি মারা যায়। ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালীর ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি. এণ্ড্ ও. কোম্পানীর

মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন

ডিনার-কামরায় যখন খেতে বসে, তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটা-ছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত ব'লেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের দাবি সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা,—আছে সবই অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়।" আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার বাহন করতে চেয়েছেন তার কারণ হু'টি ঃ একটি হচ্ছে, মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান সহজে মনের আয়ত্ত হয়; অপরটি হচ্ছে, শিক্ষা মুষ্টিমেয় লোকের ব্যক্তিগত সম্পদ হয় না, পক্ষান্তরে দেশজোড়া অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করতে সাহায্য করে—এমনি ভাবেই জ্ঞান সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

একদা রবীন্দ্রনাথ ক'লকাতা বিশ্ববিগ্যালয়ের কাছে সবিনয়ে অনুরোধ করেছিলেন,—"একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশজুড়ে পাতা হোক্। এমন সহজও ব্যাপকভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না, তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করছে এইটি দেখবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী দেওয়া হয়, এক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সেরকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে বিষয়বিশেষে। সেই বিষয়ে আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়। সেটুকু অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার কোনো কারণ দেখিনে।" কিন্তু আজও অবধি বিশ্ববিদ্যালয় গুরুদেবের ঐ অনুরোধ রক্ষা করেন নি; তাই তিনি বিশ্বভারতীর মাধ্যমে ঐরূপ পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন তো করেছিলেনই, অধিকন্তু ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে সংগৃহীত জ্ঞান যাতে জনসাধারণ লাভ করতে পারে, তারই জন্য তিনি "বিশ্ববিদ্যালয়-সংগ্রহ-গ্রন্থমালা" প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন ও নিজে বিজ্ঞানের বই লিখে ঐ বিপুল জ্ঞান-দান-যজ্ঞের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বভারতী এক্ষণে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত হওয়ায় 'লোক-শিক্ষা-পরিষদ' দ্বারা গৃহীত পরীক্ষা কি আর বিশ্বভারতী কর্তৃক স্বীকৃত হবে?

দেশজোড়া পরীক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন

রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষার সঙ্গে জীবনের নিবিড় সংযোগ থাকা চাই। "শিক্ষাকে জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাকে বিদ্যালয়ের গড়া কৃত্রিম সামগ্রী করে তুললে তার অনেকখানিই আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হয়।" তিনি বেদনাহত চিত্তে লিখেছেন, "আমাদের ভাব, ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গিয়াছে,—মানুষ

বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্ফল হইতেছে।" তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বোঝাতে চেয়েছেন—"আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnology বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশের যে হাড়ি-ডোম, কৈবর্ত, পোদ-বাগ্দি রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কতবড় একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে।" তাই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন,—'জ্ঞান-শিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে-বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে-বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানতঃ তাহাকেই অবলম্বন করিয়া হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই।" রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানের এই সূত্রটিকেই রূপায়িত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। আশ্রমের গাছপালা, পশুপক্ষী প্রভৃতি বিশ্বপ্রকৃতির এই উপাদানগুলির সঙ্গেই যে শুধু আশ্রম-ছাত্রছাত্রীগণের সম্পর্ক আছে তাই নয়, ভুবনডাঙ্গা গ্রাম ও সাঁওতাল পাড়াগুলির সম্যক পরিচয়ও তাদের পেতে হয়। জীবনকে পেতে হলে জীবনকেই ছুঁয়ে যেতে হয়। জীবনহীন শিক্ষার ভিতর দিয়ে জীবনকে ধ্বংসই করা হয়—তাকে পাওয়ার আশা দুরাশার নামান্তর। শিক্ষা ও জীবনের পূর্ণ সমন্বয় সাধনই রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসত্রের মূল কথা।

শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সংযোগ

জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সহজ ও সুনিবিড় সম্পর্ক না থাকায় ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় আমাদের শিক্ষা কোনরূপ সক্রিয় শক্তি সঞ্চারিত তো করেই নি, উপরন্তু প্রত্যহের অনাড়ম্বর সরলতাকে চালিত করেছে আড়ম্বরময় জটিলতার দিকে। ফলে ঘটেছে জীবনের পরাজয়। সারা জগৎকে পুঁথির দর্পণে চিনতে গিয়ে, দেখতে গিয়ে ও বুঝতে গিয়েই আমরা ভুলের বালুচর তৈরি করছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"বই পড়াটাই যে শেখা ছেলেদের মনে এই অন্ধ সংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়।" কারণ,—পুঁথি-আবরণ বিদ্যায় মন এমনই মোহ-বিমূঢ় হয় যে সকল সচেতন সজীবত যায় হারিয়ে, পুঁথির বাধনে মন হয় পঙ্গু নির্জীব ও জড়। আসল কথা, পুঁথির বুলিকে আমরা শৈশবকাল থেকে আপন বুদ্ধির আগুনে ঝলসিয়ে নিতে শিখি নি, ব্যবহারিক বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে শিখি নি, শৈশব থেকে কল্পনা ও চিন্তাশক্তিকে স্বাধীনভাবে বিকশিত করে তুল্‌তে শিখি নি। "জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না, বই দিয়া ছুঁই" বলেই আমাদের এই ভীষণ দুর্গতি। পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষাই বয়সে সাবালক মানুষকেও করে রাখছে বুদ্ধিতে চির-নাবালক। জীবনে শিক্ষার এ কী নিদারুণ মর্মান্তিক পরাজয়!

পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষার গলদ

রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে আনন্দহীন শিক্ষার বেদনায় জর্জরিত হয়েছিলেন। তাই

চিত্তবিকর্ষণমূলক পাঠশালাগত শিক্ষায় তিনি এগুতে পারেন নি। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের যোগ থাকা চাই—ব'লতে কি, শিক্ষায় আনন্দের স্থান সকলের উপরে। কারণ, "আনন্দের সঙ্গে পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিত ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, গ্রহণ-শক্তি, ধরণা-শক্তি, চিন্তা-শক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক ভাবে বল লাভ করে। আনন্দেয় ভিতর দিয়া মুক্তির হাওয়ার মধ্যে শিশুচিত্ত যেমন বিকশিত হয়, তেমন আর কিছুতেই সম্ভব নয়।" তাই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে আনন্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, আনন্দ হচ্ছে একজাতীয় জারকরস, যা অধীত বিদ্যাকে হজম করতে মনকে সাহায্য করে। "যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না।" ইস্কুলের ব্যাকরণের সূত্রাদি, শব্দার্থ, অঙ্ক-কষা প্রভৃতি ছাড়াও যা পড়ুয়াদের প্রাপ্য, তা তো ঐ বেত ও 'মাষ্টারের কটু গালি।' ফলে পড়ুয়ার কাছে ইস্কুল হয় কারাগার। তাই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মুক্ত আকাশের নীচে ধরিত্রীমাতার বক্ষোদেশে ইস্কুল বসিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে শিশুপ্রকৃতির যোগসাধন করতে চেয়েছিলেন। অবশ্যপাঠ্য বিষয়গুলির সঙ্গে অনাবশ্যক বহু বিষয় মিশিয়ে শিশুমনের সহজ কৌতূহল জাগিয়ে আনন্দের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। জ্ঞান চিত্তাকর্ষক না হলে তরুণ মন তাতে সাড়া দেয় না। তাই আজ বেত নির্বাসিত হয়েছে বিদ্যালয় থেকে, ফুলফল পশুপক্ষীর ছবি সমাদর পাচ্ছে বিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে। প্রায় অবশ্যপাঠ্য বিষয়ের মর্যাদা পেয়েছে আবৃত্তি ও সংগীতানুশীলন।

শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের সংমিশ্রণ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় যে পাঠ্যতালিকা অনুসৃত হয়, তার মধ্যে মনের ঐশ্বর্য ও চিন্তার স্বকীয়তা বাড়ানোর উপকরণ বড় বেশি থাকে না। শৈশবকাল থেকেই শিশুদিগের শিক্ষায় স্বাধীনতা দিতে হবে। কেবলমাত্র স্মরণ-শক্তির উপর নির্ভর না করে' চিন্তা-শক্তি ও কল্পনা-শক্তির স্বাধীন পরিচালনায় নব নব বিস্ময় ও কৌতূহলের মধ্য দিয়ে যদি শিশুশিক্ষা অগ্রসর হয়, তবেই শিশুর সমগ্র জীবন যথাকালে হবে সরস, হবে ফলপ্রসূ। অপরিমিত আশা ও চিন্তার আলো শিশুমনে সর্বদা সঞ্চারিত করে' রাখ্‌তে পারলেই প্রকৃত স্বাধীন শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠে।

স্বাধীন শিক্ষা

আমাদের শিক্ষা যাতে অন্তরের রসে রসায়িত হয়, আমাদের জ্ঞান ও কর্ম যাতে অন্তঃপ্রবাহী প্রাণধারার মতো বয়ে চলে, আমাদের মননশীলতার বনিয়াদ যাতে ভিতরে ভিতরে সুদৃঢ় হয়, তার দিকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল

যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ, তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও, তাহাদিগকে এই ভূমির আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিও না।···বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্যে বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষ লীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও।" ষড়ঋতুর উৎসবে লীলায়িত প্রাণময়ী প্রকৃতির রঙ্‌মহলে, চেয়ার-বেঞ্চি-টেবিল-ডেস্ক-বর্জিত উন্মুক্ত প্রকৃতির পাঠশালায় শিশুশিক্ষার কথাই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, শিশুশিক্ষার প্রধান উপাদান প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ ও প্রকৃতি-পরিচর্যা। প্রথমটিতে জাগে মন, বাড়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি এবং দ্বিতীয়টিতে বিবিধ হৃদয়বৃত্তি পায় স্ফূর্তি। পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে পরিবেশগত শিক্ষাকেই রবীন্দ্রনাথ প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে পরিচিত হলে শিশুমন পায় উৎসাহ, শিশুর স্বভাবজাত গুণ হয় বিকশিত। নিছক প্রকৃতির সঙ্গে একটা আনন্দময় যোগসাধনই নয়, পার্শ্ববর্তী লোকালয়ের জনগণকে জেনে তাদের জীবনযাত্রার বহুবিচিত্র সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলেই আদর্শমণ্ডিত পরিবেশগত শিক্ষার সফলতা প্রকাশ পায়। এই শিক্ষাধারায় শিশুমনে দেশপ্রীতিও সত্য হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথের মতে, শিশু যখন স্বাধীনভাবে কাঠ মাটি দিয়ে পুতুল গড়ে, তখন তাতে শিশুমনই পায় রূপ। সাহিত্য শিল্পকলা চিত্রকলা সংগীতবিদ্যা প্রভৃতির চর্চায় ঘটে শিশুশক্তির বিকাশ, শিশুচরিত্র হয় সমুন্নত, শিশুমনের বল পায় বৃদ্ধি। শিক্ষার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশই চেয়েছিলেন। শিশুর স্বাস্থ্যচর্চার দিকেও তাঁর ছিল লক্ষ্য। আবার গানে গল্পে অভিনয়ে খেলাধুলায় ভ্রমণে শিশুর আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা যাতে রূপ পায়, তাও তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও পুরাপুরি ভাবসর্বস্ব ছিলেন না। তাই তিনি শান্তিনিকেতন কলাবিদ্যালয়ের পাশাপাশি স্থাপন করেছিলেন শ্রীনিকেতন বিদ্যালয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে তিনি ভাবমূলক শিক্ষার বাহনরূপে প্রবর্তিত করে' যে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নবশিক্ষাদর্শ আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, তা দেশে দেশে প্রচলিত শিক্ষার রকমারি পরীক্ষা-নীরিক্ষার মধ্যে কেবলমাত্র অন্যতমই নয়, হয়তো-বা প্রথমতমই।

শিক্ষা-পরিকল্পনা

শিক্ষার উদ্দেশ্য যাতে ব্যর্থ না হয়, তাহারই জন্য রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে সতর্ক করবার মানসে বলেছেন,—"শিক্ষা সম্বন্ধে সবচেয়ে স্বীকৃত এবং সবচেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে, শিক্ষা জিনিসটা জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্যপ্রণালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে, কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে।" পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে যে সমস্ত বোর্ডিং-ইস্কুল স্থাপিত হয়, সেগুলো রবীন্দ্রনাথের মতে "বারিক, পাগলা-গারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই এক গোষ্ঠীভুক্ত।" রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত 'আদর্শ

বিদ্যালয়' সেকালের তপোবন-বিদ্যালয় যেমন নয়, একালের পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন ইস্কুলও তেমনি নয়। "লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে" স্থাপিত রবীন্দ্র-পরিকল্পিত 'আদর্শ বিদ্যালয়ে'র "অধ্যাপকগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।...যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক ;—এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্রেরা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ, ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। কারণ, বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাকাইতে থাকিবে।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিজ্ঞানের আরও কয়েকটি সূত্র

রবীন্দ্র-পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় পুঁথির স্থান বড় নয়, বড় গুরু বা শিক্ষকের ভূমিকা। কারণ, পুঁথির লেখা আর গুরুর মুখের কথার মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। "মুখের কথা তো শুধু কথা নহে, তাহা মুখের কথা। তাহার সঙ্গে প্রাণ আছে ; চোখমুখের ভঙ্গী, কণ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ইঙ্গিত—ইহার দ্বারা কানে শুনিবার ভাষা, সংগীত ও আকার লাভ করিয়া চোখ মন দুয়েরই সামগ্রী হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, আমরা যদি জানি, মানুষ তাহার মনের সামগ্রী সদ্য মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে, —সে একটা বই পড়িয়া মাত্র যাইতেছে না, তাহা হইলে মনের সঙ্গে কালের প্রত্যক্ষ সম্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রসের সঞ্চার হয়।" তাই শিক্ষকের "জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণ সাধন করিতে হয়।" সত্যি কথা ব'লতে কি, "ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্বন্ধ কেবল শিক্ষাদানের সম্বন্ধ হলে চলবে না...... যথার্থ আত্মীয়তার সম্বন্ধ হওয়া চাই।" রবীন্দ্রনাথ পুঁথিকে যে কতখানি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর স্বপ্নে গড়া 'পথচারী বিদ্যালয়ে'র মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—ভ্রমণ করতে করতে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। তার কারণ কেবলমাত্র এ নয় যে, ভ্রমণে নানা বিষয় পর্যবেক্ষণের দ্বারা আয়ত্ত হয়, তার কারণ এই যে নিত্যই নূতনের সংযোগ এবং অন্তর-বাহিরে উভয়ের সম্মিলিত পদক্ষেপে আমাদের জাগরূক চিত্তবৃত্তি সর্বদাই উৎসুক হয়ে থাকে। এমন অবস্থায় ছাত্রেরা শিক্ষার বিষয়ে যা কিছু পায় তাকে গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সহজ হয়।"

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনা অনেকেরই কাছে বাস্তব বুদ্ধিহীন স্বপ্নচারী কবির কল্পনাবিলাস নামে আখ্যাত ও উপহসিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে

দেখা যাচ্ছে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির ডালপালাগুলো ক্ষেত্রবিশেষে ছাঁটাই হলেও মূল সূত্রগুলি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ইতিপূর্বেই গৃহীত হয়েছে অথবা এখন হচ্ছে। বর্তমানে মাতৃভাষাই ভারতের সর্বত্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন। জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগসাধনের প্রয়োজনীয়তাও আজ্‌কের এই জীবনভিত্তিক ও কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রচলিত হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্র-পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতিরই মূল সূত্রানুসারে শিক্ষাসংস্কার হলেও প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনারও অবশ্য অন্ত নেই। আজ্‌কের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ব্যর্থ বলা হয় প্রধানতঃ এই কারণে যে, শিক্ষিত ব্যক্তিরা চাকরি পায় না বা পেলেও ভাল পায় না। তার উত্তরে এইটুকুই বলতে চাই যে, রবীন্দ্র-প্রবর্তিত শিক্ষা অর্থকারী শিক্ষা নয়—মৌলিক শিক্ষা। তাই যদি হয়, তবে অর্থোপার্জনে 'অকেজো' শিক্ষার সার্থকতা কোথায়? কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন একেবারেই, অবান্তর। রবীন্দ্রনাথ এক দিকে যেমন অর্থোপার্জনের চেষ্টাকে জাগানোর জন্যে শ্রীনিকেতনে এক বিরাট্ প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, অপর দিকে তেমনি দেশবাসীদিগকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করবার মানসে তিনি যা স্থাপন করেছেন তা ঐ শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিজ্ঞানের সমালোচনা

## শিশুশিক্ষা

শিশুকে পুরানো দিনে কেবলমাত্র বয়স্কের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে' মনে করা হত। ফলে তার শিক্ষার কোন বিশিষ্ট রূপ ছিল না। কিন্তু আধুনিক যুগের মনোবিদ্ ও দার্শনিকেরা সর্বসম্মতভাবে মানব জীবনের প্রতিটি স্তরের স্বয়ংসম্পূর্ণ গুরুত্বের কথা মেনে নিয়েছেন। আধুনিক যুগের শিশু তাই শিক্ষারাজ্যে এক বিশেষ ভূমিকা পেয়েছে। শিক্ষার আদর্শ জীবনের প্রতিটি স্তরের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। আবার শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপরই নির্ভর করে তার ভবিষ্যৎ জীবন। তারই মনোরাজ্যের নানা প্রবৃত্তি, আবেগ ও অনুভূতির পরিচালনা ও পরিস্ফুটনের মধ্য দিয়া শিশুর পূর্ণবিকাশ সম্ভব।

শিশুর গুরুত্ব

শিশুশিক্ষার ইতিহাসের ধারাটি নিতান্ত অর্বাচীন নয়। প্রাচীন যুগে সক্রেতিস, প্লেতো, আরিস্ততল এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে কমেনিয়াস সমাজের প্রগতিতে শিশু-শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। বিপ্লবী শিক্ষা-দার্শনিক রুশো তাঁর "এমিল" গ্রন্থে শিশুশিক্ষা বিষয়ে তাঁর নিজের মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর শিক্ষায় প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কোন পরিচালক বা পুঁথির প্রয়োজন নেই। বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশু অকৃত্রিমভাবে

শিশুশিক্ষার ইতিহাস

ড় হবে। তাঁরই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত পেসতালজ্জি, ফ্রয়েব্‌ল, ডিউই, মন্তেসরী ারবর্তী কালে শিশুশিক্ষার ধারাকে পুষ্ট করলেন।

পেসতালজ্জির মতে, শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু যেন চারাগাছের মতো নিজের শক্তিতে বেড়ে লেছে। শিক্ষক মালীর মত তার স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ কৃত্রিম আগাছাগুলির উচ্ছেদ করবেন। ফ্রয়েব্‌ল্ শিশুর সহজ সরল প্রাকৃতিক মুক্তিকেই শিশুর শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মেনে নিলেন। আপনার সংগঠিত শিশু-শিক্ষাকেন্দ্রের নাম দিলেন 'কিণ্ডারগার্টেন" অর্থাৎ শিশুকানন। অবশ্য ফ্রয়েব্‌ল্-এর আধ্যাত্মিক মতবাদ তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতিকে খানিকটা জটিল করে তুলেছিল। পরম ঈশ্বরই চরম লক্ষ্য এবং শিশু সেই ভগবানেরই প্রতিভূ। এহেন শিশুর অন্তর্নিহিত বৃত্তির সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক প্রকাশই শিক্ষার লক্ষ্য। শিশু প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবানের সঙ্গে একাকার হয়ে আছে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে ফ্রয়েব্‌ল্-এর শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি রচিত। এই গভীর ও জটিল দর্শন তাঁর শিক্ষা-উপাদানগুলিকেও (Gift এবং occupation নামে অভিহিত) জটিল করে তুলেছে। মন্তেসরী ফ্রয়েব্‌ল্-এরই অনুসারী। অবশ্য তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন শিশুর ইন্দ্রিয়বোধগুলির বিকাশসাধনের উপর। মন্তেসরী-পদ্ধতিতে শিক্ষিকা পরিচালিকা—শিশুমনস্তত্ত্বেও সুদক্ষা। খেলা ছবি গান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে শিশুর বিভিন্ন বৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ প্রকাশসাধনে তিনি সহায়তা করবেন।

পেসতালজ্জি ; ফ্রয়েব্‌ল্ ; মন্তেসরী

শিশুশিক্ষার ধারায় ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর অবদানও উল্লেখযোগ্য। ডিউই-এর মতোই গান্ধীজীও শিক্ষার সঙ্গে কর্মকে যুক্ত করেছিলেন তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার ভিত্তিতে। দ্বিতীয় ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় তিনি প্রাক্-প্রাথমিক স্তর ও নঈ-তালিম-এর উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী তাঁর বাণীতে বলেছিলেন, "নঈ-তালিম বা নতুন শিশুপদ্ধতিকে জন্মমুহূর্ত থেকে মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত সকল পর্যায়ের জনগণের জন্য শিক্ষার পদ্ধতিরূপে প্রচলিত করতে হবে।" রবীন্দ্রনাথ চিরদিনের শিশু। শিশুশিক্ষায় তাঁর অবদান "আনন্দভবন" নিজ নামেই বিশিষ্ট। শিশুর অন্তররাজ্যের সহজ সারল্যটুকু মুক্তির আলোকে উজ্জ্বল হয়েছে রবীন্দ্রনাথের "সহজ পাঠে", "শিশুতে", "শিশু ভোলানাথে"। শিশুর ভালো-লাগার মধ্যে দিয়ে, আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিশুশিক্ষার ধারা প্রবাহিত, এই সত্যটিকেই তিনি রূপ দিয়েছিলেন। প্রধান প্রধান শিক্ষাদার্শনিকের মতামত থেকে এই সত্যটি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করা যায় যে, শিশুকে শিক্ষা দেওয়াই বড় কথা নয়, শিশুর শেখার আগ্রহকে জাগিয়ে তোলাই শিশুশিক্ষার মূল কথা।

গান্ধীজী ; রবীন্দ্রনাথ

বয়স্কের মানসগঠন অনেকখানি স্থিতিপ্রবণ। কিন্তু দু বছর, পাঁচ বছর ও সাত

বছরের শিশুর মানস-চরিত্রে অশেষ ব্যবধান। তাই শিশুশিক্ষায় এই বয়সগত ব্যবধানের দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। নার্সারী কিণ্ডারগার্টের ও মন্তেসরীর শিশুকে বাধ্যতামুলক ভাবে কোন পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়া চলে না। তার ভালো-লাগা অনুসারে নানারূপ লেখার সরঞ্জাম হাতের কাছে এগিয়ে দিতে হবে। ছবি-ছড়া-গানের আনন্দ শিশুমনে সৌন্দর্য-রসের সঞ্চার করতে হবে। সর্বোপরি, শিশুর স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস-গুলির দিকে লক্ষ্য রাখাই হবে শিশুবিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ। সাত বছরে শিশু প্রাথমিক স্তরে সুনির্দিষ্ট পুঁথিগত শিক্ষালাভ করতে পারে—তার পূর্বে নয়। অবশ্য এই প্রাথমিক স্তরের লেখাপড়াতেও আনন্দের স্থান সর্বাগ্রে। এখানে ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যে সব শিক্ষা দেওয়া হবে তাও তার চেনা-পরিচিত রাজ্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে। শিশু যেন তার স্বাভাবজাত জানার আগ্রহেই জানতে চায় শিখতেও চায়। তার পাঠ্য-বিষয়ের প্রাণকেন্দ্র হবে সহজ সরলতা।

শিশুশিক্ষার বিভিন্ন স্তর

শিশুশিক্ষার এই বিশেষ ধারা আমেরিকা, ইংলণ্ড, সোভিয়েৎ এবং য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশেও কেবল যে জনপ্রিয় তাই নয়, জীবনধারার পক্ষে একান্ত অপরিহার্যও। এই সব দেশে শিল্পোন্নয়নের ফলে নারীকে ও পুরুষের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। ফলে জননীর গুরু দায়িত্ব অনেকাংশে শিশু বিদ্যালয়গুলির উপর বর্তেছে। তুলনায় আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাই নানা কারণে একান্ত পশ্চাৎপদ। আর শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে তার ভাণ্ডার তো নিতান্তই শূন্য। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়া এদেশে সরকারী চেষ্টায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কোন শিশু শিক্ষালয় নেই বললেই চলে।

শিশুশিক্ষা—(১) য়ুরোপে

অবশ্য ভারতের অবস্থা স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হচ্ছে। চাকরিজীবী মায়ের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। জননীর শিক্ষাগত অজ্ঞতার পরিণাম যত ক'মছে, শিশুশিক্ষার আগ্রহ সেই অনুপাতে বাড়ছে। সর্বোপরি, গণতান্ত্রিক ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষা সম্বন্ধে রাষ্ট্র সচেতন হচ্ছে। কাজেই শিশুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ বিতর্কাতীত হয়ে উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতের দিকে লক্ষ্য রেখে সর্জেণ্ট পরিকল্পনার ভারতের জাতীয় শিক্ষায় শিশুশিক্ষার বিশিষ্ট স্থানের কথা বলা হয়েছে। তাঁরা কর্মরতা জননীর শিশুদের ভার নেবার উপযুক্ত সুদক্ষ পরিচালিকা-নিয়ন্ত্রিত শিশুবিদ্যালয়ের প্রস্তাব করেছেন। শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার কথাও বলা হয়েছে। তাঁদের মতে, এই শিশুবিদ্যালয়গুলি অবশ্যই অবৈতনিক হবে। ১০,০০,০০০ শিশুর জন্য ৩,১৮,৪০,০০০ টাকা ব্যয় করা হবে বলে' সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এর গুরুত্ব অনুধাবন করা সত্ত্বেও বর্তমান সরকার

—(২) ভারতে

নিদারুণ অর্থনৈতিক চাপ ও জনসংখ্যার আধিক্যের জন্যে শিক্ষাক্ষেত্রের সবস্তরে সমান গুরুত্ব দিতে পারছেন না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষার দিকেই সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ। শিশুশিক্ষা এখনও সরকারী সাহায্যের ও পরিপোষণের অন্তর্গত নয়। কিন্তু এর নিজস্ব গুরুত্বে দেশের প্রধান প্রধান শহরে বে-সরকারী ব্যবস্থাপনায় শিশুশিক্ষালয় স্থাপিত হচ্ছে এবং নতুন আদর্শ ও পদ্ধতির সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয়ও ঘটাচ্ছে।

# নারী ও পুরুষের শিক্ষাদর্শের পার্থক্য

নারী ও পুরুষের বিভিন্ন শিক্ষাদর্শের প্রশ্নটি মূলতঃ এ-যুগের সৃষ্টি। মধ্যযুগে নারীর একমাত্র কর্ম ছিল গৃহসেবা, বাহিরের বিশ্বে নারীর প্রবেশ ছিল অনাদৃত। অবশ্য বৈদিক যুগে নারীর যজ্ঞাধিকার ছিল, কিন্তু তাহা পুরুষের অর্ধাঙ্গ হিসাবে, স্বয়ং নারী হিসাবে নয়। মধ্যযুগে সে-অধিকারের অবসান ঘটে, নারীকে গৃহ-কোণে আবদ্ধ হইতে হয়। ক্রমে রেঁনেসাঁর উজ্জ্বল আলোতে পৃথিবী আলোকিত হইল, জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের এইরূপ অন্তরালবাস আর সমর্থিত হইল না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দীপ্তি নারীকে "মানুষ" রূপে স্বীকার করিয়া হইল। এতদিনে নারী পুরুষের পাশে আপন উপযুক্ত স্থান লাভ করিল। বিংশ শতকের প্রায় প্রথম যুগ পর্যন্ত নারীর ব্যক্তিসত্তার উজ্জীবনের যুগ। এ-যুগে নারী পুরুষের পার্শ্বে পুরুষের মত হইয়া কতখানি সার্থকতা লাভ করিবে, তাহাই হইল নারীশিক্ষার লক্ষ্য। কয়জন গ্রাজুয়েট, কয়জন ইঞ্জিনীয়ার এবং কয়জন নারীই-বা এরোপ্লেন চালাইল তাহাই হইল নব্যযুগের জ্ঞাতব্য তথ্য।

সমাজে নারীর নূতন মূল্য স্বীকার

কিন্তু যুগ আগাইয়া চলিতেছে। গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের পথে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা নূতন রূপ লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নয়ন ঘটিতেছে, জীবনযাপনের জটিলতা বাড়িতেছে, সমাজের প্রয়োজন ব্যাপকতর হইয়াছে। নারীকে তাই সমাজ ও সংসারের তাগিদে বাহিরে আসিতে হইতেছে বাহবার লোভে নয়। পুরুষের ন্যায় তাহাকেও সমাজ-তরণীর হাল ধরিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহ একথা সর্বাংশে মানিয়া লইয়াছে। পুরুষ বা নারীর শিক্ষায় তাই কোন বিশিষ্ট পার্থক্য নাই। সমাজের প্রয়োজন সর্বগ্রাসী ; তাই সেখানে পুরুষ ও নারীর শিক্ষায় কোন পার্থক্য করা চলিবে না। কিন্তু অধুনা গণতান্ত্রিক সমাজ আরও গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে। দেশের শিল্পোন্নয়ন ও কারিগরী বিদ্যার কতটা উন্নতি হইয়াছে কেবল তাহাই নহে, সামাজিক মানুষের কল্যাণ সাধন কতটা সম্ভব হইল তাহাই প্রশ্ন! জননীর কর্তব্য, শান্তির নীড় গৃহের কল্যাণ, মমতাময়ী নারীর সেবাধর্ম কি

নারীর কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি

রেলইঞ্জিন ও সুকঠিন বিজ্ঞানশালার গবেষণা-কক্ষে নির্বাসিত থাকিবে? শিক্ষার রেলবর্ত্মে নারীও কি পুরুষের সঙ্গে যুগপৎ প্রবাহিত হইবে?

আসল সমস্যাটি দাঁড়াইয়াছে এইখানে। বর্তমান সমাজে নারী যদি অর্থনৈতিক মুক্তি না পায় তাহা হইলে তাহার স্বাধিকার কতকগুলি ফাঁপা বুলিতে পরিণত হইতে বাধ্য। সমাজ-প্রয়োজনীয় কর্মের ক্ষেত্রে নারী আজ চাকরির সন্ধানে বাহির হইতেছে। খনির অভ্যন্তরে ভারী কাজ, বড় বড় কারখানার শ্রমসাধ্য ব্যাপারে বা দুঃসাহসিক পরিশ্রমে দু'চারজন নারী নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও নারীসাধারণের পক্ষে তাহা যথেষ্ট উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে ক্ষেত-খামারের কাজে, বয়নশিল্পে ও অন্যান্য লঘু শিল্পকর্মে, ডাক্তারী হাসপাতালে সেবাদি কার্যে এবং শিক্ষাবিস্তারে, দোকানে বিক্রেতার ভূমিকায় এবং আপিসের নানা রকম কাজে তাহাদের দক্ষতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং স্থানও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাজেই এই সব কাজের লক্ষ্যে যাহারা গিয়া পৌছাইতে চায়, তাহাদের শিক্ষাও অনুরূপ আকার ধারণ করিবে ইহাই স্বাভাবিক। আর এ সমস্ত কাজে তাহারা পুরুষদের মতই শিক্ষা পাইবে। কাজেই দু'চারজন বিমান-চালক ও 'ব্লাস্ট-ফার্নেস অপারেটারে'র কথা ছাড়িয়া দিলে নারীর এই সাধারণ বৃত্তিগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিতে হইবে যে, পুরুষ ও নারীর শিক্ষা একই পথে মোটামুটি পরিচালিত হওয়া স্বাভাবিক। আপন আপন রুচি ও প্রবণতা-অনুযায়ী সাধারণ বিজ্ঞান বা কলা-শিক্ষায় নারীপুরুষের মধ্যে পার্থক্যের কথা ভাবার কারণ নেই। বৃত্তিশিক্ষার দিক দিয়া শিক্ষিতা নারীর পক্ষে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকতা, ডাক্তারী, নার্সিং প্রভৃতি অনুসরণ করাই সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

> নারী ও পুরুষের শিক্ষা কর্মে সমকক্ষতা

কিন্তু য়ুরোপে ও আমেরিকায় বিশেষ করিয়া মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে নারীর শিক্ষা ও বৃত্তি পরিবারধর্মের সঙ্গে ক্রমেই সম্পর্কহীন হইয়া পড়িতেছে। গার্হস্থ্য জীবনকে সুস্থ করিয়া তুলিবার জন্য বিভিন্ন ধরণের গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রচলিত করিবার কথা সেখানকার শিক্ষাদার্শনিকেরা ভাবিতেছেন। সোভিয়েৎ সমাজে নারী কর্মে এবং শিক্ষায় পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করিয়াছে। গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষায় সাধারণভাবে নারীকে সেখানে উৎসাহিত করা সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষ সামাজিক উৎপাদন কার্যের সঙ্গে সেখানে নারী-পুরুষ সবাই যুক্ত থাকিতে চায়। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে সেখানে কোন স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। অন্য দিকে তাহাদের পারিবারিক আদর্শ ভিন্নরূপ হওয়ায় এই নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে তাহা বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে। তবে সোভিয়েতের পারিবারিক আদর্শ অন্যান্য দেশ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে

> নারীশিক্ষা—
> (১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে;
> (২) সোভিয়েৎ রাষ্ট্রে

পারিবে না। কাজেই তাহাদের উদ্ভাবিত সমাধান সর্বত্র সমভাবে অনুসৃত হইবে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

কাজেই বর্তমানকালে বিভিন্ন দেশে নারীত্বের সার্থকতা এবং শিক্ষা লইয়া নূতনভাবে আলোচনার সূত্রপাত হইতেছে। সামাজিক বিচিত্র কর্মে পুরুষের সমকক্ষতা এবং পরিবার-জীবনের কেন্দ্রে জননী ও গৃহলক্ষ্মীরূপে তাহার স্থান একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে। যাঁহারা নূতন যুগের প্রয়োজন এবং নারীর বহির্মুখিতার অবস্থা স্বীকার করিয়া গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে বিশেষ নারীত্বের সন্ধান পাইতে চান তাঁহারা একটা আপোষমূলক ধারার প্রবর্তন করিতে চান। তাঁহাদের যুক্তি অনেকটা নিম্নরূপ। তাঁহাদের মতে, নারী ব্যক্তিমানবই বটে, কিন্তু সে নারীই। মনোবিদ্যা ও দেহবিদ্যার বিচারে দেখা গিয়াছে নারী ও পুরুষের মানসগঠন ও দেহগঠনের পার্থক্যকে কোনক্রমে অস্বীকার করা চলে না। আধুনিক শিক্ষাদার্শনিক-দের মতে, সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই পর্যবেক্ষণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র পুরুষের শিক্ষাদর্শের অনুসরণই নারীশিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, নারীত্বের বিকাশ-সাধনকেই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। তাহার শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার অবশ্য স্বীকৃত হওয়া উচিত। কিন্তু নারীত্বের বিশিষ্ট আসনে তাহাকে অবশ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে নূতন করিয়া গার্হস্থ্য শিক্ষার প্রশ্ন ওঠায় এই চিন্তাধারা আরও উৎসাহিত হইয়াছে।

গৃহলক্ষ্মী ও জননীরূপে নারী

শিশুশিক্ষার প্রথম স্তরে যখন মন্তেসরী ও কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের উপরই গুরুত্ব আরোপিত হয়, তখনই দেখা যায় তাহাদের স্বাভাবিক পছন্দের ধরণই বিভিন্ন। নরশিশুটি যখন বল লইয়া খেলার মাঠের দিকে ছুটিতে থাকে, নারীশিশুটি পুতুল লইয়া ঘর সাজাইতে বসে। এই মূলগত স্বাভাবিক বৃত্তির পার্থক্যকে কেন্দ্র করিয়াই বর্তমান ধারায় নারী ও পুরুষের শিক্ষাকে ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হইতেছে। বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীর বয়ঃসন্ধির যুগ। এই সময়ে তাহাদের দেহগঠনে বিশিষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়। মানস-প্রবণতায়ও ইহার প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। ফলে এই সময় হইতেই তাহাদের শিক্ষাক্রমে কিছু ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সমাবেশ প্রয়োজন। আমাদের দেশের বর্তমান উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে এই লক্ষ্য কিছুটা অনুসৃত হইয়াছে। গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের সহিত নারীর ভবিষ্যৎ জীবনের নিত্য প্রয়োজনের যোগ। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বিশেষ করিয়া ইহার পঠন-পাঠন ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। চারুশিল্প, কারুশিল্প, সীবনশিল্প প্রভৃতি বিচিত্র পথ নারীশিক্ষার সম্মুখে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে নারী-পুরুষ উভয়েই

নারীশিক্ষায় বহির্মুখী ও গার্হস্থ্য শিক্ষার মধ্যে আপোষ-রফা

তাহাদের বিশিষ্ট প্রবণতাকে শিক্ষা দ্বারা পুষ্ট ও সংস্কৃত করিতে পারে। অবশ্য এই সুযোগগুলির বিচিত্রতার দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু ছাত্রীদের অনুরূপ শিক্ষালাভের দ্বার রুদ্ধ করা হয় নাই। বিশেষ করিয়া আবশ্যিক অঙ্ক ও বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনে ছাত্র-ছাত্রী-নির্বিশেষে সকলের মানসগঠনের ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া তোলার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই আপোষমূলক ব্যবস্থা নারীর সাধারণ শিক্ষা এবং বহির্মুখী কর্মের যৌক্তিকতা যেমন মানিয়া লইয়াছে, তেমনি গার্হস্থ্য শিক্ষার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। আমাদের দেশে গার্হস্থ্য বিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রীলাভেরও সুযোগ হইতেছে। ইহার মধ্য দিয়া শিক্ষাগত নব আদর্শটিই ধরা পড়িতেছে।

উপসংহার

পরিশেষে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে পুরুষ ও নারীর শিক্ষা মূলতঃ বিপরীতধর্মী। পুরুষ শিখিবে অর্থকরী বিদ্যা আর নারী জানিবে সমাজসেবা। পুরুষ আনিবে অর্থ শান্তিসমৃদ্ধি রক্ষার্থে এবং দারিদ্র্য উচ্ছেদ করিবার জন্য আর স্ত্রী রাখিবে সংসারকে শৃঙ্খলাশ্রীর মধ্যে, পর্ণ-কুটিরকে করিয়া তুলিবে আদর্শ কুটির। প্রকৃতই সমাজের সেবায়, মানবের কল্যাণে ও পরহিতব্রতে করুণাময়ী নারী চিরদিনই মানবজাতির শ্রদ্ধেয়া। তাই এ হেন মাতৃজাতিকে অজ্ঞানতার তিমিরে না রাখিয়া তাহাদের মনে শিক্ষার বীজ উপ্ত করিয়া মনের ব্যাপকতা আনা যুগদর্শনসম্মত। সম্প্রতি নিখিল ভারতীয় নারীশিক্ষা সম্মেলনে নারীশিক্ষার তথ্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এদেশের শতকরা দশভাগ নারীও এখনও শিক্ষার আলোক পাইতেছে না। এ-অধিবেশনে আরও স্থিরীকৃত হয় যে, ভারত সরকার যেন নারীজাতিকে অনুন্নত সম্প্রদায় ভাবিয়া শিক্ষাপ্রসারে সহায়তা করেন। তাহা হইলে নারী-প্রগতি ও নারীশিক্ষার উন্নতি সম্ভবপর। শিক্ষা নারীদের ভারতীয় নারীত্ব হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহারা যান্ত্রিক জীবনের মোহে মুগ্ধ হইয়া সংসারধর্ম হইতে বিচ্যুত হয়, এই ধরণের উন্নাসিকতা বর্জন করিয়া নারীদের এমন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে তাহারা গৃহধর্মে সার্থকতার পরিচয় দেয় এবং আত্মবলে হইতে পারে মহীয়সী। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বাবলম্বন স্বাধীনতা এবং সংসারবন্ধনের সামঞ্জস্য রক্ষা করার শিক্ষাই প্রকৃত নারীশিক্ষা।

## ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও -সংস্কার এবং পাক্-শিক্ষানীতি

আজও আমাদের শিক্ষা কার্যকরী নয়—অর্থকরী। তথাপি ব্রিটিশশাসনে ভারতীয়দের অর্থকরী বিদ্যার ধারণার ( বা conception ) সঙ্গে আজকের স্বাধীন ভারতের প্রতিটি মানুষের অর্থকরী বিদ্যার ধারণার একটু পার্থক্য আছে নিঃসন্দেহে। তখন আমরা স্বার্থের খাতিরে শুধু অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারে ধন্না

দিতাম। কিন্তু আজ আমরা নাগরিক জীবনকে সুন্দর সার্থকভাবে গড়ে' তোলার জন্যে ও নিজেদের জীবনধারণের তাগিদে লেখাপড়া করি। শুধু অধ্যয়নই আজ আমাদের কাম্য নয়, জ্ঞানার্জন অধ্যাপনা ও ভারতকে শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধির পথে সহায়তা করাও অপরিহার্য কর্তব্য। অতএব, ভারতবাসীর এই পরিবর্তিত মানসিকতার পরিপেক্ষিতে মান্ধাতা-আমলের ঐ 'কেরানীগিরি-পরমার্থে'র কাঠামোয় যে শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্, তার আমূল পরিবর্তন সাধন শুধু যুগোচিত চিন্তাবাদিতারই পরিণাম নয়, উন্নততর জীবনবোধের ক্ষেত্রপ্রতিষ্ঠাকল্পে একান্তই করণীয়। অধিকন্তু ভারতীয় শিল্প-বিপ্লবের যুগে গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে নতুন প্রয়োজনোচিত অভিনব ধরণের শিক্ষার প্রচলনও বাঞ্ছনীয়। পুরানো অকেজো কাঠামোর উপরে ভিত্তিলগ্ন শিক্ষাব্যবস্থা ভারতবাসীর মনে নতুন কার্যোদ্যম সঞ্চারে নিষ্ক্রিয় এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সহজ বৃত্তি ও বুদ্ধি-বিকাশে অসমর্থ বলেই প্রাচীন জীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা অচিরে পরিত্যাজ্য। আমাদের দেশে শতকরা নব্বই জনই নিরক্ষর। সুতরাং যে ক্ষীণ-শিক্ষার পদ্ধতি এদেশে এখনও প্রচলিত, তাতে দেশের নিরক্ষরতা দূরীভূত হওয়া সুদূরের নিছক স্বপ্নবিলাস। তাছাড়া শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষণীয় বস্তু বা শিক্ষোত্তর কর্মজীবন—এদের মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই। ব্রিটিশ হয়তো সাম্রাজ্যবাদ অক্ষুন্ন রাখার দুরভিসন্ধি পরায়ণতার বশে কোন সমুচিত শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেনি। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সরকার তো এখন বিন্দুমাত্র অবহেলাভরে ফেলে রাখতে পারেন না এ সমস্যাটিকে।

সূচনা

পরাধীন ভারতেও এই অচল শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্যে ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কগণ চেষ্টার ত্রুটি করেননি। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু ব্রিটিশসরকারের কাছে অনেক প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন কিন্তু ব্রিটিশশাসকদের গোচরীভূত হয়নি সে-সব প্রস্তাব। সরকারী সূত্রে যদিও প্রাক্-স্বাধীনতার যুগ পর্যন্ত কোন উন্নতিবিধানের প্রত্যক্ষ পথ গৃহীত হয়নি, তথাপি রবীন্দ্রনাথ নিজ চেষ্টায় সর্বপ্রথম লোকশিক্ষার প্রবর্তন করেন বিশ্বভারতীতে। ভারতীয় সংস্কৃতিকে এক উন্নততর স্তরে উন্নীত করার সার্থক ও অদ্বিতীয় ঐ প্রচেষ্টা। নীরস একঘেয়ে পাঠ্য-তালিকাকে আকর্ষণীয় করার জন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে, বনস্পতির নিবিড় ছায়ায় শিক্ষা দেবার প্রচলন করেন শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার বদলে যাতে সর্বসাধারণ স্বেচ্ছায় পছন্দসই শিক্ষা পেতে পারে তার জন্যে করা হ'ল সংগীত, কলা, অঙ্কন প্রভৃতি চারুশিল্প এবং আরো অনেক কারুশিল্প শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা। ১৯২১ সালে জনসেবায় সমর্পিত শান্তিনিকেতনের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয় জ্ঞানের নতুন এক প্রতিষ্ঠান। নামকরণ হয় 'বিশ্বভারতী'।

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা

শিক্ষাভবন ( কলেজ ) বিদ্যাভবন ( গবেষণা ) রবীন্দ্রভবন ( রবীন্দ্রগবেষণা ) চীনাভবন ( চীন-ভারতীয় গবেষণা ) হিন্দীভবন ( হিন্দীশিক্ষা ও গবেষণা ) সংগীতভবন ( সংগীত ও নৃত্য ) কলাভবন ( চারুশিল্প ও কারুশিল্প ) ইত্যাদি ভারতসরকার ঘোষিত আধুনিক আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় ঐ বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ। বিশ্বভারতীর পল্লী-উন্নয়ন বিভাগটি শ্রীনিকেতনে। তাছাড়া আর সব বিভাগই শান্তিনিকেতনে। জানি না, রাশিয়া-ভ্রমণকালে সে-দেশের শিশুসৌধ দেখে কবিগুরু হয়তো সে-আদর্শের পরিপূর্ণ রূপায়ণ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন কিনা এ-বিশ্বভারতীতে!

১৯৪৪ সাল। অখণ্ড ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কারের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। তৎকালে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা গভীরভাবে জেনে ও সমস্ত বিষয় বিশেষ পর্যালোচনা করে' সার্জেণ্ট সাহেবের আধিনায়কত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা-কমিশন একটি পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন সরকারের সম্মুখে। প্রাচীন গ্রীসীয় দার্শনিক প্ল্যাটো বা আরিস্ততলের শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্যের অনেকখানি আহরণ ও অনুকরণ করা হয়েছে এতে। এ-পরিকল্পনা অনুযায়ী জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা শুরু করার কথা। নৈতিক জীবনের সংগঠন, শরীর-চর্চা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বহুমুখী শিক্ষা শিশুদের দেড় থেকে চার বছর বয়সে পরবর্তী সুষ্ঠু জীবনগঠনে খুবই সাহায্য করে। তাই মানবজীবনের এই অংশটুকু অতীব সংকটময়। এ সময়ে সতর্কভাবে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন বিষাদে ছেয়ে যাবে, এই আশঙ্কায় এই পরিকল্পনায় তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের জন্য নার্সারী স্কুলের প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু নার্সারী শিক্ষাকে অবৈতনিক করার প্রস্তাব উঠেছে অথচ আবশ্যিক করার বিষয় ভাবা হয়নি। অতঃপর এগারো বছর বয়স অবধি নানাবিধ কাজের মধ্যে দিয়ে নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়া হবে। এ সময়ে বালকেরা নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে যথাস্থানে প্রয়োগ করে' উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ বা ধীশক্তি-হেতু স্কুলে যাওয়ার উপযোগী বিবেচিত হলে তাদের স্কুলে উচ্চশিক্ষার্থে প্রেরণ করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধিবৃত্তি রুচি ও প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে পৃথক্ পৃথক্ দু'টি শিক্ষাধারা প্রবর্তনের কথা উল্লিখিত হয়েছে: একটি, যান্ত্রিক বা কারিগরি; অপরটি, নিছক জ্ঞানসঞ্চারী। তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের আপনাদের ইচ্ছামতো বৃত্তি-নির্বাচনে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। যান্ত্রিক হাই স্কুল ছাড়ার পর কুড়ি বছর অবধি কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা এবং আরও তিন বছরের অধ্যয়ন-শেষে উচ্চতর ডিপ্লোমা দেবার কথা স্বীকৃত হয়েছে। এ-পরিকল্পনার কার্যকারিতায় ও সফলতায় জীবিকানির্বাহ সমস্যার সমাধান সম্ভব। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে ওয়ার্ধা-পরিকল্পনাও একমতাবলম্বী।

সার্জেণ্ট-পরিকল্পনার স্বরূপ

তবে কলেজগুলির অপরিমেয় ক্ষতির সম্ভাবনার কথা ভেবে এ ব্যবস্থাটি অনেকে মেনে নিতে পারেন নি।

স্বাধীনোত্তর ভারতে গণশিক্ষার উপর শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি প্রসারিত হওয়ায় গান্ধীজীর ওয়ার্ধা-প্রস্তাব বা নঈ-তালিমের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হয়। প্রথমতঃ, শিক্ষা এবং জাতীয় জীবন এই দু'টির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই দুই পরস্পর-সহযোগী উপাদানকে হৃদয়ংগম করার জন্যে দুরূহ ইংরাজি ভাষার চাইতে মাতৃভাষাই প্রশস্ত। গান্ধীজীর মতে, আত্মবিকাশের পথে মাতৃভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশই একমাত্র সম্বল। দ্বিতীয়তঃ, স্বাস্থ্য শিক্ষা সাধারণ-বিজ্ঞান ও সর্বোপরি নিজস্ব সমাজ মানুষকে পরিপূর্ণ মানবতায় উদ্বুদ্ধ করে। শিশুমনে স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা-সম্বন্ধে চৈতন্যবোধ পরবর্তী জীবনে তাকে সুস্থ প্রতিশ্রুতিশীল নাগরিক করিয়া তোলে। স্বাস্থ্য তখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। সমাজবোধ সামাজিক মানুষের অনন্য হয়ে থাকা উচিত। শিশুকাল থেকে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলা নঈ-তালিমের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। যেহেতু পর্যবেক্ষণ-শক্তিই অনুসন্ধিৎসা ও চিন্তাশক্তির প্রাখর্য ঘটায় এবং মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতি বাড়িয়ে দেয়, সেজন্যে বিজ্ঞানশিক্ষার কথাও এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে। তৃতীয়তঃ শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে বৃত্তি শিক্ষা ছিল 'হরিজন শ্রেণীর' তাকে মহাত্মাজী ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় স্থান দিয়েছেন। গ্রামসেবাই ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার মূল নীতি। বৃত্তিশিক্ষার সঙ্গে যদি কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকে, তা'হলে শিক্ষাকে নিতান্তই শুষ্ক রসহীন বলে প্রতীতি হয়। তাই এ বৃত্তিশিক্ষাকে সার্থক করার প্রয়াসে নঈ-তালিমে গ্রামকে পরম ঈপ্সিত বস্তু বলে' আখ্যায়িত করা হয়েছে। নানাবিধ হাতের কাজের সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ও প্রাত্যহিক জীবনের নিকটসম্পর্ক থাকায় পাঠ্যবিষয় ও বৃত্তি উভয়ই আকর্ষণীয় হয়। এতে এক দিকে যেমন কর্মদক্ষতা বাড়ে, অপর দিকে তেমনি কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজনটুকুও সাধিত হয়। চতুর্থঃ, নঈ-তালিমে বিশ্বভারতীরই মতো চারুকলাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে। পঞ্চমতঃ, অঙ্ককষা, বাগানের কাজ, ব্যায়াম, দেহ-চালনা—মোটের উপর সব-কিছুর যথাযথ ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা দেবার কথা বলা হয়েছে। ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার মূলনীতি ধর্ম ও গ্রামসেবা।

ওয়ার্ধা-প্রস্তাব বা নঈ-তালিম

শক্তি, প্রবণতা ও প্রয়োজন—শিক্ষার এই ত্রিমুখী দিকের কথা ভেবে শিক্ষাব্যবস্থা অবৈতনিক করা, তথা সর্বজনীন করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। সর্বজনীন ভিত্তিতে শিক্ষা-প্রবর্তনের সরকারী নীতি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্বর্গতঃ শিক্ষামন্ত্রী আবুলকালাম আজাদ বলেছিলেন যে, তাঁর নীতি মূলতঃ সার্জেণ্ট-পরিকল্পনারই নতুন রূপ। তবে ভারতের মতো বিস্তৃত ভূখণ্ডে ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা ও সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা উভয়েরই সামঞ্জস্য-সাধনের প্রয়োজন

শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব

আছে। উন্নততর যুক্তিবাদিতা ও সমালোচকমন সৃষ্টি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিজের দাবিই শুধু জোর করে' কায়েম করার বদলে নিজেকে নাগরিক হিসেবে আপন রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যবোধে সজাগ করার ভিত্তিতেই গণতন্ত্র নির্ভরশীল। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতামূলক মনোভাব, শৃঙ্খলিত ব্যক্তিজীবন, সাধারণের হিতকর কার্য ইত্যাদিতে যে কোন অধিবাসীর যোগদানের জন্যে বুদ্ধিবাদী শিক্ষার দিকে যত্নশীল হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ভারতীয় সংবিধান-অনুসারে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাধারার প্রবর্তন আগামী ১৯৬০ সালের মধ্যেই অবশ্য কর্তব্য। গতানুগতিক মামুলী প্রথায় শিক্ষাদানের পরিবর্তে অত্যাবশ্যকীয় নতুনধারার প্রবর্তনে প্রয়াসী বর্তমান সরকার। মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের দিকেও সকলে যত্নশীল। ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কারের পরিকল্পনা শিক্ষার ইতিহাসে বিপ্লবাত্মক প্রগতিপন্থী সুব্যবস্থা। ভারত সরকার ব্রিটিশ সরকারের মতোই শিক্ষাকে উক্ত বিষয়ক মন্ত্রিসভার হাতেই রেখেছেন। উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারেরই দায়িত্ব।

শিক্ষা ও ভারতীয় সংবিধান

প্রাথমিক স্কুলগুলিকে কিভাবে চারুশিক্ষায় ও কলাশিক্ষায় সমন্বিত করা যায় বর্তমানে সরকারের এটাই প্রধান বিচার্য সামগ্রী। এ বিষয়ে 'সর্ব-ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা-পরিষদ' গভীর আলোচনার বিষয়। এঁরা নির্ধারণ সংসদের (Assessment Committee) প্রস্তাব সর্বতো ভাবে মেনে নিয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেল ১৯৫১-৫২ সালের ২,১৫,৩৬৬ প্রাথমিক (প্রাক্-প্রাথমিক সহ) ও ৩৩,০৫১ বুনিয়াদি স্কুলের সংখ্যা ১৯৫৬-৫৭ সালে ২,৮৮,০৯১ প্রাথমিক (প্রাক্-প্রাথমিক সহ) ও ৪৬,৮২ বুনিয়াদী স্কুলে পরিণত হয়েছে। 'সরকারী ব্যয় প্রথম শ্রেণীর স্কুলে হয়েছে ৫৭·৬১ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুলে ৯·০৬ কোটি টাকা। ১৯৩৭ সালে ৩১শে জুলা গান্ধীজী 'হরিজনে' বলেন যে, অনুন্নত ভারতীয় জনগণকে আত্ম-নির্ভরশীল করে তোলার জন্যে চারুশিল্প শিক্ষা কারুশিল্প শিক্ষা, এবং সাধারণ জ্ঞানার্জন প্রয়োজন শুধু অক্ষর-জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য না রেখে যাতে ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় তা দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। ফলে সেই বছরেব ডক্টর জাকীর হোসেনের নেতৃত্বে একদ শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাবিদের মিলিত বৈঠকে শিক্ষা-বিষয়ক একটি খসড়া আইনে পাণ্ডুলিপি প্রস্তাবিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই প্রস্তাব অনুমোদন করার প ওয়ার্ধাতে প্রথম বুনিয়াদী বিদ্যালয় (Basic school) স্থাপিত হয়। অতঃপর আর হয় ১৯৩৯ সালে প্রথম বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্মেলন।

প্রাথমিক শিক্ষা

১৯৫৩ সালের ২৮শে আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত মুদালিয়র-কমিশনে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্তীকৃত এক বিবরণে জানা যায় যে, বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা একদেশদর্শী। শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়েরই আধিপত্য বেশি। ছাত্রদের ইচ্ছা- ও ঔৎসুক্য-পূরণশীল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সুযোগের খুবই অভাব। তাই কমিশন কৃষিবিদ্যালয়, বাণিজ্যবিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয় ও পল্লীবিদ্যালয় ইত্যাদির পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করেন। যদিও বৃত্তি-নির্বাচনে স্বেচ্ছাচারিতা ছাত্র-ছাত্রীদের শক্তির অপচয় ঘটায়, তথাপি একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ইচ্ছামতো বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা এদেশে অতি অল্পই। ২৫০ পৃষ্ঠা ও ১৬টি পরিচ্ছেদ-সংবলিত কমিটির বিবরণীতে আরও জানা যায় যে, কমিশন মধ্যশিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি অপসারণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি সংস্কারমূলক প্রস্তাব দেন— প্রকৃত শিক্ষক অন্বেষণ করা অধ্যাপনার ক্ষেত্রে অচিরেই প্রয়োজন। তাছাড়া, (১) বহুমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করা; (২) আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া ও একটি অন্ততঃ বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা; (৩) পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের জন্যে একটি ক্ষমতাশালী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা, (৪) ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে শরীর-শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো; (৫) এ শিক্ষা যাতে জনসাধারণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে তার দিকে দৃষ্টিপাত করা; (৬) প্রতিযোগিতামূলক সর্বভারতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ফল ও কর্মকুশলতা বিবেচনা করা; (৭) ছাত্রদের বিষয়-নির্বাচনে উপদেশ দেওয়া ও সহায়তা করা; (৮) অধিক পরিমাণে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা; (৯) পারিবারিক বিজ্ঞান-শিক্ষাকে প্রতিটি ছাত্রীর কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা ও বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদিই—এই কমিশনের মূলনীতি। এতে লাইব্রেরী-ব্যবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষকদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ইত্যাদি উন্নতি করার প্রস্তাবও রয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

১৯৫৭ সালে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ শিক্ষাসচিবদের এক বৈঠকে বলেন যে, 'বুনিয়াদী ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা গঠিত না হলে জনবহুল ভারতের শিক্ষা-সমস্যা সমাধান অসম্ভব।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, অধুনাপ্রবর্তিত সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় পূর্বোক্ত দুই পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি প্রথমতঃ সর্বার্থসাধক, দ্বিতীয়তঃ মানবতা-সম্পন্ন। বর্তমানে সমগ্র ভারত-ভূখণ্ডে মাত্র ১০,৭৩৮টি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ১২,১২৫। এই পরিকল্পনাকালের মধ্যেই পশ্চিম বাংলায় ১,২০০ স্কুলে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার কথা আছে। তারপর তিন বৎসরের ডিগ্রীকোর্স প্রবর্তিত করা হবে। তাতে নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান হবে উন্নীত। সাধারণ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে-কিছু কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা (Technological bias) করা হবে, তা নিঃসন্দেহে

পরিকল্পনার প্রগতিশীল প্রয়োজনবোধেরই পরিচায়ক। তবে এ-উপায়ে দেশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া অর্থাৎ অনেক ছাত্রের পক্ষে এ-শিক্ষাকে অসম্ভব করে' তোলা কি রকম হতাশাব্যঞ্জক! নিরক্ষরতা দূর করার নামে এই পদ্ধতিতে নিরক্ষরতাকে বাড়িয়ে তোলার গোপন দুরভিসন্ধি কি ভারতের সমৃদ্ধির পরিচায়ক? এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালী একেবারে সংকল্পে অটল। অধিকন্তু যতদিন দেশের সমস্ত বিদ্যালয় সর্বার্থসাধক কলেজিয়েট না হয়, ততদিন এই পরিকল্পনার সুফল পাওয়া যাবে না। মুদালিয়র-কমিটির প্রস্তাবিত পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচনী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অক্ষমতার দরুণ আজ মধ্যমিক-পর্ষৎএর অধীনস্থ অনেক বিদ্যালয়ে নানারকম অপাঠ্য পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হয়। এই প্রস্তাবটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে ইদানীং সংবাদপত্রে প্রচুর সমালোচনাও বেরুচ্ছে।

যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থারও পরিবর্তন নিতান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর ভারত সরকার এ-বিষয়ে গভীর গবেষণা করেন।

উচ্চ শিক্ষা

তদনুযায়ী ডক্টর ভগবন্তমের নেতৃত্বে একদল শিক্ষাবিদ্ সরকার কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের ক্রমপ্রসারিত শিক্ষা-ব্যবস্থা অনুধাবন করার জন্যে প্রেরিত হন। ১৯৫৭ সালে ঐ কমিটি রিপোর্ট পেশ করেন। উক্ত কমিটি নিম্ন-স্নাতকের প্রথম দু'বছরে সাধারণ, সামাজিক ও মানবতা শিক্ষা দিবার সুপারিশ করেন। অন্যথা স্নাতক-বিভাগে হপ্তায় ছয় ঘণ্টা গণশিক্ষা প্রবর্তনের কথাও বলা হয়েছে। ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত যুক্তরাষ্ট্রের ন'জন শিক্ষাকুশলীর মতও অনুরূপ। ভারত সরকার এই শিক্ষাপ্রচারে ইদানীং অতি-তৎপর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় সংস্কার, সংশোধন, প্রস্তাব ইত্যাদির ক্ষমতাপ্রাপ্ত ১৯৫৩ সালে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (U. G. C.) ১৯৫৬ সালে

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

ভারতীয় আইনসভা কর্তৃক একক-আইনগত ক্ষমতাশালী সংস্থা বলে' পরিগণিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও শিক্ষা-সুযোগের সমন্বয় এবং শিক্ষামূলক গবেষণা এই সংসদেরই তত্ত্বাবধানে: (১) কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে জনসাধারণের অর্থ থেকে সাহায্যদান ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দান, (২) কোন উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে সরকার-অভিলষিত ঋণমঞ্জুরের কথা সরকারের নিকট অনুমোদনযোগ্য কিনা তা ঘোষণা করা, (৩) সরকার-বর্ণিত কোন সমস্যার কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উল্লেখ করা—এই কমিশনের বিশেষ কর্মসূচী। চল্‌তি বছরের শিক্ষাবিষয়ক সমস্ত সংশোধনী নীতি, ছাত্র-ছাত্রী-ভর্তির বিষয়ে যথেষ্ট বাধ্যবাধকতা, কলেজের পড়ুয়াদের বেতনের হারবৃদ্ধি ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের মাহিনা-বৃদ্ধি এবং স্থিরীকরণও মঞ্জুরী কমিশনের কর্মসূচীর অন্তর্গত।

বর্তমান ভারতের শিল্পজাগরণের যুগে শিল্প ও বিজ্ঞান-শিক্ষায় অনুন্নত ভারত-বাসীদের জন্যে বহুল পরিমাণে শিল্প ও কারিগরি কলেজ বা বিদ্যালয় স্থাপনের অনেক অবকাশ আছে। ভারতের পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্যে ১৯৬০-৬১ সালে প্রয়োজনীয় ১,৮৮০ স্নাতক কারিগর ও ৮,০০০ ডিপ্লোমাধারী কারিগরের এখনও ঘাট্‌তি। এই অভাব পূরণের জন্যে অবিলম্বে ১৮টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব উঠেছে 'ইঞ্জিনিয়ারিং পারসোনেল কমিটি'র এক সম্মেলনে। সরকার এ-বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে' স্থির করেছেন যে, বর্তমানের এই সমস্যাপূর্ণ মুহূর্তে, দেশে যে কয়েকটি কারিগরি শিক্ষাশিবির ও শিক্ষাকেন্দ্র আছে তাতে যাতে অধিকসংখ্যক ছাত্র ভর্তি করা হয় ও তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়, তার জন্যে কলেজে ও স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বাড়াতে হবে। এরূপ আশা করা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষাশেষি কারিগরি বিদ্যালয়সমূহে ডিগ্রী-পাঠক্রমে ১৩,০০০ পড়ুয়া এবং ডিপ্লোমা-পাঠক্রমে ২৪,০০০ পড়ুয়া ভর্তি করা সম্ভব হবে। 'সর্বভারতীয় কারিগরি শিক্ষাসংসদ সর্বপ্রকার কারিগরি শিক্ষার উন্নতিকল্পে সর্ব-শিল্প ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী প্রতিনিধি-সমৃদ্ধ একটি কারিগরি-শিক্ষা-বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন।

কারিগরি শিক্ষা

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে' ধাপে ধাপে নবীনতা প্রদানে, শিক্ষক শিক্ষিকা-সম্প্রদায়কে আরও শিক্ষালাভের সুবিধা-দানে, এবং স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতিকল্পে পরিকল্পনা-কমিশনের প্রস্তাব ও গৃহীত কার্যাবলী প্রতিটি নরনারীর বুকে আবার আশার বান ডেকে আনে। ভারতের অনুন্নত ও অশিক্ষিত অঞ্চলকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে প্রদীপ্ত করার জন্যে আজ ইউনেস্কোও প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে চলেছেন। কলম্বো পরিকল্পনার সূত্র ধরে' আজ ভারতবাসী উচ্চ শিক্ষার্থে দেশবিদেশে যাবার প্রচুর সুযোগ পাচ্ছে। তারা আবার নবীনতার —নতুন জীবনের—মশাল হাতে নিয়ে আবার উদ্ভাসিত করে' তুলবে রামায়ণ-মহাভারত, সর্বোপরি বেদ-বেদান্তের জন্মভূমি ভারতকে।

পরিকল্পনা ও শিক্ষা

অধ্যাপক-উপমন্ত্রী হুমায়ুন কবীরের লেখা 'ছাত্র-অসন্তোষ ও প্রতিকার' নামে গবেষণা-মূলক মনোজ্ঞ প্রবন্ধটি শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারকল্পে বেশ সক্রিয় ও প্রতিশ্রুতিবহনকারী। তাঁর মতে, ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করার পর তাদের মানসিকতার পরিবর্তন-সাধনে সচেষ্ট হওয়াই প্রকৃষ্ট নীতি তাছাড়া, ছাত্রদের শিক্ষার মান উন্নয়নকল্পে রবার্ট ব্রিজেসের বা বিশ্বভারতী ও শান্তি-নিকেতনের আদর্শে আবাসিক শিক্ষা দেওয়ার প্রথাই সর্বোৎকৃষ্ট। সর্বদা পাঠ্য-পরিবেশে আত্মলীন থাকায় ও পরস্পরের মধ্যে শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদিতে নিহিত আছে উন্নত শিক্ষার সংস্কার। সর্বোপরি কেরালার মতো, মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে সব

উপসংহার

ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ও আয়ের একমাত্র পথ, সে-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সরকারের পক্ষে একান্ত কর্তব্য তা নইলে শিক্ষা বা পড়ুয়াদিগের মানসিকতার দিকে আদৌ দৃষ্টিদান সম্ভব নয় এবং নিজেদের স্বার্থে বিদ্যায়তনের মালিকপক্ষ আদৌ এই পরিকল্পনা গ্রহণে সম্মত হবেন না। মোটের উপর, সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সতর্ক তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক জীবনগঠন প্রয়োজন।

পাকিস্তানের শিক্ষা-ব্যবস্থা পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল সরকারের উপরে ন্যস্ত। উভয় অঞ্চলেরই নিজ নিজ শিক্ষামন্ত্রী আছে। বাওয়ালপুর, খয়েরপুর, সোয়াট্, কালাত ও অপরাপর দেশীয় রাজ্যগুলিতে শিক্ষা-বিভাগ বিদ্যমান। বালুচিস্থান ও উপজাতীয় এলাকা কেন্দ্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার অধীন। পাকিস্তানের রাজধানী করাচী শহরের শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে চীফ্ কমিশনারের হাতে রয়েছে। পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলকে শিক্ষা-বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, উভয় অঞ্চল কর্তৃক সম্পাদিত শিক্ষাকর্মের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা ও পুরাপুরি তদারক করা—এটাই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, উভয় সরকারই স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ্‌গণের কাছে উপদেশ নির্দেশাদি নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করবার জন্যে 'মন্ত্রণা-পরিষদ' ও 'পরামর্শদানকারী পরিষদ গঠন করেছেন। 'কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরামর্শদানকারী বোর্ড', 'আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড', 'কাউন্সিল অব্ টেক্‌নিক্যাল এডুকেশন'—এই প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক বিহিত বিধানের বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিবিধ অভাব অভিযোগের খবর নিয়ে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সাহায্যের অনুমোদন করবার জন্যে 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন'ও নিযুক্ত হয়েছে। আজাদী পাইবার অনতিকাল-মধ্যেই পাকিস্তান 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' ( UNO ) ও তাঁর 'শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-সংঘে'র ( UNESCO ) সদস্য হয়েছে। আন্তর্জাতিক 'শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-সংঘে'র সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্যে পাকিস্তানে 'জাতীয় কমিশন'ও (National Commission) গঠিত হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানদ্বয় পাকিস্তানের শিক্ষাসংস্কারের ব্যাপারে অনেকখানি প্রভাব সংক্রামিত করে' থাকে। শিক্ষা-ব্যাপারে সামগ্রিক উন্নতি করবার মানসে পাকিস্তানে যে 'ষষ্ঠ বার্ষিক পরিকল্পনা' গৃহীত হয়েছে, তা এই দেশকে অদূর ভবিষ্যতে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, বোধে-বুদ্ধিতে যে প্রকৃতই গরীয়ান মহীয়ান করে তুলবে, এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

পাকিস্তানের শিক্ষা-সংস্কারের গতি-প্রকৃতি

# আমাদের পরীক্ষা-পদ্ধতি

বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেক ইংরাজি শিক্ষা-সংস্কারক এদেশের পরীক্ষা নেবার অব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' অতীব মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁরা বারংবার একথা বলে গেছেন যে, এদেশে পরীক্ষা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের বেড়া ডিঙ্গোবার এবং ডিগ্রী পাইয়ে দেবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত। কিন্তু সত্যিকারের বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার, বাস্তবের রূঢ়তাকে ভেঙ্গে খান্ খান্ করে দেবার মতো কোন শিক্ষাই দেওয়া হয় না এদেশে।

সূচনা

শিক্ষাবিদ্ ও সমাজবিদ্দের মতে, শিক্ষার ধারা এমন হওয়া উচিত যা মানুষের মনের দিগন্তকে করে প্রসারিত। শিক্ষা মানুষের অজ্ঞ মানসিকতাকে যুক্তিবাদিতার নৈকট্যে করে তোলে মহীয়ান্। অতঃপর শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য – উন্নত চিন্তাবৃত্তির আশ্রয় করার মনোভাব জাগিয়ে সব অহংকার সব কুসংস্কার যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করার ঈপ্সা যোগানো। এই যদি হয় শিক্ষার আদর্শ, তা'হলে মানুষের জীবনের সঙ্গে এই শিক্ষার মৌলিক সমন্বয় ও প্রত্যক্ষ যোগসূত্র সংস্থাপনের মানসে পরীক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার সংযোগ ঘটানোর অপরিহার্যতা আদৌ অস্বীকার করা চলে না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

আমাদের দেশে যে-সব উপায়ে পরীক্ষা গৃহীত হয় তাদের প্রত্যেকটির বিশদ আলোচনা করে' এ-প্রতীতি জাগা স্বাভাবিক যে, ভাবী জীবনের উপকরণ হিসেবে গ্রাহ্য এই শিক্ষাটির সঙ্গে কর্মমুখর জাগতিক জীবনের আদর্শগত বা ভাবগত কোন সম্প্রীতি পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথ একথা অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতা ছিল বলে শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর শিক্ষা ও পরীক্ষা-পদ্ধতি অধিকতর পরিমাণে কার্যকরী। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা বা জ্ঞানের পরিচয় ও মান যাচাই করার জন্যে বছরের শেষে আড়ম্বর করে' পরীক্ষা নিয়ে প্রশ্নপত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের (important questions) উত্তর পেয়ে যে-সব শিক্ষক-শিক্ষিকা আনন্দের আবেগে ডগমগ হয়ে ওঠেন তাঁদের বোধ করি মনেও জাগে না যে, পরীক্ষার অর্থ পড়ুয়াদের কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুতির পরীক্ষা অর্থাৎ কর্মজীবনের জন্যে সে কতটা উপযুক্ত তারই বিচার করা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গুরুতর ত্রুটি রয়েছে শুধু-পাঠ্য পুস্তকের পরীক্ষা নেবার প্রচলিত রীতিতে। তাই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, এম. এ. ডিগ্রীও পেয়ে প্রতিটি মানুষ দেখে যে ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে এ-শিক্ষার কোনই মূল্য নেই। আর এই জন্যেই তারা শেষ অবধি অনন্যোপায় হয়ে ইস্কুলমাষ্টারী কেরানী-গিরিকেই আঁকড়িয়ে ধরে। অতএব, এটাই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত যে, আমাদের

প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি

কর্মজীবনের বা ব্যবহারিক জীবনের প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার কোন মূল্য নেই। কারণ,—কর্ম-জীবনের সঙ্গে এর যোগাযোগ অত্যল্প।

চীনদেশেই পরীক্ষাব্যবস্থা প্রথম প্রচলিত হয়। তারপর এ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সমস্ত দেশে অনুভূত হয়। ক্রমে এ ব্যবস্থাকে পরিশোধিত করাও হয় পাশ্চাত্ত্যের সব দেশে। অতএব, কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষাকে শুধু পুঁথিকেন্দ্রিক না করে' যুক্তরাজ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে প্র্যাকটিক্যাল বা প্রয়োগাত্মক পরীক্ষার উপরেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সরকারী মহলের তদন্ত ও ফলাফল

আমাদের দেশে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর প্রথম ১৯৪৮ সালে রাধাকৃষ্ণন-কমিশন গঠিত হয় পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার-সাধনে। এই কমিশন প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির যে-সব ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন তার বিশেষ কয়েকটির আলোচনা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হ'ল: প্রথমতঃ, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষাকেন্দ্রিক। কোন রকমে পাশ করার জন্যে অলস পড়ুয়ারা আসে বিদ্যালয়ে। তদুপরি একই বিষয়ের উপর বছরের সব সময় পরীক্ষা করা হয়। পড়ুয়াদের নৈতিক ও ব্যক্তিত্বের উন্নতির কোন ব্যবস্থাই নেই এখানে। দ্বিতীয়তঃ, চাকরির ক্ষেত্রে এই একমাত্র বইএর পরীক্ষার উপরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। রাধাকৃষ্ণন-কমিশন তাই পৃথক্‌ভাবে রাষ্ট্রীয় পরীক্ষার উপর চাকরি-প্রাপ্তিকে নির্ভরশীল করার সুপারিশ করেছেন। বাহ্যিক পরীক্ষা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার উপর পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করা অতি মারাত্মক। কারণ,—যারা পরীক্ষায় খারাপ ফল করে, তাদের মাঝখান থেকে সময়ে অনেক গুণী বা জ্ঞানীরও সন্ধান মেলে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দক্ষতা নির্ভর করে পড়ুয়াদের ফলাফলের উপর। কিন্তু এ ব্যবস্থা অব্যবস্থারই নামান্তর—যেহেতু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনপ্রাণ দিয়ে খাটার জন্যে প্রয়োজনানুরূপ বেতন দেওয়া হয় না···তা ছাড়া, অধিক কিছু বলতে গেলে পড়ুয়ারা বলে—'একি পরীক্ষায় থাক্‌বে স্যার?' অথবা 'একি পরীক্ষায় থাক্‌বে দিদিমণি?' সর্বশেষে শ্রী এ. কে. দত্ত ও শ্রী ডি. এন. মুখার্জীর মতে, ভারতের পরীক্ষাপদ্ধতির উপর খুব বেশি নির্ভর করা চলে না, কারণ এটা যথাযথ নয়। তাছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মানসিক অশান্তির দরুণ অনেক সময় পড়ুয়াদের প্রতি সুবিচারও করা হয় না। তাই নম্বর দিয়ে পড়ুয়াদের মেধা-পরীক্ষার ব্যবস্থা বর্তমান যুগে নেহাৎ অচল।

এ সব ব্যবস্থা-অবলম্বনের ফলে সরকার শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্যে এক উপদেষ্টা-কমিটি গঠন করেন। এঁদের সংস্কারমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগের পূর্বে একথা স্মরণে রাখা উচিত যে, আমাদের পরীক্ষাব্যবস্থা যুগোচিত নয়।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য

এহেন শিক্ষা-ব্যবস্থার আর একটু বিস্তৃত আলোচনা ব্যতীত পরীক্ষা-পদ্ধতির সংকট উপলব্ধি করা যায় না। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাঁধাধরা একটা মূল্যবোধ বা বিচারবোধ আছে যা দিয়ে পরীক্ষা করা হয়—একটি পড়ুয়া কোন

নির্দিষ্ট সময়ে কতটা শিক্ষণীয় বিষয় হৃদয়ংগম করতে সমর্থ হয়েছে। এই পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা দ্বিমুখী : প্রথমতঃ, এতে বোঝা যায় পড়ুয়াটির বিদ্যার পরিধি কত বিস্তৃত দ্বিতীয়তঃ; একটা উত্তীর্ণ পড়ুয়া নিজের অস্তিত্ব এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ও বিশ্বাসী হয়ে সাংসারজীবনে প্রবেশ করার প্রেরণা ও উদ্যম পায়। একটি বিশেষ পরীক্ষায় যোগদান করায় স্পষ্টই বোঝা যায় তার আগামী জীবনের বৃত্তি-নির্বাচনের কথাটি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতীয় প্রশাসনিক পর ক্ষায় যারা প্রতিযোগিতা করে তাদের সুনিশ্চিত জীবন সম্বন্ধে কারোর সন্দেহের লেশমাত্র থাকে না। এ ধরণের লোক নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যবিহীন জীবনের লাগাম টেনে গতানুগতিকতার আশ্রয় করে না কোনদিন।

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে স্ব-প্রবর্তিত পরীক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত থাকে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কলেজের পরীক্ষার গুরুত্ব কিছুটা কম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষার মর্যাদা প্রতিটি পড়ুয়ার কাছে অধিক, যেহেতু এ-পরীক্ষার সাফল্য এনে দেয় এক মানপত্র। এভাবে নিজেকে যোগ্য প্রতিপন্ন করে' পড়ুয়ারা উচ্চশিক্ষা লাভে সমর্থ হয়। আর যারা কর্মজীবনেই নিজেদের ডুবিয়ে দিতে চায় তারা সুচিন্তিত পথে ক্ষমতাসাপেক্ষ বিশিষ্ট কর্মধারা বেছে নেয়। তারপর ছোটে অবিরাম গতিতে…জীবনে পায় পরিপূর্ণ শান্তি, অপরিমেয় আনন্দ। তথাপি একথা কার অজ্ঞাত যে, আমরা যা-শিখি তা দায়ে পড়ে শিখি আর যা শিখতে চাই তা শেখার পথে আসে অনেক বিঘ্ন—অনেক অন্তরায়!

পরীক্ষা

তুলনামূলক পর্যালোচনাশেষে ভেবে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না যে, একই বিষয় অধ্যয়ন করার পদ্ধতি এদেশে এক রকম আর ওদেশে অন্য ধরণের। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশের পরীক্ষাপদ্ধতির যেন তুলনাই করা চলে না। পৃথিবীর প্রগতিবাদী ও উন্নতিশীল অপরাপর দেশে পড়ুয়ার সারা বছরের কাজ ও অগ্রগতির তালিকা করা হয় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এ-সব বিষয়ে যথেষ্ট যত্ন নিয়ে—সমগ্র বিবরণী অনুধাবন করে—তার ফলাফল ও কৃতিত্বের চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাই আমাদের দেশের পড়ুয়াদের মতো পরীক্ষার দু'মাস আগে থেকে বাছাই-করা সম্ভাব্য (suggested) প্রশ্নগুলোর উত্তর কণ্ঠস্থ করে পরীক্ষামণ্ডপে বরাত ঠুকে সাফল্য অর্জন করার দুঃসাহসিক উদ্যম পাশ্চাত্ত্য দেশে খুব কমই দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভারতের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে প্রথমোক্ত ব্যবস্থা বিরল। ইদানীং কয়েকটি মিশনারী স্কুল ও কয়েকটি কারিগরি বিদ্যালয়ে এ-নিয়ম প্রচলিত করার উৎসাহ প্রকাশ করেছেন শিক্ষাব্রতীরা। উদাহরণস্বরূপ 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট্ অব্ টেক্‌নোলজি'র কথা বিনা দ্বিধায় উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, আমাদের দেশের বৃহদাকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির

আমাদের দেশের পরীক্ষাপদ্ধতি ও পাশ্চাত্ত্যের পরীক্ষাপদ্ধতি

পক্ষে হাজারো হাজারো পড়ুয়ার জন্যে এ-ধরণের নিয়ম করা সম্ভব নয়। এটা নিশ্চয় একটা বিরাট্ অক্ষমতা। শত বাধাবিপত্তি-সত্ত্বেও এ-ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন না-করা বা শুধু বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া ছাড়া পড়ুয়াদের দৈনন্দিন উন্নতির কোন একটা তালিকার ব্যবস্থা করে' বৎসরের শেষে সেগুলিকে পড়ুয়ার মেধাবুদ্ধির পরিচায়ক হিসেবে ধরে নেবার এই যে অব্যবস্থা—ইহা প্রকৃতই অন্যায়। সর্বোপরি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে উপাচার্য-অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধান্ত বলেছেন যে, পাশ্চাত্ত্য-দেশগুলিতে প্রশ্নের উত্তরের মানের দিকে দৃষ্টি রেখে পড়ুয়াদের মেধা ও জ্ঞানার্জনের মাপকাঠি নির্ধারিত হয়—আমাদের দেশের মতো পড়ুয়াকে সর্ব বিষয়ের সর্ব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না। এতে করে পড়ুয়াটির সৃজনীশক্তি ও একটি বিষয় সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্যের উৎকৃষ্ট বিচার করা সম্ভব হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হরেক রকম বিষয় পাঠ করার রেওয়াজ—সমস্ত প্রশ্নের উত্তর না দিলে অকৃতকার্যতার সম্ভাবনা—শিক্ষা ও পরীক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়েছে প্রতি পদে। অধিকন্তু, আমাদের পড়ুয়াদের ডিগ্রীর প্রতি মোহ অধিক। তারা মনে করে ডিগ্রী পাওয়াটাই পরীক্ষার মূলমন্ত্র। তাই পরীক্ষা ক'রে এদেশের পড়ুয়াদের জ্ঞানের ব্যাপকতা বা তাতে করে সম্যক্ মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

উপরে বর্ণিত ব্যবস্থার ফলে এদেশে পরীক্ষায় পাশ করাটা নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির পড়ুয়ার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে অনেক ভালো পড়ুয়া এই পরীক্ষায় খারাপ ফলও করে। বার্ষিক পরীক্ষার প্রতি অনেক উত্তম ছেলে-মেয়ের মনোগত ভয় থাকে। যারা পরীক্ষামণ্ডপে গিয়ে দিশে-হারা হয়ে পড়ে বা যারা স্নায়ুবিকারী, তাদের পক্ষে একটা বিষয় সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ভালো ফললাভ বিফলতার বিষাদে অভিভূত হয়ে যায়। অথচ সে-বিষয়টি সম্বন্ধে ভালো ধারণা ও পড়াশুনা না থাকা সত্ত্বেও একটি রকবাজ চালাক ছেলে বুদ্ধিপ্রয়োগের ফলে পরীক্ষার পূর্বে কিছুদিন অধ্যয়ন করেও ভালো ফল পেয়ে গৌরবান্বিত হয়। আমাদের দেশের পরীক্ষাব্যবস্থা দিয়ে তাই জ্ঞানবিচার সম্ভব নয়।

সব অকৃতকার্যতা অজ্ঞানের পরিচয় নয়

মুখে মুখে প্রশ্ন করা এবং পড়ুয়াদের কাছ থেকে তার উত্তর আদায় করার ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটিযুক্ত। কথায় বলে, যারা ভালো বলে তারা ভালো লিখতে পারে না, এবং যারা ভালো লিখতে পারে তারা ভালো বলতে পারে না। অতএব, মৌখিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অথবা প্রশ্নটির যথাযথ উত্তর দেওয়া, মানুষ দেখলে যারা ভয় পায় বা জনসমক্ষে যারা আপন ক্ষমতার পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করে তাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠে। উক্ত কারণে কালিদাসের মতো মহাকবিও জনগণকে পশ্চাতে রেখে বক্তৃতা দিতে বাধ্য হতেন।

মৌখিক পরীক্ষার ত্রুটি

শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে কোন যুক্তি নেই। ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলি যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়নি বলে' উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে আগামী কয়েক বছর ইংরাজিরই মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। কিন্তু প্রাদেশিক ভাষাগুলির উন্নতি হলেই ইংরাজির প্রয়োজন যাবে চলে'। সত্যি কথা বলতে কি, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে যতদিন না হিন্দুস্থানী ভাষা এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রচালনার ক্ষেত্রে যতদিন না উর্দু-বাংলা ভাষা প্রকৃত রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করছে, ততদিন ইংরাজিকে রাষ্ট্রজীবন থেকে নির্বাসন দেওয়া অসম্ভব। শ্রীকে, এম্. মুন্সী ভারতীয় হিন্দী পরিষদের একাদশ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে বলেছেন, অত্যন্ত জেদের বশবর্তী হয়ে ইংরাজি ভাষা বর্জনের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলে হিন্দী ভাষার লাভ তো হবেই না পরন্তু ক্ষতি সুনিশ্চিত। ইংরাজি ভাষা বর্জনের ফলে জাতীয়তাবোধ অন্তর্হিত হবে, আঞ্চলিক মনোভাব জাগবে আর ভাষার ভিত্তিতে ভারত বহুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাই তাঁর মতে, দ্রুত ইংরাজি ভাষাবর্জনের কথা অতীব ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। স্বাজাত্যকরণের মত্ততায় বিভ্রান্ত হয়ে আমরা যদি এখুনি ইংরাজি ভাষাকে হটিয়ে দিতে যাই, তা'হলে আমাদের শিক্ষার অগ্রগতি হবে প্রতিহত। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের বিদ্বৎ-সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিটি প্রদেশের নিজস্ব ভাষায় যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের বই রচিত ও প্রকাশিত না হওয়া অবধি পুরনো ব্যবস্থার নড়চড় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার ফল আহরণ করে' ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে হলে সার্বভৌম ভাষা ইংরাজির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চলে না। আবার আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের একটি অন্যতম বাহন হিসেবে ইংরাজি ভাষার সাহায্য গ্রহণ সত্যই লাভজনক। বাংলা, মারাঠী তামিল, তেলেগু প্রভৃতি কোন ভাষা দিয়েই এ কাজ হবে না। এমন কি, হিন্দী এবং উর্দুও বিন্দুমাত্র সহায়ক হবে না। তাই বৃহত্তর জগৎ ও সর্বজাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানের নিমিত্ত দেশবিদেশে আনাগোনা ও আদানপ্রদানের নিমিত্ত ইংরাজি এখনও আমাদের বহু দিবস শিখতে হবে। কাজেই প্রত্যেক প্রদেশে মাতৃভাষা ব্যতিরেকে অপর ভাষা ইংরাজি শিক্ষাই সবচেয়ে লাভজনক। এতে করে' সর্ব-পাক্-ভারতীয় ও সর্বজাতিক প্রয়োজন অনায়াসেই নির্বাহিত হবে। কিন্তু ঐ অজুহাতে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সমর্থন করা যায় কি?

উপসংহার

সত্যি কথা বলতে কি, সব দিক থেকে বিচার করে' মনে হয়, ইংরাজি ভাষাকে ভারত ও পাকিস্তানের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে তো বটেই, রাষ্ট্রক্ষেত্র এবং ব্যবসায়ক্ষেত্র থেকেও দ্রুত অপসারিত করা বাঞ্ছনীয়। তা'হলে স্বাধীন রাজ্যদ্বয়ের বালক-বালিকা সহজেই মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে পারবে এবং বিদেশী ভাষা শিক্ষায় যে অনাবশ্যক শক্তির অপচয়

হয়, তাও হবে রুদ্ধ। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞদের জন্যেই ইংরাজি ভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইংরাজ একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হওয়ায় ইংরাজি ভাষার আন্তর্জাতিক মর্যাদা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। কাজেই, বিশেষজ্ঞদেরও হয়তো-বা আন্তর্জাতিক জ্ঞান আহরণের জন্যে ইংরাজি ভাষাকে ত্যাগ করে' অন্য ভাষার শরণ নিতেও হ'তে পারে। সে যাই হোক, যতদিন না ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, ততদিন ইংরাজির আসন যে এই স্বাধীন রাষ্ট্রদ্বয়ে অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে থাকবে, একথা নিঃসন্দেহ।

## সাংবাদিকতা ও আধুনিক জীবন

ইংরাজি 'জার্নালিজ্‌ম্' কথাটিকে আমরা বাংলায় বলি 'সাংবাদিকতা'। সাংবাদিকতার বিশেষ প্রবাহের মধ্যে অনেক শাখা-উপশাখার যে পল্লবিত বিস্তার আছে সেকথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। সংবাদপত্রের প্রকারভেদে সাংবাদিকতার রূপান্তর অত্যন্ত সহজে ধরা যায়। বাজারে আজকাল অজস্র পত্র-পত্রিকার ভিড়ে—এদের সমারোহের মধ্যে—বৈচিত্র্যের জয়জয়কার। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিষয়বস্তু ও উপজীব্য বিভিন্ন জাতের। দৈনিক সংবাদপত্রের রূপ ও স্বরূপ সম্পাদক ও সাংবাদিকদের হাতে কি ভাবে রূপান্তরিত হয়, সেকথা মুখ্য হ'লেও প্রাসঙ্গিক ভাবে অন্যান্য প্রকার সাংবাদিকতার আসল চেহারাও আমাদের এই আলোচনায় ধরা পড়ে।

ভূমিকা

বর্তমান কালের সভ্যতা তথা আধুনিক জীবনের অন্যতম প্রধান বাহন সংবাদপত্র। এমন এক শ্রেণীর লোক দেশে সৃষ্ট হয়েছে, যাদের প্রতিদিন সকালে চায়ের সঙ্গে দৈনিক পত্রিকা একখানা অবশ্যই চাই। দেশবিদেশের খবর জান্‌বার জন্যে সাধারণ অসাধারণ সকল মানুষেরই আগ্রহ দিনের পর দিন দ্রুত বেড়েই চলেছে। এ কেবল শহরের বেলাতেই নয়, গ্রামবাসীদের পক্ষেও সত্য। এখন আর দ্বৈপায়ন স্বাতন্ত্র্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কূপমণ্ডুকতায় টিকে থাক্‌বার দিন নেই। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর যেমন কর্মকাণ্ডের গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে, তেমনি মানুষের চিন্তার জগতেও এসেছে বিরাট্ যুগান্তর। সভ্যতা ও সমাজের বিবর্তনফলে আধুনিক জীবনের আসল রূপটি মানুষের চোখে যতই ধরা প'ড়ছে, সে ততই বেশি অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠ্‌ছে আরও জান্‌বার ও বুঝ্‌বার জন্যে।

সংবাদপত্র আধুনিক সভ্যতা তথা জীবনের বাহন

সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত গঠন করা হয়। প্রত্যেক দেশে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারের বহু পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন মতবাদ সংবাদপত্রেরই সাহায্যে প্রকাশ করে। অন্যান্য আরও অনেক উপায় থাকলেও রাজনৈতিক ব্যাপারে ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হ'তে হ'লে সংবাদপত্রের সাহায্য ও সহযোগিতা অপরিহার্য। সংবাদ-

জনমত-গঠনে সংবাদপত্র

পত্রের পাতায় পাতায় কালির আঁচড়ে যে সব সংবাদ বেরোয়, তাদের পরিবেশন-কৌশলই 'সাংবাদিকতা' নামে আখ্যাত। প্রতিটি পত্রিকার সংবাদ পরিবেশিত হয় সেই পত্রিকার আদর্শ ও স্বার্থানুযায়ী। সাংবাদিকতার বৈচিত্র্য তাই নগণ্য নয়।

ধনতান্ত্রিক প্রভাবে সাংবাদিকতা

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সংবাদপত্র মূলধনীদের পাশুপত অস্ত্র। মানুষের জাগ্রত চৈতন্যকে তারা এই সম্মোহন অস্ত্রে তন্দ্রাচ্ছন্ন ক'রতে চায় নিজেদের নিরঙ্কুশ অক্ষুণ্ণ আধিপত্য রাখবার জন্যে। এদের টাকার অভাব নেই; সুতরাং পত্রিকা-প্রকাশের আর্থিক প্রাচুর্য এদের কাছে তো খোলামকুচি। বড়োলোকদের স্বার্থের পরিপোষক হিসেবে যে সব পত্রিকার সৃষ্টি—সেখানে জনগণকে ধাপ্পা দেওয়াই সাংবাদিকতার মূল মন্ত্র। সাংবাদিকরা ভালো মানুষ, কি খারাপ মানুষ, সে বিচার সেখানে নেই। মাইনে-করা চাকর হিসেবে মালিকের স্বার্থের খবরদারী করাই তাদের প্রধান কাজ। ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের যথেচ্ছ অবকাশ সেখানে নেই। বেশির ভাগ সাংবাদিকের স্বাধীন কণ্ঠ সেখানে অবরুদ্ধ। কিন্তু সাংবাদিকতার মর্মকথাই তো হ'চ্ছে জনকল্যাণকে লক্ষ্য ক'রে সংবাদপত্রকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করা। সত্যি কথা ব'লতে কি, দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মালিকের সিন্দুকে থাকে গচ্ছিত। অতএব, সাংবাদিকতার আসল উদ্দেশ্য এখানে কারাবন্দিনী।

সাংবাদিকতায় মিথ্যাচার

ঐ সমস্ত ধনীপোষ্য কাগজে সাংবাদিকতার ধর্ম হচ্ছে ধনীর স্বার্থের রঙিন চশমা চোখে দিয়ে বাস্তব ঘটনার বিকৃত ও মিথ্যা প্রচার। আর সৎ এবং স্বাধীনচেতা সাংবাদিকের হয় সেখানে অগ্নিপরীক্ষা। হয় তাকে মালিকশ্রেণীর পায়ে আত্মবিসর্জন দিতে হয়—জনতার মঙ্গলামঙ্গলকে অগ্রাহ্য করে' মালিকের মনস্তুষ্টি করতে হয়, নয় বিদ্রোহ করে' এই নারকীয় ষড়যন্ত্রের বাইরে চলে' আস্‌তে হয়। আর্থিক দুরবস্থার চাপে যাদের অন্য কোন উপায় থাকে না, তারা বাধ্য হ'য়ে নিরুপায় ভাবে মালিকের পদসেবা করে, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে, এবং সাধারণ লোকের দুঃখবেদনার কথা অগ্রাহ্য করে' মুষ্টিমেয় বড়োলোকের প্রভাব-প্রতিপত্তির করে খবরদারী। দৃষ্টান্তরূপে 'রয়টার' বা যে কোন বড়ো সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচনা ক'রলেই এ সত্যটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সাংবাদিকতায় সত্যনিষ্ঠা

তবে দেশের লোকের মধ্যে সত্যকার রাজনৈতিক চেতনা ও দেশপ্রেমের উদ্বোধন ক'রবার জন্যে সত্য সংবাদ সরবরাহ করবার মতো পত্রিকারও অভাব হয় না কোন দিনই। ভারতের ও পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাসে সাংবাদিকতার এই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান। সাংবাদিকতা এখানে কেবলমাত্র জীবিকার্জনের পন্থা নয়। নিরলস দেশসেবিগণ মানুষের

মুক্তিসংগ্রামের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবেই একে ব্যবহার করেন এবং এখানে সাংবাদিকতা হয় সত্য ও ন্যায়ের বাহন। তবে এ ধরণের পত্রিকা ব্যবসায় ক'রবার উদ্দেশ্যকে সাহায্য করতে পারে না। কারণ,— মালিক এবং শাসকশ্রেণী একে সইতে গররাজি। টাকাওয়ালা মানুষের সমর্থন এর পিছনে না থাকায় জাঁক বেশি না থাকলেও মানুষের মনের উপর এদের প্রভাব অপরিসীম। এ হ'ল জনসাধারণের নিজস্ব বার্তাবহ—এর প্রাণভোমরা মানুষের মনের মণিকোঠায় থাকে সযত্নে লুকানো।

এ ছাড়া খেলাধূলা সিনেমা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাদের আসল কথাও হ'ল এই। যারা ব্যবসায়ী বুদ্ধির তাড়নায় পত্রিকা প্রকাশ করে, তাদের সাংবাদিকতা মিথ্যাচারের নামান্তর। মানুষকে প্রবঞ্চিত করাই তাদের ধর্ম এবং সাংবাদিকতা তাদের কাছে টাকা পিট্‌বার সস্তা উপায়মাত্র। এর অজস্র উদাহরণ আমরা পথে-ঘাটে ছড়ানো দেখতে পাই। মানুষের কতকগুলি দুষ্ট প্রবৃত্তিকে নাড়া দিয়ে সেই উত্তেজনার সুযোগ নেয় বেশির ভাগ যৌন-বিষয়ক পত্রিকা। এরা সাধু সাংবাদিকতার ছদ্মবেশে মানুষের ভালো ক'রবার আছিলায় চরম অকল্যাণই সাধন করে।

সাংবাদিকতায় কাপট্য

তবু সংবাদের পরিবেশনে কারচুপি থাকা সত্ত্বেও সাংবাদিকতা এ যুগের অন্যতম প্রধান আশ্রয়। মালিকানার আদর্শে এর রূপবদল ঘট্‌লেও সাংবাদিকতার দুর্ধার শক্তি অব স্বীকার্য। সত্যকার সাংবাদিকতা ঘটনাচক্রে যদিও অনেক সময় বিকৃতির পথ ধরে, তবু সেজন্য সাধারণ সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের শক্তিকে তুচ্ছ করা অযৌক্তিক। মানুষের সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সাংবাদিকতা ও আধুনিক জীবন ক্রমাগতই বিবর্তিত হয়ে চলেছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তিম দশা যতই আস্‌বে ঘনিয়ে, বন্দিনী সাংবাদিকতা ততই পাবে মুক্তির স্বাদ এবং জনকল্যাণে সাংবাদিকেরা নিজেদের সমগ্র শক্তি ততই ক'রবেন নিয়োজিত। তোষণবৃত্তিকে যে-সমাজ রেখেছে টিকিয়ে, সে-সমাজ সাংবাদিকতার মর্যাদা নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলবেই, এতে আর বিস্ময়ের কথা কি? কিন্তু এ ব্যবস্থাও তো চিরস্থায়ী নয়—সাংবাদিকতার বর্তমান চেহারার বদলও তাই ক্রমাভিব্যক্তির দিক থেকে অবশ্যম্ভাবী।

সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ

## বেতার ও বর্তমান জগৎ

কত অন্তহীন যুগ ধরে' প্রকৃতির নিরঙ্কুশ লালনে-তাড়নে মানুষ ধীরে ধীরে গড়ে' উঠেছে। সে যুগে প্রকৃতি ছিল স্বৈরিণী—মোনালিসার হাসির মতোই ছিল সে দুর্বোধ্য। মানুষ ছিল তার যথেচ্ছ রোষ ও দাক্ষিণ্যের ক্রীড়নকমাত্র। প্রকৃতির অনন্ত রহস্যের রত্নসম্পুট, তার প্রাণস্পন্দনের মর্মবাণী ছিল অনাবিষ্কৃত—মানুষ তাই প্রকৃতির এই স্বৈরাচারের

ভূমিকা

পাষাণস্তূপে সেদিন প্রমিথিয়ুসের মতোই মাথা খুঁড়ে মরেছিল। কিন্তু সে যুগ কবে গেছে কেটে? প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় বন্ধন ছিন্ন করে' মানুষ আজ জ্ঞানের দীপ্তিতে দেদীপ্যমান! বিজ্ঞানীর মর্মভেদী দৃষ্টির কাছে প্রকৃতি দিয়েছে ধরা। বন্দিনী নারীর মতোই তার অফুরন্ত রহস্য ধীরে ধীরে হচ্ছে আবিষ্কৃত। স্বৈরিণী প্রকৃতি আজ বৈজ্ঞানিকের নর্মসখী।

আবিষ্কারের ইতিহাস

বিদ্যুৎ আবিষ্কার বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাসে একটি প্রদীপ্ত কীর্তিস্তম্ভ। বন্দিনী বিদ্যুৎ তার ভ্রূবিলাসের চাতুর্য নিয়ে ধরা দিল বিজ্ঞানীর কাছে। ধরা পড়ল ঈথর ও ইলেকট্রনের চারুচরণের ছন্দ। বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স্ওয়েলের কাছে প্রকাশ পেল বৈদ্যুতিক তরঙ্গের স্বরূপ। আবিষ্কৃত হ'ল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন। বিশ্ববাসী তাই বিস্ময়ে হতবাক্। কিন্তু 'এহো নয়, আগে কহ আর'। দূরত্বের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা যখন ঘুচল, তখন তারের মধ্যস্থতার ব্যসন বিজ্ঞানী সইবেন কেন? শুরু হ'ল অতন্দ্র গবেষণা। 'শব্দ' জিনিসটি ঈথরের কম্পনসমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়! বিপুলা পৃথ্বীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এই ঈথরে সহজেই জলের তরঙ্গের মতো বৈদ্যুত চৌম্বক তরঙ্গ তোলা যায়। এই ঈথর-তরঙ্গকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে এবং বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে আবার শব্দ-তরঙ্গে পরিণত করার প্রচেষ্টাই একদিন রূপায়িত হ'ল বেতার আবিষ্কারের অকল্পনীয় সাফল্যে। বেতারকেন্দ্রের প্রেরকযন্ত্র ঈথরে তরঙ্গ সৃষ্টি করে; সেই তরঙ্গ এসে আঘাত করে গ্রাহকযন্ত্রে সংশ্লিষ্ট 'আকাশ-তারে'। লক্ষ যোজন দূরের সংগীত-মূর্ছনা, আবেগোচ্ছল কণ্ঠস্বরের অকুণ্ঠ অর্ঘ্য তথা আকাশবাণী এসে এমনি করেই করে আনন্দে অভিষিক্ত ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনির এই বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কর্তা বলে পরিচিত হলেও ফ্যারাডে, ম্যাক্স্ওয়েল, হার্ৎজ, ব্র্যালি, অলিভার লজ জগদীশচন্দ্র প্রমুখ জগদ্বরেণ্য বৈজ্ঞানিকগণও পথিকৃৎ পূর্বসূরী হিসাবে স্মরণীয়।

বেতারের প্রয়োজনীয়তা—
(১) আনন্দ-পরিবেশন

বেতার বিজ্ঞানীর এক অভাবনীয় আবিষ্কার। অশোকবনে বন্দিনী সীতার কুশল জানবার জন্যে আজকের রামচন্দ্র আর অঞ্জনানন্দকে সমুদ্রলঙ্ঘনে অনুরোধ করবে না। দূরকে করায় নিকট, পরকে করায় আপন, আনন্দের পরিবেশনে বেতারের এই তো বিস্ময়কর অবদান। বিংশ শতাব্দীর মানুষের এই জটিল সমস্যাপীড়িত, নিয়মের অক্টোপাসে নিগড়িত, কর্মক্লান্ত জীবনে বেতারের সংগীত, নাটক, নক্সা দেয় অমোঘ সঞ্জীবনী-পরশ। আপিস ও গৃহের অন্ধকূপে ক্ষয়িষ্ণু জীবনে বেতারের অবারিত বাতায়ন-পথে নির্ঝরিত হয় অসীমের সুরমূর্ছনা। দূরদূরান্তের সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশবাণী আমাদের হৃদয়ের সকল দুঃখজ্বালা করে বিদূরিত, গতানুগতিক জীবনের অন্ধ আবর্তন ত্যাগ করে' আত্মবিস্মৃত মানুষ আত্মচেতনার পায় সন্ধান।

কিন্তু বেতার শুধু আনন্দেরই পরিবেশক নয়। বেতারের কল্যাণ-পরশে মানবজীবনে

মঙ্গলের পথ হয়েছে প্রশস্ত। স্বাধীন দেশে বেতার আজ শিক্ষা ও জ্ঞান-বিতরণের দায়িত্ব নিয়েছে। নিরক্ষরতা দূর ক'রতে হলে শিক্ষায় চাই বেতারের উপযোগিতা।

(২) শিক্ষা ও জ্ঞানবিতরণ

পুঁথির শুক্‌নো পাতার অক্ষরে যে জ্ঞান মনকে স্পর্শ করতে পারে নি, আকাশবাণীর প্রযোজনা তাকে একেবারে অন্তরে দিয়েছে গেঁথে। গণশিক্ষার এই বাহনের কল্যাণে আজ দূরদূরান্তরের মনীষীর গবেষণার ফল আমরা ঘরে বসেই জানতে পারি। তাতে করে আমাদের শিক্ষা কুসংস্কার এবং একদেশদর্শিতা ত্যাগ করে' লাভ করতে পারে সার্থকসুন্দর সম্পূর্ণতা। দেশের কৃষক শ্রমিক ক্ষেতে-কারখানায় কর্মরত অবস্থাতেই সাধারণ ইতিহাস ভূগোল স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আকাশবাণীর মাধ্যমে প্রচুর জ্ঞানলাভ ক'রতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ কৌতূহল নিরসনের জন্যে বক্তৃতা, আলোচনা, সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ বেতারে হয়ে থাকে। শিশুমহল, ছাত্রমহল, মহিলামহলের জন্যেও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এমনি করে বেতারের মারফতে আকাশেই একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় গড়ে' তোলা যায়। বস্তুতঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদে বেতার-চালিত একটি আন্তর্জাতিক (আকাশ) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবও রয়েছে। তা ছাড়া, আকাশবাণী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে শুধু যে জ্ঞানের রাজ্যে শক্তির বৃথা অপচয় বন্ধ হবে তাই নয়, নব নব আবিষ্কারের পথে মনীষীদের জয়যাত্রাও হবে ত্বরান্বিত।

অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেও আকাশবাণী প্রতিদিন দেশে দেশে মানবের মঙ্গলের দ্বার উদ্ঘাটন ক'রছে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে

(৩) অর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনে বেতার

তো বটেই, সাধারণ ব্যবসায়ীর স্বল্পপরিসর কর্মক্ষেত্রেও বেতার আজ মানুষের সময় ও পরিশ্রম বাঁচিয়ে দূর-বিদেশের বাজার-দরের যথার্থ সংবাদ বহন করে' এনে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথ করেছে সুগম। রাষ্ট্রপরিচালনায় বেতার আজ কতখানি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে, তা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করলেই বুঝা যায়। প্রতিটি রাষ্ট্রই আজ স্বকীয় বেতারকেন্দ্রের ব্যবস্থা করেছে। এই রাষ্ট্রায়ত্ত বেতারকেন্দ্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ভাবাদর্শ জনগণের মনে সঞ্চারিত করা হয়। জনমত সৃষ্টি করার গুরু দায়িত্ব এই সমস্ত বেতারকেন্দ্রের উপরে ন্যস্ত। অবাঞ্ছিত বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনাশ করতে এর ক্ষমতাও অবিসংবাদিত। রাষ্ট্রের জনগণকে একাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করতে, রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন অকুণ্ঠচিত্তে পালন করাতে বেতার সদাজাগ্রত। সমাজসংস্কার কার্যেও বেতার আজ অগ্রণী। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অঙ্গে অঙ্গে যে দুরপনেয় কলঙ্কের স্বাক্ষর রয়েছে, তা মুছে ফেলার ব্রতও বেতার গ্রহণ করেছে। আকাশবাণী জাতিগত বর্ণগত বৈষম্য এবং

দেশগত দূরত্ব বিদূরিত করে' মানুষের সাথে মিলনের পথ দিয়েছে এগিয়ে। বেতারের এই সর্বতোমুখী কল্যাণ-সাধনায় বৈজ্ঞানিকের সাধনাও আজ তাই গৌরবমণ্ডিত।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ আমরা বেতারের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। বেতার নানাক্ষেত্রে বহু উপকার সাধন করে' থাক্‌লেও, বর্তমান জীবনের মর্মমূলে এর প্রতি মানুষকে আত্মনির্ভরশীলতা থেকে বঞ্চিত করেছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কথা আমরা বিস্মৃত হয়েছি—আমাদের পরমুখাপেক্ষী চিন্তাশক্তি আলস্যময় জড়তা লাভ করেছে।

বেতার পরিচালনায় অব্যবস্থার ফল

রণক্ষেত্রে আকাশবাণী হিংসার বিষবাষ্প উদগীরণের কাজেই নিযুক্ত। যে-বেতার সমুদ্রে বিপন্ন জাহাজের যাত্রীকে জানায় আশ্বাসের সংকেত, সেই বেতারই যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষযজ্ঞের পরিবেশ রচনা করে, মানুষের স্বার্থান্ধ কলহের অগ্নিতে যোগায় ইন্ধন। কোন কোন দেশে আবার আকাশবাণী জনগণের স্বাধীন চিন্তার স্রোতও করেছে অবরুদ্ধ, হয়েছে জনগণের নিষ্পেষণের এবং মিথ্যাপ্রচারের সুলভ বাহন। এই বেতার-পরিচালনেরই অব্যবস্থার ফলে হাল্‌কা সংগীত, কুরুচিপূর্ণ অভিনয় ও নক্‌সা জনগণের রসপিপাসা চরিতার্থ করবার প্রয়াস পায়।

আমাদের দেশ এখন স্বাধীন। বেতারের মঙ্গলময় সম্ভাবনা যাতে বাস্তবে রূপায়িত হয়, তার জন্য দেশে বেতারকেন্দ্রের আরও প্রসারণ প্রয়োজন। কারণ, বর্তমানে সারা ভারত জুড়ে মাত্র আটাশটি বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র রয়েছে। রেডিও ব্যবহারের দিক দিয়ে নিখিল বিশ্বে ভারতের স্থান তৃতীয়। ১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাস অবধি সমগ্র দেশে ১২,৯১,৮১২টি ঘরোয়া এবং ১,০৯,৬২৫টি অপর জাতীয় রেডিও-লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৭ সালের ৩রা অক্টোবর থেকে সাধারণ শ্রোতার কর্ণ ও মন পরিতৃপ্ত করবার জন্যে 'অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও' 'বিবিধ ভারতী' নামে এক নূতন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। এতে ভারতের সমস্ত বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত জনপ্রিয় ও হাল্‌কা গান, নক্‌সা, নাটিকা, আবৃত্তি প্রভৃতি কাজের দিনে প্রত্যহ সওয়া ছয় ঘণ্টা এবং রবিবারে ও ছুটির দিনে সাড়ে নয় ঘণ্টা করে' শোনানো হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজ বেতারকেন্দ্র থেকে এই অনুষ্ঠান যুগপৎ সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

'অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও'

কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, 'অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও'র অনুষ্ঠানে কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতই প্রায় অর্ধেক স্থান অধিকার করে রয়েছে। তাই—আকাশবাণীর কর্মসূচী যাতে সুপরিকল্পিত হয়, বেতারের সঙ্গে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তানায়কগণের নিবিড় সংযোগ যাতে থাকে, সেদিকে রাষ্ট্রপরিচালকগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত। আকাশবাণী যেদিন মানুষের

উপসংহার

দুর্বৃত্তির রাহুগ্রাসমুক্ত হয়ে কেবলমাত্র কর্ণেরই উপভোগের উপকরণ না হয়ে মানবের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে রত হবে, সর্বপ্রকার দূরত্ব ও ব্যবধানের অচলায়তন অপসারিত করে' বিশ্বকে মহামানবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত করবে, সেদিন বৈজ্ঞানিকের তপঃক্লিষ্ট সাধনা জগতে শান্তি ও মৈত্রীর মেদুর পরিমণ্ডল রচনা করে' এনে দেবে অটুট প্রশান্তি, অক্ষুণ্ণ সার্থকতা।

## চিত্রবাণীর ধারা ও ভবিষ্যৎ

একদা গ্যয়টে বলিয়াছিলেন, -"Theatre is a crucible of civilisation." চিত্রবাণী তথা সবাক্ চিত্র সম্পর্কেও এই মন্তব্যটি সমভাবে প্রযোজ্য। এক হিসাবে ইহাও বলা যায় যে, চিত্রবাণী সভ্য হইয়া থাকিবার মানদণ্ড-বিশেষ। তাই চিত্রবাণী প্রযোজক পরিচালকদের হাতে রহিয়াছে বিরাট্ দায়িত্ব; চিত্রবাণীর সমস্যা ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত নয়—জাতিগত প্রশ্ন। শিক্ষার দিক, সামাজিক দিক, অর্থনৈতিক দিক, রাষ্ট্রিক দিক ইত্যাদি সর্ব দিক হইতেই চিত্রবাণীর রহিয়াছে বিরাট্ সম্ভাবনা। আজ দেশীয় চিত্রনির্মাতাদিগকে এই বিরাট্ জাতীয় দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

ভূমিকা

আধুনিক বিদ্যালয়ে চিত্রবাণীর স্থান এবং সম্ভাব্য দান সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। য়ুরোপীয় এবং আমেরিকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে চলচ্চিত্র বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। জার্মানীর বিদ্যালয়গুলিতে চলচ্চিত্রের ব্যবহার যত বেশি হয়, পৃথিবীর আর কোন দেশে সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ। সোভিয়েৎ রাশিয়াও এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রণী। ইংলণ্ডে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান "British Film Institute" শিক্ষামূলক চিত্রের প্রচারবৃদ্ধিকল্পে সদাই সচেষ্ট লণ্ডনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে চলচ্চিত্র প্রদর্শন-ব্যাপারে শিক্ষাদানকল্পে "London Film School" নামে একটি শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। আধুনিক বিদ্যালয়ে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জীববিদ্যা প্রভৃতির শিক্ষা অত্যন্ত সরস ও সহজভাবে প্রদত্ত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের "G. B. Instructional Limited"-এর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জীববিদ্যা সম্পর্কিত চলচ্চিত্রগুলির কথা স্মরণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকার্যে, বিশেষতঃ বিজ্ঞানচর্চায়, চলচ্চিত্রের স্থান অপরিমেয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও চলচ্চিত্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিলাতী চলচ্চিত্রনির্মাতাগণ বৃত্তিমূলক তথা ব্যবসায়সংক্রান্ত চিত্রবাণী তুলিয়াছেন ও তুলিতেছেন। ঐ সমস্ত ছবি দেখিয়া দেশের ছাত্রেরা তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের পথ নির্ধারণ করিয়া থাকে। অথচ পাকিস্তান কেন, ভারতবর্ষেও যেখানে ১৯৫৭ সালের শেষাশেষি ৩,৫৫৫টি চলচ্চিত্র-প্রেক্ষাগৃহ, ৬৭টি ষ্টুডিয়ো, ২৫৭টি চলচ্চিত্রনির্মাতা কোম্পানী রহিয়াছে, সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে

শিক্ষায় চিত্রবাণীর স্থান ও দান

াকিস্তান, মালয়, ইন্দো-চীন, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্ম, পূর্ব-আফ্রিকা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, পশ্চিম এসীয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের বাজার আছে। কিন্তু নানা কারণে ইহা মোটেই আশানুরূপ নয়। তাই বোম্বাইয়ের চিত্রবাণী-প্রযোজক শ্রীআহলুওয়ালিয়ারের মতে, ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির জন্য তিনটি উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। প্রথমতঃ, ভাল ছবি তুলিতে হইলে "Film Finance Corporation" চালু থাকা প্রয়োজন। [অবশ্য ভারত-সরকার ২০ লক্ষ টাকা হইতে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রাথমিক মূলধন দিয়া এহেন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বৎসর হইতে ইহার কাজ শুরু হইবার কথা।] দ্বিতীয়তঃ, বিদেশে ভারতীয় চিত্রবাণীর বাজার করিয়া দিবার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা কাম্য। তৃতীয়তঃ, ভারতে যে সমস্ত বিদেশী ছবির প্রেক্ষাগৃহ আছে, সেগুলিকে একটা নির্দিষ্টসংখ্যক ভারতীয় সবাক্ চিত্র-প্রদর্শনে বাধ্য করিবার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। এ বিষয়ে দেশীয় সরকার একটি আইন প্রণয়ন করিলে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা খানিকটা সমুন্নত হইবে। অবশ্য বাংলা চিত্রবাণীর বিপত্তি নানা দিক দিয়া পরিলক্ষিত হয়। আজ মাদ্রাজে প্রায় আটশত ভ্রাম্যমাণ ছায়া-ছবি প্রদর্শিত হইতেছে, অথচ বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য পশ্চিম-বঙ্গ সরকার ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্রকে বিশেষ উৎসাহিত করিতেছেন না।

ভারতীয় চিত্রবাণী-শিল্পের উন্নতির উপায়

১৯৫৪ সাল হইতে ভারতীয় চিত্রবাণীর সৌন্দর্যগত ও কারিগরিমূলক মান বৃদ্ধিকল্পে ও শিক্ষা-সংস্কৃতিগত মূল্যায়নে দেশীয় সরকার যে বাৎসরিক পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। ১৯৫৮ সাল হইতে সর্বোৎকৃষ্ট ভারতীয় ফিচার ফিল্ম ও ডকুমেণ্টারী ফিল্মের জন্য রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ও প্রথমটির জন্য ২৫০০০টাকা, দ্বিতীয়টির ১৫০০০ টাকা নগদ; সর্বশ্রেষ্ঠ শিশু-চলচ্চিত্রের জন্য প্রধান মন্ত্রীর স্বর্ণপদক ও ২৫০০০ টাকা নগদ; সারা ভারতের ফিচার ফিল্ম, শিশু-চলচ্চিত্র ও ডকুমেণ্টারী ফিল্মের শ্রেণীগত দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে ১২৫০০, ১২৫০০ ও ২৫০০ নগদ টাকা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট ফিচার ফিল্মের জন্য রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদকাদি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, দুইটি করিয়া ভারতীয় ফিচার ফিল্ম এবং আঞ্চলিক ভাষাসমূহের ডকুমেণ্টারী ফিল্ম শিশু-চলচ্চিত্র ও ফিচার ফিল্মকেও ভারত সরকার অভিজ্ঞানপত্র দিতেছেন। সর্বোৎকৃষ্ট ভারতীয় ও আঞ্চলিক ফিচার ফিল্ম রূপে স্বীকৃত হওয়ায় রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ও রৌপ্যপদক দুইই পাইয়াছে ১৯৫৬ সালে শ্রীসত্যজিৎ রায় পরিচালিত বাংলা চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী', ১৯৫৭ সালে শ্রীতপন সিংহ পরিচালিত বাংলা চলচ্চিত্র 'কাবুলিওয়ালা', ১৯৫৮ সালে বোম্বাইয়ের রাজকমল কলামন্দির

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারব্যবস্থা ও বঙ্গীয় চলচ্চিত্র

প্রযোজিত হিন্দী চলচ্চিত্র 'দো আঁখে বার হাত' ও ১৯৫৯ সালে শ্রীদেবকীকুমার বসু পরিচালিত বাংলা চলচ্চিত্র 'সাগর-সংগমে'। অবশ্য শেষোক্ত বাণীচিত্রদ্বয় পঁচিশ হাজার টাকা নগদও পাইয়াছে। আবার ১৯৫৮ সালের বাণীচিত্র 'আঁধারে আলো'র ন্যায় অরোরা ফিল্ম করপোরেশন প্রযোজিত 'জলসাঘর' বাণীচিত্রটি ১৯৫৯ সালের বাংলায় সর্বোৎকৃষ্ট ফিচার ফিল্ম হিসাবে রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক ও সারা ভারতের দ্বিতীয় সর্বোত্তম ফিচার ফিল্ম রূপে সরকারী অভিজ্ঞানপত্র ও সাড়ে বারো হাজার টাকা নগদ পুরস্কার পাইয়াছে। ১৯৫৮ সালে বাংলা বাণীচিত্র 'জন্মতিথি'ও দ্বিতীয় সর্বোত্তম শিশু-চলচ্চিত্র রূপে সরকারী অভিজ্ঞানপত্র ও সাড়ে বারো হাজার টাকা নগদ পুরস্কার লাভ করিয়াছে; এছাড়া বাংলায় 'লৌহকপাট' চলচ্চিত্র দ্বিতীয় সর্বোত্তম ফিচার ফিল্ম এবং 'হারানো সুর' বাণীচিত্র তৃতীয় সর্বোত্তম ফিচার ফিল্ম রূপে অভিজ্ঞানপত্র পাইয়াছে। ১৯৫৯ সালে বাংলায় তৃতীয় সর্বোৎকৃষ্ট ফিচার ফিল্ম হিসাবে স্বাকৃতি পাইয়াছে অগ্রগামী প্রযোজিত 'ডাক-হরকরা' চলচ্চিত্রটি।

১৯১৩ সালের শ্রীডি. জি. ফাল্‌কে প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র 'হরিশ্চন্দ্র' প্রযোজনা করেন। অতঃপর ১৯৩১ সালে সবাক্ চিত্রের আবির্ভাবে চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হয়। ১৯৫৬ সালে ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় সবাক্ চিত্রশিল্পের রৌপ্য-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহার অনুষ্ঠানসূচীতে পূর্ববর্তী পঁচিশ বৎসরের মধ্যে প্রযোজিত কয়েকটি বিখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৬ সালে ভারত কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদান করে। একমাত্র চেকোশ্লোভাক্ চলচ্চিত্র উৎসবে 'ভারত-দর্শন' নামে রঙিন চলচ্চিত্রটি যুগ্ম দ্বিতীয় পুরস্কার পায়। তবে ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ১৯৫৭ সালে শিল্পগত সৌষ্ঠবসৃষ্টিতে, সভ্যতা-সংস্কৃতিমূলক অবধারণায় ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব বর্ধনে বাংলা চলচ্চিত্র 'অপরাজিতে'র দান ভেনিস্ চলচ্চিত্র-উৎসবে স্বীকৃত হওয়ায় উহার ভাগ্যে মিলিয়াছে সেণ্ট মার্কের সোনার সিংহ এবং ১৯৫৮ সালে সান ফ্রান্সিস্‌কোতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে ইহার পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় পুরস্কৃত হন। বাঙ্গালীর 'পথের পাঁচালী' পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে ১৯৫৮ সালে সান্ ফ্রান্সিস্‌কো উৎসবে এবং ১৯৫৯ সালে কানাডায় ব্যাঙ্কুবার-উৎসবে পুরস্কৃত হইয়াছে। ১৯৫৮ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে সর্বোৎকৃষ্ট গীতিবাদ্যের জন্য বাংলা 'কাবুলিওয়ালা' বিশেষ পুরস্কার লাভ করে এবং কাব্যভঙ্গীতে গভীর মানবিকতা-বোধ ফুটাইয়া তোলায় চেকোশ্লোভাকিয়ার কার্লভি ভ্যারীতে 'Great Grand Prix' নামে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায় 'জগতে রহো' হিন্দী চলচ্চিত্রটি এবং ভেনিসে অনুষ্ঠিত নবম

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসব ও ভারতীয় চিত্রবাণী

আন্তর্জাতিক শিশু-প্রদর্শনীতে ১৩ হইতে ১৬ বৎসর বয়সের উপযোগী অনবদ্য বিষয়-বস্তুর জন্য Children's Film Society প্রযোজিত হিন্দী চিত্র 'জলদীপ' প্রথম পুরস্কার পায়। ইহা ছাড়া, 'Gotam the Budhha', 'Magic Touch' 'Wonder of Work' ও 'Operation Khedda' নামীয় ডকুমেণ্টারী ফিল্মগুলি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবে অভিজ্ঞানপত্র, পদক, পুরস্কার প্রভৃতি লাভ করে। ১৯৫৭ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে 'দো আঁখে বারো হাত' একটি বিশেষ পুরস্কার লাভ করে এবং কার্‌লভি ভ্যারিতে 'Mother India-র প্রধান অভিনেত্রী শ্রীমতী নার্গিস অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য পুরস্কৃত হন। সে যাই হোক্‌, মোটের উপর বলা যায়, বাংলা চলচ্চিত্রই ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবাদিতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের উৎপাদকগণ নিখিল বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। চলচ্চিত্র উৎপাদন ও প্রদর্শনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যদি ঐ সুযোগের সম্যক সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে।

উপসংহার

ভারত-সরকার তথা বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের অবশ্য কর্তব্য সম্পর্কে চিত্র-উৎপাদকগণ অনেক সময় গালভরা উপদেশ নির্দেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারাও যে চিত্রের উৎকর্ষের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি না দিয়া নিছক পরিমাণের ও ব্যবসায়ের লাভের দিকে অতিরিক্ত দৃষ্টি দিতেছেন—একথাও ত অস্বীকার করা যায় না। ভারতীয় চিত্রবাণীশিল্প সংখ্যায় এবং পরিমাণে সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও উৎকর্ষ ও উপযোগিতার বিষয়ে আজিও সামগ্রিক ভাবে রহিয়াছে অতীব পশ্চাতে। ১৯৫৮ সালে যে ২৯৫টি ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎপাদিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ১৫০টি সামাজিক, ২৮টি অপরাধমূলক, ৪৫টি কল্পনা-মূলক (Fantasy), ৫টি ঐতিহাসিক, ৪টি জীবনবৃত্তান্তমূলক, ৩৭টি পৌরাণিক, ১৭টি কিংবদন্তীমূলক (Legendary), ৫টি ভক্তিমূলক ও মাত্র ৪টি শিশুবিষয়ক। একঘেয়ে সমাজবিষয়ক চলচ্চিত্র ১৯৫৭ সালের তুলনায় সংখ্যায় ২০টি কম হইয়াছে সত্য, কিন্তু অপরাধমূলক ও কল্পনামূলক চলচ্চিত্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে। ইহা দেশের কল্যাণের পরিপন্থী। তাই জীবনীবিষয়ক, ভক্তিমূলক ও শিশুসম্পর্কিত চলচ্চিত্র যতই বেশি উৎপাদিত হইবে, ততই আমাদের কল্যাণ। আবার ভারতীয় চলচ্চিত্রের বর্তমান ত্রুটি ও গলদ দূর করিবার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসব যদি কার্যকরী হয়, তবে খুবই আশার কথা। অবশ্য এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-মেলায় বিদেশী ছবির সহিত ভারতীয় ছবির মেলামেশার ফলে ভারতবাসীদের বিদেশী ছবির প্রতি আগ্রহ যেমন দেখা দিয়াছে, তেমনি বিদেশেও ভারতীয় ছবির জন্য ঔৎসুক্য সঞ্চারিত হইয়াছে। ফলে ভারতীয় ছায়াছবির বাজার যে কিছুটা সম্প্রসারিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

# প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

সূচনা

আজ যান্ত্রিক সভ্যতার বিজ্ঞানসূর্যের দীপ্তিতে সারা বিশ্ব আলোকিত। প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ প্রভৃতি তামসিকতা বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে ও অগ্রগতিতে দূরীভূত হইয়াছে এবং বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে বিজ্ঞান দান করিয়াছে তাহার সর্বব্যাপী শক্তি। তাই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে দেখা দিয়াছে স্বাচ্ছন্দ্য। কৌতূহলী মন ও সন্ধানী দৃষ্টি দিয়া মানুষ সৃষ্টির রহস্য-সন্ধানে ব্যস্ত—কার্যকারণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় জানিতে রত। বিজ্ঞান দিয়াছে মানুষকে বিশ্লেষণী বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ করিবার প্রবৃত্তি। দূর আজ তাহার বড়ই নিকট--প্রাকৃতিক দুর্দৈব তাহার আজ্ঞাবাহী। মানুষ বিজ্ঞানবলে আজ প্রকৃতির প্রভু। যাহার খেয়ালী শক্তিবিকাশে মানুষ নির্বাক্ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকিত, আজ সে-ই উহার নিয়ামক।

প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের সুদূরপ্রসারী দান

বিজ্ঞানবলে মানুষ আজ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী। জীবনযাত্রার সর্বদিকের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে বিজ্ঞান নিয়োজিত। নগরের কোন মানুষের প্রাত্যহিক কর্মতালিকা আলোচনা করিলেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রভাতী চা-পানের সময় হইতে আপিসে গমন ও আপিস হইতে প্রত্যাবর্তন এবং রাত্রিতে নিদ্রার পূর্ব পর্যন্ত সকল বিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্য দান করে এই বিজ্ঞানই। স্টোভের শব্দে নিদ্রাভঙ্গ আর রাত্রিতে রেডিওর বিদায়ী সংগীতে নিদ্রাকর্ষণ বিজ্ঞানেরই দান। যানবাহনের স্বাচ্ছন্দ্য চিত্তবিনোদনের উপকরণ, বিবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য, রন্ধনের সুসহায়ক উপকরণ প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের পক্ষে যাহা-কিছু প্রয়োজনীয়, তাহারই উপরে বিজ্ঞানের বিপুল হস্ত প্রসারিত। প্রখর উত্তাপ নিবারণ, বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা, শীতের প্রাবল্য দূরীকরণ, অন্ধকার হইতে মুক্তি—এসবই বিজ্ঞানের আশীর্বাদে সম্পন্ন করা যায়। বিজলী পাখা, বিজলী বাতি, ট্রাম কার, হাওয়াগাড়ী, রেলগাড়ী, আপিসের লিফ্‌ট্, গৃহের স্টোভ্, হিটার-চুল্লী প্রভৃতি সমস্তই সহজলভ্য লইয়াছে বিজ্ঞানের উন্নতিতে। বিমান উড়িয়া যায় শূন্যমার্গে যাত্রী ও সংবাদ লইয়া, সমুদ্র পাড়ি দেয় জলযান-- শত শত মাইল হইতে প্রিয়জনের সংবাদ আনে টেলিগ্রাম - বেতার টেলিভিসান। কত মনীষীর শিক্ষা উপদেশ ও বাণী রোটারি মেসিনে মুদ্রিত প্রাত্যহিক সংবাদপত্রে হয় পরিবেশিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস করাই শুধু নয়, দূরের খাদ্যসম্ভারও আসে ত্বরিত গতিতে দুর্ভিক্ষক্লিষ্টের মুখে হাসি ফুটাইতে। দুরারোগ্য ব্যাধিও আজ বিজ্ঞানের আশীর্বাদে নিরাময় করা যায়। স্টেপ্টোমাইসিন—পেনিসিলিন—আলট্রাভাওলেট রে—এক্স্‌রে—রেডিয়াম-থেরাপি প্রভৃতি আজ চিকিৎসাজগতে যুগান্তর আনিয়াছে। বিজ্ঞান মৃত্যুপথ-যাত্রীকে দান করিয়াছে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, চিত্তে তাহা জাগাইয়াছে আশা। লিখিবার

হাসপাতালকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হ'য়েছে। নভোরশ্মি নিয়ে গবেষণাতেও ভারতের অধ্যাপক ভাবা ও পিয়ারা সিং গিল, আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ ক'রেছেন। ক'লকাতায় বসুবিজ্ঞানমন্দিরেও নভোরশ্মি নিয়ে গবেষণা চ'লছে। বিদেশেও বহু ভারতীয় বিজ্ঞানী নভোরশ্মি নিয়ে গবেষণা করছেন; এঁদের ভিতরে বাঙ্গালী মহিলা শ্রীমতী বিভা চৌধুরীর নাম বিশেষ করে' উল্লেখযোগ্য।

'কাউন্সিল অব্ সায়েন্টিফিক য়্যাণ্ড্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ রিসার্চ' শিল্পোন্নয়নে বিজ্ঞান-প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বহু বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ ক'রেছেন। ইলেক্ট্রো-কেমিক্যাল; হেভি কেমিক্যাল; ধাতু; রঞ্জক; ভেষজ; প্লাষ্টিক; চর্মশিল্প; স্থাপত্য; বেতার; ফলিত; পদার্থবিদ্যা; যন্ত্রপাতি-নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে এই কমিটিগুলি পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

দিক্-দিগন্তরে বিজ্ঞানের অভিযান

ভারতীয় উদ্ভিদ্ থেকে ভেষজ নির্মাণের গবেষণাও চ'লেছে। কাশ্মীরের জম্মু তরাইয়ে স্যর্ রামনাথ চোপরার অধীনে একটি ড্রাগ্ রিসার্চ ল্যাবরেটরী স্থাপিত হ'য়েছে। পচন-প্রক্রিয়া দ্বারাও নব নব উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চ'লছে। এই প্রক্রিয়ায় যে সব জীবাণু জন্মে তাদের সংগ্রহ ক'রে রাখার ব্যবস্থাও হ'য়েছে বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট্ অব্ সায়েন্সে। বোম্বাইয়ের হাপকীন ইন্‌স্টিটিউটে পেনিসিলিন তৈরির আয়োজন রয়েছে। ক'লকাতায় ডাঃ সহায়রাম বসু পেনিসিলিনের সমতুল পথিপেরিন আবিষ্কার করে' যথেষ্ট কীর্তি অর্জন ক'রেছেন। ভারতে ফিসার ও ট্রপ্‌স্—উদ্ভাবিত প্রণালীতে জ্বালানী কয়লা থেকে জ্বালানী তেল উৎপাদনের যোগাড় হ'য়েছে। রেয়ন ও প্লাসটিক শিল্পকেও উন্নত করার অতন্দ্র প্রচেষ্টা চলেছে এই ভারতেই। বেতারের যন্ত্রপাতি নিমাণের কার্যও ভারতে আরম্ভ হ'য়েছে। তা ছাড়া ভ্যাকুয়াম পাম্প, কম্প্রেসর, রেফ্রিজারেটর, সেন্ট্রিফিউজ, অ্যামমিটার, ভোল্ট্‌মিটার প্রভৃতি নানাজাতীয় যন্ত্রাদিও নির্মিত হচ্ছে। কয়লা-শিল্প নিয়েও ভারতে শুরু হয়েছে প্রচুর নিরীক্ষা-পরীক্ষা।

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও ভারত পিছিয়ে নেই। যক্ষ্মা-রোগের প্রতিষেধক বি সি. জি. ভ্যাক্‌সিন্ তোয়ের করার জন্যে মাদ্রাজে একটি গবেষণাগার স্থাপিত হ'য়েছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা কুষ্ঠ প্রতিষেধের জন্যও চলেছে প্রচেষ্টা। এমন রক্তবীজের বংশ মশার বিলোপসাধনের জন্যও ডি ডি. টি. প্রয়োগ করা হচ্ছে। কুষ্ঠরোগে প্রোমিন, ডায়াসোন ও সালফিট্রোন ব্যবহারে সুফল হয়েছে। প্লেগ চিকিৎসাতেও চ'লছে অনেক গবেষণা।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা

স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান-জগতে যেরূপ আলোড়ন দেখা দিয়েছে, তা' সুপরিচালিত হয়ে দেশের মঙ্গলে নিযুক্ত হলে সত্যই এর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত আশাপ্রদ। সম্প্রতি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে 'জাতীয় অধ্যাপক' রূপে ঘোষণা

ক'রে' তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করবার সুযোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে বিজ্ঞানের অভিযানকে সফল ক'রতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রাচীন ভারত

প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের উপর আধুনিক প্রযাস নির্ভরশীল

বিজ্ঞানের যে যে ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভ ক'রেছিল, সেই সেই ক্ষেত্রে তাদের আবিষ্কৃত তথ্য নিয়ে গবেষণার কথা মনে রাখা দরকার। প্রাচীন ভারত এমন অনেক আবিষ্কারের দাবি করতে পারে যা' আজকের দিনেও পুনরায় আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। স্বকীয় ঐতিহ্যকে উপেক্ষা না ক'রে জাতির কল্যাণকামনায় বিজ্ঞানীগণ যদি তাঁদের গবেষণা পরিচালিত করেন, তবেই ভারতের দুঃখনিশা শীঘ্রই হবে বিদূরিত, তবেই ভারত আবার প্রাচুর্যে স্বাস্থ্যে সুখে ও সম্পদে জগতে শীর্ষস্থান করবে অধিকার।

# বিজ্ঞানের গতি কোন্ পথে!

পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করাই বিজ্ঞানের কাজ। পার্থিব রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবার জন্যে বিজ্ঞানের প্রয়াসের অন্ত নেই—নানাবিধ

ভূমিকা

আবিষ্ক্রিয়ায় বিজ্ঞান মানুষের জীবনে এনেছে বিরাট-বৈচিত্র্য। শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে সভ্যতার জয়যাত্রায় বিজ্ঞানের অবদান নিতান্ত সামান্য নয়। মানুষেরই জ্ঞান তার জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করবার জন্যে বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে। অথচ বর্তমান কালে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ সমস্ত মানুষের জীবনে সমভাবে বর্ষিত হতে পারছে না নানা কারণেই।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ বাস ক'রত অজ্ঞানতার তামস-তমিস্রায়। সেদিন তার জীবনে সভ্যতার চিহ্ন ছিল না বিন্দুমাত্রও। কিন্তু অবস্থার ফেরে একদিন সে আবিষ্কার

বিজ্ঞান ও সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্ক

ক'রল আগুন, শিখল সে হাতিয়ার তৈয়ের ক'রতে, ধীরে ধীরে একটির পর একটি আবিষ্কারে তার জীবনযাত্রা-প্রণালীর পরিবর্তন হতে লাগল ক্রমাগতই। শম্বুকগতি গরুর গাড়ীর যুগের সঙ্গে দ্রুতগামী বাষ্পীয় পোত বা ব্যোমযানের দূরত্বের ব্যবধান দুস্তর। অর্থাৎ বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার সভ্যতার স্রোতকে নূতন নূতন খাতে প্রবাহিত ক'রে তার মধ্যে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বৈচিত্র্য ও মনোহারিত্ব দান করেছে। মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সৃষ্টি করছে অতি গভীর একনিষ্ঠ সাধনায়—বিজ্ঞানীর জীবন-সাধনার একান্ত কামনাই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাহায্যে মনুষ্যসভ্যতার উন্নয়ন-সাধন। দিনের পর দিন অতন্দ্র সাধনায় মানব-জীবনের দুঃখযাতনাকে বিদূরিত করে' জীবনকে সুখী ও সুন্দর করে' তোলা—এর চেয়ে বড় কথা বিজ্ঞান-সাধনায় আর কিছুই নেই।

জেম্‌স্ ওয়াট্ যেদিন বাষ্পশক্তি আবিষ্কার করেছিলেন, সেদিন তাঁর কল্পনায় কি ছিল, জানা শক্ত হলেও বাষ্পশক্তি আজ মানুষের জীবনে অনেকখানি যায়গা দখল করেছে। বিজ্ঞানী যেদিন বিদ্যুতের শক্তি করলেন আবিষ্কার, সেদিনটি সভ্যতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। বিদ্যুৎ-শক্তির সহায়তায় মানুষের সমাজ ও সভ্যতার চেহারা পর্যন্ত গেছে বদলে। বৈদ্যুতিক শক্তির লীলায় সমগ্র পৃথিবীর আয়তন অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে যেন আমাদের নিকট প্রতিবেশীতে হয়েছে পরিণত। পৃথিবীর দিক্-দিগন্তে যেখানে যে ঘটনাই ঘটুক, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত দেশের লোক বিজ্ঞানের সাহায্যে তা অনায়াসেই জান্‌তে পারে। মানুষের চলাফেরা, কাজকর্মের অজস্র সুবিধা করে' দিয়েছে এই বিজ্ঞানই। ফরাসী লেখক জুলে ভার্নি *'Around the World in Eighty Days'* নামে একখানা উপন্যাস রচনা করে' সারা পৃথিবীকে একদিন দিয়েছিলেন চম্‌কে। মানুষের ধারণা এবং বিশ্বাস ছিল, নিখিল পৃথিবী পরিভ্রমণ করে' আসতে অনেকদিন সময় লাগে। কিন্তু ভার্নি ভৌগোলিক বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণ করে' দিলেন যে পৃথিবী-পরিভ্রমণে আশী দিনের বেশি সময় লাগে না। আজকাল পাঁচ দিন বা তিন দিনেরও মধ্যে পৃথিবী-ভ্রমণের কাহিনী শোনা যাচ্ছে। মানুষের পরিভ্রমণগতি অতি দ্রুত বেড়েছে—এও বিজ্ঞানেরই দান।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদান

বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে এমন সব ওষুধ যা অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিকে সহজেই নিরাময় করে' দিতে পারে। জার্মান বিজ্ঞানী 'রণ্টজেন' রঞ্জনরশ্মি (X-Ray) আবিষ্কার করে' মানুষের অশেষ মঙ্গল সাধন করেছেন। এই বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে মানুষের দেহের অভ্যন্তরের যে পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়, পূর্বে তা ছিল অকল্পিত। ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তর আবিষ্কার করলেন জলাতঙ্কের ওষুধ। এর সাহায্যে কত দুরারোগ্য ব্যাধিরই-না চলেছে চিকিৎসা।

বিজ্ঞানের সাহায্যে চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তর

দিনের পর দিন বিজ্ঞান এমনি করে' ক্রমাগত চলেছে এগিয়ে। কিন্তু অগ্রগতির সমস্ত সুফল মানুষের পক্ষে সহজলভ্য হয়েছে বলে মনে করা ভুল। বীক্ষণাগারে যে সত্যের হয় অভ্যুদয়, সকলের অধিকার তাতে সমান হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সকল মানুষে বিজ্ঞানের সেবা সমভাবে পায়নি। সমাজ-জীবনের ও রাষ্ট্রিক জীবনের চাবিকাঠি যাঁদের হাতে, তাঁরা বিজ্ঞানকে ক্রীতদাসীর মত আপনাদের বাসনাতৃপ্তির সুলভ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। বিজ্ঞান তাদের স্বার্থসিদ্ধির অন্যতম প্রধান অবলম্বন। বিজ্ঞানের অপব্যবহার ক্রমাগত বেড়ে বেড়ে এমন অবস্থায় পৌঁছিয়েছে যে, আজ মানুষের

সভ্যতার পাদপীঠে বিজ্ঞান আশীর্বাদ, না অভিশাপ ?

মনে এমন সন্দেহও জেগেছে যে, সভ্যতার পাদপীঠে বিজ্ঞান আশীর্বাদ, না অভিশাপ . মারণাস্ত্রের তাণ্ডবলীলায় মানুষের বহু যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইমারৎ যেভাবে হয় ধূলিসাৎ, তাতে মানুষের মনে এ প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের সব-কিছু দান মানুষের জীবনে কার্যকরী হ'তে পারে না। তার কারণ বিজ্ঞানকে সামান্য কয়েকজন মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা চলেছে। স্বার্থান্ধ মূলধনীরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-গুলির একচেটিয়া ব্যবসায় করে' কোটি কোটি মুনাফা পায়। অর্থাৎ বিজ্ঞানের দানকে ব্যবসায়ের মূল্যে রাখা হয়েছে মানুষেরই নাগালের বাইরে। যেমন,—'ক্লোরোমাইসেটিন' চিকিৎসার কথা বিচার করা যাক্। 'টাইফয়েড ' জাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধিতে এর প্রয়োগ অনিবার্য। কিন্তু জিনিসটি এখনও অবধি এমনি চড়া দরের যে, সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে এ পড়েই না।

বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ—আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা

বিজ্ঞানের এই অপপ্রয়োগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আণবিক বোমাও। অণুর অসীম শক্তিকে বিজ্ঞানীরা যখন করেছিলেন আবিষ্কার, তখন এর ধ্বংসকারী শক্তির কথা তাঁরা ভাবেন নি। তাঁরা ভেবেছিলেন, আণবিক শক্তির সাহায্যে মনুষ্য-জীবনের সুখশান্তিকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দেওয়া যাবে অথচ সেই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হ'ল দু'টি জাপানী শহর ধ্বংস করার জন্যে। অথচ বর্তমানে একটির পর একটি আণবিক বোমা তৈয়ের ক'রে সমগ্র পৃথিবী দখল করবার চক্রান্তের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের অপব্যবহারের রূপ সুস্পষ্টভাবে উঠেছে ফুটে। আবার এর উপরেও আছে নাকি হাইড্রোজেন বোমা! তাই বার্ট্রাণ্ড রাসেল মনে করেন,—'এমন যুদ্ধ বাধতে পারে যার ফলে সকলে, প্রায় প্রত্যেকে শেষ হয়ে যেতে পারি। যুদ্ধ যদি নাও হয় গ্রহ উপগ্রহের উপর আক্রমণ চল্‌বে এবং হয়ত সেগুলি ক্রমে ক্ষয় পেতে পারে। চাঁদ ভেঙে, গুঁড়িয়ে, গলে যেতে পারে। বিশাল খণ্ডিত অংশ মস্কো, ওয়াশিংটন বা অপেক্ষাকৃত নিরীহ দেশগুলির উপর পড়তে পারে।'

সভ্যতার পরিপন্থী বিজ্ঞান-সাধনা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য

কিছুদিন আগে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের এক অধিবেশনে অধ্যাপক জোলিও কুরি এবং মাদাম ইরিন কুরি একটি কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন। ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার সময় অধ্যাপক কুরি ইউ. পি. আই-এর প্রতিনিধির নিকট বলেছিলেন,—"The member-nations of the United Nations must unequivocally demand that the deadly bomb should be eliminated in future warfare." অধ্যাপক কুরি একথাও পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন,—"Disarmament was necessary for the present disturbed world to settle down". বিজ্ঞানের নোবেল-পুরস্কারধারী ফ্রান্সের এই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর কথায় বিজ্ঞানের অপব্যবহারের রূপটি কী বেশ চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত হয় নাই?

তবে কি বিজ্ঞানসাধনা সভ্যতার পরিপন্থী? সুসভ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েৎ রাশিয়ায় বিজ্ঞানের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান: কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের অভিযাত্রার গতি-প্রকৃতি দেখে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মনে এই কথাই জেগেছে যে, 'পাহাড় থেকে অসভ্য জাতি সুফলা শস্য-ক্ষেত্রের ওপর নেমে এসে, শিক্ষিত সেনাবাহিনী রক্ষা করার আগেই নগর দেশ লুঠ-তরাজ করেছে, এ নজীর ইতিহাসের পাতায় যথেষ্ট আছে। কিন্তু সভ্য মানব অধিকৃত বর্ধিতায়তন রাজ্যের সীমানা এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে অর্জিত শক্তি,—বর্বর জাতি কর্তৃক রোমসাম্রাজ্য ধ্বংসের মত প্রলয়ংকরী বিপত্তির আশঙ্কা বহু পরিমাণে হ্রাস করেছে। বর্তমানে বর্বর জাতি বিপদ আনে না, বরং যাঁরা সভ্যতার অগ্রণী হয়ে আছেন, তাঁরাই অশান্তির মূল।'

শেষ কথা

# যুগ-পরিবর্তনের ধারায় বাংলার উৎসব

মানবের জীবনে উৎসবের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের প্রত্যহের কর্মে ও কর্তব্যে এমন একটা স্বার্থের বন্ধন থাকে, বাঁচবার তাগিদ থাকে যে, আমাদের মনুষ্যত্ব তার মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠে। নিত্যকার ধূলিমালিন্য অপসৃত করে চিত্তকে মুক্তি দিতে হলে চাই উৎসব। যুগে যুগে তাই উৎসবের আয়োজন মানুষের আনন্দসত্তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, জীববৃত্ত থেকে উচ্চতর মানববৃত্তে তাকে স্থাপিত করেছে। হয়তো কোন সামাজিক বা ব্যক্তিক প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই উৎসবের ব্যবস্থা, তবুও তা যখন প্রয়োজনকে ছাপিয়ে ওঠে তখনই তার নামের সত্যকার সার্থকতা। আদিম যুগে মানুষের টোটেম ও ইন্দ্রজালে বিশ্বাসকে (Totemism and magic) আশ্রয় করেই প্রথম উৎসবের সূচনা হল। অথচ এই দুটি বিশ্বাসই তাদের জীবনধারার একান্ত প্রয়োজনের সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু মানুষের আনন্দ-কোলাহল সেই প্রয়োজনকে আচ্ছন্ন করতে পেরেছিল বলেই তা পশুশিকার এবং ফল-আহরণ না হ'য়ে উৎসব হয়ে উঠল।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্বণ। বাঙ্গালীর উৎসব পুঁথির প্রাণহীন নিয়মঘেরা যান্ত্রিক অনুষ্ঠান নয়। এ যে শুভ উৎসব—এ যে প্রাণের রসপিপাসার স্বচ্ছন্দ রূপায়ণ। তাইতো বাংলার উৎসবের কোন অন্ত নেই। প্রতি মাসে প্রতি দিনে তার লেগেই আছে উৎসব। বাঙ্গালীর সকল কাজের অবসরে জাগে শুধু অকাজের আনন্দ আহরণের ব্যাকুলতা। ঋতুর আবর্তনের সাথে সাথে বাঙ্গালীর উৎসব ধীরে ধীরে হতে থাকে আবর্তিত। অখণ্ড বাংলার উৎসব মূলতঃ তিন রকমের—[১] ঋতু-উৎসব; [২] ধর্মোৎসব ও [৩] সামাজিক উৎসব।

বাংলার উৎসব তিন জাতের:

প্রথমে ঋতু-উৎসবের কথাই ধরা যাক্। এক একটি ঋতু বাংলায় তার আগমনী জানায় এক একটি বিচিত্র সুরে। প্রকৃতির এই বহুবিচিত্র আত্মপ্রকাশে যে সৌন্দর্য ও সুরের লহরী খেলে, মানুষের মনে তা জাগায় নিজেকে প্রকাশ করার, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার প্রেরণা। প্রেরণাই রূপায়িত হয়েছে ঋতু-উৎসবে। নববর্ষের প্রথম দিন থেকে সুরু করে' চৈত্র-সংক্রান্তি পর্যন্ত বিভিন্ন ঋতুর বন্দনাগানে বাংলার পল্লীভবন হয় মুখর। প্রাচী শারদোৎসব ও বসন্তোৎসব এই ঋতু-উৎসবের একটি নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে আজও রয়েছে বেঁচে। বসন্তোৎসব থেকেই গড়ে' উঠেছে দোল-খেলার উৎসবটি। বাংলার মেয়েলি ব্রতের অধিকাংশই ঋতুৎসবের পর্যায়ভুক্ত। ভাদুলি, পূর্ণিপুকুর, মাঘমণ্ডল, অশ্বত্থপাতা প্রভৃতি ব্রত ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর আগমনী করে ঘোষণা।

[১] ঋতু-উৎসব

অখণ্ড বাংলার ধর্মোৎসবে ধর্ম মুখ্য হ'লেও উৎসব গৌণ নয়। বরং গোঁসাই ঠাকুর যখন পূজার আনুষ্ঠানিক শুচিতা রক্ষায় থাকেন ব্যাপৃত, তখন 'অকাজের গোঁসাই'দের মনের আনন্দোচ্ছ্বাস নানা ভাবে প্রকাশ পায় সুরে ও ছন্দে, গীতে ও নৃত্যে। বৈদিক-পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে', কত দেব-দেবীই-না বাঙ্গালীর ঘরে পূজা পান। লৌকিক মনসা বা ষষ্ঠী দেবীও এখানে বাদ পড়েন না। বছরের প্রতি মাসেই কোন-না-কোন দেবতার পূজাকে উপলক্ষ্য করে' উৎসবের আয়োজন হয় এই বাংলায়। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত ধর্মোৎসবের ভিতরে দুর্গাপূজাই সর্বশ্রেষ্ঠ। দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব। সারা বছর ধরে' বাঙ্গালী দুর্গা-মায়ের আগমনীর করে প্রতীক্ষা। শরতের গীতপুলকিত পুষ্পসুরভিত প্রভাতে যখন মায়ের অর্চনা হয় শুরু, তখন দীনের কুটির আর ধনীর পর্ণশালা হয়ে যায় একাকার। দূর প্রবাস থেকে বাঙ্গালী ফিরে আসে ঘরে মায়ের আশিস্ নেবার জন্যে। দুর্গাপূজায় বাংলার ঘরে ঘরে যে আনন্দের বান যায় বয়ে, তার তুলনা অন্য কোথাও দুর্লভ। দুর্গাপূজার পরে আসে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। তার পরে একে একে আসে কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ও সরস্বতী পূজা। মুসলমানদের ঈদ ও মহরম ধর্মোৎসবের অন্তর্গত দু'টি প্রধান জাতীয় উৎসব। এছাড়া সবে-বরাত, সবে-মেরাজ প্রভৃতি উৎসবও উল্লেখযোগ্য।

[২] ধর্মোৎসব

সামাজিক উৎসবের ভিতরে বিবাহই শ্রেষ্ঠ। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় আনন্দের অবকাশ অপ্রচুর হলেও বিবাহের রাত্রে আমাদের নিকট থেকে অপসারিত হয় যান্ত্রিক ব্যস্ততার একঘেয়ে আবর্তন। সেদিনের মধুর সুরে ও সংগীতে, সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশে বর ও কন্যার সজ্জার বৈচিত্র্য, লোকের প্রাণখোলা আনন্দ-আলাপনে চিত্তকন্দর থেকে যে প্রীতিরস হয়

[২] সামাজিক উৎসব

নির্ঝরিত, তা আজকের সমাজেও ( শান্তির স্নিগ্ধতা। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জামাইষষ্ঠী, পৌষপার্বণ প্রভৃতিও সামাজিক উৎসবের অন্তর্ভুক্ত। কবি ঈশ্বর গুপ্ত পৌষপার্বণের রসাল মাধুর্যের লীলায়িত স্বাক্ষর দিয়েছেন নিম্নলিখিত কয়েকটি ছত্রে—

'আলু তিল গুড়-ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিঠে পুলি অশেষ প্রকার॥
বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার! ধন্য তোমার খেলা॥'

মুসলমান সমাজেও আছে সামাজিক উৎসব। 'মিলাদ শরীফ' মুসলমানদের একটি অতীব জনপ্রিয় সামাজিক উৎসব। এই উৎসবটি মাসে দু'একটি করে' হয়ই।

অবশ্য একথা আজ স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের দেশে উৎসবকলায় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের স্বরূপনির্ণয়ের পূর্বে তার কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন। সেই কারণ মিলবে আমাদের সমাজজীবনের পরিবর্তনের মধ্যে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে আমাদের সমাজ ছিল গ্রামপ্রধান। গ্রামের মানুষের মধ্যে একটা সহজ পরিচিতি ও প্রীতি থাকে। পরস্পরের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধন খুব দৃঢ় হওয়া গ্রামজীবনে খুবই স্বাভাবিক। এই গ্রাম্যসমাজে বিচিত্র ধর্মাচরণ ব্রত ইত্যাদির অনুশীলন পারিবারিক জীবনের অবশ্য পালনীয় ব্যাপার ছিল। বিশেষ করিয়া জমিদার প্রমুখ ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রজাসাধারণের সম্পর্ক অলঙ্ঘ্য ছিল না। মধ্যযুগের অবসানে গ্রাম্য সমাজজীবনের সেই নিশ্চিত নিস্তরঙ্গ এবং সহৃদয় পরিবেশ ভেঙ্গে প'ড়ল। শহরজীবন সমাজে প্রাধান্য পেল এবং আদর্শ হয়ে উঠ্‌ল। ইংরেজি শিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গীতে নতুনত্ব আনল। শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে ভেদ হল প্রবল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পেল তীব্রতা। ধনী-দরিদ্রের দূরত্ব ব্যাপক ও অলঙ্ঘ্য হয়ে উঠল। গণতান্ত্রিক চেতনা ও রাজনীতিবোধ উচ্চ-গ্রামে উঠ্‌ল। এই পার্থক্যগুলি মনে রাখ্‌লে আধুনিক কালের উৎসবধারার অভিনবত্ব অনুধাবন করা যাবে।

যুগের পরিবর্তনে উৎসবধারার পরিবর্তন

পূর্বকালে উৎসবে ধর্মের প্রাধান্য ছিল। ধর্মের স্থান জীবনে ও সমাজে তখন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই আনন্দ-উৎসবও ধর্ম-অসংশ্লিষ্ট হত না। অবশ্য বিবাহ, শিশুর জন্ম গৃহপ্রবেশ পুকুর-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পারিবারিক সামাজিক উৎসবগুলি ধর্মকেন্দ্রিক নয়। কিন্তু এদেরও ধর্মগত একটি দিক আছে, সেকালের উৎসবে সেই দিকেই সকলের লক্ষ্য থাকত। ধর্ম ও আচারগত অনুষ্ঠানের খুটিনাটি অবশ্যই পালন করা হত। বর্তমানকালে মানুষের জীবনে ধর্মের গুরুত্ব একান্তভাবে হ্রাস পেয়েছে। ঐহিকতা রাষ্ট্র-সমাজে সর্বত্র প্রধান হয়ে উঠেছে। এ-যুগে তাই নানাবিধ ধর্মসংস্রবহীন উৎসবের প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে।

উৎসবধারায় ধর্মের স্থান

তদুপরি ধর্মসংশ্লিষ্ট উৎসবগুলিতেও ধর্মাচরণের গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। একালে দুর্গাপূজা প্রভৃতিতে মন্ত্র-পুরোহিত ও আচার-আচরণের খুঁটিনাটির দিকে যে একেবারেই নজর দেওয়া হয় না তা সকলেই স্বীকার করবেন। বিহাহ প্রভৃতি উৎসবে প্রথাগত মন্ত্রপাঠ-যজ্ঞাদির ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কিন্তু তার গুরুত্ব সবচেয়ে কম। ভোজন, আলোকসজ্জা, জনসমাগম, সঙ্গীতাদিই সেখানে প্রধান। গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি ব্যাপারে নারা'ণ-পূজা এখনও হয়ত হয়, কিন্তু আনন্দানুষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্র নারা'ণ-ঠাকুর পূজো থেকে সরে গিয়েছেন অন্যত্র।

একালে বারোয়ারী উৎসব সংখ্যায় যেমন বেড়ে গিয়েছে, তেমনি গুরুত্বেও প্রাধান্য পাচ্ছে। সেকালেও বারোয়ারী পূজাদি ছিল না এমন নয়। প্রধানতঃ দুর্গাপূজোর মত বড় বড় অনুষ্ঠান একজনের ব্যক্তিগত খরচায় সুসম্পন্ন হতে পারে না বলে' সার্বজনীন আকারে তা নিষ্পন্ন করা হয়।

উৎসবে সার্বজনীনতা

সেকালের গ্রাম্যজীবনে জমিদার প্রমুখ গ্রাম্য-প্রধানরাই এই সব উৎসবের ব্যবস্থা করিতেন সমগ্র গ্রামবাসীই সেই আনন্দ-উৎসবে যোগদান করত। তবে বহু গ্রামে বারোয়ারী-তলা বলে সর্বসাধারণের জন্যে বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট থাকত। শীতলা, কালী, ধর্ম পূজো বহু গ্রামেই সার্বজনীন আকারে সাধিত হত। এ-যুগে মানুষের চেতনায় গণতান্ত্রিকতা প্রভাব বিস্তার করেছে। কোন ধনী ব্যক্তির গৃহপ্রাঙ্গণে আয়োজিত উৎসবে যোগদান করিতে এযুগের মানুষের আত্মসম্মান আহত হয়। তাই একালে দুর্গাপূজাদি সার্বজনীন নীতি ও রীতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শহরজীবনে গ্রামসুলভ নৈকট্য ও পরিচিতির অভাবও সার্বজনীন পূজোর অতিবিস্তৃতির অন্যতম কারণ। সকলের চাঁদা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে এই জাতীয় উৎসবের অর্থ সংগৃহীত হয়। এই উৎসবপ্রাঙ্গণে কেউ দয়ার পাত্র নয় সকলেই আপন অধিকারে হয় সমবেত। সার্বজনীন পূজোগুলির পেছনে গণতান্ত্রিক যুগের এই পটভূমিটি জীবন্ত। একে বাদ দিয়ে দেখলে ব্যাপারটা একটা অর্থহীন হুযুগ বলে মনে হতে পারে। সার্বজনীন পূজোর বহিরঙ্গে জৌলুষই প্রাধান্য পায়। প্রতিমাসজ্জা পূজা-উপকরণকে আচ্ছন্ন করে। যাত্রা-থিয়েটারের আয়োজনে মন্ত্রোচ্চারণ স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এ-ব্যাপার একরূপ অনিবার্য। গৃহপ্রাঙ্গণে ব্যক্তির ধর্মপ্রবণতা যে পূজোর সৃষ্টি করে, মাঠে সর্বসাধারণের আয়োজিত পূজোর মূল লক্ষ্য ও লক্ষণ যে তা থেকে পৃথক হবে তাতে সন্দেহ কি? ইতিহাসের এই সাধারণ নির্দেশ মেনেও বলতে হবে, একালের উৎসবে এমন কয়েকটি দিক আছে যাদেরকে চেষ্টা করে' পরিবর্তিত করা বিবেচনাশীল মানুষমাত্রেরই কর্তব্য: প্রথমতঃ, পূজোর উদ্যোক্তা তরুণদের জুলুম করে' চাঁদা আদায়; দ্বিতীয়তঃ পূজামণ্ডপে এবং বিজয়ার শোভাযাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণ; তৃতীয়তঃ, বাহ্যিক আড়ম্বরে অতিরিক্ত অর্থব্যয়। সর্বসাধারণের উৎসব যাতে রুচিপূর্ণ ও

সুন্দর হয় সেদিকে দৃষ্টিপাত অবশ্য কর্তব্য। সরস্বতী পূজায় তরুণ ছাত্রদের উৎসাহ সর্বাধিক। তাই সার্বজনীন আকারে এই পূজা-উৎসব পালনের দিকে ঝোঁকটা বেশি। তবে একালে সার্বজনীনতা যেন ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। কালীপূজা বা কার্তিক পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা বা শীতলা পূজা—সর্বক্ষেত্রে সার্বজননীন পূজা প্রচলিত হচ্ছে। এর মধ্যে প্রাণের তাগিদ অপেক্ষা হুজুগ-মত্ততাই যে মুখ্য তাতে সন্দেহ নেই।

পারিবারিক উৎসব

পারিবারিক পূজানুষ্ঠানগুলি এখনো বহু গৃহেই চলছে। কিন্তু তা যেন গতানুগতিকতায় পর্যবসিত। বাড়ীর শিশুদের আনন্দকোলাহল এদের মধ্যে কিছুটা উৎসবের ভাব এনে দেয়, অন্যথায় এই পূজানুষ্ঠানগুলি ক্রমেই নিষ্প্রাণ হয়ে প'ড়ছে। বিবাহ, জন্মদিন প্রভৃতি উৎসবে বহিরঙ্গ জাঁকজমক খুবই বেড়ে গিয়ে বাইরের আড়ম্বর এ-যুগের সর্বশ্রেণীর উৎসবেই প্রাধান্য বিস্তার করছে। সেকালের এ-জাতীয় উৎসবে হৃদয়ের প্রীতির বন্ধনই ছিল প্রধান। একালে তা বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

নূতন নূতন উৎসবের উদ্ভব

এ-যুগে নানা ধরণের নতুন নতুন উৎসবের উদ্ভব হয়েছে। এদের চরিত্র সামাজিক, প্রাকৃতিক এবং রাজনৈতিকও। জাতির স্বাধীনতালাভ এমনই ঘটনা যাকে অবলম্বন করে' সমস্ত জাতির চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং উৎসবানুষ্ঠানে মিলিত হয়। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহান্ সাহিত্যিক-শিল্পীদের আবির্ভাব বা তিরোভাব-তিথিকে কেন্দ্র করে' বিচিত্র সামাজিক উৎসবের উদ্ভব এদেশে হয়েছে। রবীন্দ্র-স্মরণোৎসব ব্যাপকতায় দুর্গা-পূজোর ও স্বাধীনতা-উৎসবের পরেই স্থান লাভ করেছে। এ ছাড়া ঋতুতে ঋতুতে নৃত্যগীত অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসবের আয়োজন সমাজ-জীবনকে সুন্দর ও মধুর করে' তুলেছে। এ ছাড়া আছে যুব-উৎসব ধরণের আধা-রাজনৈতিক উৎসব। দেশ-বিদেশের মানুষের মিলনে এই উৎসবে প্রাণচাঞ্চল্য এক নবরূপে দেখা দেয়।

উপসংহার

এইভাবে আমাদের উৎসব যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নবায়িত হয়েছে। হয়তো কিছুটা অবাঞ্ছিত বস্তু—যেমন উন্নাসিক ঐশ্বর্যের প্রকাশ—এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সত্য, কিন্তু এক বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত, নব্যরুচি ও সৌন্দর্যবোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা এবং দেশপ্রীতিও যে এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় না। তাই আশা করা যায়, বাঙ্গালীর জীবনে আবার অতীতের সেই শুভ উৎসবের ব্যঞ্জনা নব রূপে উঠিবে ফুটিয়া।

## আধুনিক কালে ভারতে পরিবার-জীবনের আদর্শ

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনের বিভিন্ন দিকে পুরাতন মূল্যবোধের অবসান ঘটে এবং নূতন মূল্যবোধ দেখা দেয়। মানুষের সমাজ সম্পর্কিত ধারণা, ব্যক্তির মূল্য বা পরিবারের আদর্শ কিছুই স্বয়ম্ভু নয়। সব কিছুই সমাজের বিশিষ্ট পরিবেশে উদ্ভূত হয় এবং সেই পরিবেশ পরিবর্তিত হইলে আর দীর্ঘকাল টিকিয়া থাকিতে পারে না। বর্তমান কালে ভারতবাসীর জীবনে একটা ব্যাপক যুগান্তর সূচিত হইয়াছে। কাজেই প্রাচীন পরিবার-কাঠামো প্রভৃতির নূতন মূল্যায়ন প্রয়োজন।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

গ্রামকেন্দ্রিক ভারতসভ্যতায় পরিবারতন্ত্র খুব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। মানব-সভ্যতার বিবর্তনধারায় স্বতন্ত্র ব্যক্তির মিলনে পরিবারের সৃষ্টি, না পরিবার ভাঙ্গিয়া ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কৃত হইল তাহা লইয়া বিতর্ক আছে। সে বিতর্কে প্রবেশ না করিয়াও আমরা বলিতে পারি ভারতে পরিবার-প্রথা দীর্ঘকাল ধরিয়া মোটামুটি একই ধরণের কাঠামোর মধ্যে আবর্তিত। পিতামাতা ও তাহাদের সন্তানসন্ততি, পিতার ভ্রাতৃগণ এবং তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতির সহযোগে এই পরিবার একটা বিশিষ্ট আকৃতি পাইয়াছিল। ইহার মূলে অর্থনৈতিক ভিত্তি যেমন ছিল সুদৃঢ়, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গীর কতকগুলি প্রবণতাও এই প্রথাকে সাহায্য করিয়াছিল। সাধারণতঃ জমিতে পরিবারেরই অধিকার থাকিত, সে অধিকার ব্যক্তিবিশেষের নয়। কাজেই আয়ের সূত্র ছিল একটিই। আবার যে সমস্ত পরিবার বংশগত বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া ছিল তাহাদেরও বয়স্ক পুরুষেরা একই ধরণের বৃত্তির অনুসরণ করিত, যে সব উপকরণ ব্যবহার করিত তাহাও পরিবারের সাধারণ সম্পত্তি। সেকালে সমাজে মানুষের পারিবারিক পরিচয়ই প্রাধান্য পাইত। ব্যক্তিহিসাবে আপন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের সুযোগ কাহারও ছিল না। কাজেই ব্যক্তিপরিচয়ের মূল্য ছিল না। ফলে ভারতীয় পরিবার-জীবন দীর্ঘকাল আপনার প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে পারিয়াছে।

ভারতীয় পরিবার-প্রথা

একান্নবর্তী পরিবার-প্রথার এমন কতকগুলি সুবিধা আছে, যাহা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, রুগ্ন, কর্মে অক্ষম ভ্রাতাদের জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের স্বাভাবিক ব্যবস্থা করিয়া দিয়াও এই প্রথা হীনমন্যতার গ্লানি ডাকিয়া আনে না। দ্বিতীয়তঃ, আকস্মিক বৈধব্য ঘটিলে দরিদ্র ভগিনী এবং ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীরা পরিবারের মধ্যে স্বাভাবিক স্থান লাভ করে। পরিবারই যেন একটা সাহায্য ও পুনর্বাসনের দপ্তর খুলিয়া রাখিয়াছে। তৃতীয়তঃ, কোন ভ্রাতার অকালমৃত্যু ঘটিলে তাহার স্ত্রীপুত্রকন্যাদি অপরের গলগ্রহ হয় না, একান্নবর্তী পরিবারে

একান্নবর্তী পরিবারের গুণাবলী

আপনার স্বাভাবিক মর্যাদায় অবস্থান করে। এই তিনটি অর্থনৈতিক সুবিধার দিক। ইহা ছাড়া কিছু সামাজিক সুযোগ-সুবিধাও আছে। প্রথমতঃ, রোগে-শোকে-বিপদে একপরিবারস্থ মানুষগুলির মন সমভাবে আলোড়িত হয় এবং বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সংগ্রাম করিতে পারে। আবার আনন্দ-উৎসবের বেলায় কর্মনির্বাহ করিতে বাহির হইতে ভাড়া করিয়া লোক আনিতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, বৃহৎ পরিবারগুলি কেবলমাত্র পরিবারের নয়, গ্রামের কোন, বিপদ-আপদে একটি সংগঠিত বাহিনীর মত আগাইয়া আসিতে পারে। তৃতীয়তঃ, বৃহদাকারের পরিবারে বাস করিবার জন্য পরিবারের ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কিছু উদারতা, সহনশীলতা ও সহযোগিতার সদ্‌গুণাবলী আপনিই বিকশিত হয়। চতুর্থতঃ. এই পরিবারগুলিই পূজা-পার্বণ-বার-ব্রতের প্রাচীন ধারাটিকে. অব্যাহতভাবে আগাইয়া লইয়া যায়। পরিবার-জীবনের উৎসব-আনন্দ-দৈনন্দিনজীবনযাত্রা অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন ঐতিহ্য আপনাকে সতেজ রাখে। তাহা ছাড়া অনাত্মীয় মানুষও প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে এই পরিবারগুলিতে আশ্রয় পায়। দরিদ্র ভিক্ষুক বিমুখ হয় না। এইভাবে একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা বটগাছের বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব লইয়া অবস্থান করে। আমাদের গ্রামসমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি ইহাদের আশ্রয় করিয়াই বিকশিত হইয়াছিল।

আধুনিক কালে একান্নবর্তী পরিবারের অবস্থা

বর্তমান কালে আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। এক দিকে মানুষের ব্যক্তিমর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। একালের মানুষ নিজের ব্যক্তি-পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত। পরিবারের বিরাট্ মর্যাদা ও খ্যাতি সত্ত্বেও মূর্খ ও অকৃতী সন্তান জনসমাজে গৌরব লাভ করিতে পারে না। সামান্য পরিবারেও যে মহৎ ব্যক্তির জন্ম সম্ভব, একালের মানুষ তাহা প্রত্যহই দেখিতে পাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিবারের আয়ের কেন্দ্র চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ-যুগের পরিবার কোন নির্দিষ্ট পারিবারিক মালিকানার ভূখণ্ড হইতে আপন আয় সংগ্রহ করে না অথবা কোন বিশিষ্ট পারিবারিক ও বর্ণগত বৃত্তিরও অনুসরণ করে না। বিভিন্ন ব্যক্তি আপন আপন দক্ষতা ও সুযোগমত বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হয় এবং অসম-পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে। তাহারই সমন্বয়ে পারিবারিক সাধারণ কোষ গড়িয়া উঠে। উল্লিখিত কারণ দুইটি একান্নবর্তী পরিবারের সুষ্ঠু পরিচালন অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। জমার ঘরে যাহার দান অধিক, খরচের ঘরেও তাহার অধিক অধিকার বর্তাইবে, এইরূপ ধারণাকে খুবই অন্যায় এবং হীন স্বার্থপরতা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যে সাধারণ পারিবারিক তহবিল নানা পরিমাণের অর্থসংগ্রহ-দ্বারা পূর্ণ হয় তাহাতে পরিবারের সর্ব-অংশের সমান অংশ—এই নীতি অধিক উপার্জনকারী ব্যক্তি এবং তাহার স্ত্রী-পুত্রেরা মানিয়া লইতে রাজী হয় না।

এই বিক্ষোভের একটা বিপরীত মানস-প্রতিক্রিয়া স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের স্পর্শ করে। এই মনোবৃত্তি লইয়া দীর্ঘকাল এক অন্নে বাস করা যে কত অসম্ভব তাহা সহজেই অনুমিত হয়। আবার ব্যক্তিভেদে রুচিরও পার্থক্য। রুচি জীবনদৃষ্টি প্রভৃতি লইয়া পরিবারের মধ্যে একটা অশান্তি ও কলহের অবস্থা চলিতে থাকে। এইভাবে বর্তমানকালে একান্নবর্তী পরিবারের পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গিয়াছে। ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ ঘোষিত হইয়াছে, তাহাকে আর বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া লাভ নাই।

একান্নবর্তী পরিবার-প্রথার বিরুদ্ধে

অবশ্য এরূপ মনে করিবার কারণ নাই যে, একান্নবর্তী পরিবারের যে গুণগুলির কথা বলা হইল, উক্ত প্রথার অবসানে সেই গুণগুলির জন্য আমাদের দুঃখ প্রকাশ করিতে হইবে। এক কালে যাহা গুণ ছিল, জীবনভিত্তির পরিবর্তনে একালে তাহার অনেকগুলি দোষে পরিণত হইয়াছে। খুব কমসংখ্যক ধনী পরিবারই উপার্জনহীন রুগ্ন-অক্ষমদের আশ্রয় দিতে পারে। অপরের পক্ষে এই বোঝা বহন করা অসম্ভব হয়। ধনীদের গৃহে অসহায়া ভ্রাতৃজায়া বিধবা ভগ্নী যে ধরণের ব্যবহার পায় তাহা কেবল অমর্যাদাকরই নয়, সমগ্র পরিবারের আবহাওয়াকে বিষদুষ্ট করিবার পক্ষে যথেষ্ট। আবার ভ্রাতার সক্ষম স্বচ্ছল অবস্থা অনেক সময়ে অন্যদের অলস ও পরনির্ভরশীল করিয়া তোলে। আর সমাজসেবামূলক যে সব কাজের কথা বলা হইয়াছে তাহা সমস্ত সমাজের কর্তব্যরূপে একালের চেতনা গ্রহণ করিতেছে। একান্নবর্তী পরিবার-প্রথাকে সত্যই বাঁচাইয়া রাখা যাইবে না এবং বাঁচাইয়া রাখা উচিতও নয়। কিন্তু অক্ষমদের, আশ্রয়-প্রার্থীদের কি হইবে? সমগ্র সমাজকে সে-প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা আজ ব্যাপক সামাজিক সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। কোন পরিবারের পক্ষে এ-সমস্যার সমাধান অবিষ্কার করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এই সমস্যার সমাধানের নামে পরিবারের পরিবেশকে নিত্যকলহের আবাসে পরিণত করাও উচিত নয়।

স্বামী-স্ত্রী অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান

য়ুরোপে পরিবারজীবন স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের লইয়া গঠিত। সন্তানেরা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে বিবাহাদি করিয়া নূতন সংসার গঠন করে। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার-প্রথায় ব্যাপক ভাঙ্গন ধরিলেও ঠিক এই জাতীয় পরিস্থিতির সমর্থন এখনও খুব দেখা যায় নাই। কিন্তু ঐরূপ রীতি অনুসরণযোগ্য কিনা তাহার মীমাংসা হওয়া উচিত। প্রশ্ন উঠিতে পারে—ঐরূপ পদ্ধতিতে বৃদ্ধ পিতামাতার শেষ পর্যন্ত আশ্রয়চ্যুতির আশঙ্কা থাকিয়া যায় এবং জীবৎকালে সন্তানদের প্রীতি ও স্নেহ হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিতে হয়। য়ুরোপে পেন্সন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আশ্রয়গৃহ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রথম সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা হইতেছে। আর দ্বিতীয়টির বিষয়ে আমরা যতখানি সচেতন, য়ুরোপ

ততখানি নয়। প্রচলিত প্রথাকে তাহারা সহজভাবেই গ্রহণ করিয়াছে। এ-ব্যাপারে আমাদের আদর্শ কি হওয়া উচিত তাহা এক কথায় বলা কঠিন। একান্নবর্তী পরিবার-প্রথাকে অবশ্য-অনুসরণীয় পদ্ধতি হিসাবে বর্জন করা যুক্তিসংগত বলিয়াই যে য়ুরোপীয় প্রথাকে মানিয়া লইতে হইবে তাহার কোন মানে নাই। এই ব্যাপারে আমরা মুক্তমনের পক্ষপাতী। এ-যুগ গণতন্ত্রের যুগ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যুগ। সামাজিক পরিবারগুলি সবই এক ধাঁচের না হইলে সমাজ-জীবন অচল হইয়া যাইবে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই। যদি পিতামাতার জীবৎকালে বা মৃত্যুর পরেও ভ্রাতারা আপনাদের অবস্থা রুচি আয়-ব্যয় পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করিয়া একান্নবর্তী হইয়া বাস করিতে চায় এবং অন্যান্য বয়স্ক সভ্যদেরও মন-প্রাণের সমর্থন থাকে তবে জোর করিয়া সবাইকে পৃথক করিয়া দিবার কথা ভাবা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। কিন্তু বয়স্ক সন্তান যদি আপন রুচি-অনুযায়ী নূতন পরিবার স্থাপন করিতে চায় তাহারও সে-সুযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন। তবে সমাজ তাহার নিকট হইতে জীবৎকালে মাতাপিতা যাহাতে আর্থিক ও মানসিক স্বস্তি পায় তাহার ব্যবস্থাও দাবি করিবে। অবশ্য মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান হইলে বয়স্ক হইয়া বিবাহ করিয়া প্রয়োজন হইলে কিছুটা আপোষে রাজী হইয়া একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থাকা শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

নমনীয় নীতি—সমাধান

বর্তমানে আমাদের পরিবার-জীবনে একটি নূতন সমস্যা দেখা দিতেছে। তাহা হইল বিবাহ-বিচ্ছেদ। বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার আইনসংগত ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। চিরকাল মানসিক ও বাস্তব নানা অসুবিধা, ভুল-বোঝা এবং কষ্টের তুলনায় এই ব্যবস্থা ভাল সন্দেহ নাই। নর এবং নারীর ইহা মৌলিক মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত এইরূপও মনে করা চলে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে যদি বিবাহ-বন্ধনই শিথিল হইয়া পড়ে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ সুলভ ও প্রাত্যহিক ব্যাপারে পরিণত হয় তাহা হইলে পরিবারের ভিত্তিতে কুঠারাঘাত পড়িবে। পশ্চিম য়ুরোপে ও আমেরিকায় পরিবার-বন্ধন যে গুণোত্তর প্রগতিতে ভঙ্গুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে উহা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর হইয়া উঠিয়াছে। উহার অনুসরণ যে কোন দেশেরই পক্ষে অকল্যাণকর। তবে এখনও বলা যায় না যে, এই ব্যবস্থা ঐতিহ্যগর্বিত ভারতের পরিবার-জীবনে বাস্তবতঃ কি কোন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিবে!

বিবাহ-বিচ্ছেদে নূতন সমস্যা ও উপসংহার

## ভারতীয় গণতন্ত্রে ভারতীয় গণজীবন

গণতন্ত্র একটি নবীন রাজনৈতিক আদর্শ হইলেও ভারত প্রাচীন কাল হইতেই যেন এই আদর্শের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়টি অন্তরে অন্তরে অনুসরণ করিয়াছে। ভারত বিভিন্ন

ভাষাভাষী, আচার-আচরণ, বেশ-ভূষা, রুচি ও ধর্মের মানুষকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিয়াছে, অথচ কাহারও বিশিষ্টতাকে জোর করিয়া দমন করিতে চাহে নাই।

ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও গণতান্ত্রিক চেতনা

ভারতের প্রাচীনতম এবং বিশিষ্টতম ধর্মও গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতা ও উদারতার আশ্চর্য উদাহরণস্থল। বেদপন্থী ঋত্বিক, ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিক, চার্বাকপন্থী নাস্তিক এবং শাক্ত তান্ত্রিক হিন্দুসমাজের মধ্যে নির্বিবাদে স্থান লাভ করিয়াছে। এদেশে বিভিন্ন বিরুদ্ধ ধর্মমত ও দার্শনিক জিজ্ঞাসার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু আপন বিশ্বাসের জন্য য়ুরোপের মত এদেশে কাহাকেও জীবন্ত দগ্ধ বা ক্রুশবিদ্ধ করা হয় নাই। অবশ্য মুসলমান আমলে এই সহনশীলতা ও উদারতা প্রায়ই বিঘ্নিত হইয়াছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে গণতান্ত্রিক আদর্শের বহুবিধ দিক গণজীবনে নিত্য অনুশীলিত হইত।

দীর্ঘকাল বিদেশী শাসন ও শোষণের পরিবেশে বাস করিবার পরে সম্প্রতি ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় এযুগের প্রধানতম দান পার্লামেণ্টসম্মত

স্বাধীন ভারতে—

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের বহুজাতিকত্বের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া প্রদেশে প্রদেশে আইনসভা এবং মন্ত্রীমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং কেন্দ্রে এক পার্লামেন্ট ও পার্লামেন্ট-নিয়ন্ত্রিত মন্ত্রিসভার উপরে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। ভারতের এই রাষ্ট্রকঠোমোয় ভারতীয় জনসাধারণের ভূমিকা কি এবং নিয়ন্ত্রণই-বা কতদূর তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

প্রাচীন রাজতন্ত্রের দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দু-একটি দেশে ইহা এখনও টিকিয়া আছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজা সেখানে ক্ষমতাহীন। যুক্তি

রাজতন্ত্রের অবসান

বা ন্যায়নীতি কোন দিক হইতেই রাজতন্ত্রকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কোন বিশেষ বংশের প্রতি রাজ্য-শাসনের অধিকার বর্তানো সমস্ত মানবীয় নীতিরই অবমাননা। তাই স্বভাবসংগত ভাবেই ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্র রাজতন্ত্রের ধার ঘেষিয়া গেল না। উপরন্তু স্বাধীনতাকে সংগঠিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে আধা-স্বাধীন সামন্ত-নৃপতিদের রাজকীয় গৌরব হরণ করা হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের নিজাম, মহীশূরের নৃপতি, কাশ্মীরের মহারাজা সমেত দেশীয় রাজন্যবর্গ রাজক্ষমতা হারাইয়াছে। এইভাবে ভারতীয় গণতন্ত্র গণজীবনের স্বাভাবিক বিকাশ এবং আত্মমর্যাদাকে এক বিরাট্ অবরোধ হইতে মুক্ত করিয়াছে।

ভারতের জনজীবনের বাস্তব লক্ষণ-সম্বন্ধে অবহিত বলিয়াই আমাদের সংবিধান প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে আইনসভা ও মন্ত্রিসভার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই ধরণের

যুক্তরাজ্যই ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ফল। বিভিন্ন জাতি আপন আপন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য; ভাষা ও রীতিনীতি লইয়া আপনার স্বাভাবিক ধারায় বিকশিত হইতে চাহে। এই জাতিসমূহের স্বেচ্ছাসম্মিলনই ভারত-যুক্তরাজ্য। কাজেই প্রাদেশিক আইনসভাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণজীবনে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রসার ঘটানো হইয়াছে। এককেন্দ্রিক (unitary) শাসনব্যবস্থা এইরূপে বহুজাতিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের আদর্শকে পূর্ণ প্রতিবিম্বিত করিতে পারিত না। তদুপরি ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের ফলে এই যুক্তরাজ্য (federal) ধরণের শাসনব্যবস্থা গণজীবনের বাস্তব সমস্যার নিকটতম হইবার সুযোগ পাইতেছে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বোম্বাই প্রদেশে এখনও মারাঠী ও গুজরাটীদের একসঙ্গে যুক্ত রাখিয়া মিলনের পরিবর্তে বিরোধের অবস্থাই সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই দুইজাতির ভারতবাসীর গণজীবন সম্ভবতঃ শীঘ্রই সুস্থ পরিবেশে গণতান্ত্রিক আদর্শে অগ্রসর হইতে পারিবে। কারণ,—বোম্বাই প্রদেশকে দ্বিধাবিভক্ত করার কথা শুনা যাইতেছে। বাংলাদেশের প্রতিও এ-ব্যাপারে কিছু অবিচার করা হইয়াছে। বাঙ্গালী জনসাধারণের একটা অংশকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখার ফলে তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, একদল রাজনীতিজ্ঞ কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সর্বভারতে একমাত্র হিন্দীকেই সরকারী ভাষা হিসাবে চালু করিতে চাহিয়া ভারতীয় জনগণকে গণতান্ত্রিকতার একটা বৃহৎ সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ-দেশের অতীত ঐতিহ্যের ধারায়, বাস্তব অবস্থায় এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের দিক হইতে বিচার-ব্যাপারে এই প্রচেষ্টা নিন্দনীয়।

বহুজাতিক রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক আদর্শ

ভারতীয় গণতন্ত্র জনগণকে কতকগুলি অধিকার দিয়াছে, আবার কতকগুলি দায়িত্বের কথাও বলা হইয়াছে। নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের মাধ্যমে আইনসভার নির্বাচন ও নির্বাচিত আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক মন্ত্রিসভাগঠন জনগণকে দেশের সরকারগঠনে প্রত্যক্ষ অধিকার দিয়াছে। দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আপন কার্যাবলী পরিচালন করিয়া জনসাধারণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে, জনগণের রাজনৈতিক চেতনাকে সংগঠিত করিতে চায়। বহু রাজনৈতিক দল-সংবলিত দেশসমূহে গণজীবন সংগঠনে যে সব সংকীর্ণতা এবং সক্রিয়তা দেখা যায় এদেশেও তাহার লক্ষণগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ সত্য দৃষ্টির তুলনায় দলসৃষ্টির প্রভাব বাড়িয়া যাইতেছে। তবে একদলীয় পদ্ধতির তুলনায় বহুদলীয় পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র যে গণজীবনের স্বাধিকারকে অনেক বেশি

গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও 'কমিউনিজ্‌ম্‌'

মানিয়া লয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সোবিয়েৎ প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশে একদলীয় শাসন প্রচলিত। সেখানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সত্যকে দেখিবার উপায় নাই। সরকার গঠনে ভোটদানের গুরুত্ব নাই। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে গণজীবনের প্রভাব তাই কম। ভারতে প্রয়োজন হইলে জনগণ কোন-না-কোন দলের নেতৃত্বে সংগঠিত হইয়া সরকারের জনবিরোধী নীতির পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। এইরূপ পরিবর্তনের বহু উদাহরণ গত দশ বৎসরের ইতিহাস হইতে সংকলন করা যায়। 'কমিউনিজমে' জনগণের এইরূপ অধিকার বাস্তব রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় না। কিন্তু একথা মানিতেই হইবে, দেশের বৃহত্তর জনগণ যদি শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত থাকে, বাঁচিবার মত ন্যূনতম মজুরী না পায়, বেকার-সমস্যা জনজীবনকে প্রতিমুহূর্তে বিড়ম্বিত করে, দারিদ্র্য অনাহার নিত্যকার বাস্তব ঘটনা হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক আদর্শ মুখের কথায় পর্যবসিত হয়। ভারত সরকার দেশোন্নয়নের যে সব চেষ্টা করিতেছেন তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও বলিব যে, এই অবস্থাই ভারতে বিরাজিত। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আদর্শ তাই জনজীবনের গভীরতম প্রদেশে সঞ্চারিত হয় নাই। বিশেষতঃ ধনিক শ্রেণীর যে প্রভাব এখনও সরকারী নীতির উপর বর্তমান, রাজকর্মচারীদের সর্বস্তরে যে ব্যাপক দুর্নীতি চলিতেছে তাহাতে গণতন্ত্র অনেকখানি মুখের ও ভোটের আদর্শে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতেছে, গণজীবনকে উদ্দীপ্ত ও প্রাণবন্ত করিতে পারিতেছে না। ভারতের গণতন্ত্রকে বাঁচাইতে হইলে আজ পশ্চিম য়ুরোপের পুঁজিপতিদের করায়ত্ত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং সোবিয়েৎ একনায়কত্ববাদ উভয় প্রান্ত হইতেই আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অনুসরণ ও পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের সমন্বয়ের মধ্য দিয়া এইরূপ স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কার করা যাইতে পারে। তাহাই আমাদের গণজীবনে গণতন্ত্রের প্রভাবকে দীর্ঘস্থায়ী করিবে।

উপসংহার—
ভারতের গণজীবনে গণতান্ত্রিক আদর্শরক্ষার সর্তাবলী

ভারত নূতন গণতন্ত্রের সাধক। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্য এবং এই দশ-বারো বৎসরের চেষ্টার একটি ফল ফলিয়াছে এই যে, এদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা সাধারণভাবে অনেকখানি বাড়িয়াছে। এই আদর্শকে আরও অগ্রসর করিবার জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবশ্য অবলম্বন করিতে হইবে: (১) জনজীবনের বাস্তব অর্থনৈতিক উন্নয়ন; এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখিতে হইবে। (২) জনগণের মধ্যে ব্যাপক অভিযান; অশিক্ষাকে সম্পূর্ণতঃ অপসারিত করিতে না পারিলে গণতন্ত্রের আদর্শ ব্যর্থ হইবে। (৩) রাষ্ট্রযন্ত্র হইতে পুঁজিপতি ও ধনিক শ্রেণীর প্রভাব অপসারণ। (৪) শাসন-যন্ত্রের সর্বস্তরে দুর্নীতি দূরীকরণ। (৫) দেশোন্নয়নের প্রত্যক্ষ কার্যে জনগণের স্বেচ্ছায় এবং সহজভাবে যোগদান। (৬) প্রাদেশিক স্তরের নীচে কেবলমাত্র পৌর শাসনেই নয়,

সত্যকার শাসনপরিচালনাতেও জেলা ও গ্রামের স্তরে জনগণের অধিকার, নির্বাচিত সংস্থার অধিকার ও দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত কতকগুলি আচরণবিধি আছে যাহা সরকারী বেসরকারী সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতায়ই মাত্র অনুশীলিত হইতে পারে। সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার জনগণের অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু তাহা শান্তিপূর্ণ হওয়া দরকার। জাতীয় সম্পত্তির হানি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অপর দিকে সরকার পক্ষেরও জনজীবনকে ও গণদাবীকে সম্মান দিতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। গুলি করিয়া লোক মারিয়া বা দমননীতি চালাইয়া সরকারের গৌরব বাড়ে না, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎই বিনষ্ট হয়।

# জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

*প্রারম্ভিক ভূমিকা*

জাতিতে জাতিতে আজ এক দিকে যত নৈকট্য, যত মৈত্রী, ঠিক ততখানি সংঘাত ও বিদ্বেষ। ইহা বড়ই আশ্চর্য ঘটনা। পৃথিবীতে প্রাচীনকাল হইতে যুদ্ধবিগ্রহ কিছু কম ঘটে নাই। কিন্তু একালে পৃথিবীকে আর একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিবার কত চেষ্টা এবং অপচেষ্টাই-না চলিতেছে! কেবল অস্ত্রসজ্জা ও মিত্রসংগ্রহ নয়, কেবল ঘাঁটি-নির্মাণ নয়, সর্বদিক হইতেই শত্রুরাষ্ট্রকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য কথায়-লেখায়-ভঙ্গিতে একটা প্রতিযোগিতা লাগিয়া গিয়াছে। অথচ এ-যুগে পৃথিবীর দেশ ও জাতিগুলি যত নিকটতর হইবার সুযোগ পাইয়াছে পূর্বে কোনকালে তাহা পায় নাই। বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধনের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে এরূপও আর কোনকালে দেখা দেয় নাই। এই অদ্ভুত বৈপরীত্য দেখিয়া এ-যুগের চিন্তাশীল মানুষমাত্রই একই সঙ্গে গভীর বেদনা এবং কিছু কৌতুকও অনুভব না করিয়া পারেন না।

*জাতীয়তা*

শিক্ষিত মানুষের মনে একালে দুটি সত্তা খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় চেতনা এবং আন্তর্জাতিক বোধ কোনটিকেই সে অস্বীকার করিতে পারে না, অথচ সর্বদা ইহাদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ও ঘটিয়া উঠিতেছে না। এই প্রশ্নটির অন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে এই বোধ দুইটির স্বরূপ ও বিবর্তনের কিছু পরিচয় প্রয়োজন। জাতীয়তার চেতনা জাতি-বোধের সঙ্গে যুক্ত। কথাটি আমরা ইংরাজি 'Nation' শব্দটি হইতে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এই চেতনা একান্ত অর্বাচীন নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন যে, দশম-শতকের পূর্বে বাঙ্গালী আচার-ব্যবহার-রীতি-নীতি-ভাষায় ও সাধনায় পূর্বভারতে এক বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছিল। পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কেরা 'জাতি'র সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, একই ভাষাভাষী, একই ধরণের

আচার ব্যবহার ও জীবনচর্যায় অভ্যস্ত জনগোষ্ঠী যদি একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে একটা দীর্ঘ ঐতিহাসিক ঐতিহ্য লইয়া বাস করে তবে তাহাদের একজাতি বলিয়া অভিহিত করা চলে। ইহাদের যৌথ মনোবৃত্তিকেই বিশেষ জাতীয় চেতনা বলিয়া মনে করা হয়। ইহার পশ্চাতে নৃতত্ত্বের দিক দিয়াও এক ধরণের ঐক্যসূত্র থাকে, তবে দীর্ঘকালের ইতিহাসে ও অজস্র মিশ্রণে তাহার সুস্পষ্ট বিশিষ্টতা সর্বদা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অবশ্য কোন সময়েই এই চিহ্নগুলিকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা চলে না। ভাষাই শেষ পর্যন্ত কোন জাতিকে চিনিবার প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়। নিকট অঞ্চলের আধিবাসী জাতিগুলির মধ্যে নানা বিষয়ের ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। আসাম ও বাংলাদেশের মধ্যে ভাষারও নিকট সম্বন্ধ লক্ষণীয়। এই ব্যাপারে অতীত ইতিহাসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মত বহুজাতিসমন্বিত দেশে কিন্তু একটা সমপ্রাণতা লক্ষ্য করা যায়। এ-দেশে প্রাচীন নৃপতিবর্গের শাসনাধীন রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের কিছু ভূমিকা থাকিলেও, দেশের প্রাচীন ধর্মের ও সাধনার ঐক্যই এই সমপ্রাণতার ভিত্তি নির্মাণ করিয়াছে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ-শাসনে তাহা দৃঢ় হইয়াছে এবং ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা-সংগ্রামে পুষ্টি পাইয়াছে। য়ুরোপে গত শতাব্দীতে এক জাতি—এক রাষ্ট্র—এইরূপ রাষ্ট্রনৈতিক মতামত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। য়ুরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রই একজাতি-মূলক। অথচ ভারতের বুকে বহুজাতির মিলন সম্ভব হইয়াছে।

নিকট অঞ্চলে বাসকারী জাতিসমূহ

যে-সব রাষ্ট্র একজাতিমূলক তাহাদের নিকট জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নটি খুব জটিল নয়। কিন্তু যে-সব রাষ্ট্র বহুজাতির সমন্বয়ে গঠিত সেখানে জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। কোন মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক মানুষ হিসাবে বিকাশই স্বাধীনতার লক্ষ্য। জাতীয় জীবনের সার্বিক উন্নতির মধ্য দিয়াই ইহা ঘটিতে পারে। যে-দেশে বহুজাতি একত্র হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে সেখানে যদি পরিবারস্থ জাতিগুলির নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশপথে চূড়ান্ত উন্নতি সাধন করিবার সুযোগ থাকে এবং তাহাদের সকলের সম্মতিতে এবং সকলের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাহাদের এই মিলন যদি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়, তবেই বহুজাতিক সেই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা জাতীয় স্বাধীনতার সমার্থক। অন্যথায় তাহা একরূপ প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদ মাত্র। জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও আত্মোন্নয়নের কামনাকেই বলি জাতীয়তাবোধ। অনুরূপ ক্ষেত্রে তাহা বহুজাতির মিলিত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সমষ্টিগত উন্নয়নকেই বুঝায়।

জাতীয় স্বাধীনতা

জাতীয় স্বাধীনতা যে জাতিমাত্রেরই ন্যায়সংগত অধিকার এই চেতনা কিন্তু খুব প্রাচীন।

আমাদের দেশে তো উহা উনিশ শতকের পূর্বে উপলব্ধই হয় নাই। এই স্বাধীনতার স্পষ্ট অর্থটি অনুধাবনযোগ্য। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক নীতি রাষ্ট্রই নিয়ন্ত্রণ করিবে। রাষ্ট্রই সেই নীতি অনুযায়ী কর্ম পরিচালনা করিবে। নিজের দেশে কিরূপ সমাজব্যবস্থা হইবে, জীবনপ্রবাহ কোন্ খাতে বহিবে, অর্থনীতির কি পদ্ধতি চলিবে, গণতন্ত্র অথবা সমাজতন্ত্র কোন্ রাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করিবে তাহা দেশই নির্ধারণ করিবে এবং তাহার ভৌগোলিক সীমানা বিদেশী কোন শক্তি লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। এক কথায় ইহাকে বলা হয় সার্বভৌম অধিকার। এই দাবিগুলি প্রত্যেক শক্তিশালী ও দুর্বল জাতিরই অতি ন্যায়সংগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই দাবি অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া চাই। একটি জাতি স্বাধীনতার দাবি করিল, অন্য একটি শক্তিশালী জাতি আসিয়া তাহার উপরে জবরদস্ত অধিকার বিস্তার করিল, এইরূপ ঘটিলে স্বাধীনতা পরিহাসে পর্যবসিত হয় এবং পৃথিবীতে তাহা বারংবার হইতেছেও। শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বলের উপর শাসন বিস্তৃত করিতে চায়, কেবল অহমিকা প্রকাশের জন্য নহে, অপর রাজ্যের সম্পদ শোষণের মধ্য দিয়া সে আপন লোলুপতাকে তৃপ্ত করিতে চায়। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী জাতি এবং পরাধীন জাতির মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

স্বাধীনতা ও পরাধীনতা

ইহা তো গেল জাতি, জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় চেতনার কথা। কিন্তু আন্তর্জাতিকতা কি বস্তু? জাতিতে জাতিতে মানবসমাজ যে বিভক্ত, অতি প্রাচীনকাল হইতেই মহাপুরুষগণ তাহা ভাল চক্ষে দেখেন নাই। ভূগোল এবং ইতিহাসের সীমানা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আপনাদের আদর্শ বিস্তার করিতে চাহিয়াছেন, মানুষে মানুষে মিলনের সেতু রচনা করিয়াছেন। নানাভাবেই সেকালেও পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষ মিলিয়াছে নানা উদ্দেশ্যে। বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়া, ধর্মপ্রচারকে আশ্রয় করিয়া দেশ ও জাতির সীমানা বারংবার অতিক্রান্ত তো হইয়াছেই, প্রধান প্রধান নৃপতির মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ে, শিক্ষালাভের জন্য অন্যদেশ ভ্রমণের মধ্যে, এমন কি কখনো কখনো উদ্দেশ্যহীন দেশভ্রমণের মাধ্যমেও বিশ্বমানবমৈত্রীর কিছু কিছু ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। আবার পররাজ্যজয়ের উদ্দেশ্যে অপর দেশে যখন অভিযান চালানো হইয়াছে, তখনো সেই যুদ্ধ-উদ্দেশ্যকে ছাপাইয়া সাধারণ সৈন্য ও আক্রান্ত দেশবাসীর মধ্যে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানও চলিয়াছে। উদাহরণ হিসাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক প্রভাবে গড়িয়া-উঠা গান্ধার-শিল্পের উল্লেখ করা চলে।

প্রাচীন কালে জাতিতে জাতিতে সম্পর্ক

আধুনিক কালে অবশ্য আন্তর্জাতিক মৈত্রী একটা প্রত্যক্ষ এবং বহুল প্রচারিত আদর্শে পরিণত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ফলে দেশগুলির মধ্যবর্তী স্বাভাবিক

দূরত্ব সংকুচিত হইয়াছে এবং প্রাকৃতিক বাধা লঙ্ঘিত হইয়াছে। এই বিশ্বে কেহই সহস্র চেষ্টা করিয়াও অন্য সব দেশ ও জাতির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ হইয়া বাস করিতে পারে না, এই চেতনা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারের ফল দেশ ও জাতির গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মানবসাধারণের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে। আপন দেশের সীমায় আণবিক অস্ত্রাদি লইয়া পরীক্ষা চালানোও জাতি নিরপেক্ষভাবে বিশ্বমানবের চিত্তে ত্রাসের সঞ্চার করিতেছে। কোন বিশিষ্ট দেশের নব নব দার্শনিক চেতনা ভৌগোলিক বন্ধন না মানিয়া সর্বত্র মানবচিন্তায় প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সাহিত্যশিল্পে নূতন সৃষ্টি সর্বমানবের উপভোগের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই আন্তর্জাতিক চেতনা একালের মানবমাত্রে সাধারণ হইয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক মৈত্রী

কিন্তু একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে সর্বত্রই সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। বহুক্ষেত্রে এই দুই চেতনার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতেরও সৃষ্টি হইতেছে। কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশ যখন অপর জাতির উপর অধিকার বিস্তার করে তখন আন্তর্জাতিক মৈত্রী বা প্রীতির প্রশ্ন আসে না। এক কালে আক্রমণমুখী সাম্রাজ্যবাদ সংস্কৃতি-সভ্যতাহীন দেশগুলিতে তাহাদের রাজ্যজয়লিপ্সাকে সভ্যতা-বিস্তার রূপে বর্ণনা করিতে চাহিত। আজ সেই মুখোস খসিয়া পড়িয়াছে। কাজেই কোন পরাধীন জাতির পক্ষে আন্তর্জাতিক মৈত্রীর প্রশ্নটি বড়ই অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যে পর্যন্ত পৃথিবীতে ঔপনিবেশিকতা বজায় থাকিবে সে পর্যন্ত আন্তর্জাতিকতার পরম আদর্শে পৌঁছানো যাইবে না। পরাধীন জাতিগুলি সাম্রাজ্যবাদী শোষকশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই করিবে, তাহাদের অধীনে থাকিয়া আন্তর্জাতিকতার ধ্যান করিবে না। জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নটি এইরূপে সত্যকার আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিস্বরূপ। স্বাধীন জাতিগুলি আপন স্বাধীনতায় অবিচলিত থাকিলে এবং অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের বাসনাও পরিত্যাগ করিলে আন্তর্জাতিকতার সুস্থ পরিবেশ সৃষ্ট হইতে পারে।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার দ্বন্দ্ব

কিন্তু আক্রমণোদ্যত জাতীয়তা বা অন্ধ জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিক চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এক সময়ে জার্মানীতে ও ইতালীতে জাতীয়তাবোধ এই পর্যায়ে উঠিয়াছিল। 'পৃথিবীতে আমরাই বিশুদ্ধ আর্যজাতি। সমগ্র পৃথিবী শাসন ও ভোগ করিবার অধিকার আমাদেরই'—এইরূপ মতবাদে জার্মান তরুণদের আচ্ছন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছিল। ইহার অনিবার্য ফল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের সমাধি। আবার অত্যুগ্র সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যেও এই বিপদ লুকাইয়া ছিল। ট্রট্স্কিপন্থী কমিউনিস্টগণ সোবিয়েৎ বিপ্লবের সাফল্যের পরে এই বিপ্লবের আদর্শে

জাতীয়তা—অন্ধ জাতীয়তা ঔপনিবেশিকতা ও 'কমিউনিজ্‌ম্‌'

অন্যান্য দেশে সক্রিয় পন্থায় বিপ্লবসংগঠনের প্ররোচনা দানের সংকল্প করেন। বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী এক। বিশ্বের শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাহাদের রাষ্ট্রক্ষমতাকে অধিকার করিতে হইবে। জাতীয় স্বাধীনতার মিথ্যা ধূয়া তুলিয়া বিশ্বব্যাপী এই শ্রেণীসংগ্রামকে বাধা দেওয়া হইল প্রতিক্রিয়াশীলতা। এই ভাবে আন্তর্জাতিক শ্রমিকচেতনার দ্বারা জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রবল আঘাত আসিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু স্তালিনের নেতৃত্বে সোবিয়েতের কমিউনিস্টগণ শেষ পর্যন্ত স্থির করিলেন যে, সমাজতন্ত্রবাদকে কোন দেশে জয়যুক্ত করিবার দায়িত্ব সেই দেশের শ্রমিকশ্রেণীর। বিপ্লব বাহির হইতে আমদানী করা যায় না। এই ভাবে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে কমিউনিজ্‌মের সংঘর্ষ তখনকার মত লঙ্ঘিত হইল। আজিকার পৃথিবীতে মানুষের জাতীয়তা-বোধ এবং আন্তর্জাতিক চেতনা উভয়ই বেশ পুষ্ট। তবে বহু ক্ষেত্রে জাতীয়তা-বাদ ও ঔপনিবেশিকতার মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চলিতেছে; আবার বহু দেশে জাতীয়তাবাদীদের সহিত কমিউনিস্টদের নীতিগত লড়াইও শুরু হইয়াছে। কমিউনিস্টরা আন্তর্জাতিকতার আদর্শে বিশ্বাসী। তবে এই আন্তর্জাতিকতা হইল মূলতঃ শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা। জাতীয়তাবাদীগণ অপর দিকে আপন দেশ ও জাতি—সর্বশ্রেণীর প্রতি আনুগত্যকেই অধিক গুরুত্ব দেয়। তবে বর্তমান পৃথিবীর জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেকেরই মতামতের মধ্যে নানারূপ সংশোধন ও আপোষবৃত্তি প্রকাশ পাইতেছে। কমিউনিস্টগণ আন্তর্জাতিকতার আদর্শে বিশ্বাসী হইলেও জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে সংগ্রাম করিয়া জীবন দিতে প্রস্তুত হইতেছেন। জাতীয়তাবাদীরা বহু দেশেই আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের বাণী প্রচার করিতেছেন।

বর্তমান পৃথিবীতে মতামতের তীব্র দ্বিধা ও যুদ্ধমুখী পরিবেশে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিক চেতনাকে সমন্বিত করার গুরুত্ব সর্বাধিক। বিশেষতঃ মানবপ্রতিভা যখন পৃথিবী অতিক্রম করিয়া গ্রহে গ্রহে পরিক্রমা শুরু করিয়াছে তখন সমগ্র মানব-জাতির মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হওয়া স্বাভাবিক। এই দিক দিয়া "পঞ্চশীলে"র নীতি অনুসরণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। আমার দেশের সার্বভৌমতায় কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিব না। অপর দেশের সার্বভৌমতায় হস্তক্ষেপের বাসনাও করিব না। যুদ্ধের প্রস্তুতি করিব না। অপর জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণা ও দ্বেষ প্রচার করিব না। সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া অপরের সহিত মৈত্রী দৃঢ় করিয়া তুলিব। —এই আদর্শপঞ্চককে সমস্ত জাতি অনুসরণ করিলে জাতীয় মর্যাদা বিসর্জনের প্রশ্ন উঠিবে না, অথচ আন্তর্জাতিক মৈত্রী স্থাপনের সম্ভবনাও দিবে দেখা।

উপসংহার

# ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চেহারা যুগসচেতন মানুষের দৃষ্টিতে আজ অপ্রকাশ নাই। মালিক মহাজনের কুৎসিত আকৃতি পৃথিবীর জনসাধারণের নিকট আজ জঘন্যভাবে উদ্‌ঘাটিত। ব্যক্তিগত মুনাফাশিকারের খড়্গা, কোটি কোটি জনসাধারণের ন্যায্য অধিকারকে পদদলিত করিবার শয়তানী চক্রান্ত ক্রমশঃ এত বেশি প্রকট হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাতে অন্য অভিসন্ধির মায়াজালে আবৃত রাখিয়া মানুষকে ভাঁওতা দিবার কোন সোজা পথই খোলা নাই। একদল পরাশ্রয়ী স্ফীতোদর মানুষ সকল মানুষের সৌভাগ্যকে কৌশলে হস্তগত করিয়া তাহাদিগকে সারাজীবনব্যাপী শোষণ ও শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট করিবে—এই ব্যবস্থা চিরকালের জন্য কখনও চলিতে পারে না। কারণ,—স্বার্থপর মানুষের দুর্নিবার লোভই সমাজকে এইভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করিয়া ধনিকের মুনাফা-মৃগয়ার লীলানিকেতনে পরিণত করিয়াছে। অথচ মনুষ্যসভ্যতার প্রথম যুগে মানুষে মানুষে এই ধনবিভেদ শ্রেণীবিভেদ ছিল না। যদিও গায়ের জোরেই তখন অধিকার সাব্যস্ত হইত, তথাপি সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—অধিকাংশ মানুষকে শোষণ করিবার চাবিকাঠি মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে তখনও আসে নাই।

ধনবাদী সমাজের স্বরূপ

সামন্ততান্ত্রিক মানুষকে কৃষিদাসরূপে যে শোচনীয় জীবনযাপন করিতে হইত, ইতিহাসের পাতায় তাহা কলঙ্কের কালিতে লিখিত রহিয়াছে। মানুষকে সকল মানবীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া বন্য পশুর জীবন যাপন করিতে বাধ্য করার মত বর্বরতাই ধনবাদের শ্রেষ্ঠতম পরিচয়। কোটি কোটি মানুষের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া মুষ্টিমেয় মানুষের 'ব্যাঙ্ক ব্যালান্স' বাড়ানোর মত নৃশংসতা মূলধনী প্রথার দান। এই ব্যবস্থার ফলে অসংখ্য মানুষ অত্যাচারে—অনাচারে—অবিচারে তিলে তিলে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে আর একদল মানুষ সেই প্রবঞ্চনার টাকায় বিলাসের রঙিন ফানুস উড়ায়। এই সে নির্লজ্জ অমানুষিকতা, ইহার মাঝে না-আছে কোন মানবতাবোধ, না-আছে কোন ভদ্রতাজ্ঞান এবং না-আছে কোন শালীনতার আব্রু।

ধনবাদের শোষণ

সমাজবাদের জন্ম এই ধনতান্ত্রিক অব্যবস্থারই গর্ভে। মানুষ চিরকাল এই শোষণ-ব্যবস্থাকে নতশিরে বরদাস্ত করিতে চায় না। এই নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য সে করে পথের সন্ধান। সমাজবিজ্ঞানীরা তাহাদের পথনির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, মানুষের সর্ববিধ দুঃখদুর্দশার মূল কারণ মানুষেরই স্বার্থপর শোষণ-প্রবৃত্তি। শোষণ-ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে মানুষের জীবনে কোনদিনই শান্তি বা সমৃদ্ধির সূচনা হইতে পারে না। এই পৃথিবীতে

সমাজবাদের জন্ম

মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সুখী করিয়া গড়িয়া তুলিবার যাবতীয় উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে—এক শ্রেণীর মানুষ তাহা খাসদখলে রাখিয়া মৌরসী-পাট্টার পালা জমায় বলিয়াই এই শোচনীয় অবস্থা। জনসাধারণের সম্পত্তি যদি তাহাদের হাতে ফিরিয়া আসে এবং যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে তাহাদের অভাব কিসের? মানুষ একথা ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে শিখিয়াছে বলিয়াই তাহাদের শোষণহীন সমাজব্যবস্থার বনিয়াদ পত্তনের কাজে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। দুনিয়ার সর্বহারা মানুষ যেদিন হইতে শিখিয়াছে "পায়ের শৃঙ্খল ছাড়া তাহাদের হারাইবার কিছু নাই, সারা পৃথিবী তাহারা জয় করিয়া লইতে পারে", সেইদিন হইতে তাহারা মুক্তি-পতাকার তলে সমবেত হইয়াছে এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার শ্মশানশয্যার উপরে নবতম সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করিবার সংগ্রামে ব্রতী হইয়াছে। তাহাদের সংগ্রামের সফলতায় যে-সমাজের প্রতিষ্ঠা, সেখানে শোষণ নাই, অত্যাচার-অবিচার নাই, একজনকে বঞ্চিত করিয়া অন্যের সুখী হইবার বিধানও নাই। প্রয়োজন-অনুসারে সকলের অভাব সমভাবে দূরীভূত করা এবং সকলের জীবনকে স্বাস্থ্যে-শিক্ষায়-শিল্পে-সভ্যতায়-সাহিত্যে এবং মানবীয় বৃত্তিনিচয়ের মহত্তম বিকাশে পরিপূর্ণ করিয়া তোলাই তো সমাজের আদর্শ। এই আদর্শের নিশান উড়াইয়া কোটি কোটি মানুষের মুক্তি-মিছিল যতই গিরিবিজয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে, ততই ক্ষমতাভোগী পরগাছার দল নিটোল ভালোমানুষীর সুযোগ খুঁজিয়া মুক্তিকামী জনতাকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করে।

শ্রমিক এবং কৃষক আজ সচেতন হইয়া আপনার হারানো অধিকার ফিরিয়া পাইবার জন্য দুর্মর পণে কঠোর সংগ্রামে রত হইয়াছে। শেষ বিজয়ের পূর্বে বিশ্রান্তি নাই—ইহাই তাহাদের শপথ। ধনবাদের সদ্যোজাত কনিষ্ঠ সন্তান ফ্যাসীবাদ তাই তাহার সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া জনতার অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য অমানুষিক নিষ্ঠুরতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখানে দয়া মায়া মমতা প্রভৃতি কোন কোমলপেলব বৃত্তিরই স্থান নাই—আছে কেবল ক্ষমাহীন নিষ্করুণ সংগ্রামে মুনাফার খবরদারী।

ধনবাদের জঘন্যতম রূপ 'ফ্যাসিজ্‌ম্‌'

কিন্তু সকল শক্তি সংহত করিয়া জনতার অগ্রগতিকে ঠেকানো যায় নাই। পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে সমাজবাদী শ্রমিক-কৃষকদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোবিয়েৎ রাশিয়ার অনুপম আদর্শ বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে আলোক-স্তম্ভের মত দুনিয়ার সকল মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামী চেতনায় প্রেরণা সঞ্চার করিতেছে। ইতিহাসের অভ্রান্ত গতিপথে সমাজবাদেই মনুষ্য-সভ্যতার পরিণতি। আজ আর ইহা অলস কল্পনাবিলাস নয়—শোষণহীন সমাজ আজ

শেষের কথা

বাস্তব সত্য। এই সত্যকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য পৃথিবীর দেশে দেশে বিপুল আন্দোলনের প্লাবন ডাকিয়াছে। আজ সেই মহাপ্লাবনকে বালির বাঁধ দিয়া বন্ধ করিবার জন্য সারা বিশ্বের ধনিকগোষ্ঠী উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে—একটির পর একটি মহাযুদ্ধ বাধাইয়া এই অনিবার্য ভবিষ্যতের হাত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইতিহাসের পথের চাকাকে যেমন থামানো যায় না, তেমনি ধনবাদের শেষ পরিণতি সমাজবাদেরও গতি অপ্রতিরোধ্য।

## রাষ্ট্রীয়করণ নীতি ও ভারত

এ-যুগের সজাগ মানুষমাত্রেই অনুভব করে যে, ক্ষুদ্র স্বার্থে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে সর্বার্থে আপনার কর্মপদ্ধতির প্রসারণের মর্যাদা ও প্রয়োজন সমধিক। 'Self-possession' বা 'আমার'-এর বদলে প্রগতিশীল মানবগোষ্ঠী ভাবে 'Common-possession' বা সাধারণের কথা। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দর্শন এই নীতিতে দীক্ষিত আজ। অতএব, যে-দেশে সমাজতন্ত্রবাদের গুণাগুণের কথা অধিক চিন্তিত বা বিবেচিত হয়, সে-দেশে 'জাতীয়করণ' বা রাষ্ট্রীয়করণ' কথাটাও সুপ্রচলিত ও বহুল জনপ্রিয়।

সূচনা

ইংরাজ 'Social বা Public ownership'-এর নামান্তর 'জাতীয়করণ'। অর্থাৎ জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সব-কিছু সর্বসাধারণের সমান ব্যবহারযোগ্য বা সমান উপভোগ্য হয়ে ওঠে। অধ্যাপক ডারবিন বলেছেন যে, যে-সব পুঁজিবাদী শুধু নিজেদের লাভের জন্যে ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনে ও উৎপাদনবৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকে, সে-সব পুঁজিবাদী জনসাধারণের ভিতর এক উল্লেখযোগ্য অর্থ-বৈষম্য ও অসাম্য সৃষ্টি করে। এই অসাম্য দূরীকরণার্থে সরকারের একমাত্র কর্তব্য ঐ শিল্পের জাতীয়করণ, যদি সে-সরকার জনসাধারণের মঙ্গলবিধানেই অধিকতর মনোযোগী হন। অতএব, 'রাষ্ট্রীয়করণ' বা 'জাতীয়করণে'র অর্থ হচ্ছে, দেশের সমস্ত শিল্পকে সর্বসাধারণের মনোনীত বা নির্বাচিত সরকারের অধিকারে আনা।

'ন্যাশ্ন্যালাইজেসন' বা জাতীয়করণ কি?

রাজনৈতিক বিষয়ে অভিজ্ঞ জনসাধারণ বা নেতৃবৃন্দ জাতীয়করণে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন একমাত্র আদর্শ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে। তাদের এই জাতীয়করণের পশ্চাতে কোন যুক্তিপূর্ণ দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের অধিকারে বা সরকারের অধিকারে আসুক এই হচ্ছে তাঁদের বাসনা, কিন্তু কেন আনা হবে বা আনয়নের কি কর্তব্য, সে-সম্বন্ধে তাঁরা সচেতনতা বা পাণ্ডিত্যের পরিচয় কদাচিৎ দিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে

জাতীয়করণের রাজনৈতিক সংজ্ঞা

রাজনৈতিক দল, কোন বিশিষ্ট দেশের আদর্শে এতো প্রভাবান্বিত হয় যে, তাদের দেশেও ঐ আদর্শপূর্ণ এক সামাজিক ভিত্তি সংস্থাপনের পরিকল্পনা লয়।

শুধু লাভ বা মুনাফার প্রতি যাদের একান্ত দৃষ্টি, তাদের শিল্পকে রাষ্ট্র কেড়ে নেন একমাত্র বৃহত্তর জনসাধারণের হিতার্থেই। সত্যি কথা বলতে কি, অর্থনৈতিক কারণেই আজকাল জাতীয়করণের মর্যাদা বেড়ে চলেছে। পৃথিবীর প্রায় দেশেই সমাজতন্ত্রবাদ একটু-আধটু প্রচারিত হয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্রবাদের মূল উদ্দেশ্য সমাজের মঙ্গল এবং সর্বলোকের সমৃদ্ধি। আর এই সমৃদ্ধি বাস্তবে রূপায়িত হয় তখনই, যখন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে আহরণ করে' উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করা হয় বিশিষ্ট কাজে।

অর্থনীতির ব্যাখ্যা

যে-সব দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি অনুন্নত বা যে-সব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথভাবে জাতীয় উন্নতি বা সমৃদ্ধির জন্যে প্রয়োগ করা হয়নি, সে-সব দেশে জাতীয়করণ অপরিহার্য কিনা, এ বিষয়ে মতানৈক্যের যথেষ্ট অবকাশ আছে। উল্লিখিত কারণে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশে একটি পরিকল্পনা-কমিশন থাকে। এরাই অনুন্নত দেশে উচিত-মতো প্রকৃতির ধনকে কাজে লাগায় ও দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধি করে। এখন এই সম্পদ্ আহরণের ক্ষেত্রে কি সরকারই সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল হবে, না ব্যক্তিস্বার্থ প্রধান পুঁজিবাদী-দিগকেও এ দায়িত্বের অংশীদার করা হবে, এ নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সমালোচনা করে' থাকেন। তবে পরিকল্পনার ধাচের (pattern) উপর নির্ভর করে এই ধরণের মন্তব্য অতএব, জাতীয়করণের কথাও পরিকল্পনা-কমিশনের বিবেচনাধীন থাকে।

অনুন্নত দেশ ও জাতীয়-করণ

কোলিন ক্লার্ক এ বিষয়ে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা-প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত করেন, যে-সব দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ পুঁজিবাদী মতবাদের কার্যকরী পন্থার উপর নির্ভরশীল, সে-সকল দেশের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হচ্ছে—আর্থিক অনটন ও মুদ্রাবৃদ্ধি তথা মুদ্রাস্ফীতি।...আর এই বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ অর্থবিনিয়োগ (investment)। জনগণের সঞ্চিত অর্থকে যথাযথ বিনিয়োগ করার মাঝে নিহিত আছে গণ-সমৃদ্ধি। অতএব, সরকারের প্রথম কর্তব্য এই বিনিয়োগ-নিয়ন্ত্রণের সমস্যাকে তার অর্থনৈতিক কাঠামোয় সন্নিবদ্ধ করে' সমাধানের প্রকৃষ্ট পথ খুঁজে নেবার প্রচেষ্টা করা।

বিভিন্ন মতামত

জাতীয়করণের প্রশ্ন এই অর্থবিনিয়োগ-নিয়ন্ত্রণ-সম্ভূত। দেশের অর্থবিনিয়োগ-নিয়ন্ত্রণ তিন প্রকারে সম্ভব। এই প্রথম প্রকারটি অবলম্বন করেছিল ১৯৩৩-৩৯ সালে জার্মানী। সামরিক প্রস্তুতির জন্যে তদ্দেশীয় সরকার সমস্ত অর্থনীতির উপরই কঠোর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু কোন শিল্পের জাতীয়করণ হয়নি। দ্বিতীয় প্রকারটি দেখা যায় আজ্কের গ্রেটবৃটেনে। সেখানে বৃহৎ

জাতীয়করণ কি অপরিহার্য?

ও মূল শিল্পায়নগুলির রাষ্ট্রীয়করণ-নীতি সরকারের নির্ধারিত নীতি। আর এই নীতির উদ্দেশ্য বেকার-সমস্যাকে নির্মূল করা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। পরন্তু তৃতীয় প্রকারটি দেখা যায় স্বাধীন ভারতে। কয়েকটি সীমাবদ্ধ মূলমন্ত্র নিয়ে আমাদের মিশ্র অর্থনীতিতে সাধারণ শিল্প ও ব্যক্তিগত শিল্প উভয়ই পাশাপাশি স্বাধীনভাবে অবস্থান করার পূর্ণ অধিকার পেয়েছে, যদিও সরকারী নির্দেশানুযায়ী ব্যক্তিগত শিল্পগুলির সাধারণের হিতার্থে পরিচালিত হবার কথা। অতএব, অধুনা স্পষ্টই বলা চলে যে, যদিও সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে জাতীয়করণ একান্তই প্রয়োজন, তথাপি পৃথিবীর কয়েকটি দেশের অর্থনীতি আলোচনা করে দেখা গেল যে, অনুন্নত দেশে উক্ত উপায়-ব্যতিরেকেও যদি নির্দিষ্ট উপায়ে অর্থ-বিনিয়োগ ও অর্থসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রত্যেকটি স্তরে যদি প্রয়োজনীয় সংস্থা ( organisation ) সংস্থাপিত হয়, তা'হলে নির্দিষ্ট সময়ে জাতীয় আয়, উৎপাদন ও চাকরির পদ বৃদ্ধি করা সম্ভব। যদিও উৎপাদনের মূল ব্যবস্থাগুলির ( principal means of production ) জাতীয়করণ সর্বত্র প্রযোজ্য নয়, তথাপি ভারতের জীবনবীমা, পরিবহন ও খনিজশিল্পের জাতীয়করণ অনিবার্য হয়ে পড়ে বিভিন্ন কারণে। অতএব, যে-সব শিল্প বর্তমানে কার্যকর, তাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়করণ কতটা যুক্তিসংগত, এ বিষয়টি অতঃপর আমাদের কৌতূহলী করে তোলে।

উৎপাদনের উপকরণগুলির রাষ্ট্রীয় পরিচালনা ও মালিকানা কয়েকটি কারণাশ্রিতঃ প্রথমতঃ, মুনাফালাভের প্রবৃত্তিসম্পন্ন উৎপাদন-ব্যবস্থার আমূল বিলোপ সাধিত হলে সরকার শিল্পায়তনগুলিকে আপন অধিকারে এনে উপযোগ-সূচক বা কল্যাণকর দ্রব্য উৎপাদন করেন। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয়করণ ধনসম্পদ ও উৎপাদন-উপকরণগুলিকে কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোকের কুক্ষিগত হতে দেয় না—গণতান্ত্রিক বিন্যাস-সম্মত দেশের ধনসম্পদের ন্যায্য ও পক্ষপাতশূন্য বন্টনের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয়করণ ছাড়া প্রাপ্তব্য সম্পদ উৎসের অসদ্ব্যবহারের ফলে দেশের দ্রুত ও ক্রমবর্ধিষ্ণু শিল্পায়ন ব্যাহত হয়। চতুর্থতঃ লর্ড কিন্‌সের মতে, দেশে বেসরকারী উদ্যোগ অপ্রতিহত থাকলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা বা স্থিরতা রক্ষিত হয় না। বেসরকারী বাণিজ্য-উদ্যোগের ত্রুটির জন্যে বাণিজ্যচক্রে তেজী (boom) ও মন্দার (bust) উদ্ভব হয়। প্রাচুর্যের মধ্যে দুষ্প্রাপ্যতা এবং উৎপাদন 'শিখরে-পৌছানো' অবস্থার মধ্যেও ব্যাপক বৃত্তিহীনতা বেসরকারী উদ্যোগের ফলে সর্বদা সংঘটিত হয়। কিন্তু সরকারী কর্তৃত্বাধীনে এ-সব নিবারিত হয়। সর্বশেষে রাষ্ট্রীয়করণের ফলে শিল্পপতি ও শ্রমিকের সুসংবদ্ধ সুস্থ ও আন্তরিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে শিল্পীর বিবাদের উপশম ঘটে।

জাতীয়করণের যৌক্তিকতা

ভারতে জাতীয়করণ নীতি অনেক কারণে যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচ্য। প্রথমতঃ, দেশীয় অর্থসঞ্চয়ের যথাযথ সঞ্চালনে ও উদ্যোগে প্রয়োগব্যবস্থার জন্যে ভারতীয় এক-তৃতীয়াংশ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ অবশ্য কর্তব্য। এই একই উদ্দেশ্যে বীমার রাষ্ট্রীয়করণ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, বৃহৎ শিল্পগুলিতে প্রচুর অর্থ-বিনিয়োগ প্রয়োজন বিধায় ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষে ঐ অর্থ যোগান দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তৃতীয়তঃ, লৌহ ইস্পাত ইত্যাদি শিল্পে যেখানে ভয়-বিপদের সম্ভাবনা বেশি, সে সব শিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগের আগমন ভয়হেতু অসম্ভব। ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিলে ভারত সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্পনীতি থেকে এই প্রতিপন্ন হয় যে, যে-সব শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানায় উপযুক্ত পরিচালনায় অসমর্থ, সে-সব শিল্পকে রাষ্ট্র নিজের দায়িত্বে সংগঠিত করে' তুলবে। ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী প্রস্তাবে যে-কোন ব্যক্তিগত উদ্যোগকে গণস্বার্থে আপন অধিকারে আনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে। তাই দেশবিশেষের জাতীয়করণ ব্যবস্থা আলোচনা করে' স্পষ্টই বোঝা গেল যে, যে-কোন দেশের সর্বজনের মঙ্গলে শিল্পে একচেটিয়া (monopoly) প্রতিরোধকল্পে জাতীয়করণই একমাত্র উপযুক্ত ব্যবস্থা। সর্বতোভাবে বাণিজ্যকে জাতীয়করণ করার ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অব্যাহত থাকে।

ভারত ও জাতীয়করণ

জাতীয়করণের ফলে শিল্পপরিচালনা-নিপুণতা তিরোহিত হয়। সরকারী শিল্পে ব্যক্তিগত শিল্পের মতো ব্যবস্থাপনার দক্ষতা থাকে না। এই অসুবিধার কথা ভেবে শ্রমিকদল ব্রিটেনে বেসরকারী উদ্যোগের ৬০% সরকারী অংশ বলে' নির্দিষ্ট করে। এই ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ পরিকল্পনার 'বিকল্প পদ্ধতি' বলা চলে। সর্বক্ষেত্রে জাতীয়করণের অনেক অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ জোডের মতে, মানুষের ক্ষমতার সাম্যভাব প্রবর্তন করা একেবারে অসম্ভব। কারণ,—প্রত্যেকের ক্ষমতা প্রকৃতিদত্ত। অতএব, সর্বসাধারণকে সমান অধিকার বণ্টনের পরিবর্তে যদি প্রত্যেককে আপন পদ্ধতিতে আত্মবিকাশে সুযোগ দেওয়া হয় তা'হলে প্রতিভার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী।

জাতীয়করণের ফলে অসুবিধা

ধরা যাক্, একজন নাট্যরসিককে যদি নাট্যমঞ্চ স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহ'লে এ-শিল্পের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কারণ,—অর্থব্যয়ে সক্ষম নাট্যপ্রযোজক নাট্যশিল্পের সম্প্রসারণ-মানসে উপযুক্ত শিল্পী খুঁজে বের করে' নেবেনই। অপর পক্ষে কোন এক নাট্যপ্রযোজক আর্থিক অভাবহেতু এহেন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় অক্ষম, অথচ পাশেই এক ব্যবসায়ী লাভের জন্যে এক নাট্যমঞ্চের মালিক এবং সস্তার চমকে অপেক্ষাকৃত মেকি জিনিসের প্রতি আস্থা রেখে প্রকৃত প্রতিভাকে সুযোগ দেন না, সে-ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বা

আলোচনা

সরকারের একমাত্র কর্তব্য উক্ত নাট্যমঞ্চের রাষ্ট্রীয়করণ এবং প্রথমোক্ত কৃতী নাট্য-প্রযোজককে দিয়ে চালনা করার ব্যবস্থা করা। অতঃপর নাট্যপ্রযোজক আপন ক্ষমতাকে প্রতিভান্বিত করার প্রচেষ্টায় সার্থক ব্রতী হতে পারেন। সম্প্রতি কেহ কেহ নিখিল ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকেও রাষ্ট্রীয়করণের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সুতরাং ব্যক্তিগত বা দলগত প্রচেষ্টার উপরে শিক্ষাব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে শিক্ষার সামগ্রিক সমুন্নতি আদৌ আশা করা যায় না। কারণ,—এতে করে ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসাধনই প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকে।

উপসংহার

ভারত-সরকারের নীতি ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয়করণের অনুকূলে পরিবর্তিত হচ্ছে দিনের পর দিন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের জন্যে রাষ্ট্রীয়করণ অপরিহার্য। যে-দেশে এতো কালোবাজারি এবং সুযোগ-সন্ধানী আর যে-দেশে পিছনদরজার মাধ্যমে পাইকেরী হিসেবে কর্মক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বনের সুবিধা আছে, সে-দেশে সর্বকার্যে রাষ্ট্রের হাত সামাজিক দোষত্রুটিকে সংশোধন করতে সক্ষম হবে। তবে ডক্টর জন মাথাই-এর মতে, ভারতের রাষ্ট্রীয়করণ বিচারমূলক (discriminating) এবং জাতীয়-স্বার্থে অত্যাবশ্যক হওয়া উচিত। কারণ, শিল্পক্ষেত্রে স্বাধীন উদ্যমকে উৎসাহিত করা রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। এতে কম ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা আছে। সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয়করণ যদিও অতি সুফল প্রসব করেছে, তথাপি কম্যুনিষ্ট চীনে ব্যক্তিস্বার্থপ্রণোদিত শিল্প ও জাতীয় শিল্প পাশাপাশি অবস্থান করে সুষ্ঠুভাবে। এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সমাজতন্ত্রবাদী দেশের পক্ষে এক অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে।

## সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজগঠন

ভূমিকা

ইতিহাস একটি পরিবর্তনশীল পদ্ধতি। প্ল্যাটো বা আরিস্ততলের সমাজ-দর্শনে যে-আর্থিক সাম্য এবং দৈহিক অধীনতা মোচনের কথা চিন্তা করা প্রকৃতির নিয়ম ও সামাজিক-কারণ-বিবর্জিত ছিল, সেই অর্থনৈতিক সাম্যবাদ ও সামাজিক রীতির ঋজুতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন পাশাপাশি দেখা সত্ত্বেও ইতিহাস আজ বিন্দুমাত্র বিচলিত বা অপ্রস্তুত হয় না। সমাজতন্ত্রবাদের এই দুটি অপরিহার্য উপকরণ অধুনা প্রত্যেক অনুন্নত সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা স্থাপনের পরিকল্পনার দুটি মূলমন্ত্র। কার্ল মার্ক্সের দর্শন আজ সাম্রাজ্যবাদীদের বুকে এক কঠোর আঘাত হেনে তাদের উপনিবেশ হ'তে আর্থিক ও রাজনৈতিক শোষণ ও দলন-সম্ভূত প্রচুর মুনাফা থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। কার্ল মার্ক্সের সমাজতন্ত্রকে প্রগতিবাদী রাষ্ট্রসমূহ যদিও গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, তথাপি

একথা উল্লেখ্য যে, এ-দর্শনকে আধুনিক অর্থনীতিজ্ঞ লিপসন, জিউইক, ডারবিন, ক্লার্ক প্রভৃতি একটু পরিশোধিত আকারে পরিবেশন করায় চেষ্টিত।

প্রথম সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা হয় লেনিনের সোবিয়েত্ রাশিয়ায়। এ-নীতিবাদে গঠিত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে ক্রমে পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, যুগোভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদিও এই মূলমন্ত্রে দীক্ষা নেয়।…অধুনাখ্যাত গণতন্ত্রী চীনও অতি অল্প সময়ে এই আদর্শকে বরণ করে' জাতীয় জীবনে সার্থক প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে জনসমক্ষে। কয়েকটি ধনী-রাষ্ট্র ব্যতীত আজকের দুনিয়ায় প্রায় সকলেই সমাজতন্ত্রবাদের একাগ্র সাধক। তার মূলে যথেষ্ট যুক্তি আছে।…ভারতও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে তার জীবনবোধকে নবতর পর্যায়ে দীক্ষিত করতে সচেষ্ট। অতএব সমাজতন্ত্র কি, তা যদি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যাত না হয়, তা'হলে ভারতের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন কতটা সার্থক, তার ন্যায়বিচার সম্ভবপর হবে না। সাধারণতঃ সমাজতন্ত্র বলতে সর্বস্তরের লোকেরা সরল ভাবে বোঝে সমাজের নীতি। এবং এ-সমাজের নীতি সামাজিক অর্থাৎ সকলের। কিন্তু প্রকৃত সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা একটু ভিন্ন ধরণের। 'Ideal exploitation of resources and equitable distribution amongst the people' অর্থাৎ 'সম্পদের আদর্শময় অবক্ষয় ও সাধারণের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন'ই সমাজতন্ত্রের মূল কথা। পূর্বসূরীরা শুধু ইচ্ছামতো ও স্বার্থপরবশ হয়ে বিনষ্ট করত এ-জাতীয় বিত্তকে, দ্রব্যাদির উৎপাদনব্যবস্থা বা মালিকানার প্রতি খুব বেশি নজর দিত না। তাই পুঁজিবাদী দেশে অর্থের অসমান বণ্টন ও অযথাবৎ দ্রব্য-উৎপাদনব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

সমাজতন্ত্র কি ?

সমাজতন্ত্রী ও পুঁজিবাদীর মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ পুঁজিবাদীরা লাভের-স্বার্থে উৎপাদন করে। জনসাধারণের উন্নতি তাদের কাম্য নয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র দেশের সমস্ত উৎপাদনকেন্দ্র ও ব্যবস্থাগুলি আপন অধিকারে অর্থাৎ জাতীয়করণে এনে নিজেই উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি রাখে যাতে সমাজের পক্ষে হানিজনক কোন পদার্থের উৎপত্তি ও শ্রমিকদের মধ্যে অর্থবণ্টনে কোন অন্যায়ের প্রশ্রয় না নেওয়া হয়। এ-থেকে স্পষ্ট দেখা গেল, সমাজতন্ত্রী দেশে সমস্ত উৎপাদনকেন্দ্র ও তার মালিকানা সরকারের অর্থাৎ সর্বসাধারণের। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিগত স্বার্থলিপ্সু জনসাধারণকে যে-কোন উৎপাদন-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠায় ও উৎপাদনব্যবস্থা নির্বাচন করায় অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আদর্শ সোবিয়েত্ ইউনিয়নে অর্থবিভাগের প্রধান রীতি এই: 'from each according to his ability to each according to his capacity', যদিও মার্ক্সবাদী পূর্বতন আদর্শ ছিল 'from…to

Mixed বা মিশ্র অর্থনীতি

his need', [ কিন্তু ধনতন্ত্রে এ ধরণের নীতি মেনে চলতে হয় না। ] এতে করে হয় সম্পদগুলির যথাযথ বন্টন। অর্থনৈতিক এই দ্বৈত আদর্শবাদের সমন্বয়সাধনে একটি বর্ণসংকর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন আর এক শ্রেণীর লোকেরা। তাঁদের মতে, উভয় মতবাদ থেকে উত্তম ব্যবস্থাগুলো নিয়ে একটা সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থার উৎপত্তি করা চলে, যাকে "Mixed Economy' বা মিশ্র-অর্থনীতি বলে।

এতক্ষণ অর্থনীতিক দৃষ্টিকোণে সীমাবদ্ধ ছিল আমাদের পর্যালোচনা। কিন্তু রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক সংজ্ঞা আরোপেরও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। সমাজতন্ত্র ব'লতে রাজনীতি দিয়ে বুঝি, এমনতর একটি সমাজব্যবস্থা এবং সরকার-গঠন যেখানে আছে সর্বসাধারণের সমান অধিকার এবং শান্তির পথে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে অনুসৃত করায় সরকারের দায়িত্ব। সর্বোপরি, সমাজতন্ত্রের অপর একটি উল্লেখযোগ্য আদর্শ—শ্রেণীহীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন। সোবিয়েত্ ইউনিয়নে উক্ত তিনটি নীতিই যথাযথ অনুসৃত হয়েছে, যদিও অন্যান্য সমাজতন্ত্রে-বিশ্বাসী দেশে অদ্যাপি ঐ তৃতীয় আদর্শকে সহজসাধ্য নয় বলে' কিঞ্চিৎ অমর্যাদা করা হয়েছে। ১৯৪৯ সালে কম্যুনিষ্ট চীনের জন্ম সমাজতন্ত্রবাদের ইতিহাসে এক অনবদ্য অধ্যায়। একচেটিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত করার পরিবর্তে এদেশে কিছু কিছু উৎপাদন-ব্যবস্থার মালিকানা ব্যক্তিবিশেষের অধিকারে রেখে তাদের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। চীনের এ-অগ্রগতিতে ভারত সরকারও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি আগ্রহান্বিত হয় এবং আবাদী কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র ও অর্থনীতি গঠনে বদ্ধপরিকর হন।

সমাজতন্ত্র ও সরকার

আবাদী কংগ্রেসে গৃহীত এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য—ভারতবাসীর আথিক জীবনযাত্রার ও কৃষ্টিগত জীবনবোধে সামাজিকতা ও সৌজন্যের মান উন্নয়ন। জনগণের উন্নতিই ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদের একমাত্র বুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা। এই সংকল্পে অটুট থাকার জন্যে সরকারকে যে যে নীতি মেনে চলতে হয় তাতে কোন মহলের কোন আপত্তির প্রশ্নই উঠবে না। এ-পর্যায়ে মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, আমাদের সমাজে সমাজ তান্ত্রিকতার ধাঁচ দেবার কথা বলা হয়েছে। ব্রিটেনের অর্থনীতির মতো এতে থাকবে শুধু একটা সমাজতান্ত্রিক প্রশ্রয়। একে অপরিবর্তনীয় মৌল-নীতি (dogma) বলে ধরে নেওয়া ভ্রান্তিকর। অতএব মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্র ও আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের পরিকল্পনা মূলতঃ এক নয়।

ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ

আবাদী কংগ্রেসে গৃহীত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের লক্ষ্য সম্বন্ধে জননায়কেরা সমস্বরে বলেছেন যে, "Our aim is the establishment of a 'Socialist pattern of Society', where the principal means of production are under social ownership or control, production progressively speeded up and there is

লক্ষ্য

equitable distribution of the national wealth" আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি আজ এই ধাঁচেই সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের উদ্দেশ্য রচিত। সর্ববিধ সামাজিক অসাম্যের অবসানই এর কাম্য। এবং এই উদ্দেশ্যকে যদি কার্যকরী করার অভীপ্সা থাকে, তবে রাষ্ট্রকে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথে দ্রুততর এগিয়ে চলতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, মূল শিল্পগুলির সংরক্ষণ ও স্থাপনের পর রাষ্ট্রীয়করণের কথাও তখন বিবেচিত হয়। বুদ্ধিজীবী-মহল থেকে এ-প্রস্তাবও আসে যে রাষ্ট্রের বিশেষতঃ, (১) বৃহৎ ও মূল শিল্পের পরিচালনার ভার নেওয়া উচিত; (২) অর্থনৈতিক ভারসাম্য অক্ষুন্ন রাখার প্রতি দৃষ্টি রাখা সর্বদা কর্তব্য; এবং (৩) দেশে যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, (৪) অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কিত সামাজিক উদ্দেশ্য ও প্রবণতার গতি নির্ধারণ, (৫) পরিকল্পনাহীন অর্থনীতিকে এবং ব্যক্তিগত পরিচালনাধীনে ব্যবসায়-সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ, (৬) দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা ইত্যাদি রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণীয় অপরাপর কার্যাবলী।

আর্থিক প্রসঙ্গ

ভারত সরকার একদা শিল্পায়তনগুলির রাষ্ট্রীয়করণের কথা গভীরভাবে চিন্তা করেন। কারণ, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যকে সফলতামণ্ডিত করার জন্য এ-ধরণের পথ অবলম্বনের অপরিহার্যতার বিশ্লেষণ বিরুদ্ধপক্ষ থেকে অনেকবার শ্রুত হয়। কিন্তু হঠাৎ এ-ব্যবস্থা গ্রহণে দেশের আর্থিক অসচ্ছলতা আরও মারাত্মক হয়ে উঠ্‌বে, এই ভয়ে প্রধান মন্ত্রী নতুন ভাবে 'কোম্পানীর নীতি' সংশোধন করেন। ব্যক্তিগত মালিকানাকে যদি সুযোগ না দেওয়া হয়, তা'হলে এটা নিশ্চিত যে পুঁজি-বিনিয়োগে ব্যক্তিবিশেষ বিরত থাকবে—কারণ তাতে তার বিশ্বাস থাক্‌বে না সরকারের প্রতি। তবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাঠামো অনুসারেই শিল্প-ব্যবসায়ে এই পুঁজি-বিনিয়োগ যথোপযুক্ত। এই প্রসঙ্গে সরকারের ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ঘোষিত নতুন 'শিল্পনীতি' বা 'Industrial Policy'র কথা উল্লেখ করা কর্তব্য। এই নতুন আইন অনুযায়ী শ্রমশিল্পকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে: (১) যে-সব শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব সরকারের, (২) যে-সব শিল্পে জাতীয়করণের বিধি আছে সে-সব শিল্পের ক্রমপ্রসারে সরকারের নতুন শিল্পায়তন গঠন, (৩) এবং যে-সব শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধারণতঃ ব্যক্তির হাতে থাক্‌বে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পে ২৯টি বৃহদাকার শিল্পকে সাধারণ-বিভাগের (public sector) পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্যমূলক বিধিমতে (directive principle) এবং সামাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্রগঠনের নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার গতানুগতিক নীতিকে যুগোচিত করে নিয়েছে। তাছাড়া, যে সব শিল্পকে private sector বা ব্যক্তিক্ষমতাধীনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাদের মূল উদ্দেশ্য বাধ্যতামূলক ভাবে হবে জনকল্যাণ।

সরকারের শিল্পনীতি ব্যাখ্যানের পরেই আসে জাতীয় সম্পদের সমতাবিষয়ক বণ্টন (equitable distribution of national wealth)-এর কথা। অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্যের মতে, উৎপাদন-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রাধীনে আনার ফলে ধনতন্ত্র-ঘটিত অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করা সম্ভব। কিন্তু এতে করে তো ক্ষমতার অসাম্যের প্রতি আঘাতের কোন ব্যবস্থাই হয়নি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনে ভারতীয় ভাবধারা অনুযায়ী নিপুণতাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়, একথা মনে নেওয়া অযৌক্তিক যে কোন পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক শক্তিগুলিকে বিলুপ্ত করার চেষ্টাও একান্ত উচিত।

সামাজিক রাষ্ট্রগঠন—কতটা সার্থক ?

সুতরাং শিল্পের দিকে যাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা না হয়, তার দিকে যত্নশীল হলে বৃহদায়তন ব্যবসায়-বৃদ্ধির সীমা-লঙ্ঘন অসম্ভব ও রুদ্ধ হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে কুটির ও গ্রাম্যশিল্পের প্রতি গভীর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাতেও একদিন বৃহৎ শিল্পের সম্প্রসারণ সম্ভব যাতে আবার অর্থনৈতিক অসাম্য বেড়ে যাবে।

বিকেন্দ্রীকরণ

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনকে মূল লক্ষ্য করা হয়েছে তার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সমাজতন্ত্রের পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। ···কিন্তু গ্রাম্য ও কুটীর-শিল্পের সমবায়-পদ্ধতিতে পুনর্গঠনের প্রতি পরিকল্পনাকারীরা যে অতি-আস্থা দেখিয়েছেন তাতে একটু বুদ্ধিজীবী নাগরিকমাত্রেই বোঝেন, গত পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করা যায় যে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিসম্মিলিত সমবায় সংগঠনের বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষমতা অতি অল্প। অতএব, এই নীতি সর্বৈব অগণতান্ত্রিক বলে সন্দেহ জাগায়। দেশের রাজনীতিবিদ্ ও অর্থনীতিবিদ্দের অনেকে বলেছেন, "আমরা সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনে শক্তির বিকেন্দ্রীকরণে প্রাণান্ত চেষ্টার শপথ নিয়েও 'কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ও নির্দেশ' থেকে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কার্যকরী ক'রতে অসমর্থ।"····· তথাপি একটু উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাচাই করলে দেখা যায় যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার ব্রত নিয়েছে ভারতের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা। দেশের বিভিন্ন যোজনায় ও কার্যে সমতা বজায়ের কথা অতি জোর দিয়ে বলা হয়েছে সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনায়। অদূরভবিষ্যতে নিশ্চয় জনগণের ভিতরকার আর্থিক অসাম্য বিলীন হয়ে যাবে। কালক্রমে পুঁজিবাদীদের হাত থেকে অর্থ সাধারণের কাছে এসে যাবে এই সব পরিকল্পনার যথাযথ রূপায়ণে। সর্বশেষে ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের উপর এবং পুঁজিগঠনে উপযোগী শিল্পের উপর সমান গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

যদিও এসব পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হওয়া সময়সাপেক্ষ কথা, এবং যদিও বামপন্থী নেতৃবর্গ ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদকে সমাজতন্ত্র বলেই আখ্যায়িত করতে গররাজী, তথাপি নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আঞ্চলিক অধিবাসীদের উন্নতি, নাগরিক ও গ্রাম্যজীবনের সমতার দিকে দৃষ্টি এবং স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য সমান মর্যাদা ও সামাজিক-মানের ব্যবস্থা স্পষ্টতঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাজতান্ত্রিক উন্নততর প্রগতিবাদী চিন্তাশীলতার পরিচয় বহন করে। প্রধান মন্ত্রী নেহেরু একথা স্পষ্টই বলেছেন,—'জনসাধারণের মানসিক, আর্থিক, কায়িক সব-কিছু উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠার ব্রত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের। জাতির মঙ্গলই আমাদের কাম্য।' তাই যুক্তরাজ্যের মতো আমাদের অর্থনীতিকেও সমাজগত ভাবে নিরাপদ করার (socially insured) একটা প্রচেষ্টা চলেছে। এই ধরণের জাতীয় পুনর্গঠনে একমাত্র প্রতিরোধক শক্তি পুঁজির অভাব যা আমাদের পদে পদে প্রায় সমস্ত জাতির কাছে ঋণদায়ে আবদ্ধ করে ফেলেছে। দেশে সমাজবাদী অর্থনীতি গড়ে' তোলার জন্যে আত্মনির্ভরতাই একমাত্র প্রশস্ত পথ।·· ······তাই বিদেশী সাহায্যের উপর আত্মনির্ভরতার বিষয় উল্লেখে জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক নেতৃবর্গ বলেন যে, সরকারী চেষ্টাগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত পুঁজিবাদের উদ্ভব হওয়া বিস্ময়কর কিছু নয়—পরন্তু সংশয়কর! তবে শ্রেণীবিহীন দেশ নয় বলে' অর্থনৈতিক বৈষম্য তথা পুঁজিবাদী পক্ষপাতিত্ব একেবারে অসম্ভব নয় ভারতে। তবু এই পরিকল্পনা যাতে সফল হয় তার জন্যে ভারতবাসীকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে' যেতে হবে। এমন সমাজতন্ত্রবাদ নেই যেখানে পরিকল্পনা নেই—আবার সমাজতন্ত্রবাদ ছাড়া পরিকল্পনাও হয় না। তাই স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ভিত্তিলগ্ন করার অভিপ্রায় নিয়ে আমরা যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার আশ্রয় নিয়েছি, তারই অপরিহার্য ফলস্বরূপ পরিশোধিত সমাজতন্ত্রবাদ যে আসবে তা সুনিশ্চিত।

উপসংহার

## ভারতের ভূদান-যজ্ঞ ও সর্বোদয়

ভূমিকা

গ্রামবাসীদের অন্তরের অন্তরতম আত্মীয় দরদী গান্ধীজী একদা তাদের অভাবের তাগিদ ও ক্ষুধার যন্ত্রণাকে হৃদয়ের মাঝে উপলব্ধি করে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, যতদিন এদের অভাব-দুঃখ দূরীভূত না হয় ততদিন সুখসমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী ভারতের কল্পনা করা নিছক স্বপ্নবিলাস মাত্র। পল্লী-অঞ্চলের জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রচেষ্টায় ভাবগত ও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন যুগপৎ অপরিহার্য। জনসাধারণের মানসিকতার উর্ধ্বগতি ও আর্থিক বনিয়াদের সুদৃঢ় ভিত্তি-স্থাপনের সংকল্পে অটল থেকে কর্মতৎপর হওয়ার বাণী ও উপদেশ গান্ধীজীর পর প্রথম শুনিতে পাই অবধূত বিনোবা ভাবের কণ্ঠে।

বিনোবা ভাবের 'ভূদান-যজ্ঞ' আন্দোলনের ভিত্তি সাধারণতঃ দর্শনবাদীয়। ভগবানই একমাত্র ভূমির মালিক আর প্রত্যেকের নিজহাতে চাষ করার অধিকার গণতান্ত্রিকতা-সম্মত। এই বোধ হৃদয়ে জাগ্রৎ করে' দাতা যদি নিঃস্বার্থ-ভাবে জমিদানে উৎসাহ প্রকাশ করেন, তা'হলে ভূমির গ্রামীকরণ সাধিত হয়। ভূমির এ-ধরণের গ্রামীকরণকে ভিত্তি করে' কুটিরশিল্পপ্রধান অহিংস সমাজ রচনা করাই সর্বোদয় ভূদান-যজ্ঞের উদ্দেশ্য।

ভূদান-যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি ?

ভগবানের ভূখণ্ড যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী সমাজের অপব্যবস্থার (অর্থনৈতিক) ফলে রূপান্তরিত হয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। একজনের আছে প্রয়োজনাতিরিক্ত আর একজনের আছে প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই স্বল্প। তাই এত হাহাকার! দেশের এই ধনবৈষম্যের মূলে আছে অস্বাভাবিক ভূমিব্যবস্থা। তাই পুনর্বণ্টন, কারো কারো মতে, হিংসার পথেই সম্ভব। কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় এই মনোভাব অপ্রীতিকর চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার বাহক হয়ে উঠ্‌তে পারে। তাই শান্তি ও প্রেমের পথে ভূমি-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সকলেরই ঈপ্সিত।

নীতিগত ব্যাখ্যা

গান্ধীজীর আজীবনের স্বপ্ন 'সর্বোদয়' প্রতিষ্ঠা করার এবং শান্তি-প্রতিষ্ঠায় গ্রাম্য ভূমিবণ্টনের সাধনার এক উদ্দীপনাসূচক রূপ দিলেন আচার্য বিনোবা ভাবে। শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডির একশো একর জমিদানের সঙ্গে সঙ্গেই ভূমিসমস্যা সমাধানের নূতন ইঙ্গিত পাওয়া গেল। স্বতঃপ্রবৃত্ত ভূমিদান আন্দোলনের মাধ্যমে ভূমিসংগ্রহ করে' ভূমিসমস্যা সমাধানের পথে নবতর পরিকল্পনা নিয়ে বিনোবাজী শুরু করেন ভূদান-যজ্ঞ'। ১৯৫১ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে গান্ধীজীকে স্মরণ করে' সর্বোদয়ের লক্ষ্যে এক পুণ্যতিথিতে এই আন্দোলনের শুভসূচনা হয়। অতঃপর ভূদান-যজ্ঞের বাণী বহন করে' সেই হিংসাবিধ্বস্ত তেলেঙ্গানার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াবার সংকল্প করেন বিনোবাজী। প্রথম দু'মাসে দরিদ্রনারায়ণকে লোকে প্রায় ১১ হাজার একর ভূখণ্ড দান করে। পণ্ডিত নেহরুর আমন্ত্রণে ঐ বৎসরের ১২ই সেপ্টেম্বর বিনোবাজী জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সামনে অহিংস সমাজ রচনা সম্পর্কে তাঁর বিচার উপস্থাপনার জন্যে দিল্লীতে আসেন। পদব্রজে আসাকালীন পথে প্রায় ১৮ হাজার একর জমি পেলেন জনসাধারণের কাছ থেকে। দিল্লীর কাজ সমাপনের পর উত্তরপ্রদেশের সর্বোদয়-প্রেমী কর্মিগণ উত্তরপ্রদেশের ব্যাপক ক্ষেত্রে ভূদান-যজ্ঞের পরীক্ষায় বিনোবাকে আমন্ত্রণ জানায়। এদেশে আসার পর ছ'মাস ধরে' তিনি যে আন্দোলন চালিয়ে যান তাতে এক লক্ষ একর ভূমি পান। ১৯৫২ সালে সর্বোদয়ের সেবাপুরী সম্মেলনে ভূদান-যজ্ঞকে সর্বভারতীয় করে' দু'বছরে ২৫ লক্ষ একর

ভূদানের ক্রমবিকাশ

ভূমি সংগ্রহ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ক্রমে ক্রমে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমর্থনে এই আন্দোলন নিখিল ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারকে চাষের উপযোগী কিছু ভূমিবণ্টনের জন্যে পাঁচ কোটি একর পরিমাণ ভূদান সংগ্রহই বিনোবাজীর লক্ষ্য। আন্দোলনটি এক্ষণে 'গ্রামদানে' পর্যবসিত হয়েছে। সমগ্রভাবে গ্রামীণ সম্প্রদায়ই সমস্ত ভূমির অধিকারী। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা স্বীকার করেছে যে, গ্রামদান পল্লীসমূহের উন্নয়ন-ফলে যে ব্যবহারিক সফলতা পাওয়া গেছে তাতে করে' সমবায়মূলক পল্লী-উন্নয়নের তাৎপর্য বেশ ভাল ভাবেই বোঝা যায়। ১৯৫৮ সালের মে মাসে মাউন্ট আবুতে উন্নয়ন-কমিশনারদের অধিবেশনে ভূদান ও গ্রামদানের মধ্যে আরও নিকটতর সহযোগিতা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমাজ-উন্নয়ন ব্লকসমূহ স্থাপনের ব্যাপারে গ্রামদান পল্লীসমূহের অগ্রাধিকার এখন থেকে মেনে নেওয়া হবে। ভূদান জমিসমূহের আহরণ ও বণ্টনের সুবিধার্থে বিভিন্ন রাষ্ট্রে আইন প্রণীত হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে বা অঞ্চলে ১৯৫৮ সালের জুন মাস অবধি দানপ্রাপ্ত ভূমির আয়তন ৪৪,০০,৯০৫ একর এবং বণ্টিত ভূমির আয়তন ৭,৮২,৫২৫ একর। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী থেকে গ্রামদানের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১৯৫৭ সালের গ্রামদান ও ভূমিদান-যজ্ঞ গ্রামবাসী চাষীদের নবজাগরণের ও সৌভাগ্য-যুক্ত হওয়ার এক নূতন অধ্যায় রচনা করে। আচার্য কৃপালনী তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎ-কারে বলেন যে, গান্ধীজীর জীবনের আদর্শ বিনোবাজীর অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মযোগ সম্পন্ন করে যাচ্ছে। তাঁর মধ্যেও এই বিভূতির বিকাশে এ কথা স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, "বিদেশী শাসনের অবসান ক্রান্তির একটি পদক্ষেপ মাত্র। উহা পূর্ণ স্বরাজ নয়।" তাই ক্রান্তি একমাত্র তখনই সম্ভব যখন দেশের প্রতিটি মানুষ সর্ববিষয়ে মুক্তি পাবে। গ্রামদান জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য-প্রতিষ্ঠার স্ফুটনাত্মক অধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট পর্যায়। তাই বিনোবাজী এর নামকরণ করেছেন ভূমি-ক্রান্তি। ভূমিক্রান্তি মূল পঞ্চসোপানের পঞ্চম সোপান। পৃথক্ ভাবে প্রতিটি সোপানের নাম: (১) অশান্তি দমন; (২) ধ্যানাকর্ষণ; (৩) নিষ্ঠানির্মাণ; ৪) ব্যাপক ভূমিদান; (৫) ভূমি-ক্রান্তি।

পঞ্চসোপান

সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, স্ত্রী-পুরুষভেদ ইত্যাদি দূর করে' প্রতিটি মানুষকে পরমেশ্বর-পুত্র গণ্য করে' সারা গ্রামকে একটি পরিবারে পরিণত করার মহান পরিকল্পনা এই গ্রামদানের। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—ঐ আদর্শের এবং আত্মত্যাগেরই সুদূরপ্রসারী ফল। এতে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু মালিকানার সুবিধা গ্রামবাসীদের অক্ষুণ্ণ থাকে অর্থাৎ তারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জমিচাষের অধিকারী

সমগ্র গ্রামদান বা ভূমির গ্রামীকরণ

হিসেবে বহাল থাকে। বিনোবাজীর মতে, ভূদানের প্রথম পদক্ষেপে কোন ব্যক্তি ভূমিহীন থাকবে না আর অন্তিম ধাপে ভূমির কোন মালিকই থাকবে না। সমগ্র গ্রাম-দানের ফলে, প্রথমতঃ সমষ্টিগত আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, পারস্পরিক বোঝা-পড়ার পটভূমিতে সাংস্কৃতিক জীবনে বৈশিষ্ট্য আনয়ন অবশ্যম্ভাবী। এতে মানবতা ও পরস্পরের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি বৃদ্ধি পাবে। তৃতীয়তঃ, এর ফলে জনসাধারণ বাদবিসংবাদ, হিংসাদ্বেষ ভুলে নৈতিক জীবনের অগ্রগতির দিকে পা বাড়াবার সাহস পাবে। চতুর্থতঃ মানুষ 'আমি' ও 'আমার' ভুলে সর্বজনীনতায় নিজকে মিশিয়ে দিয়ে আত্মিক উন্নতি-সাধনে চেষ্টিত হবে।

সর্বোদয় ও ভূদানের সমন্বয়সাধনে সাম্যবাদের প্রাধান্য

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন অহিংস সমাজপ্রতিষ্ঠার কল্পনা সর্বপ্রথম গান্ধীজীর মানসপটে অঙ্কিত হয় এবং এই পরিকল্পনার প্রস্তুতির জন্যে তিনি ১৮ দফা সংগঠন-কার্যের ব্যবস্থা করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনকালেও অভিন্নভাবে উক্ত সংগঠন দেশের সর্বত্র অল্পবিস্তর কাজ করে' যাচ্ছিল।···রাস্কিনের 'আনটু দি লাষ্ট'-এর অনুবাদের নাম গান্ধী নিজেই দিয়েছিলেন 'সর্বোদয়'। অনুবাদের ভূমিকায় তিনি বলেন, '···সকলের সর্বপ্রকারের কল্যাণসাধনে সমাজজীবনে আলোক দেওয়া দরকার। সকলেরই হিতসাধন জীবনের তত্ত্বজ্ঞান হওয়া চাই।' অহিংস সমাজরচনার মূলে আছে এই তত্ত্বজ্ঞান। তাই মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত, অহিংস সমাজ-ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে 'সর্বোদয়'। রাস্কিনের গল্পটির মূলনীতি 'I will give unto this last even as unto thee' বা 'প্রত্যেকের নিকট থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহণীয় এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী দেয়'—এই আদর্শটি গান্ধীজীকে অধিক পরিমাণে বিমোহিত করে। তাই তিনি সর্বোদয়ের আদর্শে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। গান্ধীজীর মৃত্যুর পর ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে সর্ব-ভারতীয় গঠনমূলক কর্মীদের সেবাগ্রামে সম্মিলিত এক অধিবেশনে সর্বোদয় সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। অতএব স্পষ্টই দেখা যায় যে, ভূদান সর্বোদয়ের আদর্শকে অনুসরণ করেছে মনে-প্রাণে। সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে সাম্যমূলক অর্থনীতির রচনা উভয় পরিকল্পনারই সারমর্ম।

ভূদানের পদ্ধতি

ভূদান-যজ্ঞ বা সর্বোদয় আন্দোলনের বড় কথা হচ্ছে, দাতার অন্তরে ভাব-ক্রান্তি আনয়নের প্রয়োজনীয়তা। না বুঝে যারা দান করে, বা যাদের দানে আন্তরিকতার লেশমাত্র নেই, বা ধনীদের যারা প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির বুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ হয়ে দান করে, তাদের দান সর্বোদয় ভূদান-যজ্ঞের নীতিতে অবজ্ঞাত। ঐ দান সর্বতোভাবে বর্জনীয়। বিনোবার আবেদন,—ধনীরা যেন ভূমি

সমস্যার সমাধানে নিমিত্তমাত্র হয়। দরিদ্রদের ধনীরা ষষ্ঠ পুত্র হিসেবে স্নেহ-অর্থ-সাহায্য-ভূমি দিয়ে যেন যুগধর্মে বিশ্বাসী হয়। এই উদ্দেশ্যে বিনোবাজী তাঁর অমর বাণী প্রেরণ করেছেন ভূদান-যজ্ঞের উদ্বোধনেই।

যদিও ভূদান-যজ্ঞের মূল আদর্শ গান্ধীজীর চিন্তাধারায় প্রথম প্রকাশিত হয়, তথাপি একথা সর্বজনস্বীকৃত যে উপস্থাপনার দিক থেকে বিনোবাজী একেবারে মৌলিক।

ভূদান-যজ্ঞের মৌলিকতা

আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ভূদান-যজ্ঞের বিভিন্ন দিকের প্রতি গভীরতাব্যঞ্জক যে অনুপম প্রকাশভঙ্গী পাওয়া যায়, তা বিনোবাজীর নিজ বৈশিষ্ট্যেরই ফল। গান্ধীজীর চিন্তাকে এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে' তিনি আমাদের সমক্ষে তুলে ধরার সার্থক চেষ্টা করেছেন। ১৯৫৮ সালে বিনোবাজীর এক মন্তব্য ( 'আমি যার নিকট যা পেয়েছি, তা আপনার করে নিয়েছি' ) থেকে স্বচ্ছ প্রতিভাত হয়, বিনোবাজী আপন কৃতিত্বে মৌলিক।

আন্দোলনের দায়িত্ব জনসাধারণের উপর ছেড়ে দেবার অভিলাষ বিনোবাজী অনেক বার প্রকাশ করেছেন। এর জন্যে চাই প্রচুর অর্থসংস্থান। সম্পত্তিদান-যজ্ঞে দানপ্রাপ্ত

আন্দোলনের স্বরূপ

অর্থের একাংশ সর্বসময়ের কর্মীদের জন্যে খরচ করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সম্পত্তিদান-যজ্ঞকে আরো ব্যাপকভাবে চালানো উচিত। তবে এই আন্দোলনকে কোন সংস্থার গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখলে ক্রান্তি-আনয়ন অসম্ভব হয়ে উঠবে। ভূদান আন্দোলনের প্রয়োগাত্মক দিকটিতে রয়েছে ভূমিহারাদের মধ্যে পুনর্বণ্টনের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ ভূমির স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত দান আহরণ। চাষের পরিবেশের বাহিরেও এই আন্দোলন নানাবিধ রূপ নিয়েছে :—যেমন,— সম্পত্তিদান, বুদ্ধিদান, জীবনদান, সাধনদান এবং গৃহদান। ১৯৫৮ সালের ৩১-এ ডিসেম্বর অবধি ৪,৫৭০ গ্রামদান পাওয়া গেছে। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর অবধি ১৪,৪২,১৬০ টাকার সম্পত্তিদান আহৃত হয়েছে। ১৯৫৮ সালে ৫৫ ৪৬৮ টাকা দানপ্রাপ্তি ঘটেছে। দানপত্রের আকারে আরও ৫৯,৫৯২ টাকা এবং আরও ১৯,০০০ টাকা সাধনদান হিসেবে পাওয়া গেছে।

কয়েক বছরের ভিতরে অসাধারণ সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে এই আন্দোলন। শান্তিকামী ভারতবাসীর শান্তিনীতিতে গ্রাম-বণ্টনের প্রস্তাব অবশেষে মনঃপূত হয়।

সমালোচনা

তথাপি একথা বলা যুক্তিবাদিতার পরিচায়ক নয় যে, এই পরিকল্পনা ভ্রান্তিহীন নিশ্ছিদ্র। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের প্রায় রাষ্ট্রে ভূমিসংক্রান্ত আইনে যে কতকগুলি বিবর্তন-ধারা প্রবর্তিত হয়েছে, তাকে নাকি প্রাক্-জমিদারী-উচ্ছেদোত্তর যুগের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত ভূদান-যজ্ঞ মেনে চলে না। তদুপরি ভূমির ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিভাগ ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর।

পুঁজিবাদী ও কম্যুনিষ্টরা এ-বিষয়ে একমত। কিন্তু বিনোবাজী বলেন, 'এঁরা চান উৎপাদন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হোক্। কিন্তু বণ্টনের বিষয়ে উভয়ে একমত নন। পুঁজিবাদীরা বলেন, দক্ষতা অনুসারে বণ্টন হোক্, আর কম্যুনিষ্টরা সমবণ্টন চান।…কিন্তু আমরা চাই, উৎপাদন-ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত হোক্। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে বিরোধে ওঁরা এক হয়ে যান। এরূপে যাঁরা পরস্পর-বিরোধী তাঁরাও এক হয়ে যেতে পারেন কোন কোন বিষয়ে।'……কেউ কেউ বলেন, দানের জমির সব-কটি অনাবাদ যোগ্য। কিন্তু তথাপি এতে যে দানের ত্যাগটুকু আছে তাতো অবশ্য স্বীকৃত!……কিন্তু যুগ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তার সঙ্গে প্রত্যেকটি সজাগ মানুষের চিন্তাবৃত্তির কতটা অগ্রগতি হয়েছে, তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বামপন্থী নেতা শ্রীগোপালনের মন্তব্যে—'যদিও ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলন থেকে বিনোবাজী যতটা প্রত্যাশা করেন আমরা তা করি না, এবং মনে করি যে, আইন ব্যতীত এ-সমস্যার সমাধান অসম্ভব, তথাপি এ-আন্দোলন একটা ভালো আন্দোলন বলে মনে করি।'

উপসংহার

সে যাই হোক, সর্বপ্রকারের নাশকতামূলক সমালোচনা বর্জন করে' হৃদয়ংগম করা উচিত একজন মহান্ আত্মত্যাগী সন্ন্যাসীর দরিদ্র-কাঙ্গালের দুঃখঃ-দুর্দশা মোচনের মহান্ ব্রত কত মহত্ত্বের দ্যোতনাময়! আজ্‌কের ঘাত-প্রতিঘাত-পূর্ণ বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাসংকুল এই পৃথিবীর একটি রন্ধ্রে বিনোবাজী গান্ধীবাদকে অন্তরে স্থান দিয়ে ভারতে যে কল্যাণমূলক অহিংসার পথে নব-সমাজের রচনায় একাত্ম হয়েছেন তা বিশ্ববাসীর নিকট প্রকৃতই এক পরম বিস্ময়।

# ভারতের বন-মহোৎসব

জাতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান হিসাবে ১৯৫০খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সর্বপ্রথম 'বন-মহোৎসব' অথবা 'অধিক বৃক্ষ ফলাও' অভিযান তৎকালীন কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকে. এম্. মুন্সী কর্তৃক উদ্‌যাপিত হইলেও, বনস্পতি মানবসভ্যতার সেই আদিম ঊষা হইতেই বিদ্যমান। ইহা আমাদের নূতন আবিষ্কার নয়। বৈদিক যুগে ঋষিরা বলিয়াছেন 'ওষধিঃ বনিণঃ তুষন্তি' অর্থাৎ 'ওষধিরা বনবাসীদের সেবা করে'। ভারতের সভ্যতা তপোবনেই উদ্ভূত। আর্যধর্মের চতুরাশ্রমের ব্রহ্মচর্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস অতিবাহিত হইত ঐ তপোবনেই। তপোবনের ঋষিরা ছিলেন সভ্যতার পরিপোষক, ধর্মনীতি রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতির পুরোহিত। তাঁহাদের সুললিত বাণী আজও ভারত বিস্মৃত হয় নাই। তপোবনের বৃক্ষরাজির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। একই পরিবারের আপন জন ছিল তপোবনের বৃক্ষলতাদি। তাপস-কন্যাগণের আলবালে

সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় বনের স্থান ও অবদান

জলসেচন—বিদায়ক্ষণে সাশ্রুনয়নে বনতোষিণীকে আলিঙ্গন—বৃক্ষপল্লবকে সাদর চুম্বন—কি নিবিড় আত্মীয়তারই-না সাক্ষ্য দান করে! আরণ্যক সভ্যতার প্রতিভূ ভারত সেই জন্য বৃক্ষকে চিরকালই আত্মীয় ভাবিয়াছে। ধর্মের অঙ্গরূপে বৃক্ষের প্রতিষ্ঠান, বা রোপণকে সে গ্রহণ করিয়াছে। বনস্পতিকে দেবতাজ্ঞান অজ্ঞতার নামান্তর নয়। আধ্যাত্মিক দিক দিয়া ভারতের এমন গৌরবময় উন্নতি পৃথিবীর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। সেই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলে জানা যায়, প্রাণের বিকাশসাধনই বন-মহোৎসবের মূল মর্ম। বৃক্ষের প্রাণ আবিষ্কার আধুনিক বৈজ্ঞানিকের কীর্তি হইলেও ভারতের তপোবনসম্মত ঐ অধ্যাত্ম-উপলব্ধি ও আবিষ্কার কিন্তু প্রাচীন কালেরই। সেইজন্য বীজের মধ্যবর্তী আত্মাকে বিকাশের সুযোগ দিয়া সমুন্নতির পথে মুক্তিদানই বন-মহোৎসবের লক্ষ্য। বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগেও এই উপলব্ধি, এই ব্যবস্থা চালু ছিল। রাজতন্ত্রের যুগেও রাজন্যবর্গ তপোবনকে শান্তি প্রীতি ও আদর্শের নিকেতন বলিয়া ভাবিতেন। রাজপুরোহিতগণ থাকিতেন তপোবনে। তারপর ঐতিহাসিক যুগেও বৃক্ষরোপণ অজ্ঞাত ছিল না। জনকল্যাণের সুমহান্ আদর্শ সম্রাট্ অশোককে বৃক্ষরোপণের প্রেরণা দান করিয়াছিল। অশোকের শিলালিপিতে লিখিত আছে—'আমি পথিপার্শ্বে বটবৃক্ষ ও আম্রবৃক্ষ রোপণ করেছি—এরা মানুষ আর পশুকে সুশীতল ছায়া ও ফল দান করবে।'

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার কুঠারাঘাতে বননাশ ও ইহার প্রতিকারকল্পে 'বন-মহোৎসব' উদ্‌যাপন

ভারতীয় সভ্যতার স্মৃতিকাগার ঐ অরণ্যকে মানুষের লোভ যেদিন ধ্বংস করিয়া উহাকে নগর জনপদ ও কৃষিক্ষেত্র প্রসারের জন্য নিয়োগ করিয়া তুলিল আর অধ্যাত্ম-উপলব্ধি যে দিন মানুষ হারাইল, সেইদিন অরণ্যভূমি যাত্রা করিল বিলুপ্তির পথে। প্রকৃতির শ্যামল স্নিগ্ধতা বিদূরিত হইল—রুক্ষকঠোর রসনা বিস্তৃত করিয়া মরু-অজগর আগাইয়া চলিল সভ্যতার প্রাণনাশ করিতে প্রচণ্ড উত্তাপে ধরিত্রীর বক্ষ হইল উত্তপ্ত। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, ভারতের রাজপুতানার মরুভূমির ক্রমবিস্তৃতি নাকি বৃক্ষহীনতারই জন্য, ভারতের নানা স্থানে আধুনিক কালের ঋতুবিপর্যয় বৃষ্টিহীনতা ও রুক্ষতা নাকি অরণ্যসম্পদহীনতারই পরিচায়ক। বিজ্ঞান সেই দৈব-বিপর্যয়ের হেতু অন্বেষণে মনোনিবেশ করিল। তারই আবিষ্কার এই 'বন মহোৎসব'। বিজ্ঞান বলিল, পরিকল্পনা-অনুসারে মহীরুহ রোপণ করিয়া জনপদ ও অরণ্যের ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে অদূরভবিষ্যতে শ্যামল ধরিত্রী মনুষ্যবসতির পক্ষে অযোগ্য মরুতে পরিণত হইবে। ভারতের বন-মহোৎসব এই মানবকল্যাণব্রতের ধারক ও বাহক। তাই স্বাধীনতা-লাভের পর বৃক্ষরোপণ জাতীয় উৎসবরূপে পরিগণিত

হইয়াছে। প্রতি বৎসর বর্ষা-ঋতুতে সরকারী রাস্তার ধারে ধারে ও পতিত জমিতে অসংখ্য বৃক্ষশিশু তথা চারাগাছ রোপিত হইতেছে। এই বৃক্ষরোপণ উৎসবই বন-মহোৎসব।

বৃক্ষরাজির উপকারিতা ও প্রয়োজন

মানবসভ্যতার আদিকাল হইতেই গাছের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গাছপালা নিত্য-প্রয়োজনীয় ইন্ধন দান করে, গৃহ ও গৃহসজ্জা নির্মাণের উপকরণও যোগায়। পশুর খাদ্য, মধু, নানারূপ রং প্রভৃতি পাওয়া যায় অরণ্য হইতেই। জমির সার, রোগীর ঔষধ, কত রকমের সুমিষ্ট ফল, কত রং-বেরঙের ফুলই-না অরণ্য দান করে। ইহা ছাড়া, অরণ্যানী পরিবেশকে করিয়া তোলে মনোরম, বাতাসকে করে বিশুদ্ধ। উহার শ্যাম শোভা কামনাকে দেয় মুক্তি, দান করে সুস্নিগ্ধ সুশীতল ছায়া। এই সহজলভ্য ও সহজদৃষ্ট উপকার ব্যতীত বৃক্ষরাজি মানবের আরও অশেষ কল্যাণ সাধন করে। ইহা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, ভূমিক্ষয় নিবারণ করে, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর অধিক নিম্নে নামিতে দেয় না, দেশের শীতাতপ ও বর্ষার মৃদুতা অথবা তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে, বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পকে আকর্ষণ করিয়া বৃষ্টিপাত ঘটায়, জলবায়ুকে সুসহ করিয়া রাখে। সত্যই বনস্পতি মানসিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে।

বন-মহোৎসবের ক্রমপ্রসার এবং সরকারী বদান্যতা ও কর্মপন্থা

বন-মহোৎসবের প্রথম বর্ষে অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ৩ কোটি বৃক্ষরোপণের লক্ষ্য স্থির করা হয়। কিন্তু কার্যতঃ ৪ কোটিরও বেশি বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। পরবর্তী বৎসরগুলিতে অনুরূপ সংখ্যক বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। প্রথম বৎসরের রোপিত বৃক্ষগুলির মধ্যে শতকরা ৩৮টি এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে রোপিত বৃক্ষগুলির মধ্যে শতকরা ৫৩টি বৃক্ষ বাঁচিয়া আছে। সত্যই বন-মহোৎসব সাধারণের মধ্যে বেশ উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে। সরকার জণগণের উৎসাহ-বর্ধনার্থে বিভিন্ন পুরস্কার প্রদানেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার চার প্রকার শীল্ড প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন : (১) রাষ্ট্রপতি শীল্ড—যে-জেলায় সর্বাপেক্ষা বেশি বৃক্ষ রোপিত হয় তাহাকে দেওয়া হয়; (২) পণ্ডিত জওহরলাল শীল্ড—যে-গ্রামে সর্বাপেক্ষা বেশি বৃক্ষ রোপিত হয় তাহাকে প্রদত্ত হয়; (৩) সর্দারজী শীল্ড—সে-সমবায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্পায়তন বেশি বৃক্ষ রোপণ করে তাহাকে দেওয়া হয় এবং (৪) মুন্সী শীল্ড—সারা ভারতের মধ্যে যে-বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাপেক্ষা বেশি বৃক্ষ রোপণ করে, সেই এই সৌভাগ্যের হয় অধিকারী। সরকারী ভাবে অনুসৃত বন-মহোৎসব অনুষ্ঠানের দ্বারা জনচিত্তও ক্রমেই অধিকতর আগ্রহশীল এবং সচেতন হইয়াছে। বৃক্ষরোপণ প্রতিযোগিতায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহই সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া পুরস্কার লাভে সমর্থ হইয়াছে।

ভারতের আয়তন ১২,৬৯,৬৪০ বর্গমাইল। সুতরাং ইহাতে ৪ লক্ষ বর্গমাইল ঘনসন্নিবিষ্ট অরণ্য থাকিলেই যথেষ্ট। ভারতে বৃক্ষরোপণের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

বৃক্ষরোপণের সম্ভাব্যতা ও লক্ষ্য

প্রতিরক্ষা-বিভাগ, রেলওয়ে, পূর্ত-বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, জেলাবোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ জমিতে বৃক্ষরোপণ করিতে পারেন। বৃক্ষরোপণে জনসাধারণ উৎসুক হইলে সরকার সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। গাঙ্গেয় সমভূমিতে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমির চাষ হয়; প্রতি একরে ২টি করিয়া বৃক্ষরোপণ করিলে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ বৃক্ষ রোপিত হইতে পারে। অর্থনৈতিক কারণেও ফলবান ও সারবান বৃক্ষরোপণ একান্ত আবশ্যক। তাল, খেজুর, আম, তেঁতুল, শিরিষ, নারিকেল, বেত, বাঁশ, বাব্‌লা প্রভৃতি বৃক্ষ সহজে বাঁচে এবং লাভও হয় অনায়াসে। মাটির গুণাগুণ বিচার করিয়া বৃক্ষ রোপিত হইলে বৃক্ষশিশুর মৃত্যুর সম্ভাবনা কম এবং অচিরে লাভও হয় প্রচুর। অর্থকরী, কার্যকরী এবং উপকারী—এই তিন দিকেরই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৃক্ষরোপণ প্রয়োজন।

জনসাধারণকে বৃক্ষপ্রেমিক করিয়া তোলাই বন-মহোৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্বব্যাপী বিরাট্ জীবনের সঙ্গে যোগস্থাপনে শ্যামল তরুরা সাহায্য করে। সবুজের রং যে প্রাণের রং। অরণ্যের সঙ্গে ভারতীয় জীবনের ও সভ্যতার কিরূপ সম্পর্ক, তাহা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়,—"প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখিতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করেনি, বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়নি।...ঔষধি বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাতে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গীতে ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।" বস্তুতঃ আধুনিক ভারতে সরকারী প্রচেষ্টার বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথই তাঁহার শান্তিনিকেতনে বন-মহোৎসবের সূচনা করেন। সত্যদ্রষ্টা কবি বুঝিয়াছিলেন, ভারতের সভ্যতার সংকট আসন্ন। চতুর্থ বার্ষিক বন-মহোৎসবের উদ্বোধনী-বক্তৃতায় পশ্চিম-বঙ্গের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—'কি হিন্দুধর্মে, কি ইহুদীধর্মে, কি খ্রীষ্টধর্মে বা মুসলমানধর্মে যে স্বর্গের কল্পনা আমরা করি, পরজন্মে শান্তি ও আনন্দ ও উপাসনার যে আশ্রয়নীড় লাভের জন্য আমরা কামনা ও চেষ্টা করি, সেই স্বর্গ, সেই আশ্রয়নীড় মূলতঃ একটি উদ্যানেরই অনুরূপ। সেই উদ্যানে মানুষের অন্তরাত্মার সঙ্গে গাছপালা একই সুরে বাঁধা।' সত্যই বন-মহোৎসবের আদর্শ সুমহান্, ইহার লক্ষ্য মানবকল্যাণ।

বন-মহোৎসবের সুমহান্ আদর্শ ও লক্ষ্য

কিন্তু বন-সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের বড়ই অভাব। প্রকৃতই বৃক্ষশিশুর অকালমৃত্যু নিবারণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। বৎসরের মধ্যে মাত্র কয়েকদিন মহাড়ম্বরে জাতীয় অর্থের প্রভূত অপব্যয়ে বৃক্ষরোপণ উৎসবের শৌখীন উৎসাহের ঘটা দেখিয়া দেশব্যাপী সমালোচনারও অন্ত নাই। সত্যই ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানের দ্বিতীয় পাচসালা পরিকল্পনাতেও বনসম্পদ আহরণের কোন লক্ষ্য স্থিরীকৃত নাই। পাচমারিতে কেন্দ্রীয় বনবোর্ডের সাম্প্রতিক অধিবেশনে তৃতীয় পাচসালা পরিকল্পনার সময়ে ২৫ লক্ষ টন বাহাদুরী কাঠ ( timber ) আহরণের কথা আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা তো আর বন-সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য নয়, ভোগের লক্ষ্য। এই বন-সম্পদ উন্নয়নার্থে ১৯৫২ সালের 'জাতীয় বননীতি'তে নূতন বনাঞ্চল সৃষ্টির সমীচীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু সরকার প্রচারিত পরিসংখ্যানই সরকারী ঔদাসীন্য সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নব বনাঞ্চল অতীব সামান্যই সৃষ্টি হইয়াছে আর সংরক্ষণের ছেলেমানুষী নীতির ফলে যে পুরাতন বনসম্পদ বিনষ্ট হইয়াছে তাহারও আয়তন সদ্যোজাত বনসম্পদের তুলনায় ডবলেরও বেশি। তাই বলি,—সরকার কিংবা প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি উৎসবান্তে বৃক্ষশিশু রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন অর্থাৎ কেবলমাত্র আড়ম্বর ও ভাষণদানেই সকল শক্তি বিমূঢ় না করেন, তাহা হইলে বন-মহোৎসব অদূরভবিষ্যতে যথাযোগ্য বনবৃদ্ধি করিয়া সমগ্র ভারতের কল্যাণ অবশ্যই আনয়ন করিবে।

শেষ কথা

## ভারতে দশমিক মুদ্রা ও মেট্রিক পদ্ধতি

১৯৫৭ সনের ১লা এপ্রিলে ও ১৯৫৮ সনের ১লা অক্টোবরে ভারতবর্ষে যথাক্রমে দশমিক মুদ্রা এবং ওজন-পরিমাপের ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের মূলে প্রত্যক্ষতঃ রয়েছে লোকসভা কর্তৃক ১৯৫৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে গৃহীত "ভারতীয় মুদ্রা ( সংশোধন ) আইন ও ১৯৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত ওজন ও মাপের মান নির্ণয়ন আইন।" কিন্তু এই পরিবর্তন আকস্মিক নয়। এর পশ্চাতে সুদীর্ঘকালের চিন্তা ও প্রস্তুতির একটি ইতিহাস আছে। গণিতের ক্ষেত্রে প্রাচীন জগতের মৌলিক অবদান দশমিক পদ্ধতির আবিষ্কার। এই পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় দ্রুতসাধ্য ও সহজতর। এজন্য সমস্ত সভ্য জগৎ ভারতের এই মৌলিক অবদানকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। সভ্যতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতি শুধু গণিতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, পৃথিবীর বহুদেশ এই পদ্ধতির 'গুরুত্ব অনুভব করে' একে নিজ নিজ মুদ্রার ক্ষেত্রেও গ্রহণ করেছে। দশমিক মুদ্রা-পদ্ধতি সর্বপ্রথম গ্রহণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৭৮৬ এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তারপর ফরাসী দেশ ১৭৯৯ এবং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে। আর মেট্রিক

ভূমিকা

পদ্ধতি সর্বপ্রথম আবিষ্কার ও গ্রহণ করেন ফরাসী দেশ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের দুর্যোগময় ক্ষণে; তারপর বেলজিয়ম হল্যাণ্ড লুক্সেমবার্গ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে, সেপন ও ফিলিপাইনস্ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। বস্তুতঃ পৃথিবীর যে ১৪০টি দেশের নিজস্ব মুদ্রা আছে, তাদের মধ্যে ১০৫টি দেশই দশমিক মুদ্রা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। আর মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে ৫৮টি দেশ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যদিও ভারতেই দশমিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়, তবু এতাবৎ ভারতবর্ষ কর্তৃক তা গৃহীত হয়নি। কিন্তু তাই ব'লে ভারতবর্ষ এই ব্যাপারে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিল—একথা বললে অন্যায় করা হবে। অন্যান্য মুদ্রা ওজন ও পরিমাপ-পদ্ধতির তুলনায় দশমিক পদ্ধতির সহজাত শ্রেষ্ঠত্ব-হেতু ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞবৃন্দ বহুকাল যাবৎ এর পক্ষে মত ব্যক্ত করে এসেছেন। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয়েছিল ৯০ বৎসর আগে—১৮৬৭ সনে। সমস্ত বিষয়টি বিশদভাবে পরীক্ষার পর গভর্ণমেণ্ট তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে দশমিক পদ্ধতি ভারতবর্ষে ধাপে ধাপে গ্রহণ করা হবে। ১৮৭১ সনে এ বিষয়ে একটি আইনও পাশ হয়। কিন্তু নানা কারণবশতঃ আইনটি তখন কার্যকরী হয়নি।

১৯৪৫ সনের গোড়ার দিকে ভারত সরকারের অর্থদপ্তর বিষয়টির প্রতি আবার মনোনিবেশ করেন এবং এ-ব্যাপারে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও ভারতের অডিটর জেনারেল-এর মতামত আহ্বান করেন। সমস্ত অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল ও কণ্ট্রোলারদের মতামত গ্রহণ করে অডিটর-জেনারেল দশমিক পদ্ধতি গ্রহণের অনুকূলে মত ব্যক্ত করেন এবং এ-ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে অগ্রসরের পূর্বে যে সকল সমস্যার সমাধান দরকার, তৎপ্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৪৬ সনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৪তম অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আফজল হোসেন এক যুক্তবিবৃতিতে মুদ্রা ওজন ও পরিমাপের দশমিকীকরণের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। ১৯৪৬ সনে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে এ বিষয়ে একটি বিলও উত্থাপিত হয়। কিন্তু আসন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিলটি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। ১৯৪৯ সনে "ওজন ও মাপবিষয়ক বিশেষ কমিটি" তাঁদের রিপোর্টে মুদ্রার দ্রুত দশমিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। ওজন ও মাপের ক্ষেত্রে দশমিক পদ্ধতি গ্রহণের অনুকূলেও তাঁরা নিজেদের মত ব্যক্ত করেন। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ইনস্টিটিউশন-এর সাধারণ সভা উক্ত মত সমর্থন করেন। এইরূপে ধীরে ধীরে বিশেষজ্ঞবৃন্দ, জনসাধারণ ও ভারত সরকারের মতের পোষকতার ফলে ভারতীয় লোকসভা কর্তৃক ১৯৫৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রার দশমিকীকরণ বিষয়ক আইনটি (ভারতীয় মুদ্রা-সংশোধনের আইন) গৃহীত হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতামত

মেট্রিক শব্দটির উৎপত্তি মিটার ( metre ) শব্দ হতে। এই মিটার শব্দটি এসেছে ল্যাটিন metrum বা me ( to measure ) শব্দ থেকে। সংস্কৃত মা ( মাপা ) ধাতুর সহিত তুলনীয়। দশমিক-ভিত্তিক কতকগুলি ন্যূনতম সংখ্যক এককের ভিত্তিতে ওজন ও পরিমাপের অসংখ্য রকমফেরের পরিবর্তে ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ দেশকালনিরপেক্ষ এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ফরাসী বিপ্লবের সময় বিভিন্ন রকম মাপ ও ওজনের ফলে ফরাসী দেশে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তার প্রতিকারকল্পে ফরাসী জাতীয় পরিষদ যে কমিশন গঠন করেন, তাঁদেরই রিপোর্টের ভিত্তিতে ফরাসী দেশে মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলিত হয় ১৭৯৩ সনে। অনেক চিন্তা ও গবেষণার পর ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করেন যে এঁরা পরিমাপ ও ওজনের যে নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করবেন তাতে পৃথিবীর মেরুকেন্দ্র হ'তে বিষুবরেখা পর্যন্ত দূরত্বের কোটি ভাগেকে মূল একক বলে ধরা হবে। এর নাম হবে মিটার। ইহা প্রায় ১·১ গজের সমান। কিন্তু মেরুকেন্দ্র থেকে বিষুবরেখা পর্যন্ত দূরত্বের পরিমাপ প্রায় অসম্ভব। তাই এই বৈজ্ঞানিকগণ ফরাসী দেশের ডানকার্কের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হতে স্পেনের বার্সিলোনা শহরের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত পরিমাপের ব্যবস্থা করলেন, আর তারই ভিত্তিতে বিষুবরেখা হতে মেরু পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব ও এর কোটি ভাগের এক ভাগ স্থির করে' মিটারের সৃষ্টি হল। পরবর্তীকালে ষ্ট্যাণ্ডার্ড মিটার তুলনার উদ্দেশ্যে প্লাটিনাম-ইরিডিয়মে তৈরি এক দণ্ডে এই মূল মাপ চিহ্নিত করে' প্যারিসের সন্নিকটবর্তী সেভারস্-এর "আন্তর্জাতিক ওজন ও মাপ কমিটির" গবেষণাগারে সযত্নে এর রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক কালে অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পরিমাপের ফলে স্থির হয়েছে, উল্লিখিত দূরত্বের কোটিতম অংশে ঠিক এক মিটার হয় না। তা ছাড়া, কালের প্রভাবে পৃথিবীর পরিধির পরিবর্তন হতে পারে। সুতরাং মাপের নিখুঁত মান হিসাবে পৃথিবীর সঙ্গে মিটারের সংযোগ খুব বাঞ্ছনীয় নয়। মূল মাপকাঠি হারাতে পারে; কালের প্রভাবে এই ধাতুনির্মিত মাপকাঠির সংকোচন-প্রসারের ফলে মিটারের দৈর্ঘ্যে তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। এই সব কারণে কয়েকজন ফরাসী ও মার্কিন বৈজ্ঞানিক ( পদার্থবিদ্ ) বিশেষ কোন রং-এর আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সাহায্যে এর মাপ নির্ণয় করে রেখেছেন। আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপরিবর্তনশীল, স্থানকালনিরপেক্ষ। ফলে, দেশকালপাত্রের পরিবর্তনে বা পৃথিবীর কোন দৈবদুর্বিপাকে এই মূল মাপকাঠি হারাবার কোন ভয় নেই। যে কোন সময়ে এর পুনরুদ্ধার সম্ভব।

মেট্রিকে'র তাৎপর্য ও এই পদ্ধতির আবিষ্কারের গোড়ার কথা।

মেট্রিক পদ্ধতির মূল কেন্দ্রীয় একক মিটার। এই একককে পর্যায়ক্রমে ১০ দিয়ে

গুণ অথবা ভাগ করে' এমন এক পরিমাপ-পদ্ধতির আবিষ্কার করা হইয়াছে, যা বর্তমান যুগের বিজ্ঞান-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে প্রযোজ্য। মেট্রিক পদ্ধতিতে

মেট্রিক পদ্ধতি কি ?

ডেকা (১০ গুণ), হেক্টো (১০০ গুণ) ও কিলো (১০০০ গুণ) এই উপসর্গসমূহ প্রধান একক (unit)-সমূহের গুণিতকরূপে ব্যবহৃত হয়; আর এদের দশম অংশীয় গুণিতকরূপে ব্যবহৃত হয় ডেসি (১/১০), সেণ্টি (১/১০০) ও মিলি (১/১০০০) এই উপসর্গসমূহ। উপরের এই ছয়টি উপসর্গ মিটার, গ্রাম ও লিটার এই তিন প্রধান এককের সহিত যুক্ত করে' জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য মূল মেট্রিক এককসমূহ পাওয়া যায়। ওজনের একক হ'ল কিলোগ্রাম, ঘনফল বা আয়তনের (volume) লিটার আর দৈর্ঘ্যের মিটার। মেট্রিক পদ্ধতির সম্পূর্ণ কাঠামোটাই দশমিক-ভিত্তিক। ভারতবর্ষে বর্তমান ওজন ও মাপের হাজার রদমফের, আর তার ফলে দৈনন্দিন লেনদেনের ক্ষেত্রে হাজারো গণ্ডগোল। অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পেয়েছে, শুধু ওজনের বেলায়ই ১৪৩ রকমের পদ্ধতি দেশে প্রচলিত আছে। ক্ষেত্রফল ও ঘনফল (volume) অথবা আয়তন পরিমাপের ক্ষেত্রে এদের সংখ্যা যথাক্রমে ১৫০ ও ১৬০এর চেয়েও বেশি। আবার একই পদ্ধতির অঞ্চলভেদে বিভিন্ন মান। দৃষ্টান্তস্বরূপ মণ সেরের উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতবর্ষে শুধু ১০০ রকমের মণই প্রচলিত আছে। এদের ওজন স্থানবিশেষে ২৮০ তোলা থেকে আরম্ভ করে ৮৩২০ তোলা পর্যন্ত; আর সেরের ওজন ৮ তোলা থেকে শুরু করে ১৬০ তোলা পর্যন্ত। ওজন ও মাপের এই অনন্ত বৈচিত্র্য আমাদের বৈষয়িক জীবনে লেনদেনের ক্ষেত্রে যে অসংখ্য গোলযোগের সৃষ্টি করে, তার অবসানকল্পে প্রায় শতাব্দীকাল ধরে' বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রচেষ্টার পর ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিকবৃন্দ, বিশেষজ্ঞবৃন্দ, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, রাজ্য সরকারসমূহ, জনসাধারণ ও ভারত সরকারের মতের পোষকতার ফলে লোকসভা কর্তৃক ১৯৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসে "ওজন ও মাপের মান নির্ণয়ন" বিষয়ক আইনটি গৃহীত হয়।

অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতবর্ষ যখন বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, তখন চিরাচরিত মুদ্রা ওজন ও পরিমাপপদ্ধতির পরিবর্তন করে' নূতন পদ্ধতি প্রচলনের এমন কী প্রয়োজন

বর্তমান সময় কি অনুকূল ?

ছিল? পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দশমিক পদ্ধতি চালু হয়েছে বলে' আমাদের দেশেও এর প্রচলন করতে হবে, এমন কি কথা আছে? ব্রিটেনের মতো শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ রাজ্যে এখনও তো দশমিক পদ্ধতি চালু হয়নি? ইত্যাদি, ইত্যাদি। কথাটা ভেবে দেখবার মতো। ভারতের বর্তমান মুদ্রা ওজন ও পরিমাপপদ্ধতি বহুকালাগত; এ সুষ্ঠুভাবে দেশের জনসাধারণের চাহিদা মিটিয়ে আসছে। শত শত বৎসর ধরে' বংশানুক্রমে অভ্যাসমসৃণ

হতে হতে বর্তমান মুদ্রা ওজন ও পরিমাপ-পদ্ধতির হিসাব একটা সহজাত সংস্কারে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বিশেষতঃ শুভংকর প্রভৃতি গণিতবিদ্‌দের কল্যাণে বিভিন্ন অঞ্চলে অতি অল্প সময়ে মুখে মুখে হিসাবের রেওয়াজ জনসাধারণ তথা অল্পশিক্ষিত ছোটখাট ব্যবসায়ীদের মধ্যেও বহু প্রচলিত। নূতন মুদ্রা ওজন ও পরিমাপ প্রচলন জনসাধারণের মধ্য থেকে এই সহজাত হিসাবকুশলতার ভিৎটুকু সরিয়ে নিয়ে তাদের বিহ্বলতার গভীর জলে নিক্ষেপ করবে। উপরের কথাগুলির যুক্তিবত্তা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষতির পিঠেই একটা লাভের অঙ্কও হামেশাই থাকে। গণিতে দশমিকের ব্যবহারের ন্যায় মুদ্রা ওজন ও পরিমাপে দশমিকের ব্যবহার বর্তমান পদ্ধতির তুলনায় সহজতর হবে—একথা বুদ্ধি দিয়ে একটু বিচার করলেই হৃদয়ংগম হবে। শত শত বৎসরের অভ্যাসমসৃণ সহজাত হিসাব-কুশলতা নূতন পদ্ধতি গ্রহণের ফলে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে—এমন কোন আশঙ্কার কারণ আছে বলে মনে হয় না। তা'ছাড়া, নূতন পদ্ধতিতেও বর্তমান পদ্ধতির ন্যায় নূতন নূতন সহজসাধ্য হিসাবের আর্যা ও প্রণালী কালক্রমে আবিষ্কৃত হবে—এরূপ আশা করা বোধ হয় খুব অন্যায় হবে না। যাক্, আগের কথায় ফিরে যাই। ব্রিটেনে দশমিক মুদ্রা ওজন ও পরিমাপ প্রচলিত হয়নি তার কারণ এই নয় যে, সে দেশে দশমিক পদ্ধতির উপকারিতা অনুভূত ও স্বীকৃত হয়নি। বস্তুতঃ সে-দেশে দশমিক পদ্ধতির উপযোগিতা বহুস্বীকৃত। কিন্তু কতকগুলো বাস্তব সমস্যা সে-দেশে মুদ্রার দশমিককরণে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। তন্মধ্যে স্বয়ংক্রিয় হিসাবযন্ত্রের ( Automatic Calculating Machine ) বহুল প্রচলনই সর্বপ্রধান। বস্তুতঃ ব্রিটেনের অভিজ্ঞতা আমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার সুযোগ দিয়ে মুদ্রার দশমিকীকরণের অনুকূলে বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও সরকারের মত দৃঢ়তর করেছে। ভারতবর্ষ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রভৃতির ফলে আগামী ১০।১৫ বৎসরে ভারতে শিল্পবাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসার ও সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ স্বয়ংক্রিয় হিসাবযন্ত্রের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। এখন আমাদের দেশে এসব যন্ত্রের খানিকটা প্রচলন আছে বটে, কিন্তু ব্রিটেন প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাদের দেশের কোন তুলনাই হয় না। তা ছাড়া, বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পরিমাপযন্ত্র প্রভৃতির প্রয়োগ ব্যাপারে আমাদের দেশ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। যদি দশমিক মুদ্রা ওজন ও পরিমাপের প্রচলন আপাততঃ স্থগিত রাখা হয়, তবে শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রচুর হিসাব-যন্ত্রসম্ভার বর্তমান মুদ্রা ওজন ও পরিমাপপদ্ধতিকে অবলম্বন করে' গড়ে' উঠবে, তাদের ভবিষ্যতে দশমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন শুধু সময় ও কষ্টসাপেক্ষই নয়, অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষও বটে। প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে গড়িমসি করে' পরবর্তী সময়ে অহেতুক জাতীয় সম্পত্তি ক্ষয় কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

অন্য একটি কারণেও দশমিক মুদ্রা ওজন ও মাপ প্রচলনের এখনই সর্বোত্তম সময়। দশমিক মুদ্রা পুরোপুরি কার্যকরা হতে হ'লে মেট্রিক পদ্ধতিতে ওজন ও পরিমাপের সঙ্গে এর সংযোগ অবশ্য কর্তব্য। আগামী দশ বৎসরে ধাপে ধাপে ওজন ও মাপের দশমিকীকরণ সম্পন্ন হবে বলে সাব্যস্ত হয়েছে। ভারতবর্ষে বর্তমানে ওজন ও পরিমাপের হাজার রকমফের, আর হাজারো রকমের গণ্ডগোল। দেশে একটিমাত্র মুদ্রাপদ্ধতি ও তদনুসারী ওজন ও পরিমাপের প্রচলন এই দুরবস্থা দূর করে' হিসাবনিকাশ, ওজন ও পরিমাপ সরল ও সহজসাধ্য করে তুলবে এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করবে। ফলে ব্যবসাবাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্রেও প্রচুর সুযোগসুবিধার সৃষ্টি হবে। সব দিক দিয়ে বিচার করলে মুদ্রা ওজন ও পরিমাপের সংস্কার যে সময়োপযোগী হয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হয়। অপর একটি কারণে এই সংস্কার অভিনন্দনযোগ্য। কারণটি আর কিছু নয়—ধারাপাত বিভীষিকা। বুড়ি-গণ্ডা, কড়া-ক্রান্তি, ধুল-দন্তি, কাক-তিল, ঘুণ-রেণু প্রভৃতির গোলকধাঁধা। বর্তমান মুদ্রা ওজন ও পরিমাপ সংস্কারের ফলে ধারাপাত ও প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচী হতে এই সব অতি অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর ও কালবারিত পাঠ্যবস্তুর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হয়ে পাঠক্রম নূতন মুদ্রা ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতির সহিত সামঞ্জস্যশীল ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগনির্ভর অংশে সীমাবদ্ধ থাকবে—এ আশা দেশবাসী অবশ্যই করতে পারে।

মুদ্রার সঙ্গে পরিমাপ ও ওজনের সম্বন্ধ

ভারতবর্ষে ইংরাজের আগমনের পূর্বে মুদ্রার ধাতুমূল্য ও মূল্যমান সমানুপাতিক ছিল। নূতন মতবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা সম্বন্ধে লোকের ধারণার পরিবর্তন হল। আর পূর্ণমান মুদ্রার স্থান পরিগ্রহ করল প্রতীক মুদ্রা ও কাগজের মুদ্রা ( token coins and paper currencies )। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়বিধ মুদ্রাই পাশাপাশি চল'ত। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন বিনিময়-হার সঠিকভাবে নির্দিষ্ট ছিল না। কারণও ছিল। বহু রাজ্যে বিভক্ত ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক নরপতির নিজস্ব মুদ্রা ছিল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে, অন্যূন ৯৯৪ রকমের মুদ্রা ভারতে প্রচলিত ছিল। বর্তমান আকার ও আকৃতির (size and form) ভারতীয় মুদ্রা সর্বপ্রথম নির্মিত হয় ১৮৩৫ সনে। আজকাল টাকশাল ব'ললে যা বোঝায় তার গোড়াপত্তন হয় ক'লকাতায় ১৮২৪ সনে আর তাতে মুদ্রানির্মাণের কার্য আরম্ভ হয় ১৮২৯ সনের ১লা আগস্ট তারিখে। প্রায় ১২৫ বৎসর যাবৎ ভারতীয় মুদ্রা এই ঐতিহ্যকেই বহন করে' আসছে। ১৯৫৭ সনের ১লা এপ্রিল থেকে দশমিক মুদ্রা প্রচলনের ফলে সেই ঐতিহ্যপ্রবাহের গতি ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হ'ল। ভারতীয় মুদ্রার

উপসংহার

দশমিকীকরণ অন্যান্য দেশের অনুকরণমাত্র নয়। ভারতীয় মুদ্রাপদ্ধতির কালাগত মূল কেন্দ্রীয় মুদ্রা ( অর্থাৎ টাকা ) ও তার ভিত্তিকে অবিকৃত রেখে দশমিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে এ যেন এক সতর্ক বৃত্তচারণা। ঐতিহ্যসমৃদ্ধ অতীতের সঙ্গে নূতন যুগের ধ্যান-ধারণার অপূর্ব সমন্বয়। পরিকল্পনা-কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রিপোর্টে ওজন ও পরিমাপ সংস্কারের উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার ফলে ১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে এই সংস্কার ভারতবর্ষে বিভিন্ন নির্বাচিত অংশে, সরকারী বিভাগে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। আমাদের সমাজ-জীবনের প্রত্যেকের গায়েই এর স্পর্শ অচিরেই লাগ্‌বে। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর প্রত্যেক সংস্কারের সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের পুরাতন সংস্কার বড়ই দুর্মর ; মানসিক জাড্য নূতন নূতন চিন্তাধারার প্রধান অন্তরায়। একবার আমাদের পুরাতন সংস্কার ও দীর্ঘকাল অভ্যস্ত চিন্তাধারা ঝেড়ে ফেলে যদি নিজ নিজ বুদ্ধির আলোকে প্রস্তাবিত নূতন ওজন ও পরিমাপ-পদ্ধতির বিচার করি, তাহলে এ আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করবে সন্দেহ নেই।*

## আমাদের বেকার-সমস্যা

**ভূমিকা**

(বেকারের দেশ বর্তমান ভারত। মধ্যবিত্ত পরিবারে এর সর্বনাশা অভিশাপ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। পঞ্চাশ বছর আগেও এ-সমস্যা এতটা গুরুতর বা প্রকট ছিল না। জনসংখ্যার অনুপাতে অনতিশিক্ষিত লোকেদের চাষবাসের জমির প্রাচুর্ভাব ছিল না। কয়েক খণ্ড জমি নিয়ে পরিবারের সব কয়েকজন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন গুজরাতে পারত অনায়াসে। কিন্তু এই একখণ্ড জমি ক্রমবর্ধমান পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট রইল না। এ-দেশে শিক্ষাকেও একটু মর্যাদা দিতে লাগ্‌ল জনসাধারণ। ফলে চাকরি বা জীবিকার যথেষ্ট অভাব দিল দেখা।)

**বেকার-সমস্যার স্বরূপ**

(এ-দেশের মধ্যবিত্ত সমাজেই বেকারের হার বেশি। এর একমাত্র কারণ, এই সম্প্রদায়ের সন্তানাদিকে অনন্যোপায় হয়ে ক'রতে হয় লেখাপড়া—যেহেতু অন্য বৃত্তি অবলম্বনের যথেষ্ট অবকাশ নেই। পাশ্চাত্ত্য দেশের মতো এ-দেশে এর স্বরূপ শুধু শিল্পগত নয়, কিছুটা কৃষি-সম্পর্কিতও বটে। চাষবাস মৌসুমী পেশা (seasonal occupation)। বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময়েই অভাগা চাষীদের উপজীবিকাহীন হয়ে চুপচাপ বসে' থাকতে হয়। যেখানে একজন লোক দিয়ে কাজ চলে, সেখানে অনুরূপ বৃত্তির অভাব বলে' বাড়্‌তি লোকজনকে একই কাজের অংশ নিতে হয়। ইহাই অবনিয়োগ (under-employment)।

* বর্তমান গ্রন্থপ্রণেতার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান অনিলকুমার আচার্য, এম. এ.-র সৌজন্যে।

আমাদের দেশে শিল্পের ততটা উন্নতি হয়নি বলে' এখানে শিল্পগত বেকারের সংখ্যা অতি তুচ্ছ। পাশ্চাত্ত্য দেশে এ-সমস্যার ব্যাপকতার একমাত্র কারণ, আন্তর্জাতিক আমদানী-রপ্তানীর বাজারে যখন একটু শিল্পচাহিদা কমে' আসে, তখন বাধ্য হয়ে যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন সংযত করার যৌক্তিকতা অনুভূত হয়। পক্ষান্তরে, আমাদের দেশে শিল্প-শ্রমিকদের প্রাচুর্য তো নাইই, বরং অসদ্ভাবই আছে। যান্ত্রিক-প্রতিদ্বন্দ্বিতা এদেশের প্রতিটি ভীরু মানুষকে শ্রম-শিল্প-বিমুখ করে' চাষবাসে টেনে এনেছে। শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে যে-শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হয়, তাদের বেকারীকে ইংরাজি অর্থনৈতিক পরিভাষায় frictional unemployment বা বাংলায় যান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাসম্ভূত বেকারী বলা হয়।

শিল্পগত বেকারের রূপ

আর এক ধরণের বেকার দেখা যায় ধনী-সম্প্রদায়ে। তাদের অনেকের বাপের বা ঠাকুরদার সঞ্চিত বিত্তে দিব্যি দু'বেলা আহার আর নিত্যনৈমিত্তিক বিলাস-ব্যসনের সংস্থান হয়ে যায়। তাই তাদের চাকরি করতে হয় না। তারা স্বেচ্ছায় বেকার হয়ে থাকে। তারাই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত বেকার (deliberately unemployed)। তবে উক্ত বেকারের সংখ্যা জমিদারী প্রথা-উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই এ-ভূখণ্ডের বুক থেকে প্রায় গেছে মুছে।

স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত বেকার

ভারতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের অনেকেই আজ বেকার। এর একমাত্র কারণ, এরা নানাবিধ চাকরির প্রয়োজনানুসারে নিজেদের মিল খাইয়ে নিতে অসমর্থ। ঈপ্সিত ও প্রাপ্ত চাকরির মধ্যে অসাম্যাবস্থার অপরিহার্য পরিণতিই আনে অর্থনৈতিক সমস্যা। অনেকদিন আগেই মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় উচ্চ বর্ণ থেকে গড়ে' উঠেছিল। ক্রমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে এরা চাকরির ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় দেয়। কিন্তু এদের এই নতুন আয়ের পথে ক্রমে ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিবেশিগণ ঝুঁকে পড়ে। এমন কি পূজো-অর্চনাই যাদের একমাত্র পেশা বা ধর্ম, সেই ব্রাহ্মণেরাও আয়াসে-অর্জিত আয়ের এই পথটি ধরে ক্রমে। ক্রমে নিম্নতর শ্রেণীর লোকেরাও এসে দলভারী করে। ফলতঃ দেখা দেয় চাকরির ক্ষেত্রের অপরিমেয় স্বল্পতা। এই শ্রেণীর লোকেদের ওকালতী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষকতা, কেরানীগিরি, সরকারী চাকরি ইত্যাদির প্রতি গভীর মোহ! কিন্তু এগুলো তো আর সকলকে জীবিকার পথ দেখিয়ে দিতে পারে না।

বেকার-সমস্যার কারণ—
(১) চাকরির স্বল্পতা

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অপরিকল্পিত অর্থনীতিরই নামান্তর। এই অর্থনৈতিক কাঠামোয় যে-সব দেশ সমাসীন, সে-সব দেশে যে ব্যক্তিগত শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্বিবাদে অবস্থান করে এ-কথা সর্বজনবিদিত। এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য যে ব্যক্তিগত শিল্পায়তনের মালিকরা লাভের দিকেই যত্নশীল। এঁরা সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে আদৌ লক্ষ্য করেন না।

(২) ধনতান্ত্রিক সমাজ

তাই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, এ-সব দেশে কখনও পূর্ণ-নিয়োগ সম্ভব নয়। এ-থেকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আমাদের অর্থনীতি মূলতঃ ধনতান্ত্রিক। অন্ততঃ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আগে তো তাইই ছিল। তাই মালিক গোষ্ঠী দেশের বেকার-সমস্যার সমাধান বা বেশি মানুষ-শক্তি ব্যবহার করার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, যন্ত্র দিয়ে যাতে উৎপাদনমূলক দক্ষতা বাড়ানো যায় তার দিকেই নজর দিয়েছেন। তাঁদের এই নীতি উন্নতিশীল যান্ত্রিক ব্যবহারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত।

যদিও পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলে বাহ্যিক উন্নতির হার বর্ধিষ্ণু বলে' প্রতীয়মান, তথাপি এ-অগ্রগতি দেশের জনসংখ্যা পরিবৃদ্ধির অনুপাতে অতি অল্প। সরকারী পরিসংখ্যানে উল্লিখিত জন্মের হার দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যদিও বেকারের সংখ্যা কমাবার যথেষ্ট চেষ্টা হচ্ছে, তথাপি মোট বেকার বেড়েই চলেছে। এর একমাত্র কারণ, দেশমুখ বলেন, চাকরির সুযোগ বাড়তি মানব-শ্রমিকশক্তির সহিত সম পদক্ষেপে চ'লতে অক্ষম।

(৩) উন্নতির স্বল্পতা

দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তির হিড়িক ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। অথচ অনুপাতে সে-ধরণের চাকরির নিতান্ত অভাব এ-দেশে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী-কমিশন শিক্ষিত-বেকার কমাবার উদ্দেশ্যেই ছাত্রদের বেতনবৃদ্ধি, লেখাপড়ায় বাধ্যবাধকতা এবং সবার্থসাধক বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রচলনে অতি-তৎপর।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত বেকার

দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে টাকার মূল্য যে-পরিমাণে হ্রাস পাচ্ছে, তাতে পরোক্ষভাবে বেকারী বাড়ছে বই ক'মছে না। অপর পক্ষে ব্যবসায়ীরা মনে করেন যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, এমন কি শিল্পেও ক্রমশঃ মন্দা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ক্ষতির ভয়ে তাই তাঁরা ছাঁটাই করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন। রপ্তানী-দ্রব্যে সরকারের উৎপাদন-ব্যবস্থার হ্রাসের নির্দেশ, এবং আমদানীর হ্রাস ইত্যাদির ফলেও হয়েছে বেকার-সমস্যার বিস্তৃতি। সর্বোপরি, আমাদের শিল্পপতিরা দ্রব্য-ক্রয়মূল্যের সঙ্গে বিক্রয়মূল্যের সমতা বজায় রাখতে পারেন নি বলেই এই দুরবস্থা। অধ্যাপক ডার্‌বিনের মতে, সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রে—বিশেষতঃ রাশিয়ায়—এই সমস্যা নেই বলে' দেশের শ্রমিক-শক্তি ও শ্রমিক মূল্যের ( labour power and cost) সঙ্গে বিক্রয়মূল্য সামঞ্জস্যসাধনে সমর্থ। তাই এদেশে বেকার নেই।

(৫) অর্থনৈতিক দুর্দশা

বেকার-সমস্যা আমাদের দেশে এত বেশি কেন, এ প্রশ্নের জবাবে আরও একটি কারণ উল্লেখ করা চলে যে, সরকারী নীতির বৈগুণ্যে বরাদ্দ-প্রথার আকস্মিক তল্লিতল্পা গুটানোর ফলে অনিবার্য ভাবে অনেক চাকুরেকে হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে আস্‌তে হয়েছে। তাদের পুনর্নিয়োগের অদ্যাবধি কোন সুব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি। আবার অধিক সংখ্যায় উদ্বাস্তুদের এদেশে আগমন আমাদের বেকার-সমস্যাকে আরও সম্প্রসারিত,

(৬) সরকারী ব্যবস্থা

(৭) উদ্বাস্তু

আরও জটিল করে দিয়েছে। তাই অতি সহজে পুনর্বাসন-জিজ্ঞাসার সমাধান করে' অবশিষ্ট লোকের চাকরির সংস্থানে কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় সরকার অপারগ।

উপরের কারণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য দেশের কথা তুলনামূলক ভাবে পর্যালোচনা ক'রলে স্পষ্টই ধরা পড়ে যে, আমাদের দেশে বেকারের সমস্যা মূলতঃ অর্থনৈতিক। অবশ্য

(৮) সামাজিক কারণ

সামাজিক কারণও অনেক আছে এর পিছনে। বর্ণাশ্রম-প্রথা, একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা, বাল্যবিবাহ—এই কারণসমূহ বেকার-সমস্যার মূলে যতই উস্কানি দিক না কেন, মাড়োয়ারি ভাটিয়াদের ভিতর এ-প্রথাগুলো থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এরা ক্রমোন্নতিশীল। আসল কথা আলস্য ও শ্রম-বিরোধী মনোবৃত্তি এক কথায় শ্রমবিমুখীনতাই আমাদের বেকার-সমস্যার মূল। তাছাড়া আমাদের শিক্ষানীতি ব্যবহারিক বৃত্তিমূলক ও কারিগরিসূচক এবং শিল্পসম্পর্কিত নয়। কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৮০০০ ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত কারিগর প্রয়োজন অথচ অভাব থাকা সত্ত্বেও কর্মচারিদের ভাষায়, 'অনেক কারিগরি-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক এদেশে বেকার। নাগরিক অঞ্চলে প্রতি পরিবারে এ-ধরণের একটি বেকার পরিলক্ষিত হয়।'

ভারতের বেকার-সমস্যা প্রতিকারের জন্য অনেক অর্থনৈতিক-দার্শনিক বহুমুখী ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেছেন সরকারের কাছে। এর প্রথমটি হচ্ছে—

বেকারের প্রতিকার

আমাদের দেশে প্রচুরসংখ্যক বৃহৎ শিল্প গড়ে' তোলার অবিলম্বে প্রচেষ্টা করা সরকারের কর্তব্য। ছোট-বড়-মাঝারি প্রত্যেক প্রকারের নতুন শিল্প প্রস্তুত করায় সরকার অসমর্থ হলে, যারা গড়ে তুলতে উৎসাহী তাদের সাহায্য করতে হবে অর্থ দিয়ে। ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প-পতিদের অর্থ দিয়ে, মানপত্র দিয়ে উৎসাহ দিতে হবে—কারণ, এ-শিল্প প্রধানতঃ কম খরচে করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, এতে বেশী লোক নিয়োগ করা সম্ভব। সুতরাং বেকার-সমস্যা নির্মূল করার পক্ষে শেষোক্ত প্রস্তাব ভারতবর্ষের পক্ষে সময়োচিত ও সুচিন্তিত। তৃতীয়তঃ, সমাধানের কথা উল্লেখ করে' সমাজবিদেরা বলেছেন, জাতীয়-পরিবর্ধন-কার্য (N. E. S.) অনেক লোকের অন্নসংস্থানে সহায়ক হবে। নিম্নতন চাকরেদের জন্যে গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগতভাবে যারা ঘর তৈরী করতে চায় তাদের অনুমতি দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপার বেকার-সমস্যাকে কথঞ্চিৎ লাঘব করতে পারবে। উদ্বাস্তুদের জন্যে নগরী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার প্রস্তাবও এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য।

এ-বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক দিন ধরে' ভেবেছেন। সম্প্রতি অনুরূপ দু'টি নগরী-প্রতিষ্ঠার বিল কেন্দ্রীয় লোকসভা অনুমোদন করেছেন বিনা বিতর্কে। তবে এদের

অর্থনীতিগত প্রস্তাব

কোথায় স্থাপন করা হবে, তা এখনও স্থিরীকৃত হয়নি।......

...সর্বোপরি, বেকার-সমস্যাকে একেবারে জীবনযাত্রার কণ্টক হিসেবে যাতে আর না পেতে হয়, তার জন্যে সরকারের কতকগুলি compensatory

works বা পরিপূরক কাজ আরম্ভ করা কর্তব্য। যদি লোক বাড়্তি থাকে, রাস্তাঘাট নতুন ভাবে তৈরী করা, জনসাধারণের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কাজের আয়োজন করা, এবং এ সমস্ত কাজে ঐ-সব লোক নিয়োগ করা সমাজতন্ত্রবাদী সরকারের অন্যতম অবলম্বনীয় ব্যবস্থা। আর একটি প্রস্তাব সম্বন্ধে সকলে একমত যে, বেশি পরিমাণে লোকনিয়োগ-কেন্দ্র ( employment exchange ) স্থাপন করে' যাতে ঠিকমতো-লোকনিয়োগে অসদুপায় ও পক্ষপাতিত্ব বর্জিত হয় তার দিকে যত্নশীল হওয়া সরকারের উচিত। আন্তঃপ্রাদেশিক গমনাগমনও বেকার-সমস্যার ফলপ্রসূ সমাধান ঘটাতে পারে। একথা সর্বজনগ্রাহ্য যে, আমাদের শিক্ষানীতিতে একটু কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ও শিল্পকে শিক্ষার সম্পর্কে আনার ব্যবস্থা একান্তই বাঞ্ছনীয়। পরিবর্তিত পৃথিবীতে আজ শিক্ষাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করে নেওয়া দরকার। রাশিয়ার মতো অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ব্যবহারিক মানুষ-তৈরি-করার শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা আছে এ-দেশে।

উদ্বাস্তু সমস্যা, পূর্বোল্লিখিত জমিদারী-উচ্ছেদ—বাংলার বেকার-সমস্যাকে অধিকতর জটিল করে তুলেছে। জমিদারী-উচ্ছেদে অন্ততঃ কুড়ি হাজার কর্মচারী বেকার। দর্জিদের মধ্যে বেকারের সংখ্যাও প্রায় পাঁচ লক্ষ। খাদ্যবিভাগে পনেরো হাজার কর্মী ও দূরভাষ-বিভাগেও অসংখ্য কর্মচারী আজ অন্নের ভাগাদে ও বৃত্তিহীনতার শোচনীয় পরিণামে পথের কাঙ্গাল। অর্ধ-বেকার যুবক, প্রৌঢ়বয়স্ক বা উপার্জনশীল পুরুষ, শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত ও নিছক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পুরাঙ্গনা পর্যন্ত আজ পারিবারিক অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার ফলে চাকরি বাঞ্ছা করে বেড়াচ্ছেন। মোট কথা, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার প্রতিচ্ছবি পশ্চিম-বঙ্গের ন্যায় আর কোথাও দেখা যায় না।

পশ্চিম-বাংলার বেকার সমস্যার স্বরূপ

বেকারীর প্রকৃতি ( nature of unemployment ) অনুধাবন করে' অতি সহজেই বোঝা যায়, এ ব্যাধি জাতীয় জীবন থেকে সহজে মুছে যাবার নয়। কারণ, এর প্রতিটি মূল ও প্রশাখা আমাদের ইতিহাসে ও অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনের সঙ্গে জড়িত। জনসংখ্যার বৃদ্ধি কমানোর জন্যে একটা মৌল প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যায় বটে—ইচ্ছাপূর্বক জন্মনিয়ন্ত্রণ এ-সমস্যা থেকে আমাদের অব্যাহতি দিতে পারে। কিন্তু এভাবে জন্ম-প্রতিরোধ করার মতো উচ্চ মানসিকতা ও অগ্রগামী সমাজকল্যাণবোধ এখনও আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হ'তে আরও এক শতাব্দীর ধাক্কা! কিন্তু তাতেও তো আসল প্রশ্নের সুযৌক্তিক মীমাংসা হ'ল না। বাৎসরিক দু'-তিন লক্ষ লোকের জন্মনিরোধের ফলে একটা সমস্যার সমাধান হ'ল বটে—কিন্তু সাম্প্রতিক বেকারদের চাকরি-অপ্রাপ্তির

দার্শনিক দূরদৃষ্টি

নিরসন হ'ল কি করে'? তাছাড়া শিক্ষার সুযোগ থেকে প্রত্যেকটি আগ্রহশীল মানুষকে কিঞ্চিৎ বঞ্চিত করা তথা শিক্ষিত বেকারের হার কমানোর প্রচেষ্টা সত্যই সুস্থ সামাজিকবোধের পরিচায়ক নয়।

ডক্টর পন্থের মতে, অর্থনীতিজ্ঞ কর্তৃক ঘোষিত বেকার যোগান নিয়ন্ত্রণ ও সংকোচন-নীতির ফলে বেকারের সংখ্যা কমে না। তাঁর চিন্তাধারার গতিপ্রকৃতি এইরূপ:

ডক্টর পন্থের মত

অন্যান্য সভ্যদেশের সঙ্গে তুলনায় ভারতের শিক্ষিত নাগরিকের হার অতিশয় সংকীর্ণ। তাই শিক্ষাসংকোচের বদলে সুসমঞ্জসীভূত উপায়ে উত্তরোত্তর শতকরা একশো জনকেই শিক্ষিত করবার প্রয়াস প্রশংসনীয় হবে। কারণ, বেকার-সমস্যার পূর্ণ সমাধান চাহিদার দিকটাতেই নিহিত। এ-প্রসঙ্গে সাতিশয় বিশিষ্টতা-সম্পন্ন জ্ঞান দেবার কোন যুক্তি নেই—যেহেতু এ-জাতীয় শিক্ষার চাহিদা অতি নগণ্য। শিক্ষিতদের নিয়োগ বা তাদের চাহিদা বাড়াবার কয়েকটা প্রকৃষ্ট পথের উল্লেখ করা মোটেই কষ্টকর নয়:—(১) সর্বপ্রকারের চাকরিকে দেশীয় করে' বিদেশীর বদলে দেশীয় নিয়োগ আর্থিক সাশ্রয় ও বেকারী ঘোচাবার কাজে প্রকৃষ্টও বটে। (২) সর্বপ্রকার চাকরির বেতনের হার নির্ধারণ ও সামঞ্জস্য স্থাপন তো সময়েরই চাহিদা। (৩) বাজারে বৃহদাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশীয় অধিকারকে একচেটিয়া করা অপরিহার্য। (৪) বর্তমানের বালসুলভ 'প্রতীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ' পন্থার উচ্ছেদসাধন অচিরে কর্তব্য। (৫) চাতুর্য-পরিচালিত বিনিময় (manipulating exchange), কৌশলোদ্ভাবিত সিক্কানীতি (principle of managed currency) ইত্যাদি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অর্থনীতির বিলুপ্তি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। ডক্টর পন্থের মতে, এ-ধারা অনুযায়ী যদি কাজ চলে তা'হলে প্রতি দশ বছরে শিক্ষিতের হার যদি শতকরা একশো হিসেবেও বাড়ে, তবু শিক্ষিতের চাহিদাকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে পারবে না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগানকে সংকুচিত না করে' তাদের চাহিদা বাড়িয়ে তোলার মধ্যেই আছে বেকার-সমস্যার পূর্ণ সমাধান।

বেকার-সমস্যার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণের ধারাবাহিকতা থেকে এটুকু হৃদয়ংগম হ'ল—১৯৩৮ সালে অখণ্ড-পাঞ্জাবে বেকার-সমস্যার দ্বিতীয় কমিটির মন্তব্য—'শিক্ষার প্রসারই শিক্ষিতদের বেকার হওয়ার অন্যতম কারণ'—আজও অক্ষুণ্ণ এবং অম্লান! জানি না, অনুরূপ ধারণা কতকাল সাধারণের মনে বদ্ধমূল থাকবে! তবে এটা ঠিক দেশে বর্তমানে যে-পরিমাণ শিক্ষিত যুবক প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাট পেরোচ্ছে তার এক-তৃতীয়াংশই থাকছে বেকার! তারপরেও আছে ইস্কুলের ফেল-করা বালক! কারিগিরি-শিক্ষায় অপটু বলে' এরা ব্যবসায়েও অপাংক্তেয়। স্যাড্‌লার কমিশন অতীতে স্পষ্টই বলেছিলেন,

সরকারী মন্তব্য

অহৈতুকী অসন্তুষ্ট বুদ্ধিজীবী পরার্থশ্রমীর (intellectual proletariat) সংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি উৎকৃষ্ট শাসননীতির বিঘ্নস্বরূপ। বিশেষতঃ এই ভারতে যেখানে অশিক্ষিত জনসাধারণ বেশি, সেখানে অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির প্রভাব কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব। তাই দেখি, যে-মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ-ব্যবহারে সমাজের সম্পদবৃদ্ধিতে নিয়োজিত হ'তে পারত, তারই অপব্যবহারের ফলে বেকারের উৎপত্তি। বেকারের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে ইহা এমন এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে, তার উৎপাদন-দক্ষতা (productive efficiency)-কে নষ্ট করে' দিয়ে এক গভীর নৈরাশ্য এনে দেয়। অতএব, বেকার-সমস্যার সমাধান ত্বরিত না হলে জাতীয় জীবন পঙ্গু ও স্থাণু হয়ে পড়বে।......বেকার কমিটিগুলো 'চাষের উপনিবেশ' (farm colonies)-এর সুপারিশ করেছেন পুনঃ পুনঃ। কিন্তু তাতেও সমস্যাটি সেই পুরনো সমস্যারই মুখোস পরবে। ভদ্রলোক ও শিক্ষিত হবে কর্মমুখর, আর চাষীরা হবে জীবিকাহীন!

**পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বেকার-নিরোধ সংকট**

প্রত্যেক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে যথাযথ প্রয়োগ করে' জাতীয় আয় (national income) বৃদ্ধি করা। জাতির আয়বৃদ্ধি ও ধনবৃদ্ধি (capital formation) অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত। আর শেষোক্ত ধনবৃদ্ধির সঙ্গে পূর্ণ-নিয়োগ-ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গী-সম্পর্কিত। আবার পরিকল্পনার মারফতে যতই ধনবৃদ্ধি হবে ততই প্রসারিত হবে চাকরির ব্যবস্থা। ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থ-খাটাবার (investible) ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। চাকরির অনেক ক্ষেত্র (avenues) উন্মুক্ত হয় তাতে। তাই প্রথম পরিকল্পনা উল্লিখিত ব্যবস্থার অভাবহেতু চাকরির বেশি সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। আবার দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অধিকতর প্রত্যক্ষ সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনে যাতে বেকার-সমস্যার অভিশাপ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়, তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী (long-term) লক্ষ্য হিসেবে যদি আমরা বেকার-সমস্যা উচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তা'হলে বেকারদের সামাজিক মূল্য (social cost) দেবার ব্যবস্থা করতে হবে সামাজিক মঙ্গলের জন্যে গঠিত সংস্থার (social security বা social welfare service) মধ্যে দিয়ে।

**দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যবস্থা**

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেকার-সমস্যার সমাধানে সরকারের সামাজিক দায়িত্বের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। কিন্তু সরকারের আর্থিক দৈন্যহেতু সহসা বেকার-সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা সুদূরপরাহত। প্রথম পরিকল্পনার কালে ৪৫ লক্ষ লোকের জীবিকাসংস্থান হয়েছে। বর্তমান জনবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বাড়্তি ১৫ লক্ষ লোকের চাকরির ব্যবস্থা প্রয়োজন। কিন্তু এ-সম্বন্ধে কোন কিছুই বলা হয়নি দ্বিতীয় পরিকল্পনায়।

৮ লক্ষের বেশি লোকের চাকরির ব্যবস্থা হওয়া ১৯৬১ সালের মধ্যে অসম্ভব। কৃষি-কার্যে আরও ১৬ লক্ষ লোকের অবশ্য চাকরি হবে। কিন্তু পরিকল্পনার বিশালতা দর্শনে এই ধারণাই জন্মে যে, পরিকল্পনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দিতে হবে—আর অনেক হাল্কা কাজ আপনা-আপনি সম্পাদিত হবে। এর একমাত্র হেতু—পরিকল্পনাকারীদের দেশের সম্পদ ও অর্থ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও অসতর্ক গণনা। তাতে করে' বেকার সমস্যার কতটা লাঘব হয় তা সমালোচনাধীন। যদিও প্রথম পরিকল্পনার অনুপাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আর্থিক-সংগঠন ও বেকার-সমস্যা সমাধানের দিকে গভীর ও ব্যাপক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, তবু একথা তর্কসংকুল যে এ পরিকল্পনা বেকার-সমস্যার পূর্ণ সমাধানে সক্ষম হবে।

**শেষ কথা**

১৯৫৮ সালে ১লা সেপ্টেম্বর উপ-শ্রমমন্ত্রী আবিদ আলী লোকসভার এক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে গণনামূলক ভাবে কর্মসংস্থানের এক তালিকা পরিবেশন করেন। ৩১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ব্যয়ে পরিচালিত ২০২টি সরকারী কর্ম-সংস্থানকেন্দ্রে আগত ১৫,৮২,৫৮৬টি কর্মখালির সংবাদে এই কর্মসংস্থান-কেন্দ্রগুলি ১০,৩২,২২০ জনের চাকরির ব্যবস্থা করে। গত পাঁচ বছরে নাম রেজিষ্ট্রাকারী ৯১,২৬,৬৫৯ জন লোকের মধ্যে উল্লিখিত সংখ্যক লোক সুপারভাইজার, দক্ষ-শ্রমিক, কেরানী, শিক্ষা-বিভাগীয় পদ, অদক্ষ শ্রমিক ইত্যাদি পদে নিযুক্ত হন। এই তথ্যপাঠে মনে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়। তবু সরকারের কাছে অধিকতর উৎসাহবোধ এ-ব্যাপারে আমাদের কাম্য।

## ভারতের রাষ্ট্রভাষা-প্রসঙ্গ

**সূচনা**

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক বলে' গেছেন, 'মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব—যেহেতু একমাত্র মানুষই তার মতামত ব্যক্ত করার জন্য পেয়েছে ভাষা।' আরিস্তলের এ-উক্তির যাথার্থ্য-বিচারে এ-কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র মাতৃ-ভাষাতেই আপনার মনোভাবের সুচারু অভিব্যক্তি সম্ভব। একথাটি প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতার সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ নয়। তথাপি রাষ্ট্রীয় প্রভাব বা পক্ষপাতবিমুক্ত নয় এই ভাষার প্রশ্নটি।

**রাষ্ট্রভাষা সংবিধানের নির্দেশ**

ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে যে, 'রাজ্যের আইনসভা উক্ত রাজ্যে প্রচলিত এক বা একাধিক ভাষাকে বা হিন্দীকে আইন-প্রণয়নক্রমে উক্ত রাজ্যের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করতে পারেন। আইনসভা কর্তৃক অন্য ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ইংরাজি ভাষাই রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হবে।' কিন্তু ৩৪৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দীই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্র চালুর ১৫ বৎসর ইংরাজি ভাষাই পূর্বের মতো ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে প্রচলিত থাকবে। তবে রাষ্ট্রপতি ঐ সময় ইংরাজি

ভাষার উপরেও হিন্দীকে যে কোন সরকারী কাজের জন্যে ব্যবহার ক'রতে নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু পনেরো বৎসর কাল পরেও পার্লামেণ্টের প্রয়োজনবোধে আইন-প্রণয়ন দ্বারা, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ইংরাজি ভাষার ব্যবহার বজায় রাখতে পারেন।' অতএব, জাতীয় ভাষা এবং রাজ্যসমূহের ভাষা নির্ধারণের চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে গেছে আমাদের লিখিত সংবিধান। সুতরাং আমাদের ভাগ্য অবধারিত। এখানে জনসাধারণের মতামতের খুব বেশি মূল্য নেই।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৬, ৩৪৮ এবং ৩৫১ অনুচ্ছেদে ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। পার্লামেণ্ট অন্য ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সুপ্রীমকোর্ট এবং হাইকোর্টেও ইংরাজি ব্যবহৃত হবে। তবে শাসনতন্ত্রের বিধান, কোন সংশোধনী বিল বা গৃহীত বিল এই আইনের প্রামাণ্য দলিলসমূহ ইংরাজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হবে। কিন্তু ৩৫১ অনুচ্ছেদে হিন্দী সম্প্রসারণের জন্যে সরকারের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ ও প্রকাশভঙ্গী বা ষ্টাইল চয়নে যাতে হিন্দী একটি সমৃদ্ধ ভাষারূপে গর্ববোধ করায় সক্ষম হয় তারই ব্যবস্থা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সংবিধানের অনুরূপ বিধানের ফলে জনসাধারণের কাছ থেকে বিরাট্ এক সমস্যা অন্তর্হিত হয়েছে সত্যি, কিন্তু সমালোচক-মহলের এক অংশ ইংরাজিকে অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

রাষ্ট্রভাষা—হিন্দী ?

সম্ভবতঃ যে কোন রাষ্ট্রে বিদেশী ভাষার উপর একটা গুরুত্ব দেওয়ার রেওয়াজ জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিরোধী বলে' পরিগণিত। কিন্তু ভারতে ইংরাজির মানকে অটুট রাখার পরিকল্পনা উদ্ধত সত্তা থেকে কিছুটা অপসারিত। সংযোগ ও কৃষ্টিগত ভাবের বিনিময়-ব্যাপারে রাষ্ট্রভাষার সমস্যাটি সহজে সমাধানযোগ্য নয়। ভারতে এই সমস্যাটি পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের নিরিখে অধিকতর প্রকটিত হয়েছে। সংবিধানের ৩৪৪ অনুচ্ছেদে বিবৃত সর্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত ভাষা-তদন্ত-কমিশনের বিবরণী প্রকাশের অনতিকাল পরেই কমিশন-প্রস্তাবিত হিন্দী রাষ্ট্রভাষার উপযুক্ত, বা ইংরাজি—যা এতদিন প্রচলিত ছিল—রাষ্ট্রভাষার গৌরব পাওয়ার অধিকারী, এ নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি তুমুল বাদানুবাদ ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতে সরকারী আপিসের ভাষা-প্রয়োগের প্রশ্ন নিয়েই প্রকৃতপক্ষে এ সমস্যার উৎপত্তি।

ইংরাজি বনাম হিন্দী ?

ইংরাজি ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা। অতএব, যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত এই ভাষার জনপ্রিয়তা সর্বাগ্রগণ্য। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই ভাষার সরলতা সর্বজনবিদিত। ভিক্টোরিয়া-যুগের পর থেকে ইংরাজি সাহিত্যের সমৃদ্ধি এই ভাষার লোকপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। যারা সাহিত্যপাঠে উৎসাহী, তাদের কাছে ইংরাজি

ইংরাজির শ্রেষ্ঠত্ব

সাহিত্য কত উপাদেয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে একথাও বলা চলে না যে, ইংরাজির সঙ্গে আর কোন ভাষার বা সাহিত্যের তুলনা হয় না। ফরাসী, চীন, রুশ ইত্যাদি ভাষার সাহিত্যও কম পুষ্ট বা সমুন্নত নয়। কিন্তু একটা কারণে ইংরাজি ভাষা অধিকতর কৃতিত্ব বা প্রশংসার দাবি রাখে। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোক এ ভাষা বোঝে এবং নিরঙ্কুশ বলতে পারে। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা-তদন্ত কমিশনের এক অধিবেশনে ভারতের প্রাক্তন গভর্ণর-জেনারেল রাজাগোপালাচারি একথা স্পষ্টই বলেছেন যে, 'আমরা ভারতবাসীরা এই ভাষারই মাধ্যমে পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলি থেকে শিল্প-বাণিজ্য-বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির আলোক পেয়েছি বহুল পরিমাণে। যন্ত্র ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির কথা আমাদের কাছে চিরতরে অপরিচিত থেকে যেত যদি মেকলে ইংরাজি ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা না করে যেতেন। এটা সত্যি যে, ইংরাজি আমাদের উপর বাধ্যতামূলক ভাবে চাপানো হয়েছিল। কিন্তু বিদেশী শাসকদের ভাষা-চাপানোর প্রশ্ন আজ অতি গুরুত্বপূর্ণ নয়। যুগ ও অগ্রগতির সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলার পথে যাতে কোন বিঘ্ন দেখা না দেয়, তারি উদ্দেশ্যে আজ আমরা ইংরাজিকে আরও অনেকদিন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রয়োগ করার জন্যে বদ্ধপরিকর।' কারণ, —প্রথমতঃ, বিশ্ব-সভ্যতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার একমাত্র উপায় ইংরাজি শেখা বা জানা। দ্বিতীয়তঃ, অন্য কোন ভাষাই বাঙ্গালী, গুজরাটী, মারাঠা, তামিল, আসামী ও ওড়িয়াদের গ্রহণযোগ্য নয়।

সাধারণের ভাষা সমস্যা

হিন্দীকে ইংরাজির বদলে সাধারণের ভাষা করে নেওয়ার প্রস্তাব অসম্ভাব্য। কারণ,—হিন্দী ভারতের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের নিরক্ষর সম্প্রদায়ের নিকট ইংরাজির মতোই দুর্বোধ্য। অতএব চিন্তাবিদদের এক সম্প্রদায়ের মতে, ইংরাজিকে সাধারণের ভাষা হিসেবে বহাল রাখা হোক্ যতদিন অপর যে-কোন ভাষা সাধারণের ভাষার স্থান অধিকারে অসমর্থ থাকবে। এঁদের মতে, এ-অবস্থায় উন্নীত হবার পরেও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিক ভাবে ইংরাজি শেখাবার ব্যবস্থা ও ইংরাজি জানার জন্যে ছাত্রমহলকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা থাকা উচিত।

অপর একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা ঔপনিবেশিকতায় লাঞ্ছিত স্মৃতিকে মানসপটে পুনরায় জাগ্রৎ করে বলেন যে, বহু বৎসর দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকার ফলে আজও আমাদের মানসিক গঠন পরাধীনতার কবলমুক্ত হতে পারেনি। সেইজন্য আমাদের পক্ষে ইংরাজি ভাষার মজ্জাগত মোহকে প্রত্যাহার করা কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠছে না। দু'শ বছর আগে থেকে যদি আমরা অন্যান্য ভাষা অধ্যয়ন অনুশীলন এবং তন্মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদানে সচেষ্ট থাকতাম, তাহলে নিশ্চয় উক্ত ভাষাকেই আজ রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে

জাতীয়তাবাদীর যুক্তিতে ইংরাজি

বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতাম না। তাই সরকারী কর্মচারীদের একটি দল বলে, 'হয়তো সাম্প্রতিক প্রয়োজনে অফিসে ইংরাজি ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের মধ্যে সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরাজির বদলে হিন্দী ব্যবহৃত হবে।' তাদের মধ্যে আবার কারো কারো মতে, জোর করে' ইংরাজির বদলে হিন্দী ভাষার প্রবর্তন অতি অবাঞ্ছনীয়। তবে একথা সম্বন্ধে একশ্রেণীর লোকেরা একমত যে, স্বাধীন দেশে বিদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান নীতির দিক থেকে যেমন অশোভন, তেমনি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও অযাচিত। সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের মতো এ-দেশেও বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারী ও আপিসের কাজ নির্বাহিত হোক্, তাতে আপত্তি করার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু বিজেতা ও সম্রাজ্যবাদী-শাসকদের ভাষা এ ভূখণ্ডের বুক থেকে চিরতরে মুছে ফেলাই আমাদের যুগোচিত কর্তব্যবাদিতার পরিচায়ক।

আর এক ধরণের নিরপেক্ষ নাগরিকদের যুক্তিবাদী সমালোচনায় প্রস্তাবিত হয় যে, হিন্দী বা ইংরাজি কোনটারই বিপক্ষে উষ্মা প্রকাশ করা অনুচিত। তাঁদের মতে সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি প্রদেশকে তার নিজস্ব ভাষার অবাধ উন্নতি-সাধন উদ্দীপিত করা ও স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য। উন্নতির প্রতিটি পর্যায়ে সম্ভবতঃ স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, ভারতের মতো বিশাল উপ-মহাদেশে একাধিক ভাষাকে সাধারণ ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডের মতো অতি অল্পপরিসর দেশে যখন তিনটি ভাষাকে সরকারী অফিসে প্রয়োগ-করার উপযোগী ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছে, তখন বহুভাষাভাষী বিভিন্ন জাতির মিলনকেন্দ্র এই ভারতে কেন একাধিক ভাষা প্রচলন করা যাবে না?

ভাষা সম্বন্ধে তৃতীয়মত

কিন্তু একথা অতি বিস্ময়জনক যে. উল্লিখিত তিনটি মতাবলম্বী লোকের কেউই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার সুবিধাদানের বিরোধিতা করেন না বা ভাষাহিসেবে ইংরাজি কৃষ্টি ও সাহিত্যের প্রতি কেউই অশ্রদ্ধাশীল নন। তাই স্পষ্ট মনে হয় আরো অনেকদিন ভারতবাসী ইংরাজি ভাষাকে সম্মান দেখাবে এবং সরকারী ভাষা হিসেবেও এর গৌরব অম্লান থাকবে যতদিন নতুন আর একটি ভাষা সম-পর্যায়ে উন্নত ও জনপ্রিয় না হয়। সর্বোপরি. আমাদের কৃষ্টি-সভ্যতা-সাহিত্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ইংরাজি ভাষাকে বাধ্যতামূলক ভাবে বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষা হিসেবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও থাকবে।

অম্লান ইংরাজির গৌরব

এ-ভাষা নিয়ে সাম্প্রতিক কালে ভারতের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে উত্তেজনার প্রবল তুফান ওঠে। এমন কি কয়েকটি রাষ্ট্রে, বিশেষতঃ পাঞ্জাবে. ঐ উত্তেজনা শেষে সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হয়। বাংলা দেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে অনেক আন্দোলন হয় ভাষা-কমিশনের মন্তব্যের প্রতিবাদে। জনসাধারণ সরকারের কাছে এক বিবৃতিতে প্রত্যক্ষ অভিযোগ জ্ঞাপন করে। কলকাতা

বাঙালীর বিরোধিতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিতর্কসভায় বুদ্ধদেব বসু, বিজন ভট্টাচার্য ও অম্লান দত্ত প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দ হিন্দীর বিপক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। ওঁরা দৃষ্টান্তাদির অবতারণায় প্রমাণ করেছেন যে, ভারতের অন্যান্য যে কোন ভাষা হিন্দীর চেয়ে মধুর ও মসৃণ এবং ভাবপ্রকাশের জন্য শব্দসমৃদ্ধ। তাই অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাসমূহের গভীর গবেষণা করে তারপর রাষ্ট্রভাষার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। দেশের সবত্র যখন শুধু অভিযোগ উঠেছে ও সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র পড়েছে, তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ব্যতীত সরকার অনন্যোপায়। ফলে সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে, দেশের অধিকতর জনপ্রিয় ভাষাগুলিকেও প্রাদেশিক (State) ভাষার সম্মানে উন্নীত করা হবে।

পরিশেষে একথা উল্লেখ করা চলে যে, 'সোসিয়ালিজম্' মানে মানুষের আদর্শকে সামাজিক বা সমাজতান্ত্রিক করা। ভারত এখন পরিপূর্ণ জাতীয়তাবাদী স্বাধীন রাষ্ট্র।

উপসংহার

গণতান্ত্রিক উপায়ে তাহ আপন কৃষ্টিতে-সভ্যতায় সর্বোপরি আত্মোন্নয়নে জাতিকে আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রভাষা এমন একটি উপকরণ যা এক জাতিকে অপর জাতি থেকে বিভিন্ন বলে' প্রতিভাত করে। সংবিধানে যখন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলা হয়েছে, তখন এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো অযৌক্তিক। তবে কয়েকটি জনপ্রিয় প্রাদেশিক ভাষাকেও সরকারী কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ করার প্রস্তাবকে কার্যকরী করা হলে গণতান্ত্রিক উপায়ে আঞ্চলিকতা আর অখণ্ডতা দুটোই স্বীকৃত হবে।

## ভারতীয় চিত্রকলা

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে চিত্রকলার অবদান কম নয়। 'কলানাং প্রবরং চিত্রম্'—ললিতকলাসমূহের ভিতরে চিত্রকলাই শ্রেষ্ঠ, এ মতবাদ ভারতেরই নিজস্ব।

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতের চিত্রশিল্পের মাধুর্য বহির্জগতে অনেক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এশিয়া ও ইউরোপের বহু স্থানেই ভারতীয় চিত্রশৈলী প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু কালের সর্বক্ষয় প্রভাবে ভারতের অতীত ঐশ্বর্যের প্রায় সমস্ত নিদর্শনই আজ অবলুপ্ত। অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি দু'একটি স্থানের গুহাচিত্র মাত্র সেই প্রাচীন ঐশ্বর্যের ধ্বংসাবশেষ বুকে নিয়ে আজও নীরবে দাঁড়িয়ে।

অজন্তা, ইলোরা, এলিফ্যান্টা প্রভৃতি স্থানের গুহাচিত্র নিয়েই ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস শুরু করতে হয়। অজন্তার গুহাচিত্রাবলীর সমস্তই এক যুগের নয়। এর

প্রাচীন চিত্ররীতি

সূচনা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে। বৌদ্ধধর্ম-সম্পর্কিত চিত্রই সেখানে বেশি অন্যান্য চিত্রও অবশ্য অনেক রয়েছে। ডক্টর স্টেলা ক্রামরীশের মতে, প্রাচীন ভারতীয় চিত্ররীতিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: ক্ল্যাসিক বা কৌলিক রীতি এবং মধ্যযুগীয় রীতি। অজন্তায় বহু চিত্রেরই

ভিতরে রয়েছে ঐ ক্ল্যাসিক রীতির নিদর্শন। ক্ল্যাসিক রীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বর্তুল (Plastic) অঙ্কন-পদ্ধতি; কিন্তু মধ্যযুগীয় চিত্রশৈলী এই বর্তুলতাকে বিসর্জন করে' রেখাত্মক অঙ্কনকে দিয়েছে প্রাধান্য। ইলোরায় এই মধ্যযুগীয় রীতির যথেষ্ট নিদর্শন মেলে। অনেকের মতে, কুষাণ-রাজাদের যুগে গান্ধারশিল্প বা গ্রীকো-রোম্যান্ শিল্প ভারতীয় শিল্পকে প্রভাবান্বিত করেছিল। এই প্রভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় সাঁচীর কতকগুলি প্রাকৃতিক চিত্রে। কিন্তু প্রভাবটি বিশেষ কার্যকর হতে পারে নি। গ্রীক্-শিল্পের লক্ষ্য ছিল বিষয়কে হুবহু অনুকরণ করা। কিন্তু ভারতীয় শিল্পী এই অনুকরণ-স্পৃহার দ্বারা কখনও পরিচালিত হয়নি। ভারতীয় শিল্পীর দৃষ্টি ছিল অন্তর্মুখী। রেখা ও রঙের সাহায্যে ভাবাভিব্যক্তিই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। বাইরের বস্তুকে যথাস্থিত রূপে উপস্থাপিত করাই সে তার প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেনি। এই বস্তুতান্ত্রিকতার অনুষঙ্গ-সত্ত্বেও ভারতীয় চিত্রের ভাবাভিব্যক্তি ও আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনাই হ'ল এর বৈশিষ্ট্য। তাই ভারতে কোনদিনই 'মডেল্' সম্মুখে রেখে চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি ছিল না। ভারতীয় চিত্রশিল্পের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এর গতিপ্রাণতা। চিত্রের ভিতরে প্রাণের স্বচ্ছন্দ আরোহ-অবরোহ ব্যঞ্জিত করাই ছিল এদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই এই চিত্রগুলোতে গতি ও স্থৈর্যের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গতিশীল আকাশে পারস্পরিক সংযোজনার ফলে উৎপন্ন হত বলেই এদের অবয়ব-রূপায়ণের রীতি ছিল য়ুরোপীয় ও চৈনিক রীতির থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ভাষায় বলা যায়, "গ্রীকেরা অবয়বাকাশকে গোলককল্প স্থৌল্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। চীনারা ডিম্বাকৃতি আকাশের মধ্য দিয়া স্থৌল্যকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। ভারতীয়েরা ধ্যানধৃত অন্তরাকাশের সঞ্চারি স্থৌল্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন।" খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে ভারতীয় শিল্পে ব্যঞ্জনা জিনিসটি একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছিল। কিন্তু গুপ্তযুগে ধীরে ধীরে চিত্রশিল্প কিছুটা বাস্তবানুরাগী হয়ে উঠে। এই চিত্ররীতিই পাল-সেন-পল্লব-চালুক্যদের আমলতক অনবচ্ছিন্ন ভাবে চলেছিল।

মুসলিম যুগে ভারতীয় চিত্রশৈলী ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। ভারতীয় চিত্র তার প্রশান্ত অনাড়ম্বর সূক্ষ্ম আবেদন ও আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জনা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে। তার পরিবর্তে আসে বাহ্যাড়ম্বর, আসে লালসার লালায়িত লীলাভঙ্গী। মোগলযুগের চিত্রে হয় এই ধারারই পরিপূর্ণ বিকাশ। মোগলযুগের দরবারের চিত্রে বর্ণাঢ্যতা, অলংকরণের প্রাচুর্য ও পার্থিব ভোগের স্পৃহা অত্যন্ত উদগ্রভাবে রূপায়িত হয়েছে। অপর দিকে রাজপুত-যুগের চিত্র-শিল্পের ভিতরে আমরা দেখ্তে পাই সেই যুগাগত ঐতিহ্যেরই রসঘন রূপায়ণ। রাধা-

মুসলিম ও রাজপুত-যুগ

কৃষ্ণের মিলন বা বিরহের চিত্রে অথবা রাগ-রাগিণীর ধ্বনি-সুষমা-মণ্ডিত চিত্রে রাজপুত শিল্পীদের যে সূক্ষ্ম নৈপুণ্য ও রসবিহ্বলতা দেখা যায়, তা সত্যই অতুলনীয়।

ইংরাজ-রাজত্বের সময় থেকে ধীরে ধীরে বিদেশী অপপ্রচারের ফলে আমাদের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ভাঁটা পড়ে। তার পরিবর্তে বিদেশী চিত্রকলার বহুমানন হতে থাকে পাশ্চাত্তাভাবাপন্ন অভিজাত ভারতীয়দের ভিতরে। এমনি করে য়ুরোপীয় চিত্রকলা ধীরে ধীরে ভারতীয় চিত্রকলাকে সর্বক্ষেত্রেই গ্রাস করে বসল। মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে যে মোগলাই রীতির চিত্র ছিল, তা হল অবলুপ্ত। তার স্থান অধিকার করল ইংরাজ শিল্পী রচিত চিত্র। ভারতে এই সময়ে হল প্রথম তৈলচিত্রের প্রবর্তন। এই যুগের চিত্রশিল্পীদের ভিতরে রবি বর্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। য়ুরোপের চিত্রাদর্শের হুবহু অনুকরণ করে ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে চিত্র এঁকে সে-যুগে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু যথাযথ অনুকরণই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাই আজকের দিনে রবি বর্মার ছবি অনাদৃত।

ইংরাজ-আমলের গোড়াকার অবস্থা

ভারতীয় শিল্পে, বিশেষ করে চিত্রশিল্পে, যে নবজাগৃতি দেখা দিয়েছে, এর মূলে রয়েছে শিল্পতত্ত্ববিশারদ ঈ. বি হ্যাভেলের অকুণ্ঠ প্রেরণা। হ্যাভেল কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষরূপে এসে ভারতীয় শিল্পকলাকে বহুদিনের পঙ্কশয্যা থেকে উদ্ধার করেন। তিনিই উদ্‌ঘাটিত করেন ভারতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের রত্নভাণ্ডার। তিনি পাটনার লালা ঈশ্বরীপ্রসাদকে আর্ট স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত করে' সেখানে ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সর্বপ্রধান সহায়ক ছিলেন আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ শিল্প-শিক্ষা করেছিলেন পাশ্চাত্ত্য রীতিতে। তিনি মিঃ গিলড়ীর নিকট Pastel Portrait তৈয়ের করা শেখেন এবং মিঃ পামারের নিকট Oil Painting শেখেন। কিন্তু বিলাতী আদর্শে চিত্রাঙ্কনে নিরত না হয়ে তিনি নূতন চিত্ররচনাশৈলী উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর ভিতরে ভারতীয় প্রাচীন আদর্শ, মোগলাই রাজপুত আদর্শ এবং বিদেশী শিক্ষা—এসবই একত্র সমন্বিত হয়ে এক অপূর্ব চিত্রশিল্পের সৃষ্টি হয়েছে। জাপানী এবং কাকুরার প্রভাবও বর্তমান। অবনীন্দ্রনাথের 'মৃত্যুশয্যায় শায়িত শাজাহানের তাজমহল দর্শন', অভিসারিকা', 'চৈনিক পরিব্রাজক', 'ভিক্ষু বুদ্ধ', 'বুদ্ধের বিদায়' চিত্রগুলি বিপুল কল্পনার ঐশ্বর্যে বিমণ্ডিত। ভারতীয় চিত্রকলার নবোন্মেষের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় নিয়ে অঙ্কিত অবনীন্দ্রনাথের চিত্রগুলোও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধীরে ধীরে প্রাচীন য়ুরোপীয় সমস্ত ধারায় পরীক্ষা-

নবজাগৃতি—অবনীন্দ্রনাথ ও শিষ্যগণ

নিরীক্ষা করে' অবনীন্দ্রনাথ শেষে ভারতীয় গণকলার ক্ষেত্রেও বিশেষ সার্থক কতকগুলো চিত্র রচনা করেন। অবনীন্দ্রনাথ যে নব রীতিটির উদ্ভাবন করেন, তাঁর উত্তরসাধক তাঁরই ছাত্রগণ। এঁদের মধ্যে নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদার সমধিক প্রসিদ্ধ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও একটি স্বতন্ত্র চিত্রশৈলী প্রবর্তন করেছেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিচরণ করবার কোন উত্তরাধিকারী এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। খ্যাতনামা শিল্পী যামিনী রায় অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়িয়ে পটের পদ্ধতিতে ছবি আঁকছেন। এই ছবিগুলোর য়োরোপেও যথেষ্ট সমাদর। আধুনিক চিত্রশিল্পীদের ভিতরে হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি সম্পূর্ণরূপে অবনীন্দ্র-নাথের প্রভাবমুক্ত হয়ে পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলার আদর্শে চিত্রাঙ্কন করেন। প্রতিকৃতিতে ও চিত্রে ভারতে তাঁর সমকক্ষ বোধ হয় কেউই হয়নি। প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নারীর নগ্নরূপকে বাস্তবতামণ্ডিত অথচ ভাবব্যঞ্জনাময় করে' আঁকাতেই তাঁর কবিত্ব।

অবনীন্দ্রনাথের পরে ভারতীয় চিত্রকলায় সত্যিকার প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পীর উদয় আর হয়নি। সেদিক থেকে অবনীন্দ্রের সাধনা কিছুটা ব্যর্থ হয়েছে ব'ল্লে অসংগত হবে না। তাঁর শিষ্যগণ গুরুর গতানুগতিক অনুকরণ করেই চলেছেন। গুরুর কল্পনাশক্তি ও ভাবদৃষ্টি তাঁদের ভিতরে মোটেই সংক্রামিত হয়নি। তাই এঁরা নব নব রীতিতে নব নব সৌন্দর্যের অবতারণা করে' চিত্ররসিকদের চাহিদা গড়ে তুলতে সক্ষম হন নি। এটা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। চিত্রশিল্পকে আবার নব নব সম্ভাবনার পথে এগিয়ে দিতে হলে সরকারকে এদিকে যেমন দৃষ্টি দিতে হবে, তেমনি চিত্রশিল্পীদেরকেও অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করে' স্বকীয় প্রতিভার স্বচ্ছন্দ পথে অগ্রসর হবার সাহস সঞ্চয় করতে হবে আর এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে ভারতীয় চিত্রকলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

উপসংহার

## ভারতীয় ভাস্কর্য

বৈদিকযুগে মূর্তিপূজোর প্রচলন ছিল কি না, এ সম্বন্ধে কোন নিঃসংশয় সিদ্ধান্তের সিংহদ্বারে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অনেক পণ্ডিতের অভিমত যে, আর্যগণ মূর্তিপূজোর আদর্শ দ্রাবিড়দের নিকট থেকে গ্রহণ করেন। বৈদিক মন্ত্রে কিন্তু দেবতাদের যে স্তুতি পাওয়া যায়, তাতে দেবতাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা রয়েছে প্রচুর। সে যাই হোক্, বৈদিক যুগের কোন প্রতিমা বা মূর্তির কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু প্রাগ্-বৈদিক যুগের সিন্ধু-সভ্যতার মূর্তিশিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার মূর্তিগুলো ভারতীয় স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এই দু'টি স্থানে পাওয়া গেছে বহু মাটির মূর্তি। ব্রতপার্বণে মেয়েরা যে রকম পুতুল ব্যবহার করে, এই

ভূমিকা

মূর্তিগুলো অনেকটা সেই রকমেরই। পশু, পক্ষী বা চাকা-লাগানো বাড়ির প্রতিকৃতিও পাওয়া গেছে অনেক পাথরে ও নানা ধাতুতে-গড়া যে সমস্ত মূর্তি এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সুষমা অনবদ্য। হরপ্পার বেলেপাথরের অতি মসৃণ ও কমনীয় নৃত্যরত স্ত্রীমূর্তি, মহেঞ্জোদারোর চুন-পাথরের শাল-গায়ে শ্মশ্রুল ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক মূর্তি ও ব্রোঞ্জের নর্তকী-মূর্তির শিল্পনৈপুণ্য অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। তনুর উচ্ছল লাবণ্য-লহরী 'বর্তনা' বা ভাবব্যঞ্জনা ও গতিশীলতা—ভারতীয় ভাস্কর্যের এই তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের নবোন্মেষ এই মূর্তিগুলোর ভিতরে বিশেষ করে লক্ষণীয়।

ভাস্কর্যের ইতিহাসে এর পরেই দেখা দেয় এক সুদীর্ঘ অন্ধকার-যুগ। এই অন্ধতমিস্রা কেটে যায় সম্রাট্ অশোকের রাজত্বকালে। অশোকের প্রেরণায় তখন যে সমস্ত বিরাট্ মূর্তি নির্মিত হয়েছিল, তা ভারতীয় ভাস্কর্যের এক অবিনশ্বর অবদান। বিপুলায়তন পাথর কেটে মূর্তি-রচনার প্রেরণা বিশেষ করে দেখা দেয় ঐ যুগেই। ভারতের ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত অশোকস্তম্ভ—হস্তিমূর্তি, বৃষমূর্তি, সিংহমূর্তি—পরিকল্পনার ব্যাপকতায় ও সুসমঞ্জস সুষমার সমাবেশে অপূর্ব এক ঐশ্বর্যমদির ভাবলোকের সংকেত জানায়। মূর্তিগুলোর সুবলিত দেহসৌষ্ঠব, আত্মস্থ ও সাড়ম্বর গাম্ভীর্যময় ভাব সম্রাট্ অশোকেরই সমুন্নত ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর বুঝিবা বহন করে আছে। প্রায় সমসাময়িক যুগে নির্মিত উত্তর-ভারতের বিচ্ছিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েকটি বৃহৎ প্রস্তরমূর্তি হয়েছে আবিষ্কৃত। এর মধ্যে পাটনার দিদারগঞ্জের নারীমূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। এই মূর্তিটির অম্লান সুষমা ও অনাহত মসৃণতা অশোকযুগের শিল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পরবর্তী যুগে বরহুত, সাঁচী প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধস্তূপের উপরে অনুরূপ লক্ষণযুক্ত অনেক মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়—এগুলো অবশ্য কিছুটা খর্বাকৃতি। মূর্তিগুলো বিভিন্ন দেব-দেবী, যক্ষ-যক্ষিণীদের মূর্তি বলে' পরিচিত। এই সময়কার অনেক পোড়া মাটির মূর্তিতে অনুরূপ শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়। সাধারণভাবে একটা সাদৃশ্য থাকলেও বরহুতের মূর্তিগুলো একটি বিভিন্ন শিল্পধারার সৃষ্টি বলেই মনে হয়। বরহুতের মূর্তিগুলোর অনমনীয় দেহ ও ভাবব্যঞ্জনাহীন মুখ দেখে মনে হয় যে, এগুলো রেখায় ও রঙে অঙ্কিত চিত্রশিল্পের অনুকরণে নির্মিত। এই জাতীয় চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায় অজন্তার গুহায়। সাঁচীর মূর্তিগুলো বিদিশার প্রখ্যাতনামা গজদন্তশিল্পীদের কীর্তি। এই মূর্তিগুলোর দেহসৌষ্ঠব ও ভাবাভিব্যক্তি কৃতিত্বের পরিচায়ক। এর কিছুকাল পরেই ভাজা ও কারলের গুহামন্দিরের মূর্তিগুলো তৈয়ের হয়েছিল। ভাজার মূর্তিতে দেহসৌষ্ঠব ও গতিশীলতা এবং কারলের মূর্তিতে মাংসল নমনীয়তা ও আত্মস্থ গাম্ভীর্য পরিস্ফুট। বৌদ্ধদের অনুপ্রেরণায় জৈনগণ কর্তৃক উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে নির্মিত গুহামন্দিরের মূর্তিতেও এই একই লক্ষণ প্রকাশিত।

অশোকযুগের ভাস্কর্য

পরবর্তী যুগে ভারতীয় শিল্পে পড়ে বৈদেশিক প্রভাব। ঐ প্রভাব মুখ্যতঃ গ্রীক প্রভাবই। কুষাণযুগে হয় ঐ প্রভাবের সূচনা। গান্ধারদেশ এই বৈদেশিকদের প্রধান আশ্রয় ছিল বলে' এই শিল্পের নাম 'গান্ধারশিল্প'। এই যুগের শিল্পে নবাগত জাতির চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য— দুর্দম ভোগ-লালসা ও যৌবনাবেগ— ধীরে ধীরে সংক্রামিত হতে থাকে। এরই নিদর্শন পাওয়া যায় মথুরার ভাস্কর-শিল্পে। এই যুগেই ভগবান বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হয়। কিন্তু এই মূর্তির ভিতরে পূর্বযুগের যক্ষমূর্তিগুলোর অবিসংবাদিত অনুকৃতিই দেখা যায়। কুষাণ-সম্রাট কনিষ্কের অনুপ্রেরণায় পুরুষপুরেও (পেশোয়ারে) বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হতে থাকে। কিন্তু এগুলোর প্রেরণা ছিল গ্রীক্ ভাস্কর্য। এগুলোয় এবং কনিষ্কের মুদ্রায় শিব উমা বুদ্ধ প্রভৃতির যে মূর্তি দেখা যায়, সেগুলোতেও দেহগঠনের ব্যাপারে গ্রীক্ আদর্শই কার্য-কর হয়েছিল। কিন্তু প্রতিমাতত্ত্বের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ এই মূর্তিগুলোতে সংযো-জিত হয়নি বলে' এদের ভিতরে ভারতীয় সংবেদন ছিল সামান্যই। তাই গান্ধারশিল্প ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। মথুরা ও গান্ধারের শিল্পীরা যখন বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন দক্ষিণ-ভারতের অমরাবতী অঞ্চলেও বুদ্ধমূর্তি নিয়ে অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হল। মথুরার শিল্পীরা শুধু বুদ্ধমূর্তিই নির্মাণ করেননি; সেখানে বহু জৈন ভাস্কর্যেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানকার একটি জৈন প্রতিষ্ঠানের প্রাচীরবেষ্টনীর স্তম্ভস্তম্ভের উপরে এক বিচিত্র ধরণের ভাস্কর্যের সাক্ষাৎ মেলে। কোন কোন দিক্ থেকে প্রাচীন যক্ষ-যক্ষিণী মূর্তির সঙ্গে এদের সাদৃশ্য থাকলেও এদের দেহের কমনীয়তা, অনাবৃত উর্ধ্বাঙ্গ, সূক্ষ্ম পরিচ্ছদ, লীলাচঞ্চল ও আত্মতৃপ্ত ভাব এদের বিশেষত্ব। মনে হয়, সমাজ এই সময়ে একটি যুগসন্ধির ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল এগিয়ে। পরবর্তী যুগে কিন্তু এই সংশয় ও চাঞ্চল্য অপসারিত হয়।

কুষাণযুগের ভাস্কর্য

গুপ্তযুগ ভারত ইতিহাসে সর্বাধিক গৌরবমণ্ডিত যুগ। ঐ যুগ ভারতের সর্বময় সমৃদ্ধির যুগ। সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে তাল রেখে ভাস্কর্যও এই যুগের চরম উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছিল। এই যুগের ভাস্কর্যের আদিম নিদর্শন পাওয়া যায় সারনাথের প্রসিদ্ধ বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধমূর্তিতে এবং মথুরার বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব এবং গিরিগোবর্ধনধারী বিষ্ণুমূর্তিতে। গঠনতান্ত্রিক দিক থেকে এই মূর্তিগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, আয়ত অর্ধনিমীলিত চক্ষু, বৃষস্কন্ধ, পেশল বক্ষোদেশ, অঙ্গের পেলব গঠন, স্বল্প অলংকার এবং সূক্ষ্ম পরিধেয়। কিন্তু এই মূর্তিগুলোর প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে এদের আত্মস্থ ভাবস্তিমিত প্রকাশের মাঝে। জীবনের বহুধাবিচিত্র চাঞ্চল্যের ভিতরে অবিচল আত্মচৈতন্যের ধ্রুবজ্যোতি যেন এই মূর্তিগুলোর ভিতরে

গুপ্তযুগের ভাস্কর্য

রূপায়িত হয়েছে। তাই ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণীই যেন মূর্তিগুলোর মধ্যবর্তিতায় পেয়েছে প্রকাশ। গুপ্তযুগের ভাস্কর্যশৈলী প্রায় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এই যুগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বহু মূর্তি তৈয়ের হয়েছিল। এগুলোর ভিতরে মথুরা, সারনাথ ও সাঁচীর কয়েকটি মূর্তি, দেওগড়ের অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তি, মধ্যভারতের এরাণে বরাহরূপী ভগবানের মূর্তি ও বিহারের সুলতানগঞ্জের ব্রোঞ্জ-নির্মিত বুদ্ধমূর্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুলতানগঞ্জের বুদ্ধমূর্তিটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অক্ষোভ্য গাম্ভীর্যের পরিবর্তে এক ভাবোচ্ছল চঞ্চলতা; কিন্তু এখানেও ভারতীয় অধ্যাত্মদৃষ্টির দাক্ষিণ্য থেকে শিল্পীমানস বঞ্চিত হয়নি।

পরবর্তী যুগে গুপ্ত ভাস্কর্যের অমূল্য 'রিকৃথ' বিশেষ ক'রে বাংলায় ও দক্ষিণ-ভারতে সমাদৃত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে পল্লবরাজাদের সময়ে ভাস্কর্য বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল। মাদ্রাজের অল্প দক্ষিণে মহাবলীপুরে, কাঞ্চী ও অন্যান্য অঞ্চলে বহু মূর্তি পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগের সুকুমার দেহগঠনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়ত দেহের সমাবেশ এবং ধ্যানগাম্ভীর্যের পরিবর্তে গতিচাঞ্চল্যই এই মূর্তিগুলোর বৈশিষ্ট্য। এই গতিচাঞ্চল্যের পরিস্ফুট নিদর্শন রয়েছে মহাবলীপুরের দেবীযুদ্ধ এবং গঙ্গাবতরণ ইত্যাদি বহুমূর্তিযুক্ত ফলকে।

পল্লবযুগের ভাস্কর্য

গুপ্ত আদর্শ বাংলার ভাস্কর্যকে গতিচাঞ্চল্যে প্রভাবিত না করে' অখণ্ড মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের বিকাশে প্রবুদ্ধ করে' তুল্‌ল। প্রতিমাশিল্পে সুস্পষ্ট রসব্যঞ্জক পরিণতি বাংলাতেই সম্ভব হয়েছিল। পাল ও সেনরাজাদের আমলের কালো কষ্টিপাথরে-তৈরী মূর্তিগুলো বঙ্গীয় সংস্কৃতির এক বিরাট্ অবদান। এই মূর্তিগুলোর দেহ কৃশ ও দীর্ঘ, নানা অলংকারে সুশোভিত চক্ষু বাদামী। পাল ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য 'কীর্তিমুখ' মূর্তি; এর ভিতরে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর, অলংকারের সজ্জা বড়ই বেশি। কিন্তু সেনযুগের ভাস্কর্যে যে সুকুমার লালিত্য, যে গীতিময় উন্মাদনা ও যে সূক্ষ্ম নৈপুণ্য দেখা যায়, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ঐ 'ছত্রমুখ' মূর্তিগুলো। এই জাতীয় ভাস্কর্য বাংলার নিজস্ব সম্পদ্। এযুগের প্রসিদ্ধ শিল্পী ধীমান ও বীতপালের খ্যাতি ভারতে, এমন কি ভারতের বাইরেও বিস্তৃত।

পাল ও সেন-যুগে বাংলার ভাস্কর্য

পল্লবদের উত্তরাধিকারী দাক্ষিণাত্যের চালুক্যদের যুগের ভাস্কর্যে পল্লবযুগের এবং পশ্চিম-ভারতের গুহামন্দিরের মূর্তিকলার সম্মিলিত প্রভাব সুপরিস্ফুট। ইলোরায় রয়েছে এই শিল্পের নিদর্শন। এলিফ্যাণ্টা দ্বীপের অন্তর্গত সুবিখ্যাত শিব, উমাবিবাহ প্রভৃতি মূর্তি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। গতিশীলতার চূড়ান্ত নিদর্শন রয়েছে দক্ষিণ-ভারতের নটরাজ-মূর্তিতে।

চালুক্যযুগের ভাস্কর্য

ভারতে মুস্‌লিম আধিপত্য বিস্তারের পরে উত্তর-ভারতে ধীরে ধীরে ভাস্কর্যকলার অনুশীলন রহিত নয়। দাক্ষিণাত্যে অবশ্য বিজয়নগরের রাজবংশের আমলেও এই শিল্পের ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু তার পরে এধারাও যায় শুকিয়ে। অবশ্য বাংলায় নিতান্ত ক্ষীণ ভাবেই এই শিল্পধারা ছিল বেঁচে। কৃষ্ণনগরের ভাস্কর্যই তার প্রধান নিদর্শন। স্বাধীন ভারত আজ বিদেশী ভাস্করের মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বদেশের অবহেলিত ভাস্করদের যদি আনুকূল্য করে, তবেই-না ভারতের ভাস্কর্য আবার জগতে পারবে নব আদর্শ রচনা করতে।

ভাস্কর্যের অবনতি

## ভারতীয় নৃত্যকলা

সংগীতের স্বরলিপির ন্যায় আমাদের প্রাচীন নৃত্যের কোন প্রতিলিপি তথা গতিলিপি নেই। তাই প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের প্রকৃতিটি যে সত্যই কিরূপ ছিল আর কবেই-বা এর জয়লাভ ঘটেছে, তা বলা প্রকৃতই খুব কঠিন। যতদূর মনে হয় প্রাচীন নাট্যসম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: একটি ভারত-সম্প্রদায় এবং অপরটি, নন্দীকেশ্বর-সম্প্রদায়। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনটি যে প্রাচীনতর, সে সম্পর্কে মতবিরোধ থাকলেও ভরত-সম্প্রদায়ই প্রাচীন ভারতীয় সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। নাট্যশাস্ত্রে প্রাচীন নাচের রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে যে সমস্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে, তা পড়ে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভারতীয় ধ্রুবপদী নৃত্য সেকালে সত্যই চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যরীতি নাচের রূপবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা থাকায় স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, নাট্যশাস্ত্র-রচনার অনেক আগে থেকেই শাস্ত্রোক্ত ভারতীয় ধ্রুবপদী নৃত্য তথা মার্গনৃত্যের অনুশীলন চলে আসছিল। অতএব, ভারতীয় ধ্রুবপদী নৃত্যের প্রাচীনতা সম্পর্কে কোনরূপ মতদ্বৈধের কারণ নেই।

ভূমিকা

আর্য নাট্যশাস্ত্রের মতে, প্রকাশরীতির চারটি বিভাগ: প্রথমতঃ, কথায় যাহা অভিব্যক্ত হয় তাহার নাম বাচিক অভিনয়; দ্বিতীয়তঃ, ভাবপ্রকাশই যাহার হয় উদ্দেশ্য তাহার নাম সাত্ত্বিক অভিনয়; তৃতীয়তঃ, অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় তাহাকে বলে আঙ্গিক অভিনয় ও চতুর্থতঃ মঞ্চসজ্জা দৃশ্যপট ইত্যাদির সাহায্যে যাহা অভিব্যক্ত হয় তাহার নাম আহার্য অভিনয়। নাচে সাত্ত্বিক, আঙ্গিক এবং আহার্য—এই তিন রকমের অভিনয়ই প্রয়োজনীয়। আবার 'নাট্য' নৃত্ত' ও 'নৃত্য' এই তিন রকমের নৃত্যাভিনয় থেকে ভারতীয় ধ্রুবপদী নৃত্যের অন্তঃপ্রবাহিত গভীরতা খানিকটা অনুমান করা যায়। 'নাট্য' জিনিসটি আসলে পুরোপুরি নৃত্যাভিনয়ই; অর্থাৎ বাচিক,

'নাট্য' 'নৃত্ত' ও 'নৃত্যে'র সংজ্ঞা-নির্ণয়

সাত্ত্বিক, আঙ্গিক এবং আহার্য—এই চার রকমের অভিনয়-রীতিই এতে রয়েছে। পক্ষান্তরে 'নৃত্তে' কেবলমাত্র আঙ্গিক অভিনয়ই থাকে এবং অঙ্গসঞ্চালন-প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন বিশেষ কথাবস্তু, কাহিনী বা গীতিকবিতার সামগ্রিক রূপটি ফুটে ওঠে না। 'নৃত্ত' জিনিসটির যত কিছু আবেদন আমাদের বিশুদ্ধ অাচ্ছিন্ন রসানুভূতির কাছে এসে পৌঁছয়। 'নৃত্ত' প্রাচীন শাস্ত্রকর্তাগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও নিয়মিত এক অবচ্ছিন্ন শিল্প (abstract art) ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিশেষে 'নৃত্য' জিনিসটি দেয় বিশিষ্ট ভাব ও রসের দ্যোতনা। অধুনা-প্রচলিত নাচের সঙ্গে নাট্য ও নৃত্তের সম্পর্ক নেই বললেই চলে, হয়তো-বা কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে নৃত্যের সঙ্গে।

দক্ষিণ-ভারতে যে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলার রূপটি দেখতে পাওয়া যায় তা দু'জাতের : একটি 'ভরত-নাট্যম্' এবং অপরটি, 'কথাকলি'। আবার উত্তর-ভারতে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা যে দুটি বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত, তার একটির নাম 'মণিপুরী নৃত্য' এবং অপরটির নাম 'কত্থক-নৃত্য'। ভরত-নাট্যমে বর্ণিত নাচের প্রচলন দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত তাঞ্জোর অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি। এই নাচ দাক্ষিণাত্যের দেবদাসীরা করে' থাকে বলে' চলতি কথায় একে বলা হয় 'দেবদাসী নৃত্য'। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্পর্শহেতু এই নাচের রূপ ও রসের বৈশিষ্ট্য সবিশেষ লক্ষণীয়। তাই ভরত-নাট্যমের নৃত্যকে 'ব্রাহ্মণ্য নৃত্য'ও বলা চলে। আবার 'কথাকলি নাচ'টি দাক্ষিণাত্যের মালাবার অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। 'কথাকলি নৃত্যে' দেবদেবীগণই উদ্দিষ্ট এবং রামায়ণ-মহাভারত থেকে এই নাচের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছে। ভরত-নাট্যমের মঞ্চসজ্জার রীতি কথাকলি নাচের মধ্যে আর দেখা যায় না। এই নাচ গ্রামের মেয়ে-পুরুষেরা নাচে। অভিনয়প্রধান—তাই মুদ্রাবহুল কথাকলি নৃত্যকে 'প্রাকৃত নৃত্য' তথা 'লোকনৃত্য'ও বলা চলে। আবার উত্তর-ভারতে প্রচলিত 'মণিপুরী নৃত্যে' মণিপুর অঞ্চলের প্রভাবই যে শুধু পড়েছে তা নয়, বাইরের প্রভাবও কিছু কিছু পড়েছে। 'মণিপুরী নৃত্য' রাধা-কৃষ্ণলীলা নিয়ে রচিত। তাই মণিপুরী নৃত্যকে অনায়াসেই 'বৈষ্ণবীয় নৃত্য' বলা চলে। এ ছাড়া উত্তর-ভারতীয় কত্থক নৃত্যে' বিদেশী নৃত্যভঙ্গিমার ছাপ অত্যন্ত বেশি পড়েছে। রাধাকৃষ্ণের লীলাই যদিও বিষয়বস্তু, তবুও নৃত্যরীতির দিক দিয়ে 'মণিপুরী' ও 'কত্থক' নৃত্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অতঃপর যুগধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যশিল্পীর মনে ও রুচিতে পরিবর্তন সংক্রামিত হওয়ায় নাচের রূপরীতি ও রূপবন্ধের মধ্যেও এসেছে বৈচিত্র্য। ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে' উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রীতির নাচ আত্মপ্রকাশ করেছে। গুজরাটী গর্‌বা-নৃত্য ভীল-নাচ, পল্লীনৃত্য, রায়বেঁশে নৃত্য, সাঁওতালী নৃত্য, ব্রতনৃত্য, বরণনৃত্য—এমনি আরও

উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্যকলার বিভিন্ন বিভাগ

কত রকমের আঞ্চলিক নাচ যে গজিয়ে উঠেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এই সব আঞ্চলিক নাচের মধ্যে কিছু কিছু বিদেশী প্রভাব পড়লেও, মোটের উপর ভারতীয় নৃত্যের ভাবধারাই এদের মধ্যে প্রবাহিত। আবার দাক্ষিণাত্যের ভরত নাট্যমের ছাপ ব্রহ্মদেশের 'পোয়ে'-নৃত্যে, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত নাচেও দেখা যায়।

দক্ষিণ-ভরাতীয় ভরত-নাট্যমে এবং কথাকলিতে দক্ষিণী ভাস্কর্যের একটা সুবলিত প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। দক্ষিণ-ভারতের ভরত-নাট্যমে এবং কথাকলিতে নাচিয়ের দেহ-খানি যেন জ্যামিতিক বন্ধনে উপস্থাপিত, বুঝিবা কেটে-কেটে খাঁজে-খাঁজে থাকে-থাকে রেখে দেওয়া হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, এই দক্ষিণী নাচ দুটি প্রধানতঃ 'ক্ল্যাসিক্যাল' তথা স্থাপত্যধর্মী। অপর পক্ষে, উত্তর-ভারতীয় মণিপুরী এবং কত্থক নাচ দু'টিতে রোম্যান্টিক আবেশ এমনভাবে ফুটে উটেছে যে, এদের মাঝে ক্ল্যাসিক্যাল তথা স্থাপত্যধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভারতের এই উত্তুরে নাচ দু'টিতে বিশুদ্ধ ভাব ও রসের প্রকাশ-সৌষ্ঠব বেশ ভালোই —তাই জনপ্রিয়ও বটে। এই নাচ দু'টিতে উচ্চাঙ্গের গীতিকবিতার রসানুভূতি ঘটে।

ভারতীয় নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য

আবার এই ভারতীয় ধ্রুবপদী নৃত্যচতুষ্টয়ের ভঙ্গিমার দিকে যদি একটু সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তা'হলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কোন নাচে রয়েছে পুরুষালি ভাব অর্থাৎ সেটা হচ্ছে উদ্ধত 'তাণ্ডব নৃত্য', কোন নাচে রয়েছে একটা মেয়েলী ভাব অর্থাৎ সেটা হচ্ছে সুকুমার 'লাস্য নৃত্য'। বলা বাহুল্য, পুরুষ-নাচিয়েই নাচে তাণ্ডব নৃত্য আর স্ত্রী-নাচিয়ে নাচে লাস্য নৃত্য। অবশ্য শাস্ত্র পাঠ করে জানা যায় যে, শিবের অনুচর নন্দী অর্থাৎ তণ্ডু যে নৃত্য-পদ্ধতির স্রষ্টা এবং তাণ্ডব ঋষি যার প্রথম প্রবর্তক, তারই নাম 'তাণ্ডব নৃত্য'; পক্ষান্তরে লাস্য নৃত্যের জনয়িত্রী শিবসোহাগিনী দেবী পার্বতী। তাই আল্‌গা ভাবে তাণ্ডব নৃত্যকে বলা হয় 'শিবনৃত্য' এবং লাস্য নৃত্যকে বলা হয় 'পার্বতীনৃত্য'।

'তাণ্ডব নৃত্য' ও 'লাস্য নৃত্য'

বাংলা দেশ নাকি একটি বিশেষ নাচের পদ্ধতির জন্মস্থান। এই নাচটি 'ওরিয়েণ্টাল' নামে অভিহিত। বাংলার বাইরে কোন নাচের আসরে যদি কোন বাঙ্গালী নাচিয়ে ভারতীয় ধ্রুবপদী নাচও নাচেন তো অবাঙ্গালী দর্শকসম্প্রদায় একে 'ওরিয়েণ্টাল নৃত্য' তথা 'ভাবনৃত্য' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু 'ওরিয়েণ্টাল' শব্দটির মানে 'প্রাচ্য'। অতএব 'ওরিয়েণ্টাল নৃত্য' বলতে 'প্রাচ্য নৃত্যই তথা 'ভারতীয় ধ্রুবপদী নৃত্য'ই বুঝায়। সম্ভবতঃ, বাঙ্গালী নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর অজন্তা-ইলোরার ভাস্কর্যরীতিকে অবলম্বন করে যে সব নৃত্যপদ্ধতি প্রবর্তন করেন তাকেই অবাঙ্গালী সম্প্রদায় 'ওরিয়েণ্টাল নৃত্য' মনে করে আর যেহেতু উদয়শংকর বঙ্গসন্তান—তাই বাঙ্গালী নাচিয়েমাত্রই ওরিয়েণ্টাল নৃত্যবিদ্! কিমাশ্চর্যতঃপরম!

বাংলার 'ওরিয়েণ্টাল নৃত্য'

আবার এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কোন একটি গানকে বিভিন্ন 'গুরুজী' বিভিন্ন ভঙ্গীতে, বিভিন্ন মুদ্রাসাহায্যে, বিভিন্ন সজ্জায় নৃত্যরূপ দেন। গানের মূলভাব তো একটিই, কিন্তু তাকে নাচের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করবার সময় গুরুজীরা এরূপ বৈচিত্র্যবাদী হয়ে উঠলেন কেন? এটা সত্যিই ভাববার বিষয়। আসল কথা, নিত্যকলার রূপদান ব্যাপারে কোন আদর্শ, কোন রূপকল্প গুরুজীরা, হয় না-জানার দরুণ, নয় জেনেশুনেই, অনুসরণ করেন না। ফলে আধুনিক নৃত্য চর্চার ক্ষেত্রে একটি উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে, একটি ব্যভিচারের প্রবাহ বইতে শুরু করেছে। আর কিছুদিন এভাবে নৃত্যকলার অনুশীলন চ'ললে নাচের ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী।

বঙ্গীয় নৃত্যকলায় অরাজকতা

মানবমনে বহুবিচিত্র সুর হয় অনুরণিত। তাই মনুষ্যশিল্পী মধুর বেদনাকে রূপ দেবার জন্যে যেমন ভাষার মাধ্যমে সৃষ্টি করে সাহিত্য, যন্ত্র বা কণ্ঠের মাধ্যমে শোনায় সংগীত, তূলী ও রঙের মাধ্যমে অঙ্কন করে চিত্রকলা, তেমনি আপন দেহকে লীলায়িত করে' পরিবেশন করে নৃত্য। কিন্তু আপন দেহ নৃত্যকলা-প্রকাশের বাহন হওয়ায় একটা মস্ত বড় বিপদেরও রয়েছে সম্ভাবনা। অপরাপর শিল্পকলার সহিত তুলনায় নৃত্যকলার ক্ষেত্রে নৃত্যশিল্পী উপভোগ-কর্তার মনের মধ্যে যতটা তাড়াতাড়ি সরাসরি ভাবে দাগ কাটতে পারে, এমন আর কিছুতেই নয়। কারণ,—ভাষা, যন্ত্র, কণ্ঠ, তূলী, রঙ—শিল্পসৃষ্টির এই বাহনগুলির মধ্যে কোনটিই দেহের ন্যায় জৈবিক আকর্ষণে তৎপর নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পাশ্চাত্ত্য নৃত্যকলা গ্রীক্ নৃত্যকলার প্রভাব থেকে মুক্ত হবার পর ক্রমেই যেন জৈবিক আকর্ষণের দিকে যাচ্ছে এগিয়ে। আমাদের দেশে উদয়শংকরী নৃত্যপদ্ধতি যদিও এখনও অবধি জৈবিক আকর্ষণের দিকে ঝুঁকে পড়ে নি, তবু কালক্রমে অনুকরণের ধারা বেয়ে বেয়ে অদূরভবিষ্যতে ইন্দ্রিয়াভিমুখী হয়ে পড়তে পারে। আবার ক'লকাতা এবং তার আশেপাশে নৃত্যশিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে যে নৃত্যপদ্ধতি চালু হচ্ছে, তাও ব্যক্তিগত বাহাদুরী দেখানোর প্রবণতাবশতঃ ঐ জৈবিক আকর্ষণের দিকেই পড়ছে ঝুঁকে। পক্ষান্তরে শান্তিনিকেতনী নৃত্যশিক্ষাপদ্ধতিতে জৈবিক আকর্ষণ গৌণ হলেও ঐ স্বতঃ-উৎসারিত নৃত্যচ্ছন্দ পরিণামে পথভ্রষ্ট হয়ে নিছক সুকুমার মূকাভিনয়ে রূপায়িত হতে পারে। এই জন্যেই ভারতীয় ধ্রুবপদী নৃত্য তথা মার্গনৃত্যের বহুল প্রচার ও অনুশীলন প্রয়োজন। নৃত্যকলার বাহন যদিও এই অঙ্গই, তবু এর শিক্ষাপদ্ধতিতে অনঙ্গ হওয়ার সাধনাই সবচেয়ে বড় কথা। *

উপসংহার

* [ শ্রীগোপী ভট্টাচার্য ও শ্রীদেবপ্রসাদ বসু রচিত 'নাচের ইতিকথা' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে বর্তমান লেখক কর্তৃক লিখিত পূর্বাভাষ হইতে উদ্ধৃত। ]

# ভারতীয় সংস্কৃতি

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়ে দেশী এবং বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে তীব্র মতভেদ আছে এবং তা থাকাও স্বাভাবিক। বহুজাতির সংস্কৃতির সমন্বয়ে এই মহাসভ্যতার সৃষ্টি। এদেশের ভৌগোলিক বিস্তার যেমন সুবিপুল, বৈচিত্র্য যেমন অন্তহীন, তেমনি ঐতিহাসিক অতীত বহু সহস্র বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত। বহু পরিবর্তনের ধারা ভারতের সংস্কৃতিকে জটিলতর করে তুলেছে। তাই এর সত্যস্বরূপ জানতে হলে মনে রাখতে হবে এর বিপুলতার কথা, বিচিত্রতার কথা, বহুজাতিক সমন্বয়ের কথা এবং বহু বক্রপথে গতিময় পরিবর্তনধর্মের কথাও।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের ধারায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্বগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা চলে। আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব থেকে হরপ্পা মহেঞ্জোদারোকে কেন্দ্র করে' যে সভ্যতার বিকাশ এদেশে হয়েছিল, প্রাপ্ত বিবরণাদির মধ্যে তাই প্রাচীনতম। তারপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল আর্যদের আগমন ও উত্তর-ভারতে প্রাধান্য বিস্তার। দীর্ঘকাল ধরে' ভারতের বুকে চলতে লাগল আর্য এবং আর্যপূর্ব বাসিন্দাদের রক্তের ও কৃষ্টির সম্মিলন। বৈদিক যুগ এবং পৌরাণিক যুগ এই ভাবেই অতিক্রান্ত হল। তারপরে হিন্দু-বৌদ্ধ নৃপতিদের নানা বংশ ভারতে কখনো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, কখনো প্রদেশে প্রদেশে শাসন পরিচালনা করেছে। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মুসলমান-বিজয়। পূর্বে যে সব বহিরাগত গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় ভারত আক্রমণ করেছিল, ভারতীয় প্রাচীনতর সভ্যতা তাদের নিঃশেষে গ্রাস করেছে। অবশ্য তাদের কৃষ্টি ভারতীয় সভ্যতাকে যে পুষ্ট করে নি এমন নয়। কিন্তু রাজকীয় শক্তি, ধর্মজিজ্ঞাসা, জীবনচর্যায় মুসলমানগণ একটা অভিনব মন্ত্র নিয়ে এল। তাদেরও ভারত গ্রহণ করল, কিন্তু তাদের বিশিষ্টতাকে সসম্মানে স্বীকার করেই—সম্পূর্ণ গ্রাস করে' নয়। বহু শতাব্দী ধরে মুসলমান রাজশক্তি ভারত শাসন করেছে আঘাতে-সংঘাতে, প্রীতি-প্রেমে, সমৃদ্ধিতে শিল্পে এই দীর্ঘকালের ইতিহাস পরিপূর্ণ। অবশেষে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়েছে। ধীরে ধীরে তারা সমগ্র ভারত অধিকার করেছে এবং পশ্চিম পৃথিবীর সঙ্গে এদেশকে পরিচিত করিয়েছে আবার এদেশের অজস্র সম্পদ নির্মমভাবে লুণ্ঠন করেছে। অবশেষে দীর্ঘকালীন সংগ্রামের ফলে এসেছে স্বাধীনতা।

রাজনৈতিক চক্রাবর্ত

ভারতের ইতিহাস ঘটনাবহুল, উত্থান-পতনে পরিপূর্ণ। এই ইতিহাস নিয়ে এ-যুগের ভারতবাসী যেমন গর্ব অনুভব করতে পারে, তেমনি তার লজ্জিত হবার যথেষ্ট কারণও এর মধ্যে আছে লুকিয়ে। এদেশে এমন কতকগুলি কাল এসেছে ঐশ্বর্যে-সম্পদে-সঞ্চয়ে এবং শিল্প-সাহিত্যসৃষ্টিতে, যখন দেশ অশেষ উন্নতি লাভ করেছে। উদাহরণ হিসেবে চন্দ্রগুপ্ত-অশোকের সমকালীন মৌর্যযুগ, গুপ্তযুগ এবং আকবর হইতে শাজাহানের কাল

রাজনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য

পর্যন্ত মুঘল রাজত্বকালের উল্লেখ করা চলে। ভারতে প্রাচীন কাল থেকে অজস্র রাষ্ট্রশক্তির উত্থান-পতন ঘটেছে। কোন কোন যুগে ভারতের বৃহৎ অংশ জুড়ে একক সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে আবার কোন কোন যুগে প্রদেশগুলিতে বা তাদের কোন অংশে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করেছে। দীর্ঘকালীন রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চলেছে। কোন নৃপতি প্রজার কল্যাণ কামনা করেছেন, কারও উদার দৃষ্টিভঙ্গী প্রজা-সাধারণের জীবনে ও মনে স্বস্তি ও নিরাপত্তার ভাব এনেছে। আবার কোন রাজা অনুদার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি বা চূড়ান্ত খামখেয়ালীপনা প্রজার জীবনকে বিপর্যস্ত করেছেন। অবশ্য নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সেই সর্বব্যাপক পরিবেশেও বাংলাদেশের জনসাধারণ গোপালকে তাদের নৃপতি নির্বাচন করেছিল বংশমর্যাদার প্রতি কোন নজর না দিয়েই। আবার ইতিহাসের কোন কোন পর্বে দেশের কোন কোন অঞ্চলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণও মিলছে। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্যটি অবশ্যই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ভারত এক বৃহৎ ও বিপুল সভ্যতার সৃষ্টি করলেও, প্রাচীন গ্রীক বা রোমক সভ্যতার মত ব্যাপক হারে দাসপ্রথা এদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলে নি। খুব বিচ্ছিন্ন আকারে ক্রীতদাস-প্রথা কিছু কিছু চললেও সমাজভিত্তিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এ-প্রথার ছিল না। মুসলমান আমলেও দাস ক্রয়-বিক্রয় অচলিত ছিল না। কখনো কখনো ক্রীতদাসেরা প্রবল হয়ে সৈনাপত্য, এমন কি নৃপতির সিংহাসনও দখল করেছে। কিন্তু দাসেদের উপরে ভিত্তি করে' এদেশের অর্থনীতি কোন কালে গড়ে' ওঠেনি। কোণারক-তাজমহলের মত বিরাট্ বিরাট্ প্রাসাদ-মন্দির-মসজিদ অজস্র গড়ে' উঠেছে সে-যুগে। বেকার শ্রমিকের নিয়োগও কিছু চলছে, কিন্তু দাস-শ্রম এদের ভিত্তিতে সক্রিয় ছিল না।

অর্থনৈতিক প্রথার দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে, ইংরাজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে একই ধরণের অর্থনীতি প্রচলিত ছিল। মুসলমান-বিজয় ভারতের প্রাচীনতর অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিনষ্ট করতে পারেনি।

**অর্থনৈতিক জীবন**

এই অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামের প্রাধান্য ছিল। গ্রামগুলি অর্থনীতির দিক থেকে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আত্মনির্ভরশীল। গ্রামের বাইরে যাবার প্রয়োজনীয়তা এবং ইচ্ছাও বড় বেশি ছিল না। বাণিজ্য এলাকাগুলিতে বহির্বাণিজ্য-জনিত কর্মচাঞ্চল্য ইতিহাসের কতকগুলি পর্বে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু বিশাল এই দেশের মানুষের গ্রাম্যজীবন অনেকাংশেই ছিল নিশ্চিত এবং নিস্তরঙ্গ। তবে য়ুরোপীয় সামন্তবাদের মতো প্রথা এদেশে দানা বাঁধেনি। জমির মালিক প্রজা। রাজাকে বা জায়গীরদারকে নির্দিষ্ট খাজনা বা উৎপন্ন শস্যের একটা অংশ সে দিত। কিন্তু তার মালিকানা সর্বদাই স্বীকৃত পেয়েছে। অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদ ও জুলুমবাজী

যে ছিল না তা নয়, তবে ছোটখাট জমিদার-জাগীরদারের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্কে বেশ নৈকট্যও লক্ষ্য করা যায়। এই অর্থনৈতিক জীবনের প্রভাব প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মে সাহিত্যে ও শিল্পে যথেষ্ট পরিমাণে অনুভব করা যায়। এই অর্থনৈতিক জীবনে মূলগত পরিবর্তন এল ইংরেজ-বিজয়ের পরে। ইংরেজ বণিকরা এদেশের গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিপ্রধান অর্থনীতিকে দিল ভেঙ্গে। নতুন ধরণের ভূমি-ব্যবস্থা স্থাপিত হতে লাগল। ইংরেজ বিজয়ের ফলে ভারতে কিন্তু য়ুরোপের মত ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। বড় বড় কলকারখানা গড়ে' উঠে' দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণীশক্তি হয়ে উঠল না। পুরনো কৃষিকেন্দ্রিক জীবনধারা হল বিপর্যস্ত। কিন্তু নতুন যন্ত্রকেন্দ্রিকধারাও প্রতিষ্ঠিত হল না। এইভাবে আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক অর্থনীতি গোটা ইংরেজ রাজত্ব ধরে' আমাদের দেশে প্রচলিত রইল। অথচ অন্য দিকে ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যশিল্পের চেতনায় এ-দেশবাসী পুরণো যুগকে একান্তভাবে বর্জন করে য়ুরোপীয় ধ্যানধারণার সমীপবর্তী হয়ে উঠল। এইভাবে চিন্তা-চেতনা-মানসসৃষ্টি এবং বাস্তব জীবনধারার মধ্যে একটা দ্বৈধ চলতে লাগল। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে অর্থনৈতিক জীবনে তথা তৃতীয় পর্যায়ে ভারত পৌছুল। দেশের শিল্পায়ন একটা বাস্তব সম্ভাবনার আকারে দেখা দিল। গত বারো বছরে দেশের অর্থনৈতিক জীবন সেইদিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

ধর্ম ও দর্শন

অন্যান্য দেশের মত এদেশেও প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মের প্রাধান্য ছিল। বৈদিকপূর্ব যুগে এদেশের আদিবাসীদের মধ্যে বিচিত্র আদিম পূজা-প্রণালী প্রচলিত ছিল। এখনও তার নিদর্শন মিলবে বর্তমান আদিবাসী গোষ্ঠী ও উপজাতিগুলির মধ্যে। ভারতের অধিকাংশ লোক যে ধর্মাচরণের অনুবর্তী সেই হিন্দুধর্মের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেও কয়েকটি আশ্চর্য সত্য উদ্ঘাটিত হবে। এই ধর্মের মধ্যে সুবিস্তৃত উদারতা ও সহনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। ঔপনিষদিক বিশ্বাস এবং চার্বাকী বস্তুবাদ হিন্দুধর্মের কাঠামোর মধ্যে সুনিশ্চিত ভাবে পাপাপাশি বিরাজ করেছে। পৌরাণিক দেবকল্পনার সঙ্গে লৌকিক পূজার্চনা সমান গুরুত্ব ও গৌরব লাভ করেছে। বেদান্তের অতি উচ্চ দার্শনিকতা এবং পৌত্তলিকতা এই ধর্মের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে নি। ধর্ম নিয়ে বিতর্ক ও রেষারেষি কম ছিল না, কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীকে অস্ত্রের সাহায্যে উৎসাদিত করবার ঘটনা বড় চোখে পড়ে না। মুসলমান আমলেও কিছু কিছু বিবাদ-বিসম্বাদের ঘটনা ধর্মকে কেন্দ্র করে ঘটলেও, কোন নৃপতি হিন্দু কি মুসলমান সে কথা বিচার না করেই সম্রাটেরা আপন রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেছেন। রাজপুতদের সঙ্গে মুঘলদের সংগ্রাম রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যেই ঘটেছে, ধর্মবিস্তারের জন্য নয়। নব-অভ্যুত্থিত শিখ-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুঘল

সম্রাটদের ব্যবস্থাদি রাজনীতির স্বার্থেই গ্রহণ করা হয়েছিল, ধর্মনীতির স্বার্থে নয়। ভারতের জীবনধারায় ধর্ম সহনশীলতার সাধারণ পটভূমি সৃষ্টি করেছিল। ক্রুসেড লড়াই বা প্রোটেস্ট্যান্ট-ক্যাথলিক বিসম্বাদের সমজাতীয় কোন ব্যাপারের সৃষ্টি করতে পারে নি। দার্শনিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বকে কয়েকটি অতি অভিনব বস্তু দান করেছে। অতিপ্রাচীন উপনিষদশাস্ত্রে জীবন-জগতের যে ব্যাখ্যা উপস্থাপিত, য়ুরোপীয় আধুনিক দর্শনও সেই উপলব্ধির প্রয়াসী হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বৌদ্ধদর্শনের মানবিকতা ও বস্তুদৃষ্টি যে পৃথিবীর অধিকসংখ্যক লোককে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল এটাও ভারতের কম গৌরবের কথা নয়। সে-যুগে একক ব্যক্তিত্ব হিসেবে শংকরাচার্য দার্শনিকশ্রেষ্ঠের আসন পেতে পারেন। জ্ঞানমার্গের এত বড় ব্যাখ্যাতা সমগ্র জগতে বিরল। মুসলমান রাজত্বকালে নতুন নতুন ধর্মগুরুর আবির্ভাব হয়েছে। এই ধর্মগুরুদের অবলম্বন করে' কখনও কখনও এক একটা জাতি জেগে উঠেছে। যেমন বাংলাদেশে চৈতন্যদেব এবং পাঞ্জাবে গুরু নানক। আবার সুফী সাধনা, বাউল ধর্ম, কবীরপন্থ, নাথপন্থ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মিলনের মহাসংগীত রচনা করেছে! বলা বাহুল্য, এদেশে খ্রীষ্টধর্ম রাজশক্তির সহায়তা পেয়েও গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় নি।

ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগ শিল্প-সাহিত্যে যেমন মূল্যবান ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে, তেমনি আধুনিক কালেও অতি উন্নত শ্রেণীর মানসদৃষ্টিতে সে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবার যোগ্যতা দেখাচ্ছে। বৌদ্ধ-হিন্দুযুগে সমস্ত ভারত জুড়ে মন্দির ও মূর্তি-নির্মাণে এদেশের শিল্পী যে দক্ষতা দেখিয়েছে এখনও তার নিদর্শন লুপ্ত হয়নি। কোণারক-ভুবনেশ্বর-খাজুরাহো-আবু পাহাড়-মাদুরা-মহাবলীপুরম্ প্রভৃতি অসংখ্য স্থানের নাম উল্লেখ করা চলে। গঠনের বিচিত্র ভঙ্গীতে, মণ্ডনের নিপুণ কারুকার্যে, পশুদেহ মানব-মানবী দেবদেবীর মূর্তি-নির্মাণে যে মাধুর্য ও বীর্যের সঞ্চার করা হয়েছে তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি শিল্পী-আদর্শের গৌরবস্থল। অজন্তা-ইলোরার চিত্রকলার কদর আধুনিক য়ুরোপও করছে। মুসলমান-যুগেও আমাদের স্থাপত্যশিল্পের সৌন্দর্য কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল তাজমহল তার চরম সাক্ষ্য হয়ে আছে। মুঘল-রাজপুতদের চিত্রাঙ্কনের বিশিষ্ট শৈলী-ও একাল পর্যন্ত প্রশংসা পাচ্ছে। সাহিত্যের দিক থেকে রামায়ণ-মহাভারতের তুলনা হোমার ছাড়া পৃথিবীর অন্যত্র যে মিলবে না, এ বিষয়ে বিশ্বের পণ্ডিতবর্গ একমত। তাছাড়া কালিদাস ভবভূতি মাঘ ভারবি প্রমুখ কবিদের সংস্কৃত কাব্য, বৌদ্ধ জাতককাহিনী, ফার্সী আরবী রচনা এবং বাংলা ভাষায় রচিত মধ্যযুগের নানা সাহিত্যের কীর্তিগান একাল পর্যন্ত নিশ্চিত-চিত্তে করা যেতে পারে। আধুনিক ভারতে বঙ্গসাহিত্য উৎকর্ষের যে স্তরে উঠেছে মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সাধনায়, তাতে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ রচনাদির সঙ্গে এর তুলনা চলতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল বসুও আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পের গৌরব।

শিল্প-সাহিত্য

আধুনিক ভারতবর্ষের দু'টি নাম সমগ্র বিশ্বে সর্বজনপরিচিত। ঐ বিশ্ববরেণ্য নাম দু'
হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর। অর্থাৎ পৃথিবীর কাছে ভারতের চরম পরিচয় হচ্ছে
অহিংসা শান্তি, কল্যাণ ও সৌন্দর্যের পরিচয়। ভারতী
সংস্কৃতি নিখিল বিশ্বকে এই বস্তুই দান করতে পারে, আণবিক
বোমার শক্তি বা চন্দ্রমুখী রকেটের দীপ্তি নয়।

উপসংহার

# পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবন

প্রত্যেক দেশ বা জাতিরই একটি বিশেষ ধরণের সংস্কৃতি আছে এবং সেই সংস্কৃতি
পাদপীঠে জাতীয় জীবনকে দাঁড় করিয়ে জগতের দরবারে তাদের বৈশিষ্ট্যকে দেখাতে
চায়। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তাদের জীবনযাত্রার ছন্দ
একটি বিশেষ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পরিপূর্ণ আত্ম
প্রকাশের মধ্যেই প্রত্যেক জাতির একটি গৌরবময় রূপ আছে, আর সেই রূপটি ফুটে
ওঠে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে।

ভূমিকা

পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়-সূত্রটিকে ধর'তে গিয়ে আমাদের সর্ব
প্রথম 'সংস্কৃতি' কথাটিকে বুঝে নিতে হবে। সংস্কৃতির মধ্যে একটি 'কৃতি' বা প্রাণম
বিকাশের জন্য সৃষ্টিমূলক দিক আছে,—আর আছে চিৎ
প্রকর্ষের সুগভীর প্রকাশ-ব্যাকুলতা। বাইরের সৃষ্টিমূলক
বিকাশের দিকটির সঙ্গে তাল রেখে যদি চিত্তের বিকা
সাধন না ঘটে, সত্যকার সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। এই জন্যই সংস্কৃতির মধ্যে
একটি জাতির যেমন বহির্জীবনের কর্মসাধনার দিক আছে, তেমনি আছে মানস-সাধনা
দিক। কর্মময় শক্তি ও জ্ঞানপিপাসু মনের যে পারস্পরিক সক্রিয়তা, তাই গড়ে তোলে
একটি বিশেষ দেশের বা জাতির সংস্কৃতিকে। সংস্কৃতির মুকুরে ধরা পড়ে একটি জাতি
মানস-প্রবণতা, তার অনুষ্ঠানময় সামাজিকতা, শিল্পসাহিত্যের কারুকৃতি, ধর্মের প্রকৃতি
ও ঐতিহ্যের সমুন্নতি। সংস্কৃতি তাই একটি জাতির প্রাণসত্তার কর্মময় ও চিন্ম
অভিব্যঞ্জনা। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তারেই বেজে ওঠে একটি জাতির মর্মধ্বনি।

'সংস্কৃতি' কথাটির অর্থ ও বাখ্যা

পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবন এ-গুলির প্রায় প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য নিয়েই গড়ে
উঠেছে। তার যেমন বাইরের ঐতিহ্যগত সম্পদ আছে, তেমনি আছে মানস-সম্পদ
বহু প্রাচীনকাল থেকেই একটি গৌরবময় ইতিহা
পূর্ব-বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে জড়িয়ে রেখেছে। ব
জ্ঞানসাধকের তপস্যার সম্পদ দেশ-বিদেশের চিত্তকে আকর্ষ
করেছে। যে-সংস্কৃতি বা সভ্যতা অন্য দেশের প্রাণকে আকর্ষণ করতে পারে
তাই বরণীয় সংস্কৃতি। পূর্ব-পাকিস্তান সেইরূপ বিশেষ একটি সংস্কৃতির অধিকারী

ঐতিহ্যগত সম্পদ ও মানস-সম্পদ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাবধারায় পরিপুষ্টি লাভ করে' বাঙ্গালী সংস্কৃতি যখন নূতন একটি রূপ লাভ করল, তৎ থকেই স্বর্ণসৌধটিতে একটি সৃষ্টিরূপেরও ম বুলিয়ে দিয়েছিল। পাক্-ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাঙ্গালী সংস্কৃতি সেই আত্মপ্রকাশের পথে নূতন প্রাণসঞ্চার করবার জন্যই সচেষ্ট হয়েছে। পাক্-ভারতীয় সংস্কৃতি যখন ক্রমবিকাশের পথটি ধরে' বহু সোপান অতিক্রম করে' অনেকটা এগিয়ে গেছে, তখন নূতন ঐতিহ্যের একটি রাজপথ সৃষ্টি করে' মুসলমান সংস্কৃতি এসে দেখা দিল। এই সংস্কৃতির যোগবন্ধনে বাঁধা পড়ে' বাঙ্গালীর সাহিত্য ও শিল্পচেতনা জেগে উঠেছিল নূতন সৃষ্টির আনন্দে। পূর্ব-বঙ্গ সেই সাংস্কৃতিক চেতনার মানস-ঐশ্বর্যকে গ্রহণ করে' তার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপে, আধ্যাত্মিক মানসিকতার প্রকাশভঙ্গীতে, গ্রাম্যসংগীতের বৈশিষ্ট্যে, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার রীতি-নীতিতে একটি বিশেষ রূপায়ণ রূপায়িত করে' তুলেছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবন হিন্দুমুসলমানের মিলিত মানস-চর্চার বহিঃপ্রকাশ।

বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রাচীন পটভূমিকা

পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনে যেমন বৈচিত্র্যের ব্যাপ্তি আছে, তেমনি আছে একটি মিস্‌টিক মনোভাব। বৈচিত্র্য ফুটেছে বস্তুধর্মী সংস্কৃতিতে, আর মিস্‌টিক মনোভাব প্রকাশ লাভ করেছে আধ্যাত্মিকতার সংগীতে। পূর্ব-পাকিস্তানের যে-বাউল, মুর্শীদী, ভাটিয়ালী গান, তার মধ্যে রূপাতীতের সঙ্গে মানস সম্বন্ধ স্থাপন করবার কি যেন এমন এক রস-আবেদন আছে। বাউলের অন্তরে যে-বৈরাগী পায়—তা যেন সমস্ত প্রাণমনকে উদাস করে' কোথায় কোন্ সুদূরের দেশের পানে টেনে নিয়ে যায়! নদীর তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে ভাটিয়ালী-গানের প্রাণ-ব্যাকুলতার সুর-ঝংকার। তা'ছাড়া জারিগান ও গাজার গানের একটি বিশেষ রূপ আছে পূর্ব-পাকিস্তানে। কিছুদিন হ'ল কবিগানের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। আনন্দময় সংগীতের জগতে নূতন জাগরণের কল্লোলধ্বনি উঠেছে যেন! কবিগানের যে সুরধারা একদিন পূর্ব-পাকিস্তানে শুষ্কপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, তার পুনর্জাগরণে মনে হয় প্রাণময় চেতনার একটি দিক আবার যেন নূতন করে' সঞ্জীবনীমন্ত্র লাভ করেছে। কবিগানের একটি বিশেষ চর্চা পূর্ব-বাংলায় প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। কীর্তনগানের প্রচলন পূর্ব-পাকিস্তানে এক সময় খুবই ছিল, এখনও আছে। কৃষ্ণলীলাকে যাত্রার ছাঁচে ঢালাই করে গান করবার রীতি বোধ হয় পূর্ব-পাকিস্তানের নিজস্ব। এ-গান আজ পর্যন্তও অনেকটা পূর্বের মতোই চলছে। বৈষ্ণব ও শক্তি আরাধনার দু'টি দিকই আজও পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুর জীবনকে ধর্মগত সাংস্কৃতিক চেতনার দিক দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে তুলছে।

পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনে বৈচিত্র্য ও মিস্‌টিক মনোভাব

মানসিক ও কলাগত সংস্কৃতির দিক দিয়েও পূর্ব-পাকিস্তান একটি স্মরণীয় দিক রক্ষা করে'চলেছে। 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা তার সাংস্কৃতিক জীবনের একটি মৃত্যুঞ্জয় স্বাক্ষর বহন করছে। অশিক্ষিত গ্রাম্যকবির কণ্ঠে পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যেমন প্রশস্তি-গীতি দুই একটি গানের অল্প কথায় ফুটে উঠেছে, তেমনি ফুটে উঠেছে মানবমনের অতলান্ত প্রেমরহস্য। সেই ধারা আজ পর্যন্তও পূর্ব-পাকিস্তানে লুপ্ত হয়নি,—এখনও বহু গ্রাম্যকবি সংগীতের জগতে তাদের অন্তর্মুখী মন নিয়ে পল্লীর শ্যামল রূপের মৌন প্রশান্তির মধ্যে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করে। বংশীদাস, নারায়ণ-দেবের মনসামঙ্গল, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ-গান, দ্বিজ কানাই, নয়ানচাঁদ ঘোষ, কবি মনসুরের কাহিনী-গীতি পূর্ব-পাকিস্তানের মানসগত সাংস্কৃতিক জীবনকে আজ পর্যন্তও মধুর করে রেখে দিয়েছে। বংশীদাস ও নারায়ণদেবের মনসামঙ্গল নিয়ে একদিন পূর্ব-বাংলায় 'ভাসানগানে'র আনন্দকল্লোল বয়ে গিয়েছিল। চেতনার তটদেশে সেই আনন্দস্মৃতি আজও নূতন ধ্বনি জাগিয়ে তুলে সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

মানসিক ও কলাগত সংস্কৃতি

পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনগঠনের কার্যে বহুমূল্য উপাদানের যোগান দিয়েছে লোকসাহিত্যের অন্যান্য দিক। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ছড়াগুলি সারল্যভরা প্রকাশ-মাধুর্যে ও বিচিত্র উপলব্ধির সুর-ঝংকারে সকলের অনুভূতির তারে একই সঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দের গান বাজিয়ে যায়। সহজ অনুভূতির স্বত-উৎসারিত প্রকাশ বলেই লোকসাহিত্য জীবনকে প্রতিদিন শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ভরে' তোলে। পূর্ব-পাকিস্তানের লোকসাহিত্য সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম প্রধান ধারক।

সাংস্কৃতিক জীবনে লোক-সাহিত্যের অন্যান্য দিক

অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি আর একটি লক্ষণীয় দিক গড়ে'তুলেছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত একটি সংস্কৃতির রূপ পাওয়া যায় পূর্ব-পাকিস্তানের কয়েকটি অনুষ্ঠানে। এখানকার পল্লী-অঞ্চলে এখনও অনেক হিন্দু পীরের দরগায় শিরনি ও বাতি মানত্ করে' যায়। নবান্নের উৎসবে, পৌষপার্বণের আনন্দরোলে, বিবাহের স্ত্রী-আচারে, ব্রতপার্বণের আলপনায় ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অনেক কাজে সংস্কৃতিমূলক মানস-সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। চৈত্র-সংক্রান্তি চড়ক-পূজা উপলক্ষে এখনও অনেক হিন্দু সঙ সেজে এসে নৃত্যগীত পরিবেশনে হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই পরিতুষ্ট করে। চড়কপূজায় বহু মুসলমানেরও সমাগম হয়। মহরম-উপলক্ষে মুসলমানগণ হিন্দু বাড়িতে লাঠি খেলা দেখিয়ে আনন্দ দান করে। পূর্ব-পাকিস্তানের এই আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে আন্তরিক প্রীতিমাধুর্যের পরিচয় মেলে।

অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি

সাংস্কৃতিক জীবনে আছে লোকসংস্কৃতির আর একটি দিক। এই দিকটিও পূর্ব-পাকিস্তানে বিশেষ মূল্য দাবি করে। এই লোকসংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে

কৃষিজীবীদের সংস্কৃতি। বহু রকমের গঠনকর্মে, চিত্রশিল্পের কারুকার্যে, পুতুল-রচনার পটুতায়, অলংকার-গড়ার চাতুর্যে একটি বাস্তব সাংস্কৃতিক জীবন পূর্ব-পাকিস্তানে অনেক-কাল আগে থেকেই আছে, এবং আজও তার বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণেই দেখা যায়। খড়ের চালের কুটির দারিদ্র্যের স্বাক্ষরচিহ্ন বহন করলেও কৃষক-জীবনের কারুকৃতিমূলক যে বশিষ্ট্যের দিক আছে, তারও পরিচয় বহন করে। পূর্ব-বাংলার বেত ও বাঁশের কাজ আবার যেন নূতন করে জেগে উঠেছে। গাজীর পট আঁকার এখন প্রচলন নেই বটে, কিন্তু পূজাপার্বণে শরায় ছবি-আঁকার বিশেষ রীতিটির এখনও সমারোহ আছে। গ্রাম্য-শিল্পের মধ্যে পোড়ামাটির পুতুল ও কাঠের পুতুল তাদের স্থানটিকে আজও বজায় রেখে চলেছে। ঢাকার শাঁখের কাজ, রূপার তারের কাজ, ময়মনসিংহের অন্তর্গত ইসলাম-পুরের কাঁসার বাসন, ঢাকার ফুলতোলা কাপড়, টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি, কুমিল্লার ময়নামতীর শাড়ি, রাজশাহীর মট্‌কা, কুমিল্লা ও নোয়াখালির শীতলপাটি প্রভৃতি আজ পর্যন্তও পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনকে অন্যদেশের কাছে লক্ষণীয় করে রেখেছে। এখানে কাঁথা-সেলাইয়েব একটি বিশেষ শিল্পসংস্কৃতি আছে, এবং তাহার মধুরতম প্রকাশরূপ দেখ্‌তে পাই পূর্ব-পাকিস্তানের স্বনামখ্যাত কবি জসীমউদ্দীনের 'নক্সীকাঁথার মাঠ' কাব্যটিতে। এই কাব্যের নায়িকা যখন তার কাঁথাটির উপরে নিজ জীবনের বেদনাকে রূপময় করে তুলেছে, তখন—'ও যেন তাহার গোপন ব্যথার বিরহিয়া এক কবি।' শুধু তাই নয়,—

লোকসংস্কৃতির আর একটি দিক

> 'অনেক সুখের দুঃখের স্মৃতি ওরি বুকে আছে লেখা,
> তার জীবনের ইতিহাসখানি কহিছে রেখায় রেখা।'

প্রিয়বিচ্ছেদের হৃদয়-নিঙড়ানো বেদনাময় ছবিটিকে একটি ছেঁড়া কাপড়ের কাঁথার বুকে পূর্ব-পাকিস্তানের পল্লীরমণী বুঝি এমনি করেই ফুটিয়ে তুলে' সাংস্কৃতিক জীবনে একটি শিল্পসুন্দর অধ্যায়কে সকলের সামনে তুলে ধরেন। চিরুনী-শিল্পেরও এক ব্যাপকতা আজকাল এখানে দেখা যায়।

নৃত্যশিল্পে বুল্‌বুল্ চৌধুরী যে-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর সহধর্মিণী ও অন্যান্য সুযোগ্য অনুসারিগণ সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করবার জন্যে যেমন আজকাল আগ্রহশীল হয়েছেন, তেমনি চেষ্টাও করেছেন। তাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উচ্চতর সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে পূর্ব-পাকি-স্তানের জন্য একটি বিশেষ স্থান করে নেবে, সে আশা আমাদের আছে।

নৃত্যশিল্প

দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে উচ্চতর ভাবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয় ও বহুবিধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। পূর্ব-বাংলা সেই দিক দিয়ে ঐশ্বর্যশালিনী হয়ে উঠেছে। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিস্তারমূলক প্রচেষ্টার ফলে বিভিন্ন রকম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা ও গবেষণা চলেছে। অনুসন্ধিৎসু বিদ্যার্থী-হৃদয়ের পিপাসা আজকাল চরিতার্থতার পথ করে' নিতে পারছে যেন। রাজশাহীতেও আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জ্ঞানতপস্যার আলোকময় পথে চলবার নির্দেশ লাভ করেছে পূর্ব-পাকিস্তান। ঢাকায় একটি শিল্পবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদীন তাঁর শিক্ষাদান-কার্যের দক্ষতার দ্বারা একটি নূতনতম সংস্কৃতির দ্বার যেন মুক্ত করে দিচ্ছেন। যুগোপযোগী সিনেমা-শিল্প বিস্তারের জন্যও প্রবর্ধমান প্রচেষ্টায় সাক্ষ্য মিলছে।

**সংস্কৃতি-সৃষ্টিতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান**

পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকুকেই এর সামগ্রিক রূপ বলে ধরে নেওয়া চলবে না। সামাজিকতার পটভূমিতে দৈনন্দিন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নূতন-কিছু সৃষ্টি করার মানস-প্রবণতাকে জাগিয়ে রেখে জাতীয় সংস্কৃতিকে গড়ে' তুলতে হয়। নূতন স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব-পাকিস্তানের জনসমাজ একটি বিশেষ সংস্কৃতিকে গড়ে' তুলবার জন্য যে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে, তা বেশ বোঝা যায়। বিশ্ববাসীর চোখে নব নব সংস্কৃতি সৃষ্টির দ্বারা পূর্ব-পাকিস্তান বরণীয় হ'য়ে উঠুক, এই সকলের কাম্য।*

**উপসংহার**

# বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকদের সাহিত্যসাধনার ক্রমবিকাশ

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান বাংলা দেশে বিজেতা হিসাবে প্রবেশ করে এবং এই সময়ের কিছু পূর্বকাল হইতেই সমগ্র ভারতবর্ষে এক নূতন সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। বাংলা দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতেই মুসলমান শাসকবর্গ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এদেশের প্রাণের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইলে এদেশের ভাষা আয়ত্ত করা দরকার—এদেশের ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাই মুসলমান শাসককুল এদেশে আসিয়াই বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন, এবং তাঁহারা হিন্দুমুসলমান কবি ও সাহিত্যিকবর্গকে তাঁহাদের রাজসভায় স্থান দান করিয়া নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বাংলা ভাষা নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে পরিণতির পথে আগাইয়া চলিতে লাগিল। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে একটানা ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সব মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডীমঙ্গল,

**দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় ও হিন্দু মুসলমান-নির্বিশেষে বঙ্গসাহিত্য সাধনার প্রকৃতি-পরিচয়**

*অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত, এম, এ, মহাশয়ের সৌজন্যে।

কালিকামঙ্গল, মনসামঙ্গল, বৈষ্ণবজীবনী ও চরিতসাহিত্য, বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ণ বা শিবমঙ্গল প্রভৃতি বিরচিত হইয়াছিল তাহাতে হিন্দু-মুসলমান কবি-সাহিত্যিক জাতিধর্মনির্বিশেষে রচনাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান লেখকবর্গে সাহিত্যে-কাব্যে ধর্মই ছিল সাহিত্যিক প্রেরণার উৎস। স্থতরাং মানবধর্ম বা মানবপ্রেম কাব্যপ্রেরণাকে কোনপ্রকারেই উদ্দীপ্ত করিতে পারে নাই—ভগবৎপ্রেমই ছিল কাব্য বা সাহিত্যের উপজীব্য। মানুষের স্বভাবধর্ম এবং প্রেম য কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হইতে পারে, তাহা বৈষ্ণব পদকর্তাগণও ধরিতে পারেন নাই। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণও যুগের প্রভাব অতিক্রম করিয়া স্বকীয় মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কিন্তু ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণের রচনা ও চিন্তাধারায় মৌলিকতার সন্ধান পাওয়া গেল। এই সময়ে যিনি সর্বপ্রথম মানুষের প্রেমকাহিনী—ইউসুফ-জোলেখার প্রেমের বিবরণকে—ভিত্তি করিয়া একখানি অনিন্দ্যসুন্দর কাব্য রচনা করিলেন, তিনি হইলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। সগীরের কাব্য বিখ্যাত পারস্য কবি ও দার্শনিক জামীর সুফীদর্শন ও ভাবের অনুসরণে রচিত। মূল আখ্যানভাগটি সগীর ধার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আখ্যায়িকার সুমধুর বর্ণনার ক্ষেত্রে সগীরের মৌলিকতা অসামান্য। গ্রন্থখানি বিরাট্ হইলেও ভাষার স্বচ্ছন্দগতি কোথাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। সমগ্র কাব্যের মধ্যে সগীর নরনারীর প্রেমের যে মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

দুইটি স্থান ছিল মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণের সাহিত্য ও কাব্য আলোচনার কেন্দ্রস্থল। ইহার একটির নাম গৌড় এবং অপরটি আরাকান। বাংলা দেশে পাঠানেরা যখন শাসকরূপে গৌড়ের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন হইতেই তাঁহারা বাঙ্গালীদের সহিত বসবাস করিতে ও অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করিতে লাগিলেন। তখন গৌড়ের ভাষা ছিল বাংলা। নূতন শাসকবর্গ হিন্দুদিগের পুরাণ, ইতিহাস ও শাস্ত্রাদি আলোচনাচ্ছলে বাংলা ভাষা শুনিতে ভালবাসিতেন এবং প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থ যাহাতে বাংলায় অনুবাদিত হয়, সেজন্য উৎসাহিত করিতেন। গৌড়ের অধীনস্থ সুবাদার পরাগল খাঁ এবং তদীয় পুত্র ছুটি খাঁ ব্যাপকভাবে সাহিত্য-চর্চার আয়োজন করেন। গৌড়ের বিদ্যোৎসাহী সম্রাট্ হুসেন শাহ্ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টা-তদ্বিরের ফলে গৌড়-দরবারের রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত শাস্ত্রচর্চা ও কাব্যালোচনা করিতেন। এই সময়ে হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকগণ কাব্যচর্চায় অংশগ্রহণ করিলেও, তাঁহাদের সাধনা

মুসলিম কবি-সাহিত্যিক-গণের সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্রস্থল দুইটি :—(১) গৌড়

এবং অনুশীলনের মূলে যাহারা ছিলেন তাঁহারা সকলেই মুসলমান। গৌড়ের মুসলমান শাসকবর্গ মুক্তহস্তে ও অকপটে সাহায্য করিতেন বলিয়াই মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে আগাইয়া চলিল।

শাহ মুহম্মদ সগীরের পর চট্টগ্রামবাসী কবি জঈনুদ্দিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের কেহ কেহ কবি জঈনুদ্দিনকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি বলিয়া অভিহিত করেন। কবি জঈনুদ্দিন গৌড়ের সুলতান সামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের ( ১৪৭৪—৮২ খ্রীষ্টাব্দ ) পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেন হজরত মুহম্মদ ( দঃ )-এর পবিত্র জীবনী অবলম্বনে "রসুল-বিজয়"। জঈনুদ্দিনের পরে সৈয়দ সুলতান রচনা করেন 'নবীবংশ'। ইহা ছাড়াও তিনি 'সবে মেরাজ' ও 'ওফাতে রসুল' নামে আরও দুইখানি কাব্য রচনা করেন। তাঁহার ভাষা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন। রচনাভঙ্গী কবি কৃত্তিবাস কাশীরাম অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। রচনার মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল-সৃষ্টি সৈয়দ সুলতানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'নবীবংশে' তিনি বর্ণনা করিয়াছেন কয়েকজন নবীর জীবনকাহিনী। আলাওল ভিন্ন তাঁহার ন্যায় জনপ্রিয় কবি আর কেহ ছিলেন না। কবি 'কাসাসুল আম্বিয়া'র মতো অনেক পুঁথি রচনা করিয়া স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর দান করিয়াছিলেন। শা বিরিদ খাঁ ও শেখ চাঁদ 'রসুলবিজয়-কাব্য' প্রণয়ন করেন। শেখ চাঁদ ছিলেন অধ্যাত্মবাদী ও তত্ত্বরসের রসিক। 'রসুলবিজয়' ছাড়াও তিনি 'শাহদৌল্লা পীরপুঁথি' রচনা করিয়াছিলেন। শা বিরিদ খা বিদ্যাসুন্দরের প্রণয় কাহিনী লইয়া 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য লেখেন। "মুহম্মদ হানিফা ও কায়রাপরী" নামক রোমাণ্টিক কাব্যও তাঁহার রচনা। মহম্মদ খানের রচিত 'মাকতুল হোসেন' 'সত্য কলি বিবাদ সংবাদ' ও 'কেয়ামত নামা' কাব্যত্রয়। 'মাকতুল হোসেন' কাব্যে কারবালার বিষাদময় কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। 'সত্য কলি বিবাদ সংবাদ'-এ আছে যোগশাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক মারফতী আলোচনা। মহম্মদ খাঁকে অনুসরণ করেন ইয়াকুব আলি ও জনাব আলি প্রভৃতি কবিগণ। ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কবি আবদুল নবী রচনা করেন 'আমীর হামজা' কাব্য। 'আমীর হামজা'-র বিরাট্ কলেবর মহাভারতের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। ভাষা স্বচ্ছ এবং সুন্দর। কাহিনী-বর্ণনা ও বিরাটত্বের দিক দিয়া ধরিলে আবদুল নবীর কাশীরাম দাসের সহিত তুলিত হইবার যোগ্যতা রহিয়াছে যথেষ্ট। সৈয়দ মহাম্মদ আকবর 'জেবুন মূলক সামারোগ' কাব্য রচনা করেন। মানুষ ও পরীর কাহিনী বর্ণনার ভিতর দিয়া কবি উন্নত ধরণের কবি-প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছেন। কবি মহম্মদ রফিউদ্দীন, চুহর, কবি শেরবাজ প্রভৃতির নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চুহরের 'আজবশাহ সোমনরোজ' গ্রন্থ, শেরবাজের 'কাশিমের লড়াই'

গৌড়কেন্দ্রে মুসলিমের সাহিত্য-সাধনা—বঙ্গসাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি কে ?

'মল্লিকার সওয়াল' 'ফক্করনামা' ও 'সখিনার বিলাপ' প্রভৃতি কাব্য জাতীয় জীবনের রূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছিল।

উত্তর-বঙ্গের প্রথম মুসলমান-কবি রংপুর-নিবাসী কবি হায়াৎ মামুদ। তিনি 'জঙ্গনামা' 'মুসার সওয়াল' 'চিত্তউত্থান' 'হিতজ্ঞানবাণী', 'অম্বিয়াবাণী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি গরীবুল্লা 'আমীর হামজা' (১ম খণ্ড) 'ইউসুফ জোলেখা' 'জঙ্গনামা' 'সোনাভান' 'সত্যপীরের পুঁথি' প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। গরীবুল্লার বাড়ী ছিল পশ্চিমবঙ্গে। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী নিবাসী কবি সৈয়দ হামজা বিরাট্ গ্রন্থ 'আমীর হামজা' (২য় খণ্ড) 'হাতেম তাই' 'জৈগুনের পুঁথি' 'মধুমালতী' প্রভৃতি রচনা করিয়া স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় দান করেন। চট্টগ্রামের নসরুল্লা হজরত আলীর বীরত্ব-কাহিনী লইয়া লিখিলেন 'জঙ্গনামা' কাব্য। খলিল আহম্মদ 'ভানুমতীর লড়াই' কাব্য রচনা করেন অনেকটা নসরুল্লার অনুসরণে। আবদুল হাফিজের বিরচিত 'নুরনামা' 'নুরকনদেব' 'নসিহৎনামা' 'লালমতি সায়ফুল-মূলক'। আল্লারসুলের কাহিনী গ্রথিত করিয়া কবি তাঁহার এই কাব্য কয়খানা লিখিলেন। মুহম্মদ জীবন 'কামরূপ-কুমার' 'বাহান্ন হুসেন বাহারাম বোল' রচনা করেন। ইঁহাদের সকলের গ্রন্থের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায় নাই; কিন্তু গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বত্র ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর দরদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই হিসাবেই এই কবিদিগের কাব্যের বিচার করিতে হইবে। বাউল বা কবিত্বের সম্পর্কে আলোকপাত করিয়া গ্রন্থ রচনা করেন কবি আলি রেজা ওরফে কানু ফকির। চট্টগ্রাম তাঁহার বাসভূমি। 'জ্ঞানসাগর' 'যোগকলন্দর' 'সাতচক্র ভেদ' 'ধ্যানমালা' প্রভৃতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কবি ফয়জুল্লা সত্যপীরের কাহিনী লইয়া সর্বপ্রথম 'গোরক্ষবিজয়' কাব্য প্রণয়ন করেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন আরিফ ও ওয়াজেদ আলি।

গৌড়কেন্দ্রে মুসলিমের সাহিত্য-সাধনায় ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিপত্তি

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে যে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে ভাবের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় হিন্দু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ভাবানুসারী অনেক মুসলমান কবি ও পদকর্তাও রহিয়াছেন। মুসলমান পদকর্তাদিগের মধ্যে যাঁহারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা হইলেন শেখ কবির, আলাওল, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মুর্তজা, সালবেগ, আলীরাজা, ফৈজুল্লা, চাঁনকাজী, আকবর প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকজন কবি বিরহ-বেদনায় কাতর নায়িকার বার মাস যাপনের কাহিনী অবলম্বনে লিখিয়াদেন বারমাস্যা। বৈষ্ণব-কাব্যের উপজীব্য পারমার্থিক প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করিয়া এই কবিকুল লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। যে প্রেমের মাহাত্ম্য পারস্যদেশীয় মরমী কবি

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে মুসলিম কবিগণ

হাফিজ ও ওমরের গজল-রুবাইয়াতে ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহাই যেন সুদূর বাংলা দেশের কবিগণের কণ্ঠে অনুরণিত হইয়া উঠিল ; মুসলমান কবিগণও প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিল। 'জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সই তারে'।

মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে মুসলমান কবিদিগের অবদান সর্বাপেক্ষা বেশি হইল রোমান্টিক কাহিনী-রচনার ক্ষেত্রে। এই ধারার কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কবিগণ পারস্য কবিদিগের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন নানাভাবে। কাহিনী ভাব ও পরিকল্পনার দিক দিয়া তাঁহারা পারস্য সাহিত্যকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন বেশি করিয়া। দৌলত উজির বাহারাম খাঁ 'লায়লা মজনু' কাব্য রচনা করেন।

(২) আরাকান-কেন্দ্রে মুসলিমের সাহিত্য-সাধনার স্বরূপপ্রকৃতি —রোমান্টিক কাহিনীর প্রাধান্য

মুহম্মদ সগীর ও আবদুল হাকিমের পুস্তকগুলি রোমান্টিক কাব্য। কিন্তু রোমান্টিক কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা আলোড়ন উঠে আরাকান রাজসভায় মুসলিম কবিগণের রচনায়। পাঠান রাজগণ ও তাঁহাদের কর্মচারীদের অনুকরণে ও উৎসাহে আরাকান-রাজসভা সপ্তদশ শতকে বাংলা সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এখানকার সব কবিই ছিলেন মুসলমান। শুধু আরাকানের নয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন সৈয়দ আলাওল। নিজের কাব্যগুলিতে তিনি স্বীয় জীবনের কথা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা একেবারে বৈচিত্র্যহীন নয়। তিনি 'পদ্মাবতী' 'লোরচন্দ্রানী' 'সৈফুলমুল্‌ক বদিউজ্জমাল' 'হপ্তপয়কর' 'দারাসিকন্দর-নামা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। আলাওলের কবিত্বশক্তি ছিল অসাধারণ। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল গভীর। সর্বোপরি কবির গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাঁহার আদি-রসাত্মক কাব্যগুলিকে একটি সংযতশ্রী প্রদান করিয়াছে। আক্ষরিক অনুবাদ তিনি কোথাও করেন নাই। তৎকালে রূপবর্ণনা, বারমাস্যা বর্ণনা, বীররসাত্মক যুদ্ধবর্ণনা প্রভৃতির ভিতর দিয়া কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিবার প্রথা ছিল। আলাওল স্বীয় কাব্যগুলিতে, বিশেষতঃ 'পদ্মাবতী'তে স্বীয় মৌলিকতার পরিচয় প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন। 'পদ্মাবতী' কবির এক অনুপম সৃষ্টি। সমগ্র কাব্যের মধ্যে কোথাও আন্তরিকতার অভাব নাই। কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন আলাওলের উৎসাহদাতা। ইনি আরাকানরাজসভার মন্ত্রী হইলেও কাব্য প্রণয়নের ব্যাপারে কবি আলাওলকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। হয়ত তাঁহারই সাহায্য লাভে কবি আলাওল প্রতিভা বিকাশের ব্যাপারে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। আলাওল তাঁহার কাব্যে মাগন ঠাকুরের প্রশংসা করিয়াছেন। 'চন্দ্রাবতী' কাব্য-রচয়িতা মাগন ঠাকুর এবং রাজমন্ত্রী মাগন ঠাকুর এক ব্যক্তি কিনা, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের মূলকাহিনীর সঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে তিনটি উপকাহিনী। উপকাহিনীগুলির পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রহিয়াছে। কাহিনী হইয়াছে রসাল কিন্তু কবিত্ব সুলভ নয়। কাব্যখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও কবিত্বশক্তি উচ্চগ্রামে বাঁধা হয় নাই। কবি মর্দান দৌলতকাজীর কিছু পরবর্তীকালের। কবি দৌলতকাজী ছিলেন আর একজন প্রতিভাশালী কবি। তাঁহার রচিত কাব্য 'সতীময়না' মধ্যযুগীয় হিন্দু-মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। নীতিগত আদর্শ ছিল, রুচি ছিল, কবিত্ব ছিল। ভাষা অতীব মনোজ্ঞ। সব দিক দিয়া শালীনতাসম্পন্ন এমন একখানি চমৎকার কাব্য মধ্যযুগে বড় একটা দেখা যায় না। নারীর বিরহকালীন মনোভাব কবি বারমাস্যায় নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে নারীর যৌবনধর্মের কথাও রহিয়াছে। 'ময়নামতী'র ন্যায় শালীনতাসম্পন্ন, সুন্দর, মার্জিত ও অনুপম নারীচরিত্র বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। ভোগ ও কামনার প্রতীকরূপ কিছুই নাই দৌলত কাজীর 'সতীময়না কাব্যে'। 'লোরচন্দ্রাণী' তাঁহার আর একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য। কবি সমসের আলি আরাকান রাজসভার অপর একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁহার রচিত 'রেজওয়ান শাহ' কাব্যখানি কবি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। কাব্যের মূল কাহিনীটি পারস্য-সাহিত্যের অন্তর্গত। রোমান্টিক কাহিনী রচয়িতাদের মধ্যে কবি মর্দান রচিত 'নাসিরনামা', মুহম্মদ আকবর রচিত 'জেবুলমুলুক' এবং মুহম্মদ রাজা রচিত 'মিসরী জামাল' শ্রেষ্ঠ।

কতকগুলি পুঁথি এই সময়ে আরবী-পার্শী-উর্দু সাহিত্য হইতে বাংলাভায়ায় অনূদিত হইয়া রসিক-সমাজের কাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল। অনুবাদ ছাড়া আর

আরবী-পার্শি-উর্দু সাহিত্য হইতে অনূদিত পুঁথি-রচনায় মুসলিম কবিগণ

যাহা কিছু মৌলিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কবিত্বের নিকষে পরীক্ষা করিলে সেগুলিকে বিশেষ উচ্চস্থান দেওয়া যাইতে পারে। এগুলির অধিকাংশের মধ্যেই কবিত্ব নাই; কিন্তু অনূদিত পুঁথিগুলি সম্পর্কে একথা খাটে না। 'আলেফ-লায়লা', 'কাছাছোল-আম্বিয়া', 'আমীর হামজা' ও 'সবে মেরাজ' প্রভৃতি পুঁথিগুলি মুসলিম সাহিত্যের মুকুটমণি। প্রধানতঃ দুইটি কারণের জন্য পুঁথি-সাহিত্য মুসলমানদের কাছে আদর পাইয়াছে। প্রথমতঃ, এগুলি বাংলার মুসলমানদের বোধগম্য সহজতম বাংলা ভাষায় রচিত। দ্বিতীয়তঃ, মুসলিম জাতির ধর্মকথা ও মুসলিম বীরগণের বীরত্বের কাহিনী ইহার প্রাণ। কবিত্বের দিক দিয়া ইহার মূল্য যাহাই হোক্, মুসলিম জনসাধারণের ধর্মজীবন গঠনের দিক দিয়া মূল্য অসামান্য। উত্তরবঙ্গের পল্লীগীতি-সাহিত্য মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণের সাহিত্যসাধনার আর একটি স্বাক্ষর দান করিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ প্রচেষ্টায় পূর্ব-বঙ্গের ময়মনসিংহ ও

চট্টগ্রাম জেলার পল্লীগীতি সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মোট ৫৪টি গীতিকার মধ্যে ২৩টি গীতিকা সংগ্রহ করা হইয়াছে মুসলমান-দিগের বাড়ি হইতে। পল্লীকবির রচিত 'দেওয়ানা-মদিনার' কাহিনী মর্মস্পর্শী। কাহিনীটি ভিতর হাসিকান্না, হর্ষে-বিষাদ যেমন সুবিপুল পরিমাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সমগ্র কাহিনীটি মানুষের অন্তরপুরীর অনন্তরহস্য-জাল দ্বারা বেষ্টিত। জগদ্বিখ্যাত মনীষী রোঁম্যা রোলাঁ এই কাহিনীটির সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন : 'I was specially delighted with the touching story of Madina, which although only two centuries old, has an antique beauty and purity of a sentiment which art has rendered faithfully without changing it."

মধ্যযুগে কবিগণ কাব্য রচনা করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া গদ্যসাহিত্যের চর্চা করিতেন না তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। তদানীন্তন কালের প্রামাণ্য কোন গদ্য-পুস্তক না পাওয়া গেলেও পারিবারিক চিঠিপত্র ও সরকারী দপ্তরে দাখিল-করা দরখাস্ত দৃষ্টে মনে হয় যে, তখনও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একপ্রকার বাংলা গদ্যের প্রচলন ছিল, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বলাভের পর শিক্ষিত হিন্দুগণ কলিকাতা ও হুগলী অঞ্চলে গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং তাহারই ফলে ভাগীরথী নদীর দুই তীর দিয়া একটি নূতন 'কালচার' বা সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মিশনারীদিগের প্রচেষ্টার ফলে এবং সিভিলিয়নদিগকে বাংলা শিক্ষা দিবার প্রয়োজনে উইলিয়ম কেরীর তত্ত্বাবধানে বাংলা ভাষার পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন আরম্ভ হয়। পাদ্রী কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতির সহায়তায় হিন্দু পণ্ডিতবর্গ সংস্কৃত-মিশানো বাংলা গদ্যভাষা সৃষ্টি করিয়া গদ্যগ্রন্থ-প্রণয়নে যত্নবান হইলেন। নব-আবিষ্কৃত এই গদ্য ভাষায় মুসলমানগণ সহসা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই; ফলে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল তাহাদের লেখনী অচল হইয়া রহিল। সুদীর্ঘ ছয় সাত শত বৎসরকাল যে মুসলমান বাংলা তথা ভারতবর্ষ শাসন করিয়া আসিয়াছে, তাহারা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজ্যচ্যুত হইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে নানাদিক হইতে আক্রমণাত্মক আঘাত-সংঘাতে মুসলিম সমাজ জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল; ফলে সমাজের ভিত্তিমূল অনেকখানি শিথিল হইয়া পড়িল। সমগ্র মুসলিম সমাজের যখন এমন একটা দুর্দিন ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তখন সমাজদেহে চেতনাসঞ্চারের নিমিত্ত যাহারা নিজেদিগের সমগ্র শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ), পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীন মাসহাদী, মুন্সী রিয়াজ উদ্দীন, মুন্সী মেহেরুল্লা, শেখ আবদুর

বাংলা গদ্যসাহিত্য রচনায় মুসলিম সাহিত্যিকগণ

রহিম, ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রভৃতি কবি সাহিত্যিকগণ সমধিক খ্যাত। ইঁহারা জাতীয় অধঃপতনের যুগে ধর্মীয় বোধে অনুপ্রাণিত হইয়া যেভাবে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। তাঁহারাই সে সময়ে জ্ঞানের দীপবর্তিকা হাতে করিয়া পথভ্রান্ত জাতিকে মুক্তিপথের সংকেত দিয়াছেন। মীর সাহেবের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। কি প্রবন্ধ, কি উপন্যাস, কি নাটক, কি জীবনচরিত, কি রসরচনা—যেদিক দিয়াই ধরা যাক্ না কেন, মীর সাহেবের তুলনা নাই। তিনি 'বিষাদ-সিন্ধু, 'রত্নাবতী' 'বসন্তকুমারী' 'জমিদার-দর্পণ' প্রভৃতি নাটক-উপন্যাস রচনা করেন। 'বিষাদ-সিন্ধু' কারবালার এমাম হোসেনের (রাঃ) শাহাদাৎ-প্রাপ্তির বিষাদময় ঘটনা লইয়া বিরচিত। ইহা বাংলা দেশের ঘরে ঘরে এখন পর্যন্ত সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। পণ্ডিত রিয়াজ উদ্দীনের 'সমাজ-সংস্কারক' গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ চিন্তানায়ক জামাল উদ্দিন আফগানীর জীবনকাহিনী লইয়া বিরচিত। এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত বিপ্লবী ভাবধারা তৎকালীন মুসলমান সমাজজীবনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা ছাড়া, 'সিরিয়া-বিজয়' এবং 'অগ্নিকুক্কুট' তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ। 'অগ্নিকুক্কুট' ব্যঙ্গ পুস্তিকা। আবার তিনি "মিহির ও সুধাকর" নামে একখানি সংবাদপত্রও বাহির করিয়াছিলেন। মুন্সী মেহেরউল্লা ছিলেন শক্তিশালী লেখক। তিনি 'রদ্দে খৃষ্টানী বা খ্রীষ্টানী ধোঁকা ভঞ্জন' 'বিধবা-গঞ্জনা' প্রভৃতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রায় শতাধিক পুস্তক রচনা করিয়া দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শেখ আবদুর রহিম সাহেবের রচিত গ্রন্থ 'হজরত মোহাম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি'। সম্ভবতঃ মুসলমান লিখিত ইহাই হজরতের জীবনীমূলক সর্বপ্রথম গ্রন্থ। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী রচিত 'অনলপ্রবাহ' তৎকালে তরুণ মুসলমানদিগের প্রাণে অনলশিখা জ্বালাইয়া তাহাদিগের প্রাণে চেতনা-সঞ্চার করিয়াছিল। Revivalist চিন্তাপদ্ধতি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার সব রচনায়। অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিখ্যাত 'উচ্ছ্বাস', 'উদ্বোধন', 'নব উদ্দীপনা', 'প্রেমাঞ্জলী', 'স্পেনবিজয় কাব্য', 'রায়নন্দিনী', 'তারাবাঈ', 'ফিরোজাবেগম', 'নূরুদ্দিন', 'তুরস্কভ্রমণ', 'তুর্কীনারী জীবন', 'স্পেনীয় মুসলিম সভ্যতা' প্রভৃতি। কবির বিখ্যাত কাব্য 'মহাশিক্ষা' অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে। কারবালার বিষাদময় কাহিনী 'মহাশিক্ষা'র উপজীব্য বিষয়।

**বিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্য-সাধনায় মুসলিম কবিসাহিত্যিক**

ইঁহাদের অব্যবহিত পরেই আর একদল সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটিল। ইঁহারা হইলেন—মওলানা আকরম খাঁ, শেখ ফজলুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, মির্জা ইউসুফ আলি, মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, সৈয়দ এমদাদ আলি, মোজাম্মেল হক, ডাঃ সৈয়দ আবুল হোসেন, আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে মওলানা আকরম খাঁ 'মোহম্মদী', এবং চৌধুরী রওশন আলি 'আল্‌ইসলাম' পত্রিকা প্রকাশ

করিয়া বাঙ্গালী মুসলমান জাতির রসপিপাসা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মীর্জা ইউসুক আলির 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' ইমাম গাঞ্জালীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিমিয়ায়ে-সাদতে'র পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুবাদ। মীর্জা সাহেব ইসলামের সৌন্দর্য ও ধর্মীয় রীতি-নীতি বর্ণনার ক্ষেত্রে যে কুশলতা দেখাইয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। ফজলুল করিম সাহেবের 'পরিত্রাণ-কাব্য' সে-যুগে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে উদারপন্থী এক লেখক-সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিল এবং তাঁহাদিগের উদার ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী সমাজের ভিত্তিপত্তনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। এই সাহিত্যিককুলের সমবেত চেষ্টা ও সাধনার ফলে মরণোন্মুখ ও আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্যে জাগরণের একটা ব্যাপক সাড়া পড়িয়া যায়। জাতি পুনরায় নব প্রাণচাঞ্চল্যে অধীর হইয়া উঠিল। ঢাকা ও কলিকাতার বাহিরেও এই নব্যসাহিত্যিক সম্প্রদায়ের নূতন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যিকদের প্রাণে আবেদন জাগাইয়াছিল। মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর) ও মোজাম্মেল হক, বি এ (ভোলা) সাহেবদ্বয় কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা দেখাইলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের রচনার মধ্যে কবিমনের স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যতৃষ্ণা ও কবিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। পণ্ডিত নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' 'হাসান গঙ্গাবাহমনি', মোহাম্মদ কোরবান আলীর 'মানোয়ারা', কাজী আবদুল ওদুদের 'মীর পরিবার' ও 'নদীবক্ষে', হবিবর রহমানের 'আলমগীর', আবুল মনসুর আহম্মদের 'আয়না' 'ফুড কনফারেন্স' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হাবিলদার-কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক চমকপ্রদ ঘটনা। তিনি 'বিদ্রোহী কবি' নামে পরিচিত। কবি উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটক মতবাদ, আচারব্যবহার, রীতিনীতি সর্বত্র এই 'বিদ্রোহী' নামের সারবত্তা প্রদর্শনও করিয়াছেন। মানবাত্মার আকুতি বেদনা, ও বিচিত্র অনুভূতি নানাস্বরে নানাছন্দে গদ্যে-পদ্যে, গানে-কবিতায়, কোমলে-কঠোরে কতভাবেই-না লেখনীমুখে ধ্বনিত হইয়াছে। একদিকে 'অগ্নিবীণা' 'বিষের বাঁশী' 'ভাঙ্গার গান' অগ্নিবৃষ্টি করিয়া মানুষের ভিতরের ক্লেদ অসাম্য ও কুসংস্কারকে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে, অন্য দিকে 'দোলনচাপা' 'ব্যাথার দান' 'বুলবুল' 'চোখের চাতক' গীতিধর্মী রসসর্বস্বতা দ্বারা মানুষের প্রাণে স্নিগ্ধকোমল মোহ বিস্তার করিয়া দিয়াছে। কাব্য ছাড়াও নজরুল গল্প-উপন্যাস-নাটক সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও নিজের লোকোত্তর প্রতিভার স্বাক্ষর দান করিয়াছেন। প্রতি গ্রন্থেই নজরুলের যে মুন্সীয়ানা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই বাংলা সাহিত্যে তাঁহাকে চিরঞ্জীব করিয়া রাখিবে। কাজী এমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ', ইব্রাহীম খানের 'কামালপাশা' 'আনোয়ারপাশা' 'সোনার শিকল', কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' 'শ্মশানভস্ম' 'অশ্রুমালা' 'শিবমন্দির' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি মুসলমান

সমাজের সুখ-দুঃখ লইয়া রচিত। কবি কায়কোবাদ সৌন্দর্যপাগল কবি। 'অশ্রুমালা' ও 'অমিয়ধারা' কাব্যের মধ্যে কবিত্বরস স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত হইয়াছে। 'মহাশ্মশান' কাব্য রচিত হইয়াছে তৃতীয় পানিপথ-যুদ্ধের কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া। মুসলমানদিগের শৌর্য বীর্য ও গরিমাকে ফুটাইয়া তুলিবার বাসনায় তিনি এই বিরাট কাব্যপ্রণয়নে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কবি শাহাদৎ হোসেন ক্লাসিক কবি। তিনি কয়েকখানি কাব্য, নাটক রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি গ্রন্থেই কবির মৌলিকতার ছাপ স্পষ্ট। 'রূপচ্ছন্দা' বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। 'আনারকলি' 'মসনদের মোহ' নাটকগুলির মধ্যে শাহাদৎ হোসেনের গীতিমানসের ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। মুসলমান লেখকবর্গের মধ্যে যাঁহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রথিতযশা হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, ডাঃ অবদুল গফুর সিদ্দিকি' ডাঃ মুহম্মদ এনামুল হক, ডাং মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন সাহিত্যালোচনা ও গবেষণার ভিতর দিয়া সেই সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষায় ইহারা প্রচুর চেষ্টা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্য-সাধনায় মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ

১৯৩৯-৪৫ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের সমাজজীবনে আসিয়া লাগিল রূঢ় বাস্তবতার আঘাত। 'মানুষকে বাস্তবমুখীন করিতে হইবে'—এমনি একটি মতবাদ লেখক ও সাহিত্যিকগোষ্ঠীর মধ্যে সংক্রামিত হইল। ফলে মুসলিম সমাজের সাহিত্যিকগণের চিন্তাধারায় আসিয়া লাগিল বাস্তবতার ঢেউ। বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ ঘটনা গণ-জাগরণ। সাধারণ নরনারীর সুখ-দুঃখ-বেদনার কাহিনী ও ইতিবৃত্ত লইয়া সাহিত্য রচনা করিবার তাগিদ বাঙ্গালী মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হইল। দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতায় ইহাদের সাহিত্য মর্মস্পর্শী। বিভাগ-পূর্ববর্তী কাল হইতেই যাঁহারা কাব্য ও সাহিত্য সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁহাদিগের মধ্যে আবুলফজলের 'রাঙা প্রভাত' 'চৌচির', মাহ্‌বুবুল আলমের 'মোমেনের জবানবন্দী' 'পল্টন জীবনের স্মৃতি', শওকত ওসমানের আমলার মামলা', আবুজাফর সামসুদ্দীনের 'পরিত্যক্ত স্বামী', কাজী আফসার উদ্দীনের 'চরভাঙা চর' প্রভৃতি সমধিক খ্যাত। শওকত ওসমানের 'ফাদার জোয়ান' 'পিঁজরা-পোল, সাবেক' কাহিনী' 'জনুআপা' ও 'বনি আদমের' মধ্যে লেখকের বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। জসীমুদ্দীন পল্লীকবি। তাঁহার কাব্য ও কবিতায় বাউল, গাথা ও পল্লীগীতিকার প্রভাব রহিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সৃষ্টিধর্মী কবি হিসাবে তিনি অতুলনীয়। তিনি বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন পথের পথিকৃৎ। নক্সীকাঁথার মাঠ' 'সোজনবাদিয়ার ঘাট'

'রাখালী' 'ধানক্ষেত' 'মাটির কান্না' 'বালুচর' 'হাসু' জসীমুদ্দীনের স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কবির কাব্য বাংলা দেশের নিরাবরণ ও নিরাভরণ মানুষের কথা ও কাহিনী-দ্বারা সমুজ্জ্বল। গোলাম মোস্তাফা প্রাবন্ধিক ও কবি। 'বিশ্বনবী' তাঁহার একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। আশরাফ-উজ-জামানের 'মঞ্জিল', 'অরণ্যপথ', 'সাগর ও পর্বত' সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। শাহেদ আলির 'ফসল তোলার কাহিনী' 'একই সমতলে', সৈয়দ ওয়ালিউল্লার 'লাল সালু' ও 'নয়নতারা' আবুলকালাম সামসুদ্দীনের 'শাহেরবানু'তে বৈশিষ্ট্যের ছায়া পড়িয়াছে। অতি আধুনিক কবি ও সাহিত্যিকগণের মধ্যে বেশি নাম করিয়াছেন কবি ফররুখ আহমদ ও আহসান হাবীব। আধুনিক কবিতা, হাস্যরসাত্মক কবিতা, গান, ব্যঙ্গকবিতা, সনেট, সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের ফররুখের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার স্বাক্ষর মিলিবে। তিনি ধূলিম্লান পৃথিবীর পৃষ্ঠা হইতে উঠিয়া আসিয়া ধূলির মানুষের কথা বড় মনোরম করিয়া বলিতে পারিয়াছেন। ফররুখের 'সাত সাগরের মাঝি' 'প্রেম-নারী-মানুষ' এবং আহ্‌সান হাবীবের 'রাত্রিশেষ' উল্লেখযোগ্য অবদান। আধুনিক প্রবন্ধকারদিগের মধ্যে সমধিক খ্যাত মোতাহের হোসেন চৌধুরী, মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহ্‌সান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের নাম করা যাইতে পারে। পল্লীগ্রামের লুপ্ত প্রাচীন গাথা ও সংগীত উদ্ধার করিয়া মনসুরউদ্দীন ও জসীমুদ্দীন একটি কাজের মতো কাজ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিভাগে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন এম. আকবর আলি ও আবদুর জব্বার। বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস রচনা করিয়া যশ অর্জন করিলেন আবদুল লতিফ চৌধুরী এবং নাজিরুল ইসলাম সুফীয়ান।

পাকিস্তানের পরিপূর্ণ রূপায়ণের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর মানসলোকে আজ যে অভূতপূর্ব উল্লাসধ্বনি শ্রুত হইতেছে, তাহার প্রতিফলন রহিয়াছে আমাদের প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ-কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের রচনায়। বিভাগোত্তর কালে প্রবীণ লেখকদিগের হাতে জাতীয় জীবনের যে বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়া আজিকার নূতন সাহিত্যব্রতিগণ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। কি উপন্যাস, কি ছোটগল্প, কি প্রবন্ধ, কি সমালোচনা, কি রসরচনা, সর্ববিভাগে আজ বাঙ্গালী তরুণ মুসলমান কবি-সাহিত্যিকবর্গ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে নুরুল মোমেন, আবু ইসহাক, আসকার ইবনে শাইখ, আশরাফ সিদ্দিকী, মুযহারুল ইসলাম, আবদুর রশিদ খান, সর্দার জয়েন উদ্দীন, আলাউদ্দীন আল্‌আজাদ, মুনীর চৌধুরী, মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, তালিম্ হোসেন, ইব্রাহীম খলিল, চোধুরী ওসমান, সামসুর রহমান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁহাদিগের রচনার

বিভাগোত্তর কালে বাংলা-সাহিত্যের সেবায় পূর্ব-পাকিস্তানী কবি-সাহিত্যিকগণ

মধ্যে নবযুগের সমাজচেতনা ও ব্যক্তিচেতনার আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন। আজ যাঁহারা সাহিত্যশিল্প লইয়া নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতেছেন, সাধনার সর্বোচ্চ মিনারে চড়িবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের জয়যাত্রাপথের মঞ্জিল সার্বজনীন সার্বভৌম নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই গুরু দায়িত্ব যদি তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে সমাজের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।*

## পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক প্রবন্ধসাহিত্য

পূর্ব-পাকিস্তানের প্রবন্ধসাহিত্য যে বঙ্গ-বিভাগোত্তর যুগে বেশ খানিকটা উন্নতি করেছে, সাধারণভাবে একথা বলা চলে। দৈনিক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই সাময়িক পত্র-গুলিকে অবলম্বন করেই প্রবন্ধসাহিত্যের উদ্ভব এবং দ্রুতবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। স্বাধীনতালাভের পর পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে' বুদ্ধিজীবিগণের মনে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ে নানা বিতর্কমূলক সমস্যা জন্ম নিয়েছে, এবং বিভিন্ন মতাদর্শের সংঘাতে প্রবন্ধসাহিত্য নানামুখী বিস্তৃতি পেয়েছে। সংক্ষেপে এ সমস্যাগুলির উল্লেখ করা চলে:—পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিচার, ইসলামী জীবনবোধ ও নূতন জগৎ, সাহিত্য সমালোচনার নানা প্রণালী, বাংলা ভাষার জন্ম ও বিকাশের সমস্যা প্রভৃতি।

ভূমিকা

প্রথমেই সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কীয় গবেষকদের চেষ্টার বিচার করা যেতে পারে। সম্প্রতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন ডক্টর শহীদুল্লাহ্। এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ প্রাচীন বাংলা সাহিত্য গবেষণায় সর্বজনস্বীকৃত মনীষা। তাঁর মতে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাচাই-করা সন্তোষ-জনক তথ্যের ভিত্তিতেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পুনর্গঠন অত্যাবশ্যক। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচনা করা অতীব দুরূহ কাজ। নানা কারণে প্রাপ্ত তথ্যাদি সব সময়ে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না, বিশেষতঃ চণ্ডীদাস-সমস্যা, কৃত্তিবাসের জীবৎকাল, বিজয় গুপ্তের অস্তিত্ব এবং লোক-সাহিত্যের সমস্যা এমন কতকগুলি ব্যাসকূট সৃষ্টি করেছে যার সম্যক্ সমাধান প্রায় দুরধিগম্য। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেবের গবেষণা এই সমস্যাগুলির উপরে অন্ততঃ

ভাষা ও সাহিত্য গবেষণায় ডক্টর শহীদুল্লাহ্, নাজিরুল ইসলাম, আবদুল কাদির

* অধ্যাপক জনাব গোলাম সাকলায়েন, এম. এ. মহাশয়ের সৌজন্যে

কিছুটা আলোকপাত করেছে। নাজিরুল ইসলামের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ "বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস" পূর্ব-পাকিস্তানে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বঙ্গভাষার ইতিহাস সম্পর্কে নূতন মতবাদ এ গ্রন্থে উপস্থিত করার চেষ্টা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার বিবর্তনের ফলে প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষার জন্ম, এ তথ্যে তিনি অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও বাক্যবিন্যাস-প্রণালীর উপর দ্রাবিড় ভাষা-সমূহের প্রভাব দেখিয়ে তিনি অন্যতর সিদ্ধান্তের দিকে যেতে চান। তাঁর এ মতবাদের মধ্যে হয়ত অনেকটা সত্য আছে, কিন্তু যথোপযুক্ত ও প্রচুর উদাহরণের সাহায্যে এর মূল প্রত্যয়গুলি এখনও প্রতিষ্ঠিত হবার অপেক্ষা করছে। বাংলা ভাষা ও শব্দবিজ্ঞান নিয়ে আবদুল হাই-এর গবেষণাত্মক রচনাবলীও উল্লেখযোগ্য। তিনি সমস্যাটিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচারের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য আঞ্চলিক ভাষাগুলি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করলেই এ সম্পর্কে কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে, তার পূর্বে নয়। আবদুল কাদির বাংলা সাহিত্যের ছন্দপ্রকরণ এবং তার সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি সমস্যাটিকে আন্তরিকতার সঙ্গে বিচার করেছেন, তবে ভারতীয় ও গ্রীক ক্ল্যাসিকাল ছন্দরীতিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি কাব্যাদির সৌন্দর্য নিয়েও আলোচনা চলেছে। যদিও সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তান এখনও যথেষ্ট পিছিয়ে আছে, তবু কিছু কিছু প্রাবন্ধিক আন্তরিকতার সঙ্গে এই বিষয়ে ভাবছেন। সৈয়দ আলী আহ্‌সান ও মোতাহের হোসেন আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। উভয়েই সৌন্দর্যতত্ত্বের একটি বিশুদ্ধ মাপকাঠির পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য সমালোচনার পক্ষপাতী। সৈয়দ আলী আহ্‌সান নজরুল ও ইকবালের সাহিত্যসৃষ্টির যে সমালোচনা করেছেন তাতে এলিয়ট ও আই. রিচার্ডের আলোচনা-পদ্ধতি বহুল পরিমাণে অনুসৃত হয়েছে। এঁরা উভয়েই প্রাচ্য বিচার-প্রণালীকে পরিহার করে পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার ধারাটি অনুসরণের পক্ষপাতী। কিন্তু জাতীয় ঐতিহ্যবোধ সম্পর্কে এঁদের মধ্যে স্পষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। সৈয়দ আলী আহ্‌সান ঐতিহ্য বলতে পাকিস্তানের ইতিহাস ধর্ম ও জীবনদর্শনের সমষ্টিকে বোঝাতে চান, পক্ষে মোতাহের হোসেন বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা-প্রণালীকেই তার হিসেবে উপস্থিত করতে চান। তরুণ লেখক আশ্‌রাফ সিদ্দিকী উনিশ-শতকের কবি ও নাট্যকারদের প্রতিভার মূল্যবিচারে ব্রতী হয়েছেন। মুসলিম সাহিত্যিকদের সমালোচনার ব্যাপারে তাঁকে একরূপ পথিকৃৎ বলা চলে। ভবিষ্যতে তাঁর বিচার আরও সূক্ষ্ম, আরও সার্থক হয়ে উঠবে, এই প্রতিশ্রুতি তাঁর রচনাবলী নিঃসন্দেহে বহন করে

সৌন্দর্য-বিচারে সৈয়দ আলী আহ্‌সান, মোতাহের হোসেন, আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

*জীবনচরিত ও আত্মচরিত*

স্বাধীনতার পর পূর্ব-পাকিস্তানে কয়েকখানি জীবনচরিত রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে হজরত মোহম্মদের জীবনী সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। অবশ্য বিষয়বস্তুর গৌরবের কথা মনে রাখ্‌লে এই জাতীয় জীবনী-রচনায় সাফল্যলাভ একরূপ অসম্ভব বলা যেতে পারে। ইকবালের দুইখানি এবং নজরুলের একখানি জীবনচরিত এই জাতীয় গ্রন্থের অভাব কিছুটা মিটিয়েছে। এ ছাড়া 'আসহানুউল্লাহ্‌র' আত্মচরিত একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ।

*ইসলাম ও বর্তমান জগতের অবতারণায় ওয়াজিদ উল্লা, আক্রাম খাঁ, গোলাম মুস্তফা*

রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা এবং ইসলামের আদর্শ ও কম্যুনিজম্‌ সম্বন্ধে কিছু কিছু রচনাও আলোচনার যোগ্য। ওয়াজিদ উল্লার 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম' পুস্তকখানির ঐতিহাসিকতা সন্দেহের অতীত নয়। আক্রাম খাঁর ইসলামিক গঠনতন্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদের সমন্বয়ের দিক থেকে মূল্যবান। গোলাম মুস্তফার গদ্যরচনাও এদিক থেকে উল্লেখের দাবি রাখে। সম্প্রতি তাঁর দুইখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। একখানিতে তিনি জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যখানিতে 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোর' আদর্শগুলির বিচার-প্রসঙ্গে ইসলামী জীবনবোধের সঙ্গে তার কতটা সমন্বয় সম্ভব তারও আলোচনা করেছেন।

*দর্শনশাস্ত্রে*

দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পূর্ব-পাকিস্তানে বড় একটা রচিত হয়নি। যাঁরা এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি, তাঁরা উপযুক্ত বাংলা পরিভাষার অভাবে ইংরাজি-ভাষার আশ্রয়ই সাধারণতঃ গ্রহণ করে থাকেন। তরুণ লেখক সৈয়দ সাহাদৎ হোসেন সাধারণের উপযোগী করে' কয়েকজন খ্যাতনামা পাশ্চাত্ত্য ভাববাদী দার্শনিকের চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করে' কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

*নানা-নিবন্ধ রচনায়*

রচনারীতির সৌন্দর্য ও রসাবেদনের দিক থেকে নুরুল মোমেনের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'ঢাকার সামাজিক জীবনের আলো' উচ্চাঙ্গ হাস্যরসে পূর্ণ। জসীমুদ্দীনের ভ্রমণ-কাহিনী 'প্রথম চলো মুসাফির' এ বিষয়ে পথিকৃৎ। এম এ আজম রচিত 'বিশ্বনবীর দেশে' বইখানি সরস ভ্রমণ-কথায় সমৃদ্ধ। রম্য রচনার রীতি এতে পরিলক্ষিত হয়। রচয়িতার আন্তরিক অনুভূতি এই ভ্রমণকথার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নানা ধরণের ঐতিহাসিক সামাজিক রচনার দিক থেকে আবুল কালাম সামসুদ্দীনের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রবন্ধগুলি মতবাদের তীক্ষ্ণতায় ও স্পষ্টতায় সমুজ্জ্বল।

*উপসংহার*

সার্বিক বিচারে তাই ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের ভাষায় বলা যেতে পারে, 'সমালোচনা ও রসাত্মক প্রবন্ধসাহিত্যে পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যসাহিত্য পাওয়া যেতে পারে। ঐতিহাসিক ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত রচনাগুলো যতই তাৎপর্যমূলক হোক না কেন, বর্তমান অবস্থায় [illegible] হিসেবে তাদের মূল্য খুব বেশী বলে গণ্য করা যায় না।'

# একখানি গদ্যকাব্য

[ বিষাদ-সিন্ধু : মীর মোশারফ হোসেন ]

ইংরাজবিজয়ের পরে যখন আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি এদেশে বিস্তৃত হইতেছিল, এদেশীয় মুসলমান-সমাজ তাহাকে নানা কারণে খুব সহজভাবে গ্রহণ করিলেন না।

ভূমিকা

কাজেই কি নূতন ইংরাজি শিক্ষা, কি নূতন সাহিত্যসৃষ্টি—উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহারা আধুনিক যুগের নবতম বিকাশগুলির দিকে পিছন ফিরিয়া রহিলেন। 'দ্বিভাষী পুঁথি-সাহিত্যে'র মধ্যেই তাঁহাদের যাহা-কিছু সাহিত্য-রচনা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। এই অবস্থা হইতে বাঙ্গালী মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের যাঁহারা মুক্তির পথ দেখাইলেন তাঁহাদের মধ্যে কায়কোবাদ ও মীর মোশারফ হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। কায়কোবাদ মধুসূদন-হেমচন্দ্রের পন্থায় কাব্য রচনা করিয়া নবজাগৃতির কাব্যকল্পনার সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলমানদের নাম সংযুক্ত করিলেন এবং মীর মোশারফ হোসেন বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের গদ্যসাহিত্যের সহিত নিজের ঐতিহাসিক এই গদ্যকাব্যটির নামও অমর করিয়া রাখিলেন।

১৮৪৮ সালে নদীয়া জেলায় মীর মোশারফ হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কিছুদিন কুষ্টিয়ার ইংরাজি-বাংলা স্কুল এবং

লেখক-পরিচিতি

পদমদীর 'নবাব-স্কুলে' পড়িতে লাগিলেন। পরে 'কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে' ভর্তি হইলেন। অতঃপর কলিকাতায় এক পিতৃবন্ধুর গৃহে থাকিয়া তিনি পড়াশুনা করেন। চাকরিজীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি বিভিন্ন জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার প্রভৃতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। মীর মোশারফ হোসেন দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা করেন, তিনি ক্ষুদ্র-বৃহৎ পঁচিশখানি পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বিষাদ-সিন্ধু', 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', 'গো-জীবন', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'মোসলেম বীরত্ব', 'হজরত বেলালের জীবনী', 'বিবি কুলসুম' এবং তাঁহার সুবৃহৎ 'আমার জীবনী'র নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে 'বিষাদ-সিন্ধু'ই শ্রেষ্ঠতম। গ্রন্থটি মহাকালের বিচারে উত্তীর্ণ হইয়া একালের সাহিত্য-রসিকদেরও মন জয় করিয়াছে।

'বিষাদ-সিন্ধু' একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ। ইহার কাহিনী-অংশ ঘটনার উত্থান-পতনে ও দ্রুতগতিতে এবং বিরাট্ ব্যাপকতায় পাঠকের ঔৎসুক্য ও কৌতূহল শেষ পর্যন্ত জাগরূক

কাহিনী-পরিচয় ও ঐতিহাসিকতা

রাখে। গ্রন্থটি তিনটি সর্গে বিভক্ত : প্রথম সর্গ মহরুরম-পর্বে এজিদের লোভ ও কামলালসায় এবং ইসলাম-বিরোধী মনোবৃত্তির ফলে কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে হজরত মোহম্মদের দৌহিত্র হাসান বিষপানে এবং হোসেন কারাবালা-প্রান্তরে একবিন্দু জলের অভাবে

নিহত হইলেন, তাহার মর্মস্পর্শী বিবরণ রহিয়াছে। দ্বিতীয় সর্গ উদ্ধার-পর্ব। এই পর্বে হানিফা, কাক্কা প্রমুখ মুসলমান বীরদের জীবনপণ সংগ্রামে কিরূপে এজিদের বন্দীশালা হইতে হাসান-হোসেনের পরিবারবর্গ মুক্তি পাইলেন, তাহার বীরত্বোল্লসিত বর্ণনা রহিয়াছে। তৃতীয় সর্গ এজিদ-বধপর্ব। এই পর্বে গ্রন্থকার হোসেনপুত্র জয়নালের সিংহাসন-প্রাপ্তি; এজিদের অতি-যন্ত্রণাময় পরিণাম, বীরত্বের মোহে আচ্ছন্ন হানিফার পরিণাম বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "হিজরীর ৬১ সালের ৮ই মহর্‌রম তারিখে মদিনাধিপতি হজরত ইমাম হোসেন ঘটনাক্রমে সপরিবারে কারবালা-ভূমিতে উপস্থিত হন এবং এজিদ-প্রেরিত সৈন্যহস্তে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। সেই শোচনীয় ঘটনা মহর্‌রম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই ঘটনার মূল কি এবং কি কারণে সেই ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' বিরচিত হইল।" কাহিনীর মূল ভিত্তি যে ঐতিহাসিক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণের সর্বাংশ ঐতিহাসিক সত্যতামণ্ডিত কিনা এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে প্রশ্ন উঠিয়াছে। ডক্টর আব্দুল গফুর সিদ্দিকী বহু গবেষণার পরে 'বিষাদ-সিন্ধু'র যে পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন, তাহাতে এই প্রশ্নের উত্তরদানের চেষ্টা আছে এবং সমগ্র গ্রন্থটির ঐতিহাসিক ভিত্তিটিকে পাকা করিবার উপযোগী সংশোধনী রহিয়াছে। 'জংনামা' 'মোক্তাল হোসেন' শ্রেণীর সত্যমিথ্যায় রঞ্জিত গ্রন্থাবলীকে ভিত্তি করাতেই বোধ হয় এইরূপ ত্রুটি আলোচ্য গ্রন্থটিতে দেখা গিয়াছে। এই জাতীয় কিছু কিছু ত্রুটির অভিযোগ সত্য বলিয়া গৃহীত হইলেও গ্রন্থটির সামাজিক ও সাহিত্যিক মূল্য আদৌ কমিবে না।

বাংলা ১২৯১ সাল হইতে ১২৯৭ সালের মধ্যে 'বিষাদ-সিন্ধু'র বিভিন্ন অংশ রচিত হয়। বাংলা গদ্যসাহিত্যে তখন বঙ্কিমের একাধিপত্য। কাজেই ভাষায় সংস্কৃত-প্রাধান্য এবং কথ্য-ভাষার সমন্বয়ের স্রোত প্রবাহিত। মীর মোশারফ হোসেনের গ্রন্থটিতেও বঙ্কিমী ভাষার প্রভাব রহিয়াছে।

রচনাকাল ও ভাষা

তবে সংস্কৃতের দিকে ঝোঁকটি কম থাকায় ভাষা যে খুবই সহজবোধ্য হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মাঝে মাঝে কিছু আরবী ফার্সী শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে, তবে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুপ্রযুক্ত। তাই ইহার ফলে কাহিনী যে দেশীয় পরিবেশে ঘটিয়াছিল, তাহার একটি ভাষাগত ব্যঞ্জনাও মাঝে মাঝে বিস্তৃত হইয়াছে। উনিশ শতকের সপ্তম অষ্টম দশক পর্যন্ত বাংলা দেশে আরব পারস্য সম্পর্কিত ইতিহাসের এমন সমৃদ্ধ গবেষণা হয় নাই যাহাতে ঐতিহাসিক কিছু কিছু ত্রুটি দেখাইয়া মীর সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারি।

বাঙালী মুসলমান-সমাজ অন্যান্য মুসলমানদের মত মহররমের ঘটনাটিকে তাহাদের ধর্মজীবনের একটি কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পটভূমিকায় যে করুণ কাহিনীটি বিদ্যমান, আলোচ্য গ্রন্থটি তাহা সহজ সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছে। উপরন্তু এই সব কাহিনীর মাধ্যমে কি বিপুল বিরোধ ও বাধার মধ্য দিয়া ইসলামধর্মের প্রথম যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার রক্তস্রাত ও বিশ্বাসোজ্জ্বল একটি চিত্রও সমগ্র মুসলমান-সমাজের গর্বের বস্তু হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও ইহার তাৎপর্যটি সহজে উপলব্ধি করিবেন। যে কোন সত্যধর্ম ও বিশ্বাসকেই অবিশ্বাস ও অজ্ঞানের প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া অশেষ ত্যাগের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়। যে কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের কাছেই মহররমের এই শিক্ষা।

ধর্মকাহিনী ও সাংস্কৃতিক মূল্য

কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবলমাত্র সাহিত্য হিসাবেই আলোচ্য গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। গ্রন্থটির মধ্যে মহাকাব্যসুলভ এক বিরাট্ ব্যাপ্তি ও পর্বতকল্প সমুন্নতি রহিয়াছে। চরিত্রসৃষ্টিতে কিংবা কাহিনীর ক্ষেত্রে লেখক নূতনতর কোন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেন নাই। কারণ, সে সুযোগ তাঁহার ছিল না। বর্ণনার মধ্যে বিশেষ কৌশল, চেষ্টাকৃত সৌন্দর্য আরোপের কোন চিহ্নই গ্রন্থটির মধ্যে নাই। কিন্তু তবু সহজ সরল বর্ণনার মধ্য দিয়াই জীবন-মৃত্যু আশা-আনন্দ বিশ্বাস-বীরত্বের যে মূর্তি তিনি আঁকিয়াছেন, তাহা আপন প্রাণবত্তাতেই ভাস্বর। মসহাব কাক্কা ও ওমর আলীর বীরত্ব, হোসেনের দার্শনিক জীবনপ্রতীতি ও মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব, হাসানের অপরিসীম ধৈর্য, সাখিনার আত্মদান, এজিদের হিংস্র ক্রোধ, সীমারের পৈশাচিকতা, সিংহশিশু জয়নালের ক্রুদ্ধ গর্জন আর পর্বতবেষ্টিত হানিফার প্রচণ্ড ক্ষমতার আত্মধ্বংসী রূপ জীবন সম্পর্কে এক নূতন চেতনায় আমাদের চিত্তকে সমুন্নীত করে। ফোরাত নদীর কূল এজিদ-সৈন্যেরা আটকাইয়া রাখে, জলের পিপাসা শত্রুর তীরের মুখে চিরতরে মিটিয়া যায়, পুত্র পিতার জিহ্বা লেহন করিয়া শক্তি অর্জনের চেষ্টা করে আর এমাম হোসেন অঞ্জলিপূর্ণ জল মুখের কাছে ধরিয়াও স্পর্শ করিতে পারেন না—এই তো জীবন! দূর হইতে অগ্নিদাহের প্রচণ্ড জ্বালায় এজিদের চীৎকার ভাসিয়া আসে, হানিফার দুল্‌দুল্ প্রাচীরের চারিপার্শ্বে পদচারণা করে, কারবালার বালুকারাশি তৃষ্ণায় মুখর হইয়া উঠে। আকাশ-বাতাস ধ্বনিত করিয়া একটি রবই ওঠে—'হায় হাসান। হায় হোসেন!' এই বেদনা, এই জীবনবোধ, এই চরিত্রগৌরব যে কোন সাহিত্যরসিকেরই দৃষ্টি এই অমর গ্রন্থের দিকে অবশ্যই আকর্ষণ করিবে।

সাহিত্য-মূল্য

# আসামের অধিবাসী ও ধর্ম

সমগ্র মানবগোষ্ঠীর তথ্য, পূর্বপুরুষদের পরিচয়বৃত্তান্ত এবং তাহাদের ইতিহাস অনুধাবনে ইউনেস্কো ( UNESCO ) যেমন উৎসুক, তেমনি আসামের উন্নত ও অনুন্নত সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের কাছারী, রাভা, মীরি, লালুঙ, গারো, কোকি, নাগা প্রভৃতি উপজাতির বা কালিটা ও অহোম সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা ও ধর্ম, তাহাদের দলীয় অভ্যুত্থান, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বসতিস্থাপন ইত্যাদি অবগত হইবার বাসনা যুগোচিত সংগতিবোধেরই পরিচায়ক। সংখ্যাহীন জাতি-উপজাতিধন্য এই আসাম। প্রত্যেক জাতি বা উপজাতির কৃষ্টি ও আচার-ব্যবহার অপর জাতি বা উপজাতির কৃষ্টি ও আচার-ব্যবহারের অনুরূপ নয়। তাহাদের এই বিভিন্নতার একমাত্র কারণ তাহারা একই গোষ্ঠী বা একই শাখার মানুষ নয়। ইহাদের কেহ মঙ্গোলীয়ান, কেহ-বা ককেশীয় আবার কেহ-বা অনার্য।

ভূমিকা

আসামের বর্তমান অধিবাসীদের আদি পুরুষ কাহারা, এ বিষয়ে মনীষীদের ভ্রান্তিহীন কোন বর্ণনা বা গ্রন্থপঞ্জি হইতে এ যাবৎ সঠিক বিবরণ পাওয়া যায়নি। তবে মোটামুটি বলা যায়, মুখ্যতঃ অষ্ট্রো-এশিয়ান, দ্রাবিড়, তিব্বত-বর্মী, মঙ্গোলীয় ও আর্য সম্প্রদায়েরই বংশপরম্পরা আজিকার সংঘবদ্ধ আসামী সম্প্রদায়। ডক্টর কাকতির মতে, অষ্ট্রো-এশিয়ানরাই সর্বাগ্রে এদেশের পাহাড়ী মাটিতে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং তাহারা ক্রমে মিলিত হইয়া এদেশের প্রতিবসতির প্রথম ইতিহাস রচনা করে। এই অষ্ট্রো-এশিয়ান সম্প্রদায়েরই অংশ খাসি-জয়ন্তিয়ারা সব সময় চাষবাস, খেলাধূলা, নাচগান ইত্যাদি স্বপ্নাবেশেই বিভোর হইয়া থাকিত। তাই ইহারা ইতিহাসের কৌতুকজনক উপাদান।

বিভিন্ন মতামত

'অহোম' সম্প্রদায় এদেশে আসে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। ইহারাই এ-দেশের গতানুগতিক ইতিহাসে সৃষ্টি করিল এক অভিনব অধ্যায়। রচনা করিল নবীন জীবনযাত্রা। এই অহোম জাতি ও ভারত-চীনা পরিবারের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে অহোমরা সহসা অধিকার করে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও উচ্চতর আসাম। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহারা সমস্ত কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্মে দীক্ষা লয়। অহোমদের ইতিহাসে অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি ছিল। স্মরণীয় পুঁথিপত্র এবং ঐতিহাসিক বিবৃতি ইত্যাদি সঞ্চয় করিবার প্রতি তাহাদের অগাধ অনুরাগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এখনও অনেক গুরুত্বপূর্ণ গাছের-বাকলে-লেখা-পাণ্ডুলিপি অহোমদের গৃহে পাওয়া যায়। 'বুরঞ্জি' ( Buranji ) এই ধরণের একপ্রকার পাণ্ডুলিপি যাহা কৃতিত্বের দাবি রাখে। অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমারের মতে, তাহারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ও রচনাশৈলীতে উজ্জ্বল।......অহোমরা 'সোমদেও'র পূজারী ছিল।

অহোম

অন্যান্য দেবদেবীর প্রতি তাহাদের বড় একটা শ্রদ্ধাদৃষ্টি ছিল না। যোদ্ধা জাত অহোম। তাহাদের শক্ত ও সমর্থ পেশীবহুল শরীর যুদ্ধেরই উপযোগী। তাহারা আবার গৃহ-নির্মাণেও অভ্যস্ত। শিবসাগরের তীরের 'জয়-ডোল' 'শিব-ডোল' 'বিষ্ণু-ডোল' নামের তিনটি পূজার মন্দির তাহাদেরই নির্মিত।

পাহাড়ময় দেশ এই আসাম। নৈসর্গিক রমণীয়তা দিয়া আবৃত ইহার দেহ। নীলে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে পাহাড়গুলি। ছোটবড় মাঝারি কত প্রকৃতির পাহাড়রাজি। এই বিভিন্ন পাহাড়ে বিভিন্ন পাহাড়িয়া আসামী জাতির বাস।

নাগা

ব্রহ্ম ও আসাম-সীমান্তে অবস্থিত 'পাত্‌কই' অঞ্চলে নাগাদের বসতি। তিব্বত-ব্রহ্মীয় গোষ্ঠীর উত্তরসূরী এই পার্বত্য জাতিকে হেন্‌রী বেল্‌ফোর্ 'unrisen race' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের কায়দা-কানুন, শিক্ষা. সভ্যতা প্রাচীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের অনুরূপ। গতিশীল শক্তির অভ্যুদয় না হওয়ার ফলে আজও নাগারা অশিক্ষা ও অসভ্যতার তিমিরে। অথচ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশ্বের দরবারে গতিশীল সমৃদ্ধ বলিয়া সুবিদিত। নাগারা যুগ যুগ ধরিয়া শিকারী জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহাদের দলীয় ও ঐক্যবদ্ধ জীবনেরও মাঝে মাঝে ঘাত-প্রতিঘাত আনে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ। ব্রিটিশ রাজত্বে ভেদনীতি প্রবল আকার ধারণ করে। তবে শেষ পর্যন্ত তাহাদের জীবনে শান্তি শৃঙ্খলাবোধ আবার ফিরিয়া আসে। 'নাগা' কথাটির অর্থবিচারে পণ্ডিতেরা বিভিন্ন মতাবলম্বী—কেহ কেহ বলেন, 'নাগা' কথাটির অভিধানগত অর্থ হইতেছে 'পাহাড়িয়া মানুষ'—'নগে' বাস করে যে আবার ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে—হোলকম্ব ও পীল সাহেবের মতানুসারে, 'লোক'। সাধারণতঃ যখন বিভিন্ন বংশের নাগা সমতল ভূমিতে মিলিত হয়, তখন একে অপরকে শুধায়, 'অ নোক এ'—'তুমি কোন্ দলের লোক?' আবার 'নাগা নগ্ন মানুষদেরই প্রতীক'—ইহাও বলেন কেহ কেহ। ফিউরার—হেইমেনডরফ সর্বজাতীয় অর্থের সমন্বয় করিয়া বলিয়াছেন,—'Nagas not only live in the hills but cover their magnificiently modbelled bodies as little as any sculptor could wish'.

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রচলিত নাগা-অঞ্চলের এক গৌরবময় শাসনব্যবস্থা নাগাদের জাগ্রৎ জাতীয় জীবনবোধেরই পরিচয় বহন করে। সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃস্থানীয় ও নির্বাচিত সদস্য দ্বারা গঠিত 'তাতার' নামক একটি পরিষদই গণতান্ত্রিক গ্রামগুলি শাসন করে। এই পরিষদের যে কোন বৈঠকে যে কোন নাগরিক যোগ দিতে পারে, এমন কি আলোচনাতেও অংশ গ্রহণ করিতে পারে। পরিষদের বৈঠকে তাহাদের মতামতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা

নাগাদের শাসনব্যবস্থা

হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর বর্তমান সদস্যদের পদত্যাগ করিতে হয় এবং পুনর্নির্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। যে কোন পরিবার একটি করিয়া সদস্য নির্বাচন করিতে পারে এই সংসদের জন্য। গ্রাম্য সমস্ত দ্বন্দ্ব ও কলহের নিরসন করিয়া গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত হয় প্রতিষ্ঠানগুলি। সীমান্ত-কিনারার যুদ্ধপ্রিয় কণ্যক-নাগারা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটি রঙিন চিত্র। অনেকে মনে করেন, তাহারাই প্রথম আসামে আসে। অঙ্গমীরাও রণপিপাসু। তাহারা চিরকালই যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া পাশবিকতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত করিত। অহোম-রাজার আবির্ভাবের আগে আর কেহই ইহাদিগকে দমন করিতে সক্ষম হন নাই। এই কারণে নাগাদের সব সময় সেনাবিভাগে নিয়োগ করা হইত। ব্রিটিশ সরকার বারো বার অভিযান চালাইয়া নাগাপাহাড়ের এক অংশ ১৮৭৮ সালে স্বাধিকারে আনে। ফলে ক্রমশঃ অনেক নাগাকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা লইতে হয়। নাগারা এখনও কম উৎপাত করে না। একশ্রেণীর নাগারা স্বাধীন বাসভূমির জন্য ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত; ইহা প্রকৃতই উদ্বেগপূর্ণ। কত উপায় উদ্ভাবিত হইল এই বিদ্রোহদমনের উদ্দেশ্যে। ফলে হইল না কিছুই। তবু একথা স্বীকার্য যে, নাগারা কিঞ্চিৎ ভদ্র ও মার্জিত হইয়া অহোম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করিবার জন্য সমতল ভূমিতে নামে। নিজেদের পণ্য বাজারে বিকাইয়া, কিনিয়া লইয়া যায় নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

গাড়ো ও দাফ্‌লা; লুসাই ও কোকি

পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করিয়া তিব্বত-ব্রহ্ম বংশীয় গাড়ো ও দাফ্‌লা সম্প্রদায়ের লোকেরা সমতলে আসে অহোমদের সঙ্গে ভাব জমাইতে এবং উহাদের জীবনযাত্রা অনুকরণ করিতে। তাহাদের সকলেই চাষবাস-দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। তবে দৈনন্দিন জীবন কাছারীদের মতোই। খ্রীষ্টানধর্মের প্রতি আগ্রহও ইহাদের খুব বেশি। ১৭৫০—১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশ হইতে আসে লুসাই সম্প্রদায়। তাহারা শিল্পকার্যে দক্ষ খুবই। পঞ্চায়েতী শাসনপ্রথা প্রবর্তনের সুবিধার্থে তাহারা সমস্ত লুসাই-অঞ্চলকে ৩০০ অংশে ভাগ করিয়া লইয়াছে। গ্রামাধিপের পদ উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত হয়। কোকিদিগের অনেকেও এই শাসন-পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সামন্তরাজাদের মত গ্রামাধিপের নিজস্ব জমি থাকে। তাহার 'উপ' নামে সদস্য মনোনীত একটি প্রবীণদের সংসদ থাকে যাহার নিকট হইতে তাহাকে পরামর্শ লইতে হয়। ভারত সংবিধানের ষষ্ঠ-বিভাগে বর্ণিত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এই পার্বত্য উপজাতিদের উন্নতির সাহায্যকারী। লুসাইদের প্রায় সকলেই খ্রীষ্টান। ১৮৯৮ সালে পূর্ববিভক্ত লুসাই-পর্বতকে পুনরায় সংযুক্ত করিয়া ব্রিটিশ সরকার আসাম সরকারের উপর তাহার শাসনভার অর্পণ করে।

মিরিরা সমতল ও পার্বত্যভূমি উভয়েতেই বসবাসে অভ্যস্ত। তিব্বত-ব্রহ্মীসম্ভূত

হইলেও 'ডাফলাসদের' অনুরূপ নয়। মঙ্গোলিয়ানদের মত তাহাদের দেহ দীঘল, অঙ্গসমূহ সুষ্ঠু। আহোম-রাজাদের অধীনে সেনা-বিভাগে চাকরি করিয়া তাহাদের অনেকে প্রশংসাভাজন হইয়াছে। 'অবর' জাতি হিমালয়ের পাদদেশেই বাস করে। 'অবর' কথাটার অর্থ 'অনার্য—বর্বর'। তাহাদের আলাপ-আলোচনা মিরি-পাহাড়ীদের মত। বিক্ষিপ্ত ভাবে এখানে-সেখানে অবস্থান করে। তাহারা গ্রামভিত্তিকে গণতান্ত্রিক উপায়ে 'কেবাং' নামে একটি পরিষদ্ নির্মাণ করিয়া তৎকর্তৃক নিয়োজিত একদল লোকের দ্বারা দেশ শাসন করায়। কেবাং-কৃত সিদ্ধান্তের প্রতি জনসাধারণ যদি বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, তাহা হইলে জনসাধারণের অধিকাংশের মতামতের উপর বিষয়টি ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সদস্যদের সকলে পুনরায় একমত না হওয়া পর্যন্ত কোন বিলই অনুমোদিত হয় না। অবরদের মত উত্তরপূর্ব সীমান্তের অধিবাসী মিসিমিরা। গোরুমহিষ পালন ও দুধে জীবনধারণই তাহাদের প্রাত্যহিক কর্মসূচী। যাহার যত গোরুমহিষ ও স্ত্রী আছে, সমাজে সে-ই তত ধনী। টেজু পাহাড় মিসিমিদের প্রাণকেন্দ্র। আগেকার রাজধানী 'সাধিয়া' ১৯৫০ সালের ভূমিকম্প ও বন্যায় ধ্বসিয়া যায়। মঙ্গোলীয়ান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 'খামাটি' ব্রহ্মপুত্রের তীরে থাকে। ব্রহ্ম-রাজার উৎপীড়নে তাহার 'ইরাওয়াডি' হইতে এখানে উদ্বাস্তু হইয়া আসিতে বাধ্য হয় কয়েক শতাব্দী আগে। সিংপোরাও ক্রমশঃ হুকওয়াং উপত্যকা অতিক্রম করিয়া পাটকই-পথে আসামে প্রবেশ করে। সিংপো'র প্রতিশব্দ 'মানুষ'। কারেন ও অবরদের কথার সঙ্গে তাহাদের কথা হুবহু মিলিয়া যায়। সিংপোরা লোহার ব্যবহার জানে। নিজেরা সংসারের চাহিদা-মত সমস্ত কাপড় বুনে। নওগাঁকে স্বতন্ত্র পার্বত্য জিলা হিসাবে পরিগণিত করা হইয়াছে ভারত-সংবিধানের ষষ্ঠ বিভাগে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এখানে বাস করে। তাহারা বোদো ও নাগাদের মাঝামাঝি ধরণের ভাষায় কথা বলে।

অন্যান্য জাতি

বিচিত্র দেশ এই আসাম। সমস্ত জাতি-উপজাতির মিলনকেন্দ্র এই দেশ এবং প্রত্যেকেই যেন অপরের সাথে একই সূত্রে আবদ্ধ। তাই উহাদের এক জাতি বলিয়া ভ্রম হয় মাঝে মাঝে। ডক্টর হাটন বলেন যে, উহারা প্রত্যেকেই ইন্দোচীন পরিবারের মানুষ। অতএব, উহাদের এক-জাতি বলিতে আপত্তিকর কিছুই নাই। আসাম-প্রসঙ্গে বলিতে গিয়া একবার নেহরু বলিয়াছিলেন,—'নিঃসন্দেহে বলিতে পারি উপজাতীয় লোকদের ঐতিহ্য কৃষ্টি সংস্কৃতি নৃত্য ও সংগীত কোনদিন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে না।' নেহরুর একথা বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নয়। পর্বতের শ্বাপদসংকুল পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া, সেই হিংস্র মানুষগুলি শিকারকার্য সম্পন্ন করিয়া, ভ্রাতৃবিদ্বেষ রেষারেষি ইত্যাদি করিয়াও পরম পরিতৃপ্তি

বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐক্যময় আসাম

াইতে চায় লোকনৃত্যে ও লোকসংগীতে। আঞ্চলিকতার প্রতি উহাদের মোহ স্বাভাবিক। কিন্তু ঐটাই উহাদের জীবনযাত্রার শেষ অধ্যায় নয়। কর্মজীবনে উহারা হজে পূর্ণচ্ছেদ টানে না। কারণ,—উহাদের জীবনের বিরাট্ এক অংশ বরাদ্দ থাকে র্মচর্চা ও উপাসনার জন্য।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণান বলিয়াছেন, হিন্দুধর্মের মত এত উদার আর কোন ধর্ম নাই। অনার্য দেবদেবী-অর্চনা প্রচলিত ও প্রাচীন মনোভাব-বাহিত এই ধর্মে আসাম ও দক্ষিণ-ভারতের প্রতিটি লোকের তাই দীক্ষা লওয়া অতি সহজ ছিল। আসামীরা শক্তিপূজার উপাসক। তাহারা র্বান্তঃকরণে তান্ত্রিক। 'ভোগী' পূজা পুরাকালে আসাম-অঞ্চলে অতি প্রচলিত ছিল। এই পূজায় বিজিতদের কখনও-বা দেবীর পায়ের নিকট লইয়া শৃঙ্খল উন্মুক্ত করিয়া ইচ্ছামত ভোগ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইত, আবার কখনও-বা আত্মোৎসর্গ করানোই ছিল ঐ পূজার অঙ্গ। কালিকা-পুরাণে এই ধরণের অনেক দৃষ্টান্ত উল্লিখিত রহিয়াছে। ধর্মীয় উৎসবে যাদুর স্থান ছিল সম্মানজনক। প্রকৃতিকে যাহারা অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসাবে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিত, তাহাদের পক্ষে যাদুবিদ্যায় গভীর আস্থা রাখা মোটেই অনুচিত বা আশ্চর্যজনক নয়। 'আইন-ই-আকবরী'তে এধরণের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। তবে দেবত্বপ্রাপ্তির জন্য সন্তানসম্ভবা জননীর পেট কাটিয়া সন্তান পরীক্ষা করা কোন সভ্য জাতির পক্ষে সুশোভন বলিয়া পরিগণিত হয় না। শক্তিধর্মের কলুষিত আচার-প্রথা হইতেই এই সব কদর্য মানসিকতার উদ্ভব হইয়াছে।

শাক্তধর্ম

ভারত হইতে আসামের পথে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় ব্রহ্মদেশে। সুতরাং আসামবাসীর কিছু অংশ প্রাথমিক অবস্থায় বৌদ্ধধর্মে প্রভাবান্বিত হয়। অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, বৌদ্ধধর্ম ক্ষীণপ্রাণ হইয়াই এদেশে আপন মাহাত্ম্য প্রচারে ব্যাপৃত। ফলে বুদ্ধের আসল স্বরূপটি তাহাদের কাছে অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। 'হাজো'র মাধব' প্রাচীনকালে বৌদ্ধমন্দির ছিল বলিয়া কথিত আছে। পরবর্তী কালে হিন্দুধর্মের ক্রমাভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম

তবে শংকরদেবের ভক্তিমার্গ যে আসামীদের জ্ঞানমার্গের রূপান্তর ঘটায়, ইহা অসংকোচে বলা যাইতে পারে; প্রার্থনা ও আত্মত্যাগেই আসে চিত্তশুদ্ধি। বিষ্ণুই সেই শুদ্ধির প্রতীক—এই আদর্শ প্রচারে সহযোগিতা করিলেন রাজা নারায়ণ। ক্রমেই বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাই ষোড়শ শতাব্দীকে আসামের ধর্মীয় ও কৃষ্টীয় নবজাগরণের যুগ রূপে প্রকৃতই অভিহিত করা চলে।

বৈষ্ণবধর্ম

তারপর দিন অতিক্রান্ত হইতে থাকে। আর অতিক্রান্ত হইতে থাকে ঘনকালো

মেষ। মুক্তি ছাড়া আত্মার কাম্য কিছু নাই। বাহিরে উৎসবের সমারোহ অথচ অন্তর শ্রদ্ধাভক্তি-বিবর্জিত—ইহা, শ্রীকৃষ্ণের ভাষায়, মিথ্যাচার। ভক্তি ধর্মীয় জীবনের মূলনীতি।

গোঁসাই বা সত্রাধিকার; মহাপুরুষিয়া

সমাজের ধর্মীয় পুরোহিত 'গোঁসাই' বা 'সত্রাধিকার' আসামীদের সংস্কারপূর্ণ ও আচারবহুল জীবনে গোঁসাইদে স্থান অত্যুচ্চে। 'সত্র' ছিল যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্রাদি শিখিবা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের শিষ্যদের নাম ছিল 'কেয়োলিয়া'। তাহারা বৌদ্ধভিক্ষু দেরই মত। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে শংকরদেব প্রচারিত ধর্মের নাম 'মহাপুরুষিয়া' এই ধর্ম অনুযায়ী গাথা, কীর্তন, শ্লোকোচ্চারণ ইত্যাদি দিয়া অধিবাসীরা 'অর্চনা' সমাঃ করে। কৃষ্ণ আর বিষ্ণুই আজ আসামীদের একমাত্র দেবতা।

শক্তির উপাসকদের সংখ্যা এখনও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। এখানকার নীলাচ পর্বতের কামাখ্যা-কালীর মন্দিরে এখনও শাক্তেরা আসিয়া ভিড় জমায় তিথি তিথিতে। যোনিপূজা এখানকার অপর এক বৈশিষ্ট্য

আসামীদের ধর্ম ও তীর্থস্থানাদি

আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের 'তমরেশ্বরী দেবী' এ কামাখ্যারই আর একটি অংশ। 'কেছইখাতি'র (মীনখাদিকা) মন্দির বলিয়া উ খ্যাত। পার্বত্য উপজাতিদের একমাত্র তীর্থস্থান এই মন্দির। হিউয়েনৎসাঙ্গ ও অন্যা পরিব্রাজকদের মতে, ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দেও এখানে প্রচুর শিবমন্দির ছিল। তারপর ১৭২ সালে অহোম-রাজ শিব-ডোল নামে একটি নূতন শিবমন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন।

মুসলমান ধর্মাবলম্বী অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। তথাপি মোটামুটি ভাবে বৌ খ্রীষ্টান, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মই এখানকার অধিবাসীদের ধর্ম। খ্রীষ্টানধর্মের লোকেরা সংখ্যায় অতি অল্প। ক্যাথলিক মিশনের অক্লান্ত চেষ্ট

মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার

ফলেও এই দেশের মাত্র ৬৯,১৪৮ জন অধিবাসী খ্রীষ্টা সুতরাং অবুঝ অসভ্য পাহাড়িয়া জাতিদের খ্রীষ্টান করিবার আশা অন্ধকারে। তথা একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, মার্কিন ব্যাপ্টিষ্ট মিশন পাহাড়িয়া জাতিদের উন্নত করিব আন্তরিক চেষ্টা করে। তবে এখানে আরও অনেক ব্যাপ্টিষ্ট মিশন অবস্থান কর তাহারা ব্যর্থ হয়। তাহা ছাড়া আসামী জনগণ আপন কৃষ্টি সংস্কৃতি নৃত্য ও সংগী শিল্পকে বর্জন করিয়া অভিনব বিলাতী ছিমছাম কায়দার কাছে আপন সত্তাকে উৎ করাটাকে বরদাস্ত করিতে পারে নাই। তাই খ্রীষ্টধর্মের বহুল প্রচার সার্থকও হয় না।

প্রাচীনতায় অগ্রণী ঐতিহ্যে সমৃদ্ধিশালী, শিল্পে লালিত্যে পারদর্শী আসাম অজ্ঞানত সমাচ্ছন্ন। ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় যে, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা এদেশের জনগণের তিলমাত্র উন্নতি দেখিতেছি ন

উপসংহার

উপজাতিদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা, তাহাদের শি ব্যবস্থা করা—নূতন জীবনের ঐ পথ দেখাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে অচিরে শিক্ষা জাতীয় জীবনের দর্পণ। তাই সরকারের প্রধানতম কর্তব্য, এই ভাষাহীন মানুষগুলিকে নবশিক্ষায় বাঙ্ময় করিয়া তোলা।

# আসামের নাগরিক ও গ্রাম্যজীবন

গ্রামপ্রধান আসাম। কৃষিই এখানকার অধিবাসীদের একমাত্র উপজীবিকা। ১৯৫১ সালের একটি পরিসংখ্যানে প্রকাশিত হয় যে, এখানকার অধিবাসীদের শতকরা ৭৪ ভাগ চাষবাস ক'রে জীবিকানির্বাহ করে। অতএব, কৃষিপ্রধান রাজ্যসমূহের মধ্যে বিহারের পরই আসামের স্থান।

ভূমিকা

স্পষ্টতঃ আসামীদের সামাজিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনেকটা কৃষির উপর নির্ভরশীল। চা-শিল্পই এখানকার অর্থনীতির একমাত্র ভিত্তি। তাছাড়া ডিগবয়ের তেলখনি ও দু'চারটা কয়লার-খনি ছাড়া আসামে নতুন কোন শিল্প গড়ে'-ওঠার মত সম্ভাবনা আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না। আসামের মাটি যদিও কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, তথাপি আজ অবধি এখানে কোন শিল্পনগরী গড়ে ওঠেনি। মুষ্টিমেয় ক'টি নগরীই গড়ে উঠতে পেরেছে আসামে, যেখানে শুধু কয়েকজন সরকারী চাকুরে ছাড়া আর কারো থাকার অবকাশ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি গণনায় বলা হয়েছিল যে, ব্রহ্মপুত্র নদীর স্রোত পাঁচ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-উৎপাদনে সক্ষম। এই একমাত্র পরিকল্পনা দ্বারা আসামে শিল্পের প্রভূত উন্নতি সম্ভব। অথচ এই দিকে সরকারের অবহেলাও লক্ষণীয়।

'ডিষ্ট্রিক্ট হেড্ কোয়ার্টার' প্রস্তুত করার জন্যে এখানকার একটি শহরও গড়ে' ওঠেনি। এখানকার শহরগুলি মুখ্যতঃ শাসনকার্যের সুবিধার জন্যে তৈরি করা হয়েছে। কয়েকটা ইস্কুল-কলেজ, একটি আদালত, একটি কারাগার একটি প্রধান ফাঁড়ি ও একটি সেনাবাহিনী নিয়ে আসামের এই ক্ষুদে শহরগুলি। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক বাস করে শহরাঞ্চলে। শহুরে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ লোক ছাড়া অন্যান্য সকলে গ্রামেই থাকে। কারণ, জীবিকার উপায় শহরে নেই —যেহেতু দেশটি শিল্পে অনুন্নত। কৃষিই একমাত্র জীবিকাসংস্থানের অবলম্বন, আর কৃষির জন্যে প্রশস্ত ভূমি গ্রাম। সুতরাং আসামবাসীদের জীবন প্রধানতঃ গ্রাম্য।

শহুরে ও গ্রামীণ মানুষ

তবে গ্রাম্যবাসীদের মানসিকতা যখন একটু উদার-দিগন্তে পাখা মেলে, তখনই ওরা শহরে আসার ভরসা পায়। আর কিছু কিছু গ্রামবাসী শহরে আসে ভালো ভালো জিনিস কেনাকাটার উদ্দেশ্যে। সরকারী কাজে, সিনেমা দেখার জন্যে গ্রামবাসীদের প্রায়ই শহরে আসতে দেখা যায়। আবার শহরবাসীরা গ্রামে আসে সস্তায় চাল, শস্য, ফল ইত্যাদি গ্রামের বাজার থেকে কিনে নিয়ে যেতে। এমন লোকও আছে যাদের জমিদারী গ্রামে, অথচ সখ ক'রে বাসাভাড়া নিয়েছেন শহরে। শহরাঞ্চলের লোকেদের অধিকাংশই এই অঞ্চলের প্রাক্তন অধিবাসী নয়। এদের অনেকে কার্যব্যপদেশে ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে, এমন কি বিদেশ থেকেও এসে এখানে আস্তানা গেড়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে,

গ্রাম ও শহরের যোগাযোগ

আসামের নগরগুলির উত্থানের জন্যে একমাত্র দায়ী চা-বাগানের সাহেবেরা। কালক্রমে তেলখনির কর্তৃপক্ষরাও অবশ্য এতে অংশ গ্রহণ করে।

আসামীদের নাগরিক জীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই। এদেশের লোকেরা এখনও ঐতিহ্য বা অতীত আচরণকে ভুলতে পারেনি। তাই তাদের মধ্যে প্রগতিবোধ জাগা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। একমাত্র কর্ম ছাড়া ওদের জীবনে না আছে কৃষ্টি বা সংস্কৃতির কোন অধ্যায় না আছে খেলাধুলার প্রতি ঝোঁক। তবে ওদের অনেকে কবিতার অনুরাগী 'Emotion contemplated in tranquility'—কথাটির সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে ওদের মধ্যে। ওদের রচিত কবিতাগুলি প্রায়ই আবেগাকুল বা উচ্ছ্বা বহুল। আসামী ভাষায় রচিত অনেক গল্প ও উপন্যাস ইদানীং চোখে পড়ে। ওগুলো নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। নাগরিক জীবন আসামবাসীদের মনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। শহরের ইস্কুল-কলেজের দৌলতে গ্রামাঞ্চলের লোকেরাও যেন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাটুকু উপলব্ধি করতে শিখছে ইস্কুল-কলেজে আঞ্চলিক ছাত্রসংখ্যার পরিবর্ধনের হার দেখে একথা স্পষ্ট মনে হয়।

প্রগতিবোধ

তবুও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে এদেশের মানুষ মাটিকেই যেন ভালোবাসে অধিক তার একমাত্র কারণ—অধুনা-উদ্ভূত নগণ্য কয়েকটি শহর যেন আবহমানকাল ধরে-চলা এদের জীবনযাত্রার পরিপন্থী। অন্ততঃ স্থানীয় অধিবাসীদের শহরে বাস করাটাই ধাতস্থ নয়। শ্যামল মাটি আর সজীব গাছপালার বুকে যারা খুঁজে পেয়েছে সরল জীবনের স্বাদ, তারা কি করে' মেনে নেবে বক্র ও কুটিল-সভ্যতার প্রতীক শহরে-পথ ধরে চলা? মাটিই তাদের জীবন, গাছপালাই তাদের প্রাণ; আর খড়কুটোর পর্ণকুটির তাদের জীবনযাত্রার বহিরঙ্গ পৃথিবীজোড়া কত প্লাবন, কত সর্বনাশা ঝঞ্ঝা ওদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেল। এল কত বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন। তবু পড়েনি ভেঙ্গে। ছাড়েনি সেই ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়। জগৎব্যাপী ভূকম্পনে ধ্বসে-যাওয়া খাদেও সেই লোহিত মাটিকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে দেশের প্রতিটি মানুষ।

গ্রামমুখী সভ্যতা

প্রকৃতির সাথে গ্রামবাসীদের নাড়ীর টান। কারণ,—এই প্রকৃতির কোলেই তো ওরা মানুষ। প্রকৃতি তার বুকভরা মধু অবারিত করে দিয়েছে বলেই তো আজ ওরা প্রাণ পেয়েছে। সুখেদুঃখে তাই নেমক-হারামের মত শহরে পালিয়ে না গিয়ে, তারা এ মাটিকে আশ্রয় করে থাকবে। বারোমাস তারা মাটি খুঁড়ে সোনা ফলায়, আর অবসর-সময়ে নিজেদে ডুবিয়ে রাখে তাঁত বাঁশ বা বেতের কাজে। ধানচাষ হয় বহুল পরিমাণে। পাট

গ্রাম্য জীবন

কম জন্মে না এদেশে। তবু চাষীরা ধানের দিকে বেশি নজর রাখে, যেহেতু চালই তাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য। তাছাড়া, আসামের জলবায়ু কৃষির অনুকূল। এজন্যে চাষীরা অদ্ভুত প্রেরণা পায় চাষবাসে। তাদের সব সময় লক্ষ্য থাকে ক্ষেত-খামারের দিকে। এখানকার উৎপন্ন ধান দিয়ে জনসাধারণের ক্ষুধা যথেষ্ট পরিমাণে মেটে। চাষ-আবাদ ছাড়া বনস্পতিবহুল আসামের বৃহদারণ্যে অনেক পাহাড়িয়া উপজাতি কাঠ কাটে ও গুঁড়িকাঠের ব্যবসা করে' অনেক টাকা উপার্জন করে। প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল, গ্রামগুলিই সম্পদ-সমৃদ্ধ, আর অধিবাসীরা চাষবাসের বিদ্যা ছাড়া যে-কোন কারিগরি শিক্ষা থেকেই বঞ্চিত। গ্রামই তাদের প্রাণকেন্দ্র। গ্রামবাসীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছু নিজেদের হাতে তৈরি করে। চাষ ক'রে আনে ফসল। বাঁশ কেটে গড়ে নিজেদের ঘর। মেয়েরা গুটিপোকার চাষ করে' রেশম তৈরি করে—তা দিয়ে বোনে পরিবারের প্রয়োজনীয় জামা-কাপড়। আসামীদের ঘরে ঘরে তাঁত। আসামী মেয়েদের তাঁতশিল্পে দক্ষতা দেখে গান্ধীজী নিজেই স্বীকার করেছেন—'They are born weavers...And she weaves fairy tales in cloth.' গান্ধীজীর এই উক্তিটি গভীর ব্যঞ্জনাময় ও ব্যাপক। এদের প্রস্তুত রেশমী শাড়ী একদিন হর্ষবর্ধনের চোখও ধাঁধিঁয়ে দিয়েছিল। সেই শাড়ীর রং চাঁদের আলোকেও হার মানিয়েছিল।

স্বয়ংসম্পূর্ণতা

আসামের অধিবাসীদের মধ্যে যারা গ্রাম্য, তাদের প্রতি ঘরে একটা-না-একটা কুটিরশিল্প আছেই। আসামীরা বাঁশ ও বেতের চমৎকার সামগ্রী-নির্মাণে দক্ষ হাতের পরিচয় দিয়ে এসেছে অতীতে। ওদের কুটির-শিল্প আজও সে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বিশেষতঃ 'জাপিস' টুপীর নাম সমঝদার-মহলে সকলেরই জ্ঞাত।......মোটের উপর, দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য জিনিসের জন্যে ওদের পরমুখাপেক্ষী হতে হয় না কখনও। গান্ধীজীর ভাষায় আসামীরা 'self sufficient' বা স্বয়ংপূর্ণ।

বিহু ইত্যাদি উৎসব

এভাবে ক্ষেত-খামারে রোদে তেতে পুড়ে, বর্ষায় জলে ভিজে, সোনার ফসল ফলিয়ে, তারপর বাড়ি ফিরে হাতের কাজ করে' অনেক দীর্ঘ দিন কাটিয়ে তারা একদিন পায় উৎসবের আনন্দ ও নির্মল প্রশান্তি। সেদিন গ্রামবাসীরা আনন্দে হয় মাতোয়ারা। আসে সর্বোৎকৃষ্ট উৎসব বিহু। লোকগীতি, প্রচলিত লোকনৃত্য ইত্যাদি দিয়ে ঢাক পিটিয়ে এই উৎসবের সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়। এতে করে ধর্মভীরু আদিবাসীরা ফিরে পায় নতুন প্রাণের জোয়ার এবং কমতার অপূর্ব বন্যা।

চড়াই হই পৰিমগই তোমাৰে বিলাত ঐ<br>
মাচ হই পৰিমগই জালত।<br>
ঘাম হই পৰিমগই তোমাৰে শৰীৰত<br>
মাখি হই পৰিমগই গালত।

—বিহু-উৎসবে গাওয়া উপরের গানের ঐ উদ্ধৃতিটুকু সত্যিই রোম্যাণ্টিক। এখানকার অধিবাসীরা এ-ধরণের আরও অনেক ছড়া ও লোকগীতি এভাবে ধরে রেখেছে। সমতলভূমিতে বোদোরা 'খেরাইপূজা' করে থাকে। 'চিফুং' নামের বাঁশী বাজানো হয় ঐ উৎসবে। 'ভাওয়ানা' লোকসংগীতের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। শংকরদেব বিরচিত নাটক বৈষ্ণবদের মধ্যে সমধিক আদৃত। মা বিষহরির তুষ্টির জন্যেও এখানে 'ওঝাপালি' নাচের ব্যবস্থা করার প্রথা আছে। আসামীদের নাচের মধ্যে মণিপুরী নাচ নিঃসন্দেহে নৃত্যবিশ্বে শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন। লুসাই-অঞ্চলের অধিবাসীদের বাঁশনৃত্য বিহুনৃত্যের আর একটি কৃতিত্বপূর্ণ চমকপ্রদ অঙ্গ। নাংক্রেম একটা দলীয় নাচ। তাতে ছন্দের অপূর্ব কৌশল দেখানো হয়। ওদের আদিযুগীয় গুরুত্বময় নৃত্যকৌশলে 'rythmical patterns of movement and plastic sense of space and vivid representation of a world seen and imagined-এর স্বাদ পাওয়া যায়।

প্রকৃতির প্রাচুর্যে যারা নিজেদের বিলিয়ে দিতে চায়, তারা নির্মল আনন্দে মনের দিগন্তটুকুকে আরও একটু বাড়িয়ে দিক্। ভারত আসামের গ্রামগুলিতে পেতে চায় রুসোর 'আদর্শ-গ্রাম'। আসাম ভারতেরই অংশ। তাই ঐ আদর্শ গ্রামগঠনে ভারত সরকারের দায়িত্ব অনেক বেশি। আসামীদের যে আফিম খাওয়ার নেশা গান্ধীজীর মনে একদিন আসামীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব জাগিয়েছিল, সে আফিম-নেশা যাতে গ্রামের লোকেরা ক্রমশঃ ত্যাগ করে, তার দিকে নজর দিতে হবে। সর্বোপরি, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ওদের অন্তর-মার্গকে লেখাপড়ার আলো দিয়ে উন্নত করে তুলতে হবে। তবেই হবে আমাদের সাধনা-সফল। তবেই আসাম হবে ভারতের সুইজারল্যাণ্ড।

পরিশেষ

## আসামের অর্থনীতি

ভারতের পূর্ব-সীমান্তে অবস্থিত সবুজে-ঢাকা বন্ধুর আসাম প্রদেশের প্রাকৃতিক রমণীয়তা সকলের নিকট সুবিদিত। প্রকৃতি অকাতরে আপন প্রাণের শ্যামল প্রাচুর্য দিয়ে একান্ত চেষ্টা করেছে এই মাটির বুকে সরসতা এনে দিতে। এক হাতে দিয়েছে আপন ঐশ্বর্যরাশি কোমল প্রাণ-টুকু পর্যন্ত উজাড় করে'; কিন্তু অপর হাতে এদেশকে শরীক করেছে নিজের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণার। পাহাড়িয়া এ প্রান্তরের প্রতিটি মানুষ মাটি চষে' তেতেপুড়ে সোনার ফসল যদি ফলিয়েছে তো ভূকম্পন, কালজয়ী ঝঞ্ঝা, বিধ্বসন, সর্বনাশা বান এসে সমস্ত-কিছু আপন হিংস্র বিবরে টেনে নিয়ে প্রতিটি মেহনতি মানুষকে পথের ফকির করে ছেড়েছে। প্রকৃতিই যাদের প্রতি সুপ্রসন্না নন, নিদারুণ নিয়তির শাসন মানাই যাদের একমাত্র উপায়, তাদের ঘরে যে আর্থিক অসচ্ছলতা থাকবে, এ আর অস্বাভাবিক কি?

ভূমিকা ও অবস্থান

খনিজ সম্পদ, শস্য-ফল-বৃক্ষ—সব-কিছু থেকেও যেন সব-কিছু আজ হারিয়ে যাবার মোহানায় এসে ওরা ভিড় জমিয়েছে। ওদের জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে সর্বনাশা বুভুক্ষা ওদের পঙ্গু করে দিয়ে যাচ্ছে। ওদেশের অর্থনীতি তাই ক্ষীণপ্রাণ দারিদ্র্যের অর্থনীতি। অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, আসাম তাই problem-state তথা সমস্যাবহুল রাষ্ট্র।

আসামের অর্থনীতি পর্যালোচনার প্রথম পর্যায়ে আসামের কৃষিকেই স্থান দিতে হয়। দেশের অধিবাসীদের শতকরা চুয়াত্তর জন এই চাষবাসের উপর নির্ভরশীল। আসামের

চাষ

ভূমি ও জলবায়ু হুবহু পূর্ব-বাংলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করেছে। তাই ধানচাষ হয় এখানকার মাটিতে অধিক পরিমাণে। চল্লিশ একর পরিমিত জমিতে প্রায় পনেরো লক্ষ মণ ধান ফলে প্রতি বছর। ধানের জন্যে আসামকে আর পরমুখাপেক্ষী হতে হয় না। ধান-উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয় কামরূপ। শিবসাগর, গোয়ালপাড়া, লক্ষ্মীমপুর, ধারাঙ্গ ও নওগাঁতেও অল্পবিস্তর ধান হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা হাড়-কাঁপানো শীতের দিনে জলা নীচু জমিতে শালিধানের চাষ করে। ঘন বারিপাতে আবার 'বাও' ও বসন্তে উন্নত ভূমিতে 'আহু' ধানের বীজ ছড়ানো হয়। আমাদের অতি-পরিচিত পরম-উপাদেয় চালগুলির প্রায় সবই উৎপন্ন হয় আসামে। প্রসঙ্গক্রমে 'ঝাহা' চালের নাম উল্লেখযোগ্য। আর এক অদ্ভুত ধরণের ধান হয় এখানকার মাটিতে। একে বলা হয় 'বোকাধান'। এ ধান সেদ্ধ-না করেই খাওয়া যায়। এখানে বর্ষাকালে ঘন বৃষ্টিপাত হয়। তাই পাট জন্মানোর উপযোগী এদেশ। ভারতের উৎপন্ন পাটের প্রায় অধিকাংশ আসে এদেশ থেকে। আসামের ৩১১, ৫৩৮ একর জমিতে প্রতি বছর প্রায় ৭৫৩,৫৪৫ বেল পাট জন্মে। নওগাঁতেই পাট হয় বেশি পরিমাণে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশে পাট-শিল্প নেই। তাতে এসব পাট কাঁচামাল হিসেবে অতি সস্তায় পাঠাতে হয় ক'লকাতা বা বোম্বাইর শিল্প-অঞ্চলগুলিতে। ধান ও পাট ছাড়া অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে আখ, তামাক, তৈলবীজ, ডাল ও বিভিন্ন ধরণের ফসলের নাম উল্লেখযোগ্য।

সমতল ভূমিতে আদ্যিকালের সেই গোরু আর লাঙ্গল দিয়ে চাষ করার রীতিই এদেশে সর্বাধিক প্রচলিত। যদিও ভারতের অন্যান্য স্থানে ট্রাক্‌টার্ দিয়ে চাষের পদ্ধতি

চাষবাসের পদ্ধতি

খুব একটা চালু হয়নি, তথাপি পর্বতসংকুল আসামের ভূমিতে ট্রাক্‌টার্-চাষের প্রচুর অবকাশ আছে। অশিক্ষিত ও বহিঃ-সম্বন্ধবিমুখ এদেশের অধিবাসীরা গতানুগতিকতা থেকে এক তিলভর ন'ড়তে চায় না। যে দেশের পাহাড়ে কাঠ পুড়িয়ে তার ছাইএর উপর 'ঝুমিং' পদ্ধতিতে বীজ বোনা হয়, সে দেশ যে শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষ্টিতে বর্ধিষ্ণু ভারতেরই অঙ্গ—এ প্রতীতি সহজে জন্মে না কোন চিন্তাবিদের মনে। যাদের শুধু কুসংস্কার আর ঐতিহ্যপূর্ণ অতীতকেই আঁকড়ে

ধরে' রাখার প্রবল বাসনা, তাদের নৈতিক জীবনবোধকে সমুন্নত করে' গতিশীলতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেবার প্রচেষ্টা অচিরেই গৃহীতব্য।

কুটিরশিল্প

আসামের কুটিরশিল্প যদি আজ্‌কের পৃথিবীবাসীর স্মৃতির অতলে, তবু একথা অবশ্য স্বীকার্য যে একদা আসাম তার নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন দ্রব্যসামগ্রী অসংকোচে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দ্রব্যসম্ভারের প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছিল। ওরা আজ অবধি অদ্ভুত রুচিশীলতার পরিচয় বহন করে' আসছে। ভারতবাসী নিশ্চয় আজও ভুলতে পারেনি যে, একদা হাসভেগবাহিত ও হর্ষবর্ধনের নিকট প্রেরিত উপহার সিল্কের শাড়ী চাঁদের আলো বলে' বিভ্রম জাগিয়েছিল সকলের মনে। অনুশোচনার বিষয়, ওদের অনেক আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পথে। শিল্পীরা আর্থিক অনটনের ভিতর দিয়ে কালাতিপাত করে' সরকারের কাছ থেকে কোন সাহায্য বা উৎসাহ না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছে। আসামে এখনও ৫,০০,০০০ সক্রিয় তাঁত আছে। এতে ১২'৫ লক্ষ লোকের আংশিক সময়ের ও পূর্ণ সময়ের কর্মসংস্থান হচ্ছে ; রঞ্জনশিল্পও পাহাড়িয়া উপজাতীয়দের অতি প্রিয় শিল্প। নাগাদের অনেকে অতি চমৎকার রং তৈরি করতে পারে। এখানকার লোকেদের হাতে-প্রস্তুত সোনা, তামা, মাটি, বাঁশ, বেত ইত্যাদির জিনিস প্রশংসার দাবি রাখে। গত মহাযুদ্ধে হঠাৎ বেত ও বাঁশের ঝোড়া যুদ্ধকার্যে প্রয়োজন হওয়ায় এবং চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বাড়ায় এই দুটি শিল্প প্রভূত উন্নতি করেছিল। এতে চাষীদের উপরি-আয় অনেক বেড়েও গিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ থামার সঙ্গে সঙ্গে এসব জিনিসের চাহিদা আসে ফুরিয়ে। ফলে চাষীরা ঐ অবসর-সময়ের পরিশ্রমজাত আয় থেকে হয় বঞ্চিত।

রাজ্যসরকার ও কুটিরশিল্প

স্বাধীনতার পর থেকে রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এই সব অবহেলিত কুটির-শিল্পকে প্রাণ দেবার জন্যে পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা করে চলেছেন। তবু দেখি—পেতল ও লোহার শিল্পায়তনগুলি কাঁচামালের অভাবে ক্রমেই তল্পিতল্পা গুটাচ্ছে। অধুনা-প্রকাশিত রাজ্যসরকারের শিল্পনীতি থেকে জানা গেল যে, সরকার বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে ছাত্রদের পাঠাচ্ছেন শিল্পবিদ্যা অধ্যয়ন ক'রতে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প সূচনা করার ক্ষমতা যাদের আছে, তাদের অর্থমঞ্জুর করাও হচ্ছে এই কারণে। গৌহাটির সাবান তৈরির প্রতিষ্ঠান এই পরিকল্পনারই একটা অংশ। ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে গুটিপোকার চাষ ও বয়নশিল্পের দিকে অর্থাৎ এই দু'টি শিল্পের উন্নয়নের দিকে সরকার মনোনিবেশ করেছেন। যাতে গ্রাম্য ঋণদানকারী চড়া-সুদখোরদের কাছে না যেতে হয় তার জন্যে ব্যবস্থা হয়েছে 'বোয়া-কাটা' বা বয়ন-সমবায় সমিতির। এই সমিতি ক্রয়-বিক্রয়ের একটা বিভাগ খোলায়, তন্তুবায়দের এখন আর বিক্রেতাদের হাতে প্রবঞ্চিত হবার কোন সম্ভাবনা রইল না। ১৯২১ সালের

৪,২০,০০০ তাঁতের পরিবর্তে আসামে আজ তাঁতের সংখ্যা ৫,৪৫,০০০ টি। রেশম ও পশম জাতীয় কাপড়চোপড়ের উৎপাদনের হার এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। Assam Financial Corporation-এর প্রতিষ্ঠা যদিও একটা বিরাট আশা-পরিবাহী, তবু এতে যে শিল্পীদের চাহিদানুযায়ী অর্থবণ্টন হবে তা মনে হয় না। তবে এই প্রতিষ্ঠান গুরুতর অর্থনৈতিক অবস্থানকে কথঞ্চিৎ লাঘব করে দেবে।

বৃহৎ শিল্প—চা পেট্রোলিয়াম কয়লা ইত্যাদি

আসামের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গঠন করেছে একমাত্র চা-শিল্পই—এই কৃষিজ শিল্পই। ১৮২৩ সালের সে এক সকাল। লোহিত উপত্যকার কোলে ঘন চা-বনের আবিষ্কার হল সেদিন প্রথম। তারপর থেকে অপ্রতিহত গতিতে এ-শিল্পের ক্রমপ্রসার ঘটে। আসাম এনে দেয় অদ্ভুত সুগন্ধিযুক্ত উত্তম ধরণের চা সারা পৃথিবীর ঘরে ঘরে। আজও সে তার গতিকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি। ৩৮৩,৩৪০ একর জমিতে ৩১৫,৩১৫,৩৬৯ পাউণ্ড চা ফলিয়ে ভারতভূমিকে চা-এর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে। ডিগবয়ে ১৮৮৯ সালে প্রথম 'আসাম রেলওয়ে ট্রেডিং কোম্পানী' কর্তৃক তেল তোলা হয়। তারপর অনেক দিন গেল কেটে। এ-শিল্পে এল অনেক দক্ষ কারিগর। হল নতুন উপায়ে তেল খননের ব্যবস্থা। পরিশোধনাগার তৈরিব প্রস্তাব নিলেন ভারত সরকার। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে আমরা এ-ধরণের দু'টি পরিশোধন-কেন্দ্র পাব বিহারের বারায়ুনি ও আসামে। সেদিন শুধু দিনে অপরিশোধিত ১,৮০,০০০ গ্যালন পেট্রোল পাব না, পাব পরিশোধিত ১,৮০,০০০ গ্যালন তেল। আসামে প্রতি বছর প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হয়। নাগা পাহাড় ও লক্ষ্মীমপুর অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়। গারো পাহাড়েও কয়লা পাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যানবাহন ও যোগাযোগের অসুবিধার ফলে এসব খনির উন্নতি হচ্ছে না। 'আসাম-লিঙ্ক রেলওয়ে'র সাহায্যে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কয়লা পরিবহনের সুবিধা থাকায় উচ্চ-আসামে মাখুম ক্ষেত্রের প্রায় সমস্ত কয়লা তুলে ফেলা হচ্ছে। মোটের উপর, যথেষ্ট পরিমাণে যানবাহনের ব্যবস্থা না হলে এসব খনির ধ্বংস অপরিহার্য। এ-সব শিল্প ছাড়া চামড়া-শিল্পেরও অল্পবিস্তর উন্নতি ঘটেছে আসামে। এখানকার কাঁচা চামড়া সমগ্র ভারতের শিল্পগুলির চামড়ার চাহিদা মেটায়। কাঠ-শিল্প, পাত-গালা ও তার্পিন শিল্পেরও কয়েকটা ছোটো প্রতিষ্ঠান আছে আসামে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্যে প্রচুর কাঁচা মাল থাকা সত্ত্বেও আসামকে নির্ভর করতে হয় অন্যান্য দেশগুলির উপর। অচিরে বহুল পরিমাণে বিরাটাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আসাম ও কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উন্নয়ন অসম্ভব।

সমবায় আন্দোলনের ফলে আসামেও কয়েকটি ঋণদান সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

যদিও এদের অর্থ নেহাৎ অল্প। তাই জনগণের চাহিদা মেটে না এই অর্থে। যদি এই সমিতিগুলোকে সরকার অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন, তাহলে জনসাধারণ খুবই উপকৃত হবে। চাষ ও শিল্পের জন্যে একান্ত প্রয়োজন মূলধন। আর এই মূলধনের অধিকাংশ যদি এই সব সমিতি সাধারণকে দিতে পারে, তবে আসাম আর কোন কিছুতেই পিছিয়ে থাকবে না। অন্যান্য রাজ্য-গুলির সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলতে পারবে।

সমবায়-সমিতি

আসামের পরিবহন ও যোগাযোগের ব্যবস্থা অতীব অল্প। অথচ এই যোগাযোগ ও পরিবহন শুধু শিল্পে ও সম্পদেই দেশকে এগিয়ে দেয় না, এগিয়ে দেয় ভাবের আদান-প্রদানের দিক থেকেও। সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বিনিময়ের জন্যে এই পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। আগেকার দিনে লোহিতই ছিল একমাত্র যোগাযোগের পথ। তারপর লর্ড কার্জনের আমলে ১৯০৩ সালে তিনসুকিয়া লাইনে যাতায়াত শুরু হয়। অবিভক্ত ভারতে আসাম অন্যান্য প্রদেশগুলির সঙ্গে 'আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে' দ্বারা সংযুক্ত ছিল। দেশবিভাগের পর আসামের আর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগের পথ ছিল না। তাই ১৪২৫ মাইল মিটার গজের 'আসাম-লিঙ্ক' পথ প্রস্তুত করা হয় ৮৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। বিমানে যাতায়াতের ব্যবস্থাও এদেশের সমৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে দিয়ে জাহাজযোগে চলাচলও সীমাবদ্ধ। অল্প কয়েক মাইল রেলপথ ও বিমানপথ দিয়ে একটা সীমান্ত-প্রদেশ চলতে পারে না। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সীমান্ত-প্রদেশের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের যাতে অনায়াস যোগাযোগ স্থাপন করা চলে, তার ব্যবস্থাও সরকারের করা উচিত।

যোগাযোগ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আসামের কৃষিজাত দ্রব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। যানবাহন ও চলাচলের দিকে দৃষ্টিপাত ছিল সরকারের। তবু যেন আশানুরূপ উন্নতি হয়নি এদেশের। আর শিল্পের দিকে সরকারের অবহেলাও যেন পরিকল্পনার আর একটি ত্রুটি। প্রথম পরিকল্পনা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানকে একেবারে উন্নত করতে পারেনি। অনুন্নত অঞ্চলগুলির দিকে তো কোন নজরই দেওয়া হয়নি। প্রথম পরিকল্পনার আর একটি বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য ছিল সমাজ-উন্নয়ন। দেশ থেকে অনাহার, অস্বাস্থ্য, রোগ, অশিক্ষা দূর করে' আসামকে শিল্পে বিজ্ঞানে শিক্ষায় জনসাধারণের নৈতিক উন্নয়নে এই পরিকল্পনা সাহায্য করবে—এটাই ছিল সকলের ধারণা। মঙ্গলদাই, শিলচর, গারো-পাহাড়, গোয়ালপাড়া ও মিকির-পাহাড়, গালাঘাট পরিকল্পনা ইত্যাদির লক্ষ্য ও আদর্শ মহান্। গ্রামগুলির উন্নয়নের জন্যে এসব খাঁটি পরিকল্পন নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু সে-মন্ত্রে দীক্ষা এখনও পায়নি গ্রামবাসীরা। উৎপাদনা বেড়েছে, কিন্তু জনসাধারণের উন্নতি ঘটেনি।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উমত্রু হাইড্রো-ইলেকট্রিক পরিকল্পনা বিদ্যুৎ-উৎপাদনে আসামে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ২·০৫ কোটি টাকার এই পরিকল্পনা ১৯৫৭ সাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ করে' বিস্মিত করেছে জাতিকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার একমাত্র ত্রুটি—আসামের শিল্পপ্রতিষ্ঠার দিকে বিন্দুমাত্র নজর দেওয়া হয়নি। এবারেও জোর দেওয়া হয়েছে কৃষির উপর। কিন্তু কৃষি ও শিল্প পাশাপাশি না থাকলে দেশের সুসমঞ্জস উন্নতি হয় না। আসামের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের উন্নতি ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ যত্নশীল হওয়াও এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। পরিকল্পনার এই দিকটিই শুধু সমাজতান্ত্রিক প্রগতিবোধের পরিচায়ক। মোট ব্যয় ২৯০ কোটি টাকার ৫০ কোটি টাকা খরচ হবে এতে। আসামীরা তাই ঐ সুস্থ জীবন সম্বন্ধে আশান্বিত।

দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা

## আসামের বিহু-উৎসব—সংগীত ও নৃত্য

'হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যানভরা ধন,
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্ত্যে মূর্তি ধর ভুবনমোহন
নববরবেশে।'

—রবীন্দ্রনাথ।

শীতের পর আসে কবিদের বহুবাঞ্ছিত সুন্দর বসন্ত। তাই এ-বসন্তকে যেন উৎসবমুখরতার ভিতর দিয়ে ফলার্ঘ্য-ভরা অঞ্জলিপুটে স্বাগত না জানালে নয়। তপস্বিনী যেমন নতুন দৃষ্টিতে তপস্বীর বরবেশ দেখবার প্রয়াসে নিশিদিন একান্তচিত্তে কৃচ্ছ্রসাধন ও আরাধনার আশ্রয় করে, তেমনি আজ শীত-সায়াহ্নের বীথিকার রিক্ত ব্রততীতে, কঙ্কালসার মানবীর ক্ষুধার্ত-ভিক্ষার্থী প্রসারিত করের মতো শুষ্ক বৃক্ষের শূন্যে ছড়ানো রিক্ত শাখায়, বসন্তঋতুর নবীন সবুজ সাজ অবলোকনের কামনায় উন্মাদ ধরাবাসী।

সূচনা

এ-হেন সৌন্দর্যের আগার বসন্তঋতুর বন্দনা যুগ-যুগান্তর ধরে' করে' এসেছে পৃথিবীর কবিরা। আদি যুগেও যখন মানুষ অসংস্কৃত ও অজ্ঞতার তিমিরে ছিল, তখনও তারা ছড়া গাথা ইত্যাদিতে নিজের ভাবকে ভাষায় রূপায়িত করার চেষ্টায় ছিল। বিদগ্ধমণ্ডলীর মতে, ভাবোচ্ছ্বাসসম্ভূত কবিতা রচনা যে-কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই সম্ভব। আসামীদের পক্ষেও ঐ একই কারণে কবিতা রচনা করা আর এই কাব্যরসে বসন্ত বন্দনাকে অভিনব রঙে ছোপানো সম্ভবপর ছিল। কবিগুরুর কবিমানসনিঃসৃত বনগীতিকা ও বসন্তোৎসবের গূঢ়ার্থময় অভিব্যক্তির এক অসামান্য সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় আবহমানকাল ধরে' গাওয়া [illegible]: বিহু-সংগীত ও নৃত্যের মধ্যে। তবে আসামীরা এই উৎসবে শুধু প্রকৃতির সজীবতা ও শ্যামলিমা বাঞ্ছা

বিহু-উৎসবের তত্ত্ব

করে না, কিশোর-কিশোরীদের মনে সজীবতা সঞ্চার করে' যৌবনের প্রথম অভ্যুদয়ের জন্যে উপাসনা করে নিসর্গসুন্দরীকে আর প্রীতিপ্রেম নিবেদন করে তাদের অন্তরের দেবীকে। বাংলার বসন্তে-বিমোহিত কবির আকুল প্রার্থনাভরা কবিতা, 'আসামী কিশোরীদের প্রাণে নবীন বসন্ত জাগাবার বিহু-উৎসবের' অর্বাচীন সরল-সুন্দর কামনায় যেন আরও সার্থক রূপ পেল। নবীনাকে পাবার জন্যে নবীনের এই যে আগ্রহ বা যৌবনকে পাবার ও উপভোগ করার জন্যে তাদের এই যে অভীপ্সা, ইহা যদিও প্রাচীন তথাপি জগতের শাশ্বত সত্য।

আসামী বর্ষপঞ্জীর আজ শেষ অধ্যায়। আর সব অধ্যায়কে কাল চিরতরে টেনে নিয়ে বিলীন হয়ে গেল চিরতমসায়। শুধু একটিমাত্র পর্ণপত্রকে ছায়ার মতো রেখে গেল হতাশ মানুষের দুঃস্থ মনকে আশার আলোয় ভরে' দিতে। রুদ্র-রুক্ষ-নিরাভরণা প্রকৃতিকে নিয়েও আজ্‌কের এই স্মরণীয় বৎসরের শেষদিনে উৎসবে মেতে এরা কল্পনার পটে দেখবে প্রকৃতির আগামী দিনের শিশির-সিঞ্চিত কোমল রূপ। অজন্মা, বন্ধ্যা এ ধরিত্রীর বুকে এরা দেখবে আবার জন্ম ও সৃষ্টির কত লীলাখেলা। কাল বছরের প্রথম দিন। গত দিনের ব্যর্থতার সমস্ত ধূলো, সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুছে দেবে উৎসবের এই দিনটি। শুধু এই দিনটি কেন, এ-সপ্তাহের সাতটা দিনই।...

বিহু-উৎসবের কাল—বোহাগ-বিহু

কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি অতিক্রান্ত। অচিরেই পৃথিবীর কোলে নেমে আসবে বর্ষণমুখর দিন, আর চাষীদের কর্ম্মমুখর চঞ্চলতায় চমকে' উঠবে ফেলে-আসা রৌদ্রশুষ্ক দিনগুলো। ভিজে যাবে তৃষাদীর্ণ মাটি আর উৎসাহ ও আশ্বাসভরে ছুটে চলবে লাঙ্গল ও বীজধান-কাঁধে চাষীরা। প্রকৃতির এ কী যাদু! তার অলৌকিক শক্তিতে আজ পৃথিবীর এ কী সুন্দর রূপ! কুয়াশার আস্তরণে পূর্ণিমার চাঁদ নীলাভ আকাশের বুকে আর ঢাকা পড়বে না। গাছে গাছে গাইবে পাখী। মাঝে মাঝে আকাশ ঢেকে যাবে ঘন মেঘে—বিদ্যুতের বাঁকা রেখাও হয়তো শুভ্রতার ঝিলিক দেবে কয়েক নিমেষ। সহসা হবে বারিপাত। মাটি হবে নরম, যেমন প্রেমিকের আবেগবিহ্বল স্বর প্রেমিকাকে কোমল করে তোলে। প্রকৃতির উৎপাদন-ক্ষমতার পরিবর্ধন হবে—ফলবতী হবে বসুন্ধরা।

বর্ণনা

আদিম সভ্যতায় প্রভাবান্বিত এ-সব মানুষের তথা আসামের উপজাতিদের মধ্যে প্রকৃতির এই উৎপাদনী বা প্রজননী শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে যে উপাসনার প্রচলন আছে, তা আদর্শপূর্ণ। বোহাগ-বিহুতে প্রকৃতির এই জন্মদানের ক্ষমতাকে অপূর্ব সমরোহে রসে ছন্দে বিচিত্র সংগীতমুখরতায় অর্চনা করা হয় পক্ষকাল ধরে'। 'রাথ্ বেনেডিতের' ভাষায় 'জমির উর্বরতা ভগবানের ক্ষমতার মধ্যে সীমিত।' তাই কৃষক-সম্প্রদায়ই প্রকৃতিকে সৃষ্টির

বিহুর উদ্দেশ্য—বোহাগ-বিহু

আদিকাল থেকে আপন ঐশ্বর্যসম্ভার ও ভক্তি-ভরা মন অকাতরে সমর্পণ করে' আনুষ্ঠানিক-ভাবে পূজা করে এসেছে। বোহাগ-বিহু কৃষাণদের স্বার্থান্বেষী সাম্প্রদায়িক (শুধু চাষীদের) অনুষ্ঠান। এতে ভগবানের রহস্যময়ী-ভৌতিকতা আরোপ করা হয়েছে। তারা যদিও প্রকৃতির পূজারী, তথাপি তারা অন্ধবিশ্বাসী—তাদের এই অর্চনায় প্রকৃতির নিয়ম (Laws of Nature)-ঘটিত কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদিতা নেই। সাচ্ সাহেবের মতে, আর্যদের এদেশের মাটিতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই এই অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার আরোপিত হয়। অতঃপর লোকগীতি নৃত্য ইত্যাদি আনন্দ-আহ্লাদের সঙ্গে সঙ্গে পূজা (দেবীপূজা) ও ধর্মীয় পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

কৃষিযুগ থেকেই গো-পালকদের মধ্যে গো-মহিষাদি পুজোর ও মঙ্গলকামনা-সূচক অনুষ্ঠানের রেওয়াজ আছে প্রত্যেক দেশে। আসামীরা এই প্রচলিত প্রথার অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটাবার চেষ্টা করেনি। বোহাগ-বিহুর দিনে এরা 'গোরু-বিহু' করে। চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে আঞ্চলিক অধিবাসীরা গৃহপালিত পশুদের সযত্নে স্নান করিয়ে দেয়। স্নানের পূর্বাহ্ণে মতি-কলাই ও গাছের শিকড় গুঁড়ো করে একপ্রকার প্রলেপ তৈরি করে' গোরু-মহিষের সারা গায়ে দেয় মাখিয়ে। স্নানের পর ডিগলতি ও মক্ষিয়াতি গাছে-ক্ষত বেগুন ও লাউ খাওয়ায়। রাখালরা এই অনুষ্ঠানে উল্লাস প্রকাশ করে…গায়ঃ

আনুষ্ঠানিক কর্মসূচী—
(১) গোসেবা

লাউ খাও, খাও বেগুন,
… … …
যেন হও বর্ষীয়সী বছরে বছরে।'

তারপর উক্ত গাছের চূর্ণ শিকড় ও বেগুনের কিছু অংশ গোয়ালঘরের গায়ে রাখা হয়। সেদিন নতুন দাড়ি বা পাখা দেওয়া হয় গোরুকে। আর গোয়ালের সামনে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া দেওয়া হয় চারধারে। এই দিনটি সাধারণের কাছে 'উরুখ' বা 'বিহু-পূর্বাহ্ণ' বলে পরিচিত। এই দিবসে লোকেরা সকালে-বিকালে পশুশিকারে বা মৎস্যশিকারে নিজেদের নিয়োজিত করে। নিশাভাগে সর্বসাধারণের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হয় আহৃত মাংসে। দলগত ভাবে এই ভোজ-পর্বের সমাধা হয়। অতঃপর আসে বছরের নতুন দিন। বিহু-উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায়। উৎসব-দিবসে পরিবারের লোকজন আত্মীয়স্বজন, প্রিয় গ্রামবাসী ও বন্ধুবান্ধবদের পরস্পর পরস্পরকে উপহার দেয় তাদের স্বহস্তে-প্রস্তুত তোয়ালে বা 'গামছা'। মানু-বিহু দিনও এইভাবেই শুরু হয় পরস্পরের আদান-প্রদান ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়া-আসার মাধ্যমে। বিহু-উৎসব মুখ্যতঃ ভোজন ও আনন্দের উৎসব।

(২) ভোজ

(৩) উপহার

লোকনৃত্য আসামীদের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মসূচীর একটি প্রধান অঙ্গ। বোহাগ-বিহুতে এই নৃত্য বহুল পরিমাণে আয়োজিত হয় প্রতিটি গৃহে। এই বোহাগ-বিহুর আগমনে মানুষ আবার জীর্ণতা-দীর্ণতার খোলস ছেড়ে নতুন মানুষ হয়ে ওঠে। অসাধারণ উদ্যম আর অনন্যপূর্ব প্রেরণা পায় নৃত্যের তালে তালে নিজের অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে দেবার। আদিগন্তপ্রসারিত মাঠ, প্রবীণ বটবৃক্ষের ছায়াতল, বাঁশঝাড় বা আমবনের সুনিবিড় শীতল আচ্ছাদন, যেখানেই হোক আসামীরা শুধু পরিতৃপ্তিভরে নেচেই চলে। ঢোল বা ঢাকের আনন্দবিষাদবিজড়িত অভ্রভেদী শব্দ মনের উপলব্ধিটাকে ক্ষণেকের তরে অপূর্ব এক আস্বাদনে কাঁপিয়ে তোলে। শরীর আর ইন্দ্রিয়—এ-দু'টির স্পর্শকাতরতা যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে বিরহী প্রাণের ব্যথা-উথলানো করুণ বাঁশী। যুবতীহৃদয়কে অসম্ভব জোরে ঝাঁকুনি দেয় বাঁশীর এই গুমরানি। যুবক বা যুবতী এ-বাঁশীর মস্থণ লয়ে যেন আকৃষ্ট হয় একে অপরের দিকে। কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তোলে স্বপ্নমধুর ভাবী বাসরের দিনগুলি। বনগীত বা বিহু-গীত সহসা কিশোর-ফুলের কুঁড়িটাকে ফুটিয়ে তুলে ধরে অনাস্বাদিত যৌবনের কাছে।

লোকনৃত্য

মানবসভ্যতার মতোই অতি প্রাচীন এই নৃত্যের ইতিহাস। যুগে যুগে সমাজ এই নৃত্যশিল্পের উন্নয়নকল্পে উৎসাহ প্রকাশ করেছে। শিল্পের ইতিহাস ও মানবকল্যাণের উন্নতি—দু'টিই অঙ্গাঙ্গী-জড়িত; শিকারের যুগে নাচ নিশ্চয় যুদ্ধের পরিবেশের পরিচায়ক। শিল্প-বিষয়ক মন্তব্যাদি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শিল্পের মূল উদ্দেশ্য উৎসব। আচারনিষ্ঠ যুগের পণ্ডিতদের মতে, উৎসবের পিছনে শিল্পের যাদু থাকা সমীচীন। ক্রমবিবর্তনশীল মানবসংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে' চাষীরা চিরঞ্জীব করে রেখেছে এই নৃত্যশিল্পকে।

বিহু-নৃত্য ও মানবসভ্যতা

বিহু-নাচ চাষী ও পশুপালকদের অভিজ্ঞতানির্ভর চিরাচরিত রীতি। এই বিহু-নৃত্যের মূল উদ্দেশ্য শস্য পশু বা নারীজাতির উৎপাদনী শক্তি-সঞ্চারের প্রতি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, 'কৃষি ও পশুপালনের যুগে শস্য গো-মহিষ ও স্ত্রী-সম্প্রদায়ের প্রজননী শক্তির উপর লোকেরা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করত।' যেহেতু সর্বদা প্রয়োজনমতো বা আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, আদিবাসীরা তাই এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে ভগবানকে কিছু উৎকোচ দিত। লোকনৃত্যের উদ্দেশ্য ও রকম প্রতীকভাবাপন্ন। প্রাচীনকালে লোকেদের দৃঢ়মূল ধারণা ছিল যে, ক্ষেত-খামারে নাচের আয়োজনে উৎপাদনী-দেবী সুপ্রসন্না হন। সহযোগিতামূলক সামাজিক প্রচেষ্টার ফলে তাদের সমস্ত শিল্প ও উৎসব সম্ভবপর হয়ে উঠেছে।

বিহু-নৃত্যের উদ্দেশ্য

মানুষের খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে শারীর-উদ্ভিদবিদ্যা ও গতিশীল অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মানুষ বাঁচার তাগিদে আগের দিনে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র থাকত। নানাবিধ প্রতিকূলতা মানুষকে দীক্ষা দিল ঐক্য ও সমন্বয়ের মন্ত্রে। অতঃপর অর্থনীতির বনিয়াদ সুদৃঢ় করায় প্রয়াসী তাদের যৌথ চেষ্টা এক নতুন একক-সমাজের ছাপ গেল রেখে। এই সমাজের ভিতর দিয়ে গড়ে' উঠল নতুন কৃষ্টি, নতুন সভ্যতা। বিহু-সংগীত ও নৃত্যকে এই প্রতীকাত্মক উপায়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা ক'রলে এই চরম সত্যই সমধিক প্রকটিত হয়।

অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাব ও সহযোগিতা

ভারত ও ব্রহ্মদেশের সীমান্তে অবস্থিত কন্যক-নাগারাও বিহুর মতো বসন্ত-উৎসব করে। নগ্ন-নাগারা বলে, 'প্রিয়াকে যেভাবে প্রিয় আলিঙ্গন করে, সেভাবে মৃত্তিকা আপন জঠরে টেনে নিক সদ্য-বীজ।' প্রকৃতপক্ষে এই উৎসবের পরেই আসে বর্ষা। প্রকৃতি তখন নিজেকে গাছের শীষে ফলে বিকশিত করে' স্মিত অধরে দোলে। বিহু-উৎসবের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য কিশোর-কিশোরীদের মনে ভাববৃত্তির উন্মেষ করা। বন-গীত ও বিহু-গীতের সুমিষ্ট তানে যুবতীহৃদয়ে ডাকে আবেগের বান। এই সময়ে তারা মনের মানুষ খুঁজে নেয় নৃত্যরত যুবকদের মাঝখান থেকে। এই নৃত্যে যুবতীরা তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব দুলিয়ে পুরুষের চিত্তকে' আত্মহারা করে তোলে। যেদিন কিশোরী তার বক্ষোদেশ রক্তাক্ত কাপড়ে ঢেকে দেয়, সেদিন এটা স্থির হয় যে, কিশোরীর দেহে এসেছে যৌবন। আর বিহু-দিবসেই প্রথম লাল কাপড়ে দেহাবৃত করে নবযৌবনপ্রাপ্ত সদ্য-যুবতীরা। নতুন যৌবন পাওয়া পুরুষের কামনাতেও ছড়িয়ে পড়ে উগ্র আগুন। এই উৎসবের দিনে অনেকে প্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়। জাত-কৌলীন্যের কঠোরতা বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না এ-দু'টি হৃদয়কে। সাধারণতঃ পণ দিতে হয় মেয়ের বাবাকে। জামাইকে পলায়নের জন্যে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ অর্থ দিতে হয় অথবা স্ত্রীর বাপের ঘরে আজীবন কাজ করতে হয়। এই পর্যায়ে যুবতীর প্রণয়প্রার্থী যুবকের প্রতি সেই সাবধানবাণীটি উল্লেখযোগ্য।

কামনার আবেদন

'বিহু মাৰিথাকোতে পেলুওয়াই
নিনিবা ভৰিব লগিব ধান।'

মধ্যযুগের ফরাসী সংগীতের মতোই কামনা ও ভালবাসা উদ্রেককারী বিহু-সংগীতের ঐ ভাবালু স্বরধ্বনি। এরা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত, সৌন্দর্যরসাভিষিক্ত। অধিকন্তু অষ্টোত্ত-স্থির ভাষায় সরল মরমীয়া স্বাদসমৃদ্ধ। বিহু-সংগীতের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে উপমা ও অন্যান্য অলংকার-প্রয়োগের কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি, বিহু-সংগীত প্রতীকাত্মক ভাব ও শব্দ প্রয়োগের প্রসাদে গরীয়ান্। রবার্ট বায়ন্স্-এর উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, 'বিহু-সংগীতের

বিহু-সংগীতের বৈশিষ্ট্য

অন্তর্নিহিত ভাবপ্রয়োগ ইংরাজি কবিতা ও অন্যান্য দেশের কবিতার প্রতীকাত্মক ভাবের গূঢ়ার্থব্যঞ্জক প্রয়োগের অনুরূপ। পুনশ্চ, বিহু-সংগীতের কয়েকটি গানের কলিতে প্রেম বা প্রীতির কতকগুলি বিশেষ গুণের কথা উল্লিখিত হয়েছে : যেমন,—

'পিৰীতি নভাগে পিৰীতি নিছিযে
পিৰীতি না যাই অই পৰি।
যিমানে খুয়াবা সমানে মেৰে খাব
পিৰীতি প্ৰেমৰে যৰি।'

—এই চরণ-ক'টি ভালোবাসার মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যারই একটি সার্থক চিত্রকল্প। ভালোবাসা প্রকৃতই আকর্ষণের সূত্র। এ-সূত্র কদাপি ছিঁড়ে যেতে পারে না। তাই বিহু-সংগীতের মধ্যে দিয়ে প্রেমিকাকে বলে, 'দিম্ দেখা স্বপনত্ যদি থাকো নীলগত্ থিথকাত্ দেখিবা ছইয়া।' অর্থাৎ কবিগুরুর ভাষায়—'যখন তুমি থাকবে না তখন-ও তুমি থাকবে আমার গানে।' আসামীরা একাধারে যেমন এই উৎসবের নবযৌবনের উন্মাদনাকে কামনার অঙ্গারে জ্বালিয়ে তোলে, তেমনি ওরা প্রেমের পবিত্রতাকেও যথাযথ স্থান দেয় ওদের জীবনদর্শনে। তা নইলে কি করে ওদের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়—প্রেম মন নিয়ে সে কদাপি দেহাশ্রয়ী হয় না—'বহনা নেথাকে গাত্'। তাই ওরা বলতে পারে, 'পৃথিবীত্ ঝিলিকে আমাৰে ময়না তাতো কই এ ভেৰি কেৰা' অর্থাৎ, মেঘের কোলে চাঁদ বা নীল আকাশে তারার চেয়েও পৃথিবীতে প্রিয়ার প্রেম সমুজ্জ্বল। তা ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পবিত্র বলে' ঘোষণার জন্যে চাকরির উদ্দেশ্যে স্বামীর শহরে চলে যাবার পর স্ত্রীর কাছে শোনা যায় 'ছৰকাৰী কামত্ চেনাই বন্দী হল, তপনী নাহে অয়্ ৰাতি'। বিচ্ছেদব্যথায় ব্যাকুলতা তাকে নিশীথে সুপ্তিমগ্ন হতে দেয় নি,—এটাই হচ্ছে উদ্ধৃতিটুকুর অনুবাদ। রিহা বা বুকের অঞ্চল সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের যৌবন-পরিস্ফূর্তিরই ঘোষক। বাঁশের প্রয়োগও সমতুল। এ-তুটি বিহু-উৎসবের প্রধান লক্ষ্য ঐ জননক্ষমতার উত্তেজনারই (procreative urge) সূচক। পুনরায় ডিমের নাচ বা যুদ্ধ এবং ঝিনুকের ক্রীড়া ইত্যাদির মহিমা প্রকৃতি ও মানুষের যৌবনপ্রচারে। সাধারণ ক্ষেত্রে মানুষের প্রজননী ক্ষমতাবর্ধনে এই তু'টি পরম সহায়ক। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে, 'মানুষের জন্মদান ক্ষমতার পরিবৃদ্ধি ক্ষেত্রের উর্বরতারই নামান্তর।' প্রাচীন মিশরেও এ-ধরণের প্রচলিত অনুষ্ঠানের প্রাতুর্ভাব ঘটেনি। বিহু-উৎসবের আর একটি বিশেষ অঙ্গ মেয়েদের লাল কাপড়-বোনা। ঐ লাল উর্বরতার প্রতীক।

আদি সভ্যতার নিত্য-সহচর ঐ কামবৃত্তি—নারীদেহে পুরুষজীবনের সর্বার্থ-লাভ—আজও আসামীদের মধ্যে বিদ্যমান। তাও একটু উৎকট ও উগ্র লালসারই।

**মাঘ ও কাতি-বিহু**

আদিমানুষের কামসর্বস্ব প্রেমগাথা—বিহুর প্রতিটি স্তবকে কামনার উগ্রবহ্নি দাউ দাউ করে' জ্বলে—আর এর দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নেই বিহু-সংগীতে। একই গতানুগতিকতার আদিবাসীরা নিজেদের জ্বালিয়ে

দের ধানকাটার শেষে হাড়-কন্‌কনে শীতে প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে উদ্‌যাপিত মাঘ-বিহুতে। তবে আত্মরক্ষার সামগ্রী আগুন থেকে আধুনিক নব্য সভ্যতার উদ্ভব। অতি-ফসল-পাওয়া-জনিত আনন্দমুখর এই অনুষ্ঠান সত্যই প্রাচীন অনার্য সভ্যতারই ধ্বংসাবশেষ। শূন্য দিগন্তের বুকে এই আগুন নিয়ে মাতামাতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে শীতের দিনে অধিক মহিমান্বিত করে বৈকি! আয়োজনের তুলনায় সবুজ প্রান্তরের দেবীর কার্তিক মাসের উপাসনা বা কাতি-বিহু কম গুরুত্বব্যঞ্জক। তবে সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মীকেই আলো জ্বালিয়ে অর্চনা করা হয় এ-বিহুতে।

বিহু-নৃত্যে অষ্ট্রো-এশিয়ার কৃষ্টি ও সভ্যতা প্রভাবান্বিত একটি মধ্যযুগীয় অপেক্ষাকৃত প্রগতিবাদী সংস্কৃতির সার্থক চিত্র পাই। জাভা, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, চীন প্রভৃতি দেশেও অদ্যাবধি একই কায়দায় অনুষ্ঠিত বসন্তগীতি, বন-বন্দনা, সবুজ প্রকৃতিকে আরাধনা থেকে উল্লিখিত সত্যই প্রমাণিত হয়। বৈষ্ণবধর্ম প্রভাবান্বিত এই আঞ্চলিক সভ্যতার অধিকারী প্রতিটি মানুষের গানে প্রতিটি নৃত্যে যে যৌবনের অদ্ভুত ব্যাখ্যান পাব, তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে কিনা, ভোগের নিরিখে অণুবীক্ষিত এই জাতির জীবনযাত্রায় মেকি আনন্দ ও জৌলুষ আছে বটে—না জানি কতটুকু চিরস্থায়ী পরিতৃপ্তি পায় এতে এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা! 'একমাত্র যৌবনবেদনা সঞ্চার করা লক্ষ্য হলেও' (হ্যালডেন ও হাক্সলির মতে), যৌবন-আবেদন সীমিত রেখা ছাড়িয়ে যেতে পারে না। (১) শুধু মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, বা (২) সমান সমান স্ত্রীপুরুষের বা (৩) বিভিন্ন দলে স্ত্রীপুরুষের বা (৪) মিশ্রিত দলের নৃত্যে সর্বদা যৌবন-উন্মাদনা জাগে যদিও কদাপি হাত ধরাধরি করে' বা কাছে এসে নাচে না কেউই। ঢাক, মাহার, সিঙ্গার, পেপা, হাততালি তাদের নৃত্য বা সংগীতের উপকরণ।

বিহু-নৃত্যের বৈশিষ্ট্য

জানি না, কোন্ আদিকালে বর্ণসংকর এই আসামী সভ্যতার কোন্ কবিযশস্বী-নিঃসৃত এ বিহু-সংগীত! সনাতন সত্য আর জীবনসত্য ও অভিজ্ঞতানির্ভর এ-সব কবিতা আজও সভ্যজগতের কাছে একটি বিস্ময়! আঙ্গিকে বলার অপূর্ব ভঙ্গীতে, সর্বোপরি সংগীতের উপযুক্ত স্থানে যথাযথ প্রয়োগ সত্যই মনোমুগ্ধকর ও আদিবাসীদের কবিতারসবোধের অনবদ্য স্বাক্ষর। আসামীজীবনের জীবনবোধ অসাধারণ। সূক্ষ্ম বস্তুচেতনাসমৃদ্ধ পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত-বর্ণিত এই বিহু-সংগীতলহরীর প্রতিটি চয়ন প্রশংসার দাবি রাখে। ভারতবাসী আজও এগুলির সম্বন্ধে অতি-সচেতন ও অবহিত নয়। তাদের এবিষয়ে অবগতি ও উৎসাহবোধের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে ভারতের প্রাচীন সুমহান্ ঐতিহ্য পর্যালোচনার ব্যাপারে। কবির কবিতা কভু ব্যর্থ হয় না। একদিন বিদেশীয়দের মতো ভারতীয়েরাও এই পিছিয়ে-পড়া দেশের কথা স্মরণে আনবে শুধু বিহু-সংগীতেই মুগ্ধ হ'য়ে।

পরিশেষ

# ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

বহুবাঞ্ছিত স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের জাতীয় সরকার গণদেবতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিয়া সমগ্র জাতিকে বিশ্বসভায় যথোচিত স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার যে কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহারই মধ্যে পড়ে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, তখন বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর সভাপতিত্বে একটি 'জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি' গঠিত হয়। নানা কারণে বিদেশী ব্রিটিশ সরকার এই সমিতির সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বোম্বাই প্ল্যান' ( Bombay Plan )-এর উদ্ভব হয়; কিন্তু তাহাও ফলপ্রসূ হয় নাই। পরিশেষে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারত-সরকার শ্রীনেহেরুর সভাপতিত্বে একটি 'পরিকল্পনা কমিশন' গঠন করেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে উক্ত কমিশন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করেন এবং উহাই ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই ডিসেম্বর তারিখে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল ছিল ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু হইয়াছে। প্রতি পাঁচ বৎসর ব্যাপিয়া কার্যকাল স্থির করিয়া আর্থিক উন্নতির শিখরে না পৌছানো অবধি এইরূপই চলিতে থাকিবে।

**ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্মেতিহাস**

দেশের ব্যাপক নিরক্ষরতা, ব্যাধি, অনাহার, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি দূরীকরণের মহান্ ব্রত লইয়া কল্যাণকামী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যে বিভিন্নমুখী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রধান সাতটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে :—(১) কৃষি ও সমাজ-উন্নয়ন; (২) সেচ ও জলবিদ্যুৎ; (৩) পরিবহন ও যোগাযোগ; (৪) বৃহদায়তন শিল্প; (৫) শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ; (৬) পুনর্বাসন; (৭) বিবিধ। কৃষি ও সমাজ-উন্নয়ন শাখায় কৃষিনীতি পরিবর্তন, জমিদারী প্রথার বিলোপ, জমিবণ্টন, সার ও বীজ সরবরাহ, সমবায়প্রথার প্রসার সাধন প্রভৃতি আছে। সেচ ও জলবিদ্যুৎ শাখায় আছে জলসেচ, বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন কুটির শিল্পোন্নয়ন, মৎস্যচাষ, বনীকরণ, মৃত্তিকা-সংরক্ষণ, পতিত জমি উদ্ধার প্রভৃতি বহুবিধ কার্য। দামোদর, বোকরা, নাঙ্গল, মোর, হীরাকুন্দ প্রভৃতি পরিকল্পনাও ইহার অন্তর্গত। পরিবহন ও যোগাযোগ শাখায় আছে রেলওয়ে সম্প্রসারণ, রেল ইঞ্জিন নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, বন্দর নির্মাণ, বিমান কোম্পানীগুলির জাতীয়করণ, বিমানপথ সম্প্রসারণ, ভারতের সর্বত্র কাঁচা ও পাকা রাস্তা নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাম ও ডাকব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার প্রভৃতি। বৃহদায়তন শিল্পশাখায়

**পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যক্রম**

আছে লৌহ, ইস্পাত, খনিজ তৈল, সিমেণ্ট, সার, ভারী রসায়নদ্রব্য, সুরাসার ও য়্যালুমিনিয়ম প্রভৃতি। শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ শাখায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতির জন্য নূতন বিদ্যালয় ও নূতন হাসপাতাল স্থাপন প্রভৃতি। পুনর্বাসন শাখায় আছে উদ্বাস্তুদের বাসগৃহ, অন্নসংস্থান, কর্মসংস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা। পল্লী উন্নয়ন বা সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধানতম অঙ্গ।

জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। ইহাতে বলা হইয়াছিল, "জনগণের জীবনধারণের মান উন্নয়ন এবং তাহাদিগকে উন্নততর ও বৈচিত্র্যময় জীবনযাপনের সুযোগ প্রদান ভারতে পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই ভারতের জনবল ও সম্পদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োগ এবং আয়, ধন ও সুযোগের অসাম্য হ্রাস করিবার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে।" অতএব, ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনবৃদ্ধি, জনগণের ক্রয়ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং সুসমঞ্জসীভূত বণ্টনব্যবস্থা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল নীতি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও মূল নীতি

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যখন গৃহীত হয়, তখন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মত ভারতেও মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অত্যন্ত প্রকট ছিল। খাদ্যসমস্যাও ছিল ভয়াবহ। শ্রম-শিল্পের ক্ষেত্রে অব্যবস্থা, শ্রমিক-বিরোধ, কাঁচামাল সংগ্রহের অসুবিধা, যন্ত্রপাতি আমদানীর অনিশ্চয়তা প্রভৃতিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে বর্তমানে দামোদর ও ময়ূরাক্ষী উপত্যকা, শতদ্রুর পরিকল্পনা, চিত্তরঞ্জন সিন্দ্রী প্রভৃতির রূপায়ণ, টাটা ইণ্ডিয়ান আয়রন প্রভৃতির সম্প্রসারণ, বিশাখাপত্তমে নৌনির্মাণ শিল্পের ও হিন্দুস্থান বিমানকেন্দ্রের অগ্রগতি, বহির্বাণিজ্যের উন্নতি, বিনিয়ন্ত্রণের ব্যাপকতা, শিল্পোৎপাদনের সমুন্নতি প্রভৃতি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য সূচিত করিতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমাদের অর্থনীতিতে অনেকটা সবলতা ও স্থায়িত্ব আনিয়া দিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতি ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান

কিন্তু সরকার-পক্ষের আত্মপ্রসাদবাণী বহু-বিঘোষিত হইলেও নানা কারণে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সামগ্রিক ও সর্বব্যাপক রূপ লইয়া সমগ্র দেশবাসীর নিকট উপস্থিত হইতে পারে নাই। বিদেশী শাসনে মৃত জাতির অচেতনতা, সাম্প্রদায়িকতা, বিভিন্ন দলের স্বার্থচিন্তা ও দলাদলি, নিম্ন জীবনমান, অশিক্ষা প্রভৃতি নানা কারণে সার্থক সম্ভাবনার স্বপ্ন ব্যর্থ হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনের নিরিখ অতিক্রান্ত হইলেও মূল সমস্যাসমূহ অব্যাহতই রহিয়াছে। বেকার-সমস্যা ও উচ্চমূল্য স্তরের তারতম্য ঘটে নাই, পরন্তু বিপরীত আকারই পাইয়াছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি যথাযথভাবে কার্যকরী না করা এবং পরিকল্পনা-প্রণয়নে বাস্তব জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অভাবই এই ব্যর্থতা আনিয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতা

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় পরিকল্পনা-কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করেন। অবশ্য ইহার পূর্বে ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে অধ্যাপক পি. সি. মহলানবীশের খসড়া পরিকল্পনাটি ও অর্থমন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিভাগ ও পরিকল্পনা-কমিশনের অপর একটি পরিকল্পনা রচিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা চারিটি মুখ্য নীতি লইয়া গঠিত : (ক) জীবনযাত্রার মান যাহাতে উন্নীত হয় তাহার জন্য জাতীয় আয় (national income) বৃদ্ধিকরণ; (খ) দ্রুত শিল্পায়ন, বিশেষতঃ অধিক পরিমাণে বৃহদাকার ও মুখ্য (basic) শিল্পায়তন স্থাপনের চেষ্টা; (গ) চাকরির যাহাতে অধিকতর সুবিধা করা যায় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন; (ঘ) আয় ও সম্পত্তিতে জনসাধারণের মধ্যে যে বৈষম্য রহিয়াছে তাহার দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক শক্তিকে (economic power) সমানভাবে কাজে লাগানো। মোটের উপর, দ্রুত ও সমতাপূর্ণ অর্থনৈতিক সমুন্নতির প্রতি এবার সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্ভব ও মূল লক্ষ্য

উপরের উদ্দেশ্যাদি যাহাতে সফলতায় পর্যবসিত হয় তাহার জন্য সরকার গত পরিকল্পনার তুলনায় এই পরিকল্পনায় অধিক পরিমাণে অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় সরকার হইতে বিভিন্ন খাতে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবার কথা। নিম্নে প্রদত্ত তালিকায় তুলনামূলক ভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে ব্যয়বরাদ্দের পার্থক্যটি সবিশেষ লক্ষণীয় :

দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ

পরিকল্পনাদ্বয়ের বিভিন্ন খাতে ব্যয়বণ্টনের তালিকা

| | প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা | | দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা | |
|---|---|---|---|---|
| | মোট ব্যয় (কোটি টাকা) | শতাংশ | মোট ব্যয় (কোটি টাকা) | শতাংশ |
| ১। কৃষি ও সমাজ-উন্নয়ন | ৩৫৭ | ১৫·১ | ৫৬৮ | ১১·৮ |
| ২। সেচ ও বিদ্যুৎ | ৬৬১ | ২৮·১ | ৯১৩ | ১৯·০ |
| ৩। শ্রমশিল্প ও খনিজ-সম্পদ | ১৭৯ | ৭·৬ | ৮৯০ | ১৮·৫ |
| ৪। পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫৫৭ | ২৩·৬ | ১,৩৮৫ | ২৮·৯ |
| ৫। সমাজসেবা, গৃহনির্মাণ ও পুনর্বাসন | ৫৩৩ | ২২·৬ | ৯৪৯ | ১৯·৭ |
| ৬। বিবিধ | ৬৯ | ৩·০ | ৯৯ | ২·১ |
| মোট একুনে | ২,৩৫৬ | ১০০·০ | ৪,৮০০ | ১০০·০ |

উদ্ধৃত ছকটি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিপুল ব্যয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে শিল্পায়নের উন্নতির জন্য। প্রথম পরিকল্পনাটিতে ছিল মুখ্যতঃ কৃষির উপরেই জোর। আবার বিদ্যুৎ-সম্পর্কিত উন্নতি যদি শ্রমশিল্পপ্রসারের অঙ্গীভূত বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ৫৭ ভাগ শিল্পায়নের ব্যাপারেই লাগিবে। ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন ব্যাপারে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতির দিকেই অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ অল্প ব্যয়ে এই শিল্প চালানো সম্ভব—এবং এখানে অধিক লোক নিয়োগের প্রচুর অবকাশও আছে। একই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগে কুড়িগুণ লোকের চাকরির সংস্থান করা যাইতে পারে এই শ্রমশিল্পে। অধিকন্তু এই শ্রমশিল্পাদির উন্নয়নে বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়া উঠিবে এবং জনগণের মধ্যে আর্থিক দিক দিয়া দুর্বলতর শ্রেণী-সমূহ অতিরিক্ত কাজ করিয়া আয় বাড়াইতে পারিবে।

উভয় পরিকল্পনার তুলনা

অর্থনীতিবিদ্‌রা ধারণা করিয়াছিলেন যে, প্রথম পরিকল্পনায় ১১% হারে জাতীয় আয় পরিবর্ধিত করার সুযোগ আছে। কিন্তু পরিকল্পনাশেষে দেখা যায়, জাতীয় আয় শতকরা ১৮৲ হারে বর্ধিত হইয়াছে। আর মাথা-পিছু আয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও শতকরা ১১৲ হারে বাড়িয়াছে। এই আশাতিরিক্ত সৌভাগ্যের ফলে পরিকল্পনা-কমিশন ধারণা করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উল্লিখিত আয় যথাক্রমে শতকরা ২৫৲ ও ১৮৲ হারে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। পূর্ববর্তী তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয় পরিকল্পনা সফল হইলে আমাদের অর্থনৈতিক ও জাতীয় জীবনের উন্নতি অনিবার্য। যে-দেশে যত বেশি জাতীয় আয়-জনিত সঞ্চিত-অর্থের বৃদ্ধি ঘটে সে-দেশ তত উন্নত!

দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও জাতীয় আয়

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেকার-সমস্যা সমাধানের দিকটি অত্যাধুনিক সমাজতান্ত্রিক রুচিসম্মত ভারতের যুক্তিবাদিতার স্বাক্ষর। বেকার দূর করিবার ব্যাপারে যে সরকারেরই বেশি দায়িত্ব ও কর্তব্য, এ-বিষয়ে ভারত সরকার সজাগ দৃষ্টিরই পরিচয় দিয়াছেন। এই পরিকল্পনার গোড়ার দিকে এ-দেশে বেকার-সংখ্যার হার ছিল ২.৫ লক্ষ নাগরিক কর্মী ও ২.৮ গ্রাম্য বা আঞ্চলিক শ্রমজীবী। প্রতি বছর আমাদের দেশের জনসংখ্যায় বেকার ২ লক্ষ হারে ক্রমবর্ধমান। অতএব, পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে পরিকল্পনার শেষের দিকে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের ভিতর মোট পনেরো লক্ষ লোকের চাকরির উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া শ্রমিকের অবনিয়োগ (underemployment) তো আছেই। কিন্তু বিভিন্ন যোজনায় (projects) ক্রম-

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেকার-সমস্যার সমাধান

সংগত উপায়ে কর্মী-নিয়োগ ঘটিলে মোট আট লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থান হইতে পারে শুধু শ্রমশিল্পেই। আর চাষেও ১·৬ লক্ষ লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট বাড়্‌তি লোকের কি হইবে, এ-ব্যাপারে সরকারী নীতি দুর্বোধ্য। তাহা ছাড়া দেশে আর্থিক দৈন্যের যে স্রোত বহিতেছে তাহাতে সরকারকে অনেক কাজ বাদ দিতে হইবেই। বেকার জনসংখ্যার বেকারী ঘুচিবে কিনা এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা ১৯৫৫-৫৬ সালের বরাদ্দ থেকে শতকরা ১৫% হারে খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধির একটি উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছে। বর্তমান অর্থমন্ত্রী মোরারজী

খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন

দেশাই ১৯৫৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক বেতার সাক্ষাৎকারে ওয়াশিংটনে বলেন, "যদিও সম্প্রতি আমাদের দেশে খাদ্যসংকট দেখা দেওয়ায় বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইতেছে, তবু দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। তখন দেশে আর খাদ্যশস্যের সংকট থাকিবে না।" দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যদিও পূর্বাপেক্ষা বেশি ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে কৃষি-খাতে, তথাপি পরিকল্পনার ব্যয়ের অনুপাতে এ-বরাদ্দ বাড়ে নাই। সরকারের অপেক্ষাকৃত কম নজরই দেখা যাইতেছে এই বিষয়ে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যকর গৃহনির্মাণ ও সুখে-সমৃদ্ধিতে বাস করিবার নিমিত্ত সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার মনোনিবেশ করিয়াছেন অধিক

সামাজিক কল্যাণপ্রদ কর্ম

পরিমাণে। অসুস্থ অনাহারক্লিষ্ট জীবন দিয়া যে গণতান্ত্রিক উপায়ে অভিনব সমাজব্যবস্থা (social order) সম্ভবপর নয়, একথা পরিকল্পনা-কমিশন অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন। তদুপরি ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকদের যাহাতে অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা দেওয়া হয় তাহারও এক ব্যবস্থা আছে।

প্রথম পরিকল্পনা জনসাধারণের সহানুভূতি পাইবার জন্য অধিক দৃষ্টিনিবেশ করিয়াছিল শহর ও গ্রামের স্থানীয় অধিবাসীদের মঙ্গল ও অগ্রগতির দিকে। এই পরিকল্পনায়

শহর ও গ্রামের সমতাপূর্ণ উন্নতি

শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে আপন আপন জনবসতির উন্নতির কার্যে সহযোগিতার উপর গভীর গুরুত্ব আরোপিত হয়। ইহা ব্যতীত শহর ও গ্রামের সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতি চিরদিন অসম্ভব হইয়া থাকিবে। সমাজতন্ত্রবাদী গণতান্ত্রিক ভারত সরকারের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে স্থানীয় লোকেদের সম্প্রীতিপূর্ণ জীবন প্রস্তুত করিবার এই যে প্রয়াস, ইহা জনসাধারণকে সমান মান, সমান মর্যাদা ও সমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা দিবারই পরিচায়ক।

১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্মধারাকে

অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সরকার নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। ইহাতে প্রাক্তন সাধারণ-বিভাগে (public sector) রক্ষিত মাত্র ৯টি শ্রমশিল্প ছাড়াও আরো ২৯টি শ্রমশিল্পকে সরকারের অধীনে আনা হয়। এই নীতি অনুসারে প্রায় বৃহদায়তন শিল্পগুলিই ক্রমে সরকারের আয়ত্তে আসিবে। অবশিষ্ট শিল্পগুলি ব্যক্তিগত থাকিলেও ইহাদের উদ্দেশ্য হইবে সাধারণের হিত। 'They should have public purpose'—এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে ভারতকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্রগঠনে আরও কিছুটা আগাইয়া দিল।

সরকারের নূতন শিল্পনীতি

প্রধান মন্ত্রী নেহেরুর মতে, সর্বাঙ্গীণ ভাবে বিচার করিলে সমাজতান্ত্রিক রূপ সফল করিয়া তোলাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য। উচ্চতর আয়সম্পন্ন জনগণের নিকট অধিকতর স্বার্থত্যাগের দাবি উপস্থাপিত করিয়া ও নিম্নতর আয়সম্পন্ন দরিদ্র জনগণের জীবনে অধিকতর নিরাপত্তা ও সেবা প্রতিফলিত করিয়া একটি সমভোগাত্মক সমাজগঠনই দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। প্রধান মন্ত্রী যেমন ভাবগত দিক দিয়া কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্টবিরোধী বিপরীতমুখী মতদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটি পথ খুঁজিয়া সামঞ্জস্য রক্ষায় সচেষ্ট, তেমনি শহর-পল্লীর বৃহদায়তন শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের, এবং সরকারী ও বেসরকারী শিল্পোদ্যমের মধ্যে সংগতি রাখিয়া চলিতে ইচ্ছুক।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে শ্রীনেহেরু

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় করার নিমিত্ত যে অর্থের প্রয়োজন তাহার প্রাপ্তি-সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান। আমরা এখন বুঝিতেছি, এই পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে যাইয়া কি ভাবে জনসাধারণ করভাবে নিষ্পেষিত হইয়া পড়িতেছে। দেশে কি পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তাহার কথা বিবেচনা না করিয়াই পরিকল্পনাকারীরা ব্যয়ের এক প্রশস্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। শ্রী এ. ডি. গরওয়ালার অভিমতে, 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি শুধু একটি খরচের হিসাব'। ১২০০ কোটি টাকার বাজেট্ ঘাট্তির যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা মিটাইতে এখন বিদেশী সরকারের কাছে শুধু ঋণই করিতে হইতেছে। তদুপরি, বৈদেশিক মুদ্রার হ্রাসজনিত আমদানী-রপ্তানীর সংকোচ ও টাকা উৎপাদনে অন্তরায়-সৃষ্টি এক্ষণে আমাদের অর্থমন্ত্রীকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। আমাদের এই বিদেশী মুদ্রাসংকটে সরকারের রেশম বয়নশিল্পের উৎপাদনহ্রাস ঐ সমস্যাটিকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। সূতা ও তাঁতশিল্পের দ্রব্য রপ্তানীবন্ধের ফলে সরকার বিদেশী মুদ্রা ও ষ্টার্লিং হইতে কিছুটা বঞ্চিত হইয়াছেন—কারণ এই শিল্পদ্রব্য অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এই বিষয়ে সরকারের পুনর্বিবেচনা প্রয়োজনীয়। প্রাক্তন অর্থসচিব জেদ করিয়াই বলিতেন, "আমরা ঋণে ডুবিয়া যাইব, তথাপি পরিকল্পনা

সমালোচনা

সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিব এবং পরিকল্পনার কোন অংশকেই বাদ দিব না।' কথা অতি সত্য। পরিকল্পনার প্রথম অধ্যায়ে যদি আমরা শুধু কর্তন ও আংশিক সফলতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করি, তাহা হইলে সরকারের অর্থনীতিতে জনসাধারণের আস্থা থাকিবে না। আবার ঘাট্‌তি বা অর্থাভাবের প্রকটতাজনিত বিপদের ভয় গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সমীচীন পদ্ধতি নয়।······একথা সত্য যে, নিদারুণ অর্থ-সংকটের মধ্য দিয়া আমাদের আরও প্রায় দুই বছর অতিবাহন করিতে হইবে। ইহার একমাত্র কারণ দেশের বিত্ত ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের অজ্ঞতা। এই জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের একদল বিশেষজ্ঞ আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে 'অতি-উচ্চ আশাবাদী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এদেশের করব্যবস্থা (Tax policy) গবেষণা ও অধ্যয়ন করিয়া কিছু দিন পূর্বে অধ্যাপক কেল্‌ডর বলিয়াছেন, "বাড়্‌তি ১২৫০ কোটি টাকা কর যদি পাঁচ বৎসরের মধ্যে তোলা না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা পূরণ হইবে না। ইহার কর-চাহিদা (tax requirement) হইতেছে : (১) ৪৫০ কোটি টাকা ; (২) ৪০০ কোটি টাকা অভাব (gap) ; আর (৩) (Deficit financing) বা ঘাট্‌তি অর্থ-সরবরাহের ১২০০ কোটি টাকার মধ্যে ৮০০ কোটি টাকা পাওয়ার পর আরও ৪০০ কোটি টাকার যে-প্রয়োজন কেল্‌ডরের মতে সেই ৪০০ কোটি টাকা—এই মোট ১২৫০ কোটি টাকা। আমাদের কর-নীতির আমুল সংশোধনের ফলে হয়তো ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বৎসরে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট টাকা ?······" সজাগ অর্থনীতিবিদ্‌দের সামনে ইহাই তো প্রশ্ন। তাই এই পরিকল্পনাকে 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা' বলা চলিতে পারে। সমালোচকেরা আরও বলেন যে, এই পরিকল্পনার বিরাট্ আকারের জন্য খাদ্যদ্রব্যের মুল্য স্থিতিশীল থাকিবে না বলিয়া আশা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ইদানীং দ্রব্যমুল্যবৃদ্ধি এই কারণেই সাধিত হইতেছে। দেশে মুদ্রা স্ফীতির সমুহ সম্ভাবনা আছে ঘাট্‌তি অর্থ সরবরাহের ফলে। কাহারও মতে, ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে এমতাবস্থার সৃষ্টি নাও হইতে পারে, কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এই বদ্ধমুল ধারণা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কার্যকর হইবে কি ?

দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষ পর্যায়

সম্প্রতি-প্রাপ্ত হিসাবে জানা যায়, এই দ্বিতীয় পরিকল্পনার অবশিষ্ট দুই বৎসরের নিমিত্ত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ১৭৫৪ কোটি টাকা লিখিত ভাবে দিতে পারিবেন বলিয়া ধারণা করা যায়। তবে পরিকল্পনার জন্য সম্প্রতি স্থিরীকৃত মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৪৫০০ কোটি টাকায় লইয়া যাইতে হইলে আগামী দুই বৎসরে ২০৩৪ কোটি টাকা খরচ করিতে হইবে অর্থাৎ ২৮০ কোটি টাকা ঘাট্‌তি থাকিবে। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৮ কোটি টাকা ও রাজ্য সরকারদের ৮২ কোটি টাকা ঘাট্‌তির পরিমাণ। এই ঘাট্‌তি পূরণ করিতে হইলে দুইটি মাত্র উপায় বিদ্যমান : প্রথমতঃ, নূতন করধার্য

ও করফাঁকির সর্ববিধ প্রয়াসের পথ অবরোধ; দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণসংগ্রহ ও সঞ্চয়ে তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলা।

তথাপি একথা দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করা চলিবে যে, ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিবার পরিকল্পনা। ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই আমরা এসব কাজে অগ্রসর হইতেছি। তাই আমাদের পরিকল্পনা সুদূরপ্রসারী। ৩৬ কোটি মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য একান্তই যদি আমাদের সাময়িক দুঃখ-দৈন্য সহিতেই হয়, তবু আমাদের বিমুখ হওয়া চলে না। গঠনমূলক সমালোচনা করিয়া সরকারকে নবজাগৃতির পথে সহযোগিতা করাই আমাদের কর্তব্য।

উপসংহার

## ভারতের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা

স্থচনা

ছ'লক্ষ পল্লীসমৃদ্ধ এই ভারতভূমি। এদেশের শতকরা ৬৭ জন লোক বাস করে গ্রামে। একথা সকলেরই জ্ঞাত যে, গ্রামের অধিকাংশ লোকই চাষবাসের উপর নির্ভরশীল। অতএব, সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ও ভারতীয় কৃষ্টি-সভ্যতার ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের যে-কোন পরিকল্পনা এই গ্রামগুলিকে বাদ দিয়ে চলে না। রবীন্দ্রনাথের মতে, সমস্ত শরীরের রক্ত এসে যদি মুখমণ্ডলে পুষ্ট হয় তাকে যেমন স্বাস্থ্য বলা চলে না, তেমনি শুধু নাগরিক সভ্যতা দিয়ে একটা জাতির সভ্যতা বা সংস্কৃতির বিচার পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। কবিগুরুর যুক্তিটি অতীব যুগোপযোগী। অর্থাৎ পল্লীকেন্দ্রিক ভারতের উন্নতি ও ঐশ্বর্যের কথা ভারতীয় গ্রামগুলির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। ভারতকে যদি সর্বোৎকৃষ্ট করে' তুলতে হয়, তা'হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিরক্ষর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামগুলিকে সঞ্জীবিত করে' তোলা। বর্তমান শোচনীয় পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যে কোন উন্নতি সম্ভব, এ-বিষয়ে কল্যাণকামী ভারতবাসী মাত্রেই সন্দেহ প্রকাশ করে। আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে যদি ভারতকে সমতালে পা ফেলে চ'লতে হয়, তা'হলে আধুনিক বৈদ্যুতিক প্রণালীতে, সমবায় প্রচারভিত্তিতে কৃষি-স্বাস্থ্য-শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিপ্লব আনতে হবে। অর্থনৈতিক পটভূমিতে এ-সব উপায়ে যদি ভারতের পল্লীতে পল্লীতে নব জাগরণ না ঘটে, তবে ভারতের ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্তভাবেই তিমিরেই।

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ও ঐতিহ্য

সমাজ-উন্নয়ন একটা রীতি যার মধ্য দিয়ে আমরা ভারতের পল্লীসমাজের উন্নতি কামনা করি। এটা মূলতঃ একটি গণ-আন্দোলন অথচ সরকারকে এ-আন্দোলনে নেতৃত্ব করতে হয়। ভারতের পল্লীগুলির জনসাধারণের ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত মঙ্গলসাধনের মহান্ ব্রত নিয়ে ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবরে নির্বাচিত বিশেষ বিশেষ ৫৫টি কেন্দ্রে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটি কেন্দ্র ২ লক্ষ জনসাধারণ-

সমন্বিত ও ৫০০ বর্গমাইল-বিস্তৃত ৩০০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। পরিকল্পনাটি এটোয়ার 'সম্প্রসারণ' নীতির সাফল্যসূচক ও সম্পূরক। সমাজ-উন্নয়ন কথাটি যদিও নতুন, তবু এর ভাব বা আদর্শ প্রাচীনকালের বর্ণাশ্রয়ী সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত। প্রাচীন কালের গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ গ্রামগুলিতে ছিল বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের দেনা-পাওনার ভূমিকা। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক সভ্যতায় গ্রামের ঐ স্বয়ং-সম্পূর্ণ অবস্থা আজ বিপর্যস্ত। গণতন্ত্রের বাস্তব প্রতিষ্ঠার তাগিদে গণসংযোগ একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা ও স্বাধিকার-চেতনা সম্বন্ধে সজাগ করাতেই সুপ্ত আছে গণতন্ত্রের বীজ। আর সেটা কেবল গ্রাম্য ও নাগরিক সভ্যতার যৌথ উন্নতি ও বিস্তারের ফলে সম্ভব।

ইতিহাস

শিল্পবিপ্লবের আগে ভারতে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সমাজের গঠন মূলতঃ প্রায় একই রকমের ছিল। গ্রামবাসীদের নিয়েই সমাজ গড়ে' উঠেছিল—শুধু কয়েকটি শহর দেখা যেত এখানে-ওখানে। পল্লী-অঞ্চলে কৃষি-কাজই ছিল জনসাধারণের আহারের একমাত্র সংস্থান। কারিগরের দলও কৃষকদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ ক'রত। শিল্পবিপ্লবের পর ভারত কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অন্যান্য দেশগুলি থেকে। ফলে আবির্ভাব ঘটে এক নতুন শ্রমিকগোষ্ঠীর—এরা এদের সাথে নিয়ে এল আনুষঙ্গিক কদাচার ও কুপরিবেশ। ...কিন্তু আকস্মিকভাবে বিদেশী শাসকের লোলুপ দৃষ্টি এড়াতে পারেনি ভারত। শ্রমবিপ্লব হ'লেও এদেশের কাঁচামাল যেতে লাগ্‌ল বিদেশের কলকারখানার খোরাক যোগাতে। কারিগরি বিদ্যায় পেছিয়ে পড়ল ভারতবাসীরা। চাষ-বাসকেই আবার আঁকড়ে ধরতে হ'ল তাদের। তাদের জীবনযাত্রা এত অবনতির খাদে নেমে এল যে, শিক্ষালোক পাওয়া বা বেঁচে থাকার চেতনাটুকু পর্যন্ত তারা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হ'ল। স্বাধীনতা পাবার পর দেশের নেতাদের এজন্যে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই পটভূমিতেই তাদের 'সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা'র কথা মনে উদয় হয়। এই সময়ে উত্তর প্রদেশের এটোয়াতে মেয়ার্স সাহেব 'সম্প্রসারণ' কাজ নিয়ে পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। এ-পরীক্ষার সফলতা এটাই প্রতিপন্ন করে যে, বৃহৎ ক্ষেত্র জুড়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে কৃষি-উন্নতির সমস্যার সমাধান করা যায়। সাধারণের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম সেবা ও শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে' তোলাই মার্কিন সংজ্ঞা 'সম্প্রসারণের' মূলনীতি। যান্ত্রিক ও শিল্পবিদ্যা-প্রদানে সমর্থ এ-ব্যবস্থা প্রত্যেকটি লোককে ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য করতে পারে। পল্লী-অঞ্চলের দ্রুত উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সাহায্যে ইতিমধ্যে কয়েকটি পথ-নির্দেশক পরিকল্পনা শুরু হয়। সমাজ-উন্নয়নের ব্যবস্থা এর পরে

সম্প্রসারণ

প্রচলিত হয়। ভারত-মার্কিন প্রয়োগ-চুক্তির নিয়মমাফিক মহাত্মা গান্ধীর জন্মোৎসব দিবসে ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে প্রথম সমাজ-উন্নয়ন ব্লকগুলির সৃষ্টি হয়।

অনতিকাল পরেই সরকার এ-কাজটিকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার প্রয়াসী হন। স্থির হয় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দেশের এক-চতুর্থাংশ সম্প্রসারণ-ব্লকের মধ্যে আনা হবে। প্রথমেই কোন অঞ্চলকে সমাজ-উন্নয়ন ব্লকে আনা হবে না। দুটি স্তরে কাজ শুরু করা বাঞ্ছনীয়। প্রথম স্তরে, জাতীয় সম্প্রসারণ-ব্লক হিসাবে নানা ক্ষেত্রে উন্নতি করার ব্যবস্থা হবে। যেসব ব্লক কার্যে অধিকতর অগ্রসর, ক্রমে তাদের সমাজ-উন্নয়নে আনা হবে। কয়েক বছর নিগূঢ়ভাবে কাজ করার পর সেগুলোকে পুনরায় আনা হবে সম্প্রসারণ-ব্লকে।

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত করার পদ্ধতি

ক্রমে কাজ আরম্ভ হয় যথাযথভাবে। ভারতের ৬ লক্ষ গ্রাম ও ২৭৪০ লক্ষ গ্রামবাসীর মধ্যে মোটামুটি ৩০ হাজার গ্রাম ও ২ কোটি অধিবাসী প্রাথমিক উন্নয়নের এলাকায় পড়ে। ১০০টি পরিবারে বিভক্ত মোট ৫ শত লোকের বাসভূমি প্রতিটি গ্রামই উন্নয়নের ক্ষুদ্রতম অঞ্চলরূপে গৃহীত হয়। প্রতিটি গ্রামকে সামাজিক ও অর্থনীতির দিক থেকে স্বয়ংপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ১০০টি পরিবারের আপন আপন বৃত্তিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এ-ধরণের ১০০টি স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম নিয়ে এক একটি উপকেন্দ্র এবং ৩টি উপকেন্দ্রের সমবায়ে গঠিত হয় প্রতিটি উপ-উন্নয়নকেন্দ্র বা অঞ্চল। পরিকল্পনার কর্মসূচী দু'টি পৃথক্ পর্যায়ে বিভক্ত হয়। কিন্তু পৃথক হ'লেও পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিদ্যমান। প্রথম ভাগটি—নেহেরু-চেষ্টারবোল্‌স্ স্বাক্ষরিত ভারত-মার্কিন কারিগরি-সহযোগিতা চুক্তির অধীনে। দ্বিতীয় ভাগটি ফোর্ড-প্রতিষ্ঠানের অর্থ-সাহায্যে কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্যদপ্তরের পরিচালনাধীনে। প্রথম ভাগটি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও উপদেষ্টামণ্ডলীর সহযোগিতায় এবং একজন নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রাধীনে পরিচালিত 'সমাজ-উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণমণ্ডলী' নামক সমিতির হাতে অর্পিত হয়। আর দ্বিতীয় ভাগটি সরাসরি ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষিদপ্তরের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি রাষ্ট্রে আবার রাষ্ট্রমণ্ডলীর দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র-উন্নয়ন সমিতিও বিদ্যমান। উন্নয়ন কমিশনার, জেলা উন্নয়ন কর্মচারী, উন্নয়ন-কেন্দ্রগুলির কার্যনির্বাহক কর্মচারী প্রভৃতি রাষ্ট্র-উন্নয়ন সমিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রধান ভাগটির কর্মসূচী সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত : (১) প্রাথমিক (Basic) সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ; (২) সমষ্টিগত (Composite) পরিকল্পনা ; এবং (৩) শিক্ষাশিবির (Training camp) : প্রথম অংশের উপর কৃষির উন্নতি, জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা,

কর্মসূচী ও অগ্রগতি

দ্বিমুখী কর্মপন্থা ও তত্ত্বাবধায়ক

রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি; দ্বিতীয় অংশের উপর কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্রায়তন কারিগরি শিল্প প্রভৃতি এবং তৃতীয় অংশের উপর বিশেষজ্ঞদের অধীনে জনসাধারণকে বাস্তব শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা ন্যস্ত আছে। দ্বিতীয় ভাগটির উপর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাঞ্চলের উন্নতির ভার বিদ্যমান।

(১) ভারত-মার্কিন কারিগরি সাহায্য | (২) সম্মিলিত প্রচেষ্টা (৩) ফোর্ড-প্রতিষ্ঠান চালিত তহবিল ও সমাজ-উন্নয়ন সংস্থাচালিত

| রাজ্যসমূহ | পরিকল্পনা-অঞ্চল | উন্নয়ন ব্লক | শিক্ষাশিবির | পরিকল্পনা-অঞ্চল | শিক্ষাশিবির-সহ উন্নয়ন-অঞ্চল |
|---|---|---|---|---|---|
| ভাগ—এ | ৩২ | ১৬ | ১৬ | | |
| ভাগ—বি | ১১ | ২ | ৬ | | |
| ভাগ—সি | ২ | ৮ | | | |
| | ৪৫ | ২৬ | | | |

প্রদত্ত তালিকা থেকে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার দু'টি পৃথক্ রূপ ধরা পড়ে। যে-সকল অঞ্চলে জলসেচ-প্রণালী উন্নত ও বৃষ্টিপাতের নিশ্চয়তা আছে, সে সমস্ত অঞ্চলের উপর বেশি নজর দেওয়া হয়। নিম্নের তালিকা থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উন্নয়নকেন্দ্রের সংখ্যা জানা যাবে। প্রসঙ্গতঃ এটাও স্মরণীয়, প্রতিটি ব্লক তিনটি কেন্দ্রের সমান অঞ্চলে গঠিত। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি রাষ্ট্রে কেন্দ্র-ছাড়া ব্লক স্থাপনের কথা চিন্তা করা হয়: যেমন,—

তালিকাদি

| | | |
|---|---|---|
| (১) | মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশ | ৬টি করে |
| (২) | বোম্বাই, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব | ৪টি ,, |
| (৩) | উড়িষ্যা | ৩টি মাত্র |
| (৪) | মধ্যভারত, আসাম, হায়দ্রাবাদ, রাজস্থান, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন | ২টি করে |
| (৫) | বি ও সি রাষ্ট্রের অন্যান্য স্থানে | ১টি ,, |
| (৬) | পশ্চিমবঙ্গ | ৮টি ব্লক |

১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬·৩ কোটি লোক অধ্যুষিত ১,১৮,৯৫৭টি গ্রাম ও জাতীয় সম্প্রসারণ-কৃত্যকে ৮·৬ কোটি জনতা-অধ্যুষিত ১,৫৭,০৬৯টি গ্রামকে পরিকল্পনার অধীনে আনা সম্ভবপর হয়। ১৯৫৮ সালের ৩১-শে ডিসেম্বর অবধি ৩,০২,৯৪৭ গ্রাম এবং প্রায় ১৬·৫ কোটি জনতা-অধ্যুষিত ২,৪০৫টি ব্লক এই পরিকল্পনার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়। সংশোধিত কর্মপন্থায় সমগ্র ভারতভূমি ১৯৬৩ সালের অক্টোবরের মধ্যে এই পরিকল্পনাধীন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার বাকি কার্যের বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল:

| সময় | সম্প্রসারণ-কৃত্যকে ব্লকের সংখ্যা | সম্প্রসারণ-কৃত্যকের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রহণীয় ব্লকের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১৯৫৮—৫৯ | ৭৫০ | ২৬০ |
| ১৯৫৯—৬০ | ৯০০ | ৩০০ |
| ১৯৬০—৬১ | ১০০০ | ৩৬০ |

পরিকল্পনা-কমিশন সমাজ-উন্নয়নের যে-খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, সমাজ-উন্নয়নের কর্মসূচী প্রধানতঃ ছয়টি: (১) কৃষি-উন্নয়ন; (২) কুটির-শিল্প ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসংগঠন; (৩) বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রচার; (৪) স্বাস্থ্যোন্নয়ন; (৫) আবাসগৃহের উৎকর্ষ সাধন; (৬) যোগাযোগের উন্নতি সাধন। এ-ছাড়া পশুপালন, পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা, সেচ উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতিও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় কম গুরুত্ব পায়নি।

প্রধান কর্মসূচী

এসব কাজকে সফল করার জন্যে চাই প্রচুর অর্থ। এ-অর্থের প্রয়োজন মেটাবে সরকার আর জনসাধারণ যৌথভাবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে সর্ব-প্রথম ৬৫ কোটি টাকা বাজেট করা হয়। ৩৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা নিয়ে কাজ শুরু হয়। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ভারত সরকার ৩৪ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা দেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'টি. সি. এম. অপারেশান্যাল চুক্তি' অনুযায়ী সাজসরঞ্জাম আমদানীর জন্য ১৪.২৪ মিলিয়ন ডলার এই পরিকল্পনা তহবিলে পরে দান করেন। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস তক জনসাধারণের সাহায্য পরিমাণ ৬৫.৯৩ কোটি টাকা। ইহা মোট সরকারী ব্যয় ১০৩.৪ কোটি টাকার প্রায় শতকরা ৬৪ ভাগ। ৫২.৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম পরিকল্পনানুযায়ী ১২০০ ব্লকের কাজ সুচারুভাবে সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সর্ব-সমেত ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ের কথা আছে। ত্রৈবার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা প্রতিটি সম্প্রসারণ-কৃত্যকে ও ১২ লক্ষ টাকা প্রতিটি সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যয়িত হবে। জনসাধারণের শিক্ষার জন্যে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন থেকেও ভারত-মার্কিন চুক্তি অনুযায়ী সাহায্যের টাকা পাওয়া গিয়াছে। তাছাড়া রাজ্য-সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ও অর্থব্যয়ের হারই হবে সর্বোচ্চ।

আয়-ব্যয়ের হিসাব

জাতি-সংঘ সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত নীতির ব্যাখ্যা করে বলেছেন,—'সমাজ-উন্নয়ন একটি পদ্ধতি যার উদ্দেশ্য সমষ্টির সক্রিয় সহযোগে ও গোষ্ঠীগত কার্যপ্রেরণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে' সমগ্র সমাজের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির পরিবেশ সৃষ্টি করা।' পরিকল্পনা-কমিশনের অন্তর্ভুক্ত সমাজ-উন্নয়ন প্রশাসনের একই পুস্তিকায় সমাজ-উন্নয়নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখা রয়েছে,—'গ্রাম্য সমাজ উন্নয়নের প্রধান কার্য ও উদ্দেশ্য জনসাধারণকে উন্নততর জীবন-যাপনে প্রেরণা দেওয়া ও কি উপায়ে উন্নততর জীবন যাপন করা যায় সে-বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া।' 'সমগ্রভাবে সমস্ত সমাজকে পরিপূর্ণ জীবনের

লক্ষ্য ও আদর্শ

আস্বাদ দেওয়া,, শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাম্যবস্তু।' এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রামের অর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আনার একটা প্রক্রিয়ার সূচনা করবে। অতএব, সমাজ-জীবনের উন্নতিসাধন হচ্ছে এর উদ্দেশ্য, আর সম্প্রসারণ-ব্যবস্থা এর সাধক। শিক্ষিত ও সুস্থ জীবনযাত্রার পক্ষে যোগাযোগকে এক অপরিহার্য নীতি হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। 'সুতরাং সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার চিন্তা ধারা বহুমুখী হতে বাধ্য হয়েছে।' সমষ্টির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতায় এ কাজ সম্পাদন করতে হবে। গণকল্যাণকামী রাষ্ট্রের জন্যে জনগণের আত্মসচেতনতা ও আত্মনির্ভরতার একান্ত প্রয়োজন। এটিই হচ্ছে সমাজ-উন্নয়নের মূল আদর্শ ও নীতি।

এই পরিকল্পনা নীরন্ধ্র নয় স্বীকার্য হলেও এ ধরণের সমালোচনায় শক্তিক্ষয় অনুচিত। পরিকল্পনা যাতে সার্থক রূপায়ণের পথে বিঘ্নিত না হয়, তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাই আমাদের পক্ষে সময়োচিত।……এ কথা নির্বিবাদে বলা চলে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত যে-হারে উন্নয়নের অগ্রগতি সূচিত হয়েছে তা সত্যি খুবই আশাপ্রদ। গ্রামে গ্রামে দলগত চেতনা ও অন্তর-বিনিময়ের বাসনা প্রবল হয়ে উঠছে দিন দিন। গ্রামের বয়স্ক লোকদের মিলিত-চেষ্টায় পৌরসংঘ গড়ে তোলা, টাকা তুলে পার্কের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টিবোধের পরিচয় দেওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে পশ্চিম-বঙ্গের মহম্মদবাজারে যে অপূর্ব কর্মপ্রেরণা জেগেছে, তা দেখে সত্যি উৎসাহিত হবার কথা। সমাজ-উন্নয়ন বিষয়ে উন্নয়ন-কমিশনারদের যে সভা হয় তার উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রধান মন্ত্রী বলেছিলেন'—'এই পরিকল্পনার কাজে নামতে হবে এমন কিছু নিয়ে, যার মধ্যে অগ্নির তেজ আছে; এমন একট প্রবুদ্ধ চেতনা নিয়ে, যা একটা জাতিকে উচ্চ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত করতে পারে।' শ্রীযুত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. সি. এস্.-এর মতে, 'বস্তুর ক্ষেত্রে লক্ষ্যলাভ সত্ত্বেও উন্নত জীবনযাত্রার জন্যে গ্রামবাসীর মনে কিছুটা জাগরণের পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও, একথা বলা শক্ত যে, এই আন্দোলনের মধ্যে এমন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে যা' আমাদের উচ্চ প্রেরণা যোগাতে পারে।' তবে এই পরিকল্পনায় মার্কিন-সরকারের প্রায় আর এক কোটি টাকার সাহায্য প্রদান আমাদের উদ্দীপিত করে।

সমালোচনা ও প্রতিকার

পরিশেষে, সুস্থ ব্যক্তিত্বের জন্যে সুস্থ সমাজ ও বলিষ্ঠ সমাজবোধের দরকার। ঠাকুর-পরিবারে উদার সংস্কৃতির আবহাওয়া বিরাজ না করলে আমরা হয়তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পেতাম না। তাই সমাজচেতনা গড়ে' তুলতেই হবে। আর এর জন্যে চাই 'আমি' 'আমার' বদলে 'আমরা' 'আমাদের' শিক্ষা। সমষ্টির চিন্তায় মগ্ন থাকার জন্যে তাকে উৎসাহিত করা সর্বৈব প্রশংসনীয়। এর জন্যে চাই আমাদের আদর্শের ভাবগত আবেদন। যে-আদর্শের প্রতি আমাদের প্রাণের বেগ বেশি, তারই জন্যে খেটে আমরা উৎফুল্ল হই। 'অতএব

পরিশেষ

আমাদের আদর্শ এমন হওয়া উচিত যা আমাদের মধ্যে গভীর ভাবের উদ্রেক করে, যাতে আমাদের মনে হয়, আমরা খুব বড় উদ্দেশ্যের জন্যে কাজ করছি ; নচেৎ মহৎ প্রচেষ্টা সার্থক হওয়া অসম্ভব।'

# আধুনিক বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতি

ভূমিকা

'আধুনিক' শব্দটি অত্যন্ত বিতর্কবহুল। কারণ, আধুনিকতার কালগত বৈচিত্র্যের পরিবর্তন হয় সময়ধারার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। সুতরাং আমাদের আলোচনায় 'আধুনিক বাংলা কবিতা' বলিতে আমরা পর-রবীন্দ্র 'কল্লোলযুগ' হইতে শুরু করিয়া সাম্প্রতিক কাল অবধি কবি-দের রচনাকে আলোচনার বিষয়ীভূত করিব। 'রবীন্দ্র-যুগে'র কবি-সাহিত্যের সহিত ইহার মৌলিক ব্যবধানের সুরটি কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও-বা পরোক্ষভাবে ব্যঞ্জিত। অন্ততঃ এ সময়ের কবিমানস রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করিয়া এ নূতন পথে পরিভ্রমণ করিয়াছে তাহার বিবর্তনের ইতিহাস কম কৌতূহল-জনক নয়। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, অতীত দিনের ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া কোন নূতন কাব্যরীতি রাতারাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না—নূতনের উদ্ভবের বীজ নিহিত থাকে পুরাতনেরই জঠরে। অতএব, যে নবতর প্রেরণায় আধুনিক কবিতার স্বাতন্ত্র্য, তাহাকে একেবারে আকস্মিক মনে করিবার কোন কারণ নাই। ঐতিহাসিক প্রয়োজনবোধের তাগিদে বাংলা কাব্যের পরিবর্তন বাস্তবতার যাত্রাপথে যে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে, তাহা একেবারে নগণ্য নয়।

পরিবর্তনের কারণ

বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা ও নিয়ামক প্রায়শঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কবি ও সাহিত্যিকরা। বৈদেশিক রাজশক্তির শাসনে ও শোষণে এই উপমহাদেশের শিরায় শিরায় ব্যথা-বেদনার স্রোত গলিত লাভার মত সমস্ত দেশের দেহকে আত্যন্তিক বেদনায় অস্থির করিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া সর্বাপেক্ষা বেশি হইয়াছে মধ্যবিত্ত-মানসে। জীবনের গভীর নৈরাশ্য ও অবক্ষয় তাহাদিগকে স্বপ্নালুতার ভাবলোক হইতে ক্রমশঃ সরাইয়া আনিতে কঠোর বাস্তবের ধূলিধূসরতার মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়াছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাই নূতন বৈপ্লবিক চেতনা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে—কবিরাও বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়াইয়া চলিয়াছেন নূতন পথে।

আধুনিক বাংলা কবিতায় বিদ্রোহের দুইটি মূল সুর

বলা বাহুল্য, কবিশেখর কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন কবিগণের সমকালীন হইলেও, আধুনিক-পূর্ব বাংলা কবিতারই ধারা উহাদের রচনায় অনুসৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই বিদ্রোহী আধুনিকতার উদ্বোধন হইয়াছে মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইত্যাদি রবীন্দ্রোত্তর কবিদের রচনায়। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত-জীবনের ভাঙন ও নবতর সৃষ্টির গান ইহাদের কণ্ঠে মন্দ্রিত

হইল। নানা কবির নানা কাব্য-কবিতায় নানা রূপে বিদ্রোহী মনোভঙ্গী ছড়াইয়া পড়িল। এক দিকে জীবন-রসিক মোহিতলাল ভোগবাসনার এক বিচিত্র তথ্য প্রকাশ করিলেন। মার্কিন-কবি হুইট্‌ম্যানের বাণী হইল ইঁহাদের বেদমন্ত্র—

A little while we die—
Shall not life thrive as it may,
For no man under the sky
Lives twice out-living his day.

অতএব, এই জন্মের সীমাবদ্ধতাকে পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে হইবে—নারীর দেহ হইতে নিঙড়াইয়া লইতে হইবে সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত লাবণ্য। কারণ,—

রমণী-অধর-সীধু যে রসনা করিয়াছে পান
অমৃত-পায়স তার মনে হবে ক্ষারকটু প্রলেহ-সমান।

এইভাবে নারীকে মোহিতলাল মনে করিলেন ভোগেরই উপকরণরূপে—তাহার আত্মা ও হৃদয় আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিলেন না। অন্য দিকে নজরুলের কণ্ঠে আমরা শুনিলাম অন্য সুর। রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন গণমানবের জয়—কারার লৌহকপাট ভাঙ্গিয়া লোপাট করিয়া নূতন সমাজ গড়িবার আহ্বান জানাইলেন 'অগ্নিবীণা'র বিদ্রোহী কবি নজরুল। 'বিদ্রোহ' কবিতায় তিনি ঘোষণা কবিলেন—

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
যবে অত্যাচারীর খড়্‌গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।

পরবর্তী কালে এই দুইটি পৃথকধর্মী সুরই পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

মোহিতলালের জৈবিক বাস্তবতা ও কল্লোলযুগের যৌন-আত্মরতির উৎস খুঁজিয়া পাওয়া যায় গোবিন্দ দাস ও বিদেশী কবিদের রচনায়। নারী-সম্পর্কে গোবিন্দ দাস স্পষ্টই বলিয়াছেন—'আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমজ্জাসহ।' বিদেশী লরেন্সীয় জীবন-দর্শন—"If we can exchange our ideas, why can't we exchange our feelings?"—ইহাদিগকে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। গ্লানিময় যৌন-অক্ষমতারও স্বীকারোক্তি বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় মিলে—

আধুনিক বাংলা কবিতার সুরবৈচিত্র্য

রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমণী-রমণ রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি।

'বন্দীর বন্দনা'র কবি রতিক্রিয়ার অবাস্তব রোম্যান্টিক ভাববিলাসিতায় বলিয়াছেন—

যে মুহূর্তে বাসনা-বিহ্বল নীবি খসে পড়ে
দেখা দেয় কলের প্রলয়-জলে

সর্বগ্ন তিমির-তলে অলজ্জ ব-দ্বীপ,
অমনি কাল ; অদৃষ্টের করাল-কুহেলী দীর্ণ করি
আদিম পুরুষ
লভে সপ্তদশ-দ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর।

অবশ্য অচিন্ত্য সেনগুপ্তের নারী-ঘটিত কবিতায় খানিকটা সাহসিকতার পরিচয় থাকিলেও, অজিত দত্তের রোমান্টিকতা সত্যই চমৎকার—

মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মত চঞ্চল উদ্দাম ;
মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম।
আমি সে বায়ুস্রোতে খসে-পড়া পালকের মত
আকাশের শূন্য নীলে মোর কাব্য লিখি অবিরত,
সে আকাশ তোমার অন্তর,
মালতী, তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর।

অথচ এমনিতর রচনায় গোবিন্দ দাস বহু পূর্বেকার হইয়াও কি চমৎকার দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন ! মনে হয় যেন একেবারে সাম্প্রতিক কালে লেখা ঃ

রুমাল পয়মালকারী বিলক্ষণ চিনি নারী
চিনি সে অটোডিরোজ, ইউডিকলন ;
একটু শুঁকিতে হায়, হাওয়ায় উড়িয়া যায়,
পকেটে রাখিলে তবু করে পলায়ন।'

অবশ্য জীবনানন্দ দাশের রোম্যান্টিকতা আরও অনেক বেশি সুন্দর ! তাঁহার রচনার আঙ্গিকে আছে সুদূরতা ও ব্যাপকতার ইঙ্গিত ঃ যেমন,—'বনলতা সেনে' পাই—

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙ্গে যে নাবিক হারিয়েছে দিশা,
সবুজ ঘাসের দেশ যখন চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে—
'এতদিন কোথায় ছিলেন !'
পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

তবে জীবনানন্দ সম্পর্কে সব চেয়ে বড় কথা এই যে 'ঘটনার ঘনঘটায় তাঁর চিত্ত অতি অল্পই আলোড়িত হয়েছে। কিন্তু তার কারণ এই নয় যে, জনজীবনের সঙ্গে তিনি যোগ রাখতে চাননি। চেয়েছিলেন, তাঁর নিজস্ব উপায়ে। তাৎক্ষণিকতার আকর্ষণ থেকে দূরে সরে গিয়ে মানবজীবনের সারাৎসারকেই তিনি তাঁর কাব্যে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। দূরে যাবার দরকার ছিল। তিনি জানতেন, ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে দাঁড়ালে কদাচ তার সামগ্রিক চেহারাটিকে দেখতে পাওয়া যায় না। তার জন্য ঈষৎ দূরত্ব রচনার প্রয়োজন ঘটে। তিনি যখন বলেন,—

"আছে আছে আছে" এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষণ্ণ হৃদয় ;
জয় অস্তসূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়।

তখন মনে হয় দূরে গিয়েও—হয়ত দূরে গিয়েই—তিনি আমাদের কাছে থাকতে চেয়েছিলেন।' বুদ্ধি ও বোধ, মস্তিস্ক ও হৃদয়—এই দুয়ের মধ্যে শুধু জীবনানন্দই সেতু-সংযোজনা করেন নাই, প্রেমেন্দ্র মিত্রও করিয়াছেন। তবে প্রেমেন্দ্রের কবিতা মুলতঃ হৃদয়নির্ভর হইলেও তাহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য অহেতুক প্রয়াস তিনি পান নাই। সত্যই নিঃসন্দেহে এই সময়কার শ্রেষ্ঠতম কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁহার যে কবিমানস হইতে 'প্রথমা'র উৎপত্তি, তাহার এক দিকে করুণ বর্ষার ঝর্‌ঝরানির মতো বিলাপের সুর, অন্যদিকে জনতার সম্মিলিত দূর পদধ্বনি। লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের ব্যর্থতায় যে-মন বলে—

জীবন-শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল
সে মিথ্যায় মত্ত হয়ে সত্য তোর ভোল।

নিষ্ঠুর বাস্তবের নির্মম আঘাতে সেই মধ্যবিত্ত মনকেই দেখি কল্পনার আশ্রয়নীড় খুঁজিতে। বিদ্রোহী জীবন হইতে উৎসারিত বাণীতে তাই ফুটে পীড়িত অবহেলিত নিঃস্বদের জন্য দরদ—

অগ্নি-আঁখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম,
চেন কি তাদের ভাই?
দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
দুয়েরই বল্গা নাই?

এই একই সুরে তিনি গণমানবের সঙ্গে নিজের একত্মতা ঘোষনা করিয়াছেন—

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটেমজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের!
আমি কবি ভাই কর্মের আর ধর্মের;
বিলাস বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই
সময় যে হায় নাই!

কিন্তু 'প্রথমা'র পরবর্তী কালে দেশের জাতীয় জীবনে যে বিরাট্ ভাঙ্গাগড়া হইয়া গিয়াছে, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাহার সহিত সমতালে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 'সম্রাট্' কাব্যে যদিও তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—

শুধু সদস্য আমরা নই, আমরা যে সম্রাট্!
শুধু লভ্যাংশে মন ভরে না, চাই সাম্রাজ্য।
বিধাতার সাথে সেই তো আমাদের চুক্তি!

অথচ 'ফেরারী ফৌজে' তিনি জীবন-পলাতক এবং তাহার কারণ সকলের নিকট বিদিত —তিনি যখন সাম্রাজ্য-স্থাপনে ব্রতী, জনতার কথা তাঁহার মনে নাই। তবে 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থে প্রেমেন্দ্রের কাব্যচিন্তায় নূতন এক হাওয়া-বদলের পালা দেখা যায়। ইহা তাঁহার অদম্য প্রাণশক্তিরই পরিচায়ক।

পরিচয়-গোষ্ঠীর সুধীন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন ইত্যাদির কবিতায় যুক্তিবুদ্ধির প্রাথর্য আছে—জীবনানন্দ-প্রেমেন্দ্রের ন্যায় হৃদয়নির্ভর নয়। 'সুধীন্দ্রনাথ মিতভাষী কবি,

শব্দনির্বাচনে তিনি ধ্রুপদী পন্থায় আস্থাবান্।' তবে কোন রকমে শব্দের দুরূহার্থকতা কাটাইয়া উঠিতে পারিলেই 'যুগসংশয়ে পীড়িত, প্রশ্নার্ত অথচ মীমাংসাজিজ্ঞাসু এক অসাধারণ শিল্প-মানসের সান্নিধ্য পাওয়া যায়'। অবশ্য এমন সমালোচকও আছেন যাঁহাদের মতে এই কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নাই—উটপাখীর মত বালিতে মুখ গুঁজিয়া ইঁহারা ঝড়ের দাপট হইতে আত্মরক্ষা করেন এবং পাণ্ডিত্যাভিমানের গজদন্তমিনার হইতে জনতার জন্য কাব্যবাণী প্রেরণ করেন—আসলে এসব পাণ্ডিত্যেরই ঘোড়দৌড়। সমাজনিষ্ঠ কবি বিষ্ণু দে বলেন,—

আধুনিক বাংলা কবিতায় দুর্বোধ্য ধুসরতার সাধনা

মরীয়া লিবিডো আজো কাউন্‌সিলের প্রবল গলায়,
ওড়েনি ওড়েনি আজো কঠিন সঙ্গীন
সর্বকামপরিত্যাগী কর্পোরেশনের ব্যূহদ্বারে।

আবার শুনুন সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় দুর্বোধ্য শব্দের সমারোহে কাব্যিক জগাখিচুড়ি—

রন্ধ্রহীন বিস্মৃতির প্রতন পাতালে।
অতিক্রান্ত বিলাসের, অস্থাবর প্রমোদের শব
অনুর্বর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব
যোগায়ে জীয়ান-রস অপুষ্পক-বীজে।

অবশ্য পলায়নবাদী সমর সেন মহুয়ার সুবাসে আর ছায়ায় হৃদয়ের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিলে কাহারও কিছু বলিবার ছিল না; কিন্তু তাঁহার ধূসর বিশীর্ণ মনের বমন সত্যই অস্বস্তিকর—

কালিঘাট ব্রিজের উপর কখনো কি শুনিতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে শহর, হে ধূসর শহর!

পক্ষান্তরে, 'রুচিসুন্দর, শুচিশুভ্র হৃদয়ের অধিকারী' অমিয়কুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে 'সুধীন্দ্রনাথের ব্যবধান প্রায় অসেতুসাধ্য'। 'এমন নয় যে, মানবজীবন এবং তার পরিবেশের নানা অসংগতি অমিয় চক্রবর্তীর চোখে কখনও ধরা দেয় নি। দিয়েছে; কিন্তু তা তাঁর কাছে খুব পীড়াদায়ক হয়নি বলেই বিশ্বাস করি। তার কারণ, সেই অসংগতির চিত্রটিকে তিনি নিতান্তই আপাতক বলে ভাবতে পেরেছেন……'সংগতি' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যেখানে ঝোড়ো হওয়া, পোড়ো বাড়ি, ভাঙা দরজা ইত্যাদি সমস্ত-কিছুরই এক অনিবার্য উত্তরসংগতির কথা বলা হয়েছে।' যুক্তিনিরপেক্ষ এই বিশ্বাসের দরুণ কবি অমিয় চক্রবর্তী অতি সহজেই বলিয়াছেন—

মধ্যাহ্নের রিক্তপটে রৌদ্র লেগে
ঐ দেখ বৃক্ষচ্ছবি আছে জেগে।

ধ্যানের মতন
বিশুদ্ধ তাকেই দেখ, মন।
আলোয় রয়েছে ডুবে, হাওয়া তাকে যায় স্পর্শ করে,
মন্ত্র যোগে তারাময় ভোরে।

জীবনসংগ্রামী কবিদলের কাব্যসাধনা

বিদ্রোহের ঐ নৈরাশ্যবাদ কাটাইয়া যাহারা বাংলা কাব্যে নূতন বলিষ্ঠতার সঞ্চার করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই মার্কস্‌বাদী। কাব্যকে তাঁহারা জীবনসংগ্রামের সহিত অঙ্গাঙ্গী করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের রচনা সব সময় রুচিমাফিক না হইলেও যে বলিষ্ঠ ইহা অবশ্য স্বীকার্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিদ্রূপাত্মক কবিতার বক্তব্য কত তীক্ষ্ণ,আঘাত কত প্রত্যক্ষ:

প্রভু যদি বলো, অমুক রাজার সাথে লড়াই,
কোন দ্বিরুক্তি করব না। নেবো তীর ধনুক।
এমনি বেকার। মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই—
দেহ না চ'ললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক!

আরও গভীর কবি অরুণ মিত্রের অনুভূতি—প্রকাশভঙ্গী তাঁহার অনেক বেশি সংহত সংযত। সমগ্র মানবগোষ্ঠীর পরিপূর্ণ জীবনছন্দের সহিত যেন তাঁহার কবিতার আত্মীয়তা। 'লাল ইস্তাহারে' রাজনৈতিক উত্তেজনা থাকিলেও সে তো উহারই স্বীকৃতি—

প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার ?
লাল অক্ষর আগুনের হল্‌কায়
ঝল্‌সাবে কাল জানো!

সরোজকুমার দত্তেরও কাছে শোনা যায় এই কবিগোষ্ঠীর জবানবন্দী—

কবরে প্রেতিনী হ'য়ে কাঁদিবে না আমার বেদনা,
দুঃসাহসী বিন্দু আমি, বুকে বহি সিন্ধুর চেতনা!

বাংলার কিশোর-কবি নয়, কবি-কিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবনানুভূতি ও প্রত্যাশা গভীরতর। সুকান্ত-প্রতিভার অবিনশ্বর সাক্ষ্য 'ছাড়পত্র' ও 'ঘুম নেই' প্রাত্যহিক জীবনের রূঢ় বাস্তবতা হইতে উৎসারিত। মাত্র বিশ বৎসর বয়সে দারিদ্র্যকীটে দংশন করিয়া ঐ স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভাকে শেষ অবধি কালকবলিত করায় বাংলা কাব্যের অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে। কবি সুকান্ত আর্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন—

এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম তোমারে সেলাম!

বিদ্রোহী আধুনিকতা, অবোধ্য ধূসরতা ও জীবনসংগ্রামের তীব্রতায় আধুনিক বাংলা কবিতা অধ্যুষিত। তবে এমন জনকয়েক কবিও আছেন, যাঁহাদের কবিতাদিতে

ঐরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান না মিলিলেও স্ব স্ব ভাবানুভূতির বৈশিষ্ট্যে তাঁহারা আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। 'স্বপ্ন ও সংগ্রামে'র কবি অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় মনে করেন, "অলক্ষ্যে বৃহতের জন্য স্বপ্নপ্রয়াণ এবং প্রত্যক্ষ ক্ষুদ্রত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-চেতনা—এই হচ্ছে পূর্ণ জীবন, শিল্পজীবন তথা সত্যজীবন।" এই জীবনদৃষ্টি থাকায় কবি অমিয়রতন বলিয়াছেন—

আধুনিক বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য সুরবৈচিত্র্য

সেই পৃথিবী, সেই পৃথিবীর আমি সাধনা করি,—
যেখানে অন্নের সঙ্গে পুষ্পের হয় না প্রতিদ্বন্দ্বিতা,
—একে হনন করে না অপরকে।
যেখানে মানুষ ভোলে না মধুপের আনন্দ,
মধুপ হরণ করে না মানুষের কর্মশক্তি।

পক্ষান্তরে, এক চিরন্তন বাউল 'যাযাবরে'র কবি সুধীর গুপ্তের নিভৃত মনোমন্দিরে থাকিয়া তাহার মাঝে 'রমান্তিক' বৈরাগী-বৃত্তির অনুভূতি সঞ্চারিত করিয়াছে। মন ও মাটির সুবলিত যোগাযোগে আবেগানুভূতির স্বর্গ মন্দাকিনীতে মর্ত্যভাগীরথীকে প্রবাহিত করিবার সাধনাই এই কবির সাহিত্যধর্ম। তাই 'মাটির মাধুরী'তে 'বিরহীর অভিজ্ঞতা' বর্ণনাকালে কবি গাহিয়াছেন—

হারানোর চেয়ে অনেক ভালো যে
কোনো দিন ভালো না বাসা;
পুরানো স্মৃতির পুঞ্জিত চাপে মরিয়া
বুঝিয়াছি, ভালো ছিল চিরকাল
বুকে পুষে রাখা তিয়াসা;—
মরুতে না হয় মেঘভার যেতো ঝরিয়া।

'নিশান নাও-'য়ের কবি ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় সেই স্বদেশী যুগে দেশবাসীর অন্তরে যে বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চারিত করেন, তাহার জন্য তিনি 'চারণ-কবি'ও বটে। 'জাগরণী'তে তিনি গাহিয়াছেন—

চক্ষে হানিয়া দামিনী-দীপ্তি, বক্ষে বাঁধিয়া বজ্রানল
চরণে বাঁধিয়া ঝঞ্ঝার বেগ কম্পিত কর ধরণীতল।
রক্তসায়রে ফুটিছে ফুল!
যুগের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া জাগুক্ হিমালয় হ'তে জলধিকুল।

'কোণার্কে'র কবি জীবনকৃষ্ণ শেঠ অতীতকালের সেই কোণার্কের সূর্যমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার বিচিত্র ভাবানুভূতিকে বিভিন্ন কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। অপরিসীম গভীর দরদ লইয়া তিনি কবিতাগুলি লিখিয়াছেন। আর তাহারই ফলে কবিবাণী যেন জীবন্ত চিত্ররূপে আমাদের নয়নপুটে উঠে ফুটিয়া। লিয়াখিয়া নদীর কি মনোমদ সজীব ছবিই-না তিনি আঁকিয়াছেন—

খেয়ালি জোয়ার আসে, সোনালি জোয়ার,
লিয়াখিয়া বয়ে চলে খরতর বেগে।

লক্ষ আলোর কুচি ঢেউএ ঢেউএ ভেঙ্গে চুরে যায়।
অপরূপ—অপরূপ লিয়াখিয়া, কাহারে সে খোঁজে ?

রজনীগন্ধা, নির্ঝর, পাহাড়, নদী, ভোরের হাওয়া, তরু, কোকিল, ঘন বরষা প্রভৃতি লইয়া এই যে রহস্যময়ী প্রকৃতি—ইহার প্রতি 'মঞ্জরী'র কবি ধীরানন্দ ঠাকুরের 'অনুরাগের দীপ জ্বলে যেন অনির্বাণ'। প্রকৃতির সূত্রে জীবনকে এই যে ভালো-লাগা, ইহার মূলে আছে 'জীবের জিজীবিষা।' তাই জীবনের ওপারে রহিয়াছে যে-মরণ, তাহার সম্পর্কে ধীরানন্দ অতীব সহজ কণ্ঠে স্পষ্ট তাৎপর্যময় ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন—

মরণ মানে শূন্যতা, জীবনশূন্যতা—
সব অনুভূতির লয় ও লোপ।

'অনামিকা'র কবি গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়েরও সঙ্গে নিসর্গপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ মিলন ঘটিয়াছে, কিন্তু এই আন্তর মিলনের মূলে রহিয়াছে যে সৃজনীশক্তি তাহাকে নিঃশেষে জানিবার বাসনা তাঁহার নাই। রমান্তিক মনোবৃত্তি কবি তাই বলিয়াছেন—

চিনেও চিনি না স্বরূপ তোমার
আলো-ছায়া তনিমা,
দিওনাকো মোরে তব পরিচয় অনামিকা অসীমা।

'স্বপ্নজাগরে'র কবি অনিলেন্দু চক্রবর্তীর কাব্যকৃতি সম্পর্কে নিঃসংশয়ে বলা যায় "একাধারে 'কড়ি ও কোমল' ভাবের এই কবিতাগুলির মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি, স্পষ্ট অবলোকন ও চিত্রাঙ্কনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে—সমস্ত-কিছুর মধ্যেই কবির সমবেদনার সুরটি উপভোগ্য। ...Antipathy না দেখিয়েও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ কাব্যকারের অন্যতম গুণ।" এই অনন্য-সাধারণ পরিচয় কবি অনিলেন্দুর লেখায় প্রচুর পরিমাণেই ছড়াইয়া রহিয়াছে। যেমন,—

চেয়ে দেখো আর এক দুনিয়া :
শ্বেত আর পীত আর কালো মানুষেরা যায় মিলে
মৃত্যু ঠেলি' অবিশ্রান্ত প্রাণের মিছিলে,
অলির গলির দ্বন্দ্ব মিটে যায় মুক্ত ময়দানে ;
স্বেদ ঝরে, পলি পড়ে—
অহল্যার হাসি ফোটে ফসলের গানে।

আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে আরও যাঁহারা লেখনী চালনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিমলচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, দিনেশ দাস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শঙ্খ ঘোষ, শাহাদাৎ হোসেন, জসীম-উদ্‌দীন, ফররুখ্ আহমেদ, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রসিদ খাঁ, সুফিয়া কামাল, নূরুন্নাহার, মতিউল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, বন্দে আলী মিঞা, আবদুল কাদির, সৈয়দ আলী আহ্‌সান, বেনজির মহম্মদ, আহসান হাবিব, গোলাম কুদ্দুস প্রভৃতির নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ ধরণের চিন্তাধারার শরীক এবং ইঁহাদের কাব্যধর্ম নবজীবনের আগমনী-বাণীতে মুখর।

শেষ কথা

# অষ্টম সংস্করণের পূর্বভাষ

...গে এইখানির সপ্তম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। যদিও ...ল সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তবু সংস্করণের ...গ্রিক সমুন্নতি সকলেরই দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করিতে ... বইয়ের গত সাতটি সংস্করণেরই বেলায় দেখিয়াছি যে প্রকাশনার ...ৎসরও নয়—এক মাসেরই মধ্যে উহা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। ... অপরিসীম প্রিয়তার সহিত তাল রাখিয়া বইখানি আরও পূর্বে ...হওয়ায় ছাত্রছাত্রীসমাজের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, আমরা জানি। তাই ...প্রকাশনার জন্যই আমরা খুব দুঃখিত।

...না জাতের, ...না বুলির, নানা সাজের রচনাপুস্তক থাকা সত্ত্বেও, এই ব... ...এই বিগত ... মাস ব্যাপিয়া সমভাবে থাকায়—সমভাবে কেন, বৃদ্ধি পাওয়... ...নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। সাধারণতঃ এতদিন কোন পুস্তক অপ্রকাশিত থাকিলে তাহাকে লোকে ভুলিয়া যায় এবং অন্য কোন পুস্তক সেই অপ্রকাশিত পুস্তকের স্থান অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু 'একের ভিতরে চারে'র ক্ষেত্রে সেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে দেখিয়া সত্যই আমি খুব আনন্দিত।

এই নবতম সংস্করণটি সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য ইহার প্রতিটি খণ্ডই, প্রতিটি পর্বই, প্রতিটি অধ্যায়ই অতীব যত্নসহকারে সবিশেষ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। এবার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমার্জনা ঘটিয়াছে নবপ্রকাশিত এই সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডে। কলিকাতা, গৌহাটি, ঢাকা ও রাজসাহী—এই চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ও ইন্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষাগুলিতে ব্যাকরণ, অনুবাদ, ভাবসম্প্রসারণ, ভাবার্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কিত যে-সমস্ত প্রশ্ন ইতিপূর্বে আসিয়াছে, তাহাদের প্রায় সবই এ-সংস্করণে স্থান পাইয়াছে। রচনাপুস্তক-পরিপ্লাবিত পাক্-ভারতের বাজারে এই উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি অন্য কোন পুস্তকেই নাই, কেবলমাত্র 'একের ভিতরে চারে'ই আছে। চতুর্থ খণ্ডে পুরাতন অপ্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রবন্ধ বাদ দিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়টি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। অতঃপর অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনাদি পরিলক্ষিত হইবে। অভিনব ধরণের যে-সমস্ত প্রবন্ধ পাক্-ভারত ও আসামের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নানা পরীক্ষায় আসিয়া থাকে বা আসিতে পারে তাহারই নমুনাদি এই সংস্করণে প্রভূত পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান সংস্করণের আর একটি উল্লেখযোগ্য যোজনা পরিলক্ষিত হইবে সপ্তম পর্বের অলংকার-প্রকরণে। এই অংশে আরও কয়েকটি অলংকারের

প্রচেষ্টা করে এসেছেন গ্যালিলিও ও অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। আজ কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন সম্ভাবনার পথে অনেকটা এগিয়ে চলেছে। চাঁদে অভিযানকারীরা প্রথমেই অবতরণ করবে প্লাতোন আগ্নেয়গিরির দক্ষিণে বৃষ্টিসাগরে। চাঁদে যে সমুদ্র স্থলভাগ ও বিভিন্ন রকমের পাহাড় রয়েছে তার একটা থেকে অপরটার পার্থক্য তারা জানতে পারবে ক্রমে। অবতরণের জায়গা থেকে 'আরিস্তার্ক' জ্বালামুখটা খুব বেশি দূর হবে না। পূর্ণিমার দিনে কেন এটা এতো সমুজ্জ্বল দেখায়, তাকে জানার অপরিসীম কল্পনা চাঁদে-অভিযানের ফলে বাস্তবে রূপ পাবে। এ-প্লাতোন জ্বালামুখটাও আর একটা আকর্ষণীয় বস্তু। কেন সেখানে প্রতিনিয়ত রংএর পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়? এটা কি আলোকিত হয়ে ওঠার জন্যে?—না, কি কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার সংযোগের ফল? সর্বোপরি চাঁদে গমন, চাঁদে অবস্থিত শিলা-ধূলো-বালি, উপরিস্থিত ভূখণ্ডের আস্তরণ ইত্যাদি জানার পথ অতি শীঘ্রই সুগম করে দেবে।

**চাঁদে গমনের হেতু**

সৌরমণ্ডলের গ্রহনক্ষত্রকে জানার পথে একমাত্র অন্তরায় বায়ু। এই বায়ুমণ্ডলের জন্যে গ্রহগুলির দৃশ্যরূপ বিকৃত হয়ে যায়, আলোকরশ্মিগুলো ছড়িয়ে যায়, ঘুরে যায়, এমন কি বায়ুমণ্ডলের জন্যে পৃথিবীর সমীপবর্তী মহাশূন্য ভেদ করে' আলোকরশ্মি আসতেও অনেক বাধা পায়। কালো মেঘে আকাশ ঢেকে গেলে কত দিন ও কত ঘণ্টা ধরে' জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজ নষ্ট হয় তাও এই বায়ুমণ্ডলেরই জন্যে। কিন্তু চাঁদে এই বায়ুমণ্ডল নেই। তাই একটা মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করে' চাঁদ থেকে (বায়ুমণ্ডলের সীমানার বাইরে) পর্যবেক্ষণের কাজ করার জন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একটা বিস্তৃত পরিকল্পনার খসড়া করে রেখেছেন। আর তারই দায়িত্বসূচক শিশুচন্দ্রকে মহাকাশে নিক্ষেপ করে' জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎ কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করায় প্রচেষ্টা করে চলেছেন।... চাঁদে যদি মানমন্দির হয়, সেটি টেলিভিশনের ব্যাপক প্রচারে বিশেষ সহায়তা করবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানীদেরও একটি বিরাট্ লাভ হবে। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা পৃথিবী ছাড়াও আরো দু'টি স্বাভাবিক বীক্ষণাগার পাবে: প্রথমটি চাঁদে, অন্যটি গ্রহান্তরবর্তী মহাশূন্যে। সূর্যরশ্মি গবেষণার জন্যে এই বীক্ষাণাগার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।...মার্কিন সরকারের মতে, সোবিয়েত্ সরকারের চাঁদে বীক্ষণাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য একটি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের কাজ গোপনে সম্পাদন করা।

**বীক্ষণাগার ও মার্কিন ভীতি**

পরমাণবিক শক্তির আবিষ্কর্তা পিয়র কুরী নোবেল প্রাইজ উৎসবে বলেছিলেন, সৎ মানুষের হাতে অণুশক্তি মানব-উন্নতির জন্যে খুবই কার্যকরী। কিন্তু অসৎ লোকের হাতে পড়ে' এ-শক্তি একদিন মানবসভ্যতার অনিবার্য শোচনীয়তা এনে দেবে। অধ্যাপক আইনস্টাইনও বলেছিলেন, তৃতীয় মহাযুদ্ধে মানুষ কি ঘটাবে জানা নেই, তবে এটা নিশ্চিত যে চতুর্থ মহাযুদ্ধে মানুষ সেই আদিকালের তীর-ধনুকের ব্যবহার

**সাম্প্রতিক অবিক্রিয়ার সম্ভাব্যতা**

করবে। একথা এখন স্পষ্ট যে, বিজ্ঞান এক দিকে মানুষকে যেমন সভ্যতার চরম শিখরে উন্নীত করেছে, অন্য দিকে তেমনি সে মানুষের বর্বরতা ও হিংসোন্মত্ততাকে প্রশ্রয় দিয়ে আদিমতা ফিরিয়ে দিয়েছে। তাই বর্তমান যুগের বিস্ময় এ-রকেট জানি না কোনোদিন মানবধ্বংসে নিয়োজিত হবে কিনা! যদি মহাকাশে যুদ্ধ করার কোনো অভিসন্ধি রকেট-সভ্যতায় অন্তর্নিহিত থাকে তবে আইনস্টাইনের ভবিষ্যৎ-বাণী বিফল হবে না। তাই আজ এই প্রশ্ন জেগেছে আমাদের মনে—দুর্দমনীয় জ্ঞানপিপাসা ও জানার পরিধিকে ব্যাপ্ত করার অভিপ্রায়ে আবিষ্কৃত রকেট্ নিয়োজিত হবে সৃষ্টির কাজে, না ধ্বংসের কাজে? এ সমস্যার সমাধান ক'রবে ভাবীকালের সভ্যতা—যেদিন পৃথিবী থেকে চাঁদে যাবার 'স্পুত্‌নিকে'র মতো শূন্যে- যাত্রা কাজে পরিণত হবে।

অর্থনীতিবিদ্ ম্যাল্‌থাস একদিন বলেছিলেন, পৃথিবীর এমন এক যুগ আসবে যেদিন পৃথিবীর জনসংখ্যা এতো বেড়ে যাবে যে, এ ভূখণ্ডে তাদের বাসস্থান-বিভ্রাট্ দেখা দেবে। প্রকৃতি তখন ঝড়, ঝঞ্জা ও নানাবিধ কালক্ষরী অস্ত্রে জনসংখ্যা-বৃদ্ধিকে নিরোধ করবে।...লুইসের মতো সমাজ-অর্থনীতিবিদও দুঃস্বপ্ন দেখেছেন যে, অদূরভবিষ্যতে এ-পৃথিবী জনাকীর্ণ হয়ে উঠবে। তাই সুস্থভাবে বাচার জন্যে এখন থেকে চাই জন্মনিয়ন্ত্রণ তথা ভ্রূণক্ষয়। কিন্তু সোবিয়েত্ বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের চিন্তাধারায় এর চেয়ে অধিক লজ্জাকর দিক থাকতে পারে না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকেই ধ্বংস করা যদি বর্তমান সভ্যতার সুচিন্তিত ভাবধারা বলে' পরিগণিত হয়, তা'হলে বিজ্ঞান আছে কেন?......বিজ্ঞান তাই আজ উঠে পড়ে লেগেছে। সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহে বাড়্‌তি মানুষের বাসস্থান খুঁজে পাবার জন্যে বিজ্ঞান আজ একাগ্র সাধনা করে চলেছে। মহাকাশ-অভিযানের প্রথম প্রস্তুতিপর্বের স্বাক্ষর স্পুত্‌নিক তাই মানবসভ্যতার এক নতুন দিগন্তকে মানুষের চোখের কাছে উন্মোচন করে দিয়েছে। কিন্তু অতঃপর? অতঃপর রাশিয়ার তৃতীয় মহাজাগতিক রকেট ১৯৫৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর রাত ২টা ৩২ মিনিট ২৪ সেকেণ্ডে চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌছিয়েছে। মানবেতিহাসে এই প্রথম পৃথিবী থেকে প্রেরিত কোন মহাজাগতিক অভিযান সৌরজগতের অপর কোন গ্রহ-উপগ্রহে পৌছুতে পারল। মহাকাশে পৃথিবীর নিকট-প্রতিবেশী চন্দ্রে যখন ঐ রকেট পৌছয়, তখন ও পৃথিবী থেকে ২৩৩,৬০০ মাইল দূরে ছিল। শেষ পর্যায়ে রকেটের গতি ছিল প্রতি সেকেণ্ডে সাত মাইল। সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা আশা করেন, সোবিয়েৎ রকেট অতি শীঘ্রই শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের দিকে রওনা হয়ে যাবে এবং ঐ দুইটি গ্রহে অবতরণেরও আর দেরী নেই।......

উপসংহার

—ইতি—